ভারতী।

বৈশাখ।

১

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল,
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল।
স্বামী তার, "চৈত্রমাস," অনঙ্গের মত,
[illegible] হেরি, জানু করি নত,
[illegible] ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস।
[illegible]দ্রের মূরতি ওযে!—একি সর্ব্বনাশ!

২

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে,
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম, মাখি কুতূহলে,
তপে মগ্ন—চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে,
হে চৈত্র, এ নিশি শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা—নাশিতে জীবন
রোষাক্ত বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন।

৩

বিপন্ন[illegible] ডাকে কি কর কি কর,
নব উষা বলে "ক্রোধ সম্বর সম্বর"
কোকিল ডাকিল মুহু করিয়া মিনতি;
সভয়ে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি।
বৃথা বৃথা—বৈশাখের দু চক্ষু হইতে,
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে, আচম্বিতে।

৪

ভস্ম হ'ল চৈত্র মাস; হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দূর বিন্দু বাসন্তী যামিনী।
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া,
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া।
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে;
ভিজিল শিরিষ-পু[illegible]নের নীরে।

৫

আম্রের [illegible] মুঞ্জরিত দেহ
ঝরি গেল রক্তপীতে, খসি গেল কেহ।
কঠিন উপলে বসি সারস সারসী,
বিহগ ভাষায় ডাকে "কোথায় সরসী!"
গহন অরণ্যে ছায়া পলায় তরাসে,
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সন্তাপে!

৬

লতিকা পড়িল লুটি তরুর চরণে;
বনস্থলী [illegible]হীনা নবীন যৌবনে।
দিন বলে "এবে আমি খেটে হব সারা,"
রাত্রি বলে "হায় আমি এবে আয়ু-হারা"
দম্পতি, যুক্তি করি, "বিরহে" ডাকিল,
"কল্পনা"—কবির বধূ—বিদায় মাগিল!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ফুলের মালা। *

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অস্ত্রোৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা সুলতান সেকন্দরসাহ সেনাপতি আজিমখাঁকে উদ্যাননিভৃতে ডাকিয়া শক্তির সন্ধানে নিযুক্ত করিতেছিলেন। গায়সুদ্দিন পিতার নিকট রাত্রির জন্য বিদায় লইতে এইদিকে আসিয়া তাঁহাদের গুপ্ত কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। অবশেষে কি না পিতা পুত্রে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী! এ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে গেলে ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাজ্য জীবন সকলই পণ করিয়া তবে তাঁহাকে আগুয়ান হইতে হয়। তিনি কি করিবেন? মরিবেন—না ফিরিবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার পরামর্শদায়িনী প্রাণসখী উগ্রবাসনাময়ী প্রবৃত্তি অন্তর হইতে সদর্পে, সতেজে বলিয়া উঠিল—"ছি ছি! ফিরিবে কি? মরিতে হয় মরিও,—কিন্তু ফিরিও না।" গায়সুদ্দিন কখনও তাহার কথা অগ্রাহ্য করেন নাই, আজও পারিলেন না—শুনিয়া, শুনিয়া নিশ্চিৎ বিপদের মুখে অগ্রসর হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

নবাব সাহ গায়সুদ্দিন আজম খাঁ সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা,—সেইখানেই তিনি বাস করেন,—অস্ত্রোৎসব উপলক্ষে রাজধানীতে সম্প্রতি আসিয়াছিলেন মাত্র। সুবর্ণগ্রামে তাঁহার ঐকাধিপত্য,—তাঁহার নামে সেখানে মুদ্রাব পর্য্যন্ত প্রচলন হইয়া থাকে। বাদসাহ ইহাতে কোন আপত্তি করেন না। তিনি মনে করেন, গায়সুদ্দিনই ত ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনে বসিবে,—না হয় পিতাবর্ত্তমানেই পুত্র নিজের এলাকায় রাজপ্রতাপ বিস্তার করিলেন;—তাহাতে আর সুলতানের ক্ষতি কি! ক্ষতি যে কি তাহা এইবার বুঝিতে পারিলেন।

গায়সুদ্দিন পিতার গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পাইয়া আর তখন তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না—চুপে চুপে নিবাসভবনে ফিরিয়া সুবর্ণগ্রামে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কতক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে পরিবারদিগকে সেই রাত্রেই সেখানে রওয়ানা করিলেন,—বাকী সৈন্য নিজের সঙ্গে লইবার জন্য সজ্জিত রাখিয়া কুতবের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুতব তাঁহার আর এক প্রিয় বন্ধু, প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে পরামর্শ দান করে,—কুতব দ্বারা অনুমোদিত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। একজন যেন তাঁহার জীবনের কাঁটা, আর একজন তাহাতে দম দিবার হাত; উভয়ের কাহাকে নহিলেই তাঁহার চলে না। শক্তিকে দেখিবামাত্র প্রবৃত্তি যেমন তাঁহাকে উত্তেজিত করিল,—কুতব অমনি ইঙ্গিতে তাঁহার বাসনা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বালিকার অনুগামী হইল। কুতব যে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিবে সে বিষয়ে নবাবের কোন সন্দেহ নাই—তিনি কেবল কুতবের প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছেন। একবার শক্তিকে

---

* ১২৯৯ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রারম্ভিত।

লইয়া নিজের এলাকায় পৌছিতে পারিলে আত্মরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। দ্বিপ্রহরের কিছু পরে কুতব আসিয়া নবাবসাহকে খবর দিল, "হরিণী জালে পড়িয়াছে—সেজন্য আর ভাবনা নাই, এখন কেবল তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেই হয়।" নবাব সাহ উৎফুল্লহৃদয়ে তখন তাঁহার পালায় ইতিমধ্যে ঘটিত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাহাকে বলিলেন। কুতব তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সময়োপযুক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহার তারিফ করিল; গায়সুদ্দিন নিশ্চিন্ত হইয়া, আর একটি বিপদ কিরূপে ভঞ্জন হইতে পারে, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নবাবের ইচ্ছা, পলায়নের পূর্ব্বেই শক্তিকে বিবাহ করিয়া রাজ-প্রথানুযায়ী সম্মানে তাহাকে সম্মান প্রদান করেন। সেজন্য দাসদাসী অলঙ্কার পরিচ্ছদ সমস্তই ঠিক, কেবল প্রাসাদের মাত্র অভাব,—যেখানে বালিকাকে বেগমবেশে সাজাইয়া সমাদৃত করিতে পারেন। ইহার কি উপায় করা যায়!

নবাবের মস্তকের উপর খরধার উন্মুক্ত খড়্গ, তাহা হইতে দূরে না যাইতে পারিলে, নিশ্চয় মৃত্যু; কিন্তু এই আসন্ন মহাবিপদ উপেক্ষা করিয়াও তিনি তাঁহার খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত! এমনি মোহের খেলা! ভোগসুখের মায়া! ভাবিতে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য সংসারে বড় কম নহে।

কুতব এ কার্য্য কিছুই কঠিন দেখিল না; কুতবের পিতা রাজমন্ত্রীর সুসজ্জিত নির্জ্জন উদ্যানবাটীকা এই কার্য্যের জন্য সে উপযোগী বিবেচনা করিয়া উদ্যানরক্ষককে এক পত্র লিখিয়া দিল, সেই পত্র লইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ হোসেন খাঁ সসৈন্যশিবিকা তৎপশ্চাদভিমুখে যাত্রা করিল; আর নবাবসাহ একখানি শিবিকা এবং দুই চারিজন বাছা সৈন্য মাত্র লইয়া কুতবের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। কালীমন্দিরের কাছে পৌছিয়া কুতবের আদেশে সৈন্যগণ শিবিকা লইয়া বনমধ্যে লুকাইল—তাঁহারা দুই বন্ধুতে মন্দিরে উপস্থিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কুতব শক্তির অনুসরণ করিয়া মন্দিরের আশপাশ মন্দিরের অভ্যন্তর সব দেখিয়া গিয়াছিল। সে মন্দিরে ঢুকিয়া প্রথমেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল; মাথার উষ্ণীষ পরিচ্ছদরূপে ধারণ করিয়া কালীকণ্ঠের জবা হার লইয়া মাথায় জড়াইল, বক্ষে ঝুলাইল—দেয়াল হইতে নৃকপালমালিকা লইয়া গলায় পরিল; প্রতিমার সম্মুখস্থিত পাত্র হইতে রক্তচন্দন লইয়া অনাবৃত গাত্রের যেখানে সেখানে দিল। এইরূপে সাজসজ্জা করিয়া নবাবকে বলিল,—"দাঁড়ান্ এইবার দেখা যাক, ইহার পর কি করিতে হইবে?" বলিয়া দেয়ালের ছিদ্র দিয়া সন্ন্যাসিনীর গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল; "নবাবসা, প্রতিমার পশ্চাতে লুকায়িত থাকুন; বালিকা এইখানেই আসিবে।" উত্তরেই প্রতিমার পশ্চাতে লুকায়িত হইলেন। তাহার পর কি হইল, পাঠক তাহা জানেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

্যির আলোকরাজ্যে নীত হইয়া শক্তির চক্ষু সহসা ঝলসিয়া উঠিল, কিন্তু
 মুহূর্ত্তের জন্য; তাহার পর পলকপাতেই যেন সেই আলোকতেজে
ন অভ্যস্ত হইয়া আসিল। মহারাণী হইতেই সে জন্মিয়াছে; মহারাণীই
ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

াভিত গৃহ, চারিদিকে দর্পণের দেয়াল। দর্পণের কাছে কাছে লতাপাতা
সুকোমল শয্যাসন; গৃহের যত্র তত্র ফুলে ফুলে সজ্জিত শ্বেতমর্ম্মরময় উৎস,
 গোলাপ জলের ফোয়ারা ছুটিতেছে, তাহার সুগন্ধ পুষ্পোত্থিত সুবাসে
হ সুগন্ধাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী
বৃতা হইয়া শক্তি যেমন এই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি শতসহস্র
সুসজ্জিতা সুন্দরী শত শত উৎসারিত ফুল্ল কানন পূর্ণ করিয়া তাহা[illegible]
 দাঁড়াইল! শক্তি চমকিয়া উঠিল! তাহার অভ্যর্থনার জন্য [illegible]
 নামিয়া আসিয়াছে না কি?

বিস্ময়ে আবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; সেই ফুল্লকাননে
সজ্জিতা অপ্সরাদিগের মধ্যে এক দীনবেশা রমণী শতমূর্ত্তিতে বিরাজমানা।
াকে চিনিয়া আত্মস্থ হইল; বুঝিল ইহা মায়ার খেলা; দর্পণবিম্বিত
য়ের পরিবর্ত্তে তখন অপূর্ব্ব গর্ব্বময় পরিতৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল;
ীনবেশার মনস্তুষ্টির জন্যই এত অসামান্য আয়োজন! লক্ষ লক্ষ নর নারীর
ত্রী! তাহার ইঙ্গিতে তাহার আদেশে তাহারা জীবনপাত করিতেও
া! সে এখন সামান্য দরিদ্রনারী মাত্র নহে!

খান হইতে স্নানাগারে নীত হইল; চারিজন দাসী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের
-খচিত চারিটি পেশোয়াজ তাহার সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেগম
 কোনটি স্নানান্তে পরিবেন?" শক্তি একে একে সেগুলি একবার
য়া বলিল; "এ কি বিশ্রী, অন্য কাপড় নাই?" দাসীরা অবাক হইয়া
 বলিল "বিশ্রী! এই কাপড়ের জন্য তিন বেগমের মুখ দেখাদেখি নাই!"
বলিল "ইহা নবাবসাহের মাতা সুলতানা সাহেবের পরিচ্ছদ; তাঁহার
 বেগমেই ইহা দখল করিতে চাহেন; নবাবসা তাই কাহাকেও না দিয়া
ছিলেন; আজ আপনার অঙ্গশোভার জন্য ইহা প্রেরিত হইয়াছে।"

টু হাসিয়া বলিল; "ইহাতে আমার আবশ্যক নাই; নূতন বেগমের
তিনজনকে ইহার তিনটি পাঠাইয়া দাও।"

ট!"

"আর একটি ? নবাবসার এতদিন প্রিয় বেগম কে ছিল ?

"মতিয়াজান !"

"তাহাকেই পাঠাইয়া দাও।"

দাসী বলিল, "যো হুকুম ! কিন্তু আপনি কি পরিবেন !"

"সাড়ি নাই ? আমার একখানি সাড়ি ও ওড়না হইলেই হইবে !"

দাসী পরিচ্ছদপেটিকা খুলিয়া, তাহা হইতে নানা বর্ণের, নানা কাজের, নানা রকমের সাড়ি ওড়না বাহির করিতে লাগিল, শক্তি তাহার মধ্য হইতে হীরকপাড়-সংযুক্ত একখানি শুভ্র বস্ত্র ও স্বর্ণখচিত একখানি ওড়না বাছিয়া লইল।

স্নানান্তে সেই বস্ত্র পরিয়া শক্তি কোমল শয্যায় ক্লান্তিজনক-আয়েশে ঠেসান দিয়া আছে, সখীগণ কেহ তাহার চুল শুকাইতেছে ; কেহ ব্যজন করিতেছে ; কেহ চরণতল মেদিরঞ্জিত করিতেছে, কেহ আতর গোলাপ মাখাইতেছে ; আর দুইজন অলঙ্কার-রাশি হইতে গহনা তুলিয়া তুলিয়া তাহাকে দেখাইতেছিল। কত রকমের কত অজস্র অলঙ্কার ! তাহার কি চমৎকার কারুকার্য্য ; কি শোভা ! স্বর্ণ, চুণি, পান্না, ফিরোজ, মতি, হীরক প্রভৃতি মণিরত্নের একত্রীভূত জৌলস নয়ন যেন সহ্য করিতে পারে না ! বিশেষতঃ হীরকালঙ্কারের কি মনোহর দীপ্তি ! দাসী যখন শতনল হীরকহার ও ছায়া-পথের ন্যায় ঘন সংযুক্ত তারকাপ্রভ হীরক মুকুট তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, শত শত সূর্য্যরশ্মি যেন তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাতে খেলিয়া উঠিল, শক্তির নয়ন সে জ্যোতিতে ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

শক্তি দিনাজপুরের রাজবাটীতে রত্নালঙ্কার দেখিয়াছে বটে কিন্তু এরূপ মণিরত্নের অনুপমকান্তি কখনও দেখে নাই। বালিকা সেই অলঙ্কাররাশির মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হীরকালঙ্কার কয়েকটি বাছিয়া লইলেন। সাজ সজ্জা শেষ হইলে আবার সেই মুকুরগৃহে শক্তি আগমন করিলেন। নবাবসাহ তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; এইখানে আসিয়া তাহাকে সংবাদ পাঠাইলেই তিনি আসিবেন। মুকুরে শক্তির সুসজ্জিত সালঙ্কৃত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল, শক্তি নিজেকে দেখিয়া নিজে বিস্মিত হইয়া গেল ; আপনাকে আপনি যেন চিনিতে পারিল না ; এ কি ভুবন-মোহিনী রূপ ! কিন্তু এ রূপ দেখিবে কে ? কাহার জন্য এ সাজসজ্জা ! ধীরে ধীরে শক্তির নয়নে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া আসিল !

"হায় ! সুখ কোথায় ! গণেশদেব যখন তাহার হইলেন না তখন ধনে ঐশ্বর্য্যে ক্ষমতায় কোথায় সুখ ! কিসে সুখ ! সে কেবল ঐশ্বর্য্যের লোভে সুখের লোভে আত্ম বিক্রয় করিয়া দেহ বিক্রয় করিয়া আত্ম-সম্মান পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। এই কি তাহার প্রতিশোধ ! এ কাহার প্রতি প্রতিশোধ ? অন্যকে হত্যা করিতে গিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে ! সে এখন পিশাচী, প্রেত, তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখন লোপ হইয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঐশ্বর্য্যের আলোকরাজ্যে নীত হইয়া শক্তির চক্ষু সহসা ঝলসিয়া উঠিল, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য; তাহার পর পলকপাতেই যেন সেই আলোকতেজে তাহার নয়ন অভ্যস্ত হইয়া আসিল। মহারাণী হইতেই সে জন্মিয়াছে; মহারাণীই সে হইল; ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

মুকুরশোভিত গৃহ, চারিদিকে দর্পণের দেয়াল। দর্পণের কাছে কাছে লতাপাতা ফুল বেষ্টিত সুকোমল শয্যাসন; গৃহের যত্র তত্র ফুলে ফুলে সজ্জিত শ্বেতমর্ম্মরময় উৎস, উৎস হইতে গোলাপ জলের ফোয়ারা ছুটিতেছে, তাহার সুগন্ধ পুষ্পোত্থিত সুবাসে মিলিয়া গৃহ সুগন্ধাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী সখীগণ পরিবৃতা হইয়া শক্তি যেমন এই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি শতসহস্র লক্ষকোটি সুসজ্জিতা সুন্দরী শত শত উৎসারিত ফুল্ল কানন পূর্ণ করিয়া তাহাকে যেন ঘেরিয়া দাঁড়াইল! শক্তি চমকিয়া উঠিল! তাহার অভ্যর্থনার জন্য নন্দন কানন মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে না কি?

শক্তি সবিস্ময়ে আবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; সেই ফুল্লকাননে সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা অপ্সরাদিগের মধ্যে এক দীনবেশা রমণী শতমূর্ত্তিতে বিরাজমানা। শক্তি আপনাকে চিনিয়া আশ্বস্থ হইল; বুঝিল ইহা মায়ার খেলা; দর্পণবিম্বিত দৃশ্য! বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তখন অপূর্ব্ব গর্ব্বময় পরিতৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল; এই সামান্য দীনবেশার মনস্তুষ্টির জন্যই এত অসামান্য আয়োজন! লক্ষ লক্ষ নর নারীর এখন সে কর্ত্রী! তাহার ইঙ্গিতে তাহার আদেশে তাহারা জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না! সে এখন সামান্য দরিদ্রনারী মাত্র নহে!

শক্তি সেখান হইতে স্নানাগারে নীত হইল; চারিজন দাসী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মণিমুক্তা হীরক-খচিত চারিটি পেশোয়াজ তাহার সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেগম সাহেব, ইহার কোনটি স্নানান্তে পরিবেন?" শক্তি একে একে সেগুলি একবার নাড়াচাড়া করিয়া বলিল; "এ কি বিশ্রী, অন্য কাপড় নাই?" দাসীরা অবাক হইয়া গেল। একজন বলিল "বিশ্রী! এই কাপড়ের জন্য তিন বেগমের মুখ দেখাদেখি নাই!" আর একজন বলিল "ইহা নবাবসাহের মাতা সুলতানা সাহেবের পরিচ্ছদ; তাঁহার মৃত্যুর পর তিন বেগমেই ইহা দখল করিতে চাহেন; নবাবসা তাই কাহাকেও না দিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন; আজ আপনার অঙ্গশোভার জন্য ইহা প্রেরিত হইয়াছে।"

শক্তি একটু হাসিয়া বলিল; "ইহাতে আমার আবশ্যক নাই; নূতন বেগমের উপহার বলিয়া তিনজনকে ইহার তিনটি পাঠাইয়া দাও।"

"আর একটি!"

"আর একটি? নবাবসার এতদিন প্রিয় বেগম কে ছিল?

"মতিয়াজান!"

"তাহাকেই পাঠাইয়া দাও।"

দাসী বলিল, "যো হুকুম! কিন্তু আপনি কি পরিবেন!"

"সাড়ি নাই? আমার একখানি সাড়ি ও ওড়না হইলেই হইবে!"

দাসী পরিচ্ছদপেটিকা খুলিয়া, তাহা হইতে নানা বর্ণের, নানা কাজের, নানা রকমের সাড়ি ওড়না বাহির করিতে লাগিল, শক্তি তাহার মধ্য হইতে হীরকপাড়-সংযুক্ত একখানি শুভ্র বস্ত্র ও স্বর্ণখচিত একখানি ওড়না বাছিয়া লইল।

স্নানান্তে সেই বস্ত্র পরিয়া শক্তি কোমল শয্যায় ক্লান্তিজনক-আয়েশে ঠেসান দিয়া আছে, সখীগণ কেহ তাহার চুল শুকাইতেছে; কেহ ব্যজন করিতেছে; কেহ চরণতল মেদিরঞ্জিত করিতেছে, কেহ আতর গোলাপ মাখাইতেছে; আর দুইজন অলঙ্কার-রাশি হইতে গহনা তুলিয়া তুলিয়া তাহাকে দেখাইতেছিল। কত রকমের কত অজস্র অলঙ্কার! তাহার কি চমৎকার কারুকার্য্য; কি শোভা! স্বর্ণ, চুণি, পান্না, ফিরোজ, মতি, হীরক প্রভৃতি মণিরত্নের একত্রীভূত জৌলস নয়ন যেন সহ্য করিতে পারে না! বিশেষতঃ হীরকালঙ্কারের কি মনোহর দীপ্তি! দাসী যখন শতনল হীরকহার ও ছায়া-পথের ন্যায় ঘন সংযুক্ত তারকাপ্রভ হীরক মুকুট তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, শত শত সূর্য্যরশ্মি যেন তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাতে খেলিয়া উঠিল, শক্তির নয়ন সে জ্যোতিতে ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

শক্তি দিনাজপুরের রাজবাটীতে রত্নালঙ্কার দেখিয়াছে বটে কিন্তু এরূপ মণিরত্নের অনুপমকান্তি কখনও দেখে নাই। বালিকা সেই অলঙ্কাররাশির মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হীরকালঙ্কার কয়েকটি বাছিয়া লইলেন। সাজ সজ্জা শেষ হইলে আবার সেই মুকুরগৃহে শক্তি আগমন করিলেন। নবাবসাহ তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; এইখানে আসিয়া তাহাকে সংবাদ পাঠাইলেই তিনি আসিবেন। মুকুরে শক্তির সুসজ্জিত সালঙ্কৃত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল, শক্তি নিজেকে দেখিয়া নিজে বিস্মিত হইয়া গেল; আপনাকে আপনি যেন চিনিতে পারিল না; এ কি ভুবন-মোহিনী রূপ! কিন্তু এ রূপ দেখিবে কে? কাহার জন্য এ সাজসজ্জা! ধীরে ধীরে শক্তির নয়নে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া আসিল!

"হায়! সুখ কোথায়! গণেশদেব যখন তাহার হইলেন না তখন ধনে ঐশ্বর্য্যে ক্ষমতায় কোথায় সুখ! কিসে সুখ! সে কেবল ঐশ্বর্য্যের লোভে সুখের লোভে আত্ম বিক্রয় করিয়া দেহ বিক্রয় করিয়া আত্ম-সম্মান পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। এই কি তাহার প্রতিশোধ! এ কাহার প্রতি প্রতিশোধ? অন্যকে হত্যা করিতে গিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে! সে এখন পিশাচী, প্রেত, তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখন লোপ হইয়াছে।

এই বিরূপ বিকৃত অস্তিত্ব লইয়া তাহার প্রিয়জনের নিকট যাইতেও আর সে
নহে। সে এখন মুসলমানের পত্নী! শক্তির স্মৃতিতে পর্য্যন্ত এখন তাঁহার ঘৃণা
করিবে। ইহার পূর্ব্বে সে তাঁহার ভালবাসার বস্তু না হউক সম্মানের বস্তু
হায় হায় ইহা অপেক্ষা সে সন্ন্যাসিনী রহিল না কেন?"

তাহার উগ্র কঠোর প্রকৃতি কোমল প্রেমোত্থিত অনুতাপে লীন হইয়া
একজন দাসী বলিল "নবাব সাহ আসিতে চাহেন; খবর দিব?" শক্তি
"আসিতে বল, আমি একটু পরে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি।"
শক্তি সেই ঘর হইতে চলিয়া গিয়া অন্য ঘরে আসিয়া একজন দাসীকে বলিল, "
পরিত্যক্ত কাপড় কোথায়? এখানে আন।" বলিতে বলিতে শক্তি নিজের সা
খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। দাসী অবাক হইয়া বলিল, "বেগমসাহেব, নবাব সাহ
কি?" শক্তি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "সে ভাবনা তোমার নাই, তুমি কাপড় আন"।
নীরবে কাপড় আনিয়া দিল শক্তি পূর্ব্ববেশ পরিয়া মুকুরগৃহে আসিয়া দেখিল, গায়
তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শক্তির এই বেশ দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য
বলিলেন—"একি? এখনো সেই বেশ? বঙ্গেশ্বরীর উপযুক্ত বেশ ত ইহা নহে!"

শক্তি বলিল "এখনো বঙ্গেশ্বরী হই নাই। যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয় ত
আমার এইরূপ সাজ থাকিবে।"

গায়সুদ্দিন তাহার দৃঢ়স্বরে অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, তোমা
ধন সম্পদ প্রাণ পণ করিয়াছি, তুমি প্রফুল্ল মুখে আমাকে এই বিপদে বল প্রদান ক
কিন্তু তোমার একি ভাব!" বলিতে বলিতে তাহার নিকট অগ্রসর হইলেন।
একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জাঁহাপনা আমাকে স্পর্শ করিবেন না আমি
করিয়াছি যতদিন না যুদ্ধ শেষ হইবে ততদিন—"

গায়সুদ্দিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার নয়নে ক্রোধাগ্নি জ্বলিল; তাহ
কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার পত্নী, তুমি আমার সম্প
তোমার হুকুমে আমি কাজ করিব—না তুমি আমার আজ্ঞায় চলিবে?" শক্তি
নয়নে ক্রোধাগ্নি নির্গত হইল, বলিল "তবে আমি আপনার পত্নী নহি, আমাকে ছা
দিতে আজ্ঞা হউক, আমি অন্যত্র যাই।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, কুতব সাহেব শীঘ্র বাহিরে যা
বলেন; নহিলে বিপদ সম্ভাবনা।"

দাসী চলিয়া গেল। গায়সুদ্দিন শক্তির অদম্য ইচ্ছায় নত হইয়া কাতর স্বরে বলিলে
"প্রিয়তমে, ক্ষমা কর; আমিই তোমার আজ্ঞাবহ দাস। যুদ্ধে যাইতেছি বাঁচিয়া আ
কি না জানি না, যাহার জন্য মরিতে চলিয়াছি একবার তাহার প্রেমালিঙ্গন পাই
মরিতেও দুঃখ নাই।"

শক্তি বলিল "জাঁহাপনা, আমার কথার অন্যথা নাই। যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন আমরা স্বামী স্ত্রী নহি। যদি আমাদের উভয়ের অমঙ্গল না আনিতে চান ত আমার কথা রক্ষা করিয়া চলুন। নহিলে আপনার শত পাহারাও আমাকে আর আপনার অন্তঃপুরে রাখিতে পারিবে না।" বাহিরে চীৎকার ধ্বনি উঠিল, কুতব দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিল, "আর এখানে নহে; থাকিলেই বন্দী হইতে হইবে। দাসীগণ শিবিকায় উঠিয়াছে বেগম সাহেবকে শিবিকায় উঠাইয়া আমরা বন পথে অগ্রসর হই।"

কোথায় সুখ! কোথায় সম্ভোগ! কোথায় আনন্দ! সর্ব্বস্ব-পণের সাধের বিবাহ দিনে নিরানন্দ কলহ স্মৃতি সঙ্গে লইয়া গায়সুদ্দিন বিমর্ষ বিষণ্ণভাবে বিপদের মধ্যে যাত্রা করিলেন।

মৃণ্ময়ী। *

(সমালোচনা)

(১)

"মৃণ্ময়ী, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষশাস্ত্রান্তর্গত ভূগোলবিদ্যা" (শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত), দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পর বঙ্গদেশীয় সকল খ্যাতনামা সংবাদপত্রিকাতে ইহার প্রভূত সমালোচনা হইয়াছিল, এবং সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসাবাদ প্রচার করিয়া, প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থের আদর বাড়াইয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহার সমালোচনা লইয়া সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত হওয়া, একান্ত ধৃষ্টতা মনে করিয়াও নানাকারণে তাহা হইতে বিরত হইতে পারিলাম না, ভরসা করি, পাঠকবৃন্দ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমার এইরূপ আচরণের একটী প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গীয় সমালোচকমাত্রেই গ্রন্থের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কেবলমাত্র কুৎসা কীর্ত্তন করিলে যেমন নিন্দুক বলা যায়, তেমন কেবল প্রশংসা কীর্ত্তন করিলেও তোষামোদকারী বলা যাইতে পারে; অতএব যখন সমালোচকমাত্রেই নিন্দুক নামে বাচ্য হইতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিরুপায় হইয়া আমাকে সেই নামটী গ্রহণ করিতে হইতেছে। গ্রন্থের গুণ অশেষ, কিন্তু তজ্জন্য তাহা নির্দ্দোষ নহে; গুণাংশের সমালোচনার ত্রুটি হয় নাই বলিয়াই তাহা স্বীকার্য্য মানিয়া লইয়া কেবলমাত্র দোষাংশেরই উল্লেখ করিব। ইহাতে পুনরুক্তি পরিহারহেতু যদি আমাকে নিন্দুকের দলে মিশিতে হয়, তবে তাহা নিয়তির বিধানের একটী প্রক্রিয়ামাত্র মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিব। আত্মপক্ষসমর্থনার্থ এইমাত্র বলিতে পারি যে, কুৎসাকীর্ত্তন আমার উদ্দেশ্য নহে, গ্রন্থে যে

---

* মৃণ্ময়ী—শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

এই বিরূপ বিকৃত অস্তিত্ব লইয়া তাহার প্রিয়জনের নিকট যাইতেও আর সে সাহসী নহে। সে এখন মুসলমানের পত্নী! শক্তির স্মৃতিতে পর্য্যন্ত এখন তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক করিবে। ইহার পূর্ব্বে সে তাঁহার ভালবাসার বস্তু না হউক সম্মানের বস্তু ছিল! হায় হায় ইহা অপেক্ষা সে সন্ন্যাসিনী রহিল না কেন?"

তাহার উগ্র কঠোর প্রকৃতি কোমল প্রেমোত্থিত অনুতাপে লীন হইয়া পড়িল। একজন দাসী বলিল "নবাব সাহ আসিতে চাহেন; খবর দিব?" শক্তি বলিল, "আসিতে বল, আমি একটু পরে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি।" বলিয়া শক্তি সেই ঘর হইতে চলিয়া গিয়া অন্য ঘরে আসিয়া একজন দাসীকে বলিল, "আমার পরিত্যক্ত কাপড় কোথায়? এখানে আন।" বলিতে বলিতে শক্তি নিজের সাজ-সজ্জা খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। দাসী অবাক হইয়া বলিল, "বেগমসাহেব, নবাব সাহ বলিবেন কি?" শক্তি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "সে ভাবনা তোমার নাই, তুমি কাপড় আন"। দাসী নীরবে কাপড় আনিয়া দিল শক্তি পূর্ব্ববেশ পরিয়া মুকুরগৃহে আসিয়া দেখিল, গায়সুদ্দিন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শক্তির এই বেশ দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"একি? এখনো সেই বেশ? বঙ্গেশ্বরীর উপযুক্ত বেশ ত ইহা নহে!"

শক্তি বলিল "এখনো বঙ্গেশ্বরী হই নাই। যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন আমার এইরূপ সাজ থাকিবে।"

গায়সুদ্দিন তাহার দৃঢ়স্বরে অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জন্য ধন সম্পদ প্রাণ পণ করিয়াছি, তুমি প্রফুল্ল মুখে আমাকে এই বিপদে বল প্রদান করিবে; কিন্তু তোমার একি ভাব!" বলিতে বলিতে তাহার নিকট অগ্রসর হইলেন। শক্তি একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জাঁহাপনা আমাকে স্পর্শ করিবেন না আমি শপথ করিয়াছি যতদিন না যুদ্ধ শেষ হইবে ততদিন—"

গায়সুদ্দিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার নয়নে ক্রোধাগ্নি জ্বলিল; তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার পত্নী, তুমি আমার সম্পত্তি, তোমার হুকুমে আমি কাজ করিব—না তুমি আমার আজ্ঞায় চলিবে?" শক্তিরও নয়নে ক্রোধাগ্নি নির্গত হইল, বলিল "তবে আমি আপনার পত্নী নহি, আমাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হউক, আমি অন্যত্র যাই।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, কুতব সাহেব শীঘ্র বাহিরে যাইতে বলেন; নহিলে বিপদ সম্ভাবনা।"

দাসী চলিয়া গেল। গায়সুদ্দিন শক্তির অদম্য ইচ্ছায় নত হইয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে, ক্ষমা কর; আমিই তোমার আজ্ঞাবহ দাস। যুদ্ধে যাইতেছি বাঁচিয়া আসিব কি না জানি না, যাহার জন্য মরিতে চলিয়াছি একবার তাহার প্রেমালিঙ্গন পাইলে মরিতেও দুঃখ নাই।"

শক্তি বলিল "জাঁহাপনা, আমার কথার অন্যথা নাই। যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন আমরা স্বামী স্ত্রী নহি। যদি আমাদের উভয়ের অমঙ্গল না আনিতে চান ত আমার কথা রক্ষা করিয়া চলুন। নহিলে আপনার শত পাহারাও আমাকে আর আপনার অন্তঃপুরে রাখিতে পারিবে না।" বাহিরে চীৎকার ধ্বনি উঠিল, কুতব দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিল, "আর এখানে নহে; থাকিলেই বন্দী হইতে হইবে। দাসীগণ শিবিকায় উঠিয়াছে বেগম সাহেবকে শিবিকায় উঠাইয়া আমরা বন পথে অগ্রসর হই।"

কোথায় সুখ! কোথায় সম্ভোগ! কোথায় আনন্দ! সর্ব্বস্ব-পণের সাধের বিবাহ দিনে নিরানন্দ কলহ স্মৃতি সঙ্গে লইয়া গায়সুদ্দিন বিমর্ষ বিষণ্ণভাবে বিপদের মধ্যে যাত্রা করিলেন।

মৃণ্ময়ী। *

(সমালোচনা)

(১)

"মৃণ্ময়ী, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষশাস্ত্রান্তর্গত ভূগোলবিদ্যা" (শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত), দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পর বঙ্গদেশীয় সকল খ্যাতনামা সংবাদপত্রিকাতে ইহার প্রভূত সমালোচনা হইয়াছিল, এবং সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসাবাদ প্রচার করিয়া, প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থের আদর বাড়াইয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহার সমালোচনা লইয়া সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত হওয়া, একান্ত ধৃষ্টতা মনে করিয়াও নানাকারণে তাহা হইতে বিরত হইতে পারিলাম না, ভরসা করি, পাঠকবৃন্দ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমার এইরূপ আচরণের একটী প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গীয় সমালোচকমাত্রেই গ্রন্থের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কেবলমাত্র কুৎসা কীর্ত্তন করিলে যেমন নিন্দুক বলা যায়, তেমন কেবল প্রশংসা কীর্ত্তন করিলেও তোষামোদকারী বলা যাইতে পারে; অতএব যখন সমালোচকমাত্রেই নিন্দুক নামে বাচ্য হইতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিরুপায় হইয়া আমাকে সেই নামটী গ্রহণ করিতে হইতেছে। গ্রন্থের গুণ অশেষ, কিন্তু তজ্জন্য তাহা নির্দ্দোষ নহে; গুণাংশের সমালোচনার ত্রুটি হয় নাই বলিয়াই তাহা স্বীকার্য্য মানিয়া লইয়া কেবলমাত্র দোষাংশেরই উল্লেখ করিব। ইহাতে পুনরুক্তি পরিহারহেতু যদি আমাকে নিন্দুকের দলে মিশিতে হয়, তবে তাহা নিয়তির বিধানের একটী প্রক্রিয়ামাত্র মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিব। আত্মপক্ষসমর্থনার্থ এইমাত্র বলিতে পারি যে, কুৎসাকীর্ত্তন আমার উদ্দেশ্য নহে, গ্রন্থে যে

---

* মৃণ্ময়ী—শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

সকল ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে, তাহা ক্ষালিত করিয়া গ্রন্থের গৌরব এবং উপকারিতা বর্দ্ধন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুজ্যোতিষ যে অতি প্রাচীনকালের অধীত বিদ্যা এবং প্রাচীন হিন্দুগণ যে জ্ঞানবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ববোধে অজ্ঞ ছিলেন না, ইহা নব্য যুবকদলের প্রাণে গ্রথিত করিয়া দেওয়ার ন্যায় সৎকার্য্য হিন্দুসন্তানের পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাতে উন্নতিশীল সমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তি জাতীয়জীবনের ভিত্তিতে সমাহিত হইবে এবং পূর্ব্বে যে হিন্দুজাতি জগতে প্রতিভাবিস্তার করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইব। "মৃণ্ময়ী" সেই কার্য্যসম্পাদনার্থ কতকগুলি বিষয়ে আমাদের নেত্রোন্মীলন করিতে প্রয়াস পাইয়া একান্তই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাকে কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থশ্রেণীর অন্তর্ভূত করা যায় না; ইহা কেবল বহুসংখ্যক পাঠ্যগ্রন্থের সূচীপত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক ইহাতে কোন বিষয় স্পষ্টতঃ শিক্ষা করা যায় না বটে, কিন্তু গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল কোথায় শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার যথেষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এই হেতু ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক প্রতিপন্ন হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট বহুবিধ সমালোচনাদৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সমালোচকগণ কেহই গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহের ভাবোদ্ধার করিতে প্রয়াস পান নাই। (পারেন নাই বলিলে একান্তই ধৃষ্টতা হয়); কেবল গ্রন্থের উদ্দেশ্য দেখিয়াই অনেকে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যে, ইয়ূরোপ এক্ষণে যাহা শিক্ষা দিতেছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানের সহিত তুলনায় তাহা যে কিছুই নূতন নহে, "মৃণ্ময়ী আমাদিগকে তাহা বলিতে সমর্থ করিতেছে।" ইহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই যে গ্রন্থকার ইয়ূরোপীয় বিজ্ঞানের শিক্ষাতে অসম্পূর্ণতানিবন্ধন তাহার সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত জ্ঞানের তুলনা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমপ্রমাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন উক্ত তুলনা স্থলবিশেষে একান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে; দুইটী জ্ঞানের তুলনা করিতে হইলে, কিম্বা ঐ তুলনা ঠিক হইয়াছে কি না তাহার বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত উভয় জ্ঞানকে কবলিত করা প্রয়োজন, নতুবা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। দেশে একটী প্রবাদ আছে যে যে হেতু গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান মানুষের চিত্ত বিগলিত করিয়া দেয়, অতএব যাত্রা না শুনিলেও কেবল গোবিন্দ অধিকারীর নামেতেই অনেকের নেত্রবারি বিগলিত হইতে থাকে; এস্থলেও দৃষ্ট হইতেছে যে, অনেক সমালোচক কেবলমাত্র "গোবিন্দ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ" এই কথা বলিতে গিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে এক ফল এই হইয়াছে যে, তুলনার অসামঞ্জস্যনিবন্ধন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবকে হাস্যের বাজারে তৌলাইতে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা কেবলমাত্র ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত তাহাদের চক্ষে ঐ সকল ভ্রমপ্রমাদ পতিত হইয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্যসাধনে

অনেক বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। এই বৈসাদৃশ্য বিদূরণপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবের সহিত গ্রন্থেরও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাওয়াই এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

সমালোচনারম্ভের পূর্ব্বে এইটী বলা প্রয়োজন যে, হিন্দুজ্যোতিষ যদিও ভাস্করাচার্য্যের পর প্রায় কিছুমাত্রই উন্নতিলাভ করে নাই, কিন্তু ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্পর্কে তাহা বলিতে গেলে, বাতুলতা প্রকাশ পাইবে ; এখন এমন সপ্তাহ যাইতে দেখা যায় না, যাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক কিছু না কিছু নবাবিষ্কার সাধিত না হইতেছে। অতএব তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে কেবল পুরাতন মতের বশবর্ত্তী হইলে অনেক স্থলে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইবে। বিশেষতঃ সংখ্যাপ্রসঙ্গে কথা বলিতে অতিশয় সাবধান হওয়া আবশ্যক ; কারণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের কোন সংখ্যাবচনই স্থিররূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না, অতএব তাহা পুনঃপুনঃ নির্দ্ধারণ করিয়া ভ্রমবিশোধিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সুদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিয়া প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠানুক্রমে সমালোচনা করাতে অনেক স্থলে প্রবন্ধ অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে। আশা করি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

ভূমিকার ॥/০ পৃষ্ঠাতে ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত বিষয়সমূহের অতিশয় স্থূল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণাবিষ্কার হইতে যে "প্রাকৃতিক জ্যোতিষের" (Physical Astronomy) অভ্যুদয় হইয়াছে, এবং তাহাই প্রধান নবাবিষ্কার বলিয়া যে ইয়ুরোপ গর্ব্বিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার একান্তই উদাসীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। * এই উদাসীনতাহেতু তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, লাভেরিয়েরের "উপদেশবশতঃ বার্লিননগরবাসী ডাক্তার গাল যে গ্রহের আবিষ্কার করেন, তাহার নাম নেপ্‌চুন।" এই উক্তিবিষয়ক প্রকৃত ঘটনাটী একান্ত বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তির অববোধার্থ অতি স্থূল রূপে ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে, "ইন্দ্রগ্রহ" (ইউরেনস্) আবিষ্কৃত হইলে পর, তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কক্ষপ্রমাণ সাধিত হয় এবং তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার অবস্থিতি গণনপূর্ব্বক তাহা তালিকাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ বলে গ্রহ যে পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহা ঐ গ্রহের "মধ্য কক্ষ", (ইহা সর্ব্বদাই বৃত্তাভাসাকার" হইয়া থাকে ; সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহাকে "লম্বিত কক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তথায় এই লম্বনের কারণ মাধ্যাকর্ষণের পরিবর্ত্তে "প্রবহ বায়ু" বলিয়া কথিত হইয়াছে)। এতদ্ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণসূত্রবলে সপ্রমাণিত হয় যে, গ্রহগণ পরস্পরকে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্ধেতু কোন গ্রহের গতি অপর সকল গ্রহের আক-

---

* সমালোচনার দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে যে গ্রন্থকার মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়াকে একান্তই ভুল বুঝিয়াছেন এবং তদ্ধেতু ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের একটী প্রধান অঙ্গ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

সকল ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে, তাহা ক্ষালিত করিয়া গ্রন্থের গৌরব এবং উপকারিতা বর্দ্ধন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুজ্যোতিষ যে অতি প্রাচীনকালের অধীত বিদ্যা এবং প্রাচীন হিন্দুগণ যে জ্ঞানবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ববোধে অজ্ঞ ছিলেন না, ইহা নব্য যুবকদলের প্রাণে গ্রথিত করিয়া দেওয়ার ন্যায় সৎকার্য্য হিন্দুসন্তানের পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাতে উন্নতিশীল সমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তি জাতীয়জীবনের ভিত্তিতে সমাহিত হইবে এবং পূর্ব্বে যে হিন্দুজাতি জগতে প্রতিভাবিস্তার করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইব। "মৃণ্ময়ী" সেই কার্য্যসম্পাদনার্থ কতকগুলি বিষয়ে আমাদের নেত্রোন্মীলন করিতে প্রয়াস পাইয়া একান্তই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাকে কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থশ্রেণীর অন্তর্ভূত করা যায় না; ইহা কেবল বহুসংখ্যক পাঠ্যগ্রন্থের সূচীপত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক ইহাতে কোন বিষয় স্পষ্টতঃ শিক্ষা করা যায় না বটে কিন্তু গ্রন্থোক্ত বিষয় সকল কোথায় শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার যথেষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এই হেতু ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক প্রতিপন্ন হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট বহুবিধ সমালোচনাদৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সমালোচকগণ কেহই গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহের ভাবোদ্ধার করিতে প্রয়াস পান নাই। (পারেন নাই বলিলে একান্তই ধৃষ্টতা হয়); কেবল গ্রন্থের উদ্দেশ্য দেখিয়াই অনেকে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যে, ইয়ূরোপ এক্ষণে যাহা শিক্ষা দিতেছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানের সহিত তুলনায় তাহা যে কিছুই নূতন নহে, "মৃণ্ময়ী আমাদিগকে তাহা বলিতে সমর্থ করিতেছে।" ইহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করেন নাই যে গ্রন্থকার ইয়ূরোপীয় বিজ্ঞানের শিক্ষাতে অসম্পূর্ণতানিবন্ধন তাহার সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত জ্ঞানের তুলনা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমপ্রমাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন উক্ত তুলনা স্থলবিশেষে একান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে; দুইটী জ্ঞানের তুলনা করিতে হইলে, কিম্বা ঐ তুলনা ঠিক হইয়াছে কি না তাহার বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত উভয় জ্ঞানকে কবলিত করা প্রয়োজন, নতুবা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। দেশে একটী প্রবাদ আছে যে যে হেতু গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান মানুষের চিত্ত বিগলিত করিয়া দেয়, অতএব যাত্রা না শুনিলেও কেবল গোবিন্দ অধিকারীর নামেতেই অনেকের নেত্রবারি বিগলিত হইতে থাকে; এস্থলেও দৃষ্ট হইতেছে যে, অনেক সমালোচক কেবলমাত্র "গোবিন্দ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ" এই কথা বলিতে গিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে এক ফল এই হইয়াছে যে, তুলনার অসামঞ্জস্যনিবন্ধন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবকে হাস্যের বাজারে তৌলাইতে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা কেবলমাত্র ইয়ূরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত তাহাদের চক্ষে ঐ সকল ভ্রমপ্রমাদ পতিত হইয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্যসাধনে

অনেক বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। এই বৈসাদৃশ্য বিদূরণপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবের সহিত গ্রন্থেরও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাওয়াই এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

সমালোচনারম্ভের পূর্ব্বে এইটী বলা প্রয়োজন যে, হিন্দুজ্যোতিষ যদিও ভাস্করাচার্য্যের পর প্রায় কিছুমাত্রই উন্নতিলাভ করে নাই, কিন্তু ইয়ূরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্পর্কে তাহা বলিতে গেলে, বাতুলতা প্রকাশ পাইবে ; এখন এমন সপ্তাহ যাইতে দেখা যায় না, যাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক কিছু না কিছু নবাবিষ্কার সাধিত না হইতেছে। অতএব তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে কেবল পুরাতন মতের বশবর্ত্তী হইলে অনেক স্থলে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইবে। বিশেষতঃ সংখ্যাপ্রসঙ্গে কথা বলিতে অতিশয় সাবধান হওয়া আবশ্যক ; কারণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের কোন সংখ্যাবচনই স্থিররূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না, অতএব তাহা পুনঃপুনঃ নির্দ্ধারণ করিয়া ভ্রমবিশোধিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সুদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিয়া প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠানুক্রমে সমালোচনা করাতে অনেক স্থলে প্রবন্ধ অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে। আশা করি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

ভূমিকার ॥/• পৃষ্ঠাতে ইয়ূরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত বিষয়সমূহের অতিশয় স্থূল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণাবিষ্কার হইতে যে "প্রাকৃতিক জ্যোতিষের" (Physical Astronomy) অভ্যুদয় হইয়াছে, এবং তাহাই প্রধান নবাবিষ্কার বলিয়া যে ইয়ূরোপ গর্ব্বিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার একান্তই উদাসীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। * এই উদাসীনতাহেতু তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, লাভেরিয়ের "উপদেশবশতঃ বার্লিননগরবাসী ডাক্তার গাল যে গ্রহের আবিষ্কার করেন, তাহার নাম নেপ্‌চুন।" এই উক্তিবিষয়ক প্রকৃত ঘটনাটী একান্ত বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তির অববোধার্থ অতি স্থূল রূপে ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে, "ইন্দ্রগ্রহ" (ইউরেনস্) আবিষ্কৃত হইলে পর, তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কক্ষপ্রমাণ সাধিত হয় এবং তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার অবস্থিতি গণনপূর্ব্বক তাহা তালিকাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ বলে গ্রহ যে পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহা ঐ গ্রহের "মধ্য কক্ষ", (ইহা সর্ব্বদাই "বৃত্তাভাসাকার" হইয়া থাকে ; সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহাকে "লম্বিত কক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তথায় এই লম্বনের কারণ মাধ্যাকর্ষণের পরিবর্ত্তে "প্রবহ বায়ু" বলিয়া কথিত হইয়াছে)। এতদ্ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণসূত্রবলে সপ্রমাণিত হয় যে, গ্রহগণ পরস্পর একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্ধেতু কোন গ্রহের গতি অপর সকল গ্রহের আক-

---

* সমালোচনার দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে যে গ্রন্থকার মাধ্যাকর্ষণ প্রক্রিয়াকে একান্তই ভুল বুঝিয়াছেন এবং তদ্ধেতু ইয়ূরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের একটী প্রধান অঙ্গ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

র্ষণবশে বিচলিত হওয়াতে তাহার প্রত্যক্ষস্থিতি "মধ্য কক্ষ" হইতে "ভ্রষ্ট" হইয়া যায়; অতএব ঐরূপ বিচলিতগতিবশে গ্রহ যে পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাকে "ভ্রষ্ট কক্ষ" বলা যায়। এক্ষণে দৃষ্ট হয় যে মাধ্যাকর্ষণসূত্রমতে গণিতবলে গ্রহের মধ্যকক্ষ আবিষ্কৃত হইতে পারে; তদনন্তর অপরাপর গ্রহদিগের আকার প্রকার জ্ঞাত থাকিলে, তাহা হইতে তাহাদিগের আকর্ষণহেতু উক্ত গ্রহের "কক্ষভ্রষ্টতা" সাধিত হয়। ইন্দ্রাবিষ্কারের পর উপরোক্ত প্রণালীমতে তাহার "মধ্য কক্ষ", এবং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের আকর্ষণানুযায়ী "ভ্রষ্টতা" প্রয়োগপূর্ব্বক "ভ্রষ্ট কক্ষ" সাধন করা হইয়াছিল; কিন্তু কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণের পর দৃষ্ট হইল যে, "প্রকৃত গ্রহ" উক্ত "ভ্রষ্ট কক্ষে" পরিভ্রমণ করিতেছে না; তাহার প্রকৃত কক্ষ উক্ত গণিত ভ্রষ্টকক্ষ হইতেও অধিকতর "ভ্রষ্ট" হইয়া যাইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌মণ্ডলী এই "ভ্রষ্টতার" পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলে পর ইংলণ্ডে এডাম্‌স্ ও ফ্রান্সে লাভেরিয়ে নামক জ্যোতিষীদ্বয় ইহার কারণানুসন্ধানে যত্নশীল হইয়া উভয়ে প্রায় এক সমকালেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ইন্দ্র-কক্ষের বহির্ভাগে অপর একটী গ্রহ বিচরণ করিতেছে, যাহার আকর্ষণে ইন্দ্রগ্রহ উক্তরূপে কক্ষভ্রষ্ট হইতেছে। ইহারা উভয়ে পরস্পরের গণনার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন এবং ফল প্রচারের পূর্ব্বে কেহই জ্ঞাত ছিলেন না যে দুই ব্যক্তি এইরূপে এক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যাহা হউক উপরোক্ত ভ্রষ্টতার পরিমাণ হইতে তজ্জননকারী গ্রহের আকার প্রকার ও স্থিতি গণিত হইলে পর লাভেরিয়ের নির্দ্দেশিত স্থানে ডাক্তার গাল কর্তৃক তাহা প্রথম পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল; এডাম্‌সের গণিত স্থান হইতে ইহা প্রায় এক অংশ পরিমিত স্থান অন্তরে ছিল। লাভেরিয়ে ডাক্তার গালকে এইরূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবম্বিধ আকারের একটী জ্যোতিষ্ক দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্ট হইবে; গাল তদনুসারে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক তদ্বিধ জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে গালকে যদি ঐ গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা বলিতে হয়, তবে যে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই দূরবীক্ষণই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কর্ত্তা নামে বাচ্য হইতে পারে।

ইন্দ্র (ইউরেনস্) ও বরুণ (নেপ্‌চ্যুন্) গ্রহদ্বয়ের দূরতা, ব্যাসপরিমাণ এবং আবর্ত্তনকাল সংশোধিত ও পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে; অতএব গ্রন্থের নূতন সংস্করণে সে সকল সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ঐ সকল ফল, যথা ;—

	দূরতা (ক্রোশ)।	ব্যাস (ক্রোশ)।	আবর্ত্তন কাল বৎসর	আবর্ত্তন কাল দিন	কাহার মতে
ইন্দ্র	৮৯০০০০০০০	১৫৫০০	৮৪	৮	(ইয়ুরোপীয়)
				৬	(আমেরিকান)
বরুণ	১৪০০০০০০০০	১৮৬০০	১৬৪	২২৫	(ইয়ুরোপীয়)
				২২৬	(আমেরিকান)

ইয়ুরোপের নবাবিষ্কারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করা

হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ জানুয়ারিতে ২৮১ এবং ১৮৯২ খ্রীঃ অঃ জানুয়ারিতে ৩২০ হইয়াছিল। ১৮৫৪ সলেন ৬টী ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল "ইউক্রোসাইন" নামক গ্রহ আমেরিকান জ্যোতিষী ফর্গুসন্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত; অপর যে দুইটি গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকে ভূমিকার ॥৶০ পৃষ্ঠায় আখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'পমোনা' জর্ম্মেণ জ্যোতিষী "গোল্ডশ্মীড্" কর্ত্তৃক, এবং 'পলিহিম্নিয়া' ফরাসী জ্যোতিষী "শাকোর্ণা" কর্ত্তৃক 'পারি' নগরে আবিষ্কৃত হইযাছিল।

গ্রন্থের ৩—৪ পৃষ্ঠার টীকাতে উক্ত হইয়াছে যে, "প্লেকেয়ার ও কেসেনি (কেশীনি!) প্রভৃতি ইউরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতগণও এই মতের (হিন্দুজ্যোতিষ যে পাঁচ সহস্র বৎসরাধিক পূর্ব্বে অধীত হইয়াছিল, বেইলীকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত এই মতের) পোষকতা করিয়াছেন। দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অনভিজ্ঞ বেণ্টলি সাহেব অকারণে অসূয়াপরবশ হইয়া আমাদিগের অতি প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বিজ্ঞসমাজে উপহাসাস্পদ হইয়াছেন।" বেণ্টলি যদি প্রকৃত পক্ষেই উপহাসাস্পদ হইতেন, তবে আর দুঃখের বিষয় কিছুই ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞানসমিতি The Royal Society of Great Britain হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে বেণ্টলির মতকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। বেইলী প্লেকেয়ার প্রভৃতি সকলেই বেণ্টলির অগ্রবর্ত্তী; এবং বেণ্টলি সমগ্র হিন্দুজ্যোতিষের আধুনিকত্ববিষয়ে কথা না বলিয়া কেবলমাত্র সূর্য্যসিদ্ধান্তেরই কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বেইলীর "Traitè de l' Astronomie Indienne et Orientale" নামক গ্রন্থ মান্দ্রাজের অন্তর্গত 'তির্ব্বালোর' হইতে সংগৃহীত কতকগুলি গ্রহতালিকা ও তাহাদের গণন প্রণালীকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু বেণ্টলি কেবলমাত্র সূর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব বেলীর মত গ্রাহ্য করিতে হইলেই যে বেণ্টলির মত অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। বেণ্টলি যে সকল যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, (বেণ্টলি যে যুক্তিশূন্য নহে, তাহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে।) সেই সকল যুক্তি খণ্ডন না করিলে কেবল গালি দ্বারা তাঁহাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। বেণ্টলির পরে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হিন্দুজ্যোতিষের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণার্থ তাঁহার মত খণ্ডন কিম্বা অপর কোন স্বসাধিত মত প্রতিপাদন করেন নাই বলিয়াই বেণ্টলির মত প্রচলিত রহিয়াছে। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক Brennand সাহেব সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রাচীনত্ব দর্শাইয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং ১৮৯২ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশার্থ Royal Societyতে প্রেরণ করিয়াছিলেন; (ঐ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার জনৈক সভ্যের অনুগ্রহে আমি তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।) তাহাতে তিনি কেবল প্লেকেয়ারের মতানুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু বেণ্টলির নামোল্লেখমাত্র

র্ষণবশে বিচলিত হওয়াতে তাহার প্রত্যক্ষস্থিতি "মধ্য কক্ষ" হইতে "ভ্রষ্ট" হইয়া যায়; অতএব ঐরূপ বিচলিতগতিবশে গ্রহ যে পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাকে "ভ্রষ্ট কক্ষ" বলা যায়। এক্ষণে দৃষ্ট হয় যে মাধ্যাকর্ষণসূত্রমতে গণিতবলে গ্রহের মধ্যকক্ষ আবিষ্কৃত হইতে পারে; তদনন্তর অপরাপর গ্রহদিগের আকার প্রকার জ্ঞাত থাকিলে, তাহা হইতে তাহাদিগের আকর্ষণহেতু উক্ত গ্রহের "কক্ষভ্রষ্টতা" সাধিত হয়। ইন্দ্রাবিষ্কারের পর উপরোক্ত প্রণালীমতে তাহার "মধ্য কক্ষ", এবং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের আকর্ষণানুযায়ী "ভ্রষ্টতা" প্রয়োগপূর্ব্বক "ভ্রষ্ট কক্ষ" সাধন করা হইয়াছিল; কিন্তু কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণের পর দৃষ্ট হইল যে, "প্রকৃত গ্রহ" উক্ত "ভ্রষ্ট কক্ষে" পরিভ্রমণ করিতেছে না; তাহার প্রকৃত কক্ষ উক্ত গণিত ভ্রষ্টকক্ষ হইতেও অধিকতর "ভ্রষ্ট" হইয়া যাইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌মণ্ডলী এই "ভ্রষ্টতার" পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলে পর ইংলণ্ডে এডাম্‌স্ ও ফ্রান্সে লাভেরিয়ে নামক জ্যোতিষীদ্বয় ইহার কারণানুসন্ধানে যত্নশীল হইয়া উভয়ে প্রায় এক সমকালেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ইন্দ্র-কক্ষের বহির্ভাগে অপর একটী গ্রহ বিচরণ করিতেছে, যাহার আকর্ষণে ইন্দ্রগ্রহ উক্তরূপে কক্ষভ্রষ্ট হইতেছে। ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের গণনার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলেন এবং ফল প্রচারের পূর্ব্বে কেহই জ্ঞাত ছিলেন না যে দুই ব্যক্তি এইরূপে এক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যাহা হউক উপরোক্ত ভ্রষ্টতার পরিমাণ হইতে তজ্জননকারী গ্রহের আকার প্রকার ও স্থিতি গণিত হইলে পর লাভেরিয়ের নির্দ্দেশিত স্থানে ডাক্তার গাল কর্ত্তৃক তাহা প্রথম পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল; এডাম্‌সের গণিত স্থান হইতে ইহা প্রায় এক অংশ পরিমিত স্থান অন্তরে ছিল। লাভেরিয়ে ডাক্তার গালকে এইরূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবম্বিধ আকারের একটী জ্যোতিষ্ক দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্ট হইবে; গাল তদনুসারে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক তদ্বিধ জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে গালকে যদি ঐ গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা বলিতে হয়, তবে যে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই দূরবীক্ষণই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কর্ত্তা নামে বাচ্য হইতে পারে।

ইন্দ্র (ইউরেনস্) ও বরুণ (নেপ্‌চ্যুন্) গ্রহদ্বয়ের দূরতা, ব্যাসপরিমাণ এবং আবর্ত্তনকাল সংশোধিত ও পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে; অতএব গ্রন্থের নূতন সংস্করণে সে সকল সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ঐ সকল ফল, যথা;—

	দূরতা (ক্রোশ)।	ব্যাস (ক্রোশ)।	আবর্ত্তন কাল বৎসর	আবর্ত্তন কাল দিন	কাহার মতে
ইন্দ্র	৮৯০০০০০০০	১৫৫০০	৮৪	৮	(ইয়ুরোপীয়)
				৬	(আমেরিকান)
বরুণ	১৪০০০০০০০০	১৮৬০০	১৬৪	২২৫	(ইয়ুরোপীয়)
				২২৬	(আমেরিকান)

ইয়ুরোপের নবাবিষ্কারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করা

হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ জানুয়ারিতে ২৮১ এবং ১৮৯২ খ্রীঃ অঃ জানুয়ারিতে ৩২০ হইয়াছিল। ১৮৫৪ সলেন ৬টী ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল "ইউক্রোসাইন" নামক গ্রহ আমেরিকান জ্যোতিষী ফর্গুসন্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত; অপর যে দুইটি গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকে ভূমিকার ॥৶০ পৃষ্ঠায় আখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'পমোনা' জর্ম্মেণ জ্যোতিষী "গোল্ডশ্মীড্" কর্ত্তৃক, এবং 'পলিহিম্নিয়া' ফরাসী জ্যোতিষী "শাকোর্ণা" কর্ত্তৃক 'পারি' নগরে আবিষ্কৃত হইযাছিল।

গ্রন্থের ৩—৪ পৃষ্ঠার টীকাতে উক্ত হইয়াছে যে, "প্লেকেয়ার ও কেসেনি (কেশীনি!) প্রভৃতি ইউরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতগণও এই মতের (হিন্দুজ্যোতিষ যে পাঁচ সহস্র বৎসরাধিক পূর্ব্বে অধীত হইয়াছিল, বেইলীকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত এই মতের) পোষকতা করিয়াছেন। দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অনভিজ্ঞ বেণ্টলি সাহেব অকারণে অসূয়াপরবশ হইয়া আমাদিগের অতি প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বিজ্ঞসমাজে উপহাসাস্পদ হইয়াছেন।" বেণ্টলি যদি প্রকৃত পক্ষেই উপহাসাস্পদ হইতেন, তবে আর দুঃখের বিষয় কিছুই ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞানসমিতি The Royal Society of Great Britain হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে বেণ্টলির মতকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। বেইলী প্লেকেয়ার প্রভৃতি সকলেই বেণ্টলির অগ্রবর্ত্তী; এবং বেণ্টলি সমগ্র হিন্দুজ্যোতিষের আধুনিকত্ববিষয়ে কথা না বলিয়া কেবলমাত্র সূর্য্যসিদ্ধান্তেরই কাল নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বেইলীর "Traitè de l' Astronomie Indienne et Orientale" নামক গ্রন্থ মান্দ্রাজের অন্তর্গত 'তির্ব্বালোর' হইতে সংগৃহীত কতকগুলি গ্রহতালিকা ও তাহাদের গণন প্রণালীকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু বেণ্টলি কেবলমাত্র সূর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব বেলীর মত গ্রাহ্য করিতে হইলেই যে বেণ্টলির মত অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। বেণ্টলি যে সকল যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, (বেণ্টলি যে যুক্তিভ্রান্ত নহে, তাহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে।) সেই সকল যুক্তি খণ্ডন না করিলে কেবল গালি দ্বারা তাঁহাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। বেণ্টলির পরে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হিন্দুজ্যোতিষের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণার্থ তাঁহার মত খণ্ডন কিম্বা অপর কোন স্বসাধিত মত প্রতিপাদন করেন নাই বলিয়াই বেণ্টলির মত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক Brennand সাহেব সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রাচীনত্ব দর্শাইয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং ১৮৯২ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারি মাসে তাহা প্রকাশার্থ Royal Societyতে প্রেরণ করিয়াছিলেন; (ঐ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার জনৈক সভ্যের অনুগ্রহে আমি তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।) তাহাতে তিনি কেবল প্লেকেয়ারের মতানুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু বেণ্টলির নামোল্লেখমাত্র

করেন নাই। বেণ্টলি প্লেকেয়ারের যে সকল মতে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত খণ্ডন না হওয়াতে উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। বেণ্টলি গণনাদ্বারা হিন্দুজ্যোতিষের আধুনিকত্ব (অর্থাৎ হিন্দুজ্যোতিষ যে খ্রীষ্টের চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দীর অধিক পুরাতন নহে) সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব তাঁহার মত খণ্ডন করিতে হইলে ঐ গণনাতে ভুল দর্শাইয়া তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতে হইবে ; নতুবা কেবল গালি দিলেই বেণ্টলি পরাজিত হইবে না।

৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' গ্রন্থ ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অপর নাম 'পৈতামহসিদ্ধান্ত' ; ইহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উপদেশিত বলিয়া কথিত আছে। ব্রহ্মগুপ্তপ্রণীত গ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' ; ইহাকে ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অন্যতম সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

৫ পৃষ্ঠায় আর্য্যভট্টের আবির্ভাবকালবিষয়ে আর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতা তত্র বে চ যুগপদাঃ।
অধিকাবিংশতিরব্দাস্তদিহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"

এস্থলে গ্রন্থকার "যুগপদাঃ" শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু আর্য্যাষ্টশতক গ্রন্থের স্থলবিশেষে দৃষ্ট হইয়াছে যে আর্য্যভট্ট তথায় স্বীয় আবির্ভাব কাল "যুধিষ্ঠির শকের ষোড়শ শতাব্দী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় দিন-পঞ্জিকাসমূহে অদ্যাপিও কলিগত বর্ষাণিকে যুধিষ্ঠিরশক নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোলবুক সাহেবকৃত "ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিতের অনুবাদ" গ্রন্থের ভূমিকাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি নানাবিধ পর্য্যালোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আর্য্যভট্ট কোনমতে খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না।

ঐ পৃষ্ঠার অপরাংশে একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে "ভারতবর্ষে আর্য্যভট্টের ন্যায় ইউরোপ খণ্ডে কোপারনিকস নামক পণ্ডিত সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণ বিষয়ক মত প্রকাশ করেন। এই নূতন মত প্রকাশ করাতে তিনি স্বদেশীয় প্রাচীন মতবাদী পণ্ডিতগণের দ্বারা নিন্দিত ও ভৎর্সিত হইয়াছিলেন। দেশের রাজাও তাঁহাকে এ নিমিত্ত বিস্তর ক্লেশ প্রদান করেন।" ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট যে পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণ মত প্রকাশ করেন নাই, বস্তুত তিনি কেবল পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণনেরই স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা স্থলান্তরে দৃষ্ট হইবে। কোপর্নিকস্ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার গ্যালিলিওকে ভাবিতেছিলেন এইরূপ অনুমিত হইতেছে। কারণ কোপর্নিকস্‌কে কাহারও নিন্দা, ভৎর্সনা কিম্বা ক্লেশ প্রদান করিবার অবসর হয় নাই ;— তাঁহার প্রণীত "De Revolutionibus Orbium Celestium" গ্রন্থই প্রথমে তাঁহার মত জগতে প্রচার করে, এবং ঐ গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া যে সময় তাঁহার হস্তগত

হইয়াছিল তখন তিনি আসন্ন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন; তাহার অল্পক্ষণ পরেই ঐ গ্রন্থ হাতে করিয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। যদিও তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করিয়া "গোপনে" বন্ধুবর্গের মধ্যে তাহা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাঁহার মতে বিশ্বাসী এবং তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহাও সপ্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে ঐ হস্তলিপির এক খণ্ড প্রথম তাঁহার জনৈক বন্ধুর হস্তান্তরিত হইয়া তায়কো ব্রাহির হস্তগত হইয়াছিল; ইতি পূর্ব্বে ঐ সকল বন্ধুবর্গ ভিন্ন অপর কেহই ইহার বিষয় বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। অপরন্তু গ্যালিলিও কোপর্নিকসের মত সপ্রমাণ করিয়া আজীবন নিগৃহীত এবং কারাবরোধে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

৬ পৃষ্ঠাতে গ্রহদিগের চন্দ্র (বা উপগ্রহ) সংখ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে "বৃহস্পতির চারি চন্দ্র শনির শত চন্দ্র আছে। হর্শেল নামক এক গ্রহ আছে তাহার ছয়টী চন্দ্র।" ইহাদের মধ্যে বৃহস্পতির সম্প্রতি অপর একটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, * অতএব এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ তাহার পাঁচটি চন্দ্র। শনির উপগ্রহসংখ্যা বোধ হয় কোন কেশীনির মতাবলম্বী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শনির আটটি উপগ্রহ; তন্মধ্যে সর্ব্ববহিঃস্থ উপগ্রহের কক্ষ এত বৃহৎ যে ঐ উপগ্রহ যখন শনির কক্ষের বহির্ভাগে থাকে তখন অতি দূরত্ব হেতু তাহা নেত্রগোচর হয় না। কেশীনি বহুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও নির্দ্দেশ না পাওয়াতে ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন; কিন্তু হর্শেল তাহার কক্ষপ্রমাণ আবিষ্কার করিয়া ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং তদনন্তর বহুলোক বড় বড় দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহাকে সর্ব্বাবস্থাতে নেত্রগোচর করিয়াছেন। হর্শেল বা ইন্দ্র † গ্রহের চারিটি মাত্র উপগ্রহ আছে। হর্শেল যখন ইন্দ্রাবিষ্কার করেন তখন ছয়টি উপগ্রহাকার জ্যোতিষ্ককে গ্রহের আশে পাশে দেখিয়া তাহাদিগকে উপগ্রহ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে চারিটি জ্যোতিষ্ক তাৎকালিক ইন্দ্রাবস্থানের প্রায় সমসূত্রস্থ কোন দূরস্থিত নক্ষত্র চতুষ্টয়, তাহারা দূরবীক্ষণ-ক্ষেত্রে গ্রহের সন্নিকটে থাকাতে উপগ্রহ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। অতএব দৃষ্ট হয় যে হর্শেল ইন্দ্রের দুইটি মাত্র উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎপর ল্যাশেল ও স্ক ভ নামক জ্যোতির্ব্বীদ্বয় অপর দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। বরুণ গ্রহের একটি উপগ্রহ আছে, তাহা গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই।

তৎপর উক্ত হইয়াছে যে "পরন্তু বেষ্টা, অষ্ট্রীয়া, যুনো, শিরিস্, এবং পালাস নামক গ্রহগণ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে।" (এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে পূর্ব্বে যে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রহদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে উদ্ধৃতাংশোক্ত

* গত মাঘ ও ফাল্গুনের ভারতীতে "বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
† গত অগ্রহায়ণের ভারতীতে "গ্রহের নাম করণ" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

গ্রহগণ তাহাদের অন্তর্গত।) এই স্থলটি সাধারণের একান্তই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে, কারণ "মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী আকাশ (?)" বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না; তাহার পর আবার "দৃষ্ট" হওয়ার কথাতে সহজে অনুমান করা যাইতেছে যে খগোলকের পৃষ্ঠদেশে যে দুই স্থানে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়কে অবস্থিত বলিয়া নেত্রগোচর করা যায়, উক্ত ক্ষুদ্র গ্রহগণ তাহাদের অন্তর্ভূত খগোলক পৃষ্ঠভাগে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে. উক্ত ক্ষুদ্রগ্রহ সকল মঙ্গলের কক্ষ ও বৃহস্পতির কক্ষ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী "প্রশস্ত স্থানেতে" স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। গ্রন্থকার যদি "স্থান" অর্থ "আকাশ" এবং "গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন" হওয়াকে "দৃষ্ট" হওয়া বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার উক্তি ঠিক হইয়াছে; নতুবা কাহাকেও ঐ "আকাশ দৃষ্টি" করিতে হইলে সৌরমণ্ডল ছাড়াইয়া রাশিচক্রের উপর লম্বভাবে শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতে হইবে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন ধূমকেতুকে "নবাবিষ্কৃত বলা যাইতে পারে না" কারণ "প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রেও তাহাদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।" কিন্তু সেই "উল্লেখ" কেবল এই মাত্র দর্শাইয়াছেন যে "ধূমকেতু উদয় হইলে দেশের বিশেষ অমঙ্গল" হইবে। ইয়ুরোপ ধূমকেতু সংক্রান্ত যে "নবাবিষ্কার" নিয়া গর্ব্বিত হইতেছে তাহা এই, ধূমকেতুর স্বরূপ কি? তাহাদের উৎপত্তির পর্য্যায় কিরূপ? অতঃপর তাহাদের আবির্ভাব, স্থিতি ও গতি পর্য্যালোচনা করিয়া গণিতবলে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাহারা আর কদাপি সৌরমণ্ডলে দেখা দিবে কিনা, এবং যদি তাহা হয় তবে কোন সময়ে গগনের কোন প্রান্তে, কি আকারে আবির্ভূত হইবে? এই রূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে অনেকগুলি ধূমকেতুর ভ্রমণ-পথ অর্থাৎ কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর গতি সপ্রমাণার্থ আর্য্যভট্ট হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই,—

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্॥"

ইহা হইতে স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে যে আর্য্যভট্ট "প্রতিদৈবসিকৌ" শব্দ দ্বারা কেবল পৃথিবীর দৈনন্দিন "বিঘূর্ণনেরই" পরিচয় দিতেছেন। এই গতিতে কেহ আপত্তি করিলে তাহাদের বোধার্থ ৯ পৃষ্ঠোক্ত শ্লোক প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার বলিতেছেন এতদ্বারা আর্য্যভট্ট "পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণ প্রতিপন্ন" করিতেছেন। পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে এই উক্তি দ্বারা গ্রন্থকারের ভ্রম ভিন্ন. আর কিছু "প্রতিপন্ন" করা যাইতে পারে না। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপে পৃথিবীর বিঘূর্ণনের জ্ঞান প্রথম সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্যভট্ট তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব সপ্রমাণ হয় যে তিনিই পৃথিবীর বিঘূর্ণনের বিষয়

জগতে প্রথম প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন ; এই জন্য জগতে আর্য্যভট্টের প্রচুর প্রতিপত্তি রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার "আবর্ত্তন" জ্ঞানের কোন পরিচয় না পাইয়া তাঁহাতে তাহা আরোপ করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার গৌরবের খর্ব্বতা সম্পাদিত হয়, কারণ ঐরূপ মিথ্যা গৌরবের সিংহাসনে বসাইতে গেলে তিনি সহজেই সমালোচকের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন।

১০ হইতে ১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সকল প্রতিবাদবচন উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসমস্ত দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে সকলেই কেবল মাত্র পৃথিবীর "বিঘূর্ণন" বিষয়ে আর্য্যভট্টের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, কুত্রাপি তাহার "আবর্ত্তনের" কোন উল্লেখ কিম্বা প্রতিবাদ করেন নাই।

১৩ পৃষ্ঠাতে উক্ত হইয়াছে যে "ভূও ভূবায়ুর তুল্য গতি বিধায় কঠিন তরল কোন পদার্থই স্বভাবতঃ স্থানচ্যুত হইতে পারে না। ইহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে জলপূর্ণ ঘট দ্রুতবেগে ঘুরাইলে তত্রস্থ জল পড়িয়া যায় না।" দৃষ্টান্তটি কত অনুপাদেয় হইয়াছে তাহা দর্শাইবার জন্য ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ধরাস্থলে তরল পদার্থ আধারের "উপরিভাগে" এবং ঘটস্থলে তাহা আধারের "অভ্যন্তরে" অবস্থিত! আবার ঘটের বেগ যত "দ্রুত" হইতে থাকিবে তাহার ভঙ্গপ্রবণতা তত বৃদ্ধি পাইবে এবং বেগ সমধিক দ্রুত হইলে ঘট বিদীর্ণ হইয়া জল নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে। পদার্থকে ঘুরাইলে তাহা "স্বভাবতঃ স্থানচ্যুত" হয় না কিম্বা তাহার আকৃতিরও কোন ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু তরল পদার্থকে ঘুরাইলে "স্বভাবতঃ" তাহার আকৃতির ব্যত্যয় হয় এবং ঘূর্ণনের বেগাধিক্যপ্রযুক্ত তাহা "স্থানচ্যুত"ও হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি কঠিন পাত্রাকার পদার্থকে ঘুরাইলে দৃষ্ট হইবে যে তাহার আকৃতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এক্ষণে ঐ আকারে একটি পাত্র জলপূর্ণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে তাহার উপরিভাগ সম্পূর্ণ সমতল থাকিবে কিন্তু যদি তাহাকে ঘুরাইতে আরম্ভ করা যায় তবে দৃষ্ট হইবে যে ক্রমে কিয়ৎপরিমাণ জল পাত্র হইতে উথলিয়া চতুর্দ্দিগে ছড়াইয়া পড়িতে থাকিবে এবং জলের উপরিভাগ সমতল না থাকিয়া ঈষৎ বক্রতা প্রাপ্ত হইবে। (ইংরাজিতে ইহাকে "Surface of the 'paraboloid' of revolution" বলিয়া থাকে।) পাত্রের বেগ যে পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইবে উক্ত বক্রতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং তদনুসারে অধিকতর পরিমাণে জল উথলিয়া পড়িতে থাকিবে। বলা বাহুল্য যে ইহা ঘূর্ণন বশে "কেন্দ্রাপসারিণী প্রক্রিয়ার" * ফল মাত্র। অতএব দৃষ্ট হয় যে ঘূর্ণনকালে কঠিন পদার্থ হইতে তরল পদার্থে "কেন্দ্রাপসারিণী প্রক্রিয়া" অধিকতর কার্য্য করিয়া থাকে ; এবং "তরল বিজ্ঞান" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে

* অপূর্ব্ব বাবু Centrifugal ও Centripetal Forceএর বাঙ্গলা করিয়াছেন, "কেন্দ্রাপসারিণী প্রক্রিয়া" ও "কৈন্দ্রিকাকর্ষণ" আমাদের মতে 'কেন্দ্রাতিগ' ও 'কেন্দ্রাভিগ' এই দুইটি শব্দ উপযুক্ততর। ভাঃ সং।

তরল হইতে বাষ্পীয় পদার্থে ঐ প্রক্রিয়ার কার্য্য আরও সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে পৃথিবীর বিঘূর্ণনবশতঃ "ভূ ও ভূবায়ুর তুল্যগতি" অসম্ভব। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে বায়ু পৃথিবী হইতে উথলিয়া পড়িয়া যায় না কেন? অথবা "তদ্বেগজনিত বায়ু দ্বারা পতাকাদি সতত পশ্চিমগামী হয় না কেন?" (ইতি শ্রীপতি মিশ্র।) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে পৃথিবীর আকর্ষণ বায়ুকে ধরানিবদ্ধ করিয়া রাখে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে সদা ঘূর্ণনশীল তরল পদার্থ খণ্ড স্বীয় গতি বশে একবার যে আকার পরিগ্রহণ করে কোন বাহ্যিক কারণ কিম্বা আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন বশতঃ তাহার বেগের তারতম্য না ঘটিলে, সেই আকার পরিহার করে না; * অতএব পৃথিবীর বিঘূর্ণন বশে তাহার বায়বীয় আবরণ যে আকার ধারণ করিয়াছে কোন বাহ্যিক কারণ ব্যতীত তাহার ব্যত্যয় হইতেছে না। (পরে দৃষ্ট হইবে যে ইহার আকার পৃথিবীর ন্যায় উত্তর দক্ষিণে চাপা গোলকের মতন; কিন্তু পৃথিবীর আয়তন পরিমাণে নিরক্ষদেশ যেরূপ স্ফীত, বায়ু গোলকের আয়তনানুক্রমে তাহা তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্ফীত।)

১৪ পৃষ্ঠাতে উক্ত হইয়াছে যে, "পুরাণশাস্ত্র সমালোচন করিলে তাহাতেও সূর্য্যের মধ্যকেন্দ্রত্ববিষয়ক মতের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এবং তৎপোষকতার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে যে, অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যোদ্যাবাভূম্যোর্য্যদন্তরঃ" ইত্যাদি। এই স্থলে "অণ্ডমধ্যগত" এই বাক্য দ্বারা সূর্য্যের "মধ্যকেন্দ্র" কেন বুঝাইবে, তাহা বোধগম্য হইতেছে না। সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অংশবিশেষের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে, ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে পুরাণে "অণ্ডমধ্যগত" দ্বারা কি বুঝাইতে পারে;—'অব্যক্ত, নির্গুণ, তৎস্বরূপব্রহ্ম প্রকৃতিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তরল পদার্থের উৎপত্তি করিলেন, এবং তাহাতে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করাতে তৎপ্রভাবে পরিচালিত হইয়া উক্ত তরল পদার্থ চিরস্থায়ী স্বর্ণডিম্বরূপে পরিণত হইল। † ......এই ব্রহ্ম-

---

* ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভার্থ "Hydromechanics" পঠিতব্য। কঠিন এবং তরল পদার্থের গতি এক প্রণালীক্রমে বিধিবদ্ধ হইতে পারে না বলিয়াই ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে "Rigid Dynamics" ও "Hydro—Dynamics" নামে দুইটি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রণালী রহিয়াছে।

† ইয়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাপ্লাশ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, সমস্ত পদার্থজগৎ আদিতে পরমাণুরূপে অবস্থিতি করিতেছিল; তদনন্তর তাহাতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে পরমাণু সকল ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয় ও বাষ্পাণু সকল শক্তির বেগে আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়া স্থলবিশেষে অধিকতর ঘনীভূত হইতে থাকে এবং চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থাণু সকল ঐ সকল স্থানে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে ও ক্রমে তাহারা তরলত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই সকল পদার্থই ক্রমে অধিকতর ঘনীভূত হইয়া পদার্থজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে পদার্থজগৎ তরলাবস্থাতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

ডিম্বের গর্ভস্থল শূন্য এবং তাহাতে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ইহার অভ্যন্তরে ব্যোমকক্ষ নামে একটী বৃত্ত আছে; তাহার নিম্নে ক্রমশঃ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ এবং চন্দ্রের কক্ষ; তদনন্তর সিদ্ধপুরুষ ও বিদ্যাধরদিগের এবং তৎপর মেঘদিগের কক্ষ বিরাজ করিতেছে। এই ডিম্বের কেন্দ্রভাগে ভূগোলক স্বীয় শক্তিতে শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে।" ইহা হইতে লক্ষিত হয় যে, "অণ্ডমধ্যগত" বচন দ্বারা কেবলমাত্র "অণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত" বুঝাইতে পারে। জ্যোতিষের যে সকল তত্ত্ব প্রমাণ জ্যোতির্ব্বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাদের সপ্রমাণার্থ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ জ্যোতিষের তৎকালপ্রচলিত ভাব সকলই পুরাণে নিবিষ্ট হইয়াছে। নতুবা পুরাণ দৃষ্টে কদাপি জ্যোতিষ রচিত হয় নাই। এই হেতু গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় বলা যাইতে পারে, যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে "পৌরাণিক মত যে ঔপপত্তিক নহে, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত।"

১৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ টীকাতে পৃথিবীর আকার এবং তাহার নিরাকরণপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে; ইহাতে গ্রন্থকার যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমালোচনার পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় মতে পৃথিবীর আকার কিরূপ তাহা পাঠকবর্গের গোচর করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। আধুনিক ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষ হিপ্পার্কাস ও টলেমির গ্রন্থাবলীর উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া সমুৎপন্ন হইয়াছে, এবং ঐ সকল গ্রন্থে পৃথিবীকে গোলক বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে; পরন্তু খ্রীঃ পূঃ লিখিত অনেক গ্রীকগ্রন্থেই পৃথিবীর গোলত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, (ইহা হইতে এই অনুমান অযৌক্তিক হইবে না যে, হিন্দুজাতি হইতেই উক্ত ধারণা অভ্যুদিত হইয়া ইয়ুরোপে প্রবেশলাভ করিয়াছে।) যাহা হউক নিউটনের পূর্ব্বে ইয়ুরোপে কোন পণ্ডিতই পৃথিবীর গোলত্ব ভিন্ন অপর কোন আকার সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন নাই। নিউটনই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে "কিঞ্চিৎ চাপা" সপ্রমাণ করিয়া গণিতবলে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎপর বৃদ্ধ কেশীনি (ইহার বংশধরেরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সকলেই জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে বিশেষ খ্যাতিপন্ন হইয়াছিলেন;) তাহাতে মতান্তর ঘটাইয়া পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে "বিলম্বিত" অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ক্লেয়রৌ, মৌপেতুয়ী প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা ফরাসী জ্যোতিষী বহুপরিমাপ ও নানাস্থানে ধরাতল পর্য্যালোচনা করিয়া নিউটনের মত সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং কেশীনির গণনাতে যে ভুল সঙ্ঘটিত হওয়াতে তন্মতে পৃথিবীর বিপরীত আকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাও দর্শাইয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু ইঁহাদিগের পরিমাপফলে পৃথিবীর "চাপাত্বের" পরিমাণ নিউটনের সাধিত পরিমাণ ফল হইতে অনেক বিশুদ্ধতররূপে পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল। অতঃপর ফ্রান্স, সুইডেন্, নরওয়ে, রুশীয়া, জর্ম্মেণি, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় যথাক্রমে জরীপবিভাগ স্থাপিত হইয়া পৃথিবীর

পৃষ্ঠদেশে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন "যাম্যোত্তর বৃত্ত-চাপ" (meridional arc) পরিমাপ পূর্ব্বক তাহার আকার নির্দ্ধারিতরূপে "উত্তর দক্ষিণে চাপা" স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যৎকালে উপরোক্ত বাহ্যিক প্রণালী ও পরিমাপ সকল ব্যবহার পূর্ব্বক পৃথিবীর আকার নিরাকৃত হইতেছিল তাহার মধ্যভাগে ফ্রান্সে এক "ভূ-জ্যোতিষ্ক" আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইনি কিছুমাত্র পরিমাপ বা পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ না করিয়া আপন পাঠাগারে উপবেশন পূর্ব্বক গণিত-যোগবলে জগতের যাবতীয় বিষম সমস্যার গূঢ়তত্ত্বোদ্ঘাটন করিয়া তৎপ্রভায় জগৎকে আলোকিত করিতেছিলেন। ইনি জগদ্বিখ্যাত মনীষী লাপ্লাশ! লাপ্লাশ পৃথিবীর আকার পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কোন একটি তরল পদার্থখণ্ডকে স্বকীয় আকর্ষণবলে ঘুরাইলে তাহার যেরূপ আকার হইবে পৃথিবীর আকার ঠিক তদনুরূপ; অনন্তর তরলবিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিয়া উপরোক্ত পদার্থখণ্ডের সম্ভাবিত আকার নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন যে বাতাবী লেবুর আকারবিশিষ্ট ঊর্দ্ধাধোভাগে চাপা একটি গোলক অনায়াসে ঐ অবস্থায় স্থাপিত হইতে পারে; এই "চাপাত্বের" পরিমাণ গোলকের ঘূর্ণনবেগের উপর নির্ভর করে। * এতদ্ভিন্ন ইহাও সিদ্ধান্ত করিলেন যে যে তরল গোলকের ঘূর্ণনবেগ যত অধিক হইতে থাকে তাহার মধ্যভাগে "কেন্দ্রাপসারিণী প্রক্রিয়া" তত প্রবল হইয়া উঠে; এবং যখন তাহা এত প্রবল হয় যে "কৈন্দ্রিকাকর্ষণ" হইতে তাহার বল অধিকতর হয় তখন সেই স্থান হইতে পদার্থখণ্ড সকল স্খলিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

উপরোক্ত তত্ত্বমীমাংসার পর লাপ্লাশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে আদিতে পদার্থাণু সকল ঘনীভূত হইয়া ক্রমে খণ্ড খণ্ড তরল পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছিল; সৌর-জগৎ তাহার একটি খণ্ডবিশেষ। যখন এই পদার্থ ক্রমে অতিশয় তরল হইতে ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করে তখন সেই সঙ্গে তাহার বেগবৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্ধেতু তাহার মধ্যভাগ হইতে তরল পদার্থখণ্ড সকল ক্রমশঃ স্খলিত হইয়া তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপর গ্রহগণ তাৎকালিক সৌরবেগে চালিত ও ঘূর্ণিত হওয়াতে তাহারাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করে, এবং তদনুক্রমে বেগবৃদ্ধিহেতু তাহাদেরও অংশবিশেষ স্খলিত হইয়া উপগ্রহদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া তিনি তরলিত গ্রহদিগের আকার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে সকল গ্রহই ঊর্দ্ধাধোভাগে চাপা। লাপ্লাশের মত (এবং আধুনিক তরল-বিজ্ঞানের সূত্রমতে) গ্রহদিগের আদ্য-গোলত্ব স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না; যে কোন আকারের তরল পদার্থখণ্ডকে স্বকীয় আকর্ষণবলে ঘূর্ণিত করিলে তাহা ঊর্দ্ধাধোভাগে চাপা গোলকের আকার ধারণ করিবে। অতএব গ্রহগণ যে আকার বিশিষ্ট হইয়া সৌরদেহ

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে হইলে Hydromechanics কিম্বা Natural Philosophy সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পঠিতব্য।

হইতে বিছিন্ন হউক না কেন; ইহা নিশ্চিত যে তাহারা তরলাবস্থাতেই বর্ত্তমান (ঊর্দ্ধাধোভাগে চাপা) আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর আদ্যতরলত্বের বিষয় ভূবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। (পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে সূর্য্য-সিদ্ধান্তও এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছে।) অধিকন্তু ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে কোন গাঢ় কঠিন পদার্থকে ঘুরাইলে যে পর্য্যন্ত তাহার কঠিনত্ব বিনষ্ট বা আংশিক বিপর্য্যস্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার আকৃতির ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না; ঘূর্ণনবশে কেবলমাত্র তাহার স্থিতি বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। কিন্তু তরলাবস্থায় ঘূর্ণনশীল হইয়া একবার সম্ভাবিত আকার গ্রহণ করিলে পরে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহা অবস্থান্তরিত অথবা স্থিত্যন্তর প্রাপ্ত হয় না। এই সকল মত বিজ্ঞানসমাজে সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং "ইয়ুরোপীয় ইদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণেরও" মত।

মৃণ্ময়ীর ১৮ পৃষ্ঠায় (৯) সংখ্যক টীকাতে উক্ত হইয়াছে যে, "পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ইউরোপীয় ইদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মত এই যে, প্রথমতঃ পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল রূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল (ক), বিপুলকালসহকারে ঘুরিতে ঘুরিতে উহার মধ্যস্থল অপেক্ষাকৃত স্ফীত ও উত্তর দক্ষিণ প্রান্তদ্বয় ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে (খ)। এরূপ হইবার আরও এক কারণ এই যে, প্রতি দক্ষিণায়নে পৃথিবী সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তিনী হওয়াতে সূর্য্যের অতিরিক্ত আকর্ষণ শক্তিদ্বারা নিরক্ষদেশের উক্তরূপ অবস্থা হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে (গ)।" (ক, খ, গ চিহ্ণগুলি আমার নিজের, তাহা গ্রন্থকারের নহে।) পৃথিবীর আকারবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে সপ্রমাণ হইবে যে (ক) ও (খ) চিহ্ণিত অংশদ্বয় একান্ত ভ্রান্তিমূলক; ইহা সহজে অনুমিত হয়, যে কোন অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রতিপাদক ইয়ুরোপীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ঐ বাক্যদ্বয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। (গ) চিহ্ণিত স্থলটী গ্রন্থকারের নিজের আবিষ্কৃত; কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা পদার্থবিজ্ঞানে জ্ঞানানাধিক্যের পরিচায়ক! প্রকৃতির নিয়তিই পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র এবং তাহাই গণিত সমস্যা! এই সূত্র বা সমস্যাবলে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে কোন গোলাকার বস্তুতে "অতিরিক্ত আকর্ষণ" প্রযুক্ত হইলে তাহাতে ঐ বস্তুর গতিবেগের ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে; তৎপ্রযুক্ত তাহার আকৃতির ব্যত্যয় সম্পূর্ণই "অসম্ভাবিত।" * গ্রন্থকারের ইহা জানা উচিত যে, "দক্ষিণায়নে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তিনী হওয়াতে যেমন "মধ্যস্থল স্ফীত" হওয়া "অসম্ভাবিত", আবার উত্তরায়নে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তিনী হওয়াতে সেই স্ফীত স্থল সঙ্কীর্ণ হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া তেমন অসম্ভাবিত।

---

* এই সকল গূঢ় তত্ত্বের মূলোদ্ঘাটন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আকর্ষণবিষয়ক প্রস্তাবসমূহের বিশেষ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যাঁহাদের অভীপ্সিত, তাঁহাদের গোচরার্থ বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, প্রবন্ধলেখক নিউটনপ্রণীত "Principia" নামক সিদ্ধান্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিতে বাসনা রাখেন; তাহাতে নিউটনের ভাষাতে এই সকল তত্ত্বের মীমাংসা হইবে।

অনন্তর ২০ পৃষ্ঠাতে উক্ত হইয়াছে যে, "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর পূর্ণ গোলত্ব লিখিত আছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও পৃথিবীর আদ্যাবস্থায় পূর্ণ গোলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না? বাস্তবিক যে কালে ভারতবর্ষে জ্যোতিস্তত্ত্বের প্রথম বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, সেকালে পৃথিবীর পূর্ণগোলত্ব নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। সেকালে হয় ত ভূগোলের বাল্যাবস্থাই ছিল।" এই উক্তির বিস্তারিত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "পৃথিবীর আদ্যাবস্থায় পূর্ণগোলত্ব স্বীকার" করিলেও তৎকালে তাহার তরলত্ব হেতু তৎপৃষ্ঠস্থাপিত আদি হিন্দুজাতি সৃষ্ট হওয়ামাত্রেই ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহারা "জ্যোতিস্তত্ত্ব-বিচার" করিতে অবসর পায় নাই !!!

শাস্ত্রে একটী প্রবাদ-বচন আছে যে, "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।" এই বাক্যটী আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত বোধ হইতেছে। স্বদেশানুরাগ অতিশয় কামনীয় বস্তু, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে। ইহাতে এই ফল হয় যে, অতি অনুরাগবশতঃ আমরা স্বদেশের বিরাগের কারণ হইয়া পড়ি।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া গ্রন্থকার যে সকল ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বিবাহ-উৎসব। *

(মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত)

২য় দৃশ্য।

কবি ও সখা।

মিশ্রখাম্বাজ—একতালা।

কবি। ওই জানালার কাছে বসে আছে,
করতলে রাখি মাথা
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কানে কানে কি যে কহে যায়

* ১২৯৯ সালের ভাদ্র ও আশ্বিনের ভারতীতে ইহার প্রথম দৃশ্য ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

তাই আধ শুয়ে আধ বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস মধুর আবেশ
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

সখা। সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো
এই বেলা মানে মানে ফেরো ফেরো।
পলক যে নাই আঁখির পাতায়
(তোমার) মনটা কি খরচের খাতায়
হাঁসি ফাঁশি দিয়ে প্রাণে বেঁধেছে গেরো?

বেহগড়া—ঝাঁপতাল।

কবি। ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসহে।
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসহে।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে সখি চাও, চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসহে।

সিন্ধু—একতালা।

সখা। তুমি আছ কোন্ পাড়া।
তোমার পাইনে যে সাড়া।
পথের মধ্যে হাঁ করে যে
রইলে হে খাড়া।
রোদে প্রাণ যায় দুপুর বেলা
ধরেছে উদরের জ্বালা
আরে এর কাছে কি হৃদয় জ্বালা!
তোমার সকল সৃষ্টি ছাড়া।

রাঙ্গা অধর নয়ন কালো
ভরা পেটেই লাগে ভাল
এখন পেটের মধ্যে নাড়ীগুল দিয়েছে তাড়া।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কবি। গেছ গেছ যাও মন এসনা আমার কাছে।
তারে ছেড়ে যাবে কোথা—
কোথা বা আর সুখ আছে।
এচিত শ্মশান ভূমি, রে মন এসনা তুমি
প্রমোদ প্রমোদবনে পারিজাত ফুটিয়াছে।

স্বরলিপি।

সঙ্কেতের ব্যাখ্যা। *

স র, গ, ম, প, ধ ন = শুদ্ধ সুর।
রো, গো, ধো, নো = কোমল সুর।
মী = কড়ি মধ্যম।
স১ র১ গ১ = একমাত্রাকাল স্থায়ী।
স২ র২ গ২ ... ... দুইমাত্রা কাল স্থায়ী অর্থাৎ = সা—আ
স৩ = সা—আ—আ—
সর১।—এখানে একমাত্রাকালের মধ্যে দুটী সুর বাজাইতে হইবে।
সরগ১ —একমাত্রা কালের মধ্য তিন সুর বাজাইতে হইবে।
সর—গ১ এ স্থলে কশির বাম পার্শ্বস্থিত সুরের মাত্রা কাল তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সুরের মাত্রা কালের সমান, অর্থাৎ 'সর' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী এবং 'গ' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী।
সর১ এ স্থলে বাম পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র সকে ভূষিকা বলা যায়, তাহা মীড়ের কাজ করে, অর্থাৎ তাহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া প্রধান সুর র১ বাজাইতে হয়।
[ ] ব্র্যাকেট পুনরাবৃত্তির চিহ্ন

---

* বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১২৯৯ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে দ্রষ্টব্য।

{ } পুনরাবৃত্তি কালে যে স্বরগুলি বাদ দিতে হয় তাহারা এই বন্ধনীতে আটক থাকে।

আ—প্র = আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন।

শেষ = আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গান যেখানে শেষ করিতে হইবে।

আ = আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন কোন স্থলে প্রথম দুই একটী স্বর বাদ দিয়া আরম্ভ করিতে হয় সেই স্থলে যে স্বরের মাথায় 'আ' থাকিবে সেই স্বর হইতে পুনরায় ধরিতে হইবে।

যে স্থলে মাত্রা চিহ্নিত কশির নীচে গানের পদের স্থানে কশি টানা থাকিবে সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের স্বরের রেশ চলিতেছে কিন্তু যে স্থলে নীচে কোন কশি নাই সে স্থলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা পর্য্যন্ত বাজনা ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। নিম্নে যে গানগুলির স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রথম গানটি-তেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

"ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়" "কানে কানে কি যে কহে যায়" এই দুই স্থলে প্রথম "যায়" তিন মাত্রা কাল টানিয়া রাখিয়া তাহার পরে এক মাত্রা কাল ছাড়িয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় "যায়" সে এক মাত্রা কালও টানা থাকে।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

আ
গম১। প১ ন১ র্স১। নর্সর্র১ র্স১ র্সধ১। ধনো১ ধনোর্স১
ওই জা না লা র কা ছে ব সে

নো১। ধ২ ধম১। ম১ প১ পর্স১। নোর্সনো১ ধ১ পধপ১। গম১
আ ছে — ক র ত লে রা খি মা
শেষ।

পধপ১ মপ১। গ২ গরসন্১। স১ ম১ গ১। ম১ গ১ ম১।
— — থা তার কো লে ফু ল প ড়ে

প১ ধ১ নো১। র্স১ র্সধ ধনো১। র্স১ র্র১ গোঁ১। র্র১ র্সন১
র য়ে ছে — — সেযে ভু লে গে ছে মা

র্স১ । নর্স১ নর্সর´১ র্সনো১ । ধ২ গম১ ॥ মগ১ । ম১ নো১
লা গাঁ — — থা ওই শুধু ঝু রু
(আ—প্র)

ধ১ । ধন১ ন১ র্স১ । নর্সর´১ র্সন১ ন১ । র্স৩ । —১ র্স২ ।
ঝু রু বা য়ু ব — হে যায় তার

ন১ র্স১ ন১ । র্সর´১ র্স১ র্সধ১ । ধনো১ ধনোর্স১ নো১ ।
কা নে কা নে কি যে ক — হে

ধ৩ । —১ ধ২ । নো১ ধ১ প১ । ম১ গ১ ম১ । নো১ ধনো১
যা য় তাই আ ধ শু য়ে আ ধ ব —

পধ১ । নোর্স১ ন১ র্স১ । —১ ধ১ নো১ । র্স১ র´১ র্গো১ ।
— — সি য়ে — — — ভা বি তে

র´১ র্সন১ র্স১ । নর্স১ নর্সর´১ র্সনো১ । ধ২ গম১ ॥ —১ । স৩ স১
ছে ক ত ক — — থা ওই — চো খে
(আ—প্র)

ম১ । ম১ ম১ ম১ । ম১ প১ পধ১ । মপ১ মগ২ । ম১ নো১
র উ প রে মে ঘ ভে সে যায় উ ড়ে

ধ১ । ধ১ ধ১ নো১ । নো১ র্স১ নর্সর´১ । র্স২ নোধ১ । ধ১
উ ড়ে যা য় পা — — খী — সা

নো১ র্স১ । —১ র্সর´১ র্গো১ । র্গোর´১ র্সর´১ র্স১ । —৩ ।
রা দি — — ন ধ — রে —

সর্ম১ ম১ ম১ । —১ ম২ । ম১ প১ পধ১ । প১ মগ১
ব কু লে র ফুল ঝ রে প ড়ে থা

গ১ । ম১ ধ১ পধনো১ । ধ৩ ॥ ধ১ ধ১ ধ১ । ধ১ ধ১ ন১ ।
কি থা — — কি ম ধু র আ ল স

ন১ স́১ নস́র́১ । র́স́১ স́২ । ন১ স́১ নস́র́১ । র́১ র́১
ম ধু র আ বেশ ম ধু র মু খে

স́র́১ । নস́১ নস́র́১ স́১ । ধস́নো২ ধ১ । —১ ধ২ । ধ১
র হা — সি টী —

নো১ প১ । ম১ মগ১ ম১ । প১ নো১ ধনোস́১ । ন১ স́১
ধু র স্ব প নে প্রা ণে র মা ঝা

স́১ । স́১ গ́১ ম́১ । র́১ স́১ র́১ । নস́১ নস́র́১ স́১ । ধস́নো২
রে বা জি ছে ম ধু র বাঁ — শি টী

ধ১ । —১ ধম১ গম১ ॥
— — — ওই

(আ—প্র)

ঝিঁঝিট—খেমটা।

মপ১ নো১ ধ১ । পধ–ম১ গোর১ সর১ । মম১ পম১ পধনো১
সাধ ক রে কে ন স খা ঘটা বে গে

ধ৩ । নো১ নো১ নো১ । নোস́১ নো১ ধ১ । মম১ পধনো১
রো এই বে লা মানে মা নে ফের ফে
শেষ।

ধ১ । —১ মগোর১ সর১ । মম১ পম১ পধনো১ । ধ৩ ॥
র — স খা ঘটা বে গে র ।

[পধ১ মপম১ প১ । নোনো১ ধধ১ —১ । —১ ধধ১ নোনো১
[পলক যে নাই আঁখির পাতায় — — তোমার মন টা

ধনো১ র্সর্র্স১ নোর্স১ । নোধ১ —২ ।] নোনো১ নো১ নো১ ।
— কি খ রচের খাতায় —] হাসি ফাঁ শি

নোর্স১ নোর্সনো১ ধ১ । মম১ পম১ পধনো১ । ধ১ মগোর১
দিয়ে প্রা ণে বেঁধে ছে গে রো স

সর১ । মম১ পধনো১ ধ১ ॥
খা ফেরো ফে রো।

(আ—প্র)

আপেল আঘ্রাণে।

অন্তিমকালে অ্যারিষ্টটল যে উপদেশ দেন তাহা 'বুক অফ দি আপেল' নামে খ্যাত, ইহা তাহারি অনুবাদ। আরিষ্টটলের লুপ্ত গ্রন্থের অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাও একরূপ লুপ্ত গ্রন্থ। কারণ ইয়োরোপে এ গ্রন্থখানির কোন নিদর্শন পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। পারস্য ভাষায় আরিষ্টটলের বুক অফ দি আপেলের অনুবাদ বলিয়া একখানি পুস্তিকা পাওয়া যায় তাহা এখন ইয়ুরোপীয় নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আরিষ্টটলের পুস্তকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ইংরাজ অনুবাদক এ গ্রন্থখানি বাস্তবিক আরিষ্টটলের কি না তাহাতে সন্দেহ করেন। তাঁহার সন্দেহের কারণ এই যে, গ্রন্থখানির স্থল বিশেষে কোরাণের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাঁহার মতে কোন পারস্যলেখক আরিষ্টটলের অনুকরণে ও আরিষ্টটলের শিষ্যদের নাম লইয়া নিজে এ গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন ও আরিষ্টটলের বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের তাহা ঠিক মনে হয় না। আরিষ্টটলের অনুকরণে লেখা সহজ নহে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার শিষ্যদের যথার্থ নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, পারস্যলেখক আরিষ্টটলের লেখার সহিত সুপরিচিত ছিলেন তবে আরিষ্টটলের অনুবাদ করিতে তাঁহার বাধা কি? অনুবাদক সাধারণতঃ বিষয়কে নিজ দেশোপযোগী করিয়া অনুবাদ করেন সুতরাং ইহার মধ্যে কোরাণের ছায়া দেখাই সম্ভব। আজ কাল একটী ভাব দেখা যায় যে অনুবাদ যথাযথ করিতে হইবে নহিলে ইতিহাস রক্ষা হয় না, পূর্ব্বে সে ভাব মোটেই ছিল না।

বিষয়টী যাহাতে চিত্তাকর্ষক করিয়া অন্য ভাষায় পরিবর্ত্তিত করা যায় কেবল তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখা হইত। এই জন্য সম্ভবতঃ পারস্য লেখক স্থলে স্থলে আপনার কথা বসাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পারস্য জানি না সুতরাং ইংরাজী অনুবাদই বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিতেছি। স্থলে স্থলে এক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও ভ্রমাত্মক যুক্তি আছে কিন্তু অনুবাদের মূল্য রক্ষার্থে তাহা আমরা অবিকল রাখিতে বাধ্য হইলাম। সে সময় পুনরাবৃত্তি অবশ্যক হইত কারণ লোকের মনে কোন ভাব বসিতে বিলম্ব হইত। এখন অগণ্য পুস্তকের সাহায্যে আমরা অল্প কথাতেই সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি। ন্যায়যুক্তিও আজকাল বহু উন্নতিলাভ করিয়াছে কিন্তু তথাপি এই ভ্রম সত্বেও আরিষ্টটলের যুক্তি চিরনবীন তেজে দর্পভরে দণ্ডায়মান। বাস্তবিক পক্ষে সেই প্রাচীনকালে প্রথম ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত যে দর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ইয়ূরোপে আর কে সেরূপ করিতে পারিয়াছে ? আমাদের দেশের কথা উল্লেখ করিব না কারণ আমাদের দেশে তাহার পূর্ব্ব হইতেই দর্শন উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিদেশীয় বলিয়াই আমাদের নিকট এ প্রবন্ধের আদর। নহিলে নূতন কথা কিছুই নাই। বিদেশীয় দর্শনের স্থাপন কর্ত্তা ইয়ুরোপের আদিগুরু আরিষ্টটলের কিরূপ মত তাহা ইহা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারি বলিয়াই আমাদের নিকট ইহা মূল্যবান।

আরিষ্টটলের পরমায়ু নিঃশেষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে দেখিতে আসেন। গুরুর জীর্ণ কলেবর, দুর্ব্বলতা, ও অন্যান্য মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়া শিষ্যেরা বুঝিলেন তাঁহার জীবনের আশা নাই। এই অবস্থায় তাঁহার চিত্তের আনন্দ ও জাগ্রতভাব এবং বুদ্ধির নির্ম্মলতা দেখিয়া তাঁহারা অবাক হইয়া গেলেন। একজন তাহার মধ্যে বলিলেন "আপনার জন্য আমরা যতদূর দুঃখ পাইতেছি, আপনি নিজের জন্য সেরূপ দুঃখিত নহেন। আপনার ইহলোক ত্যাগচিন্তায় আমরা যেরূপ ব্যথিত আপনি সেরূপ নহেন। আপনার অবস্থা আপনি আমাদিগের হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিতেছেন ইহাত স্পষ্টই বোধ হইতেছে ; সে ভাবটি কি সে সম্বন্ধে আমরা আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।"

আরিষ্টটল বলিলেন "আমাতে তোমরা যে আনন্দ দেখিতেছ তাহা জীবনের আকাঙ্ক্ষা হইতে উৎপন্ন নহে। মৃত্যুর পরে আমার যে অবস্থা হইবে তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস হইতে উহার উৎপত্তি।"

সিমিয়স নামক শিষ্য বলিলেন "আপনার যদি এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তবে সে বিশ্বাসের মূল কি তাহা আমাদের বলা কর্ত্তব্য তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আপনার ন্যায় আমরাও অসন্দিগ্ধ চিত্ত হইতে পারিব।"

আরিষ্টটল বলিলেন "এখন যদিও আমার পক্ষে কথা কহা অত্যন্ত কষ্টকর তথাপি তোমাদের হিতের জন্য আমি এই কষ্ট স্বীকার করিব। প্রথমতঃ ক্রাইটন কি বলেন তাহা শোনা যাক কেন না আমি দেখিতেছি তাহার কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে"।

ক্রাইটন বলিলেন "হে মানবশ্রেষ্ঠ! আপনার উপদেশ বাক্য শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিতে যদিও আমি অদ্য অত্যন্ত উৎসুক কিন্তু চিকিৎসক মহাশয় আপনাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহাতে কোন প্রকারে আপনি অধিক কথা না কহেন এইরূপ আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। কথা কহিলে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবে, উত্তাপাধিক্য ঘটিলে ঔষধের ফল ব্যর্থ হইবে। পীড়ার উপশম হইতে বিলম্ব হইবে।"

আরিষ্টটল বলিলেন "আমি চিকিৎসকের আদেশ অবহেলা করিয়া, অন্য ঔষধের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র একটী আপেল ফলের আঘ্রাণ লইব। ইহা উপদেশ সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত রাখিবে। এই উপদেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকার আছে। কথা কহিবার শক্তি লাভই যখন ঔষধের উদ্দেশ্য তখন কেনই বা না আমি কথা কহিব? ঔষধে যখন কথা কহিবার মত বল ভিন্ন আর কোন উপকার দিতে পারিবে না তখন আমি কথা কহিব না কেন? এখন শোন। তোমরা বল দেখি জ্ঞানের মহত্ব তোমরা স্বীকার কর কি না?"

তাহারা বলিল "জ্ঞানকে সম্মান কবিবার একমাত্র কারণ এই যে আমরা জানি যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট।"

আঃ। "ইহার উৎকৃষ্টতা কোথায়? ইহলোকে না পরলোকে?"

শিঃ। "আমরা জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করি, এবং অনন্যোপায় হইয়া পরলোকেই ইহার মূল ও উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে হয়।"

আঃ। "তবে কেন তোমরা মৃত্যুকে ভয় কর? এবং ভাব যে মৃত্যু দ্বারা তোমাদের কোনরূপ হানি হইবে? তোমাদের বোঝা উচিত যে অজ্ঞলোকে মৃত্যুকে যত ভয়ঙ্কর মনে করুক না কেন মৃত্যু আর কিছুই নহে কেবল দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ মাত্র।"

শিঃ। "উহা কিরূপ তাহা আমাদের ভাল করিয়া বলুন।"

আঃ। "তোমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ তাহাতে তোমাদের মনের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে কি না বল দেখি? এবং যে জ্ঞান তোমাদের লাভ হয় নাই তাহার জন্য দুঃখিত হইয়াছ কি না বল দেখি?"

শিঃ। "উভয় কথাই সত্য।"

আঃ। কিসের দ্বারা তোমরা জ্ঞান লাভ কর? শরীরের দ্বারা? যে শরীর অন্ধ বধির অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য—আত্মাহীন হইলে যে শরীর জড়পিণ্ড মাত্র? কিম্বা আত্মা দ্বারা? যে আত্মা হইতে মানব প্রতিমুহূর্ত্তে জ্ঞান লাভ করিতে দেখিতে লিখিতে ও কথা কহিতে সক্ষম হইতেছে?"

শিঃ। "অবশ্য আত্মার সৎ ও জীবনী শক্তি হইতেই আমরা জ্ঞানলাভ করি এবং দেহের স্থূল নির্জ্জীবভাব বশতঃই উহা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত।"

আঃ। "অতএব যখন সুস্পষ্ট বুঝিতেছ যে শরীরের স্থূলতা জ্ঞানের বিরোধী ও জ্ঞান আত্মা হইতে প্রসূত এবং জ্ঞান আহরণ করিয়া তোমরা আনন্দিতচিত্ত হও আর তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে ক্ষুব্ধ হও তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আত্মা ও দেহের একত্রাবস্থান অপেক্ষা শরীর হইতে আত্মার বিচ্ছেদই অবশ্য তোমাদের নিকট অধিক বাঞ্ছনীয় হইবে? আত্মার পক্ষে দেহ হইতে বিচ্ছেদই শ্রেয়ঃ। তোমরা কি জাননা যে শারীরিক সুখ ও আকাঙ্খা যেমন স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য্য, জ্ঞানান্বেষণের প্রতিবন্ধক? যখন তোমরা এই সকল ভোগ বিলাস পরিত্যাগ কর তখন বুদ্ধির সহায়ে জ্ঞানলাভের জন্যই কি এরূপ আত্মোৎসর্গ কর না।"

শিঃ। "অবশ্য তাহাই।"

আঃ। "তাহা হইলে তোমরা যখন স্বীকার করিতেছ যে বিলাসিতা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষতি করে তখন অবশ্য দেহও—যাহা এই বিলাস সুখ ভোগ করে তাহা বুদ্ধিরও ক্ষতি সম্পাদন করে?

শিঃ। "আপনি এতাবৎ যাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা আমাদের বিচারে সঙ্গত; কিন্তু আপনার ন্যায় মৃত্যুতে অবিচলিত চিত্ত এবং জীবনে অনাস্থাবান হইবার নিমিত্ত কি করা কর্ত্তব্য এবং তাহা কি করিয়াই বা সম্পাদিত করিতে হয় তাহা আমাদের কিরূপে শিক্ষা হইবে?"

আঃ। জ্ঞানদাতার পক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যাহা সত্য তাহাই বলা এবং শ্রোতার পক্ষে তাহাই যথার্থরূপে বোঝা। আমি এখন সত্য বলিতে চেষ্টা করিব তোমরা উহা যথার্থ ভাবে বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হও। তোমরা কি জান না যে 'ফিলজফি' এই কথার অর্থ জ্ঞানানুরাগ এবং এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে মানব প্রকৃতি ও সত্যের মূল আলোচনা করা। মন জ্ঞান দ্বারাই আনন্দ লাভ করে এবং কেবল মাত্র জ্ঞান লাভেই শান্তিলাভ করে।"

শিঃ। "আপনি যথার্থই বলিয়াছেন।"

আঃ। "তোমরা কি জান না যে জ্ঞানই চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক? চিত্ত ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা আমাদের জ্ঞান লাভ হয়? এখন দেখ মনের বিকাশ ও উন্নতি দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং ক্রোধ নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতির হ্রাসেই মনের সম্যক বিকাশ।"

শিঃ। "হাঁ।"

আঃ। "প্রবৃত্তির শমতার উপরই যদি মনের বিকাশ ও উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে তাহা হইলে যখন এই প্রবৃত্তিগুলি লোপ পাইয়া যায় তখন মনের কি আরও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নহে?"

শিঃ। "আপনার যুক্তি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তথাপি মৃত্যুচিন্তায় আপনি যেরূপ আনন্দ লাভ করিতেছেন আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না।"

আঃ। দৃষ্টি দ্বারাই দর্শক আপনার অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হ'ন, অতএব যাহাতে তোমরাও মৃত্যুর উপকারিতা দেখিতে পাও আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে দাও। হে জ্ঞানানুরাগী বন্ধুগণ! তোমরা কি দেখিতে পাও না, যে জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর আত্মা পাপ মুক্ত হইয়াছে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই বন্ধু রাজ্যপদ ঐশ্বর্য্য উপাধি সকল বিষয়েই ত্যাগ স্বীকার করিয়া কষ্ট সহ্য করেন। এই সকল বিষয়ের জন্যই মানুষ সংসারে জীবন কাম্য বিবেচনা করে আর তিনি জ্ঞানলাভার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর দুঃখ ভার বহন করেন। সে দুঃখভার মোচনের মৃত্যু ব্যতীত আর কাহার ক্ষমতা-সাধ্য? যিনি কোন সুখই উপভোগ করেন না তাঁহার আর জীবনের স্পৃহা কোথায়? যে মৃত্যুতেই তাঁহার শান্তি তাহা হইতে পলায়ন করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যে যোগ্য না হইয়াও দার্শনিক নাম গ্রহণ করে সে অত্যন্ত অন্যায় করে। যে মনে করে এই সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য বিলাসের মধ্য দিয়া জ্ঞানের পথ বিস্তৃত সে নিতান্ত মূঢ়জন। তোমরা কি চাহিতে পার যে তোমরা আহার পান আমোদ প্রমোদ ইত্যাদিতে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানীর আনন্দ লাভ করিবে?"

শিঃ। "আমাদের সেরূপ বাসনাও নাই আমরা তাহা অন্বেষণও করি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এ পৃথিবীর প্রতি আসক্ত ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি প্রকারে আমরা "জ্ঞানী" আখ্যা লাভের দুরাশা করিতে পারি? আমরা দেখিতে পাই যে, যখন অতিরিক্ত পানাহার বা কাম ক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতি ন্যায়বুদ্ধির বিরোধী বিষয়ে চিত্তের আগ্রহ প্রকাশ পায় তখনই আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অন্য পক্ষে যদি ঐ সকল ভাব দ্বারা আমাদের চিত্ত পরিচালিত না হয় তাহা হইলে শোণিত মাত্র প্রধাবিতমান দেহে বুদ্ধিবৃত্তি কার্য্যকারী থাকে এতদ্ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি রক্ষার যখন অন্য উপায় নাই তখন আমরা কি প্রকারে তাহা আশা করিতে পারি?"

ক্রমশঃ

বিদেশে রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক।

[শ্রীমান্ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মার্কিন দেশে প্রবাসকালে কোন আত্মীয়কে একখানি চিঠি লিখেন তাহা সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চিঠিতে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে সাধারণের অবিদিত কতকগুলি কথা আছে। পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে বলিয়া তাহা প্রকাশিত হইল।—ভাংসং]

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থিতিকালে রামমোহন রায়কে যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রবাসে চিনিতেন তাঁহাদের নিকট মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বিস্মিত ও

প্রীত হইয়াছি। যাহা শুনিয়াছি ভাবিয়া দেখিলে তাহা হইতে বড় সুন্দর রূপে একটি শিক্ষা লাভ করা যায়। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপনা কিছুকাল হইতে উন্নতপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটি আদর্শ কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর শেষ সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে ও এই সময়ের মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "মানুষ মানুষের ভাই" এই ভাবটি যেন মহৎ প্রকৃতিকে আপনা হইতে নমিত করিয়া বশীভূত করিয়াছে। এই ভাবটির ধারণাই যেন মহত্বের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু খাঁটি সোনায় যেমন গহনাপত্র গড়া হয় না বা সাধারণ্যে প্রচলিত রাজ মুদ্রাও হয় না—কতকটা খাদ দিবার আবশ্যক হয়, তেমনই নিছক বিশুদ্ধ ভাবও পৃথিবীতে চলে না—আপনা হইতেই যেন কিছু খাদ আসিয়া পড়ে। মানুষের জাতিব্যাপী ভ্রাতৃভাবও এই সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। লোকে বলে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব স্থাপন কর। ভ্রাতৃভাব কি মানুষের ইচ্ছাধীন—ইহা যে আমাদের প্রকৃতিগত সত্য। পরমেশ্বর মানুষকে মানুষের ভাই করিয়া গড়িয়াছেন এবং অবিভাজ্য ঈশ্বর প্রত্যেকের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে চিনিলেই মানুষের ভ্রাতৃভাব অনুভব করা যায়। তাই আমাদের পক্ষে "ভ্রাতৃভাব স্থাপন কর" ইহা বিধি না হইয়া, বিধি হওয়া উচিত যে, "ঈশ্বর দত্ত ভ্রাতৃভাব উপভোগ কর।" ভ্রাতৃভাবের জন্য মানুষকে কুঁদাইয়া লইতে হইবে না—কেবল ঈশ্বরে সকল মানুষের একত্ব অনুভব করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সন্তান রামমোহন রায়ের ইহুদি ও খৃষ্টানের মধ্যে সস্নেহ সম্মান দেখিয়া ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

লণ্ডনে মিসেস্ গ্রে—র বাড়ীতে আহারান্তে সন্ধ্যা যাপনের জন্য একদিন আমার নিমন্ত্রণ হয়। গৃহস্বামিনী একজন খ্যাতনামা লেখিকা। সেখানে যথারীতিতে একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদি ভদ্রলোক মিষ্টার লে—র সহিত পরিচিত হই। তিনি আমাকে পূর্ব্ব দেশীলোক দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার একজন স্বদেশীয়লোক আমার পিতার পরমবন্ধু ছিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি একজন অসাধারণ আশ্চর্য্য-লোক ছিলেন।"

নাম জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁহার পিতা ও অপরাপর বন্ধুগণ রামমোহন রায়ের ইহুদি ধর্ম্মের জ্ঞান ও গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কথা শেষ করিবার সময় ভদ্র লোকটি বলিলেন, "মহাশয়, রামমোহনকে আমার পিতা কেবল পূজা করিতে বাকী রাখিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরও আমার পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার নাম করিতেন। রাজা একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। সে রকম লোক আমি আর কখনও দেখি নাই।"

মিসেস্ রো—সে—নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলার সহিত লণ্ডনে আমার পরিচয়

হয়। এদেশে বয়স গণনার রীতি অনুসারে তিনি এখন বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। প্রচলিত পদ্ধতিমত ইনি একজন খ্যাতিপন্ন রমণী, লণ্ডনের কএকখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পিতৃভবনে ইনি রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন। রাজা অনেকবার ইঁহার পিতার নিমন্ত্রণে ডিনারে উপস্থিত থাকিতেন।

এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজা কি ডিনারের সময় আহারে যোগ দিতেন?"

তিনি উত্তর করিলেন, "না, আহারে ঠিক যোগ দিতেন না। তবে আহারের সময় টেবিলে আসিয়া বসিতেন। এবং ঈশ্বরের নামে রুটি নিবেদন করিয়া ভাঙ্গিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিতেন।"

রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার পিতৃ-পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। কখনও কখনও রাজা বন্ধুর বাড়ী আসিয়া কৌচের উপর শয়ন করিতেন এবং এই মহিলাকে ডাকিয়া গান গাহিতে বলিতেন। ইনি তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। আর এই বালিকার ছাই ভস্ম গান শুনিতে শুনিতে রাজা নিদ্রা সেবা করিতেন।

অপরাপর ছোট ছোট কথার কণা সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই। ফল কথাটা আমার মনের উপর দাঁড়াইয়াছে এই যে, লোকে জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ হইয়া রামমোহন রায়কে স্নেহ ও সম্মান করিত। আমার বোধ হয় এরূপ স্নেহ ও সম্মান-আকর্ষণী শক্তি রাজার বিদ্যা বুদ্ধিজনিত নহে, ইহার উৎপত্তি স্থান রামমোহনের সত্যনিষ্ঠতা। খৃষ্টের কথা ঠিক যে, সত্যই মানুষের সান্ত্বনাদাতা।

তবে আর একটা কথা বলিতে হইবে। কবি রোড়ন্ নোয়েল আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা কাউণ্টেস্ অফ্ গেন্স্‌বরা রামমোহন রায়ের একটী সুন্দর মার্বেল মূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। উহা এখন তাঁহার কোন বংশীয়ানের নিকট আছে। আমি এটা দেখি নাই। মৃত্যুর পর রামমোহন রায়ের মাথার একটা ছাঁচ তোলা হয়, তাহা এখন নিউইয়র্কে আছে—ইহা আমি দেখিয়াছি।

বষ্টনে আসিয়া দেখিলাম, একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম সুপরিচিত। এক বংশ পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের মুখ্য নেতৃবর্গ রামমোহন রায়ের প্রশংসাশীল বন্ধু ছিলেন। চ্যানিং, ওয়েস, টাকারমান প্রভৃতির সহিত রাজার প্রত্যক্ষভাবে বা অপরের মধ্যবর্ত্তিতা অবলম্বন করিয়া চিঠি পত্র চলিত। একটি প্রকাশ্য ভোজে মিঃ হেল—(ইনি বষ্টনের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার) রামমোহন রায়ের আরও কয়েক জন বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলি আমার মনে নাই।

টাকারমান রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডে যান—মনে রাখিতে হইবে, যে কালের কথা হইতেছে, তখন কলের জাহাজের সৃষ্টি হয় নাই। এবং

রামমোহন রায়ের সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, "ঈশ্বর ধন্য, তিনি এই মানুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইলেন !"

রামমোহন রায়ের রচিত "Precepts of Jesus" এবং Appeals to the Christian Public"—এই গ্রন্থগুলির এক সংস্করণ বষ্টন নগরে ছাপা হইয়াছে দেখিয়াছি।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ও প্রীতিকর একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা এখনও বলি নাই। মিসনারী এডামের নাম আমাদের দেশে অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরের মিসনারীসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে রামমোহন রায়ের সঙ্গ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্র্যাত্মক ঈশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এজন্য সহযোগী পাদ্রীরা তাঁহাকে Second Father Adam উপাধি দেন। ইয়ুরোপে আসিবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মাননীয় ৺ রাখালদাস হালদার মহাশয় এডামের একটি বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে ছাপাইয়াছিলেন।

এডামের বিধবা পত্নী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসরের অধিক কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি এখনও অক্ষুণ্ণ। বৃদ্ধা দুইটি কন্যা লইয়া বষ্টনের সন্নিকটে জেমেকা প্লেন নামক একটি পল্লীতে বাস করেন। বষ্টন হইতে ইঁহাদের বাড়ী রেলে ১৫ মিনিটের পথ।

আমার পরিচিত পাদ্রী ড—য়ের নিকট আমার সম্বাদ পাইয়া বৃদ্ধা আমাকে দেখা করিতে আমন্ত্রণ করেন। আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আদেশ রক্ষা করিলাম।

মিসেস্ এডামের দুইটি কন্যাই ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনে হইতে লাগিল যেন কালের চক্র বিপরীত গতিতে চলিতেছে। বৃদ্ধা অবশ্য রাজা রামমোহনকে চিনিতেন। এডাম্ সপরিবারে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া সারকুলার রোডের দক্ষিণ অংশে বাস করেন। এই রাস্তার অন্য দিকে রাজা নিজের বাগানবাটিতে থাকিতেন। এই বাগান বাটিতে স্কীস্ ষ্ট্রীটের থানা ছিল দেখিয়া আসিয়াছি। আমার বিবেচনায় এই বাটি ক্রয় করিয়া একটি সাধারণ মন্দির করা উচিত। মিসেস্ এডামের কাছে শুনিলাম কি অবস্থায় রাজা একটি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার রাজারাম রায় নামকরণ করেন। মিষ্টার ডিগবি নামক একজন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী এই অনাথ বালকটিকে মানুষ করিতেন। একদিন রাজা ডিগবির সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, কিন্তু এ অনাথ বালকটিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল। দুই বন্ধুতে কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বালক ঘরে ঢুকিয়া দুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সস্নেহে রাজার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

মিষ্টার এডাম রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ রাধাপ্রসাদ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধার সহিত রাধাপ্রসাদের বিশেষ কথা-বার্ত্তা হয় নাই কিন্তু প্রতিদিন পড়িতে আসিবার

ও পড়া শেষ করিয়া যাইবার সময় ইহাঁর সহিত তাঁহার দেখা হইত। একদিন রাজা আসিয়া এডাম ও তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, "রাধাপ্রসাদের মাতার মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু রমাপ্রসাদের মাতা এখনও জীবিত।" কথাটা ইহাঁদের নিকট একটা হেঁয়ালির মত বোধ হওয়ায় ইহারা রাজাকে সমস্যা পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে বুঝিলেন যে, রাজাকে শৈশবে তাঁহার পিতা তিনটি বিবাহ দেন। রামমোহন রায়ের তৃতীয় স্ত্রীর কথা তাঁহার বংশীয়ানদিগের বাহিরে যে কেহ জানে—এই আমি প্রথম শুনিলাম। তবে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ সহোদর ভাই। কিন্তু ইহাদের মাতা ভিন্ন এ কথার অর্থ বোধ হয় এই যে, রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রীকেই রমাপ্রসাদ মা বলিয়া জানিতেন—তাঁহার গর্ভধারিণীকে চিনিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর, বহুকাল পরে রমাপ্রসাদ অবগত হন যে তাঁহার যথার্থ গর্ভধারিণী কে। এ কথা বাটিতে শুনিয়াছিলাম।

মিসেস্ এডাম বলেন, তাঁহার স্বামী ও রামমোহন রায় উভয়ে মিলিয়া গ্রীক ভাষা হইতে খৃষ্টীয়ানদিগের নূতন ধর্ম্মপুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে উভয়েরই জীবন শেষ হইয়াছিল।

রাজা বিলাতে আসিবার সময় ইহাদিগেকে বলিয়াছিলেন যে আমরণ তিনি আর দেশে ফিরিবেন না এবং ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাইবারও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিসেস্ এডামের প্রত্যাশা ছিল যে এ দেশে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু অনতিবিলম্বে রাজার মৃত্যু হওয়ায় সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই।

রামমোহন রায় খৃষ্টীয়ান কি না জানিবার জন্য বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম এলরিয়্যানিং এডামকে পুনঃ পুনঃ চিঠি লেখেন। অবশেষে এডাম রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ প্রশ্নের কি উত্তর করিবেন। রাজা ইহাতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতীব সুন্দর, "আপনি আমার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কিরূপ তাহা জানেন এবং জীবনে কিরূপ ব্যবহার কার্য্য করি তাহাও জানেন—ইহাতে যদি আমি খৃষ্টীয়ান হই তবে আমি খৃষ্টীয়ান।"

মিসেস্ এডামের পিতা পাদ্রীগ্রাণ্ট শ্রীরামপুরে ফেরি মার্শমান প্রভৃতির সহযোগী ছিলেন। ইনি পিতা মাতার সহিত অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে যান। শ্রীরামপুরে প্রথম বাঙ্গালীর খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা তাঁহার পরিষ্কাররূপ স্মরণ হয়। তাহার নাম কৃষ্ণ, সে জাতিতে তাঁতী।

একটি সতীদাহও মিসেস্ এডাম চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। সে সময় ইংরেজরাজ্যে এই নৃশংস প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল তাই এ কুসংস্কার রাক্ষসের নিকট বলি দিবার জন্য দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে যাইতে হইত। মিসেস্ এডাম ও তাঁহার মাতা গঙ্গা তীরে উপস্থিত। অপর পার হইতে একখানি নৌকা করিয়া বাদ্য বাজানা লইয়া কতকগুলি লোক আসিতেছিল। দেখিয়া মনে হয় কোন উৎসব উপলক্ষে যাত্রী আসিতেছে।

নৌকা কূলে লাগিল। কিন্তু আরোহীদিগের মুখে উৎসবোচিত হর্ষ নাই—সকলই বিষণ্ণ সকলই মলিন। সর্ব্বশেষে নৌকা হইতে একটি ক্ষীণা তরুণী নামিল। তাহার পর? তাহার পর ও হরি হরি! কোথায় উৎসব—আর কোথায় চিতা সজ্জা। তরুণী গঙ্গায় স্নান করিয়া মৃত পতির সহিত চিতারোহণ করিল। গ্রাণ্টপত্নী এই লোম হর্ষণ ব্যাপারে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িলাম। একটু পরে মিসেস্ এডাম বেগম সমরুর দরবারের কথা তুলিলেন। বেগমের সহিত একদিন তিনি হাজিরা খাইতে গিয়া দেখেন যে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা দুয়ারের বাহিরে জুতা রাখিয়া টুপী মাথায় দিয়া বেগম সাহেবের নিকট হাজির হইলেন! এ কথা এখন কেহ বিশ্বাস করা সুকঠিন।

বলা বাহুল্য বৃদ্ধা ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিনিতেন। বেলগাছিয়া বাগানে তাঁহারা অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সে বিষয়ে অনেক কথা শুনিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে চিড়িয়াখানা দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিলেন। বৃদ্ধা বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন কি না প্রসঙ্গক্রমে এ কথা উঠিলে তিনি আমাদের চিরপরিচিত

"মশায়, মশায় তোমার প'ড়ো হাজির।
এক দণ্ড ছেড়ে দাও জল খেয়ে আসি॥"

ইত্যাদি আওড়াইলেন। ইঁহার বাঙ্গালা উচ্চারণ বিশুদ্ধ, কথার অতি যৎসামান্য টান। বাঙ্গালা এ পরিবারের সকলেই জানিতেন কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর অনভ্যাসে এখন কথা কহিতে অক্ষম। হাঁসের ছবিওয়ালা একটা আমাদের দেশীয় কাগজচাপা দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন,

"হাঁসগুলা বালির উপর দৌড়ে দৌড়ে যায়।"

আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম। ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিতও এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ইঁহাদের সহিত অনেকবার আহারাদি করিয়াছিলেন আরও অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, সকলেরই এক সুর—যাহা ছিল তাহা নাই।

কাল কৃষক। আমরা শালী ফসল। পূর্ব্ব কৃতীগণকে কাল গত বৎসরের ফসলের ন্যায় কাটিয়া যে গোলায় জমা করিয়াছে, সেখানে মানুষের চক্ষু যায় না।

সন্ধ্যারম্ভে আমি ভাবিতে ভাবিতে রেলের ষ্টেশনে ফিরিলাম,

All flesh is as grass
And all the glory of man
as the flower of grass
The grass withereth, and the
flower thereof falleth away

But th word of the Lord
nduretb for ever.

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং, প্র তিদিনং যাতিক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুর্ন্নদিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্ মাং শরণাগতং শরণদত্বং রক্ষরক্ষাধুণা ॥
সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায় ॥

বষ্টন, মাসাচুসেট্স্,
আমেরিকা,
১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৭ সাল।

কলিকাতা আক্রমণ।

পাঠক! প্রবন্ধের শীর্ষদেশ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিবেন না। বর্ত্তমান প্রাসাদময়ী নগরীর সঙ্গে এই প্রবন্ধের কোন সংস্রব নাই। আমাদের সম্বন্ধ অতীতের সঙ্গে, যাহা বলিতেছি, তাহা অতীতের কথা।

বাঙ্গলার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর পুত্রাদি জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহার সহোদর হাজির তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। * আলিবর্দ্দির কন্যাগুলিকে নওয়াজিস্, ও জৈনউদ্দিন নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বিবাহ করেন। এই জৈনউদ্দিনের দুই সন্তান জন্মে—তাহার মধ্যে মির্জ্জা মহম্মদ জ্যেষ্ঠ। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত করেন ও অপরটি নওয়াজিস্ মহম্মদ কর্তৃক মনোনীত হয়। সেরাজ উদ্দৌলার পূর্ণ নাম, "মনসুর উল্-মুলুকসেরাজ উদ্দৌলা সাহকুলী খাঁ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর।"

---

* সুবিধার জন্য আমরা বংশাবলার ক্ষুদ্র তালিকা করিয়া দিলাম।
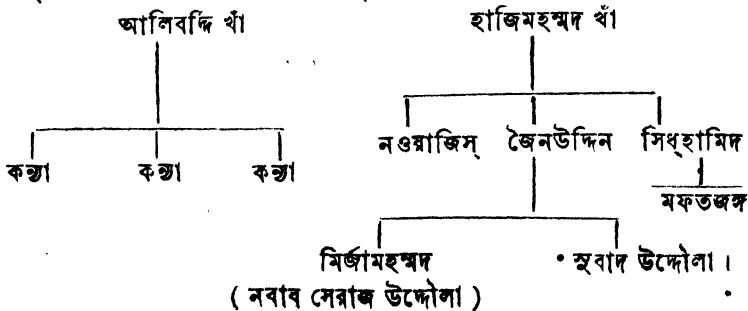
কলিকাতা আক্রমণ সম্বন্ধে সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আলিবর্দ্দির সময়ের কয়েকটি ঘটনার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক।

আলিবর্দ্দি খাঁ যে বৎসর বেহারের সুবাদারী পান, সেই বৎসর মির্জ্জামহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। দৌহিত্রের জন্মকে তাঁহার নূতন শ্রীবৃদ্ধির কারণ মনে করিয়া, তিনি তাহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিবার মানস করেন।

বড় লোকের ঘরের ছেলে আদর পাইলে ও আবদারে হইলে যেরূপ কুফল ফলিতে পারে এক্ষেত্রে তাহাই হইল। মাতামহের নিকট যেটা তিনি সহজে পাইতেন না, মাতামহীর নিকট তাহা অনায়াসে লভ্য হইয়া উঠিত। মায়াবৃদ্ধির সহিত সেরাজ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠিলেন। মুরশীদাবাদের সমস্ত প্রধান প্রধান বদমায়েস তাঁহার সঙ্গী হইয়া উঠিল।

স্বীয় পদ-মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া ক্ষীনমতি যুবক, মুরশীদাবাদের পথে পথে তাঁহার মনোমত সঙ্গীদের লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সম্ভ্রান্তলোকদিগকে পথে ঘাটে পাইলে অসম্মান প্রদর্শন করিতেন। বৃদ্ধ নবাবের কানে এ সমস্ত কথা উঠিলেও তিনি তাহার কোন প্রতিবিধান করিতেন না। সেরাজের সুন্দর মুখ খানি দেখিয়া স্বীয় অসীম স্নেহবশে সমস্তই উপেক্ষা করিতেন।

আলিবর্দ্দির নিকট ক্রমাগত প্রশ্রয় পাওয়াতে সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক মির্জ্জামহম্মদ এতদূর দুর্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠিল যে তাহাতে তাঁহার খুল্লতাত তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। নওয়াজিস্ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন—তাঁহার অগাধ ধন সম্পত্তি ছিল—সৈন্যদলেরও অভাব ছিল না। আলিবর্দ্দি এই সময়ে তাহাদের বিরক্তিভাব উপলব্ধি করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া একটা মহা গোলোযোগ বাধিবে।

নওয়াজিস্ এই সময়ে মুরশীদাবাদে ছিলেন। ঢাকায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হোসেন কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দি ভাবিতেছিলেন, বর্দ্ধিতপ্রতাপ নওয়াজিস্ ও তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দক্ষিণহস্তস্বরূপ হোসেন কুলী খাঁকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত না করিতে পারিলে, তাঁহার উত্তরাধিকারীর পক্ষে সিংহাসন অধিকার করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

মির্জ্জামহম্মদও এই সকল বিষয় সহজে বুঝিতে পারিলেন। আর কিছু পারুন আর নাই পারুন এই পর্য্যন্ত বুঝিলেন—নওয়াজিস ও তাঁহার কর্ম্মচারিরা তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বার্থের বিশেষ প্রতিযোগী। তিনি অনন্যোপায় হইয়া—বোধ হয় মাতামহের সম্মতি ক্রমে ঢাকায় একদল গুণ্ডা পাঠাইয়া মুরশীদ্ কুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিলেন। এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের কথা নওয়াজিসের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক প্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সে বিদ্রোহ নিবারণ করিতে আলিবর্দ্দীকে বিশেষ

কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। তিনি সহজেই তাঁহাকে বুঝাইলেন এ কার্য্যে তাঁহারও সেরাজের কোন হাত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রকার ঘটনার কয়েকদিন পরেই—একটু গোলমাল থামিয়া গেলেই সেরাজ পুনরায় হত্যাকারী নিয়োগে মুরশীদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে হোসেন কুলী খাঁকে নিহত করেন।

নওয়াজিস্—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রকাশ্যরূপে আলিবর্দ্দীর বিদ্রোহী হইতে সাহসী না হইলেও স্বীয় সৈন্য বৃদ্ধি ও কোষাগার পরিপূর্ণ করণে ব্যস্ত রহিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মিদ্ হামিদ্ এতদিন পৃথক ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন এখন দুই ভাইয়ে সমান স্বার্থে একত্রিত হইলেন। প্রকাশ্য বিদ্রোহের কোন আয়োজন না করিয়া সন্দিগ্ধ অবস্থাতেই তাঁহারা আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত রহিলেন। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ১৭৫৬ অব্দে দুই ভ্রাতাই জ্বর রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নওয়াজিস অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহায় বিধবা তাঁহার এক পালিত শিশুর জন্য সিংহাসনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এদিকে আবার পুর্ণিয়ার নবাব সফতজঙ্গ সুযোগ অপেক্ষা করিয়া সেনাবল বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

হোসেন কুলীখাঁর মৃত্যুর পর—রায় রাইয়াঁ রাজবল্লভ ঢাকার গবর্ণরের সহকারিত্বপদ লাভ করেন। নওয়াজিসের মৃত্যুর পরও ঢাকা সরকারে তাঁহার ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। সেরাজ—কয়েকটী বিশেষ কারণে রাজা রাজবল্লভের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রথম কারণ এই—তাঁহার নিজ ঘরে যে তহশীল ছিল—তাহার দস্তুর মত আদায় উসুল হইলেও নবাব সরকারে রাজস্ব স্বরূপ অতি অল্পই আসিত। ক্রমাগত নানা কারণে বাকী পড়াতে নবাব তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া হিসাব নিকাশ আদেশ করেন। সে আদেশ পালন করিতেও রাজা রাজবল্লভ কাল বিলম্ব করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ এই—সেরাজের পরমাত্মীয় নওয়াজিস মহম্মদ খাঁর এক বিধবা পত্নী ছিল। নওয়াজিস পত্নী সেরাজের পুজনীয় ও গুরুতর সম্পর্কের লোক। জনশ্রুতি এরূপ কথা প্রচার করিল যে রাজা রাজবল্লভ নওয়াজিস পত্নীর সহিত অযথা প্রণয়ে নিবদ্ধ। উষ্ণরক্ত উগ্রপ্রকৃতি ক্রুদ্ধস্বভাব অসংযতপ্রতাপ যুবক নবাব কুলকলঙ্ককাহিনী কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি আটক করিয়া হিসাব নিকাশের আদেশ হইল। *

এই প্রকার অসম্ভাবিত বিপৎপাতে অনন্যোপায় হইয়া রাজা বাহাদুর বহুমূল্য ধনরত্নাদি বাছিয়া দিয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে তীর্থপর্য্যটন ছলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

---

* বান্ধবের কোন লেখক এই কথাই বলিয়াছেন।

আলিবর্দ্দি এই সময়ে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু দস্তুর মত চিকিৎসা চলিলেও তাঁহার আরোগ্য লাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। রাজবল্লভ উপস্থিতমতে আবশ্যক বোধে কাশিমবাজার কুঠীর বড় সাহেব ওয়াট্‌ সাহেবকে দিয়া এক পত্র লেখাইয়া দিলেন যেন কৃষ্ণদাস জগন্নাথ যাত্রার পথে নিরাপদে সপরিবারে কলিকাতায় দিন কতক বিশ্রাম করিতে পান। এই সময়ে নওয়াজিসের বিধবা ও সমস্ত ধন সম্পত্তি সমেত "মতি ঝিলের" প্রাসাদে সরিয়া পড়িলেন। কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবের মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মাইল যে নওয়াজিস পত্নী সিংহাসন লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইবেন। সুতরাং কলিকাতা কৌন্সিলকে পত্র দিতে তিনি কোন প্রকার সঙ্কুচিত হইলেন না। কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব এই সময়ে স্বাস্থ্যের অনুরোধে বালেশ্বরে গিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতা কৌন্সিল এই পত্র পাইয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদানে অগ্রসর হইলেন।

প্রাচীন কলিকাতায় এই সময়ে উমিচাঁদ নামক এক বিস্তৃত বাণিজ্যশালী বণিক বাস করিতেন। ধনের জন্য উমিচাঁদ কলিকাতায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। সেই দীর্ঘশ্মশ্রুল মহাজন * চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত বাণিজ্য দ্রব্য সরবরাহ কার্য্যে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রাপ্তে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কলিকাতার মধ্যে সে কালে তাঁহার মত বড়বাড়ী খুব কম দেশীয় লোকেরই ছিল। সিপাহীসান্ত্রিরও অভাব ছিল না। সেকালে ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, বিষয় বুদ্ধি যাহা থাকিলে লোকে বড়লোক হয়—তাহা তাঁহার সবই ছিল। বাঙ্গালা বিহারের সকল স্থানে তাঁহার বাণিজ্য চলিত নবাব সরকারেও প্রভুত্ব কম ছিল না। কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে অনেক সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিরা তাঁহার সহায়তায় তাহা মিটাইয়া লইতেন।

কলিকাতায় এই সময়ে কাপড়ের ব্যবসাটাই বেশী প্রবল ছিল। উমিচাঁদ এতকাল এই ব্যবসায়ে এক চেটিয়া স্বত্ত লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামে ও কতকটা তাঁহার ধনলোলুপতায় তাঁহার দ্রব্যাদির দর এত বাড়িয়া উঠিল যে ইংরেজ কোম্পানি তত চড়া দরে জিনিষ পত্র চালান দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা নিজে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আড়ঙ্গে পাঠাইলেন। ইহাতে উমিচাঁদ ইংরাজের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজবল্লভ কৃষ্ণদাসের সুবিধামত আশ্রয় লাভের জন্য উমিচাঁদকে এক পত্র দিয়াছিলেন। উমিচাঁদ মহা সমাদরে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু মুরশীদাবাদে এই কথাটা বড় ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। সেরাজ উদ্দৌলা যখন শুনিলেন

---

* একটি—প্রবাদ ছিল—সেকালে এই তিনটি জিনিসকে লোকে বড় ভয় করিত।
জগৎ শেঠের কড়ি (অর্থ)
উমিচাঁদের দাড়ি
গোবিন্দরামের ছড়ি (লাঠী)

যে ইংরাজের অধিকারে কৃষ্ণদাস আশ্রয় লাভ করিলেন তখন তিনি মুমূর্ষু শয্যাশায়ী আলিবর্দ্দির নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

এই সময়ে কাশিমবাজার কুঠীর Forth নামক এক চিকিৎসক নবাবের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি তাঁহাকে ইংরাজদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি সৈন্যবল সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব যখন বুঝাইয়া বলিলেন—বাণিজ্য ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন অভিসন্ধি নাই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন তখন সেই রুগ্নশয্যাশায়ী নবাব কতকটা প্রশমিত চিত্ত হইয়া এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা হইতে কিয়ৎকালের জন্য অবসর লইলেন।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রেল বাঙ্গলার প্রতাপান্বিত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কবরে শুইলেন। মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আলিবর্দ্দি তাঁহার মুমূর্ষু শয্যাপার্শ্বে মির্জ্জা মহম্মদকে বসাইয়া ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে হস্ত মর্ষণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "বৎস? সকলই রহিল, ইহ জীবনের সাধ আমার ফুরাইয়াছে আমি বাঙ্গলা শাসন করিয়া প্রবীন হইয়া কবরে শুইতে চলিলাম। তুমি তরুণ প্রকৃতি যুবক—দুইটি কথা তোমায় বিশেষ রূপে বলিয়া যাই, মানিয়া চলিও, এ বৃদ্ধের এই মৃত্যু শয্যায় এই পবিত্র অনুরোধ স্মরণ করিয়া কার্য্য করিও তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না। আমার প্রথম অনুরোধ "তুমি দেশ মধ্যে ইয়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইতে দিবে না। আমার রাজ্যে তিনটি ইয়ুরোপীয় ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইতেছে ইহাদের তিনটিকেই একত্রে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিও না। ইহাদের মধ্যে ইংরাজ জাতির ক্ষমতাই কিছু অধিক—প্রথমতঃ তাহাদের বশীভূত করিবে তাহা হইলে অপর গুলির জন্য তোমার বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। ইংরাজদিগকে বাঙ্গালায় দুর্গ নির্ম্মাণ, কিম্বা সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে দিও না।"

বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ—প্রথম প্রথম ইংরাজদের উপর সদয় ছিলেন। ইংরাজ বণিকের সহিত বাণিজ্যে তাঁহার কোষাগারের অনেক শূন্য অংশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বলা যায় না কি কারণে ইংরাজ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বমত সহসা এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। *

* আলিবর্দ্দির মস্তফা খাঁ বলিয়া একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। মস্তফা এক সময়ে আলিবর্দ্দিকে ইংরাজদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য উত্তেজিত করেন কিন্তু তদুত্তরে বিজ্ঞ আলিবর্দ্দী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত তাঁহার মুমূর্ষু শয্যায় উপদেশবাক্যগুলির তুলনায় শেষোক্তটির সম্বন্ধে আমাদের একটু বিস্ময় উপস্থিত হয়। মস্তাফাকে লক্ষ্য করিয়া সেই বৃদ্ধ নবাব উত্তর করিয়াছিলেন "দেখ! তুমি সৈনিক পুরুষ, সময়েই তোমার আনন্দ তরবারি তোমার উপজীবিকা, কিন্তু ইংরাজেরা আমার কি করিয়াছে যে আমি তাহাদের উচ্ছেদ করিব? নিকটবর্ত্তী ঐ তিন ক্ষেত্রে অগ্নি প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ অনিষ্টই হইতে পারে। ইংরাজের সহিত বিবাদে জলে যে অগ্নি জ্বলিবে তাহা নির্ব্বাণ করা অতীব দুঃসাধ্য কার্য্য।"

সেরাজ সিংহাসনাধিকারের অব্যবহিত পরেই নওয়াজিস্ পত্নীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলেন। মসনদে বসিবার দুই দিন পরে তিনি কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন "যেন সম্পত্তি সহিত কৃষ্ণদাসকে মুরশীদাবাদে ফিরিয়া পাঠান হয়।"

গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ রাম রাম সিংহের ভ্রাতা এই পত্র লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। এই ব্যক্তি দৌত্য কার্য্যে বিশেষ চতুরতা দেখাইবার জন্য সামান্য ফেরি-ওয়ালার ছদ্মবেশে কলিকাতায় দেখা দিল। উমিচাঁদের বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে তাহাকে লইয়া কৌন্সিলের সদস্য ও পুলিস বিভাগের কর্ত্তা হলওয়েল সাহেবের কাছে পরিচিত করিয়া দিলেন। অধ্যক্ষ তখন অনুপস্থিত সুতরাং সেদিন নবাবের দূতকে গ্রহণ করিবার সম্বন্ধে সমস্ত কথা স্থির হইতে পারে না এই ভাবিয়া মন্ত্রী সভা অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন।

পরদিন অধ্যক্ষ ফিরিয়া আসিলে মন্ত্রণা সভা আহূত হইল। সভায় স্থির হইল এ সব উমিচাঁদের চক্র। সেইই পাকচক্র করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এরূপ করি-য়াছে। সকলেই একমত হইলেন যে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে দূতকে নবাবের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হইবে না। কোম্পানীর কর্ম্মচারিরা জানিতেন সেরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে নওয়াজিস্পত্নী সিংহাসন সহজে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহারা এক সাবধানতা সূচক পত্র কাশিমবাজারের কুঠীতে লিখিয়া নবাব দূতকে অপমান করিয়া কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

দরবারে যখন এই কথা উঠিল যে ইংরাজ অধ্যক্ষ কলিকাতা হইতে অপমান করিয়া দূতকে তাড়াইয়া দিয়াছেন—তখন নূতন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কোনরূপ বিরাগ বা অপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিলেন না। কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্ সাহেবের উকীল যখন নবাবকে কেবল সন্দেহে এইরূপ করা হইয়াছে—এই কথা বুঝাইয়া দিল তখনও তিনি কোনরূপ উত্তেজিত ভাব বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে ইয়ুরোপে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কুঠীর অধ্যক্ষেরা এই সংবাদে উদ্বেলিত চিত্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। দুর্গ নূতন করিয়া নির্ম্মাণের কোন অবকাশ নাই সুতরাং সংস্করণেই অধিকাংশ মনোযোগ আকর্ষিত হইল।

এই সময়ে আলিবর্দ্দির বিধবা পত্নী স্বীয় কন্যাকে নানারূপ প্রবোধে ভুলাইয়া সেরাজের প্রতিযোগিতা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অবসর পাইয়া সেরাজ তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া সিধ্ হামিদের পুত্র সফতজঙ্গের বিরুদ্ধে পুর্ণিয়ায় যাত্রা করিলেন।

এই যাত্রামুখে নবাব ইংরাজের দুর্গ সংস্কার সম্বন্ধে সংবাদ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"শুনা যাইতেছে যে, আপনারা

দুর্গের চারি দিকে পরিখা খনন করিতেছেন, আপনারা যাহা কিছু করিয়াছেন, সমস্তই ভাঙ্গিয়া দিবেন।”

ড্রেক সাহেব উত্তর পাঠাইলেন, “যাহারা নবাবের নিকট ইংরাজের দুর্গনির্ম্মাণ বার্ত্তা গোচর করিয়াছে, তাহারা মিথ্যা রটনা করিয়াছে—মার্হাট্টাদিগের আক্রমণের পর হইতে তাঁহারা কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে আর কোন খাত খনন করেন নাই। তখন যাহা কিছু করা হইয়াছিল, তাহাতে ভূতপূর্ব্ব নবাব সাহেবের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। গত বারে ইউরোপে যুদ্ধ বাধাতে ফরাসিরা অতর্কিতরূপে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছিল, সেই আশঙ্কায় এবার তাঁহারা কেবলমাত্র দুর্গের দুই এক স্থানে কামান সম্বন্ধে দুই একটা সংস্করণ করিতেছেন।”

১৭ই মে রাজমহলে নবারের নিকট এই পত্র পৌঁছিল। তিনি ইহা পাঠ করিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ণিয়ার দিক হইতে ফিরিয়া একদল সৈন্য কাশিমবাজার আক্রমণে নিযুক্ত করিলেন। ২২এ জুন তারিখে এই সৈন্য অগ্রগামী হইয়া কাশিমবাজার লুঠ করিল। ১লা জুন নবাব সেরাজউদ্দৌলা নিজে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন।

কাশিমবাজারে উপস্থিত হইয়াই, নবাব কুঠীর-অধ্যক্ষ ওয়াট সাহেবকে ডাকাইলেন। রাজবল্লভ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আপনাদের কোন ভয় নাই”, ইহার পর ডাক্তার ফর্থ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি নবারের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রাজবল্লভ তাঁহাদিগকে নবাবের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। নবাব তাঁহাদের রুক্ষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এক শিবির মধ্যে পাঠাইলেন। এখানে নবাবের কর্ম্মচারিরা লিখিবার উপকরণ লইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই মর্ম্মে একখানি দলিল প্রস্তুত হইল যে, পত্রপ্রাপ্তির তারিখ হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে কলিকাতা অধ্যক্ষ যাহা কিছু সংস্কার করিয়াছেন, তাহা সমভূমি করিয়া দিবেন। নবাবের যে সমস্ত প্রজা কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাদের নবাবের হস্তে দিবেন। এবং নবাবের অজ্ঞাতসারে ও অসম্মতিতে যে সকল লোককে বাণিজ্যসম্বন্ধে দস্তক দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে।” এই-খানিতে ওয়াট্ ও তাহার আর দুইজন সহযোগী স্বাক্ষর করিলেন।

কাশিমবাজার ধ্বংশ করিয়া, ওয়াট্ কলেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে সঙ্গে লইয়া নবাব কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। কেহই তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। কেবলমাত্র জগৎ শেঠ, মাতাব চাঁদ দুই চারি কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধচিত্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

গান।

খাম্বাজ—একতালা।

(কেন এত ফুল তুলিলি সজনি।)

সরস বসন্তে হরষে গাঁথিয়ে
পর লো সুন্দরি মালতী-মালা,
রাধা-সুরে ওই বাঁশরী সাধিয়ে
এসেছে নিকুঞ্জে দেখ না কালা,
প্রেম-যমুনায় বহিছে উজান,
প্রাণভোরে বাঁশী গায় প্রেম-গান,
প্রেমের জোছনা
খেলিছে দেখনা,
যমুনা-পুলিন করিয়ে আলা!
ওই যে বহিছে মলয়পবন,
শিহরে আবেশে তনু, প্রাণ, মন,
কুসুমে কুসুমে,
মত্ত অলি চুমে,
নিবারি অধরে পিয়াসা জ্বালা!
তোমারো নবীন যৌবনের ফুল,
ফোটে ফোটে, হৃদি করিয়ে আকুল,
অলি শ্যামরায়,
পরশিতে চায়,
ঢাল সুধা তায়, হাসিয়ে বালা!
ফিরায়ো না তায়, কাঁদায়ে বালা!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

নববর্ষের স্বপ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজকালকার কালেজের নব্য বাঙ্গালী আমি। আর্য্যামিবর্জ্জিত নহি, অথচ ব্যবহারে অনেকগুলি অনার্য্য ভাব। বাল্যবিবাহ ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন "থিওরি" নাই, "প্র্যাকৃটিসে" এই ঘটিয়াছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণের উদ্যোগে ভগিনীর বিবাহ খুব সকাল সকাল সমাধা হইয়াছে—তাহাতে আমি কোন বাধা দিই নাই, কিন্তু নিজেকে এ পর্য্যন্ত বহুযত্নে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হইতে দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি, এটী আমার কালেজী অনার্য্য শিক্ষার ফল হইবে বোধ হয়। আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রম্ভালাপে তাঁহার প্রণয়িনীর অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বিবাহিতজীবনের সুখই শ্রেষ্ঠসুখ, উদাহরণস্বরূপ তাঁহার নিজের দাম্পত্যজীবনের কতকগুলি চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। যথাযোগ্য গাম্ভীর্য্য সহকারে তাঁহার বিশ্রম্ভালাপে মনোনিবেশ করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহার পন্থানুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। এমনো দেখিয়াছি কোন কোন সুহৃদ্বর চাঁদের আলোতে

অদৃষ্টপূর্ব্বা প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে কবিতা আওড়াইয়া হাহুতাশ করিয়া শেলি বাই-রণের অন্ন মারার উপক্রম করিতেছেন—তাঁহাদের দলে ভিড়িতেও কখন সাধ যায় নাই। কবিতা পড়িয়াছি ঢের, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জীবনে কাব্যরসের চর্চ্চাটা আমার দ্বারা হইয়া উঠিল না। আমার কোন সুরসিকা আত্মীয়া একদিন প্রেম ও প্রেমিকাখ্য মূর্খাগ্রগণ্য সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বল রসিকতার প্রয়াসে হাড়ে চটিয়া উঠিয়া প্রতিশোধস্পৃহাদীপ্ত ডাগর উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বলতর করিয়া বলিলেন "হে বিদ্রূপবাগীশ! দর্পহারী কন্দর্প আছেন, আছেন; তোমার ঐ বিদ্রূপের শোধ তিনি একদিন তুলিবেন; এখন তুমি নিরাময় রহিয়াছ কিন্তু তোমার পাকা হাড়ে যখন রোগ ধরিবে তখন আর কিছুতেই সে বিষ ঝাড়িতে পারিবে না। মা দুর্গা করুণ আমি যেন সে দিন দেখিয়া মরিতে পারি।"

আমি বলিলাম "তা হবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কবি ভবভূতি বলেছে

'ভ্রমতিভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনং
ললিতমধুরাস্তেতে ভাবাঃ ক্ষিপন্তি চ ধীরতাং'

মায়াকুমারীরাও গেয়েছে

'গরব সব হায়, কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে'

তা আমার কপালেও একদিন নাকের জলে চোখের জলে চোবানি আছে বোধ হয়, মনসিজ হে! কেউ বাদ যাবে না। (Sotto voce—শর্ম্মা ছাড়া।)"

আশা করিয়াছিলাম এমন সবিনয় সম্মতিবাক্যে ঠাকুরাণীর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি অনেকটা শীতল হইয়া আসিবে, কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তিনি শুধু একটি ভাবব্যঞ্জক গ্রীবাভঙ্গী করিয়া ঈষৎ চাপাহাসির স্বরে বলিলেন "যাও যাও আর চালাকী কর্ত্তে হবে না।"

আমার ন্যায় অপ্রেমিকেরা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কারণ সেই নাস্তিক আমি কিছু দিন পরেই স্বচ্ছন্দে অপ্রেমগর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া, একটা কাঁচা রোম্যাণ্টিক ষোড়শ বর্ষীয় বালকের ন্যায় নববর্ষের প্রভাতে স্বপ্নে দেখিলাম আমার একটী প্রণয়িনী; উভয়ের মন জানিয়া উভয়ের বিস্মিত সলাজ ভাব, মৌনভাবে পরস্পরের হাতে হাত রাখিয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব প্রশান্ত আনন্দের সঞ্চার। অনুভবে বুঝিলাম প্রেমে পড়া জিনিষটা ভারি সহজ, সরল, অবাধ; এবং একটী বহু পুরাতন সত্য আজ সহসা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাল,—সেটী এই, যে ব্যক্তপ্রেমের প্রথম মুহূর্ত্ত নিরতিশয় মধুর,—মনোরাজ্যে আমার এই আবিষ্কার জড়রাজ্যে কলম্বসের আবিষ্কারের অপেক্ষাও গুরুতর।

বিছানা হইতে উঠিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, নির্ম্মল শুভ্র আকাশ। দেখিলাম পুষ্করিণীর ঘাটে একজন যুবক দ্বারবান্ স্নানান্তে

সিক্তবসনে গায়ত্রী পাঠ করিতেছে। পূর্ব্বেও তাহার গায়ত্রী পাঠ শুনিয়াছি কিন্তু আর কখন তাহা এমন ভাবে মন স্পর্শ করে নাই। আজ নববর্ষেরর প্রভাতে তাহার বন্দনা গানে মন প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। একবার আকাশে চাহিয়া দেখিলাম—আমরা ধরায় যে মানবীকে ভালবাসি তাহাতেই ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাই আমার আকাশের দেবতা ও সবে মাত্র স্বপ্নানুভূতা হৃদয়ের দেবীকে এক মনে হইল, উভয়ের সমান প্রসন্ন, প্রশান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। বেড়াইতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ বেড়াইতে বেড়াইতে, বাগানের প্রান্তে উদ্যানপালকের কুটীরের নিকট আসিয়া পড়িলাম। তাহার সন্তানহীনা পত্নী গৃহপোষ্য জীবের উপর দিয়া তাহার ক্ষুধিত মাতৃস্নেহের চর্চ্চা করে। কুটীরের নিকটস্থ হইবা মাত্র দুইটী কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, একটি বিড়াল বহু কষ্টে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া, আমার পায়ে দুই একবার মাথা ঘসিল, আমার আর দুইটি বন্ধু—দুটি অনুদ্ভিন্নশৃঙ্গ গোবৎস তাঁহাদের অনতিদীর্ঘ দড়ির বন্ধন ছিঁড়িয়া আমার নিকট আসিবার চেষ্টা করিলেন। আমি পার্শ্বস্থ ডুমুর বৃক্ষের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের দিলাম, অদূরে দুই ক্রীড়াশীল ছাগশিশু তাহাদের মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কচি কচি দাঁত দিয়া সেই ডালের উপর দুই একবার আক্রমণ করিল।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উদ্যানপালিকা ভগবতী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত কেবল পুরোহিত আসিলেই হয়। কুটীরের ভিতর পাড়ার অনেকগুলি অপগোণ্ড বালককে সমবেত দেখিলাম। স্মরণ হইল আজ নূতন বর্ষারম্ভে মালীবধূর নূতন পাত্রে পায়সান্ন রাঁধিবার কথা, বুঝিলাম তাই এতগুলি অনাহূত অতিথি সমাগম। আজ প্রত্যূষে তাহার গৃহে দাদাবাবুর পদধূলিলাভে মালীবধূর আনন্দাতিশয্য ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম, এবং উক্ত দাদাবাবুর অপ্রতিভ ভাবের কথা বলাই বাহুল্য। আজ পৃথিবী বেশ। এই উদারহৃদয়া উদ্যানপালিকা, এই স্নেহশীল পশুগণ, সেই স্বপ্ন দৃষ্টা বালিকা, আর এই অসীম আকাশব্যাপী দেবতা সকলেই আজ আমার নিতান্ত আপনার।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় ব্যজন করিতে করিতে ভগিনী বলিল "দাদা বিয়ে কর না ভাই, এমন ফাঁকা ঘর দুয়োর, ঘরে বৌ নেই, কচি ছেলে নেই, মা কত কাঁদাকাটা করে, লক্ষ্মী ভাই বিয়ে কর।" মনে মনে বলিলাম "করিব," প্রকাশ্যে বলিলাম "পাত্রী কোথায়?" "পাত্রী ঢের আছে, তোমার পছন্দ হলেই হয়।"

আমি কিছু বলিলাম না, নীরবে আহার ও চিন্তা করিতে লাগিলাম। "এতদিন পরে আজ সহসা বিবাহে মানস কেন? স্বপ্নে প্রণয়িণী দেখিয়াছি বলিয়া? মানিলাম আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে একদিন আমার প্রতি প্রণয়বতী হইবে। একদিন উভয়ের প্রেম জানিয়া উভয়ে স্বর্গ সুখ পাইব—সব সই। কিন্তু তারপর?

তারপর প্রেমের সে মধুর বন্ধন জীবনের কঠোর বন্ধনে পরিণত হইতে কত দিন? ফুল অতি সুন্দর, অতি সুগন্ধি, তাহাকে মালা করিয়া গলায় পর, কিছুক্ষণের জন্য অতুল প্রীতি পাইবে। কিন্তু সে মাহেন্দ্রক্ষণ কি ক্ষীণপরমায়ু, তাহার ভীষণ উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই সেই ফুলে মলিনতা ও গন্ধহীনতা এবং সেই ফুলের প্রতি বিরাগ লইয়া আসিবে। স্বপ্নে প্রণয়িনী ভাল, জীবনে প্রণয়িনী হয়ত আরও ভাল, যদি নাকি সে জীবন স্বপ্নেরই মত সংক্ষেপ ও সুমধুর হয়। প্রেমিকবর! প্রেমের লোভে বিবাহ করিবে, প্রেম পালাইবে, বাকী থাকিবে কি? দীর্ঘ জীবন ধরিয়া ঘরকন্না; ঝগড়া ও ভাব, অশ্রুজল ও মানভঞ্জন; বঁটনা বাঁটিতে গিয়া গৃহিণীর আঙ্গুলছ্যাচা এবং মৎকর্ত্তৃক তাহাতে আর্ণিকালেপন; স্বামীদেবের কালো আল-পাকার চাপকানে বোতামসংযোজনরূপ আর্য্যনারীব্রতে তাঁহাকে নিষ্ফল ব্রতী-করণ প্রয়াস এবং আফিসের বেলাবেলি একটুখানি উদরান্নের জন্য অনেকখানি বৃথা হাহুতাশ। না বাপু বিবাহ করা আমার কাজ নয়।"

চিন্তা ফুরাইল, আহারও শেষ হইল। প্রভা ভারি বুদ্ধিমতী, বোধ হয় আমার চিন্তার প্রণালীটা কতকটা আঁচিয়াছিল, আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল আর কিছু বলিল না। অন্তঃপুরে আসিলেই বিবাহের জন্য আমার উপর অন্যান্য আত্মীয়াদের পীড়ন চলিত, প্রভাই শুধু আমার মন জানিয়া মাঝে মাঝে মৃদু আবদারের ভাবে মাত্র সে কথা পাড়িত।

আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দক্ষিণমুখীকক্ষে ঢালা বিছানায় আশ্রয় লইলাম। খোলা জানালা দিয়া ঈষৎ তপ্ত বায়ু আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। আমি অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বাটীর সম্মুখস্থ ছোট রাস্তা দিয়া মানুষের গতিবিধি দেখিতেছি। দেখিতেছি প্রাচীরের বাহিরে বৃহৎ দীর্ঘিকায় বালকদের অবিরাম দাপাদাপি, বধূবর্গের সমান যত্নের সহিত গাত্র ও বাসন মার্জ্জন, এবং পুরুষদের বালক ও বধূবর্গে অলক্ষিত স্নানসম্বন্ধে একরূপ গম্ভীর প্র্যাকৃটিক্যাল ভাব। আমার হাতে একখানা ফরাসীস্ কবিতাপুস্তক খোলা রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহাতেও মনোনিবেশ করিতেছি। বিবাহ নাই করিলাম, প্রেমের স্বাদ জানিতে ক্ষতি কি? উহার জমাট জটিল রহস্যের মধ্যে একবার বুদ্ধি ছুরিখানা প্রেরণ করিয়া, সবটা ঘাঁটিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া জিনিসটাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্কের সাধ্য নয় ও অতলস্পর্শের তল পাওয়া, হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থের সন্ধান থাকে ত তাহাকে পাঠাও—সেটাই কিছু শক্ত কথা।

এমনি ভাবে পাঠে, চিন্তায় ও দিবাস্বপ্নে বেলাটা এক রকম কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে উঠিলাম। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে, বাতাসে চতুর্দ্দিক হইতে গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। প্রাচীরের বাহিরেই একদল চাষা গাহিতেছে,—

সই তোরে বল্‌ব কি, রসের গৌর হেরেছি,
হেরে পাগল হয়েছি।
আবার সুরধুনীর তীরে গৌর দাঁইড়ে পেলাম দেকা
কূল যায় না রাখা, গৌর বাঁকা, রসে মাখা মাখা।

রাধিকা ঠাকুরাণী সুরধুনীর তীরে গৌরের দর্শন পাইয়া পাগল হইয়াছিলেন, গানের ভাবখানা এতদূর বেশ পরিষ্কার; কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতা সহরের গোটাকত চাষা ভাঙ্গা গলায় সপ্তমে চেঁচাইতে চেষ্টা করিয়া পাড়াপড়শীকে কেন পাগল করিয়া তুলিবে গানের এ অংশের অর্থটা তাদৃশ পরিষ্কার নয়।

আর একদল গাহিতেছে—

মদনমোহন বাঁধা দিয়ে তালুক মুলুক যায়
হায়! হায়!
এম্‌নি দলপতি ইনি আমাদের রামপ্রসাদ ঠাকুর
হায়! হায়রে মজা! হায়রে হায়!!!

আর কিছু না হউক, মদনমোহন বাঁধা রাখিয়া তালুক মুলুক ঘুরিতে যাওয়ায় রামপ্রসাদ ঠাকুরের আইডিয়ার ওরিজিন্যালিটি প্রকাশ পাইতেছে বটে। আবার ঐ শোন! দীঘির ধারে বসিয়া কৃষ্ণকুণ্ডের বংশধরটী ক্ল্যারিওনেটে তাঁহার সমস্ত হৃদয়াবেগ ঢালিয়া দিতেছেন। বেসুরো সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাতাসে ভাসিয়া না জানি কোন্ বিরহিণীর কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিতেছে। আর একটু বেশী রাত্রে যখন আমার প্রতিবেশীদের ঐকতান সঙ্গীতের বিরাম হইল, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম-চেয়ারে উপবেশন করিলাম; আমরা চারিটি সঙ্গী পরস্পরকে সঙ্গদান করিতেছিলাম। আমি, আমার চিন্তা, আমার গলার বেলফুলের মালা ও সপ্তমীর চাঁদ।

এইরূপে ত নববর্ষ কাটিল। প্রভাতে যে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়াছিলাম তাহার বেশ রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। কিন্তু তাহার পর দিন উঠিয়া পূর্ব্বদিনের গদ্গদভাব স্মরণ করিয়া আপনার নিকট আপনি লজ্জিত হইলাম। আর দুই একদিনে অনভ্যস্ত সেণ্টিমেণ্ট্যালিটি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পুনরায় নীরস গদ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থ, খাড়া হইয়া উঠিলাম। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করিতে হইল, আমার বিশ্বাস নববর্ষের স্বপ্ন আমার বিদ্রূপশীল স্বভাবকে বেশ একটুখানি ঝাঁকা দিয়া আমায় খানিক কাহিল করিয়া গিয়াছিল, জমি কতক নরম হইয়া অঙ্কুরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা না হইলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিবার আর ত কোন কারণ দেখিতে পাই না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাস কতক কাটিয়া গিয়াছে। স্বপ্নের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। স্বপ্নাভিভূত হইবার অবসরও অতি অল্প। সাম্‌নেই পরীক্ষার দিন। এখন কেবল স্তূপাকৃত আইন পুস্তকের সহিত দিন রাত্রি সহবাস ; "অষ্টিন্‌স্ জুরিস্ প্রুডেন্স" "মেন্‌স্ হিন্দু ল", ইহারাই আজ কাল প্রাণের দোসর হইয়া উঠিয়াছে. ফরাসীস্ কবিতাপুস্তকের স্মৃতি এখন বহুদূরে। একদিন সমস্ত দিন পড়িয়া পড়িয়া নিতান্ত শ্রান্তি বোধ হওয়াতে বিকালের দিকে সকাল সকাল বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টাকতক গোলদীঘির ধারে বন্ধুবর্গ এবং খোলাবাতাসের হাতে নিজেকে ছাড়ান দিয়া সন্ধ্যার সময় একটুখানি তাজা মাথা লইয়া বাড়ী ফিরা গেল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে না উঠিতে একটি কারণে বড় বিস্মিত হইলাম। উপর হইতে হারমোনিয়মের আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। আমার কনিষ্ঠটীর কিছু কিছু গান বাজনার সখ আছে, মাসিকপত্রের সঙ্গীত স্বরলিপি অধ্যয়ন করিয়া সুর আদায়ের চেষ্টাটা তাঁহার প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ভায়ার হাতে ডোয়ারকিন্‌সনের হারমোণি ফ্লুট এমন মিষ্ট বলে না। নিশ্চিত বুঝিলাম এ নির্ম্মলের বাজান নহে। উপরে না উঠিয়া নীচে দাঁড়াইয়া একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপরে কে আসিয়াছে ?" চাকর বলিল, "ও বাড়ীর বড় বউদিদি ঠাকুরুণ।"

"আর কেউ নয় ?"

"তাঁর সঙ্গে আর একটি মেয়ে আছেন, বোধ করি, তাঁর খুড়তুতো বোন হবেন।"

আমিও ভাবিলাম তাহাই সম্ভব বটে। শুনিয়াছিলাম, বৌদিদির খুড়ামহাশয় কিছু একাল-ঘেঁষা, লোক লোকাচারের ততটা এক্তার রাখেন না, নিজের কন্যাদের ভাল রকম লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, এমন কি ঘরে ওস্তাদ্ রাখিয়া তাঁহাদের সঙ্গীতবিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন। এই ভাবিতে ভাবিতে আমি উপরে উঠিতেছি, এমন সময় আমাদের গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া গানের শব্দ উত্থিত হইল। গলা ভারি মিঠে, খানিকটা দাঁড়াইয়া মনোযোগ দিয়া গানের কথাগুলি শুনিলাম।

"সুখে আছি, সুখে আছি,
সখা আপন মনে
কিছু চেও না, দূরে যেও না
শুধু চেয়ে দেখ,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।
সখা নয়নে শুধু জানাবে প্রেম
নীরবে দিবে প্রাণ

রচিয়া ললিত মধুর বাণী
আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া, কুসুম গাঁথিয়া
রেখে যাবে মালাগাছি
মন চেও না, শুধু চেয়ে দেখ,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।”

এ গান পূর্ব্বেই কেতাবে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আজ দেখিলাম, কেতাবে গান পড়া এক, আর নারীকণ্ঠে তাহা শুনা এক। আজ এই বালিকার কণ্ঠে এই গানটি যেন নূতন প্রাণ পাইল। তাহার যন্ত্রের সঙ্গত, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী এবং গানের কথা সবে মিলিয়া নিবিড় করিয়া গানের ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিল। গান শুনিয়া মনে মনে একটু হাস্য-রসেরও উদয় হইল। আমাদের স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ হইল। জানিলাম, এই মর্ত্ত্যধামে আমরা কতকটা আবশ্যক, বেশী নহি; আমাদের আত্মোৎসর্গ সুন্দর, আমরা অসুন্দর; পুরুষ জাতির আত্মাভিমান ইহাতে তুষ্ট হউক আর না হউক, ইহা সত্য যে সুন্দরীগণের জীবনের মাধুরীর হিল্লোলের মাঝে আমাদের অন্যায় আব্দারের এক একটা ঢেউ আসিয়া বড় রসভঙ্গ করিয়া দেয়।

যে ঘরে গান হইতেছিল, তাহার পাশেই আমার পাঠগৃহ। আমি এতক্ষণ আমার গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া গান শুনিতেছিলাম। গান শেষ হইলে গৃহে প্রবেশকালে মা আমার পদশব্দ পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, “কিরণ্ তোর মাথাধরাটা কি সেরেছে?” আমি অপ্রতিভ হইয়া চৌকাঠের এ পাশে দাঁড়াইয়া বলিলাম, “হ্যাঁ সেরে গেছে।”

মা বলিলেন, “বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ঘরে আয় না, ও বাড়ীর বড় বৌমা এয়েছেন, তোর সঙ্গে দেখা হল না বলে দুঃখু কর্‌ছিলেন।” মায়ের কথা শেষ হইতে না হইতে বউদিদি ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, “ঠাকুরপো, তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না।” তখন আমাকে অগত্যা গৃহে প্রবেশ করিতে হইল। এক ঘর লোক,—মা, প্রভা, দুটি একটি প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, বউদিদির দু তিনটি ছোট ছেলে মেয়ে, তিনি এবং তাঁর পাশে একটি তের চৌদ্দ বৎসরের তন্বী বালিকা,—তিনিই বৌদিদির খুড়তুতো বোন চারুশীলা,—নাম পরে শুনিয়াছিলাম। আমার মনে হইল যেন তিনি আমাকে দেখিয়া লজ্জায় একটুখানি সঙ্কুচিত হইলেন। আমি তাই আরও দ্বিগুণ অপ্রতিভ হইয়া বৌদিদির সহিত দুটো একটা কথা কহিয়াই চম্পট দিলাম। একেবারে একতালায় নামিয়া আসিয়া একখানা বই খুলিয়া পড়িতে বসিলাম। দেখিলাম, ভুল বই আনিয়াছি, কিন্তু আবার উপরে গিয়া ঠিক বইখানা আনিতে প্রবৃত্তি হইল না, মনে হইল, আবার হয় ত সকলে আমার পদশব্দ শুনিতে পাইবেন, আবার ধরা পড়িব। কিছু

ক্ষণ পরে খুব নীরব বোধ হওয়াতে নির্ম্মলকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ্ ত বৌদিদিরা চলে গেছেন কি না।" সে আসিয়া বলিল, "না এখনও যান নি, তাঁরা বাড়ীভিতর জলখেতে গেছেন।" জানিলাম এখন তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে উপরে যাইতে পারি। জলযোগ করিয়া এই পথ দিয়া তাঁহাদের নীচে নামিবার সম্ভাবনা স্মরণ করিয়া আমি গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পড়িতে বসিলাম। খানিক পরে অনেকের পায়ের শব্দ পাইলাম। ভাবিলাম, বৌদিদিরা বোধ হয় গমনোন্মুখ। তাহা নয়, পাশের ঘরে সে শব্দ নিবৃত্ত হইল। আবার গান চলিতে লাগিল। এবার গান শুনিলাম।

"কিছুই ত হোল না
সেই সব সেই সব
সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু-বারিধারা
হৃদয় বেদনা।"

আমার আইন পড়া অসম্ভব দাঁড়াইল। প্রথমটা ভারি বিস্মিত হইলাম। চকিতে যে সেই ক্ষীণ, মাধুর্য্যপূর্ণ দেহলতা দেখিয়াছিলাম তাহারই ভিতর এতখানি প্রাণ? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সুখ কানায় কানায় ভরিয়াছিল, গায়িকার ও শ্রোতার হৃদয়ময় উছলিয়া পড়িতেছিল, আর এরি মধ্যে এত হৃদয়ভেদী নৈরাশ্য, এমন জীবনমন্থন করা তীব্র যাতনা কোন্ উৎস হইতে ঝরিতে লাগিল? কি অপরূপ শিল্পী!

ক্রমে এই গানটি আমাকে পাইতে লাগিল; গান শুনিতে শুনিতে আমার নিজের মনে ভারি একটা চঞ্চলতা উপস্থিত হইল; একটা কোন্ অজ্ঞাত, অপরিচিত দুঃখসম্ভাবনায় হৃদয় পীড়িত, উদাস, বিহ্বল হইতে লাগিল। আমি টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। সাম্‌নেই উদ্যান,—জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। সেই জ্যোৎস্নাবিস্তারের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। নববর্ষের স্বপ্নের কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে প্রেমে পড়ার সহজতা স্মৃতিপথে উদয় হইল; নদীতীরে দাঁড়াইয়া জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান অতিক্রম যেমন সহজ—একটী ঝাঁপের প্রতীক্ষা মাত্র—আমি মনে মনে কল্পনায় সেই ঝাঁপের সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও যেন আমার ভালবাসার প্রবৃত্তি এই বালিকাটীতে লিপ্ত হইতে লাগিল। আবার একটা গান শুনিতে পাইলাম—

"নীরব রজনী অতি মগ্ন জোছনায়
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও।"

আমারই মনের কথা—কি ধীরে,কি সুমিষ্টরূপে,প্রেমভাবের মত করিয়া গাহিয়া বলিল।

আমি জানালার উপর হাত রাখিয়া, তাহার উপর মাথা নামাইয়া কপাল ন্যস্ত করিলাম। এইরূপভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, বাহির হইতে দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তাড়াতাড়ি মুখেচোখে স্বাভাবিক প্রশান্ততার ভাব ফিরাইয়া আনিয়া নিঃশব্দে টেবিলের সম্মুখে পুনরুপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে? কি চাই?" বাহির হইতে প্রভা বলিল, "দাদা আমি, দরজা খোল, দরকার আছে।"

আমি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌদিদিরা এখনো যাননি? অনেক ত রাত হয়েছে।" প্রভা বলিল, "গেছেন, এই আমি তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌ছি, তোমার ঘরের সাম্‌নে দিয়ে সবাই গেলুম, পায়ের শব্দ পাওনি? খুব ত একমনে পড়্‌ছিলে?"

আমার অপরাধী চিত্ত সন্দেহ করিল, প্রভার শেষ কথাটায় যেন একটু গুপ্ত বিদ্রূপ নিহিত ছিল। "সে যাহোক্ তুই কি চাস্?"

"কিছু না, এই তোমার সঙ্গে একটু গল্প কর্ত্তে এলুম; তুমি বোসো দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল গল্প জমে না;—দাদা চারুশীলাকে লাগ্‌লো কেমন? পছন্দ হয় না? কেমন গান শুন্‌লে বলদিকিন?"

প্রভার প্রশ্নের স্বরে ও ধরণে আমার বড় সন্দেহ হইল, আমি খুব শুষ্কস্বরে বলিলাম "মন্দ নয়, তোর এই বুঝি দরকার? যা যা এখন আমার গল্প জমাবার সময় নয়, দেখ্‌ছিস্‌নে এখন চার আইনের পাঁচ ধারা নিয়ে কিরকম বিব্রত হয়ে পড়েছি?"

"তাহলে তোমার সঙ্গে চারুশীলার সম্বন্ধ করি?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিন্তু চট্ করিয়া সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলাম "তুই খেপেছিস নাকি? কোথাও কিছু নেই যার তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ!"

"না দাদা আমি খেপিনি, পয়লা বোশেখের দিন তোমারই দুটো একটা খ্যাপবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। আমি তোমার পরমহিতৈষী সেই পর্য্যন্ত তোমার রোগের ঔষুধের সন্ধানে আছি। বোধ হচ্চে এতদিনে ভাগ্যিক্রমে ঠিক বড়িটি মিলেছে, এখন তোমাকে গলাধঃকরণ করাতে পার্‌লেই হয়।

আমি প্রভার নারীসুলভ তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তিতে পরম বিস্মিত হইলাম, তাহার সেই দিনকার নীরব হাসির অর্থ এতক্ষণে বুঝিলাম, মনে মনে মহা অপ্রতিভ হইলাম কিন্তু মুখে ভারি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলাম "আজ যে বৌদিদির বোন এসেছিলেন সে তবে আমাকে না বলে কয়ে তাঁকে কনে দেখাতে আনা হয়েছিল? আমি কক্ষণো বিয়ে কর্‌বনা"

প্রভা তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া সমান সপ্রতিভ ভাবে বলিল "চারুশীলাকে কনে দেখাতে আনা হয় নি, ওর বাপমারা কনে দেখাতে আমাদের বাড়ী মেয়ে পাঠাবে না; আমার চারুকে অনেকদিন ধরে দেখবার ইচ্ছে ছিল, আর চারুর গানের বড় খ্যাতি শুনে-

ছিলুম, ওর মুখে গোটাকতক ভাল ভাল গান শোনবারও ইচ্ছে ছিল,তাই আমি বৌদিদিকে বলেছিলুম একদিন বেড়াতে বেড়াতে নিয়ে আস্‌তে,—আর সেই সঙ্গে তোমার হিতটাও যে একেবারেই মনে ছিল না তা নয়; সে যাহোকগে দাদা তুমি যে এই মাত্র বল্লে কক্ষণো বিয়ে কর্‌বে না, এ কথা আর যেন মুখে এনোনা, তাহলে সত্যচ্যুত হতে হবে যেহেতু তোমার আইবুড় থাকবার মতন লক্ষণ দেখাচ্ছে না।”

আমি একটা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে আমাকে বাধা দিয়া সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। দুটো একটা কথা স্ত্রীসুলভ অসমসাহসিকতায় আন্দাজে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল, এমন আভাষ দিল যে আমাকে বিবাহে লওয়ান মায়ের চোখের জল বা প্রভার অনুরোধের কর্ম্ম নয় বটে, কিন্তু আজ একটী মিষ্টি মুখ আর একটুখানি মিঠে আওয়াজে অনেকটা কাজ সাবার হইয়াছে, “তোমার চার আইনের পাঁচ ধারায় এ বিষয়ে কি বলে কেতাব ঘেঁটে দেখো এখন, আমি আপাততঃ চল্লুম, খুকী কাঁদ্‌ছে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার ভীরু অনুরাগ যদি বা এই চারু কুসুমে বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু প্রভার রহস্যবাক্যে তাহা সত্বর সম্পন্ন হইয়া গেল, বজ্রলেপে আমার অনুরাগ তাহাতে বদ্ধ হইল। ঠাকুরাণীর কথা ফলিল, আমার পাকা হাড়ে রোগ ধরিল, এবং রোগের সকল লক্ষণগুলিই আমাতে একে একে দেখা দিল;—সেই সনাতন ক্ষুধামান্দ্য ও শরীরের অবসাদ; সেই চেহারা লক্ষ্মীছাড়া ও মেজাজ খিট্‌খিটে। মনসিজের মৃদুশর হইতে কেহই মুক্ত নহেন বটে,—শর্ম্মাও নয়। এই সময় আমায় দেখিলে এবং আমার রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইলে ঠাকুরাণীর পরসুখদ্বেষিতা বিশেষ চরিতার্থতা লাভ করিতে এমন বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন বহুদূরে, পশ্চিমে—দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যোচিত তদ্গতচিত্ততার সহিত আফিস প্রত্যাগত বুড়া স্বামীর বিপুলপ্রাণীর তুষ্টির আয়োজনে বিব্রত।

প্রভার দুষ্টুমির অন্ত পাওয়া ভার। তাহার পরদিন হইতে কোন্ নূতন মতি পরিচালিত হইয়া হঠাৎ অত্যন্ত সংযত বাক্ হইয়া উঠিল। আর ভুলিয়াও চারুশীলার নাম উচ্চারণ করে না, বোধ হয় ফন্দিটা যে আমি নিজের গরজে আপনা হইতে তাহার সহিত সে কথা পাড়িব। আমি কিন্তু কোন কথা পাড়ি না, নিজের কাছেই ভাণ করিতে চেষ্টা করি যেন আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, যেন আমার জীবনের গতি আগে যেরূপ চলিতেছিল এখনও সেইরূপই চলিতেছে। কিন্তু নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ি যখন হঠাৎ অনুভব করি কি একটা গুরুভার মনের উপর

চাপিয়া আছে, তাহা সুখের ভার কি দুঃখের ভার বলিতে পারি না, জানি তাহা আমার নূতন হৃদয়সঙ্গী, নবানুরাগ। চারুকে আর একবার দেখিবার প্রবল সাধ হয়।

হপ্তাকতক পরে প্রভা একদিন আসিয়া বলিল "দাদা আমায় একদিন বৌদিদিদের বাড়ী পালটা যেতে হবে। কিন্তু ওঁর বাপের বাড়ী আগে আর কখন যাইনি, আমি একলা যেতে পার্‌ব না, তোমাকে আমায় সঙ্গে করে রেখে আস্‌তে হবে।"

এ বন্দোবস্তে যদি বা আমার আপত্তি থাকিত, তবু প্রভার সঙ্গে পারিয়া উঠিব না জানিতাম, তবুও একবার বলিলাম "আমার যাবার দরকার কি? নির্ম্মল তোর সঙ্গে যাক্ না?

"না সে হবে না, নির্ম্মল ছেলে মানুষ সে গিয়ে ত আর হেঁটে ফিরে আসতে পার্‌বে না, আর তাদের বাড়ীতে তার সমবয়সী ছেলেও নেই যে তাদের সঙ্গে বসে গল্প কর্‌বে, তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে এসো।"

প্রভার হুকুম না মানিয়া উপায় নাই, নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে গেলাম। বৌদিদিরা প্রস্তুত ছিলেন তাঁহাদের দ্বারে গাড়ী থামিবা মাত্র চারুশীলা গাড়ীর নিকটে আসিয়া প্রভার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া গেলেন। আমার হৃৎ-স্পন্দন দ্রুততর হইল। প্রভার কৌশলকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেকখানি সুখ লইয়া—এখন শুধু দেখায় যে আমার কত সুখ তোমাদের কিরূপে বুঝাইব?—গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইতেছিলাম, পূর্ব্ববন্দোবস্ত মত প্রভার জন্য চাকর রাখিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু বৌদিদি ইতিমধ্যে খবর পাইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমাকে এখন ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। নানাপ্রকার আলাপ আলোচনায় তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রভার সহিত একত্রে বাড়ী ফিরিলাম। আমি একবার ভাবিয়াছিলাম প্রভার সহিত গাড়ীতে মিছামিছি ঝগড়া করিব, তাহার দোষে ধরা পড়িয়া আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল, এতক্ষণ পড়া কামাই হইল ইত্যাদি বলিয়া মিথ্যা অসন্তোষ প্রকাশ করিব। কিন্তু পারিলাম না, আজ অভিনয়ে মন উঠিল না। যে সুখসঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলাম তাহারই উপভোগে গাড়ীতে মৌনভাবে কাটাইলাম, প্রভাও কোন কথা বলিল না।

আমাদের উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতার আজ এই সূত্রপাত হইল। তাহার পর প্রায়ই যাতায়াত চলিতে লাগিল। চারুশীলার ভ্রাতাদের সহিত আমার সম্প্রীতি জন্মিল, তাহার পিতার সহিত পরিচয় হইল। ক্রমে বৌদিদির সম্পর্কে চারুর সহিত নিঃসঙ্কোচ বাক্যালাপ করিবার মত ঘনিষ্ঠতাও জন্মিল। একটা সুবিধা এই হইয়াছিল যে আমার একজন বন্ধু একটী সদ্য বিলাতপ্রত্যাগত ছোকরা, বিপিন, তাঁহাদেরও বন্ধু। বিপিনের পিতা অঘোর বাবুর অতি প্রিয় সুহৃদ ছিলেন তাই বিপিনের তাঁহাদের গৃহে অসঙ্কোচ গতিবিধি ছিল। সে এক একদিন বৈকালে আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাকে তুলিয়া

লইয়া সেখানে যাইত। আমাদের আপনাপনির মধ্যে চারুশীলার কথা প্রায়ই হইত, বিপিন শতমুখে তাহার গুণগান করিত,, আমি সানন্দে তাহা শুনিতাম, আমার পৌরুষিক স্থূলবুদ্ধিতে কখন সন্দেহ করিতাম না তাহার গুণগান হয়ত আমারই মত অনুরাগের আধিক্য প্রসূত।

যথাকালে আমার পরীক্ষার দিন আসিল, পরীক্ষা দিয়া আসিলাম, পাশের সংবাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আর আমার লজ্জা কিম্বা দ্বিধা নাই, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি পাশের সংবাদ পাওয়ার পর বাড়ীতে চারুকে বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করিব, তখন তাহার পিতার নিকট রীতিমত প্রস্তাব করিয়া পাঠান হইবে। অঘোর বাবুর নিকট যে সে প্রস্তাব নিতান্ত অগ্রাহ্য হইবে না এরূপ আশা করার আমার আত্মম্ভরিতা ছাড়া আরও কতকগুলি সমূলক কারণ ছিল। আমার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে, আমাদের বনেদী ঘর, বিষয় আশয় যাহা আছে তাহাতে এখনও তিন পুরুষের অন্নসংস্থান হয়, ওকালতী আমার জীবিকার জন্য অত্যাবশ্যক নহে, অন্যরূপ কর্ত্তব্য বোধ হইতে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি;—কর্ম্মহীন, অলসজীবন অনেক মন্দ অভ্যাসের জনয়িত্রী, তাহার নিবারণের জন্যই আমার পেশাগ্রহণ।

এইখানে আমার একটা অদূরদর্শিতার কথা সকলের মনে উদয় হইবে। অঘোর বাবুর নিকট আমার প্রস্তাব যেন অগ্রাহ্য হইল না, কিন্তু চারুর নিকট যে তাহা গ্রাহ্য হইবে তাহা কেমন করিয়া জানিলাম? আশ্চর্য্য বটে; কিন্তু এমনি নিজের ভাবে ভোর হইয়াছিলাম যে, চারু যে আমার অনুরাগে সাড়া না দিতেও পারে এ কথা একবারের জন্যও মনে হয় নাই। চারুর হৃদয় যে আমি পাইব, ইহা যেন স্থির, শুধু অঘোর বাবুর সম্মতির প্রতীক্ষামাত্র। এরূপ বিশ্বাস কতটা আমার আত্মম্ভরিতা, কতটা আমার চিরন্তন বাঙ্গালীসংস্কারপ্রসূত ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাসের সুখে আমি নিজেকে একান্ত মগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।

পাশের খবর বাহির হইবার পূর্ব্বেই অঘোর বাবুকে আমার অভিলাষ জানান যাইতে পারিত, কিন্তু এই বিলম্বটুকু আমার একটা খেয়াল, এ যেন উপভোগরসকে একটু মজাইয়া মজাইয়া দ্বিগুণ সুস্বাদু করিবার বাসনা। কিন্তু ইতিমধ্যে কদিন হইতে প্রভার হঠাৎ মতান্তর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আর ততটা বৌদিদিদের বাড়ী যাইতে চাহে না, আমাকেও প্রকারান্তরে নিবারণ করে। দিনকতক পরে দেখিলাম আমাদের বাড়ীতে ঘটকীর ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ হইল। প্রভা একদিন আসিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, অমুক জায়গায় একটা বিশেষ ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছে, আমায় অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ করিতেই হইবে। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া, বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে চারুশীলাদের বাড়ী যাইলাম। প্রভা জানিল, কোথায় গিয়াছিলাম, তাহার পরদিন হইতে আরও বেশী রকম পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল। আমি অবশেষে এই নূতন রঙ্গে বিরক্ত,

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, রুক্ষস্বরে বলিলাম, "প্রভা আমাকে বারবার এক কথা বলে বিরক্ত কোরো না, আমি ওখানে বিয়ে কর্‌বো না।"

প্রভা দাঁড়াইয়াছিল, সহসা আমার পদতলে পড়িয়া কাতর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দাদা আমাকে মাপ কর ভাই, মাপ কর। তুমি যাকে চাও, আমি জানি, কিন্তু তাকে পাবে না, সেদিন সবে শুনলুম, সে আর একজনের বাগ্‌দত্তা।"

আমার গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল; আমি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সাধ্য হইল না যে, প্রভাকে উঠাই।

আমাকে এরূপ অস্বাভাবিক মৌন ও নিস্তব্ধ দেখিয়া সে দ্বিগুণ আকুলতার সহিত বলিতে লাগিল, "আমি কেন না জেনে শুনে এমন কাজ কর্‌তে গেলুম, কেন তাকে আমাদের বাড়ী আনিয়ে তোমায় দেখালুম, কেন তোমার মন তার প্রতি লওয়ালুম। আমি নিজে হাতে করে তোমায় বিষ দিয়েছি ভাই। আমার কি হবে!"

প্রভার কাতর অশ্রুপাতে আমারও চক্ষু শুষ্ক গেল না, প্রভার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, "তোর কিসের দোষ প্রভা, তুই মিছে কষ্ট পাসনে। একজন মানুষের অনুরাগ আর একজনে কখন লওয়াতে পারে? সবাই নিজের নিজের প্রবৃত্তির ফলভোগ করে, তার জন্যে আর কেউ দায়ী নয়। কিন্তু কি হয়েছে, কি শুনেছিস্ বল্, কেমন করে জানলি সে বাগ্‌দত্তা, এতদিনই বা জানা যায় নি কেন?"

প্রভা অনেকবার থামিয়া থামিয়া, চোখ মুছিয়া মুছিয়া বলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভা যাহা বলিল, তাহাতে জানিলাম, চারু বিপিনের বাগ্‌দত্তা। অঘোর বাবুর অনেক দিনেরই অভিলাষ, তাঁহার সুহৃদ্‌পুত্র বিপিনের সহিত চারুর বিবাহ দেন। বিপিনের পিতা জীবিত থাকিতেই বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু বিপিনকে ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠান হয়, তখন চারু নিতান্ত ছোট, অত অল্প বয়সে তাহার বিবাহ দিয়া রাখা, অঘোর বাবুর অনভিপ্রেত হওয়ায় এতদিন বিবাহ হয় নাই। কিন্তু বিপিনকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাখাও হয় নাই। কি জানি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কিরূপ মতিগতি হয়, পাছে তখন তাহার অনিচ্ছায় চারুর সহিত বিবাহ দিলে, সে বিবাহ উভয়েরই অসুখের কারণ হয়, এই বিচার করিয়া বিপিনকে শুধু পিতার অভিলাষ জানাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দেওয়া হইয়াছিল। আর কন্যার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা আলোচিতই হয় নাই, সে কথা কাহারও মনেই আসে নাই,—ইহা ধরা কথা, পিতা তাহার জন্য যে বর মনোনীত করিবেন, সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকেই গ্রহণ করিবে। তাই বিপিন প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ না হইলেও চারুশীলা বাগ্‌দত্তা হইয়াছিল। অর্থাৎ বিপিন যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায় তাহার তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে, বিপিন যদি না চায়, তখন তাহাকে পাত্রান্তরে ন্যস্ত করা হইবে। এরূপ বন্দোবস্তে কন্যাপক্ষের যে অনেকখানি হীনতা স্বীকার করা হইল, এরূপ অভিমান অঘোর বাবুর মনে উদয় হয় নাই। তাহার কারণ এ বন্দোবস্ত তাঁহারা দুজনে আপোষে করিয়াছিলেন। অঘোর বাবুর বাটির লোকেরাও এতদিন এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না। বিপিনের বিপরীত অভিপ্রায় দেখিলে তিনি এ কথা কখন প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু বিপিন আজ চার পাঁচ দিন হইল, অঘোর

বাবুর নিকট চারুশীলার হস্ত প্রার্থনা করিয়াছে। এখন তিনি তাই তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদিদির নিকট প্রভা এই সকল কথা শুনিয়াছে। সে আরও শুনিয়াছে, যে, বিপিনের প্রস্তাবে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে অঘোর বাবু চারুশীলার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বিবাহের দিন স্থির করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিপিন তাহাতে ভীত হইয়া বলিয়াছে, "আমার একটি অনুরোধ, চারুর নিজের মত আমাকে জান্‌তে দিন, আপনি অনুগ্রহ করে, চারুকে এবিষয়ে আপাততঃ কিছু বোল্‌বেন না, কেননা আপনার ইচ্ছা প্রকাশমাত্র সে হয় ত বাধ্য হয়ে আমায় গ্রহণ করবে। আমি চাই, সে নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করে, যদি তার মুখে শুনি, সে আমাকে চায় না, সেও ভাল, কিন্তু আপনার ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে যে সে আমায় গ্রহণ করে অসুখী হবে তা আমি চাই না।"

অঘোর বাবু বিপিনের কথায় ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছেন যে তাহার এত ভয় অমূলক, চারুর যে তাহাকে বিবাহ করিতে অমত হইবে, ইহা অসম্ভব। আর সে ছেলে মানুষ সে এ সবের কি জানে? তার এ বিষয়ে কোন মতামত থাকাই উচিত নয়, তিনি যে বরকে তাহার যোগ্য বিবেচনা করিয়া বিবাহ দিবেন তাহারই সহিত যে সে সুখে থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে বিপিনের যখন নিতান্ত ইচ্ছা তখন তিনি তাহার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবেন, চারুশীলাকে এ বিষয়ে এখন কিছু জানান হইবে না। বিপিনের সে বাড়ীতে ত অবারিত দ্বার, সে নিজে অবসর খুঁজিয়া চারুকে তাহার মনের ভাব জানাক, অঘোর বাবুর তাহাতে আপত্তি নাই।

আমরা কন্যার যে নির্ব্বাচনের স্বাধীনতাটুকু গণনার মধ্যে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিলাত প্রত্যাগত বিপিনের নিকট প্রণয়িনীর সেই স্বাধীন নির্ব্বাচনটুকুই সব চেয়ে মূল্যবান্। যাহা হউক অঘোর বাবু তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছেন, চারু বিপিনকে যাহাই বলুক বিপিনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির। প্রভার বিবরণ শুনিতে শুনিতে আমি মনে মনে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। রত্ন যখন হাত ছাড়া, তখন আরও বেশী বুঝিলাম এই রত্নের উপর কতখানি মন পড়িয়াছিল। যাহা হউক আমার এ কঠিন ব্যাধি, দ্রুত প্রতিবিধান আবশ্যক। বার বার দেখা সাক্ষাতে রোগ বৃদ্ধিই পাইবে উপশম হইবে না, তাই চারুর বিবাহের পূর্ব্বে আর কখন তাহাদের বাড়ী যাইবনা স্থির করিলাম। কিন্তু বিপিনের সহিত তাহার বিবাহ কি স্থির? অঘোর বাবু তো বলিয়াছেন স্থির, কিন্তু আমি বিপিনকে যতদূর জানি চারু যদি অনিচ্ছা দেখায় সে কখনও তাহার পিতার ইচ্ছার সুযোগ লইয়া তাহাকে জোর করিয়া বিবাহে প্রবৃত্ত করাইবে না। যদিই চারু বিপিনের ভালবাসার প্রতিদান দিতে না পারে? তাহা না পারুক আমার কর্ত্তব্য একই পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এতদিন আমি জানিতাম না এখন যখন জানিয়াছি, তখন আর বন্ধুর সহিত একক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দিতা অনুচিত। তবে যদি কোন দিন দুর্ভাগ্য বন্ধু প্রত্যাখ্যাত হইয়া রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করে তখন কি আমি তাহার ভূমিকা গ্রহণ করিব? তাহা পরে বিবেচ্য।

হপ্তাখানেক শুধু বিপিনের সহিত আমার দেখা হয় নাই। দুই এক দিন পরেই সে আসিল। আপনা হইতে চারুশীলার কথা পাড়িল, তাহাকে বিবাহের অভিলাষ ব্যক্ত করিল, অঘোর বাবুর সহিত তাহার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। আমি ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাহা না থাকিলে না জানি এই অতর্কিত বিশ্রম্ভকথায় কিরূপ আচম্‌কা নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া বিপিনকেও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতাম।

তাহার পর হইতে সে মাঝে মাঝে যখন তখন আমার নিকট আসিয়া, তাহার সুখ দুঃখ আশা নিরাশা ও ভীতির কাহিনী বলিত। আত্মগোপন আমার স্বভাবসিদ্ধ। আমি প্রশান্তভাবে বিপিনের সব কথা শুনিয়া যাইতাম, আবশ্যকস্থলে দুটো একটা অভিমতও ব্যক্ত করিতাম। বিপিন স্বপ্নেও মনে করিত না, আমি আর সে নির্লিপ্ত নিঃস্বার্থ শ্রোতা নহি।

আমি অঘোর বাবুর বাড়ী আর যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রহিল না, বিপিনই দুই চারিবার টানিয়া লইয়া গেল। আমি কোন ওজর করিতে পারিলাম না।

এইরূপে মাস কতক যায়। একদিন বিপিন আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া, প্রথম দুই একটা কথাবার্ত্তার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, "আমি আসছে মঙ্গলবারে বর্ম্মায় যাচ্ছি। গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে একটা ভালরকম offer পেয়েছি।" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি বিপিনের চিরকালের স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের সংকল্প জানিতাম। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজকে সে দাস্যবৃত্তি বলিয়া জ্ঞান করিত, আর এই কমাসেই ত দেশে তাহার মন্দ পসার জমে নাই, তবে হঠাৎ এ নূতন সংকল্প কেন ?

আমি একটু পরিহাসের ভাবে তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম। সে গম্ভীর স্বরে সংক্ষেপে বলিল, "চারুকে বিবাহের কথা বলিয়াছিলাম, তাহার মুখে শুনিলাম, আমার ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। আমার নিজের কথা তখন ভুলিয়া গেলাম, শুধু বন্ধুর দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সান্ত্বনাবাক্য মনে আসিল না। বিপিন চলিয়া গেল। তখন আমার মাথার ভিতর ঝটিকা বহিতে লাগিল। বিপিনকে ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। চারু কি বলিয়াছে ? বিপিনকে ভালবাসা তার একেবারে অসম্ভব কেন ? আগে হইতে আর কাহারও প্রতি অনুরক্ত না হইলে, সোজাসুজি কোন যোগ্য লোকের ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া ত তেমন শক্ত কথা নহে ? অসম্ভব কেন ? আমি কি কিছু অনুমান করিব ? আমার আশাতীত, স্বপ্নাতীত সুখ সত্যই কি আমার সহজলভ্য ? কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তবু অলক্ষ্যে মনে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের বাড়ী যাইতে পারিলাম না। সে কথা ভাবিলেই পা বাধিয়া যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে অঘোর বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "ছেলেরা বল্‌ছিলো, অনেক দিন তুমি আর আমাদের ওদিকে আস টাস না, আপিস যেতে আরম্ভ করেছ বুঝি ? তা একদিন রবিবারে যেও না ?" আমি বাধ্য হইয়া স্বীকৃত হইলাম।

রবিবারে যাইলাম। আজ যেন চারুশীলাতে কেমন একটু বদল দেখিতে পাইলাম। যেন শেষ যে বার দেখিয়া গিয়াছিলাম তাহার অপেক্ষা হঠাৎ অনেকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, যেন পুরুষহৃদয়দলনে তাহার অজ্ঞাত শক্তি আবিষ্কার করিয়া সে একদিনে তাহার নারীত্বের সমস্ত দায়টা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। সে আর তাই বালিকা নহে, গম্ভীর আত্মসংযতা নারী, অল্প বিষণ্ণা। হইতে পারে এ পরিবর্ত্তন চারুতে বাস্তবিক নাই, ইহা শুধু আমার কল্পনার জীব, তবু এ পরিবর্ত্তন কল্পনায়ও তাহাকে আমার আরও ভাল লাগিল। আর একটা

কারণে আজ তাহাকে আমি একটু নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলাম। বিপিনের সহিত শেষ যে কটা দিন আসিয়াছিলাম সে দিনগুলা বড় অশোয়াস্তি কাটিয়াছিল, তাহাকে মনে মনে ভালবাসিলেও ভিতরে ভিতরে একটা জ্ঞান ছিল যে আমার আর ভালবাসিবার অধিকার নাই, এ ভালবাসায় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হইতেছে, তাই পূরোপুরি ভালবাসিতে পারিতাম না, নিজের মনে মনেও কতকটা সঙ্কোচ থাকিত, আজ আর কোন সঙ্কোচ নাই। নিরাশ্বাস বন্ধুর প্রতি আমার আর কোন দায় নাই, আজ আমার প্রেম ছাড়া পাইতে পারে,—আজ তাই একটা স্বাধীনতার সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ফিরে রবিবারে আবার যাইলাম। আজ মনে হইল, শুধু ভালবাসিয়াই সুখ বটে, কিন্তু একটুখানি জানান দেওয়ার সুখই বা মন্দ কি? কোন একটা কথা বিশেষ রকমে বলা, একটা ভাব কি একটা দৃষ্টিতে একটুখানি প্রেম মাখাইয়া দেওয়া। তাহার পরের বারে মনে হইল কেন না তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিব? সেদিন আমি অকুতোভয়ে প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্য হইল। কি করিতেছি? আর দুদিনে কোথায় গড়াইব? এ যে মরণান্ত খেলা, কেন নিজেকে এ খেলায় এত মত্ত করিতেছি, এ নেশা ত আর কাটাইতে পারিব না? যদিই তাহাকে না পাই? একবার নিজের প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়া আমার অন্তর্দৃষ্টি এখন প্রখর হইয়াছে,—তাহার স্থৈর্য্য তাহার প্রশান্তভাব দেখিয়া ত আশ্বাস হয় না আমার আবেগ তাহারও হৃদয়ে কোন তরঙ্গ তুলিয়াছে। হায়! দুর্ব্বল কাপুরুষ! প্রেমসর্ব্বস্বপুরুষ! অপরাধী তুমি! তোমার বিচারক তোমার প্রণয়িনী, সে দেবতার মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার। পৌরুষদম্ভে জয়লাভ করিতে চাও কাহার উপর? আত্মসম্মান রাখিতে চাও ত জগৎহাসান পরাজয়ের পূর্ব্বে এখনও পালাও। তাহাই করিলাম। সেখানে যাওয়া বন্ধ করিলাম। কলিকাতা অসহ্য হইয়া উঠিল, ওকালতী অসম্ভব। কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙে যাইলাম। সেখানে তিন মাস অবস্থান করিলাম, মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল।

দার্জ্জিলিঙের শোভাপ্রাচুর্য্যে নয়নরঞ্জনে মনোরঞ্জন আপনি হইয়া পড়ে। দেখিবার জিনিষও ত কম নহে, চোখকে একবার ছুটি দিলেই হইল। সাদা রঙ, টুটটুকে গাল, বিলম্বিতবেণী ভুটিয়া রমণী, ফুটফুটে ইংরেজ ছেলে মেয়ে, তুঙ্গ শৃঙ্গ, অপূর্ব্ব সুন্দর মেঘ, কল্লোলিনী নির্ঝরিণী, কাঞ্চন গিরিমালা, আলোছায়াময় তরুপথ,—প্রতি নয়নপাতে বিনা আয়াসে ইহাদের একটি না একটিতে চোখ জুড়াইতেছে মনও জুড়াইতেছে। সেই তীব্র শীতের বাতাসে ঘোড়া ছুটাইতেই বা কি আরাম। এক চিন্তাহীন, অতীতহীন, উন্মত্ত, ঊর্দ্ধশ্বাস গতির সুখ। মাঝে মাঝে যদি মনে হইত প্রকৃতির এই শ্যামল চিত্রপটের উপর মধ্যাহ্নের আলোয় নির্ঝরিণীর ধারে একখানি মুখ বড় মিষ্ট মানাইত, একটি মানবীসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এখানকার এই সৌন্দর্য্য উপভোগের সুখ সম্পূর্ণ হইতেছে না; কোন দিন যদি তাহার কথা মনে করিয়া হৃদয়ে অধীরতা আসিত তবে নিজেকে শাসন করিতাম। এই চিত্তচাঞ্চল্যের সূত্রপাত হইলেই তাহার অমোঘ ঔষধস্বরূপ স্যানিটেরিয়মের আলাপী বাবুদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতাম, সেই একদাড়ি নীরস পোলিটিকাল আলাপ সর্ব্বপ্রকার সেণ্টিমেণ্টসন্তাপহারী।

আমার এক অভ্যাস ছিল,—প্রতিদিন বিকালে ট্রেন আসার সময় ষ্টেসনে গিয়া দার্জ্জিলিঙের নূতন আমদানী পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। একগাড়ী লোকের মধ্যে দৈবাৎ দুটি একটি বাঙ্গালীর মুখ চোখে পড়িলে লাগিত ভাল। এখন দার্জ্জিলিঙের সিজন্ আরম্ভ হইয়াছে। ছোটলাট আসিয়াছেন, পূজার ছুটির দেরী নাই আজ কাল তাই খুব বাঙ্গালী

সমাগম। কালোমুখে হিমালয়প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এখানকার বাসেন্দা দিগের স্বজাতির মুখসন্দর্শন স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে।

একদিন আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া লোক নামা দেখিতেছে। হঠাৎ একটি মুখ দেখিয়া আমার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইল। চারুশীলাইত! তাহার কিছু দূরে অঘোর বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের সঙ্গে আর একটি রমণী ও একটি বালক। আমি আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল, একটা দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহারা চলিয়া গেলে স্যানিটেরিয়মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, গৃহে আলো দিয়াছে। আলো সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, মাথায় খরবেগে রক্ত বহিতে লাগিল। নিজেকে বারবার একই কথা বুঝাইলাম। আমি ত পলাইয়াছিলাম, অদৃষ্ট আপনি চারুশীলাকে আমার নিকট আনিয়া দিল, এ বিধির নির্ব্বন্ধ, আমি তবে নিশ্চয়ই তাহাকে লাভ করিতে পারিব। সেই রাত্রেই পুনরায় ষ্টেশনে গিয়া, কুলিদের নিকট হইতে তাঁহাদের ঠিকানার সন্ধান করিয়া আসিলাম। তাহার পরদিন সকালে অঘোর বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম কুশলসম্ভাষণাদির পর আর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া আমি যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তাঁহার অতি মাত্র বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু তাহা হর্ষযুক্ত নহে, বরঞ্চ ব্যথিত; আমি বুঝিলাম; আমি যে উন্মাদ আশায় বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তে তাহা আমায় পরিত্যাগ করিল। তিনি সকরুণ ভাবে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন "বৎস তোমাকে আমার কঠিন আঘাত দিতে হইবে, তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। আর একদিন বিপিনও এমনি বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া গিয়াছিল।"

তাঁহার স্নেহবাক্যে অতি কষ্টে আমার মুখের স্নায়ুর উপর প্রভুত্ব রহিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন "আমার অনেক দিনের সাধ ছিল বিপিন আর চারুর বিবাহ দিব। রমেশেরও সেই ইচ্ছা ছিল বিপিন তা জান্‌ত। সে বিলেতে থাক্‌তে থাক্‌তে তার পিতার মৃত্যু হয়। সেই জন্যেই বোধ হয় তার চারুর প্রতি আরও বেশী অনুরাগ হয়। তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে আমি দ্বিরুক্তি না করে তার হাতে চারুকে সঁপে দিতে প্রস্তুত ছিলুম, আমি মূর্খ তাই এ বিষয়ে চারুর মতামত জানা প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু বিপিনের উদারতায় চারু চিরজীবনের অসুখবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিপিনের মুখে চারুর উত্তরের মর্ম্ম শুনে আমি বিস্মিত হয়ে সরোজাকে জানতে বল্লুম চারু কেন বিপিনকে বিয়ে কর্‌তে চায় না। সে জেনে এসে যা বল্লে তাতে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। সে আর একজনকে ভালবাসে, সে ছেলেটি আমাদের বাড়ীতেই পালিত। আমার পৈতৃক নিবাস মজিলপুর। আমার বাড়ীর পাশে আমাদের স্বজাতীয় একটি দরিদ্র বিধবা ছিলেন, মন্মথ তাঁরই একমাত্র ছেলে। মন্মথর বার বৎসর বয়সে মার মৃত্যু হল, তার আর কেউ নেই দেখে, আমি স্নেহপরবশ হয়ে তাঁকে আমার বাড়ীতে রেখে আমার ছেলেদের সঙ্গে লেখা পড়া শেখাতে লাগলুম। তা ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান্ আর সুবোধও বটে, আমাদের ঘরের ছেলের মতই ছিল, চারু আর সে বরাবর একত্রে খেলা করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে চারুর বিয়ে দেওয়ার কথা

আমার কখন স্বপ্নেও মনে আসেনি। সে গরিব, এই বছরখানেক হল মফঃস্বলে মোক্তারী আরম্ভ করেছে, চারুর যোগ্য বর আমি তাকে মনেই করিনি। বিপিনের সঙ্গে বিয়ে দেব বলে, সে যে রকম সমাজে মিশ্‌বে আমি তার উপযোগী করেই চারুকে এতদিন শিক্ষা দিয়েছি। চারুর মনের কথা জেনে প্রথমটা আমার বড় আঘাত লেগেছিল, মনে হয়েছিল এত শিক্ষা এত যোগ্যতা সব ব্যর্থ; এখন অন্য রকম বুঝেছি, চারুর সুখেই আমার সুখ, জামাইয়ের পদমর্য্যাদায় কি আসে যায়? তারা যখন দুজনে দুজনকে ভালবাসে তখন বিপিনের সঙ্গে বিয়ে হয়নি ভালই হয়েছে। আর আমার ত টাকার অভাব নেই, বিয়ে দিয়ে ওকে ব্যারিষ্টারি শিখতে বিলেত পাঠালেও পারি। যা হোক্ বৎস আমি কখন ভাবিনি চারু তোমারও মনোবেদনার কারণ হবে, যদি তোমার হাতে চারুকে সমর্পণ করা আমার ক্ষমতাসাধ্য হত কত আনন্দের সঙ্গে তা কর্ত্তুম সেইটুকুই শুধু বলতে পারি।"

আমি অল্পক্ষণ পরে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। চারুর কণ্ঠস্বর কানে বাজিতে লাগিল—

"কিছুই ত হোল না
সেই সব সেই সব
সেই হাহাকার রব"

পরিষ্কার, উজ্জ্বল দিন। আমার নিকট বিশ্বছবি মসীমলিন বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাহার পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

* * * * * * * * *

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারুর দুটি ছেলে মেয়ে "কিরণকাকার" দুটি স্কন্ধ দশ শালার বন্দোবস্তে অধিকার করিয়া লইয়াছে। মন্মথ ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছে, প্রতিদিনই তাহার পসার বৃদ্ধি হইতেছে। বিপিন এখন কলিকাতায়, ডাক্তারীতে তার খুব নাম, আজ দুই বৎসর হইল সে একটি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়াছে।

নববর্ষের স্বপ্ন আমার জাগ্রত অনুভূতি নহে, আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। দাম্পত্যের সেই পূর্ব্ব-উপহসিত সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটি, ছোটখাট সুখদুঃখও রুচির তাহা এখন জানি, আমার এই বুভুক্ষায় কঙ্কালসার জীবন অসার তাহা জানি, কিন্তু তবু বিবাহে প্রবৃত্তি নাই। এ রহস্য পার ত তোমরা উদ্ঘাটন কর। আর আমার যে সুখ নাই তাহাও নহে, সে কথা তোমরা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। শুধু প্রভা যখন আমার শূন্যগৃহের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে, তখন তাহাকে বুঝাইবার অক্ষমতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে।

শ্রীসরলা দেবী।

আরাধনা।

তোমারি জনমদিনে শরতে জননি
জ্বরঘোরে ছিনু অচেতন ;
সহসা মানসপটে উঠিল ভাসিয়া
অনন্তের নীলিম প্রাঙ্গণ।

মা আমার, লীলা সাঙ্গ করনি যখন
তুমি-না বলিতে হাসি হাসি,
শৈশবে ক্রোড়েতে তব অনিমেষ আঁখি
হেরিতাম তারা ফুলরাশি !

সাঁঝের গগনতলে বাতায়নপথে
নিত্য শিশু চাহিত তোমায়,
ঐ তারাফুলদল তুলে এনে দিতে—
ছলে তুমি ভুলাতে তাহায় !

তুমি তারে বুঝাইতে দেবতা তাহারা
চেয়ে আছে আমাদের পানে,
শুনি শিশু ভয়ে কভু লুকাইত বুকে,
কভু কি কহিত কানে কানে।

আজ মোহঘোরে সেই গগনের তলে
হেরি এ কি দেবতার মেলা !
পুণ্যজ্যোতি মুখে, সবে স্মিতনেত্রে চাহি
—দূরে ধু ধু অনন্তের বেলা !

সহসা দেখিনু সেই দিব্যলোক হ'তে
জ্যোতি এক নামিছে ভূতলে !
বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে চিনিনু সভয়ে
যোগী সেই কুটীর-কমলে !

ব্যগ্র হয়ে সুধাইনু কেশবে তখন
"কোথা মাতা শরৎসুন্দরী ?"
শুনিলাম—সসম্ভ্রমে জানু করি নত—
উত্তরিলা মানবকেশরী

"উচ্চে, বহু উচ্চে হোথা কর নিরীক্ষণ !"
ভক্তিরসে ভরিল পরাণ ;
ম্লান-জ্যোতি নভঃতলে, ধীরে অতি ধীরে
ফুটিল মা তোর প্রেমানন !

সেই মাতৃভাব রূপে দেখাবার তরে
লভেছিলি জনম ধরায়,
সে বিশ্ব বাৎসল্য, সেই আত্ম বলিদান
আজও তোর অরূপ প্রভায় !

বিহ্বল বিবশ শোকে, মোহ গেল দূরে
আঁখি মেলি হেরিনু তখন,
তখনও বীজনে রত শিয়রে সঙ্গিনী
জলে ভাসে করুণ নয়ন !

কহিলাম "সতি, কায় মানসে বচনে
হও মোর জননী সমান !"
সধবাতে সীতারূপ, শরৎসুন্দরী
বৈধব্যের আদর্শ-জীবন !

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

পদব্রজে।

পূর্ব্ব পত্রে বলেছি আজ 'মৌনী অমাবস্যা,' আজ পশ্চিমের লোকের প্রভাতে ভাগিরথীর বরফ জলে স্নান করে পুণ্যসঞ্চয়ের ব্যবস্থা। আমরা প্রায় অর্দ্ধেক পথ গিয়েছি তখন আমার সঙ্গী বন্ধু গায়ের কাপড় চোপড় খুলতে আরম্ভ কোল্লেন, আমি আশ্চর্য্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসায় জান্‌লুম যে সূর্য্য উদয় হ'তে আর বিলম্ব নেই, অতএব অবিলম্বেই তাঁকে স্নান শেষ কর্ত্তে হবে, সূর্য্য উদয় হ'লেই পুণ্যির পথে বাধা পড়বে। স্নানের কথা শুনেই আমার আত্মাপুরুষ কাঠ,--শীতকালের ভোরে হিমালয়ের পাদতলে বরফ জলে স্নান! আমার বাঙ্গালী প্রাণে ত তা কখনও সহ্য হবে না। প্রাণটা নিতান্ত মূল্য হীন হ'লেও এই হৃষিকেশের জঙ্গলে এমন একটা কাজে বিসর্জ্জন দেবার কোন যুক্তি যুক্ত কারণ পাওয়া গেল না। বরং বিপক্ষে একটা যুক্তি আছে, এবারে স্বর্গে যাওয়ার বন্দোবস্তটা ভাগাভাগী ক'রে নেওয়া গেছে, অর্দ্ধোদয়ে বাঙ্গালী আর সোমাবতী অমা-বস্যায় হিন্দুস্থানীরা গঙ্গা স্নান করে পুণ্যসঞ্চয় কোরবে এই রকম ব্যবস্থা, তা আমি ত কালই অর্দ্ধোদয় উপলক্ষে হৃষিকেশে গঙ্গাস্নান করেছি। আমার বন্ধু কিন্তু "অধিকন্তু ন দোষায়" এই শ্লোকটি তাঁর নিজের পক্ষে দাঁড় করালেন, আমি কিন্তু এ হেন শীতের দিনে এই ভোরের বেলা ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে শ্লোকের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি এবং আমার স্বর্গের দ্বার মুক্ত কর্ত্তে কিছুতেই রাজী হলুম না। তবে আমরা বাঙ্গালী, সব ক্রিয়া কর্ম্মেই একটা শালিশ নিষ্পত্তি করে নিয়েছি, মধু অভাবে যখন 'গুড়ং দদ্যাৎ' চলে তখন গঙ্গাস্নানের পরিবর্ত্তে মাথায় গঙ্গাজলসিঞ্চনং কেন না চোলবে? এই শেষোক্ত উপায়েই আমি গঙ্গাস্নানের ফলভোগ করা বিধেয় মনে কল্লুম। কিন্তু আমার সেই হিন্দুস্থানী বন্ধুর অবগাহন ও প্রবল গাত্রঘর্ষণ দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'তে লাগলো। স্নানান্তে তিনি গায়ে কাপড় দিয়ে আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে চোলতে লাগলেন, কিন্তু এবার আর তাঁর শরীরে তেমন স্ফূর্ত্তি নেই, বোধ হল যেন তাঁর শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত জমে গেছে।

যাহোক্ আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। একটা জায়গায় আমাদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড চড়াই বেধে গেল, পাহাড়ের চড়াই দেখলেই আমার রক্ত শুকিয়ে যায়, মনে হলো এখান হ'তেই বা ফিরতে হয়! কিন্তু বিপুল পরিশ্রমে ও বহুকষ্টে উপরে উঠলুম আবার সেই দণ্ডেই অন্যদিক দিয়ে নামতে হ'লো। নাববার সময়ে নীচে শুধু পাহাড় ও গাছ পালা দেখেছিলুম তার মধ্যে যে একটি অতি সুন্দর মন্দির লুকিয়ে আছে তা নজরে পড়ে নি, শেষে দেখলুম আমাদের পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা মন্দিরেব চূড়। নাম্‌তে নাম্‌তে শেষে একেবারে মন্দিরের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

মন্দিরের দ্বার খোলা, একটি বালক ও একটি বালিকা মন্দিরের মধ্যে ব'সে আছে; আমাদের দেখে বালকটি ভিতরের দিকে চ'লে গেল। আমরা মন্দির দেখ্‌তে লাগলুম, চারিদিকের গাছ ও পাথর সূর্য্যের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তবুও এখানে অন্ধকার নেই, চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের মধ্যে লক্ষ্মণজীর প্রতিমূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গে মূল্যবান অনেক অলঙ্কার। মন্দিরের পিছনে পাহাড়, সেই পাহাড় হ'তে একটা ঝরণা বের হয়ে মন্দিরের ভিতর দিয়ে এসে প্রাঙ্গনে পোড়্‌ছে, তাতে ভারি একটা সরল গম্ভীর সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। স্থানটি বড়ই সুন্দর এবং নির্জ্জন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তেই সেই বালকের সঙ্গে পুরোহিত মশায় এসে উপস্থিত হ'লেন; তিনি আমাদের যথোচিত অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণের পর মন্দিরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বোধ করি কিছু রোমাঞ্চকর গল্প আরম্ভ কর্‌বার যোগাড় কচ্ছিলেন, তাঁকে সেই বাক্যব্যয় হ'তে অবসর দেবার আশায় আমি আগেই যৎকিঞ্চিৎ তাঁর হাতে অর্পণ কল্লুম। মন্দির থেকে বের হয়ে একটা রাস্তা ক্রমে নীচে নেবে গেছে; সেই রাস্তা ধ'রে অল্প দূর অগ্রসর হ'য়েই সম্মুখে কয়েকখানা দোকান দেখ্‌লুম—এই দোকানগুলি অতিক্রম কল্লেই সুপ্রসিদ্ধ "লছমন ঝোলা" নজরে পড়ে।

পশ্চিম দেশে যাওয়ার আগে আমি প্রায়ই পদ্মানদীর ওপারে আমার কোন বন্ধুর বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত কর্ত্তুম। সেখানকার এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর একবার বদরিকাশ্রমে গিয়ে ছিলেন, কিন্তু আমাদের মত ইংরেজী পড়া কতকগুলি ছেলের বিশ্বাস ছিল ঠাকুর হরিদ্বার পর্য্যন্তও যাননি; যাহোক দেশের লোকে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন যায় সুতরাং সে সব জায়গার গল্প আমরা সর্ব্বদা শুন্‌তে পেতুম, কিন্তু বদরিকাশ্রমে দেশের লোক বড় একটা যায় না কাজেই সেখানকার কাহিনী সম্বন্ধে বামুন ঠাকুরই প্রধান 'অথরিটী' ছিলেন। তিনি অনেকগুলি আজগুবি গল্প করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর 'লছমন ঝোলা'র গল্প আমার বেশী মনে ছিল, এবং তৎসম্বন্ধীয় একটা ভয়াবহ ভাব ছেলেবেলা হ'তে একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ছিল। আমি যে গ্রামের কথা বলছি সেখানে একটা জায়গায় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কাদায়জলে মিশে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হ'য়ে থাকতো, এবং সেখান থেকে উদ্ধারলাভের জন্যে গ্রামের লোকে একটা বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত ক'রে রাখতো, সে সাঁকোর 'আইডিয়া' সহরের লোককে দেওয়া শক্ত; কাদার মধ্যে দুখানা বাঁশ পুঁতে তার উপরে একটা বাঁশ ফেলে খানিক উপরে আর একটা বাঁশ বেঁধে দেওয়া হ'তো। সকলকে সেই নীচের বাঁশে পা দিয়ে উপরের বাঁশ ধ'রে ধীরে ধীরে সেই কর্দ্দমাক্ত স্থান পার হ'তে হ'তো, হঠাৎ হাত কি পা ফস্‌কে গেলে সেই মহাপঙ্কে একেবারে নিমজ্জন ছাড়া আর উপায় ছিল না, লছমন ঝোলার গল্প শুনে আমরা এই অপরূপ সাঁকোর নাম রেখেছিলুম "লছমন ঝোলা," তখনকি একবার স্বপ্নেও ভেবেছিলুম আসল 'লছমন ঝোলা' আমাকে পার হ'তে হবে?

কিন্তু এখন যাঁরা লছমন ঝোলা দেখ্‌বেন, তাঁরা পূর্ব্বে লছমন ঝোলা কি রকম ছিল তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। অতএব সেকালের ঝোলার একটু সংক্ষেপ বিবরণ দিচ্ছি।

প্রথমে একটা দড়ির সিঁড়ি প্রস্তুত ক'রে নেওয়া হয়; খুব মোটা দুগাছা দড়ি সমান্তরাল ভাবে রে'খে তার মাঝে মাঝে সিঁড়িতে যেমন পা দেওয়ার জন্যে কাঠ থাকে, তেমনি ছোট ছোট শক্ত কাঠ বেশ ভাল ক'রে বেঁধে সেই দড়ির সিঁড়িগাছটা দুই পারে বেশ ক'রে আট্‌কে দেয়। তার উপরে পা দিয়ে পার হতে হয় এবং হাতে ধ'রবার জন্য নীচে যেমন উপরেও সেই রকম দুটো শক্ত রশি এপার হতে ওপারে বেঁধে দেয়। সেই রশি দুটো দুই কক্ষের মধ্যে দিয়ে দুহাতে ধ'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হয়। এখন একবার মনে করুন ব্যাপারটা কি ভয়ানক! দুই কক্ষের ভিতর দুই রশি, আর পা সেই রশিনির্ম্মিত সিঁড়ির উপর, পায়ের তলায় চার পাঁচশো হাত নীচে ভয়ানক বেগবতী গঙ্গা! একবার কোন রকমে পা পিছ্‌লে গেলে আর রক্ষে নেই। প্রথমে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বেশ ঝুল্‌তে পারা যায় বটে কিন্তু পা আবার যথাস্থানে স্থাপন করা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। আরো এক ভয়ানক কথা এই যে, এই রকম ঝোলার উপর দিয়ে একটু গেলেই পা এমন ভয়ানক দোলে যে, হাত পা ঠিক রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রতি ক্ষণেই মনে হয়, এইবারই হয় তো প'ড়ে যাব। লছমন ঝোলা পার হওয়া এই জন্যেই ভয়ানক ছিল; এই ঝোলা পার হ'তে গিয়ে কত যাত্রী যে মারা গেছে, তার সংখ্যা নেই। সেই জন্যই সে কালের লোক লছমন ঝোলা পার হ'লেই নারায়ণদর্শনের আশা কর্ত্তো। সেকালে বদরিনারায়ণের পথে আরো চার পাঁচটা ঝোলা ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট; এই এক লছমন ঝোলার ভয়েই অনেক লোক সে পথে যেতে পার্ত্তো না। এখন চেতলার পুলের মত সর্ব্বত্র টানা পুল হয়েছে। লছমন ঝোলার বর্ত্তমান পুলটি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সূরজমল ঝুনঝুনিওয়ালা বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়ে দেছেন, এ পুল পার হতে পয়সা দিতে হয় না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই পুল প্রথম খোলা হয়, তার পর হতেই বদরিনারায়ণের (বদরিকাশ্রমের) যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী হয়েছে।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, 'লছমন ঝোলা' সম্বন্ধে ছেলে বেলা থেকে মনে মনে যে ভয়াবহ ভাব পোষণ করে রেখেছিলুম—'লছমন ঝোলায়' উপস্থিত হয়ে তার কিছুই না দেখে খানিকটে নিরাশ হয়ে পড়্‌লুম। এখন দুবছরের ছেলেরা পর্য্যন্ত মনের আনন্দে খেলা কর্‌তে কর্‌তে ঝোলা পার হ'তে পারে। পূর্ব্ববিভীষিকা মনে করিয়ে দেবারও কিছু দেখা গেল না। কেবল দেখ্‌লুম, এপারে দুখানি ও ওপারে দুখানি জীর্ণ কাষ্ঠ দাঁড়িয়ে তাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিচ্ছে।

লছমন ঝোলার পুল পার হ'য়ে যাত্রীদল বদরি নারায়ণ যায়। বদরিকাশ্রমে সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া গৃহস্থ লোক অতি কমই যায়, আবার তার মধ্যে

বাঙ্গালীর সংখ্যা ত আরো অল্প, প্রতি বৎসর পাঁচ সাত জনের বেশী হবে না। আমার বদরিকাশ্রমে যাবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ হতে লাগ্‌লো, কিন্তু সে বারে সুবিধে করে উঠ্‌তে পাল্লুম না। তার তিন চার বৎসর আগে থেকে গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদের বদরিকাশ্রম যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সে কয় বৎসর গাড়োয়ালরাজ্যে এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যে, যাত্রীদের পথ ছেড়ে দিলে তারা হয় ত অনাহারে মারা পড়তো। আমি কিন্তু সেই থেকে বরাবর চেষ্টায় আছি, সুযোগ করে উঠতে পার্‌লেই একবার যাব। তার পরে এক বছর হরিদ্বারের মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে আমার একজন পূর্ব্বপরিচিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি বাঙ্গালী. বাল্যকাল হতেই ইনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, এখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। বলাবাহুল্য পথে ঘাটে যে রকম সন্ন্যাসী দেখা যায়, ইনি সে প্রকৃতির নন, ইতি প্রকৃতই একজন সাধু ব্যক্তি, আধুনিক-ভাবে শিক্ষিত, এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। আমি নানাপ্রকার অনুরোধ করে তাঁকে হরিদ্বার হ'তে দেরাদূন নিয়ে এলুম. কিন্তু তিনি লোকালয়ে আসতে স্বীকার হলেন না। কাজেই তাঁকে টপকেশ্বরের এক পর্ব্বতগুহায় রেখে বাসায় এলুম; অবকাশমত তাঁর নিকট যাতায়াত কর্ত্তে লাগলুম, দুই এক দিন সেই নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে বাসও করা গেল এবং এই রকম ক'রে আমরা দুজন—একজন সন্ন্যাসী ও একজন গৃহবাসী—পরস্পরের নিকট অধিকতর পরিচিত হ'তে লাগলুম; অব-শেষে তাঁর সঙ্গে আমার বদরিকাশ্রমে যাওয়া স্থির হ'য়ে গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেরাদূনস্থ বন্ধুবান্ধবমণ্ডলীর মধ্যে এ সংবাদ রাষ্ট্র হল। আমার সেই হিন্দুস্থানী বন্ধুর ত চক্ষু স্থির! তিনি ভাব্‌লেন, তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী বুঝি বা সফল হয়।

সন্ন্যাসী মহাশয়কে আমি 'স্বামীজি' বলে ডাকতুম। তাঁর সঙ্গে আমার যাত্রা করার পরামর্শ স্থির হয়ে গেলে, আমি যে সত্যিই এমন একটা বড় রকম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হচ্ছি, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তা কেউ বিশ্বাস কর্ত্তে রাজী হলেন না; যদি আমি কথঞ্চিৎ করুণাউদ্রেক অভিপ্রায়ে কোন বন্ধুর কাছে মুখ ভার ক'রে বলি, "ভায়া হে ছেড়ে ত চল্লুম, একেবারে ভুলো না।" অমনি দুই বিন্দু অশ্রু এবং একটি দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্ত্তে এক মুখ হাসি আমাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত ক'রে ফেল্‌তো; বিদ্রূপের স্বরে তাঁরা বোল্‌তেন, "তুমি যাবে?—তীর্থভ্রমণে? দেখ্‌লেও ত বিশ্বাস হয় না।" বাস্তবিক আমার মত শ্রমকাতর মনুষ্য যে বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে পদব্রজে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াবে, একথা তাঁরা কি ক'রে সহজে বিশ্বাস করেন? আমারই এক এক সময় মনে হ'তে লাগলো, এই সমস্ত পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ হাঁটা কি আমার পক্ষে সহজ হবে? সামান্য দূরে ক্ষুদ্র এক চড়াইএ উঠ্‌তে হ'লেই আমার ডাণ্ডীর দরকার হয়—আর আমি কি করে এত পথ অতিক্রম কর্‌বো? আর পথে বিপদ সম্ভাবনাও ত কম নয়?

কিন্তু নানাজনের নানাকথার মধ্যে পড়ে আমার ভ্রমণেচ্ছা ক্রমেই দৃঢ় হ'তে

লাগ্‌লো,—যতই চারদিক থেকে পথের ভীষণতা সম্বন্ধে কথা শুন্‌তে লাগলুম, ততই আমার যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হ'তে লাগ্‌লো,—শেষে যাত্রা কর্‌বার দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেল; তখন আমার বন্ধুদের পরিহাস বিদ্রূপ আর কোথায়,—বিদায়ের দুঃখে সব ভেসে গেল। সকলের মনে মনে হল এই হয়তো শেষ দেখা, আর কি ফিরে আস্‌তে পার্‌বো?

এখান থেকে আমার দৈনিক লিপি উদ্ধৃত করি।

৫ই মে ১৮৯০। মঙ্গলবার,—আগামী কাল অতি প্রত্যূষে আমার যাত্রা কর্‌বার দিন। বন্ধুবান্ধব সকলেই খুব বিষণ্ণ, বিমর্ষ, যেন আমি চিরদিনের জন্য সকলের স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চলে যাচ্ছি। পাড়ার বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ সকলেই কাতরতা প্রকাশ কর্ত্তে লাগলেন, বন্ধুবান্ধবেরা আপনার আপনার নাম লেখা পোষ্টকার্ড আমার গানের বইএর ভিতর রেখে দিলেন। সমস্ত দিন এই ভাবে কেটে গেল; দেরাদূনে এমনও দুই একজন লোক ছিলেন, যাঁরা আমার উপর অনেক বিষয়ে খুব বেশী রকম নির্ভর করেন, মনে মনে অখিল-নির্ভরের উপর তাঁদের ভার সমর্পণ কর্‌লুম্‌। রাত্রে আর নিদ্রা হ'লো না, সামান্য কোথাও যেতে হলেই নানা উৎকণ্ঠায় রাত্রে নিদ্রা হয় না, আর এ ত আমার সুদীর্ঘকালের জন্যে যাত্রা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও নানা কাজে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। আয়োজনের জন্যে কিছু ব্যস্ত হ'তে হো'ল না, দীনের বেশে বের হব, তার আর আয়োজন কি কোর্‌বো?

৬ই মে, বুধবার—আজ রাত্রি সাড়ে চার্‌টার সময় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত; তৎপূর্ব্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্যে সমবেত হ'লেন। জ্যোৎস্নারাত্রি, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, নিসুপ্ত। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর ধারা কি পরিবর্ত্তিত হয়? সকলকে ছেড়ে চল্লুম, আত্মীয় বন্ধুবর্গ অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন, তাঁদের এই দীর্ঘকালের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা বিশেষ কষ্টকর ব'লে মনে হ'তে লাগলো, তাঁদের আর বেশী দূর অগ্রসর না হতে অনুরোধ কল্লুম, তাঁরা খানিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরলেন। আমিও ফিরে ফিরে তাঁদের অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলুম। আমার মনে হলো, এতেই এত কষ্ট, আর নিতান্ত আপনার লোকের কাছ থেকে এরকম বিদায় নেওয়া না জানি আরো কত কষ্টকর! দিনকতক আগে Pilgrim's Progress পড়েছিলুম, তারই একটা ছবির কথা আমার বারবার মনে আস্‌তে লাগলো, নানাচিন্তার মধ্যে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

সূর্য্যোদয় হল। আমরা হৃষিকেশের পথে আসতে লাগলুম,—এ আর একটা পথ, এ পথেও লোকজনের সখ্যা বড় অল্প। পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম ক'রে বেলা ১১টার সময় 'থামু' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হলুম। গাছপালায় ঢাকা পাঁচ সাত ঘর গৃহস্থের বাড়ী নিয়ে এই গ্রামখানি শাখাপত্রসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বিহঙ্গনীড়ের ন্যায় স্নিগ্ধ ও বিজন। এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝরণা চলে যাচ্ছে, আমরা সেই ঝরণার ধারে একটা গাছের

তলায় আশ্রয় নিলুম; ক্ষুধা তৃষ্ণায় অধীর হয়েছিলুম, প্রাণভ'রে ঝরণার জল পান করা গেল, তারপর সেই বৃক্ষতলেই আহারাদি শেষ ক'রে অপরাহ্ণ ৫টার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ কল্লুম। গ্রাম যখন ছাড়িয়ে গেছি—তখন দেখলুম দুজন সন্ন্যাসী আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ভাবলুম আমরাও দুজন আছি, এ দুজন সাধু ব্যক্তির সঙ্গ লওয়া যাক্ না, কিছু দূর একসঙ্গেই চারজনে যাওয়া যাবে। সেই দুজন সাধুকে ধরবার জন্যে আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম, কিন্তু সন্ন্যাসীদ্বয়ের কাছে গিয়ে আমার হাসিও এল রাগও হোল, দেখি একজন আমারই বাসার চাকর; চুরী অপরাধে আজ ২০।২৫ দিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ তাকে যেরকম জঁাকাল সন্ন্যাসীর বেশে দেখলুম এবং যেরকম উৎসাহের সঙ্গে সে ঘন ঘন "হর হর বম বম্" করচে তাতে কার সাধ্য তাকে চোর বলে? তবে তার নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্য যে আজ আমার সম্মুখে পড়ে গেছে। আমি 'স্বামীজী'কে সমস্ত কথা খুলে বল্লুম, তিনি বোল্লেন "হয়ত তার সঙ্গীর ঝুলীতে কিছু অর্থ আছে তাই আত্মসাৎ করবার জন্য এ বেটা এ রকম ভেক ধরেছে।" গৈরিক বসন ও জটা কমণ্ডলুর মধ্যে এই রকম কত চুরী ডাকাতি ও নরহত্যা ছদ্মবেশে দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষা করছে তার আর সংখ্যা নেই। আমার এই ভ্রমণবিবরণে পাঠকের এ রকম অনেক সাধু দর্শন ঘটবে। আমার চাকর বাবাজী হয়তো প্রথমে মনে ক'রেছিল আমি তার এই নূতন 'ভো'ল' দেখে তাকে চিন্‌তে পার্‌বো না এবং তার পশ্চিমে বুদ্ধির দ্বারা আমার বাঙ্গালী বুদ্ধির পরিমাণ স্থির ক'রে নিশ্চিন্ত ছিল। তাই আমাদের দেখে আরো জোরে জোরে 'বম্ বম্' কর্ত্তে লাগ্‌লো;—এ ভণ্ডামী আমার নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো, আমি একটু হেসে বল্লুম, "আরে লণ্ডে, কব্‌সে চুরী ছোড়্‌কে সাধু বন্ গিয়া?"—আমার কথা শুনে বাবাজির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল, একটা কথাও বল্‌তে পারলে না। তখন তার সেই সঙ্গী বিশ্বস্তচিত্ত সাধুটীকে সমস্ত বল্লুম, সে বেচারী নিতান্ত ভালমানুষ, এই অল্পবয়সী, জোয়ান ছোকরা তার চেলা হ'তে স্বীকার করায় সে তাকে সঙ্গী করেছে, একটু আধ্‌টু ধর্ম্মোপদেশ দেয়, আর বেশ ভাল ক'রে খাওয়ায় দাওয়ায়। আমি বল্লুম, "সাধু, তুমি ওকে রাখ, খেতে দেও, তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু যদি তোমার ঝুলিতে কিছু টাকাকড়ি থাকে ত তা সাবধান ক'রে রেখো, দশবারো দিনে যে এমন সাধু হতে পারে, দু পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আবার তার নরঘাতক, দস্যু হওয়ারও আটক নেই।"—পরে জেনেছিলুম, সাধু আমার এই অযাচিত উপদেশ গ্রহণ করেছিল।

সন্ধ্যার সময় আমরা 'ভোগপুরে' উপস্থিত হলুম। এ গ্রামে অনেকগুলি লোকের বাস, দুচারটে ছোট কোটাঘর দেখে বুঝলুম এখানে ধনীও দুপাঁচ ঘর আছে; অবিলম্বে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। এ অঞ্চলে যে গ্রামে দুপাঁচ জন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস সেখানেই গ্রামের লোকের ব্যয়ে ও যত্নে এক একটা ধর্ম্মশালা থাকে; বিদেশী সাধু

অতিথি সেখানে আশ্রয় পায়, গ্রামের লোকে যথাসাধ্য আহার্য্য সামগ্রী দিয়ে যায়, তবে গ্রামে দোকান থাক্‌লে কি পথিকের হাতে পয়সা থাক্‌লে তাদের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নেবার বড় দরকার হয় না। বাঙ্গলা দেশে ধর্ম্মশালার মত জিনিষের অভাব বড় বেশী, নানাবিষয়ে আমরা ভারতের অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য কিন্তু পথিক বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পথপ্রান্তে প্রাণত্যাগ কল্লেও তাদের দিকে ফিরে তাকানর আমাদের অবসর নেই, এতই আমরা কাজে ব্যস্ত, তবে আমাদের মধ্যেও যে দুপাঁচজন এ দলের বাইরে আছেন এ কথা অবশ্য স্বীকার কর্ত্তে হবে; কিন্তু আমার যেন মনে হয় পরোপকার কি বিপন্নকে আশ্রয় দান এবং অতিথি সৎকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত গাড়োয়ালী কৃষকের হৃদয়ের উচ্চতা অনেক বেশী। ভোগপুরের' ধরমশালায় রাত্রিবাস করা গেল, আহারাদির কিছু দরকার হ'লো না; পথশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়েছিলুম, শয়ন মাত্রেই নিদ্রিত হয়ে পড়লুম।

৭ই মে বৃহস্পতিবার।—প্রত্যূষে উঠে আবার যাত্রা। এ বার সেই পূর্ব্ব পরিচিত হৃষিকেশের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেল; জঙ্গল পরিচিত হ'তে পারে কিন্তু রাস্তা সম্পূর্ণ অপরিচিত, পূর্ব্বে যে রাস্তায় এসেছিলুম, এবারো সেই রাস্তায় যাচ্ছি কিনা বুঝতে পাল্লুম না। বেলা ১১টার সময় হৃষিকেশে পৌঁছলুম। বৃক্ষতলে বিশ্রাম করা গেল, আহারাদি কিছুই হ'লো না। অপরাহ্নে রৌদ্রের তেজ কম্‌লে যাত্রা ক'রে 'লছমন ঝোলা' উপস্থিত হ'তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লছমন ঝোলায় গঙ্গার উপর যে কখানা দোকান ঘর ছিল দেখলুম তা যাত্রীর দলে পূর্ণ; সেই দিন এখানে একদল উদাসী সন্ন্যাসী এসেছে, এরা শিখ, গুরু নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু এরা এখন পৌত্তলিক। হিন্দুর সমস্ত তীর্থই পর্য্যটন ক'রে থাকে এবং নানকের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ পূজা করে; এরা সেই পুস্তককে 'গ্রন্থ সাহেব' বলে। এই দলে প্রায় ২০০ লোক, এদের কথা পরে বল্‌ব।

দোকানগুলি সব দখল হয়ে গেছে দেখে আমরা 'লছমন ঝোলা' পার হয়ে অপর পারে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ কল্লুম। পূর্ব্বকথিত দোকানঘরে সাধুর দলের সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাঁদেরও অনেকে এই সমস্ত বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি—প্রথম কয়েক ঘণ্টা অন্ধকার; ধুনীর আলোতে অন্ধকার আরও গভীর বোধ হ'তে লাগলো; আমরা অন্ধকারের মধ্যেই বালির উপর কম্বল বিছিয়ে বসলুম এবং অন্ধকারেই দুচার খানা রুটী তৈয়েরী ক'রে ধুনীর আগুনে সেঁকে একটু গুড় দিয়ে আহার কল্লুম, সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর এই আহার এবং অন্ধকার নদী সৈকতে বালুকার উপর এই কম্বলশয্যা খুব শান্তি দায়ক হ'লো। আমার বোধ হ'লো আমরা সংসারে নানা রকম বিলাসিতার মধ্যে জোর ক'রে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি ক'রে নিই, তাই সংসারে আমাদের এত দুঃখ কষ্ট, পদে পদে ভগ্ন মনোরথের ক্লেশ এবং

নৈরাশ্যের যন্ত্রণা। যাহোক সে রাত্রে যেরকম শান্তি উপভোগ করতে পাব ঠিক করেছিলুম আমার অদৃষ্টে তা ঘটে নি। শয়নের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমি আমার ডান হাতের আঙ্গুলে এক ভয়ানক দংশন যাতনা অনুভব কল্লুম; সর্পাঘাত কি রকম জানিনে, কিন্তু আমাকে যে জীবে কামড়িয়েছিল, তার যন্ত্রণা কখন ভুলব না। অনেকে কথায় কথায় সহস্র বৃশ্চিক দংশনের কথা পেড়ে থাকেন, আমার আজকেকার এ দংশন যদি বৃশ্চিক দংশন হয় তবে আমি নিঃসন্দেহে বোলতে পারি এই একটিই যথেষ্ট, সহস্র দূরে যাক্ ছুটিরও দরকার হয় না। বেদনার জ্বালায় আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম, সঙ্গী 'স্বামীজী' হাতের উপরে দু তিন জায়গায় দৃঢ় ক'রে বাঁধন দিলেন, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র বিষ সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছিল, আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে গেল, নড়্বার পর্য্যন্ত শক্তি রইল না, আর যাতনায় গভীর আর্ত্তনাদ কর্ত্তে লাগ্‌লুম; দুই চারজন নিকটস্থ সন্ন্যাসী এসে অনেক ঝাড়তে লাগলেন কিন্তু কিছুমাত্র ফল হ'লো না। আমার সঙ্গী স্বামীজী বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন, তিনি আমাকে মার মত কোলে ক'রে বস্‌লেন কিন্তু কি করবেন কিছুই স্থির কর্ত্তে পাল্লেন না।

এই রকমে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল, যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি হ'তে লাগলো; এমন সময় বুঝি আমাকে রক্ষা করবার জন্যই ভগবান একজন সন্ন্যাসীকে 'লছমনঝোলা' পার করে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটু আগে লছমনঝোলায় পৌঁছিয়েছিলেন, দু একজন সাধুর মুখে আমার এই রকম ভয়ানক দংশনযাতনার কথা শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে উপস্থিত হোলেন। তিনি আমাকে যে উপায়ে আরোগ্য কল্লেন তা অতি আশ্চর্য্য। আমার যে অঙ্গুলী দংশিত হয়ে ছিল সন্ন্যাসী সেই আঙ্গুল মুখের মধ্যে পূরে দষ্টস্থান একটু কামড়িয়ে ধর্‌লেন, বোধ হল আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটছে, শরীরে যন্ত্রণা আছে তা বুঝছি কিন্তু আর যন্ত্রণা অনুভব কর্ত্তে পাল্লুম না। সন্ন্যাসী সামান্য একটু কামড়িয়ে আঙ্গুল ছেড়ে দিলেন, ক্লোরোফর্ম্ম করলে শরীর যেমন ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে পড়ে আমিও পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সেই রকম অচেতন হয়ে পড়লুম। প্রাতঃকালে সাধুর দলের যাত্রার আয়োজনের গোলমালে নিদ্রাভঙ্গ হলো, দেখলুম আমি স্বামীজীর কোলের মধ্যেই রয়েছি, তিনি আমাকে কোলে নিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছেন; বিদেশে, পথপ্রান্তে এই রকম বিপন্ন অবস্থাতে একজন সন্ন্যাসীর নিকট যে মাতার স্নেহ ও প্রিয়তমার যত্ন পাওয়া যেতে পারে একথা আমার নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে হতো, কিন্তু এ সংসারে গৃহহীন পথিকের জন্যেও ভগবানের প্রেম স্বর্গ হতে মানবহৃদয়ে নেমে আসে। কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো।

৮ই মে শুক্রবার,—শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত তবু সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। বার মাইল গিয়ে আর চলবার ক্ষমতা রইল না, তাই 'ফুলবাড়ী' চটিতে সমস্ত দিন কাটান

গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার রওনা হ'য়ে ছ মাইল রাস্তা চলে সন্ধ্যার সময় 'বাগড়ী' চটিতে পৌঁছিলুম। উলুবেড়ে হ'তে উড়িষ্যার পথের ধারে যেমন সুন্দর সুন্দর চটি আছে তাদের সঙ্গে তুলনায় এ সমস্ত চটি কিছুই নয়, বিশেষতঃ গত তিন চার বৎসর গবর্ণমেণ্টের আদেশে বদরিকাশ্রমে যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাকায় সেই সমস্ত পাতার কুটীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে; এ বৎসরও যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাকবার কথা ছিল কিন্তু কুম্ভ মেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান হ'তে অনেক সাধুর সমাগম হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছু কম পড়ায় অল্প কয়েকদিন হলো যাত্রী যাওয়ার হুকুম হয়েছে; কিন্তু ভগ্ন চটিগুলি এখনও মেরামত হয়ে ওঠেনি এবং তাতে আজো দোকান বসেনি। আমরা দ্বিতীয় যাত্রীদল, আমাদের পূর্ব্বে একদল মাত্র যাত্রী গিয়েছে। 'বাগড়ী' চটিতে পৌঁছিয়ে দেখি সেই পূর্ব্বদিনের উদাসী সাধুর দল সেখানে সেদিনের জন্যে আড্ডা গেড়েছে। একখানি মাত্র পাতার ঘর প্রস্তুত হয়েছে আর তাতেই সামান্য জিনিষ পত্র নিয়ে দোকান বসেছে। বলাবাহুল্য সে দোকানে যা কিছু জিনিষ ছিল তা সেই দুই শত সাধুর পক্ষেই নিতান্ত অল্প, সুতরাং আমরা দেখলুম দোকানদারের কাছে আর ক্রয়োপযোগী কোন জিনিষই নেই।

এখানে এই সাধুর দলের একটু পরিচয় দিই। এদের বড় বড় দল আছে এবং একজন দলপতি আছেন, তাঁর আদেশ অনুসারে দলস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নানা স্থানে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হয়। কাশীতে নর্ম্মদা তীরে এবং অমৃতসরে ও আরো অনেক স্থানে এই সাধুদের অনেক বড় বড় মঠ আছে, মঠের অগাধ সম্পত্তি, হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও অনেক। যে দলের সঙ্গে আজ আমাদের দেখা হ'লো তাদের মধ্যে একজনকে প্রধান ক'রে এরা ভ্রমণে বাহির হয়েছে। এদের সঙ্গে অনেক লোকজন আছে, খাদ্যদ্রব্য ব'বার জন্যে মুটে আছে, বড় বড় পিতলের হাঁড়ী প্রভৃতিও সঙ্গে দেখলুম; এরা যেখানে উপস্থিত হয় সে সময় সেখানে অন্যান্য যে সমস্ত লোক থাকে তাদের সকলকেই সযত্নে আহার করায়, এমনকি বাইরের লোকের খাওয়া না হ'লে এরা জলস্পর্শ করে না। এদের কোন রকম বদ্‌খেয়াল দেখলুমনা, সকলেই সন্ন্যাসী এবং সকলেরই মাথায় বেণী ভাঙ্গান চুল। এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, সঙ্গে 'গ্রন্থ সাহেব' আছেন, তাঁর রীতিমত পূজা আরতি ও স্তব পাঠ হয়, তা ছাড়া এরা বিশেষ কোন ধর্ম্মালোচনায় যে সময় ক্ষেপ করে তা নয়; দু একজন ধর্ম্মপিপাসু সাধু ব্যক্তি আছেন কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই খুব আমোদ প্রিয়; এমন কি দেখলুম দুই তিন দল তাস ও দাবা খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমরা এদের কাছে আসবা মাত্র এরা খুব যত্নের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা কোল্লে, কোন রকমে আতিথ্য সৎকারও সম্পন্ন হ'লো। তার পর সেই অনাবৃত আকাশতলে—প্রকৃতির রত্নখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে শয়ন করা গেল। এদের একজন

আমাকে বাঙ্গালী দেখে বাঙ্গালা ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে লাগলেন, এঁর বয়স এখনও ত্রিশ হয় নি, অতি বিনয়ী, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে ব'লে বোধ হ'লো। ইনি বাঙ্গালী, কিন্তু বাড়ী কোথায় তা প্রকাশ কোল্লেম না, তবে জান্‌তে পাল্লুম ১১ বৎসর বয়সের সময় ইনি এই সাধুর দলে প্রবেশ করেছেন এবং এই দলের মধ্যে থেকেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে খানিক বাঙ্গালা ভাষায় খানিক বা হিন্দীতে কথাবার্ত্তা হোল। শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হ'লো কিন্তু শেষে তর্কের যে রকম মীমাংসা চিরকাল হয়ে থাকে তাই হোল অর্থাৎ কোন মীমাংসাই হোল না। তবে বুঝলুম লোকটা প্রকৃতই ধর্ম্মপিপাসু। বেশ আনন্দে রাত্রি কেটে গেল। শেষ রাত্রে জেগে দেখি গায়ের উপর ঝুপঝাপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে আর খোলামাঠে শোঁ শোঁ ক'রে বাতাশের শব্দ, কিন্তু তখন আর কি উপায় করা যাবে? কম্বল মুড়ি দেওয়া গেল, এবং শরীরও কম্বলের উপর দিয়ে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এই সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকারে প্রস্তুত হয়েই এ যাত্রা বাহির হয়েছি।

৯ই মে, শনিবার—সকাল, সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড চড়াই দেখ্‌লুম, ক্রমাগত ছমাইল উপরে উঠ্‌তে হ'লো, দিনকতক আগে আধ্ মাইল উপরে উঠ্‌তে গেলেই গলদঘর্ম্ম হ'য়ে পড়্‌তুম, কিন্তু আজ দৃঢ়চিত্তে ৬ মাইল উঠ্‌লুম; বেলা প্রায় ১১টার সময় আমাদের চড়াই শেষ হয়ে গেল। এই ছমাইলের মধ্যে একটাও চটি নেই, স্থানে স্থানে পর্ব্বতের গায়ে দু একটি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, দু এক ঘর গৃহস্থ শান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'চ্ছে। ছয় মাইল উঠে তার পরে আবার চার মাইল নাব্‌তে হো'ল। উঠ্‌বার সময় মনে হ'লো, নাবা সহজ, কিন্তু নাব্‌বার সময়ও দেখা গেল, কষ্ট বড় কম নয়; যাহোক অনেক কষ্টে নেবে একটা চটিতে উপস্থিত হলুম। একখানা ঘর, আর তাতে সেই ২০০ সাধু, দোকানে যা কিছু খাবার জিনিষপত্র ছিল, তা তারাই আত্মসাৎ কোরেছে। দুপ্রহর রৌদ্রে একটু ছায়া পর্য্যন্ত মিল্‌লো না, যে তিন চার্‌টে বড় গাছ ছিল, তার তলাতেও সাধুরা আড্ডা ফেলেছে। রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়ে শেষে সেখান হ'তে বাহির হ'লুম। আমরা সংকল্প কল্লুম যে এ রকম করে চোল্‌বো যে, হয় এই সাধুদলের আগে থাক্‌বো, না হয় খানিক পাছে থাক্‌বো। সঙ্গে সঙ্গে আর যাচ্ছিনে; এদের সঙ্গে এক চটিতে বাস, আর অনাহার ও রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করা একই কথা। তাই সে দিন এত কষ্টের পরে রৌদ্রের মধ্যে আবার হাঁট্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু এ দিন যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তা বোল্‌তে পারিনে; অল্প একটু যেতে না যেতেই ভয়ানক মেঘ ও ঝড় উঠ্‌লো। বোধ হ'ল, পাহাড়ের গা হ'তে আমাদের উড়িয়ে ফেলে দেয় আর কি! সৌভাগ্যের বিষয় বৃষ্টি হ'লো না। সেই বৃষ্টিহীন ঝড়ের মধ্যে 'মহাদেব চটি'তে এসে উপস্থিত হলুম। এখানে একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী ব'সে ছিল, সে বড়ই দরিদ্র, আমরা তাকে পেয়ে যতদূর সুখী না হই, সে আমাদের পেয়ে খুবই সুখী হ'ল। সমস্ত দিন কষ্টের পর সন্ধ্যার সময়

আশ্রয় পাওয়া গেল। আশ্রয় শুনে কেউ মনে কোর্‌বেন না বেশ চারিদিকে আঁটা, সুন্দর ঘর; এ ঘর বটে, কিন্তু গাছের পাতাশুদ্ধডাল দিয়ে ছাওয়া, চার্‌দিকে দেওয়াল কি বেড়া কিছু নেই। দোকানদার তারই একপাশে যেখানে তার দোকান সাজিয়ে রেখেছে, সেইখানটুকু একটু শক্ত ক'রে ঘিরে নিয়েছে। দোকানে ১৫। ১৬ সের আটা, ৩। ৪ সের ঘি, লবণ লঙ্কা আর কড়াইয়ের ডাল। এমন কি তার দোকানে খানিকটে গুড় পর্য্যন্ত বিক্রি হয়। কিন্তু এ সমস্ত জিনিষ শুধু ১০। ১৫ জন সাধুর খোরাক, তবে দোকানদার ভরসা দিলে যে শীঘ্রই সে বড় রকম দোকান খুল্‌বে।

যাহোক দোকানদারের সঙ্গে পরিচয় হো'ল, সে আমার একটি ছাত্রের পিতা; আমার পরিচয় পেয়ে সে আমাদের একটু বেশী খাতির ক'ল্লে, এমন কি তার নিজের খাবার জন্যে সঞ্চিত দধিটুকু পর্য্যন্ত এনে আমাদের দিলে। অন্য সময় হ'লে আমরা সে দই স্পর্শও কর্ত্তুম কি না সন্দেহ। কিন্তু সে দিন পশ্চিমের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন অপেক্ষা সে দই টুকু আমাদের নিকট ঢের বহুমূল্য ব'লে বোধ হ'লো। রাত্রে সেই বৃদ্ধ বাঙ্গালী প্রবাসী মনের আনন্দে গান আরম্ভ কোল্লে; বহুদিন পরে বৃদ্ধের মুখে

"আয় মা সাধনসমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

এই গান শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হ'লো, আমিও দুর্ব্বল কণ্ঠে প্রাণ খুলে কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী মহাসঙ্গীত গাইতে লাগলুম—

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত,
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হ'য়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব কেবল দর্শন মাগি
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী সেই সভামাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।"

গাইতে গাইতে মনে পড়্‌ল একদিন বাঙ্গলা দেশে, গৃহে, আমার স্ত্রী এই গানটী আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন। আজ এই দূর দেশে এ রকম ভাবে আবার এই গান গাইব তা কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলুম? এখন কোথায় তিনি কোথায় আমি? হঠাৎ অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্যে মন ভরে উঠল। এই হিমালয়, এই নিস্তব্ধতা, এই শান্তি সব ব্যর্থ মনে হল। অনেক বিলম্বে মনকে আবার সংযত করে আনলুম।

শ্রীজলধর সেন।

ফুলেরমালা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহের মরণ দুর্ব্বুদ্ধি ধরিয়াছে। একে ত তিনি ঘরে পরে শত্রু করিয়া বসিয়াছেন; তাহার উপর না আছে তাঁহার একটা মতির স্থির, না আছে নীতির স্থির! প্রতিদিন ব্যভিচারী হুকুমের জ্বালায় সৈন্য সভাসদদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কেবল তাহাই নহে, ইহার ফল মন্দ ঘটিলে দোষী অবশ্য যাহারা হুকুম পালন করে, কিন্তু ভাল হইলে যশের ভাগী তাহারা নহে। সভাসদদিগের মধ্যে একটা রুদ্ধ অসন্তুষ্টির প্রবাহ চলিয়াছে।

সৈন্যগণও নিরুৎসাহ ভগ্নচেতা। দেশে অন্নাভাব। যাহারা চাষ করিবে এক বৎসর কাল তাঁহারা অস্ত্র ধরিয়াছে, স্ত্রীলোক ও বালকের হাতে কৃষি কার্য্যের ভার, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ সৈন্যদিগের রসদ যোগাইতে অসমর্থ। তাহাদের নিয়মিত দুইবেলা অন্ন জোটাও দায়। ইহার উপর ভাগ্যলক্ষ্মীও তাহাদিগকে বাম। একবার যদি কোন রকমে তাহারা শত্রু সৈন্য হঠায় ত দুইবার নিজে হঠে। এরূপে যুদ্ধ আর কতদিন চলে! সভাসদগণ পুনঃ পুনঃ বাদসাহকে দিনাজপুরের সহিত সন্দি স্থাপন করিয়া তৎসহায়ে গায়সুদ্দিনকে দমনের পরামশ দিতেছেন। বাদসাহ এতদিন সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই কিন্তু আর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিল না। গায়সুদ্দিন নিতান্ত প্রবল হইয়া অসংখ্য সৈন্য সহ রাজধানী অভিমুখে আসিতেছেন। বাদসাহের সপ্তপুত্র তাঁহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া নূতন সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সভাসদ সকলে মিলিয়া একবাক্যে বাদসাহকে বলিতেছে দিনাজপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করা হউক তাহা হইলে তাঁহার সৈন্য এবং বাদসাহের একত্রিত সৈন্য মহাবলে গায়সুদ্দিনকে আক্রমণ করিতে পারিবে। নহিলে এ বিপদ হইতে সহজে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। বাদসাহও এ কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন। অবস্থার কি অন্যায় অত্যাচার! প্রবল প্রতাপ বাদসাহ তিনি—তাঁহার পদতলে ক্ষুদ্র দিনাজপুর কোথায় দলিত হইবে—না তিনিই তাহার নিকট আজ অনুগ্রহ ভিখারী। এই অত্যাচারী অবস্থাটাকে একবার হাতে পাইলে তাহার গলাটিপিয়া মারিলেও বাদসাহের ক্রোধ শান্তি হইত না, কিন্তু তাহা না পাওয়াতে তাঁহার রাগ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "সামান্য দিনাজপুর এতদিনে শাসিত হইল না? সেনাপতি তুমি কোন কর্ম্মের নহ! আমার আজ্ঞা যে তুমি ভাল করিয়া পালন কর নাই ইহা তাহারি প্রমাণ। যেদিকে চাহিতেছি সমস্ত গাফেলি!"

সভাসদগণ নীরব হইয়া রহিল, সেনাপতি বলিল "জাঁহাপনা দিনাজপুরকে যখন ঘেরাও করি তখন আর দুইদিন মাত্র টিঁকিয়া থাকিলেই সে আমাদের হস্তগত হইত, যদি না আপনার আজ্ঞায় আমাকে সে আক্রমণ ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে সুবর্ণগ্রামাভিমুখে

যাইতে হইত।” আজিম খাঁর পিতা বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিলেন “যুবরাজ সেরিস্সুদ্দিন, গায়-স্সুদ্দিনকে বনগ্রামের পথে ঘেরাও করিয়া সেই সময় আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠান—” বাদসাহ বলিলেন, “আমার বিশ্বাস মিথ্যা সংবাদে সেরিস্সুদ্দিনকে গায়স্সুদ্দিন ভ্রান্ত করিয়াছিল।”

মন্ত্রী। মিথ্যা নহে প্রচুর সৈন্যাভাবে বনগ্রামের সমস্ত জলপথ স্থলপথ ভাল করিয়া ঘেরাও করা হয় নাই। একদিন পূর্ব্বে আজিম খাঁ সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিশ্চয়ই গায়স্সুদ্দিন গেরেপ্তার হইতেন।

বাদ। আজম খাঁ তোমারি দোষ! একদিন পূর্ব্বে আসিতে পারিলে যদি আমাদের জয় হইত, তুমি আসিলে না কেন?

আজিম। জাঁহাপনা বর্ষায় পূর্ণভাগা নদীর দুর্দ্দম্য স্রোতে উজান টানিয়া আসিতে একে বিলম্ব হইল, তাহার পর কর্দ্দমময় পথে শীঘ্র কুচ করিয়া চলা অসম্ভব তাই যথা সময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না।”

বাদ। পারিলাম না! কোন সেনাপতির মুখে পূর্ব্বে কখনো এ কথা শুনি নাই! তোমাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।”

সেনাপতি কোন উত্তর করিল না নীরবে ক্রোধ দমন করিল। মন্ত্রী বলিলেন—“যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য শোচনা করায় এখন বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে গায়স্সুদ্দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছেন অতি শীঘ্র তাহাকে দমন না করিতে পারিলে রাজ্য রক্ষা দুরূহ হইবে। দিনাজপুরের সহিত সন্ধিস্থাপিত হইবে কি না এখনি মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।” আবশ্যকের উপর আর কথা নাই; বাদসাহ বলিলেন “আচ্ছা সন্ধির প্রস্তাব কর কিন্তু আবার যেন অস্বীকারের অপমান সহ্য করিতে না হয়।”

আজিম খাঁ এ সম্বন্ধে দিনাজপুরের মত জানিয়াই এ প্রস্তাব করে। সন্ন্যাসিনীকে লইয়া তাঁহাদের বিবাদ—সন্ন্যাসিনীর মুক্তি এবং এই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিনাজপুর নিষ্কর করিয়া দিলে গণেশদেব সন্ধিতে সম্মত ছিলেন। তাহার তরফ হইতে বাদসাহের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বাদসাহও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ হইতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার জন্য গণেশদেবকে রাজসভায় আহ্বান করা হইল। বাদসাহ যে তাঁহার কোন ক্ষতি করিবেন না ইহার প্রমাণ স্বরূপ বাদসাহের পৌত্র সাহেবুদ্দিন সপারিষদ গণেশদেবের শিবিরে জামিন হইয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহ শপথ ভঙ্গ করিলেন। তিনি গণেশদেবকে বন্ধুভাবে ডাকিয়া বন্ধুতার সমাদর দিলেন না। রাজদরবারে গণেশদেব বসিতে অনুরুদ্ধ হইলেন না।

আসল কথা, গণেশদেব সভায় আসিয়া সুলতানকে অভিবাদনপূর্ব্বক যখন উন্নত মস্তকে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে, সমগ্র মূর্ত্তিতে যে অক্ষুণ্ণ দর্প প্রকাশিত হইল; বাদসাহ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাদসাহ হইয়া এই সামান্য যুবকের তেজ গর্ব্ব যে এতদিনে তিলমাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেন নাই ইহাতে মর্ম্মে মর্ম্মে অপমানবেদনা অনুভব করিয়া এইরূপ অবজ্ঞায় প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। বাদসাহের এই অযথা ব্যবহারে সভাসদ্‌গণ মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিল;—কাহারো মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না। ঝটিকার পূর্ব্বাহ্লে যেন চারিদিক নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। বাদসাহ কিছু পরে, ক্রোধরুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"গণেশদেব, তুমি কি চাহ!" গণেশদেব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন লক্ষণ ভাল নহে; এ এ সমস্তই সন্ধিভঙ্গের সূচনা। বলিলেন,—"আমি কি চাই, তাহা পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে; আর আমার প্রস্তাবে জাঁহাপনা সম্মত হওয়াতেই সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আবার যখন আপনি নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, তখন আপনার আজ্ঞায় জানাইতেছি যে, প্রথমতঃ আমি সন্ন্যাসিনীর মুক্তি ভিক্ষা চাই—দ্বিতীয়তঃ এই এক বৎসরের যুদ্ধে আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ স্বরূপ দিনাজপুর নিষ্কর করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদসাহ ভ্রূকুটি কুটীল করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু তোমার বিদ্রোহীতায় আমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ কিরূপে হইবে?"

গণেশ। যুবরাজের সহিত যুদ্ধে আমি আপনার সহায়তা করিব!

বাদসাহ। যে সামন্ত প্রজা তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর কি তাহা নির্ভর করে! তুমি সহায়তা না করিলে ত দণ্ডনীয়। এতদিন রাজবিদ্রোহী হইয়া যে অন্যায় করিয়াছ, তাহার কি শাস্তি?

গণেশ। আপনার একারের মধ্যে আনিবার পূর্ব্বে এ শাস্তির বন্দোবস্ত করিলে ঠিক হইত। বিশ্বাসস্থলে এখন শাস্তির কথা বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র।

বাদসাহ। শঠের সহিত শঠতা বিশ্বাস ভঙ্গ নয়! এরূপ নহিলে শান্তিরক্ষার উপায় নাই। আজিম খাঁ ইহাকে বন্দী কর।"

বাদসাহ যে এতদূর অপ্রকৃতিস্থ-হইবেন, তাহা সভাসদেরা কেহ মনে করে নাই। তাহারা অবাক্ হইয়া রহিল। আজিম খাঁ রাজাজ্ঞা পালনে উদ্যত না হইয়া বদ্ধপদ হইয়া বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। রাজার সহিত তাহারই কথাবার্ত্তা;

তাহার কথাতেই আশ্বস্ত হইয়া গণেশদেব এখানে আসিয়াছেন; সে অজ্ঞাতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কারণ স্বরূপ হইয়াছে। তাহার সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে চাহিল। সে আর নিস্তব্ধে থাকিতে না পারিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা, আপনার কথায় নির্ভয় দিয়া ইহাকে এখানে আনা হইয়াছে, এ বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে আপনার সুনামে অপযশ কলঙ্ক রটিবে,—আর কেহ আপনার কথায় বিশ্বাস করিবে না।"

বাদসাহ বলিলেন—"চুপ বেয়াদব; করিমউদ্দীন, আজ হইতে তুমি সেনাপতি। বে-আদব আজিম খাঁ এবং বিদ্রোহী গণেশকে বন্দী কর; বহু দিন পূর্ব্বে উহাদের এ শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।"

করিম বলিল,—"জাঁহাপনা দ্বারদেশে বিদ্রোহীর সৈন্য সামন্ত রহিয়াছে তাহাদিগকে?"

"তাহাদিগকেও বন্দী কর।"

রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। করিমউদ্দীন আজিম খাঁ ও গণেশদেবকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। মন্ত্রী মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—"সুলতান, করিলেন কি? গায়সুদ্দিন যে আসিয়া পড়িল! আজিমখাঁকে নির্দ্দোষে বন্দী করিলেন! গণেশদেবকে—"

বাদসাহ তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন,—"নির্দ্দোষে! তোমার পুত্র বলিয়া উহাকে এতদিন সেনাপতি রাখিয়াছিলাম; উহার জন্যই ত যত মন্দ ঘটিয়াছে!"

মন্ত্রী বলিল,—"গণেশদেবকে বন্দী করিলেন—আবার দুই দিকে যুদ্ধ!"

বাদসাহ। তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইয়াছে,—গণেশদেব বন্দী হইল, যুদ্ধ করিবে কে?

মন্ত্রী। তাহার সৈন্যেরা! রাজমাতাকে কম জানিবেন, না যতক্ষণ একজনও সৈন্য অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ তাহারা রাজার বন্ধন মোচনের জন্য যুদ্ধ করিবে,—আর সাহেবুদ্দিন বন্দী আছেন; সে বিষয়ে কি ভাবিলেন—এ বার্ত্তা রাষ্ট্র হইবামাত্র যে তাহার প্রাণ যাইবে।"

বাদসাহ। গণেশদেবের যে সৈন্যেরা সঙ্গে আসিয়াছিল—তাহারাও বন্দী; সহজে এ খবর তাহাদের শিবিরে পৌঁছিবে না; এই অবকাশে সাহেবুদ্দিনকে ছাড়াইয়া আন।"

মন্ত্রী। জাঁহাপনা, আপনি হুকুম করিতে পারেন, কিন্তু হুকুম পালন করে কে? আমার কথা শুনুন, নিজের মঙ্গল দেখুন; আজিম খাঁকে ছাড়িয়া দিন; গণেশদেবকে বন্ধু করুন, নহিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সয়তান—সয়তানে আপনাকে ধরিয়াছে।"

বাদসাহ রাগিয়া বলিলেন,—"তোমরাই আমার সয়তান; জান, তোমার পুত্র কুতবই গায়সুদ্দিনের পরামর্শদাতা; তাহার জন্যই সমস্ত বিপদ।"

মন্ত্রী। "সেজন্য আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছি।"

বাদসাহ। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কমে নাই! আমার বেশ বিশ্বাস আজিম খাঁ তাহার সহিত মিলিয়া গুপ্তভাবে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে,—নহিলে এত দিনে শত্রু দমন হয় না, ইহাও কি কাজের কথা!

মন্ত্রী রাগ করিয়া বলিল, "তোবা তোবা! এ কি অবিশ্বাস! কোন্ দিন বলিবেন—আমিও গুপ্তভাবে গায়সুদ্দিনের পক্ষ হইয়াছি।"

বাদসাহ। আমার সন্দেহ হইতেছে! নহিলে তোমার পুত্রের নির্দ্দোষীতা দেখাইতে তুমি এত ব্যস্ত কেন!

পক্বকেশ বৃদ্ধ মন্ত্রী—তাঁহাকে রাজসভায় সকলে সাধুপুরুষ বলিয়া জানে—তিনি আজ রাজমুখে এই কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"সুলতান, আমি চলিলাম, ঈশ্বর আপনার বিপক্ষ, নহিলে এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন! আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম;—কিন্তু বলিয়া চলিলাম আপনার এ যাত্রা উদ্ধার নাই।"

সভাসদগণ সকলে রাজ ব্যবহারে এতই ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়াছিল যে মন্ত্রীর গমনে কেহই বাধা দিল না, থাকিবার জন্য তাঁহাকে একবার অনুরোধ পর্য্যন্ত করিল না। মন্ত্রী চলিয়া গেলেন, একটা নীরব ক্রোধের তরঙ্গ মাত্র সভায় তরঙ্গিত হইতে লাগিল। বাদসাহ তাহার নীরব স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তখন অপরাহ্নকাল। সকাল হইতে আজ বৃষ্টি হইতেছে মেঘাচ্ছন্ন দিনের ম্লান ভাব সভাসদদিগের ম্লান ভাবে মিলিত হইয়া সমস্ত সভা বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেই স্তম্ভিত সভাগৃহ সহসা ঝটিকালোড়নে যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। দুইজন সৈনিক দ্রুতপদে গৃহ প্রবেশ করিয়া বলিল, "বন্দিগি জাঁহাপনা, নবাব সাহ গায়সুদ্দিন গোয়ালপাড়ার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। লাল আরণ্য ফুলের মত সৈন্যদিগের শিরস্ত্রাণ-বস্ত্র শূন্য দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুবরাজ সেরিসুদ্দিন আহত। নবাবসাহ জেলাসুদ্দিন তাঁহার গতিরোধে অপারক। সৈন্য লইয়া সেনাপতি এখনি অগ্রসর হউন।"

বাদসাহের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "আজিম খাঁ! আজিম খাঁকে ডাক।"

করিম উদ্দীন উত্তর করিল "আপনার আজ্ঞায় তিনি বন্দী।"

বাদসাহ চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন "যাও বন্ধন মোচন করিয়া এখানে আন।"

করিম উদ্দিন চলিয়া গেল। কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান বিমর্শ মুখে বলিল "আজিম খাঁ নাই পলায়ন করিয়াছে।"

"পলায়ন করিয়াছে?"

"হাঁ"

"কোথায়!"

"শুনিতেছি, গায়সুদ্দিনের সহিত মিলিত হইবে।" বাদসাহের চারিদিকে বজ্র বাড়ী

তাহার কথাতেই আশ্বস্ত হইয়া গণেশদেব এখানে আসিয়াছেন; সে অজ্ঞাতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কারণ স্বরূপ হইয়াছে। তাহার সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে চাহিল। সে আর নিস্তব্ধে থাকিতে না পারিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা, আপনার কথায় নির্ভয় দিয়া ইহাকে এখানে আনা হইয়াছে, এ বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে আপনার সুনামে অপযশ কলঙ্ক রটিবে,—আর কেহ আপনার কথায় বিশ্বাস করিবে না।"

বাদসাহ বলিলেন—"চুপ বেয়াদব; করিমউদ্দীন, আজ হইতে তুমি সেনাপতি। বে-আদব আজিম খাঁ এবং বিদ্রোহী গণেশকে বন্দী কর; বহু দিন পূর্ব্বে উহাদের এ শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।"

করিম বলিল,—"জাঁহাপনা দ্বারদেশে বিদ্রোহীর সৈন্য সামন্ত রহিয়াছে তাহাদিগকে?"

"তাহাদিগকেও বন্দী কর।"

রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। করিমউদ্দীন আজিম খাঁ ও গণেশদেবকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। মন্ত্রী মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—"সুলতান, করিলেন কি? গায়সুদ্দিন যে আসিয়া পড়িল! আজিমখাঁকে নির্দ্দোষে বন্দী করিলেন! গণেশদেবকে—"

বাদসাহ তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন,—"নির্দ্দোষে! তোমার পুত্র বলিয়া উহাকে এতদিন সেনাপতি রাখিয়াছিলাম; উহার জন্যই ত যত মন্দ ঘটিয়াছে!"

মন্ত্রী বলিল,—"গণেশদেবকে বন্দী করিলেন—আবার দুই দিকে যুদ্ধ!"

বাদসাহ। তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইয়াছে,—গণেশদেব বন্দী হইল, যুদ্ধ করিবে কে?

মন্ত্রী। তাহার সৈন্যেরা! রাজমাতাকে কম জানিবেন, না যতক্ষণ একজনও সৈন্য অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ তাহারা রাজার বন্ধন মোচনের জন্য যুদ্ধ করিবে,—আর সাহেবুদ্দিন বন্দী আছেন; সে বিষয়ে কি ভাবিলেন—এ বার্ত্তা রাষ্ট্র হইবামাত্র যে তাহার প্রাণ যাইবে।"

বাদসাহ। গণেশদেবের যে সৈন্যেরা সঙ্গে আসিয়াছিল—তাহারাও বন্দী; সহজে এ খবর তাহাদের শিবিরে পৌঁছিবে না; এই অবকাশে সাহেবুদ্দিনকে ছাড়াইয়া আন।"

মন্ত্রী। জাঁহাপনা, আপনি হুকুম করিতে পারেন, কিন্তু হুকুম পালন করে কে? আমার কথা শুনুন, নিজের মঙ্গল দেখুন; আজিম খাঁকে ছাড়িয়া দিন; গণেশদেবকে বন্ধু করুন, নহিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সয়তান—সয়তানে আপনাকে ধরিয়াছে।"

বাদসাহ রাগিয়া বলিলেন,—"তোমরাই আমার সয়তান; জান, তোমার পুত্র কুতবই গায়সুদ্দিনের পরামর্শদাতা; তাহার জন্যই সমস্ত বিপদ।"

মন্ত্রী। "সেজন্য আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছি।"

বাদসাহ। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কমে নাই! আমার বেশ বিশ্বাস আজিম খাঁ তাহার সহিত মিলিয়া গুপ্তভাবে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে,—নহিলে এত দিনে শক্র দমন হয় না, ইহাও কি কাজের কথা!

মন্ত্রী রাগ করিয়া বলিল, "তোবা তোবা! এ কি অবিশ্বাস! কোন্ দিন বলিবেন— আমিও গুপ্তভাবে গায়সুদ্দিনের পক্ষ হইয়াছি।"

বাদসাহ। আমার সন্দেহ হইতেছে! নহিলে তোমার পুত্রের নির্দ্দোষীতা দেখাইতে তুমি এত ব্যস্ত কেন!

পক্ককেশ বৃদ্ধ মন্ত্রী—তাঁহাকে রাজসভায় সকলে সাধুপুরুষ বলিয়া জানে—তিনি আজ রাজমুখে এই কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"সুলতান, আমি চলিলাম, ঈশ্বর আপনার বিপক্ষ, নহিলে এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন! আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম;—কিন্তু বলিয়া চলিলাম আপনার এ যাত্রা উদ্ধার নাই।"

সভাসদগণ সকলে রাজ ব্যবহারে এতই ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়াছিল যে মন্ত্রীর গমনে কেহই বাধা দিল না, থাকিবার জন্য তাঁহাকে একবার অনুরোধ পর্য্যন্ত করিল না। মন্ত্রী চলিয়া গেলেন, একটা নীরব ক্রোধের তরঙ্গ মাত্র সভায় তরঙ্গিত হইতে লাগিল। বাদসাহ তাহার নীরব স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তখন অপরাহ্লকাল। সকাল হইতে আজ বৃষ্টি হইতেছে মেঘাচ্ছন্ন দিনের ম্লান ভাব সভাসদদিগের ম্লান ভাবে মিলিত হইয়া সমস্ত সভা বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেই স্তম্ভিত সভাগৃহ সহসা ঝটিকালোড়নে যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। দুইজন সৈনিক দ্রুতপদে গৃহ প্রবেশ করিয়া বলিল, "বন্দিগি জাঁহাপনা, নবাব সাহ গায়সুদ্দিন গোয়াল-পাড়ার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। লাল আরণ্য ফুলের মত সৈন্যদিগের শিরস্ত্রাণ-বস্ত্র শূন্য দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুবরাজ সেরিসুদ্দিন আহত। নবাবসাহ জেলাসুদ্দিন তাঁহার গতিরোধে অপারক। সৈন্য লইয়া সেনাপতি এখনি অগ্রসর হউন।"

বাদসাহের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "আজিম খাঁ! আজিম খাঁকে ডাক।"

করিম উদ্দীন উত্তর করিল "আপনার আজ্ঞায় তিনি বন্দী।"

বাদসাহ চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন "যাও বন্ধন মোচন করিয়া এখানে আন।"

করিম উদ্দিন চলিয়া গেল। কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান বিমর্শ মুখে বলিল "আজিম খাঁ নাই পলায়ন করিয়াছে।"

"পলায়ন করিয়াছে?"

"হাঁ।"

"কোথায়!"

"শুনিতেছি, গায়সুদ্দিনের সহিত মিলিত হইবে।" বাদসাহের চারিদিকে ঘর বাড়ী

লোক জন ঘুরিতে লাগিল; তিনি একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন,—"গণেশদেবকে আন।" উত্তর হইল,—"তিনিও পলাতক!"

"তিনিও পলাতক! মন্ত্রী, মন্ত্রী, উপায় কি!"

উত্তর হইল; "মন্ত্রী এখানে নাই; শুনা যাইতেছে তিনিও গায়সুদ্দিনের সহিত মিলিত হইবেন।"

বাদসাহের শীতল শোণিত এই কথায় সহসা উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"কেহ নাই, সব চলিয়া গিয়াছে! আচ্ছা চল; আমি যাইব; আমি তোমাদের সেনাপতি।"

বাদসাহের এই বিপন্ন অবস্থায় সভাসদগণ তাহাদের ক্রোধ ভুলিয়া গিয়াছিল—রাজার উত্তেজনাবাক্যে সকলেই উত্তেজিত হইয়া সুলতানকি জয় বলিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল। তখনি যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হইল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা কুচ করিয়া গায়সুদ্দিনের গতিরোধে অগ্রসর হইল; পরদিন পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধ বাধিল। এ যুদ্ধের পরিণাম কাহারো বোধ হয় অবিদিত নাই। ইতিহাস বহু দিন পূর্ব্ব হইতে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে দুর্ভাগ্য বাদসাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার শব রক্ষার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব হইতে নির্ম্মিত সুবৃহৎ আদিনা মসজিদের নিস্তব্ধ গুহায় তাঁহার আহত নির্জ্জীব দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইবার জন্য আশ্রয় লাভ করিল। পুত্র গায়সুদ্দিন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন।

নাম-কৌতুক।

মনুষ্য পুত্রকন্যাদিগের হয় বাহ্য নৈসর্গিক পদার্থের নামানুসারে অথবা আধ্যাত্মিক গুণের নামানুসারে অথবা মানব-উপজীবিকা-সূচক নামানুসারে অথবা দেবতার বা সাধু পুরুষের নামানুসারে নাম অথবা সংযুক্ত নাম রাখে।

(১) বাহ্য নৈসর্গিক পদার্থের নামানুসারে নাম যথা,—চন্দ্র, সূর্য্য, গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি।

(২) আধ্যাত্মিক গুণের নামানুসারে নাম যথা,—দয়া, শান্তি, ক্ষমা ইত্যাদি।

(৩) মানব-উপজীবিকা বোধক নামানুসারে নাম যথা,—Mr. Smith Mr. Carpenter প্রভৃতি।

(৪) দেবতা অথবা সাধু পুরুষের নামানুসারে নাম যথা,—কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, বুদ্ধ, Moses, John James ইত্যাদি।

(৫) সংযুক্ত নাম যথা,—John Carpenter, James Smith ইত্যাদি।

ইংরাজদিগের মধ্যে নৈসর্গিক বাহ্য পদার্থানুসারে নাম মনের-উপজীবিকা বৃত্তি

অনুসারে নাম এবং সাধু পুরুষদিগের নাম অধিকতর প্রচলিত দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে বাহ্য নৈসর্গিক পদার্থের নামানুসারে নাম এবং দেবতা ও সাধু পুরুষদিগের নামানুসারে নাম বিশেষতঃ দেবতার নামানুসারে নাম ও আধ্যাত্মিক গুণের নামানুসারে নাম অধিক পরিমাণে প্রচলিত দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে মানব-উপজীবিকা-সূচক নাম, অতি বিরল। ইংরাজদিগের মধ্যে আছে। ইংরাজদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণের নামানুসারে নাম নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে বিলক্ষণ আছে। ইহার দ্বারা হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুরাগ বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দেবতার নামানুসারে নাম রাখা প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ইহাতে তাঁহাদিগের জাতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসের শিথিলতা প্রমাণিত হইতেছে।

নিম্নে দুইটি তালিকা দেওয়া হইতেছে। একটি বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত ইংরাজী নামের তালিকা। অপরটি ইংরাজী অনুবাদের সহিত বাঙ্গালী নামের তালিকা।

বাঙ্গালা অনুবাদযুক্ত ইংরাজী নাম।

Mr. Wood—কাষ্ঠ বাবু।
Mr. Smith—কামার বাবু।
Mr. Carpenter—ছুতার বাবু।
Mr. Ironside—লৌহ-পঞ্জর বাবু।
Mr. Cockburn—মোরগ পোড়াইয়া খাওয়া বাবু।
Mr. Swoyne (Swam এর পুরাতন আকার Swayne)—চাষা বাবু।
Mr. Cotton—তুলা বাবু।
Mr. Hunter—শীকারী বাবু।
Mr. Bright—উজ্জ্বল বাবু।
Mr. Rose—গোলাপ বাবু।
Mr. Moon—চন্দ্র বাবু।
Mr. King—রাজা বাবু।
Mr. Prince—রাজকুমার বাবু।

শেষ পাঁচটি নাম ছাড়া ইংরাজী নামের বাঙ্গালা অনুবাদ কেমন হাস্যকর তাহা পাঠকবর্গ প্রতীতি করিতে সমর্থ হইবেন।

ইংরাজী অনুবাদযুক্ত বাঙ্গালা নাম।

প্রসন্ন বাবু—Mr. Cheerful.
নির্ম্মল বাবু—Mr. Transparent.
গোপাল বাবু—Mr. Cowherd.
যোগিন্ বাবু—Mr. Hermit.
অক্ষয় বাবু—Mr. Indestructible.
কাশী বাবু—Mr. Benares.
পদ্ম বাবু—Mr. Lotus.
শরৎ বাবু—Mr. Autumn.
নবীন বাবু—Mr. Fresh.
রতন বাবু—Mr. Jewel. (এ নাম ইংরাজদিগের মধ্যে পাওয়া যায়)
পূর্ণ বাবু—Mr. Full.
আনন্দ বাবু—Mr. Jolly (এ নামও ইংরাজদের মধ্যে পাওয়া যায়)
বিনয় বাবু—Mr. Politeness.
সত্য বাবু—Mr. Truth.
সঙ্কট বাবু—Mr. Jeopardy.

এক একটি অতি প্রাচীন হিন্দু নাম ইয়ুরোপখণ্ডে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যথা, যাস্ক, মম্মট, দেবদত্ত (Iasche, Mammat, Diodati) আমার কোনও বন্ধু বাতরোগে আক্রান্ত হওয়াতে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, বশিষ্ট দেব প্রস্তুত বাতঘ্ন তৈল স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের দোকান হইতে আনিয়া ব্যবহার করুন, আরোগ্য হইবেন। তিনি আমার কথা শুনিয়া আমাকে প্রথমতঃ পাগল মনে করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐরূপ তৈল আছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসী একজন ইংরাজের নাম Bosisto তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত Eucalyptus Oil ঐ রোগের একটি প্রধান ঔষধ। উহা স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের দোকানে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে নাম রাখা বিষয়ে একটি অতি নিন্দনীয় প্রথা প্রচলিত আছে। সে প্রথা এই যে তাঁহারা এমন করিয়া নাম রাখেন যে, তাহা সংক্ষেপ করিয়া বলিতে গেলেই স্ত্রীলোকের নাম হইয়া পড়ে। যথা,—দুর্গাদাস, কামিনীকুমার, নলিনীকান্ত, মোহিনীমোহন, সুন্দরীমোহন, ইত্যাদি। লোকে সচরাচর এই সকল নামের ব্যক্তিদিগকে ডাকিতে হইলে দুর্গা, কামিনী, নলিনী, মোহিনী, সুন্দরী প্রভৃতি বলিয়া ডাকে। ইহা বড় খারাপ শুনায়। একে বাঙ্গালী মেয়ে মানুষের জাতি, তাহার উপর মেয়েলী নাম, সোনায় সোহাগা।

বাঙ্গালী কোনও কোনও বংশের মধ্যে ইন্দ্র ও কৃষ্ণ প্রভৃতি উপাধিযুক্ত নামের বড় ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক সময়ে ইন্দ্রওয়ালা অথবা কৃষ্ণওয়ালা নাম রাখিতে হইলে নাম তৈয়ার করা বড় মুস্কিল হইয়া উঠে। একবার ইন্দ্র উপাধি সংযুক্ত নাম যে বংশে অতি সাধারণ সেই বংশের কোন ব্যক্তিকে আমি উপহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে আপনারা "ইন্দ্র" সংযুক্ত সকল নামই প্রায় শেষ করিলেন, একটি নাম কেবল বাকি আছে—অর্থাৎ ইন্দ্রেন্দ্র, ইন্দ্রের ইন্দ্র।

যেমন কোন কার্য্যালয়ে কিম্বা কোনও সৈন্যদলে নূতন রক্ত সঞ্চার (Infusion of new blood) অর্থাৎ নূতন লোক প্রবেশ করান আবশ্যক হয়, তেমনি অন্যান্য হিন্দু অথবা বৌদ্ধ দেশ হইতে উত্তম নূতন নাম সকল গ্রহণ করা আমাদের বঙ্গদেশে এক্ষণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যথা,—বিনায়ক, ধর্ম্মপাল, গুণরত্ন, গুণশেখর, সুমঙ্গল প্রভৃতি নাম। শ্যামদেশের এক রাজকুমারীর নাম "কুমারী রত্ন" ছিল। আমার এক অতি নিকট সম্পর্কীয় বালিকার নাম "কুমারী রত্ন" রাখিয়াছি। শ্যামদেশের এক রাজ কুমারের নাম "স্বস্তি শোভন" (অর্থাৎ মঙ্গল গুণে যিনি শোভা পাইতেছেন) ছিল। আমার এক অতি নিকট সম্পর্কীয় বালকের ঐ নাম রাখিতে মানস প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পিতা মাতা ঐ নাম কটমটে মনে করিয়া রাখেন নাই। কোনও কোনও ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশ করিবার জন্য ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষার সাহায্য কখনও কখনও আবশ্যক হয়। আমি অনেকদিন 'স্ত্রীলোক বন্ধু' এই ভাব প্রকাশ

করিবার জন্য ভাল শুনায় এমন শব্দ প্রস্তুত করিতে পারি নাই তৎপরে এক উড়িয়া গানেতে তাহা পাইলাম। তাহা "বান্ধবী" শব্দ। এইরূপ শব্দ একবার বাহির হইলে, তাহা বাহির করা সহজ কাজ লোকের বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহা সর্ব্ব প্রথমে বাহির করা বড়ই কঠিন কার্য্য। আমি অনেক দিন Popular Assembly বাক্যের উপযুক্ত বাঙ্গালা শব্দ খুঁজিতে ছিলাম। পরিশেষে তাহা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পাই। সেই শব্দ "সার্ব্বজনিক সভা"। মনের কোনও কোনও ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশ করিতে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষার সাহায্য যেমন আবশ্যক হয়, তেমনি ব্যক্তির উত্তম নাম রাখা বিষয়েও তাহা আবশ্যক হয়।

কোনও কোনও বাঙ্গালী অতি দীর্ঘনাম প্রিয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বৈঁচী ষ্টেশনের নিকট "অকাল পৌষ" নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় অন্যান্য বাঙ্গালী গ্রামের ন্যায় দলাদলির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। উক্ত গ্রামে দুইটি দল আছে। একদলের দলপতি আপনার কন্যার নাম "শরদেন্দুনিভাননা" রাখিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষদলের দলপতি তাঁহাকে জিতিবার জন্য তাঁহার কন্যার নাম এত বড় রাখিয়াছিলেন যে আমি একেবারে তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। ইংলণ্ডের ক্রমওয়েলের কালের ধর্ম্মোন্মত্ত পিউরিটনদিগের প্রাদুর্ভাব সময়ে একটি লোকের নাম ছিল,—If God (Christ) had not died for thee, thou wouldst have been damned Barebone." লোকে এত বড় নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া সচরাচর তাঁহাকে "Damned Barebone" বলিয়া ডাকিত।

কোনও কোনও বাঙ্গালী হিন্দু কন্যার ইংরাজী নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, কোন্নগর নিবাসী কোনও ব্যক্তি তাঁহার কন্যার নাম (Victoria mitra) 'ভিক্টোরিয়া মিত্র' রাখিয়াছেন। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। আমার কোনও হিন্দু বন্ধু স্বীয় কন্যার নাম (Romola) রমলা রাখিয়াছেন, ইহা জর্জ্জ এলিয়টের এক উপন্যাসের নাম। এই নামটি অনেক পরিমাণে কিন্তু হিন্দু নামের মত শুনায়।

ইংরাজদিগের ন্যায় এক্ষণে অনেক বাঙ্গালী স্ত্রী স্বীয় নামে বংশ উপাধি যোগ করিয়াছেন। যথা,—বসন্তকুমারী মিত্র, নলিনীবালা ঘোষ, কুমুদিনী বসু, শরৎকুমারী চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। আমার বিবেচনায় এরূপ বংশোপাধিযুক্ত নাম পুরুষের নামের মত শুনায়। বিশেষতঃ এই সকল নাম যথা,—সরলাবালা পৈতণ্ডী, সৌদামিনী গড়গড়ি, জ্ঞানদা পাত্র, মনোরমা সেনাপতি, রাধামণি পাঁড়ে ইত্যাদি। যদি একান্ত বংশউপাধি দিতে হয়, তবে এইরূপে দেওয়া উচিত ; যথা,—দেবী, অথবা চট্টোপাধ্যায় কুমারী মৃণালিনী দেবী ; মিত্র জায়া শ্রীমতী নলিনীবালা দাসী বা মিত্রজায়া শ্রীমতী নলিনীবালা মিত্র, কুমারী নলিনীবালা দাসী অথবা মিত্র কুমারী নলিনীবালা।

এ বিষয়ে অনেক লেখা যাইতে পারে। বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা প্রযুক্ত অধিক লিখিতে

পারিলাম না। ভরসা করি, আমার কোনও পাঠক আমার এই সংক্ষেপ প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

স্বরলিপি।

বেহাগড়া—ঝাঁপতাল।

গ১ ম১ প১ প১ ধপ১ মপ১ ম১ গ১*
প১ ধ১ । র্স১ র্স১ নোধ১ । পধ১ প১ । ম১ গ১ মগ১ । র১
ধী রি ধী রি — প্রা ণে আ মা র এ

গ১ । রগ১ মপ১ ম১ । গ১ —র১ । স৩ । স১ স১ । গ২ ম১ ।
— — — স হে — — — ম ধু র হা

শেষ।

প১ প১ । — ন১ ন১ । র্স১ নর্স১ । ধন১ র্সর্১ র্স১ ।
সি য়ে — ভা ল বে — — — স

ন১ —ধ১ । প৩ ॥ প১ প১ । প২ প১ । ধ২ । ধ২ ন১
হে — — — হৃ দ য় কা ন নে —

(আ—প্র)

র্স১ র্গ১ । র্র১ র্গর্১ র্স১ । ন১ ধন১ । র্স৩ । র্স২ । র্স২ র্স১ ।
ফু — ল — ফু টা — ও আ ধ ন

ন১ ন১ । নর্সন১ ধ১ ন১ । র্স২ । —২ নধপ১ । র্স১ নধন১ ।
য় নে স — খি চা — ও চা —

প৩ । প১ ন১ । র্স২ র্স১ । র্স১ ধ১ । নো২ নোধ১ । পধ১
ও প রা ণ কাঁ দি য়ে দি য়ে হা

---

* শেষবার পুনরাবৃত্তির কালের উপরের সুর গাহিতে হইবে।

ধ১ । প২ ম১ । মপ১ ম১ । গ৩ ॥
সি খা নি হে স হে ।

(আ—প্র)

সিন্ধু—একতালা।

স১ স১ । ধ২ ধ১ । নো২ ধ১ । প৩ । —১ প১ প১ । ম২
তু মি আ ছ কোন্ পা ড়া — তো মার পাই
শেষ।

প১ । ম১ রম১ গো১ । র৩ । —৩ । স১ স১ । র২ র১ ।
নে যে সা — ড়া — প থের ম ধ্যে

র২ গ১ । ম১ প২ । র২ ম১ । গো১ গো১ র১ । স৩ । —১ ॥
হাঁ ক রে যে রই লে হে থা — ড়া —

(আ—প্র)

—৩ ॥ স১ ধ১ ধ১ । —১ ধ২ । ধ১ নো২ । ধ১ প২ ।
— রো দে প্রা ণ যায় দু পুর বে লা

ধ১ ধ১ ন১ । র্স১ র্র২ । র্স১ ধর্স১ নো১ । ধ১ প১ ধপ১ ।
ধ রে — ছে উ দ রে — জ্বা লা —

ম২ প১ । প১ প২ । ম১ প২ । ধ১ প২ । —১ প১ প১ ।
এর কা ছে কি হৃ দয় জ্বা লা — তো মার

র১ ম২ । গো২ গো১ । র১ স২ । —১ ॥ —৩ । স১ স১
স কল সৃ ষ্টি ছা ড়া — — রা ঙা

(আ—প্র)

ধ১ । ধ১ ধ২ । ধ১ নো২ । ধ১ প২ । ধ১ ধ১ ন১ । র্স১
— অ ধর ন য়ন কা লো ভ রা — পে

র^{২}। র্স^{১} নো^{২}। ধ^{১} প^{২}। —^{১} প^{১} প^{১}। ম^{১} প^{২}।
টেই লা গে ভা ল — এ খন পে টের

প^{২} প^{১}। ম^{১} প^{২}। ধ^{১} প^{২}। র^{২} ম^{১}। গো^{১} গো^{১}
ম ধ্যে না ড়ী গু ল দি য়ে ছে তা

র^{১}। স^{৩}। —^{১} ॥
— ড়া —

(আ—প্র)

আপেল আঘ্রাণে।

আরিষ্টটেল বলিলেন। "মূল ব্যতীত শাখা প্রশাখার উদ্গম হয় না, সমগ্র ব্যতিরেকে অংশের অস্তিত্ব নাই। যদি ইহসংসারে বিলাসে প্রবৃত্ত না হইয়াও অন্তরে সংসারের প্রতি আসক্তি রাখ তাহা হইলে তাহাতে তোমার বিরাগ সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সংসারের প্রতি আসক্তির মূল আত্মরক্ষার অন্তরে নিহিত। সেই জন্য কাহারও যদি বিলাসে বিরাগ জন্মে অথচ পৃথিবীতে থাকিবার কামনা থাকে তবে সে ব্যক্তি মূলত্যাগ করিয়া শাখামাত্র জড়াইয়া ধরে, কিন্তু যিনি মূল ও শাখা উভয়ই জানিয়াছেন তিনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চরমফল প্রাপ্ত হন।

সিমিয়স। সংসারের ভোগবিলাসসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি পরিমিতাচারী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনার কথা শুনিয়া সংসার ত্যাগের বাসনায় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হে মানবগুরু! এ বাসনা যদি নিতান্তই নিষ্ফল হয় তবে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ও আপনার অনুমোদিত পথে জীবন পরিচালিত করিতে যত্নশীল হইব।

ক্রাইটস। আমার মানশ্চক্ষু আমায় এখন দেখাইতেছে যে একমাত্র 'জ্ঞানবান' ব্যতীত এমন কেহ নাই যাহার নিকট মৃত্যু দুঃখের কারণ নহে। যিনি জ্ঞানসোপানের চরমপদে উঠিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন তিনি মৃত্যুলাভে ইচ্ছুক ও মৃত্যু অন্বেষণ করুন। কিন্তু যে কেহ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহারা মৃত্যু হইতে যত দূর সাধ্য দূরে থাকিতে এবং মৃত্যুকে পরিত্যাগ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। কারণ কেবলমাত্র জ্ঞানই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে এবং মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে আমাদের উদ্ধার করিতে পারে।

জিনো। আরিষ্টটেলের উপদেশানুসারে আমাদের সুখভোগ করার ও সংসারে থাকিবার কামনা করারও অধিকার নাই। তিনি যে আমার ন্যায় মৃত্যুকে ভয় করেন না

(যদিও আমিও বিশেষ ভয় করি না) তাহার কারণ এই যে তিনি আপনার সমস্ত বিষয় ঠিক পরিস্কার রাখিবার জন্য আমাপেক্ষা অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আমিও যদি আমার নিজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া লোভ ক্রোধ বাসনা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারিতাম তবে উঁহার যে প্রকার সাহস দেখা যাইতেছে আমারও সেই প্রকার সাহস দেখা যাইত।”

অপর শিষ্য। “অদ্যকার পূর্ব্বে আমি বরাবর মৃত্যুর শঙ্কায় ভীত হইতাম কিন্তু এখন আমি জীবনের দীর্ঘতাকেই ভয় করিতেছি।”

জিনো। “জীবন বৃদ্ধি করাপেক্ষা মৃত্যু লাভ করাই তো আমাদের পক্ষে সহজ সিদ্ধ।”

উক্ত শি। আমার জীবনের প্রতি বীতরাগে মৃত্যুর আগমনের পূর্ব্বেই মৃত্যুকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে না।”

জিনো—“আমরা জানি অপরিচিত বন্ধুকে দর্শনেচ্ছায় অনেক লোকে বহু প্রয়াস পাইয়াছে। তুমি যদি মৃত্যুকে বন্ধু ভাব কি হেতু মৃত্যুকে তাহার আগমনের পূর্ব্বেই না অন্বেষণ কর?”

উত্তর। “মৃত্যু বন্ধু নহে; সেতু মাত্র। মনুষ্য যাহা চায় ও ভালবাসে তাহা লাভ করার পূর্ব্বে এই সেতু পার হইতে হয়।”

জিনো—“তুমি যদি নিশ্চয় জান যে মৃত্যু তোমায় মহত্তর করিবে তবে তুমি কেন এখানে থাক?”

উত্তর। “জ্ঞানী গিরি পথের রক্ষক স্বরূপ। সে যদি সীমার মধ্যে থাকে তবে অনিচ্ছা সহকারে থাকে, আর সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দিক্‌বিজয় করিলে জয়লাভ করে।”

জিনো—“তোমার উপমার অর্থ কি?”

উত্তর। “জ্ঞানীর আত্মা সীমান্ত দেশের গিরিপথে অবস্থিত। গিরিপথ এই দেহ—অপরদিকে অভাব কাম ক্রোধাদি অবস্থান করিতেছে। আত্মা মাত্রেরই এই রিপুবর্গের সহিত সংগ্রাম করিতে এবং তাহাদিগকে দূরে রাখিতে দুরূহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। মৃত্যুকালে যে আনন্দ ও সুখলাভ করে তাহাতেই তাহার যশ।”

আলোচনা এই অবস্থায় পৌঁছিলে লিসিয়াস বলিলেন “অজ্ঞ অপবাদ হইতে মুক্ত হওয়া ভিন্ন যদি “জ্ঞানীর—নামে” অপর কোন ব্যবহার না থাকে কেবল মাত্র তাহার জন্য আমি এনাম চাহি না।”

জিনো।—“এই আখ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষী হইবার অপর কোন উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও কেবল মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমি জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক।”

ক্রাইটন। “এই শাস্ত্রের (অর্থাৎ দর্শনের) প্রধান উপকার এই যে ইহার দ্বারা আমাদের নানা ভাবনার বিষয় একটীতে পর্য্যবসিত হয়।”

ক্রমিয়সিঃ—“এ সংসারে যখন কেবল দুঃখই স্থায়ী তখন যিনি কোন চিরস্থায়ী

বিষয়ের অনুষ্ঠানে রত তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।"

পিণ্ডার "পৃথিবীর সকল মনুষ্যই যুদ্ধে ব্যাপৃত। যোদ্ধার প্রধান কর্ত্তব্য নিকটস্থ শত্রু উচ্ছেদ করা। আপনার মনের উৎপাতই মানুষের শত্রু।"

ইনের্টস। "মানুষের শত্রু কি ?"

পিতার। "মনের সুখইচ্ছা। কারণ তাহা জ্ঞানান্বেষণের বিরোধী।"

এই সময় সিমিয়াস আরিষ্টটেলের প্রতি চহিয়া বলিলেন "হে পিতঃ—প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে তাহার শেষ আলোক রশ্মি দ্বারা আমাদের মনান্ধকার দূর কর।"

আরিষ্টটেল বলিলেন "সেই ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানলাভে সমর্থ যে জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে সংযত ও সংশোধিত করে। যে বক্তা বক্তৃতার পূর্ব্বে চিন্তা করেন তিনিই উৎকৃষ্ট বক্তা। ভাবিয়া চিন্তিয়া যিনি কার্য্য করেন তিনিই কার্য্যদক্ষ। কার্য্য করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা ও সতর্ক হওয়া জ্ঞানীর পক্ষে যত আবশ্যক তত আর কাহারও নহে। কারণ তাঁহাদের বর্ত্তমানে কার্য্য ও ভবিষ্যতে সুখ। চিন্তা দ্বারা দৃষ্টিশক্তি লাভ হইলে দৃষ্টি দ্বারা তিনি কার্য্য করিবেন। দৃষ্টি দ্বারা যদি বুঝিতে পারেন যে এই কার্য্যে ভবিষ্যতে তাঁহার সুখ হইবে তবে বর্ত্তমানে সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি সে কার্য্য করিবেন।

এইরূপে দৃষ্টি দ্বারা যখন তিনি কার্য্যে কৃত সঙ্কল্প হইয়া কার্য্য করেন তখন ফললাভের সময় তাহার পূর্ব্ব কার্য্যের জন্য বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। যিনি সংসার সুখ হইতে আপনার আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করেন মৃত্যুর পর যিনি পুরস্কার বাঞ্ছা করেন তিনি যদি মৃত্যুকালে দুঃখিত হয়েন তবে আপনাকে হাস্যাস্পদ, হেয় করেন। যেমন একজন লোক প্রাসাদ প্রস্তুতের পূর্ব্বে সেই উপলক্ষে যদি বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব করেন আর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে দুঃখিত হন তবে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হন। আমি এরূপ লোককে জানি যাঁহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহবান অথচ তাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বনকারী; এরূপ লোকের মৃত্যুকালে বিমর্ষ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে তাঁহারা মৃত্যুর পর পুরস্কার লাভে বিশ্বাস করেন তাঁহারাও যে মৃত্যুর সময় বিমর্ষ হয়েন তাহাই আশ্চর্য্য।"

ক্রাইটান বলিলেন "হে গুরু আপনি চাহেন যে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিলে পর আমরা আপনার বিচ্ছেদ প্রশান্ত মনে সহ্য করিব। কিন্তু আপনার এক্ষণকার উৎকৃষ্ট এই উপদেশ স্মরণ করিয়া (অর্থাৎ আপনি কিরূপ সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেন তাহা মনে হইলে) আপনার বিরহে আমাদের দুঃখ আরও বলবতী হইবে। আপনার মৃত্যু আপনার পক্ষে শুভ কিন্তু আমাদের পক্ষে অশুভ। কারণ আমাদের মনের জটিল প্রশ্ন সকলের আর কে মীমাংসা করিয়া দিবে ?"

ডাইওজিনিস বলিলেন, "পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন না হইলে একই বস্তু একের পক্ষে শুভ ও অপরের পক্ষে অশুভ হইতে পারে না। আরিষ্টটেলের মৃত্যু যদি তাঁহার পক্ষে শুভ ও আমাদের পক্ষে অশুভ হয় তবে নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার সহিত বিরোধী ভাবাপন্ন।"

ক্রাইটান—"তাঁহার সহিত কতক বিষয়ে আমাদের সমভাব আছে কতক বিষয়ে বিরোধিতা আছে। আমাদের বাসনা একই তবে উহার গমনে ও আমাদের থাকায় আমরা বিরোধী।"

অন্য দুইজন—"আরিষ্টটেলের স্বর্গ গমন হেতু তোমরা দুঃখিত নও—তোমরা এই মর্ত্ত্যে আছ বলিয়া দুঃখিত।"

লিসিয়াস বলিলেন, "তোমরা দুই জনেই বেশ ভাল কথা বলিতেছ। প্রজ্বলিত দীপ-মালাশোভিত গৃহের তোমরা সকলে এক একটী স্তম্ভ স্বরূপ। তাহার প্রধান স্তম্ভটী পড়িয়া গিয়াছে, অন্যান্য স্তম্ভের উপর ভার পড়িয়াছে। প্রধান দীপটী নির্ব্বাপিত হইলে গৃহের আলোক কম হইয়া যায়। অন্য স্তম্ভের পতন বা দীপের নির্ব্বাণ তোমাদের কর্ম্মের কারণ নহে কিন্তু অতিরিক্ত ভার বহন ও অন্ধকার তোমাদের কর্ম্মের হেতু।"

সিমিয়াস আরিষ্টোটলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে জ্ঞানের পথপ্রদর্শক, আমা-দিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন যে জ্ঞান-অন্বেষণকারীর প্রথম কোন্ তত্ত্বে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।"

আরিষ্টটেল বলিলেন, "যখন দেখা যাইতেছে আত্মাই জ্ঞানের মূল তখন প্রথমতঃ আত্মার জ্ঞানই আবশ্যক।"

সিঃ—"কি করিয়া তিনি সে তত্ত্ব লাভ করিবেন ?"

আঃ—"নিজের গুণে।"

সিঃ—"নিজের গুণ কি ?"

আঃ—"সেই গুণ যাহা দ্বারা তুমি আমাকে নিজ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ?"

সিঃ—"আপনার নিজ সম্বন্ধে কিরূপে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব।"

আঃ—"রোগী যেমন চিকিৎসককে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। অন্ধ যেমন অপরকে আপনার আকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।"

শিঃ—"আত্মাই যখন জ্ঞানের মূল তখন আত্মা কিরূপে নিজ সম্বন্ধে অন্ধ হইবে।"

আঃ—"জ্ঞান যখন আপনার অর্থাৎ আত্মার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, আত্মা তখন নিজ সম্বন্ধে এবং অপর সম্বন্ধে অন্ধ। যেমন আলোক বিনা চক্ষু নিজ সম্বন্ধে ও অপর-সম্বন্ধে অন্ধ।"

সিমিয়াস। "আলোক দ্বারা দর্শক যেরূপ দৃষ্টিলাভ করেন শিক্ষার্থী সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা শিক্ষালাভ করেন।"

আঃ—"আত্মা আপনার বিশুদ্ধতা দ্বারা জ্ঞানলাভের উপযোগী হয় চক্ষু যেরূপ

আলোক দ্বারা তীক্ষ্ণতা লাভ করে। উভয়ে যখন সম্মিলিত হয় তখন তার দৃষ্টি ক্ষমতা জন্মে।"

সিমিয়াস—"আত্মা এবং চক্ষু যদি জ্ঞান ও দীপ ভিন্ন জ্যোতিলাভ করিতে না পারে তাহা হইলে জ্ঞানই আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়।"

আঃ—ইহাতে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে? কোন বস্তু তাহার মূল কারণের সহিত যত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ তত উহা যাহাতে প্রবেশ করিতেছে তাহার সহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানের মূল আত্মা অতএব আত্মার সহিত জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ছাত্র অপেক্ষা গুরুর কি বিদ্বান্ নামে অধিকার বেশী নয়? গুরু বিদ্যার মূল কারণ তাহার নিকট হইতেই বিদ্যা প্রবাহিত হয়।

মিসিয়াস বলিলেন, "এ বিষয় ত শেষ হইয়াছে এখন আমি অন্য কথা বলিতে চাহি। আত্মার তত্ত্ব প্রথমতঃ লাভ করা ভাল কেন তাহা আমাকে বলুন।"

আরিঃ—কারণ গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই পক্ষে ইহা সত্য যে জ্ঞান আত্মা হইতে জন্মে।

লিসিয়াস—আমরা কি করিয়া জানিব যে জ্ঞান আত্মার বস্তু।

আরিঃ—যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে ততক্ষণ জ্ঞান থাকে। আত্মা না থাকিলে জ্ঞানও থাকে না।

লিসিয়াস—আত্মা হইতে না আসিয়া শরীর হইতেও ত জ্ঞান আসিতে পারে।

আরিঃ—জ্ঞান যদি শরীর হইতে উৎপন্ন হইত তবে জীবিত শরীরের ন্যায় মৃত শরীরেরও জ্ঞান থাকিত।

"মৃতদের জ্ঞানের বিষয়ও কিছু আমরা জানি না, অজ্ঞানতার বিষয়ও কিছু জানি না। ইহাদের এই জ্ঞানহীনতা যাহার বিষয় আমরা কিছু জানি না তাহা কি আত্মা হীনতা হইতে উৎপন্ন?

নিজ সম্বন্ধে অন্ধতাই যদি অজ্ঞানতা হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীরের অজ্ঞানতা মৃত্যুর পর শরীরের অজ্ঞানতা হইতে আরও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। আচ্ছা, মৃতদেহে নিজ সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকিলেও জীবিতের ন্যায় তাহার অন্ধ প্রবৃত্তিপরায়ণতা ত নিশ্চয়ই নাই?

আরিঃ—এই উভয় অন্ধতার মধ্যে পার্থক্য কি?

লিসিঃ—উভয় একই বা কি প্রকারে?

আরিঃ—উভয়ে এক প্রকার এইরূপে যে উভয়েই লোকের জ্ঞানহানির কারক। প্রবৃত্তির অন্ধপরায়ণতা মন্দ কার্য্য মন্দ কথার ন্যায় এবং অজ্ঞানের অন্ধতা কোন পচা দ্রব্যের দূষিত গন্ধের ন্যায়।

লিসিয়াস—যতক্ষণ লোকের প্রাণ থাকে ততক্ষণই লোকে মন্দ কার্য্য করে তবে এই মন্দ ভাব শরীরের না হইয়া আত্মার হওয়াই সম্ভব নয় কেন?

আঃ—আত্মা ঘটনা চক্রে পড়িয়া দোষ গ্রস্ত না হইয়া আত্মাই যদি দোষমূলক মন্দ বস্তু হইত তবে প্রত্যেক আত্মাই মন্দ হইত। কেহ দোষ হীন হইতে পারিত না। তাহা হইলে জ্ঞানী যোগীগণের আত্মাই বা কি প্রকারে দোষ মুক্ত হইত? কিন্তু আমরা জানি যে অনেকে রিপুকে পরিহার করিয়া আত্মা দোষমুক্ত করিয়াছেন।

লিসিয়াস—যদি আত্মা ও রিপুর মধ্যে এত প্রভেদ তবে উভয়েই কেন এক সময়ে তাহাকে ত্যাগ করে?

আরিঃ—আত্মা একটী আলোক শিখা, যখন শরীরের কোন একটী প্রবৃত্তি প্রবল হয় তাহার দ্বারা অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ দহন করে প্রবৃত্তি সেইরূপ শরীর দগ্ধ করে, কাষ্ঠ দগ্ধকালে যেরূপ তাহা হইতে উত্তাপ ও আলোক নির্গত হয়—প্রবৃত্তির কার্য্যকালেও সেইরূপ আত্মার আলোক বহির্গত হয়।

লিসিয়াস—সম্ভবতঃ সে আলোক উত্তাপ হইতে নির্গত হয়।

"উজ্জ্বলতা যদি উত্তাপের ফল হইত তাহা হইলে গ্রীষ্মকালের রাত্রি শীতকালের দিন অপেক্ষা উজ্জ্বল হইত কারণ শীতকালের দিন অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের রাত অধিক গরম।"

লিসিয়াস বলিলেন "হে গুরু আপনি আমার মনের অনেক অন্ধকার দূর করিয়াছেন। এ সকল কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া আমি প্রবৃত্তির উত্তাপ ও আত্মার আলোকের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে প্রবৃত্তি, শরীর ও তাহা হইতে আত্মার বিভিন্নতা ও গুণাগুণ বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখন আত্মার কার্য্য ও প্রবৃত্তির কার্য্যের বিভিন্নতা বুঝাইয়া দিন।"

আরিঃ—তুমি তাহাদের কার্য্যের বিভিন্নতা কিছু জান কি?

"আমি তাহাদের বস্তুত্বের পার্থক্য জানি না কিন্তু কার্য্যের বিভিন্নতা অল্প বুঝিতে পারি। আপনি সুস্পষ্ট রূপে উভয়ের বিভিন্নতা বুঝাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি উভয়ের কার্য্য অর্থাৎ কোন কার্য্য কাহার তাহা বুঝিতে পারি।"

"যাহা কিছু মন্দ তাহা প্রকৃতির কার্য্য যাহা ভাল তাহা আত্মার কার্য্য।"

"আমি উভয়ের সম্বন্ধেও যেমন বুঝি একের ভাল কার্য্য ও অপরের মন্দ কার্য্য সম্বন্ধেও সেই প্রকার বুঝি।"

"যাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর তাহাই ভাল যাহাতে হানি করে তাহাই মন্দ"।

"এমন কোন অবস্থা ঘটে নাই যাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইয়াছে। যদি একদিকে ভাল হয় তবে তাহা দ্বারা অন্যদিকে কোনরূপ হানি হয়, যাহা দ্বারা কিছু হানি হয় তাহাকে ভাল বলিব কিরূপে?"

"যে অংশে মঙ্গল তোমার অধিক আবশ্যক সেই অংশে উপকার হইয়া যদি হেয় অংশে অপকার হয় তাহা হইলে বিরক্ত হইও না।"

"আমার কোন অংশ হেয় ও কোন অংশ উত্তম।"

"বুদ্ধি তোমার উত্তম অংশ ও জ্ঞানহীনভাগ হেয়াংশ।"

"তাহাতে কি হইল?"

"যাহাতে তোমার জ্ঞানহীনতার হানি হয় তাহার দ্বারাই তোমার বুদ্ধির উন্নতি হয় সেই জন্য যাহা দ্বারা তোমার বুদ্ধির উন্নতি হয় তাহাই ভাল জানিবে তাহাতে যদি অবুদ্ধির ক্ষতি হয় তাহাতে হানি নাই। অবুদ্ধির ক্ষতি দ্বারা যে হানি হয় সে হানি বুদ্ধির উন্নতিরূপ মঙ্গল।"

"আপনি উত্তাপ ও আলোক প্রবৃত্তি ও আত্মার সদৃশ বলিলেন এবং তাহাদের উৎপত্তির বিভিন্নতা হইতে কার্য্যের বিভিন্নতা দেখাইলেন। তাহার পর আমি আপনাকে এরূপ একটী সঙ্কেত দেখাইতে বলিলাম যাহা দ্বারা ইহাদের প্রত্যেকের কি কার্য্য দেখা যায় ও কার্য্য হইতে বিভিন্নতা বুঝা যায়। আপনি বলিলেন যাহা কিছু ভাল তাহা আত্মা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এবং যাহা মন্দ তাহা প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। আমি আপনাকে ভাল মন্দের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনি বলিলেন যাহাতে জ্ঞানের উন্নতি হয় তাহাই ভাল যাহাতে হানি হয় তাহা মন্দ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা পরস্পরের বিরোধী। যাহাতে একের উন্নতি তাহাই অপরের পক্ষে অবনতি। এখন আমাকে বলুন কি কার্য্য দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি হয় এবং কিসের দ্বারা অবনতি হয়?"

"যাহা দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিস্কার হয় তাহাই উন্নতিকর যাহার দ্বারা অস্পষ্ট হয় তাহাই অমঙ্গল কর।"

"কিসের দ্বারা উজ্জলতা হয় এবং কিসে মলিনতা হয়?"

"সত্য কথা বলা এবং তদনুরূপ কার্য্য দ্বারা বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়, সন্দেহ এবং তদনুরূপ কার্য্যে মলিন হয়।"

"সত্য দ্বারা বুদ্ধি উজ্জ্বল হয় এবং সন্দেহ দ্বারা মলিন হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য কি?"

"উচিত কার্য্য ও ন্যায় সত্যে অনুরাগ; অনুচিত কার্য্য ও অন্যায় সন্দেহে অনুরাগ?"

"ন্যায় ও সত্যের সাদৃশ্য কিসে?"

"উভয়েই ঘটনাকে তাহার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখে"

"মিথ্যা ও অন্যায় একরূপ কিসে?

"উভয়েই ঘটনাকে স্বস্থানচ্যুত করে।"

"ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করা বিচারকের কার্য্য আমি কেবল সাধারণ বিষয় আপনার কাছে জানিতে ইচ্ছুক।"

"প্রত্যেক মনুষ্যই বিচারক। কেহ বা রাজ কার্য্যের বিচারক কেহ সাধারণ কার্য্য বিচারক। যাহার বিবেচনার ভ্রম সে মিথ্যা কথা বলে পরের দ্রব্য গ্রহণ করে সে অপরাধী ও মিথ্যাবাদী। যে সত্য পথ দেখিতে পায় সে সত্য কথা বলে আপনার

ধনে সন্তুষ্ট থাকে সে সত্যবাদী ও ন্যায় পরায়ণ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মানুষের প্রত্যেক কার্য্য বিভক্ত।”

“কি করিয়া আমি জানিব যে মানুষের প্রত্যেক কার্য্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত? আর কোন শ্রেণী নাই?”

“যে সকল ঘটনা বর্ত্তমানে ঘটিতেছে বা ঘটিবার সম্ভাবনা ও পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখ যে দুই শ্রেণী বহির্ভূত কার্য্য আছে কি না?”

“যাহা এখনও ঘটে নাই তাহার সহিত আমি কিরূপে যাহা ঘটিয়াছে তাহার তুলনা করিব?”—“অংশ যদি সমুদয়ের অন্তর্গত হয় এবং অংশতে যাহা আছে সমুদায় যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তুমি যে যে ঘটনা দেখিয়াছ তাহা তোমার দৃষ্টিবহির্ভূত সমুদয় ঘটনার অংশ এই হেতু তুমি এই অতীতের দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনার গুণাগুণ বুঝিতে পার।”

“কিরূপে বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ বিচার করিব?”

“যাহা বর্ত্তমান তাহা দ্বারাই ভবিষ্যৎ বিচার করিবে। অর্থাৎ যাহা দ্বারা তুমি ভবিষ্যতের অনুপস্থিতি ও বর্ত্তমানের অস্তিত্ব বুঝিতেছ তাহার দ্বারাই বিচার করিবে।”

“ভবিষ্যৎ জ্ঞান না থাকিলে কি বর্ত্তমান জ্ঞান থাকিতে পারে না? অনুপস্থিতের জ্ঞান না থাকিয়াও উপস্থিতের জ্ঞান থাকিতে বাধা কি? পৃথিবীর যে অংশ আমি দেখিতে পাইতেছি তাহা দ্বারা যে অংশ আমি দেখিতে পাইতেছি না তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার যে অংশ দেখিতে পাইতেছি না তাহার দ্বারা যাহা দেখিতেছি তাহা দেখিবার বাধা পড়ে না।”

“কিন্তু তুমি কি স্থির কর না যে আমরা যে অংশ এখন দেখিতে পাইতেছি তাহা ছাড়া পৃথিবীর অন্য অংশ আছে যাহা দেখিতে পাইতেছি না? সেইরূপে তুমি কি বুঝিতে পার না যে ঘটনা হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য ঘটনা আছে?”

“আমার স্বীকার করিতে হইতেছে যে বর্ত্তমান দ্বারা আমরা অনুপস্থিত আলোচনা করিতে পারি কিন্তু অনুপস্থিত জ্ঞান না থাকিলে বর্ত্তমান জ্ঞানের কি ক্ষতি তাহা বলুন।”

“যে বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক করিতে না পার সে বস্তুর জ্ঞান তোমার নাই। সত্য যদি মিথ্যা হইতে কি ন্যায় যদি অন্যায় হইতে পৃথক করিতে না পার তবে সত্য বা ন্যায় সম্বন্ধে তোমার যথার্থ জ্ঞান নাই। সেইরূপ অনুপস্থিতের সহিত যদি বর্ত্তমানের পার্থক্য না বুঝিতে পার তবে বর্ত্তমানের জ্ঞানও তোমার থাকিতে পারে না।”

ক্রমশঃ

কলিকাতা আক্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কাশীমবাজার আক্রমণের ফল যে এতদূর সন্তোষপ্রদ হইবে—নবাব প্রথমতঃ তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। বিজয়শ্রী লাভে তিনি আরও বর্দ্ধিত-সাহস হইয়া ইংরাজের উচ্ছেদ কামনায় প্রফুল্লচিত্তে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দলে প্রচুর গোলন্দাজ অশ্বারোহী ও পদাতিকের অভাব ছিল না * এতদ্ব্যতীত কলিকাতা আক্রমণের ভবিষ্যৎ ক্ষতি পূরণ স্বরূপ—ইংরাজের উপনিবেশ লুঠ করিলে প্রচুর অর্থাগম হইবে—অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতমান একটী প্রতিদ্বন্দী ক্ষমতা চিরকালের জন্য অবনত মস্তকে ধরাশায়ী হইবে—এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া নবাব সেরাজ উদ্দৌলা—দ্রুতপদে কলিকাতাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পাছে ইংরাজেরা সময় পাইয়া আত্মরক্ষার কোন নূতন বন্দোবস্ত করে—পাছে মান্দ্রাজ অথবা অন্য কোন ভারতীয় উপনিবেশ হইতে কলিকাতা উপনিবেশের বলবৃদ্ধি করিতে কোন সৈন্যাদি আসে—এই সন্দেহে নবাব দ্রুতপদে সদলে কলিকাতায় উস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে আবার বর্ষা—বর্ষা পড়িলে সকল পরিশ্রমই বৃথা নষ্ট হইবে—অথবা তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্রোত হয় ত ভিন্নদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে—এই ভাবিয়া তিনি সাতদিনে মুরশীদাবাদ হইতে হুগলীতে উপস্থিত হইলেন। এই কঠোর যাত্রা-মুখে অনেক সেনা পথে সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়া মরিল।

হুগলী হইতে নৌসেতুতে নবাবের অগণ্য সৈন্য ভাগিরথী পার হইল। এই সমস্ত নৌকা মুরশীদাবাদ হইতে তাঁহার অনুসায়ী হইয়াছিল। ফরাসীরা ও দিনেমায়ের পাছে জাতীয় সহানুভূতি-উদ্বেলিত হৃদয়ে ইংরাজের সাহায্য ব্রতে ব্রতী হয় এই ভাবিয়া নবাব—তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী কুঠীর সাহেবেরা "নির্ব্বিরোধ বাণিজ্যের" ধূয়া ধরিয়া ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া সে যাত্রা নবাবের ক্রোধ-মুখে পরিত্রাণ পাইলেন।

কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষেরা ১লা জুন শুনিতে পাইয়াছিলেন যে কাশীমবাজার কুঠী নবাব সাহেব আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছেন। ৭ই জুন তাঁহাদের নিকট মুরশীদাবাদ

* সমসাময়িক কোন ইংরাজ লেখকের বিবরণ হইতে জানা যায় যে নবাবের দলে—

৩০০০০—পদাতিক,

২০০০০—অশ্বারোহী,

৪০০—হস্তী,

৮০—কামান,

ছিল। ইহাদের মধ্যে বিশ হাজারের অধিক সেন্য—বন্দুক ও তরবারির সদ্ব্যবহার জানিত।

হইতে সঠিক সংবাদ পৌঁছে যে কাশীমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে, এবং নবাব কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। কলিকাতার অধ্যক্ষেরা এই প্রকার অতর্কিত বিপৎপাতে, উৎকলিকাকুলচিত্তে—মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সৈন্য প্রার্থনা করিয়া দলপুষ্টির কল্পনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহাও তখন সুদূরপরাহত বোধ হইল। তখন সমুদ্রে বায়ু বহিতেছিল কলের জাহাজের আমদানি তখন ছিল না। পাল তুলিয়া আসিতে হইবে সুতরাং দক্ষিণ মনসুনের প্রতিকুলতায় তাহাতেও এক মাস বিলম্ব ঘটিবে। আরও তখন—রেলওয়ে টেলিগ্রাফ বর্জ্জিত দিন—সংবাদ বাহকের উল্লিখিত স্থানে পৌছিতেই মাসাধিক বিলম্ব হইবে। দেখিতে গেলে—দুই মাস অপেক্ষার পর তবে সৈন্যসাহায্য পৌঁছিতে পারে।

নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে, নিতান্ত আকুলিতভাবে, অসীম উৎকণ্ঠার সহিত—তাঁহারা—চন্দননগর ও চুচুঁড়ার, ফরাসী ও দিনেমারদিগের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। তাহাদের অনুরোধ করা হইল—"আপনারা সাধারণ স্বার্থের অনুরোধে আমাদের সহায়তা করিয়া—এ ক্ষেত্রে নবাবের প্রতিযোগীতা করুন।" কিন্তু নবাবের ভয়ে—দিনেমারেরা সাহায্য প্রদানে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন। ফরাসীরা—আবার ইহার উপর এক-মাত্রা চড়াইয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনারা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চন্দন নগরে আসিয়া আশ্রয় লইলে আমরা আপনাদের সহায়তার চেষ্টা করিতে পারি।" *

এক্ষণে কলিকাতা দুর্গের সেই সময়ে কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার আলোচনা করা যাউক। কলিকাতার প্রাচীনদুর্গ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হয়। প্রথমে ইহার দুর্গের মতন আকার প্রকার ছিল না—পরে প্রাচীর ও পরিখাদি বেষ্টিত করিয়া ইংলণ্ডাধিপ তৃতীয় উইলিয়ামের নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া দুর্গ-আখ্যা প্রদান করা হয়।

---

* সে সময়ে একজন যুবক সিবিলিয়ান লিখিয়াছেন—"ফরাসীদের এই প্রকার অসঙ্গত উত্তরে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া আমরা তাহাদিগকে ভদ্রভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। আমাদের গোলাগুলির বড় অভাব ছিল। সৈন্যের প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হইয়া আমরা তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যখন নবাব কলিকাতার কাছাকাছি হইয়াছেন তখন এ পত্রের উত্তর আসিল। তাহাতে লেখা ছিল 'নবাবের ভয়ে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেও তাহারা সম্পূর্ণ অপারক' বস্তুতঃ ফরাসীদের নিকট সাহায্যের আশা করিয়া আমরা মূর্খের ন্যায় প্রতারিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই নবাব—ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বে তাহাদের নিকট বারুদ চাওয়াতে তাহারা ১৫০ পিপে বারুদ দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ত্রিশজন লোক মুসেঁ সেণ্টজ্যাক্ নামক এক ফরাসীর তাঁবে নবাবের অধীনে গোলন্দাজের কাজ করিয়াছিল। কাপ্তেন গ্রাণ্ট সাহেবও এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন "নবাবের দলে ৩০ জন ইয়ুরোপীয়, ৬৮০ জন "চট্টগ্রামী ফিরিঙ্গি" যুদ্ধের সময় গোলন্দাজের কার্য্য করিয়াছিল।"

ফরাসী তখন ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা। তাহাদের এ প্রকার উদাসীনতা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আজকালকার কয়লাঘাট ও কেয়ার্লি প্লেশ নামধেয় দুই রাজপথের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল। ইহার আকার আংশিক পরিমাণে অসম্পূর্ণ চতুষ্কোণ পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রাকারগুলি, দক্ষিণ ও পশ্চিমের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ ছিল। বাহিরের দেয়ালগুলি চারি ফিট্ পুরু ও ১৮ ফিট্ উচ্চ ছিল। এই দেয়ালের উপর ভিতরের মালগুদামের ছাদ্ একমাত্র রক্ষা স্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিত। পূর্ব্বদিকের দ্বারে ও নদীর পার্শ্বে দুই চারি স্থানে দুই চারিটী কামান সংস্থাপিত ছিল। দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্ব্বমুখী—তাহার সম্মুখে একটী কামান ছিল এবং সেই স্থানে দাঁড়াইলে সম্মুখে অগণ্য তরুরাজিপূর্ণ ছায়াময় পথ, সুবিস্তৃত ভ্রমণ-উদ্যান, স্নিগ্ধ-তোয়-পূর্ণ প্রসারিত সরোবর মাত্র দৃষ্টিগোচর হইত। *

এই দুর্গের চারিদিকে কোন প্রকার পরিখা বা অন্য প্রকারের আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। দুর্গের আশেপাশে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের উদ্যানবেষ্টিত বসতবাটী। এই প্রকার অসম্পূর্ণ অবস্থাময়ী দুর্গের আবার সংস্কার কার্য্যও অনেক দিন হয় নাই। কলিকাতার অধ্যক্ষেরা এ সম্বন্ধে কোন কিছু বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলে—ডাইরেক্টার সভা প্রচুর অর্থব্যয় ভয়ে তাহাদিগকে এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিতেন। ক্রমে ক্রমে দুর্গের অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িল যে ইহা প্রবল শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া উঠিল। যেখানে কামান রাখিতে হইবে সে স্থানের ভিত্তি মূল হয় ত—টলটলায়মান—আবার কোথাও বা পতিতপ্রায় দুর্গ প্রাচীর নূতন সংস্করণে কতকটা বলবান—আবার কোন স্থান বা উপযুক্ত সংস্করণাভাবে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যবৎ হইয়া পড়িয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে—রজার ড্রেক্ নামক একজন সাহেব সেই সময়ে ইংরাজ-কুঠীর ও কলিকাতা দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। দুর্গের মধ্যে প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা ১৮০ জন ছিল—ইহাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয়। † এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঁচজন সেনাধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে Capt. Buchanan একমাত্র সমরাভিজ্ঞ ছিলেন। সহসা সেনাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতার অধ্যক্ষেরা সহরের আর্ম্মিনিয়ন, পোর্টুগীজ ও দেশীয়দের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া বক্সারী লইয়া নূতন সেনাদল গঠন করিলেন। আরদালী, পিয়নেরাও এই ক্ষেত্রে সেনাদলে আসিয়া জুটিল। ইহাদের কেহ কখন বন্দুকের "উল্টা" "সোজা" দিক জানিত না এবং যুদ্ধারম্ভের সর্ব্বপ্রথমে ইহারাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল।

---

* এই সরোবর এক্ষণে "লালদিঘী" বলিয়া কথিত।

† সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক Orme বলেন—"নির্দ্দিষ্ট তালিকাভুক্ত সৈন্যসংখ্যা ২৬৪ জন ও অনির্দ্দিষ্ট বা Militia সৈন্য ২৫০, একুনে ৫১৪ জন। ইহাদের মধ্যে একতৃতীয়াংশ ইউরোপীয় সৈন্য।. ইহাদের মধ্যে দশজনও হয় ত প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র দেখে নাই। অবশিষ্টগুলির মধ্যে, পোর্টুগীজ, আর্ম্মিনিয়নও ছিল।

দুর্গের অবস্থা এইপ্রকার অনিশ্চিত হইলেও—আত্মরক্ষার উপায় এই প্রকার অসম্পূর্ণ হইলেও কলিকাতার অধ্যক্ষেরা দুর্গমধ্যে থাকিয়া যুঝিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উদ্ধারের দুইটি উপায় ছিল—প্রথম বাহির হইতে সেনাদল বৃদ্ধি—দ্বিতীয় নদীপথে পলায়ন। প্রথমটির আশা ততদূর বলবতী না হইলেও দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্ত ছিলেন। এবং ভবিষ্যতে কার্য্যক্ষেত্রেও তাহাই দাঁড়াইয়াছিল।

ভবিষ্যৎ বিপদের স্বরূপনির্ণয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সম্পূর্ণরূপে অশক্ত হইয়াছিলেন। কি প্রকার সৈন্যদল লইয়া নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন—এতদ্বিষয়ে সম্যক অনভিজ্ঞ থাকাতেই তাঁহাদের যথেষ্ট দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকৃতরূপে অবস্থানভিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে মতবিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছিল। এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের পতন ততদূর অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম চেষ্টার মুখে আশে পাশে দুর্গের বাহিরে যে সমস্ত পাকা বাড়ী ছিল, সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। শত্রুপক্ষ এগুলি দখল করিলে দুর্গ অতি সহজেই ক্ষমতাভুক্ত করিয়া লইবে—এই ভয়েই এইরূপ কার্য্যসূচনা। একজন সমসাময়িক লেখক বলেন,—"ইহাদের তখন এতদূর দুর্দ্দশা যে বাড়ীগুলি ভাঙ্গিবার উপযুক্ত বারুদেরও টানাটানি পড়িয়া গেল।"

দুর্গকে শত্রুহস্ত হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা করিবার জন্য ও নবাবসৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য দুর্গের বাহিরে দুই এক স্থলে কামান সন্নিবেশ করা হইল। ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান দুর্গদ্বার হইতে ৩০০ গজ দূরে (সম্ভবতঃ আজকাল যেখানে St. Andrewর গির্জ্জা আছে) আর একটি দুর্গের দক্ষিণ দিকে (অর্থাৎ বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কাউন্সিলহাউস ষ্ট্রীট ও গবর্ণমেণ্ট প্লেসের সংযোগস্থলে) তৃতীয়টি দুর্গের উত্তরাংশে (অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীটের শেষভাগে) রক্ষিত হইল। একদল পেয়াদা ও বরকন্দাজ সশস্ত্র হইয়া মারহাট্টাখাতের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

আত্মরক্ষার জন্য এই প্রকার যে সমস্ত বন্দোবস্ত হইল—তাহার সমস্তই ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছিল। যে সকল কার্য্যকে তাঁহারা আত্মরক্ষার উপায় বলিয়াছিলেন—হলওয়েল্ সাহেবের মতে তাহাতেই তাঁহাদের ধ্বংশের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

১৬ই জুনের প্রভাতে—নবাবসৈন্যের কলিকাতা আগমনবার্ত্তা ইংরাজদুর্গে পৌছাইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া সেই স্বল্পবিস্তর সৈন্যগণ দ্রুতগতিতে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সহরের আশে পাশে যে সমস্ত সাহেব মেম ছিলেন, তাঁহারা একেবারে দুর্গের মধ্যে আসিয়া পৌছিলেন।* দেশীয় অধিবাসীরা জিনিস পত্র লইয়া যে যেখানে পারিল,

* Orme বলেন,—প্রায় দুই সহস্র "কালা খ্রীষ্টান্" বা পর্টুগীজ এই সময়ে দল বাঁধিয়া দুর্গ প্রবেশ করে। ইহাদের দুর্গপ্রবেশ সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এইজন্য বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

পলায়মান হইল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সেই প্রাচীন কলিকাতা অধিবাসীশূন্য হইয়া পড়িল। কলিকাতার উত্তরাংশে চিৎপুরে অর্থাৎ (Perrius Pointএ) একটি ব্যাটারী স্থাপিত হইয়াছিল। নবাবের সৈন্য এই স্থানে দুই চারিটা গোলার আওয়াজ দেখিয়া একটু পূর্ব্বে হঠিয়া গিয়া দমদমে দাঁড়াইল। ১৭ই এইরূপে কাটিল। ১৮ই তারিখে সমস্ত সৈন্য কলিকাতার পূর্ব্বাংশ বেষ্টন করিল। এই সময়ে নবাবসৈন্য হাটে বাজারে ঘর দ্বারে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। ইংরাজেরাও দেখাদেখি গোবিন্দপুরের কয়েকটা বাজারে আগুন ধরাইয়া দিলেন।*

লালদিঘীর গির্জ্জার কাছে যে কামানটি ছিল স্বয়ং হলওয়েল তাহাতে অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। এই স্থানটি এত অরক্ষিত যে কোন উপায়েই শত্রুর গোলা হইতে মাথা বাঁচাইবার উপায় ছিল না। একদল Militia (অনিয়মিত সৈন্য) এই স্থানে গোলন্দাজদের সহায়তা করিতেছিল। অযথা অনর্থক সৈন্যনাশ দেখিয়া হলওয়েল সাহেব তাহাদের কতকগুলাকে প্রাচীন আদালত গৃহের (Mayor's Court House) † অন্তরালে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা এইস্থানে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল—কেবলমাত্র নিয়মিত সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য হলওয়েলের সমভিব্যাহারে রহিল। যখন কেহ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তখনই আবার নূতন লোক দিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করা হয়। এই প্রকার উপায়ে কার্য্য করিয়া হলওয়েল সাহেব ক্রমশঃ বলহীন হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর অনুমতি লইয়া দুর্গ প্রবেশ করিলেন। গবর্ণর ড্রেক সাহেব হলওয়েল দ্বারা Clayton সাহেবকে (ইনি এই ক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন) বলিয়া পাঠাইলেন যে, গির্জ্জার নিকট হইতে সমস্ত কামানগুলি টানিয়া দুর্গমধ্যে আনয়ন করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করা হউক। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞাপালিত হইবার কোন সুবিধা হইল না। কামানগুলি, টানিবার লোকাভাবে, সেইখানে পড়িয়া রহিল।

---

* এই সময়ের অবস্থাটা কি পাঠক একবার কল্পনার চক্ষে ভাবিয়া দেখুন। গোবিন্দপুর জ্বালানের সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়—ইংরাজের নিজের সেনারাই নাকি রাজারহাট লুট করিয়াছিল। এরূপ শুনা যায় যে, সেই সময়ে এই প্রকার অপরাধীদের ধরিয়া বিনা বিচারে ফাঁসী দেওয়া হয়।

† পুরাতন মেয়র্স কোর্ট, বর্ত্তমান স্মিথ কোংর দাওয়াইখানার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের অধিকৃত স্থানাধিকারী ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার সম্মুখের রাস্তাটীর নাম ও "Old Court House Street" আমাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক নহে।

খুলি বা নাই খুলি !

সুখ দুঃখ হাসি মেলা,
হৃদয়ের যত খেলা—
—হৃদয়েতে আছে রে গোপনে ;
আঁধারে আলোকে বসি,
প্রতি শিরে শিরে পশি,
পলে পলে রচিছে জীবনে।
বিজন হৃদয়খানি,
মরমের গুপ্তবাণী,
জীবনের রহস্য আমার—
সমূলে ছিঁড়িয়া তুলে—
পারি কি দেখাতে খুলে
—ডালি ধরি সমুখে সবার !
কেউ বা হাসিয়ে চাবে—
বুঝি বিন্দু সুখ পাবে—
কেউ দেবে অশ্রু দুটি ফোঁটা ;
কেউ বা উপেক্ষা করে'
চলে যাবে ঘৃণাভরে—
উপহাসি কেহ দেবে খোঁটা !
সহিতে পারিবি মন,
আপন স্নেহের ধন ;
—তার হেন অপমান জ্বালা ;—
কৌতুক নয়ন কোণে,
যে বাণ ছোটেরে ঘনে,
লোহ হ'তে সুতীক্ষ্ণ ধারালা !
থাক্ তবে কাজ নেই—
যেথা আছে থাক্ সেই ;
থাক্ হৃদি হৃদয় আসনে—
বাহিরে লোকের মাঝ,
এনে তারে নেই কাজ,
থাক থাক বিজনে গোপনে !

পারি কিরে দেখাইতে,
আমার গোপন চিতে
পুঁথি মত করি অনাবৃত,—
অসীম রহস্য তারি
আমি কি বুঝিতে পারি !
পৌঁছিতে কি পারি সে নিভৃত !
কেমনেতে কিবা হয়—
কিবা রহে কিবা লয়
নাহি বুঝি বুঝাব কেমনে !
উপরে উঠিছে ঢেউ,
কেহ সুখ—দুঃখ কেউ ;—
নিম্নে সিন্ধু না পড়ে নয়নে !
অবস্থা ঘটনা দলে'
রচিছে তাহার তলে
সুখ দুঃখ জীবন-সংগ্রাম—
সারারাত সারাদিন,
ঢেউগুলি শ্রান্তিহীন,
উঠিছে মিশিছে অবিরাম।
ধরিতে পারি না কভু—
সবগুলি তার তবু
সহস্রেতে এক দেয় ধরা ;
নাজানি কেমন করে'
উর্ম্মিমালা ভাঙ্গে গড়ে,
কি আছে সে সিন্ধু গর্ভে ভরা !

সমগ্র জলধি মাঝে
যে হৃদয়খানি রাজে,—
শুধু দেখে দুইটি নয়ন
যা কিছু রহস্য তার
লুকান দৃষ্টির পার—
জানে তাহা শুধু একজন।

আমার কি লাজ তবে
খুলিতে হৃদয় ভবে ?
এ ত শুধু বাহিরের খেলা—
হাস যদি আসে হাসি ;—
—কাঁদ আসে অশ্রুরাশি,
কর নিন্দা পরিহাস হেলা !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

মৃণ্ময়ী। *

(সমালোচনা।)

২য় প্রস্তাব।

নিউটনাবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ প্রক্রিয়াকে লোকসমাজ সাধারণতঃ এমত স্থূলভাবে ও অপরিপক্ক জ্ঞানের সহিত বুঝিয়া থাকে যে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। নিউটন স্বীয় 'সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থে 'মাধ্যাকর্ষণ সূত্রকে' যে সকল কথায়

---

* (গতসংখ্যক ভারতীর ১৫ পৃষ্ঠায় সম্পাদিকা মহাশয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে তদুত্তরে ইহা বলা যাইতেছে যে Centrifugal Force কে Negative এবং Centripet Force কে positive force বলা যায়। যেমন আলোকের অভাবকে অন্ধকার বলা যায় তেমন positive force এর বিরুদ্ধাচারী Inertia ই Negative force নামে বাচ্য হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ তাহা একটি স্বতন্ত্র শক্তি নহে। Centripetal force ই মূল আকর্ষণ, যাহার বলে পদার্থ পরিচালিত হইয়া থাকে ; Centrifugal force কেবল ঐ পদার্থের জড়ত্বের ফলের বাহ্যপ্রকটন মাত্র। অধুনা ইংরাজিতে Centrifugal force এর পরিবর্ত্তে Centrifugal action ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এবং ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান হইতে Centrifugal নামটি একেবারেই উঠিয়া যাইতেছে। তাহাতে Centripetal force এর পরিবর্ত্তে Central force ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Positive ও Negative force এর পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত আমি প্রথমোক্ত কে ('শক্তি' বা) 'আকর্ষণ' এবং শেষোক্তকে 'প্রক্রিয়া' রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। পাঠকবর্গের ইচ্ছা হইলে Centrifugal force এর নাম 'কেন্দ্রাতিগ প্রক্রিয়া' ও Centripetal force এর নাম 'কেন্দ্রাভিগ শক্তি' বলিতে পারেন। কিন্তু 'শক্তি' শব্দ বিষমার্থব্যঞ্জক এবং উভয় সংজ্ঞার জাতিগত পার্থক্য প্রদর্শন জন্যই 'কেন্দ্রাভিগ শক্তি'কে 'কৈন্দ্রিকাকর্ষণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই ;—"ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক পদার্থাণু অপর সকল পদার্থাণুর প্রত্যেককে স্বীয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। দুইটী অণুর সংযোজক রেখা দ্বারা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী আকর্ষণের দিক্ নির্ণীত হয় ; এবং অণুদ্বয়ের 'বস্তুমানের' * গুণফলের সহিত তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের বর্গের যে অনুপাত, তাহার সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতবিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা ঐ আকর্ষণের পরিমাণ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।"

[ইহাকে কেহ 'নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র' (Newton's Law of Gravitation) এবং কেহবা 'প্রকৃতির নীতিসূত্র' (Law of Nature) বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে 'সার্ব্বভৌমিক আকর্ষণ সূত্র' (Universal Law of Attraction) বলা যায়।]

যখন কোন এক পদার্থ অপর কোন পদার্থকে আকর্ষণ করিতে দেখা যায় তখন ইহা জ্ঞাত হইতে হইবে যে, প্রথমোক্ত পদার্থের প্রত্যেক অণু আকৃষ্ট পদার্থের প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আণবিক আকর্ষণের সমষ্টিকে আকৃষ্ট পদার্থোপরি আকর্ষক পদার্থের আকর্ষণ বলা যায়। গণিতবিজ্ঞানের যে বিশেষ সূত্রবলে এই 'সমষ্টীকরণ' প্রণালী সাধিত হয়, † তাহা প্রয়োগ করিলে দৃষ্ট হয় যে উক্ত আকর্ষণ-সমষ্টির পরিমাণ এমতভাবে দিঙ্‌নিবদ্ধ হয় যেন আকর্ষক পদার্থ স্বীয় 'বস্তুমানমিত' একটি অণুরূপে আপন 'ভারকেন্দ্রে' অবস্থিতি করিয়া ঐ আকর্ষণকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। (এতদর্থে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক যে আকৃষ্ট পদার্থ আকর্ষক পদার্থের সম্পূর্ণ বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে, নতুবা উপরোক্ত বিধি সর্ব্বথা অপ্রযুজ্য প্রতিপন্ন হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন পদার্থকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে এক মাইল উর্দ্ধে উঠাইলে তাহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ যে পরিমাণ হ্রাস হইবে, ধরাতে, একটি এক মাইল গভীর গহ্বর খোদিত করিয়া ঐ পদার্থকে তন্নিম্নে লইয়া গেলে তাহার উপর ধরাকর্ষণ বৃদ্ধি না পাইয়া আরও অধিকতর হ্রাস হইবে।) ‡ আমরা পদার্থনিচয়ের

---

* যতগুলি পরমাণুদ্বারা প্রত্যেক অণুদেহ গঠিত হইয়া থাকে তাহাদিগের সমষ্টিকে ঐ অণুর 'বস্তুমান' বলা যায়। পরমাণুর সংখ্যা নিরূপণ করা কদাপি সম্ভবপর নহে ; এই হেতু সাধারণতঃ কোন পদার্থের 'বস্তুমান' সাধন করিতে হইলে তাহার 'ঘন ফল' (Volume) ও 'মধ্যগাঢ়তা' (Mean density) এতদুভয়ের গুণফল দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইয়া থাকে। মধ্যগাঢ়তা গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রায়সঃ কোন কঠিন বস্তুকে সর্ব্বাবয়বে 'সমগাঢ়তা'-বিশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। 'বস্তুমানের' ইংরাজি অর্থ 'Mass'।

† এই 'সমষ্টীকরণ প্রণালীকে' ইয়ুরোপীয় গণিতবিজ্ঞানে 'Integral Calculus' বলা যায়।

‡ এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভার্থ Analytical Mechanics গ্রন্থের 'Attraction' বিষয়ক অধ্যায় পাঠ করিতে হইবে।

যে গুরুত্ব অনুভব করি তাহা বস্তুতঃ পৃথিবীর আকর্ষণসম্ভূত এবং ঐ আকর্ষণ (উক্ত বিধানানুসারে) পৃথিবীর ভারকেন্দ্রাভিমুখী হইয়া থাকে; এই হেতু আমরা দেখিতে পাই যে ধরাপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু নিউটনের মতে মাধ্যাকর্ষণ 'সর্ব্বব্যাপী' হওয়াতে তাহা সকল অণুতে সমভাবে নিহিত আছে। ইহার বলে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহগণ এবং গ্রহগণকে বেষ্টন করিয়া উপগ্রহগণ পরিভ্রমণ করিতেছে; আবার ইহারই বলে গ্রহোপগ্রহগণ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পরের গতিবৈচিত্র ঘটাইতেছে (পূর্ব্বপ্রস্তাবে 'বরুণ' গ্রহাবিষ্কার প্রসঙ্গে ইহাকে 'কক্ষভ্রষ্টতা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে;) এদিকে আবার উপগ্রহগণ সূর্য্য ও অপর গ্রহদিগের আকর্ষণে বিচলিত হইয়া তাহাদের গতিবিপর্য্যয়কে অতিশয় জটিল করিয়া তুলিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, 'প্রাকৃতিক জ্যোতিষ' নামক এক অতুল জ্ঞানভাণ্ডার কেবলমাত্র নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, সাধারণ্যে যে বিশ্বাস রহিয়াছে যে, বৃক্ষ হইতে আতাপতন দেখিয়াই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন," তাহা কেবল একটি উপলক্ষণ মাত্র; বস্তুতঃ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের মধ্যমনি স্বরূপ 'কেপ্‌লারের গ্রহগতিবিষয়ক নিয়মত্রয়' * হইতেই মাধ্যাকর্ষণ প্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছিল। নিউটনের পূর্ব্বে কেপ্‌লার, গ্যালিলিও প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহা পরিজ্ঞাত ছিলেন যে সূর্য্যের আকর্ষণবলে গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহারা ঐ আকর্ষণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না; নিউটনই প্রথম তাহার স্বরূপ ও পরিমাণ নির্দ্দেশ এবং তাহাকে এক সার্ব্বভৌম বিধানে বিধিবদ্ধ করিয়া জগৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। †

এক্ষণে ভূমিকা শেষ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

মৃণ্ময়ীর ৪০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, "পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানই যে পার্থিবাকর্ষণের মূল, নিউটন এই বিষয়টি আশু নূতনরূপে আবিষ্কার করিয়া ইহাকে 'মাধ্যাকর্ষণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন ......।" উপরোক্ত ভূমিকা হইতে লক্ষিত হইবে যে গ্রন্থকার 'মাধ্যাকর্ষণ' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। গ্রন্থকার যাহাকে 'মাধ্যাকর্ষণ' বলিতেছেন তাহার ইংরাজি নাম Gravity এবং আমি যাহাকে 'মাধ্যাকর্ষণ' বলিতেছি তাহার ইংরাজি নাম 'Gravitation।' নিউটনের আবিষ্ক্রিয়ার মূল অঙ্গ 'Gravitation'; Gravity কেবল একটি উপাঙ্গ মাত্র।

---

* এই নিয়মত্রয় সাধারণতঃ "কেপ্‌লারের সূত্র" নামে পরিচিত। ইহাদের বিচার স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইবে।

† See Grant's 'History of Physical Astronomy,' pages 15—20.

তৎপর উক্ত হইয়াছে যে, "ইহা বলা যাইতে পারে না যে, অনন্তপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের কোন না কোন গভীর প্রদেশে এ বিষয় নিশ্চয় অপ্রাপ্য।" ইহাতে কোন বুদ্ধিজীবী মনুষ্য (বিশেষ যে একবার সংস্কৃত শাস্ত্রসিন্ধুজলে অবগাহন করিতে পারিয়াছে) মতান্তর প্রকাশ করিবে না। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে "ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া ইদানীন্তন বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কত রত্ন লাভ এবং তাহাকে স্বদেশজাত (?) নূতনরূপে প্রকাশ করিতেছে দুর্ভাগ্য ভারতবাসীগণের মধ্যে অনেকেই তাহার কিছুই জানেন না।" জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্নাত্মক স্থলের সত্যতা জ্ঞাত না থাকায় নিমিত্ত উদ্ধৃতাংশোক্ত দুর্ভাগ্যগণের মধ্যে আমিও একজন। পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে উক্ত স্থলে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগকে চৌর্য্যাপরাধে দোষী করা হইয়াছে। কিন্তু সহজবুদ্ধিতে ইহা অনুমিত হয় যে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানগত বিষয়সমূহ অপরিজ্ঞাত থাকিয়া তদন্তর্ভূত কোন বিষয় নূতন উদ্ভাবিত করিলে সেজন্য তাহাদিগকে দোষী করিতে যাওয়া একান্তই কুৎসাপরায়ণতা ও বাচালতার পরিচায়ক। 'জ্ঞান' কিছু একটা জড়বস্তুবিশেষ নহে যে একজন একবার অধিকার করিলে প্রার্থনা কিম্বা চুরী ভিন্ন তাহা অপরের হস্তগত হইতে পারে না। অধ্যয়ন, অন্বেষণ ও পর্য্যালোচনা দ্বারা জ্ঞানের উদ্রেক হয়; এবং একই ঐশী নিয়ম ও প্রাকৃতিক কার্য্য অধ্যয়ন দ্বারা বহুলোক পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে এক বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে বাগ্বিনিময় সংঘটন স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যিনি সর্ব্বাগ্রে ঐ জ্ঞান আয়ত্ত করেন তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করেন। ইয়ুরোপের যে সকল আবিষ্ক্রিয়া আমাদের দেশে পুরাতন (অর্থাৎ প্রাচীন কালে জ্ঞানগত ছিল !!) বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাদের জন্য ইয়ুরোপকে কিছুতেই হতাদর করা যাইতে পারে না; বরং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সমান হইয়া (কিম্বা তাঁহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া) তাহারা জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতেছে বলিয়া আমাদের মস্তক অবনত হওয়া উচিত! সাধারণতঃ ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে চন্দ্রগ্রহণের সময় কুকুরজাতি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া থাকে; তাহার কারণ ইহা অনুমান করা যায় যে, সুধাকরকে রাহু গ্রাস করিতেছে দেখিয়া কুকুরের ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। ইয়ুরোপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞান স্বাধীনভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কবলিত করিয়া নিতেছে, অথচ আমরা সেই জ্ঞানের স্নিগ্ধ হিল্লোলে লালিত পালিত হইয়াও তাহা আস্বাদ করিতে পারিতেছি না, এই হেতু যখন আমরা ইয়ুরোপকে গালি দিতে উদ্যত হই, তখন আমার ঠিক ঐ কুকুর জাতির কথা মনে পড়ে।

'পৃথিবী যে স্বকীয় আকর্ষণবলে খস্থ গুরুপদার্থনিচয়কে স্বীয়াভিমুখে টানিয়া নিতেছে,' তাহা ভাস্করের পূর্ব্বে জগতে কেহ জ্ঞাত ছিলেন না, ইহার পরিচয় পাইয়া আমরা

ভাস্করকে ঐ জ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন দিয়া গৌরবান্বিত হইতেছি। কিন্তু সেই হেতু তাঁহাকে আপন সিংহাসন হইতে ভুলাইয়া নিয়া পরের সিংহাসনে বসাইতে গেলে তিনি যে উপহাসাস্পদ হইবেন, তদ্দ্বারা আমরা কি পুরুষার্থ লাভ করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ভাস্কর বলিয়াছেন "আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী..." ; কিন্তু নিউটন বলিয়াছেন "Every particle of matter in the universe attracts every other particle, &c...." * এতদুভয়ের একত্ব প্রতিপাদন আমার সাধ্য নহে ; পাঠকবর্গ সক্ষম হইলে করিয়া লউন।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন "লঙ্কা কুমধ্যে..." (মৃণ্ময়ী, ৪৩ পৃষ্ঠা) ইহার তাৎপর্য্যার্থ সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে ; যথা, "যে রেখা লঙ্কা ও উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়া কুরুক্ষেত্র স্পর্শ করতঃ মেরুভেদ করিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম 'মধ্যরেখা'।" ইহা হইতে দৃষ্ট হয় যে লঙ্কার নিরক্ষ মণ্ডলোপরি অবস্থিতি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গ্রন্থকার 'কুমধ্য' অর্থ 'নিরক্ষ বৃত্তের উপরি' করিয়া ইহা "বোধ" করিয়াছেন যে "অতি পূর্ব্বে লঙ্কা নিরক্ষ বৃত্তের উপরেই ছিল কালসহকারে উহার দক্ষিণভাগ সমুদ্রগর্ভে বিলীন এবং উত্তর ভাগ ক্রমশঃ উত্তরে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" তাহা যদি হয় তবে 'রামেশ্বর সেতুবন্ধ' কোথায় ছিল ? গ্রন্থকার হয়ত উত্তর করিবেন যে ভারতবর্ষ আরও দক্ষিণে ছিল ক্রমে উত্তরে সরিয়াছে ; প্রত্যুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারিবে যে তবে সমস্ত পৃথিবীরই "দক্ষিণভাগ সমুদ্রগর্ভে বিলীন এবং উত্তরভাগ ক্রমশঃ উত্তরে বর্দ্ধিত হইয়াছে" !!!

৫০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, "মহাসাগরে পৃথিবীর কোন্ প্রদেশে পোত আছে তাহার নিশ্চয় করিবার কারণ সম্প্রতি ইউরোপীয় নাবিকগণ এই যন্ত্র ('তূর্য্য যন্ত্র') দ্বারা সূর্য্যের উন্নত ও নতাংশ স্থির করিয়া" থাকেন। ইয়ুরোপীয় নাবিকগণ যে যন্ত্র ব্যবহার করেন তাহার ইংরাজি নাম 'Sextant' †। গ্রন্থে তূর্য্য যন্ত্রের স্বরূপ প্রদত্ত না হওয়াতে Sextanl এর সহিত তাহার কোন পার্থক্য আছে কি না তাহা বিচার করিতে অক্ষম।

গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আছে "নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতি-ষোড়শাংশে ভবেদবন্তী..."। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ করা হইয়াছে, যথা ;— "নিরক্ষদেশ হইতে অবন্তী-নগরী পৃথিবীর ষোল অংশের উপরস্থিত" অর্থাৎ উজ্জয়িনী

---

* Translated from 'Newton's Principia' by Lord Kelvin (Sir. W. Thomson) in his 'Treatise on Natural Philosophy.'

† আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে 'Sextant' যন্ত্রের একটী বাঙ্গালা নাম করণার্থ চেষ্টা করিতেছি। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া 'তূর্য্য যন্ত্রের' গঠন প্রণালী কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেন তবে একান্ত অনুগৃহীত হইব। কারণ তাহা হইলে উভয় যন্ত্রের পার্থক্য জানা যাইতে পারে।

নগরী পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত হইতে যতদূরে অবস্থিত তাহা পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিধি অপেক্ষা ষোলগুণ ন্যূন"। ইহা ভুল না বলিলেও একান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ শ্লোকাংশ দৃষ্টে সহজে প্রতিপন্ন হইবে যে তাহার প্রকৃত অর্থ এই:—নিরক্ষদেশ হইতে, ভূপরিধির ষোড়শাংশের একাংশমিত স্থান দূরে অবন্তী বা উজ্জয়িনী নগর অবস্থিত, অর্থাৎ অবন্তীর অক্ষাংশ পরিমাণ $\frac{৩৬০}{১৬}$ অংশ অথবা ২২$\frac{১}{২}$ অংশ।

৬১ পৃষ্ঠায় 'গ্রহলাঘব' হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তদ্দ্বারা কোন অভীষ্ট স্থানের অক্ষাংশ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে গ্রন্থকার শ্লোকোক্ত প্রণালী ব্যাখ্যা করেন নাই ; অতএব পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ এ স্থলে তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

"——————————————তথাক্ষ।

চ্ছায়েষুঘ্ন্যক্ষভায়াঃ কৃতিদশমলবোনায়মাশাপলাংশাঃ ॥"

(গ্রহলাঘব)

অস্যার্থঃ—পলভা সংখ্যাকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানে পাঁচ দিয়া গুণ করিবে অন্য স্থানে বর্গ করিয়া দশ দিয়া ভাগ করিবে, এইরূপে যে গণিতফল পাওয়া যায় তাহা প্রথমোক্ত গুণ করা সংখ্যা হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই অভীষ্ট স্থানের অক্ষাংশ হইবে।" (মৃণ্ময়ী)

(অভীষ্ট স্থলে 'অম্বু সংশুদ্ধ শিলাতল' প্রস্তুত করিয়া তদুপরি দ্বাদশাঙ্গুলিমিত শঙ্কু স্থাপন পূর্ব্বক বিষুবদ্দিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে তাহার ছায়া গ্রহণ করিলে ঐ ছায়া পরিমাণকে 'অক্ষ-চ্ছায়া' বা 'পলভা' বলা যায়। ইহা অঙ্গুলি মানেতে গণনা হয়।)

মনে কর প = পলভা, এবং অ° = অক্ষাংশ ; অতএব শ্লোকার্থ মতে—

$$\text{অ}^\circ = ৫\text{প} - \frac{\text{প}^২}{১০}।$$

আবার বিষুবদ্দিবস মধ্যাহ্নকালে

সৌরোন্নতি = ৯০°—অক্ষাংশ।

ইহা হইতে ত্রিকোণমিতিমতে সপ্রমাণ হয় যে

$$\text{যেহেতু} \quad \frac{\text{প}}{১২} = \text{সৌরোন্নতির} \left[\frac{\text{ভুজজ্যা}}{\text{ক্রমজ্যা}}\right] *$$

$$\text{অতএব} \quad = \text{অক্ষাংশের} \left[\frac{\text{ক্রমজ্যা}}{\text{ভুজজ্যা}}\right]$$

* সূর্য্য সিদ্ধান্তে Sine কে 'ক্রমজ্যা' ও Cosine কে 'ভুজজ্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু tangent এর কোন নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব এ স্থলে তাহাকে উপরোক্ত অনুপাত দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ইহা হইতে 'গ্রেগরির সূত্র'—মতে সাধিত হইবে যে

$$\text{অক্ষাংশ} = ৫৭\cdot৩ \left\{ \frac{প}{১২} - \frac{১}{৩} \frac{প^৩}{১২^৩} + \frac{১}{৫} \frac{প^৫}{১২^৫} - \ldots \ldots \ldots \text{ইত্যাদি} \right\}$$

$$= \frac{১৯১}{৪০} প - \frac{১৯১}{১৭২৮০} প^৩ + \frac{১৯১}{৪১৪৭২০০} প^৫ - \text{ইত্যাদি।}$$

শ্লোকার্থমতে প্রাপ্ত অক্ষাংশ হইতে 'গ্রেগরির সূত্র'—মতে সাধিত অক্ষাংশ বিয়োগ করিলে

$$\frac{৯}{৪০} প - \frac{প^২}{১০} \left(১ - \frac{১৯১ প}{১৭২৮} \right) - \frac{১৯১ প^৫}{৪১৪৭২০০} + \text{ইত্যাদি}$$

অবশিষ্ট থাকে। এ স্থলে দৃষ্ট হইবে যে যদি প = ৯ অঙ্গুলি গ্রহণ করা যায় তবে উক্ত অন্তর ফলের পরিমাণ $\frac{১}{৮}$ অংশেরও ন্যূন হয়; অতএব তাহা অগ্রাহ্য করিলে উভয় মতে সাধিত ফলদ্বয় প্রায় সমান প্রতিপন্ন হইবে। পলভার পরিমাণ ৯ অঙ্গুলি হইতে ন্যূন গ্রহণ করিলেও দৃষ্ট হইবে যে ঐ অন্তর ফল কোনমতেই এক অংশের চতুর্থাংশ হইতে অধিক হইতে পারে না; ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে ৯ অঙ্গুলি হইতে ন্যূন পলভা বিশিষ্ট স্থানে 'গ্রহলাঘবোক্ত' মতে গণনা করিয়া অক্ষাংশ সাধন করা যাইতে পারে, তাহাতে কলা ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিলে কোন ভ্রমাশঙ্কা করা যায় না।

এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, যদিও ঐ শ্লোকোক্ত প্রণালীর সহিত 'গ্রেগরির সূত্রের' ঐক্য মানা যাইতে পারে না কিন্তু ইয়ুরোপীয় গণিতে একমাত্র ঐ সূত্র ভিন্ন অপর কোন প্রণালীর সহিত ঐ শ্লোকোক্ত প্রণালীর সামঞ্জস্য করা যায় না; এবং ইহাও জানিতে হইবে যে 'গ্রেগরির সূত্র' আবিষ্কৃত হইবার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে 'গ্রহলাঘব' রচিত হইয়াছিল। (ইহার প্রণয়নকাল ১৪৪২ শকাব্দ; 'মৃণ্ময়ী' ৮০ পৃষ্ঠা) গ্রহলাঘবকার কোন্ গণিতসূত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। ইহা যে 'বিষমীকরণ প্রণালীর' * কোন জটিল সূত্রাবলম্বন করিয়া সাধিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়; কিন্তু এই সকল সূত্র কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা কে বলিয়া দিবে?

'মৃণ্ময়ীর' গ্রন্থকার ব্যক্তিবিশেষের মত সংগ্রহ করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে পলভা ৮ অঙ্গুলির অতিরিক্ত হইলে তাহাতে উক্ত প্রণালী প্রযুক্ত হইতে পারিবে না; কিন্তু

---

* 'বিষমীকরণ প্রণালীকে' ইয়ুরোপীয় গণিতবিজ্ঞানে 'Differential Calculus' বলা যায়।

পাঠকবর্গ দেখিতে পাইয়াছেন যে, কেবল অংশমানেতে অক্ষাংশ সাধন করিতে হইলে ৯ অঙ্গুলিমিত পলভা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াও উক্ত প্রণালী ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাতে অত্যন্ত অধিক কলাশুদ্ধি ঘটিবে না।

গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার শেষ দুই পদ এই,—

"চান্দ্রাঃ কল্পে সৌর চান্দ্রান্তরে যে
মাসাস্তজ্‌জ্ঞৈস্তেঽধিমাসাঃ প্রদিষ্টাঃ॥

ইহার অর্থ এই করা যায় যে, 'এক কল্পে (অর্থাৎ এক সহস্র মহাযুগে) যত সৌরমাস সংখ্যা ও যত চান্দ্রমাস সংখ্যা হয়, এতদুভয়ের অন্তরফল দ্বারা যে উদ্বৃত্ত চান্দ্রমাস সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা তাহাকে অধিমাস সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' কিন্তু গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই করিয়াছেন যে, "চান্দ্রমাস-সংখ্যা হইতে সৌরমাস-সংখ্যা বিয়োগ করিলে চান্দ্রমাসের যে অংশ (?) অবশিষ্ট থাকে তাহাই অধিমাস নামে বিখ্যাত।" তৎপর আবার বলিয়াছেন যে, "কল্পের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উপলক্ষণ মাত্র"; কিন্তু শ্লোকার্থদৃষ্টে অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায় যে গ্রন্থকার 'অধিমাস' শব্দের ভুল অর্থ করিয়াছেন। যাবতীয় প্রাচীন গ্রন্থেই সংখ্যা সকল কল্পকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; তাহা হইতে ভাগ বিয়োগাদি প্রক্রিয়া দ্বারা কোন অন্তর কালের নিমিত্ত ফল সাধন করিতে হয়। ৭৩ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত শ্লোকে 'অধিমাসের' প্রকৃত অর্থ আরও সুস্পষ্ট হইবে; যথা,—

"চান্দ্রোন সৌরেণ হৃতাত্তু চান্দ্রা-
দবাপ্ত সৌরৈর্দশনদলাঢ্যৈঃ।
মাসৈর্ভবেচ্চান্দ্রমসোঽধিমাসঃ।" ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই হইবে যে, 'সৌরমাসের পরিমাণ হইতে চান্দ্রমাসের পরিমাণ বিয়োগ করিলে যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে "চান্দ্রোন সৌর" বলা যায়। এই সংখ্যা দ্বারা চান্দ্রমাস পরিমাণকে ভাগ করিলে সৌর ৩২ মাস, ১৬ দিন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; অতএব এই পরিমাণ সৌরকালান্তে এক অধিমাস হইয়া থাকে।' ইহা কেবল একটি সরল অনুপাতমাত্র; 'চান্দ্রোন সৌর' দ্বারা প্রত্যেক সৌরমাসে তাহা এক চান্দ্রমাস হইতে কত অধিক তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব এক সৌরমাসে যদি উক্ত পরিমাণ অন্তর ঘটে তবে কত সৌরমাসে এক চান্দ্রমাসমিত অন্তর ঘটিবে? ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, যখন সৌরমাসসংখ্যা ও চান্দ্রমাস-সংখ্যাদ্বয়েতে এক মাসের অন্তর লক্ষিত হয় তখন ঐ উদ্বৃত্ত চান্দ্রমাসকে অধিমাস কহা যায়। অতএব সপ্রমাণিত হইতেছে যে অধিমাস চান্দ্রমাসের "অংশ" নহে, অথবা তাহা "সৌর ও চান্দ্রমাসের যে অন্তরকাল" তাহাও নহে। গ্রন্থকার উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ এই করিয়াছেন যে, "সৌরমাস দ্বারা চান্দ্রমাস শোধিত হইয়া যে স্থলে সৌর ৩২। ১৬ বত্রিশ মাস ষোল দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই স্থলে এক অধিমাস হইয়া

থাকে।” মৎপ্রদত্ত শ্লোকার্থদৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, গ্রন্থকার অধিমাস শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারাতে উপরোক্ত অর্থ ভুল করিয়াছেন।

৯৬ পৃষ্ঠার টীকাতে সংক্রান্তির যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত আমি এক-মত হইতে পারিতেছি না। ইয়ুরোপীয় জ্যোতিষে সংক্রান্তি দ্বারা রাশিসংক্রমণ বুঝায় না; তাহাতে কেবল ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের গতি নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, অতএব ঐ বৃত্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিক্রমণার্থ অয়নাংশশোধন প্রয়োজন হয়। কিন্তু হিন্দুজ্যোতিষে রাশিচক্রে রাশি সংক্রমণ কাল দ্বারা সংক্রান্তি বুঝায়। যেহেতু রাশিচক্র এবং রাশিগণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব ক্রান্তিপাতগতি তাহাদিগের স্থিতিব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। এইহেতু দৃষ্ট হয় যে, সৌররাশিসংক্রান্তিতে অয়নাংশ শোধন নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ‘মকর-সংক্রান্তি’ ও ‘উত্তরায়ণ সংক্রান্তি’ এক নহে; ‘মেষ-সংক্রান্তি’ ও ‘বিষুব-সংক্রান্তি’ এক নহে ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে প্রথম সংক্রা-ন্তিকে অয়নাংশশোধিত করিলে যথাক্রমে শেষোক্ত সংক্রান্তি সাধিত হইবে।

৯৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে “ইউরোপীয় মতে ক্রান্তিপাতের বার্ষিকগতি ৫৫ বিকলা। অতএব ভারতীয় মতের সহিত ইহার অতি সামান্য অনৈক্য রহিয়াছে।” গ্রন্থকারের শেষ উক্তিটি ঠিক হইলেও তিনি যে উপায়ে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহা ঠিক নহে। ইউরোপীয় মতে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫০.২ বিকলা; ইহা বিষুবদ্বৃত্তে পরিমাপ হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ঐ গতি পরিমাণ ৫৪ বিকলা; কিন্তু তাহা ক্রান্তিবৃত্তে পরিমাপ হয়। এক্ষণে দৃষ্ট হইবে যে ক্রান্তিবৃত্ত হইতে ইহাকে বিষুবদ্বৃত্তে সম্পাতিত করিলে তাহার পরিমাণ ৫০.১ বিকলা হইয়া থাকে; অতএব ইহার সহিত ইউরোপীয় মতের অনৈক্য অতি সামান্য। গ্রন্থকার ঐ গতি প্রমাণ ৫৫ বিকলা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত নহি।

১২০ পৃষ্ঠাতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই,—

“অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরা রবেঃ।
দেবভাগে সুরাণান্তু হেমন্তে মন্দতান্যথা॥”

অস্যার্থঃ।—“গ্রীষ্মকালে উত্তরগোলে অত্যন্ত নৈকট্য প্রযুক্ত সূর্য্যকিরণের তীব্রতা এবং দূরত্ব প্রযুক্ত হেমন্তকালে মৃদুতা হইয়া থাকে।” তৎপর গ্রন্থকার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে উত্তর গোলে সূর্য্য ‘মন্দোচ্চবৃত্তে’ অবস্থিতি করে; কিন্তু এতদুপলক্ষে ‘উচ্চ’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ ‘উচ্চ’ শব্দে সর্ব্বাধিক দূরত্ব বুঝায়। ‘উচ্চ’ দুই প্রকার; ‘শীঘ্রোচ্চ’ ও ‘মন্দোচ্চ’। গ্রহকক্ষের যে বিন্দুতে তাহা পৃথিবী হইতে সর্ব্বাধিক দূরে অবস্থিতি করে তাহাকে ‘শীঘ্রোচ্চ’ বলা যায়; (ঐ স্থলে গ্রহকে অপেক্ষাকৃত শীঘ্রগতি চলিতে দেখা যায় বলিয়াই তাহার নাম ‘শীঘ্রোচ্চ’ করা হইয়াছে) এস্থলে গ্রহকে সূর্য্যের সহিত সমসূত্রস্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন

অপর একটি বিন্দু আছে যেস্থলে গ্রহ সূর্য্য হইতে সর্ব্বাধিক দূরে অবস্থিতি করে, তথায় গ্রহ আকর্ষক বস্তু হইতে দূরে অবস্থিত হওয়াতে আকর্ষণের খর্ব্বতাহেতু মন্দগতি প্রাপ্ত হয় ; ইহাকে 'মন্দোচ্চ' বলা যায়। ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে সূর্য্য ও চন্দ্রের 'শীঘ্রোচ্চ' নাই, কারণ তাহারা যখন পৃথিবী হইতে সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তী হয়, তখন তাহার গতিখর্ব্বতা ঘটিয়া থাকে। (সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।) গ্রহকক্ষে উচ্চ বিন্দুদ্বয়ের বিপরীত দিকস্থ বিন্দুদ্বয়কে 'নীচ' বলা যায়। মৃণ্ময়ীর ১০৩ পৃষ্ঠার টীকাতে উক্ত হইয়াছে, "দক্ষিণগোলের নীচপ্রদেশ শীঘ্রোচ্চ নামে অভিহিত হয়।" পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন ইহা সম্পূর্ণ ভুল। 'নীচ' যে 'উচ্চ' হইতে পারে না তাহা বুঝাইতে যাওয়া একান্ত ধৃষ্টতা মনে করি। ১০৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার পুনরায় সূর্য্যের শীঘ্রোচ্চ-বৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন ; বলা বাহুল্য যে তাহাও ভুল। যাঁহারা উপরোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে ভারতী-সম্পাদিকা-প্রণীত "পৃথিবী" গ্রন্থের ঋতু-পরিবর্ত্তনবিষয়ক স্থলবিশেষ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠাতে সৌরবর্ষের যে পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভাস্করাচার্য্যের মতানুযায়ী ; কিন্তু তদ্বিষয়ে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। যথা ;—

	দিন	দণ্ড	পল	বিপল
সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে	৩৬৫	১৫	৩১	৩১·৪
পৌলিকসিদ্ধান্ত মতে	৩৬৫	১৫	৩১	৩০·০
পরাসরসিদ্ধান্ত মতে	৩৬৫	১৫	৩১	১৮·৭৫
আর্য্যসিদ্ধান্ত মতে	৩৬৫	১৫	৩১	১৭·১
লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত মতে	৩৬৫	১৫	৩১	১৫·০
ভাস্করের মতে	৩৬৫	১৫	৩০	২২·৫
টলেমির মতে	৩৬৫	১৫	২৪	৩১·৫
বর্ত্তমান ইউরোপীয় মতে	৩৬৫	১৫	২২	৫৪·০

১০৯ পৃষ্ঠাতে যে শ্লোকত্রয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বায়ুর স্তরময়ত্ব ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (ঐ শ্লোকগুলি ভাস্করাচার্য্য হইতে সংগৃহীত।) তাহার এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, "পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে দ্বাদশ যোজন অর্থাৎ ৪৮ ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ভূবায়ুর সীমা।" এস্থলে এক টীকা করিয়া ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে উপরোক্ত মতের সহিত ইয়ুরোপীয় মতের তুল্যতা সপ্রমাণিত হইতে পারে ; এবং তদর্থে ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, "ইয়ুরোপীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে ভূবায়ু পৃথিবীর প্রায় ৫০ পঞ্চাশ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে," এবং "ভারতে দেশভেদে ক্রোশভেদ আছে।" অতঃপর ৪০০০ হাতে যে এক ক্রোশ হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ দর্শান হইয়াছে। ইহার প্রথম সিদ্ধান্তের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ইয়ুরোপীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীমতে গণনা করিয়া

দেখিয়াছি; তাহাতে বায়ুস্তরের সীমা ৪০ চল্লিশ "মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে," সপ্রমাণিত হয়। (ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান তাহাই শিক্ষা দিতেছে।) তৎপর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত একান্ত অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন হইতেছে; কারণ "দেশভেদে ক্রোশভেদ" হইলেও ভাস্করাচার্য্যে "দেশভেদ" কোথায়? যিনি এস্থলে ক্রোশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাঁহা হইতেই তাহার পরিমাণ জ্ঞাত হইতে যত্নশীল হইব; অন্য লোক তাহার কি পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন? ভাস্কর বলিলেছেন,—

"হস্তৈশ্চতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ ক্রোশঃ সহস্রদ্বিতয়েন তেষাম্॥"

('মৃণ্ময়ী' ৫৬ পৃষ্ঠা; ও 'লীলাবতী')

ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভাস্করাচার্য্য ৮০০০ হাতে এক ক্রোশ গণনা করেন। অতএব আমরা ভাস্করাচার্য্যের ক্রোশকে সর্ব্বদা ভাস্করাচার্য্যের পরিমাণ (অর্থাৎ ৮০০০ হাত) দ্বারা নির্দ্দেশ করিব।

এস্থলে গ্রন্থকার আরও একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছেন; ইয়ুরোপীয় মতে ভূবায়ুর সীমা নির্দ্দেশ করণান্তর বলিয়াছেন, "ইহাই পৃথিবীর সীমা। এই সীমাস্থিত সমুদয় পদার্থই পৃথিবীকর্ত্তৃক আকর্ষিত রহিয়াছে। অতঃপর অন্য গ্রহের অধিকার সীমা।" গ্রন্থকার এই কথাগুলি ব্যক্ত না করিলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারিতাম, কারণ সমালোচকের নিকট, 'তাবচ্চ শোভতে...' ইত্যাদি বাণী প্রয়োগ করিতে বাধ্য হওয়া একান্ত অপ্রীতিকর কার্য্য। আকর্ষণের যে সীমা নির্দ্দেশ হইতে পারে না তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে 'মাধ্যাকর্ষণ সূত্র' প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। তবে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশুক যে যাহা কিছু "পার্থিব" বলা যাইতে পারে, তাহা সমস্তই বায়ুমণ্ডলের সীমান্তর্গত। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ ইহার বহির্ভাগেও কার্য্য করিতেছে; যথা,—এই আকর্ষণে চন্দ্র কক্ষাবর্ত্তন করিতেছে, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ কক্ষপথে বিচলিত হইতেছে ইত্যাদি।

১১৩ পৃষ্ঠায় ভাস্করাচার্য্য হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দর্শান হইয়াছে যে, "যে পর্য্যন্ত সূর্য্যকিরণের প্রচার হয়, সেই পর্য্যন্ত আকাশের পরিধি...।" ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভাস্কর আকাশ অথবা 'দৃষ্টিগোলক' দ্বারা কি বুঝিতে হইবে, তাহা হৃদবোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দৃষ্টিবিষয়ে 'আলোকভ্রান্ত' হওয়াতে যে আমরা আকাশের একটি গোলকাকার সীমা দর্শন করিয়া থাকি তাহা নিউটনই প্রথম শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের প্রতীতি রহিয়াছে; কিন্তু এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভাস্কর সে জ্ঞানে বঞ্চিত ছিলেন না। তবে পার্থক্য এই যে নিউটন তাহাকে ভ্রমমাত্র মনে করিয়াছিলেন কিন্তু ভাস্কর তাহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যাহা হউক মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকার সে বিষয়ে দৃক্‌পাত করেন নাই; আমরা যে

প্রাচ্যাদিত জ্ঞানরবি 'ভাস্করের' তেজে গৌরবান্বিত হইব বলিয়া আশান্বিত হইতেছি, তিনি সে বিষয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া আমাদের হইতে ভাস্করের বিমলালোক অপহরণ করিয়া নিয়াছেন! তিনি সূর্য্যকিরণের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই; যথা,—"...পিটরপারলি সূর্য্যমণ্ডলের ও সূর্য্যকিরণের স্বাভাবিক উষ্ণতা স্বীকার করেন নাই। ইহার মতে ভূবায়ুর সাহায্যই সূর্য্যকিরণের উষ্ণতার কারণ, যেস্থলে ভূবায়ু যত গাঢ় সেস্থান তত অধিক উষ্ণ হয়। ...যে সকল মানব মুক্তির অধিকারী মৃত্যুর পরে তাঁহারা আদৌ সূর্য্যলোকে গমন করেন, অতএব সূর্য্যমণ্ডল যে ভীষণ উত্তপ্ত এরূপ বোধ হয় না।" মৃত্যুর পরে কি কেহ সশরীরে মুক্ত হইতে কামনা করেন কিম্বা শরীর ছাড়িয়া মুক্ত হইতে চাহেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা শরীর ছাড়িয়া মুক্তাত্মাতে পরিণত হইবেন, তাঁহাদের এত উত্তাপে ভয় কেন? তা ছাড়া মুক্তির অধিকারী নিষ্পাপ ব্রহ্মজ্ঞানীর উত্তাপে কি করিবে? সে যাহা হউক এক্ষণে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ছাড়িয়া পদার্থবিজ্ঞানের সোপানে অবতরণ করা যাউক। ইহা অতি সত্য যে, "যেস্থানে ভূবায়ু যত গাঢ় সে স্থান তত অধিক উষ্ণ হয়;" কিন্তু তাহাতে সূর্য্যকিরণ সম্পাতিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা হয় না। বায়ু যে উষ্ণ নহে তাহা (মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকার না জানিলেও) সকলেই জ্ঞাত আছেন। সূর্য্যকিরণও যদি উষ্ণ না হয় তবে উভয়ের সাহচর্য্যে উষ্ণতা কোথা হইতে অধিষ্ঠান হইবে? (উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ অজ্ঞতা প্রকাশিত হইতেছে ও তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।) পাঠকগণ সকলেই সূর্য্যকিরণের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন মনে করিয়া তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছ। তবে ইহা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে যে বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্যের উত্তাপ পরিমাপার্থ 'Solar Radiometer' নামে যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ তাপমান যন্ত্র দ্বারা (Thermometer) বায়ুর উত্তপ্ততা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু তদ্দ্বারা, সূর্য্য কত উত্তাপ বিকীরণ করিতেছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়াই উক্ত যন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। (ইহার অপর নাম 'Actinometer'।)

গ্রন্থকার অনেক স্থলে বিনা প্রয়োজনে হিন্দুশাস্ত্রকে আসরে আনিয়া বিষম ফাঁপরে ফেলিতেছেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিতেছেন, "সূর্য্যমণ্ডল যে ভীষণ উত্তপ্ত এরূপ বোধ হয় না।" তাহা যদি না হইল তবে রামায়ণে সম্পাতির পক্ষ দগ্ধ হইয়াছিল কিসে? আশা করি, ইহা কেহই দর্শাইতে পারিবেন না যে হিন্দুশাস্ত্রে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলকে অনুত্তপ্ত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কারণ আমি পূর্ব্বপুরুষদিগকে ইহা হইতে অধিক "ন্যাচরাল ফিলসফীর" সূত্রে জ্ঞানশালী বলিয়া বিশ্বাস করি।

ভাস্করাচার্য্য স্থলবিশেষে যে আরও একটি বিমল জ্ঞানের আভাস দিয়াছেন মৃণ্ময়ীতে তাহা দর্শাইয়া দিবার সুযোগসত্ত্বেও গ্রন্থকার আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়াছেন তাই

তাহা পাঠকবর্গের গোচর করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। গ্রন্থের ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠায় যে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতে আছে, "বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলেন,...ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত গুরু পদার্থ মাত্রকেই যখন আকাশে স্থির থাকিতে না পারিয়া নিম্নে পতিত হইতে দেখা যায়, তখন গুরুভার পৃথিবীও অবশ্য অধোগামিনী হইতেছে।" ভাস্কর বৌদ্ধাচার্য্যগণের কথা দিয়াই তাঁহাদিগকে উত্তর দিয়াছেন যে, যেহেতু, "আকাশে নিক্ষিপ্ত গুরু পদার্থের পৃথিবীতে যাতায়াত" হইতেছে, অতএব পৃথিবী অধোগামিনী হইতে পারে না। তিনি ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে উপরোক্ত যুক্তি মানিতে হইলে ইহা জানিতে হইবে যে, 'যে বস্তু যত গুরু তাহা তত বেগে (অর্থাৎ তত শীঘ্র) ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হয়', এবং 'পৃথিবী তৎপৃষ্ঠস্থ অপর সকল পদার্থ হইতে অধিকতর গুরু' অতএব 'তাহা অধোগামিনী হইলে আকাশ-নিক্ষিপ্ত কোন পদার্থ নিম্নগতিবশে পৃথিবীতে আসিতে পারিত না।' ইহা হইতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে, ভাস্কর ইহা জ্ঞাত ছিলেন যে, যে পদার্থের 'বস্তুমান' যত অধিক তাহা তত বেগে আকৃষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়। (ধরাকর্ষণে যে, "শূন্যমার্গে ক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে" তাহা 'মৃণ্ময়ী'র ৩৯ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।) অতএব, নিউটনের 'মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের' প্রথমাঙ্গ ধরাপক্ষে যতদূর প্রযুজ্য হইতে পারে ভাস্করাচার্য্য তাহা বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিলেন, ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে।

উপসংহারে ইহা নিবেদন করিতেছি যে মৃণ্ময়ীর দোষাংশ যত পারা যায় উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। গ্রন্থ ১১৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; অতএব দৃষ্ট হইবে যে, দোষাংশ বাদ দিয়া তাহার গুণাংশ অত্যন্ত অধিক। ভরসা করি, গ্রন্থকার দোষাংশ বিবর্জ্জিত করিয়া গ্রন্থকে কেবলমাত্র গুণাংশের সমষ্টিরূপে পরিণত করিবেন। জাতীয় গৌরবে 'মত্ত' হওয়া অতিশয় মনুষ্যোচিত ও গৌরবান্বিত কার্য্য; কিন্তু সেই হেতু তাহাতে 'উন্মত্ততা' প্রদর্শন করিতে গেলে ঐ গৌরবের খর্ব্বতা ঘটিয়া থাকে'; অতএব স্থিরবুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক উক্ত গৌরবের ভিত্তি সত্যের ও তত্ত্বমীমাংসার উপর স্থাপিত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে কেবলমাত্র উন্মত্ততার ফলে আমাদের অনেক প্রাদেশিক গৌরব বাহ্যজগতের উপহাসাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

শিক্ষা-সঙ্কট। *

(১)

বিপদে পরামর্শ সস্তা—একথা যেমন ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে খাটে তেমনই জাতি বা সমাজ সম্বন্ধে খাটে। আমাদের দেশ বিপন্ন, লগ্ন জ্বরের ন্যায় বিপদ আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীই রোগের মূল এবং এইরূপ রোগ নির্ণয় করিয়া তাঁহারা ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রাচীন ভট্টাচার্য্যগণ বলেন, ইংরেজি শিখিয়া লোক অধঃপাতে গিয়াছে। এখনকার লোকেরা বলেন, ইংরেজি শিখিয়া বিশেষ ফল নাই—এখনও আমরা ইংরেজ হইতে পারিলাম না। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। এ অবস্থায় প্রকৃত কথা কি এবং প্রস্তাবিত উপায়গুলি কতদূর কার্য্যকারী ইহার তথ্য অনুসন্ধান করা নিষ্ফল চেষ্টা নহে।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দেশে মঙ্গল বা অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে—একথা আমরা সচরাচর বলি ও লিখি। কিন্তু কথাটা কিছু জড়ান। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রচার—কি ইংরেজি কি অন্য প্রকার—লোক সংখ্যার তুলনায় যে অতি সঙ্কীর্ণ তাহা কোন একবারকার সেন্‌সাস বিবরণী খুলিলেই দেখা যায়। সুতরাং শিক্ষার সহিত সমগ্র দেশের সুখ দুঃখের হ্রাস বৃদ্ধির—দেশের আয় ব্যয়ের স্থিতি—বা অন্য প্রকার উন্নতি অবনতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এ কথাটা একদিক হইতে দেখিলে অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা স্বাভাবিক নেতৃত্ব আছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে এরূপ নেতৃত্ব ছিল কি না তাহার আলোচনা অনাবশ্যক, তবে এখন এই নেতৃত্বের যে একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখা যায় তাহাতে আসল বস্তুটা যে একেবারে নাই তাহা বলা যায়না। আর যদিই বা প্রকৃত অবস্থা অন্য প্রকার হইত তাহা হইলেও আমাদের শিক্ষা প্রণালীর গৌরব লাঘবের কারণ ঘটিত না। সাধারণ শিক্ষা প্রণালীর অধিকারভুক্ত লোক এত অধিক ও আমাদের সহিত তাহাদের এরূপ সম্বন্ধ যে এ বিষয়ে আমরা কথনই

---

* নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছেঃ—

(১) অনারেবল জষ্টিশ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা (Calcutta University Minutes for 1891-92)

(২) "শিক্ষার হের-ফের" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত (সাধনা, পৌষ ১২৯৯)

(৩) "শিক্ষা-প্রণালী" শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত কৃত (ঐ মাঘ ঐ)

(৪) "প্রসঙ্গ-কথা" (ঐ চৈত্র ঐ)

উদাসীন হইতে পারি না। তবে সুবিচারের জন্য আলোচ্য বিষয়ের চৌহদ্দি উত্তমরূপে নির্ণয় করা আবশ্যক।

ফল দেখিয়া গাছ চিনিতে হয়। আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর সম্বন্ধে ভাল মন্দ স্থির করিতে হইলে ইহার ফল পরীক্ষা করা আবশ্যক। অবশ্য মনুষ্য জীবনের আদর্শ উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ দেশে শিক্ষা প্রচলনে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উৎপন্ন ফল যে হেয়, অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই—বরঞ্চ তাহার বিপরীত হইলেই আশ্চর্য্যের কথা হইত। আর আমরা যে ফল হস্তগত করিয়াছি তাহাতে যে অসন্তুষ্ট আছি ইহাতে ভবিষ্যতের জন্য একটা আশারও সঞ্চার হয়। কিন্তু যদ্যপি লব্ধ ফল সম্পূর্ণরূপে হেয় ও একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে—আমরা আম্রের প্রত্যাশী হইয়া বাবলার বনে আসিয়াছি। তাহা হইলে, সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা বিফল, বিনাশের আবশ্যকতা উপস্থিত। এইরূপ ঘটিয়াছে ভাবিলে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ ও হত-উদ্যম হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ অন্ধকূপে আত্মবিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে সত্য সত্যই আমরা গত্যন্তরবিহীন কি না। বিষয়টি সুচারুরূপে বুঝিবার জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের শিক্ষিত লোকের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থার তুলনা করা আবশ্যক।

এরূপ তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সন্দেহ জন্মে যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে মোটামোটি ধরিলে রামমোহন রায়ের সময়ের পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া একটা কিছু ছিল কি না?—এ কথাটা বলা একটুকু দুঃসাহসের কর্ম্ম, মনে হয়। কষ্টে কথঞ্চিত প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় লেখাপড়া শিক্ষার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। কষ্ট ক্লেশে দেহ বহন করিবার শক্তিকে শারীরিক-বল বলা যায় না। তবে টোলে সংস্কৃতের চর্চ্চা ছিল ও বড়মানুষদের ভিতর, পারসী উর্দ্দু পড়িবার রেওয়াজ ছিল। সুতরাং সেকালের টুলো পণ্ডিত ও বড়মানুষের সহিত একালের শিক্ষিত লোকের মানসিক বিকাশের তুলনা করিলে কতক পরিমাণে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। টোলে শিক্ষা হইত প্রধানতঃ ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতি। তাহার মধ্যে ব্যাকরণ ব্যাকরণের মত পড়া হইত না। ভাষা শিক্ষার উপায় বলিয়াই ব্যাকরণের দাম। নতুবা তর্কে পরাজিত বিপক্ষের মস্তকে কম্বল ঝাড়িবার অধিকারদাতা বলিয়া ব্যাকরণের মান্য নাই। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সম্মার্জ্জিত বুদ্ধিতে মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের সাধনোপযোগী বিষয়গুলি অনায়াসে যথাতথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে—এ জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন। নতুবা ন্যায়শাস্ত্র পুরুষের ভোগ বা অপবর্গ সাধক কোন কার্য্যেই লাগে না। স্মৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য লোক সংস্থিতি। নতুবা যে স্মৃতি শিক্ষা মানুষে মানুষে ভেদ জন্মাইয়া সমাজকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর

করিয়া দেয় তাহা কিরূপ শিক্ষা? না, যেরূপ বিষ অন্ন। রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য লাট আমহার্ষ্ট'কে যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তাৎকালিক বিদ্যাশিক্ষা অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। আর পারসী, উর্দ্দু শিক্ষার প্রধান উপকরণ ছিল কতকগুলি অশ্লীল উপন্যাস।

যাঁহারা ভাবেন যে ঘৃত ও তণ্ডুলের ন্যায় অপরাপর সকল বস্তুরই পুরান হইলে দাম বাড়ে তাঁহারা বলিবেন যে, এখানে পুরাতন শিক্ষিত সমাজ অন্যায়রূপে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, এখনও টুলো পণ্ডিত ও পারসী নবিস রহিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একবার তুলনা করিয়া দেখুন।

গণিত, ইতিহাস, ভূগোল সম্বন্ধে সেকালের লোক সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। অস্থিতপঙ্কের প্রশ্ন উত্তর করা তখনকার গণিতশিক্ষার উচ্চতম সীমা ছিল। ইতিহাসের দৌড় ছিল রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত। ভূগোলের জ্ঞান নিজ নিজ গ্রামের প্রান্ত সীমায় আবদ্ধ ছিল। সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, অচল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যের দৈনিক গতি, বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু—যথেচ্ছা এরূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা অনায়াস-সাধ্য। এইরূপ জ্ঞানান্ধকার মোচন করিবার জন্যই খৃষ্টিয়ান মিসনারিরা ইংরেজী শিক্ষা চালাইতে যত্নশীল হয়েন। * এইদিকে সেকাল হইতে যে সেকালে হইতে একালে যে কতদূর জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে একথাগুলি স্মরণ করিলেই তাহা যথোপযুক্তরূপে বোধগম্য হইবে। কেহ কেহ বলেন যে এ উন্নতি যথার্থ পক্ষে অবনতি। কেন না তখনকার লোক নিজের কাজ চালাইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন। সেই যথেষ্ট শিক্ষা ছিল।

ইহার উত্তরে কেবল এই বলিতে হয় যে, যাহা হউক করিয়া স্ব কর্ম্ম সাধনের উপযোগী জ্ঞান প্রচার করা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে—মানসিক বিকাশ সিদ্ধি করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি এখনকার শিক্ষা ডাক্তারকে কেবল ডাক্তারিই শিখাইত, এঞ্জিনীয়ারকে এঞ্জিনীয়ারিং মাত্র শিখাইত, কেরাণীকে কেবল কেরাণীগিরিই শিখাইত তাহা হইলে এখনকার শিক্ষা শিক্ষাই হইত না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে একথা ভিত্তি হীন। "সাধনায়" প্রকাশিত প্রবন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কেন বর্ত্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন বলিতে পারি না। † চলিত শিক্ষা প্রণালী বহুদোষ সঙ্কুল হইলেও তাহার এই দোষ নাই। তবে

---

* The Life of Alexander Duff D. D. L. L. D. by George Smith, C. I. E. L. L. D. vol 1p. 140 দ্রষ্টব্য।

† "সাধনা" পৌষ পৃঃ ৯৪, ৯৮, ৯৯।

যদি "অত্যাবশ্যক" কথার অর্থ হয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক তাহা হইলে দোষটার পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষা চালান। যদি পরীক্ষা প্রণালী নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিতেছে না এমন হয়, তাহা হইলে অল্লায়াসে সে দোষের পরিহার হইতে পারে।

এখন দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমাদের চরিত্রের উন্নতি হইয়াছে কি না। অবশ্য, শিক্ষিত সম্প্রদায় বা ভদ্রলোকের চরিত্রই এখানে আলোচ্য। ইতর সাধারণের স্বাভাবিক দোষ গুণ প্রত্যক্ষ ভাবে বিচার্য্য নহে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সরকারী চাকরেরা সাধারণতঃ সকলেই ঘুষখোর ছিল—ঘুষ নেওয়া যে দোষের বিষয় এরূপ বিশ্বাসও কাহার ছিল না। অপরিচিত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে নাম ধাম জিজ্ঞাসার পর তখন এইরূপ কথা চলিত—

প্রশ্ন। "মহাশয় কি মাহিয়ানা পান ?"

উত্তর। "মাহিয়ানা বড় কিছু নয়।"

প্রশ্ন। "উপরি ?"

উত্তর। "তা' দু'পয়সা আছে।"

এখন ভদ্রলোকের মধ্যে এরূপ প্রশ্ন করিলে ফৌজদারী হাঙ্গামা উপস্থিত হয়।

সেকালে অনৈতিক যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনা একটা বাবুগিরির মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন ঐরূপ বাবুগিরি লুকাইয়া চোরাইয়া করিতে হয় এবং উহাতে বাবুগিরি যতই বাড়ুক না কেন সম্ভ্রমের যে হানি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সেকালে জমীদার সরকারে "হপ্তকলমী" একজন প্রধান আমলার মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন "হপ্তকলমী" * নামটাও অনেকে বুঝিতে পারে না।

বাঙ্গালা সাহিত্যও সংস্কৃতের আদর ইংরেজি শিক্ষার সহিত একত্রে জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। আর হিমালয় হইতে আসমুদ্র ভূভাগ যে আমাদের মাতৃভূমি এ জ্ঞান ইংরেজি শিক্ষা হইতেই আমরা পাইয়াছি। "উড়েমেড়া," "বাঙ্গাল ভূত" "মেড়ুয়াবাদী ছাতুখোর" এ সকল কথা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ক্রমে নিরর্থক হইয়া আসিতেছে। মানুষকে অনেকটা মানুষ বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছি। বৈদেশিকদিগের সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সমস্বরে আমরা এখন আর বলি না যে,

"ইলিবিলি জপে আর কিলিবিলি বকে।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেখা যায় যে ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন, প্রতিমা পূজাকে রূপকচ্ছলে ঈশ্বর উপাসনা বলিয়াছিলেন এই অপরাধে হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হন। আর এখন হিন্দু অভিমানী শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এমন কেহই নাই

---

* "হপ্তকলমী" বা সপ্তকলমী অর্থে পেশাদার জালিয়াৎ, যে সাত রকম হাতের লেখা লিখিতে পারে।

যে প্রতিমা পূজাকে রূপক বলিয়া গ্রহণ না করেন। রূপক হইতে অরূপক উপাসনা স্বাভাবিক উপাসনার একপদ মাত্র।

ফল কথা ইংরেজি শিক্ষার দোষ গুণ বিচার করিবার শক্তি ইংরেজি শিক্ষা হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে। মাইকেল দত্ত, দীনবন্ধু, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র—ইহাঁরাও ইংরাজি শিক্ষার ফল।

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা ইহার উন্নতি অনভীপ্সিত এ কথা বলিবার জন্য পূর্ব্ব মত তুলনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই—তবে সত্যের নিক্তি ঠিক রাখা প্রয়োজন ও তাহাই এখানে উদ্দেশ্য। আর একটা কথা এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর ন্যূনতা দেখাইতে হইলে পরের মত কথা কহিতে নাই, ঘরের লোকের মত সস্নেহে, শ্রদ্ধার সহিত দোষ নির্ব্বাচন করিতে হয়। এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর সহিত আমাদের বিবাদের স্থল নাই—এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

আমাদের ন্যায় যাহাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই—যাহাদের হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি পাপিয়া-দম্পতির ন্যায় বাসা বাঁধিয়া আছে ও কল কূজনে সমস্ত জীবনে চির বসন্ত জাগাইয়া রাখিয়াছে—যাহাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ইষ্টক দেহের পঞ্জর তুল্য—তাহাদের কাছে নিন্দা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা ঘোষণা কিরূপ লাগে বলিবার আবশ্যক নাই। নিম্নে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইল, তাঁহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক, ঠিক দিকে দৃষ্টি করিলে তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী হইতে দেশের যে উন্নতি হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন না, এ কথা অসম্ভব। কিম্বা আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়াছি তাহাকে তাঁহারা যে অপর কিছু বলিবেন, ইহাও অবিশ্বাস্য। তবে যে তাঁহারা আমাদের শিক্ষা প্রণালীর উপর সূচাল কথার বাণবৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা আমাদের দুরদৃষ্ট বশতই হইবে।

চৈত্র মাসের "সাধনায়" লিখিত হইয়াছেঃ—

"ইংরাজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশু ঐ বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি বড় বড় সৌধ বুদ্বুদের মত প্রতীয়মান হইবে। ভালরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ও গুলাকে বুদ্বুদ বলিয়া বুঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎলোক প্রবাহের মধ্যে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোন মূল নাই।"

এই কয়েক ছত্র পড়িলে মন দুঃখ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কোনও শিক্ষিত লোক যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঘৃণা ব্যঞ্জক "ওগুলা" শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন, না দেখিলে আমাদের বিশ্বাস হইত না। আশ্চর্য্য হইবার অপর কথাও আছে। এদেশে কোথায় সে "বৃহৎ লোক প্রবাহ" যাহার মধ্যে অতিশয় অল্পমাত্র স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষার ধারা বহিতেছে? আমরা কি অন্ধতাবশতই মনে করি যে শিক্ষার অধিকারের সীমা ছাড়াইলে আর "প্রবাহ" নাই—বদ্ধজল, কূপোদক?

যাহা হউক, সত্য সত্যই কি আমাদের শিক্ষা পানাপুকুরের পানার মত কেবল উপরি উপরি ভাসিতেছে? আর যদি তাহাই হয়, তবে সেটা শিক্ষার দোষ বা জাতিভেদে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেশের প্রকৃতি-গত দোষ?

এ বিষয়টা বিচারে অধ্যস্ত হইলে দেখিতে হয় যে, শিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ হাকিম ও আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষিত ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার হওয়ার ইংরেজি শিক্ষার ফল জনসাধারণে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে কি না। যদি এ প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলিতে হয় তাহা হইলে প্রস্তাবিত সমস্যার আপনা হইতে পূরণ হইয়া আইসে। যদি একজন চাষার ছেলে লাটসাহেবের মন্ত্রী সভায় আসন পান তাহা হইলে চাষার দলেও যে ইংরেজি শিক্ষার ফল পৌঁছায় নাই, এ কথা বলা যায় না। এইরূপে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই ঠিকটা চোখে পড়ে। তবে যে প্রকার দ্রুতগতিতে ইংরেজি শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছে দেশে জাতিবিভাগ থাকায় ও স্ত্রীশিক্ষার অভাবে শিক্ষার গভীরতা সে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই—ইহা সত্য। কিন্তু তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রসূত দেশীয় সাহিত্যের সাহায্যে ইংরেজি শিক্ষার ফল যে অলক্ষিতভাবে সাধারণ্যের নিকট উপস্থিত হইতেছে ও সরকারী পাঠশালায় যে এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছে—এটাও সত্য। আর একটা বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। মফঃসালে যেখানে যেখানে ইংরেজি কলেজ আছে তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানের সহিত যেখানে ঐরূপ বিদ্যা-মন্দির নাই তাহার অবস্থা তুলনা করিলে যথার্থ কথা সুন্দররূপে অনুভূত হইতে পারে।

কিন্তু এ বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া "সাধনা"-লেখককে এ অনুরোধ করা যাইতে পারে যে, তিনি নিজের মন হইতে ইংরেজি শিক্ষার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া বিচার করুন যে তাঁহার উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি সুপ্রযুক্ত হইয়াছে কি না। যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি ত ইংরেজি শিক্ষা নিষ্ফল, এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত, কিন্তু মাঘ মাসের "সাধনায়" ইংরেজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত আরও এক পৈঠা অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে শিক্ষার যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ততটা যে দেখা যায় না, বরং অনেকটা উল্টাই দেখা যায়, এ বিষয়ে যদি আমার সহিত কাহারও মতভেদ হয়, তাহা হইলে আগে থাকিতেই বলিয়া রাখি আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নয়।"

লেখকের পাঠকশ্রেণী হইতে নির্ব্বাসিত হইবার আশঙ্কা মাথায় করিয়াও এ কথা বলিতে হয় যে, "যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, ততটা যে দেখা যায় না" —ইহা সত্য। কিন্তু "অনেকটা উল্টাই দেখা যায়"—ইহা সত্য নহে। সুফল প্রত্যাশার সীমা থাকা অনুচিত—তথাপি উপস্থিত অবস্থায় কতটা সুফল হওয়া সম্ভব তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। কিন্তু "উল্টাই দেখা যায়"—এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে তাহা এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে আমাদের যে অবস্থা ছিল এখনকার অবস্থা

তদপেক্ষা মন্দ। পূর্ব্বে যে কি অবস্থা ছিল তাহার আভাষ অগ্রে দেখাইয়াছি। ইচ্ছা করিলে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সহজে পাওয়া যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনপত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এ পৃষ্ঠার পাদমূলে যে গ্রন্থের নাম লিখিত হইল তাহাতে বিষয়টী আরও পরিস্কাররূপ পাওয়া যাইবে। * এই সকল দলিলের সাক্ষ্য লইয়া বিচার করিলে লেখক কখনই আর কুফলের কথা কহিবেন না—কেবল ফলের ন্যূনতার মাত্র উল্লেখ করিবেন।

কুফলের একটা কথা শুনা যায় এই যে, বর্ত্তমান "শিক্ষিত" লোকেরা অল্প শিখিয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন। কিন্তু এ দোষ কি শিক্ষারই ঘাড়ে পড়িবে? এটা একটা প্রাচীন দোষ। উপনিষদে দেখা যায়ঃ—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতমন্যমানাঃ।
জঘন্যমন্যাঃ পরীয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ॥

প্রস্তাবিত দোষটি কি আমাদের জাতিগত দোষ নহে? যখন আমরা অজ্ঞতার অন্ধতামিস্রে নিমগ্ন ছিলাম তখনও কি হিন্দুরা ভাবিতেন না যে, আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে চির আবদ্ধ থাকিলে ও অপরের সহিত কোন ব্যবহার না রাখিলে এরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। কিন্তু এই দোষের নিরাকরণের পক্ষে কি ভূগোল বিবরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ার কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই?

আর একটী কুফল শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির অভাব। কিন্তু বোধ হয় এ কুফলটী শেষোক্ত লেখক লক্ষ্য করেন নাই—তাঁহার দৃষ্টি কেবল মানসিক জগতেই নিবদ্ধ।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর একটা ভাব মনে উদয় হয়—সন্দেহ উঠে যে লেখকগণ হয় ত অনেক সময় ভুলিয়া যান যে এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক—এটা ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড নয়। ইংলণ্ডের অবস্থা এ দেশের স্বাভাবিক অবস্থা নহে, যে অংশে আমাদের 'শিক্ষিত' যুবকগণ বিলাতের তুলনায় ন্যূন সেটা যে শিক্ষার দোষ—ইহা গায়ের জোরের কথা।

এখন কথাটা এইখানেই থাকুক।

আমাদের শিক্ষার উপর সাধারণতঃ যে অযথা দোষারোপ হইয়াছে ও তাহার গৌরব হানির যে চেষ্টা হইয়াছে—সেই বিষয়েরই এ প্রবন্ধে আলোচনা হইল। প্রস্তাবকর্ত্তাগণ যে বিশেষ বিশেষ দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ও শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার কামনায় তাঁহাদের কথার যে অংশ আলোচনা করিবার প্রয়োজন তাহা বারান্তরে বিবেচিত হইবে।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* The Life of Alexander Duff, D. D. L.L.D. by George Smith, C. I. E. L.D. vol 1. pp. 86—232.

যাহা হউক, সত্য সত্যই কি আমাদের শিক্ষা পানাপুকুরের পানার মত কেবল উপরি উপরি ভাসিতেছে? আর যদি তাহাই হয়, তবে সেটা শিক্ষার দোষ বা জাতিভেদে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেশের প্রকৃতি-গত দোষ?

এ বিষয়টা বিচারে অধ্যস্ত হইলে দেখিতে হয় যে, শিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ হাকিম ও আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষিত ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষার ফল জন-সাধারণে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে কি না। যদি এ প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলিতে হয় তাহা হইলে প্রস্তাবিত সমস্যার আপনা হইতে পূরণ হইয়া আইসে। যদি একজন চাষার ছেলে লাটসাহেবের মন্ত্রী সভায় আসন পান তাহা হইলে চাষার দলেও যে ইংরেজি শিক্ষার ফল পৌঁছায় নাই, এ কথা বলা যায় না। এইরূপে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই ঠিকটা চোখে পড়ে। তবে যে প্রকার দ্রুতগতিতে ইংরেজি শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছে দেশে জাতিবিভাগ থাকায় ও স্ত্রীশিক্ষার অভাবে শিক্ষার গভীরতা সে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই—ইহা সত্য। কিন্তু তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রসূত দেশীয় সাহিত্যের সাহায্যে ইংরেজি শিক্ষার ফল যে অলক্ষিতভাবে সাধারণ্যের নিকট উপস্থিত হইতেছে ও সরকারী পাঠশালায় যে এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছে—এটাও সত্য। আর একটা বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। মফঃসালে যেখানে যেখানে ইংরেজি কলেজ আছে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের সহিত যেখানে ঐরূপ বিদ্যা-মন্দির নাই তাহার অবস্থা তুলনা করিলে যথার্থ কথা সুন্দররূপে অনুভূত হইতে পারে।

কিন্তু এ বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া "সাধনা"-লেখককে এ অনুরোধ করা যাইতে পারে যে, তিনি নিজের মন হইতে ইংরেজি শিক্ষার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া বিচার করুন যে তাঁহার উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি সুপ্রযুক্ত হইয়াছে কি না। যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি ত ইংরেজি শিক্ষা নিষ্ফল, এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত, কিন্তু মাঘ মাসের "সাধনায়" ইংরেজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত আরও এক পৈঠা অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে শিক্ষার যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ততটা যে দেখা যায় না, বরং অনেকটা উল্টাই দেখা যায়, এ বিষয়ে যদি আমার সহিত কাহারও মতভেদ হয়, তাহা হইলে আগে থাকিতেই বলিয়া রাখি আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নয়।"

লেখকের পাঠকশ্রেণী হইতে নির্ব্বাসিত হইবার আশঙ্কা মাথায় করিয়াও এ কথা বলিতে হয় যে, "যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, ততটা যে দেখা যায় না" —ইহা সত্য। কিন্তু "অনেকটা উল্টাই দেখা যায়"—ইহা সত্য নহে। সুফল প্রত্যাশার সীমা থাকা অনুচিত—তথাপি উপস্থিত অবস্থায় কতটা সুফল হওয়া সম্ভব তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। কিন্তু "উল্টাই দেখা যায়"—এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে তাহা এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে আমাদের যে অবস্থা ছিল এখনকার অবস্থা

তদপেক্ষা মন্দ। পূর্ব্বে যে কি অবস্থা ছিল তাহার আভাষ অগ্রে দেখাইয়াছি। ইচ্ছা করিলে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সহজে পাওয়া যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনপত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এ পৃষ্ঠার পাদমূলে যে গ্রন্থের নাম লিখিত হইল তাহাতে বিষয়টী আরও পরিস্কাররূপ পাওয়া যাইবে। * এই সকল দলিলের সাক্ষ্য লইয়া বিচার করিলে লেখক কখনই আর কুফলের কথা কহিবেন না—কেবল ফলের ন্যূনতার মাত্র উল্লেখ করিবেন।

কুফলের একটা কথা শুনা যায় এই যে, বর্ত্তমান "শিক্ষিত" লোকেরা অল্প শিখিয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন। কিন্তু এ দোষ কি শিক্ষারই ঘাড়ে পড়িবে? এটা একটা প্রাচীন দোষ। উপনিষদে দেখা যায়ঃ—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতমন্যমানাঃ।
জঘন্যমন্যাঃ পরীয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ॥

প্রস্তাবিত দোষটি কি আমাদের জাতিগত দোষ নহে? যখন আমরা অজ্ঞতার অন্ধতামিস্রে নিমগ্ন ছিলাম তখনও কি হিন্দুরা ভাবিতেন না যে, আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে চির আবদ্ধ থাকিলে ও অপরের সহিত কোন ব্যবহার না রাখিলে এরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। কিন্তু এই দোষের নিরাকরণের পক্ষে কি ভূগোল বিবরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ার কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই?

আর একটী কুফল শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির অভাব। কিন্তু বোধ হয় এ কুফলটী শেষোক্ত লেখক লক্ষ্য করেন নাই—তাঁহার দৃষ্টি কেবল মানসিক জগতেই নিবদ্ধ।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর একটা ভাব মনে উদয় হয়—সন্দেহ উঠে যে লেখকগণ হয় ত অনেক সময় ভুলিয়া যান যে এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক—এটা ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড নয়। ইংলণ্ডের অবস্থা এ দেশের স্বাভাবিক অবস্থা নহে, যে অংশে আমাদের 'শিক্ষিত' যুবকগণ বিলাতের তুলনায় ন্যূন সেটা যে শিক্ষার দোষ—ইহা গায়ের জোরের কথা।

এখন কথাটা এইখানেই থাকুক।

আমাদের শিক্ষার উপর সাধারণতঃ যে অযথা দোষারোপ হইয়াছে ও তাহার গৌরব হানির যে চেষ্টা হইয়াছে—সেই বিষয়েরই এ প্রবন্ধে আলোচনা হইল। প্রস্তাবকর্ত্তাগণ যে বিশেষ বিশেষ দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ও শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার কামনায় তাঁহাদের কথার যে অংশ আলোচনা করিবার প্রয়োজন তাহা বারান্তরে বিবেচিত হইবে।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* The Life of Alexander Duff, D. D. LL.D. by George Smith, C. I. E. LL.D. vol 1. pp. 86—232.

কল্যাণী-মন্দির।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কি আশ্চর্য্য! কাল চন্দ্রপতির স্ত্রীকে কে হত্যা করিয়া গিয়াছে।"

"এই দুই দিন না যাইতে যাইতে আবার এই কাণ্ড? সে দিন ত সুখলালের স্ত্রীকে— একজন সৈনিক জোর করিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল—"

"ওহে—তাও জান না—তার তিন দিন পূর্ব্বে আবার আমাদের বৃদ্ধ মসরুকে কে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া গাছের ডালে বাঁধিয়া দিয়াছিল" তাইত—ভাই কেমন করিয়া আর স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশে থাকা হয়? এখানে জন্মিয়াছি এখানে মানুষ হইয়াছি—এখানে জমীজারাত করিয়াছি। এখন যাই কোথায় বল দেখি?"

উল্লিখিত ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে ৮।১০ জন লোক ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মুষ্টি দৃঢ় সম্বদ্ধ হইল, অনেকেই কোষস্থ তরবারিতে অন্যমনস্ক ভাবে হস্ত প্রদান করিল। কেহবা সম্মুখস্থ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিল।

যাহারা সেই মঙ্গলা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতে ছিল তাহাদের সকলেই পূর্ব্বতন "ভূমি আওয়ৎ" সুজন সিংহের প্রজা।

মঙ্গলা নদী ক্ষীণ স্রোতমালা হৃদয়ে ধরিয়া যশল্মীরের পাষাণ-বক্ষ প্লাবিত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অদূরে নূতন দুর্গাধিকারীর প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য দুর্গ ক্ষমতার বিজয় নিশান স্বরূপ স্কন্ধ তুলিয়া রহিয়াছে।

রাজপুতেরা—এক এক সামন্তের অধীনে প্রজা স্বরূপে বসবাস করিত। তখন ভূমির দখলী স্বত্বের সম্বন্ধে কোন একটা বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। জমীর উপর কোন সামন্তের নির্দ্ধারিত স্বত্ব ছিল না। যাঁহার লোকবল অধিক হইত—তিনিই বাহুবলে অপর সামন্তের জমী কাড়িয়া লইয়া পূর্ব্বাধিকারীকে তাড়াইয়া দিতেন।

এবারও তাই হইয়াছে—পূর্ব্বাধিকারী সামন্ত সুজন সিংহ—দুর্জ্জন সিংহ নামধারী এক রাঠোরের দ্বারা তাঁহার পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। যিনি কাল এই ক্ষুদ্র গ্রামের অধিপতি ছিলেন—আজ তিনি পথের ভিখারী হইয়াছেন।

দুর্জ্জন সিংহ—দুর্দ্দান্ত সামন্ত। তিনি এখনও প্রজা বশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দাম্ভিকতায় প্রজারা সকলেই অসন্তুষ্ট। আজ প্রাচীনেরাও বলিয়াছিল এমন

দুর্দ্দান্ত "ভূমি আওয়ৎ" তাহারা কখনও দেখে নাই। একে দুর্জ্জন সিংহের ভীষণ অত্যাচার—ও লুঠপাঠ তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল। দুর্জ্জন সিংহ প্রজার মুখের দিকে চাহিলেন না। কে কোথায় অনাহারে পড়িয়া রহিল—তাহা না দেখিয়া তিনি স্বীয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে ব্যস্ত।

প্রজারা দল বাঁধিয়া একদিন দুর্গদ্বারে দুঃখ জানাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্জ্জন সিংহ প্রহরীদের দুর্গদ্বার আবদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন সেই দিন হইতে বড় বড় "ভূমিয়ারা" বিদ্রোহীর মত হইল।

ইহার উপর আবার নূতনবিধ অত্যাচার। গৃহস্থ লোকে দুর্জ্জনের উদ্ধত সৈনিকদিগের ভয়ে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা ভার বোধ করিল। কাহারও ঘরে সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে—সৈনিকেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে; এ প্রকার ঘটনায় দুই এক স্থলে দুই একটা খুন জখম হইল, কথাটাও দুর্গাধিপতির কানে উঠিল। তিনি নিজের সৈনিকদের বিশেষ দোষের প্রমাণ পাইয়াও নির্দ্দোষীদিগকে কারাগারে দিলেন। প্রজারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার উপর আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ভূমিয়ারা মরে মরুক দুর্জ্জন তাহার সৈন্যদিগের জন্য চড়াদামে গ্রামের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া দুর্গ মধ্যে পুরিলেন। যাহারা শস্য বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল।

যতদিন ঘরে শস্য ছিল ততদিন প্রজারা দুইবেলা খাইয়া ছিল। ভাণ্ডারে টান পড়িলে একবেলা খাইল। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া দুইবেলা খাইত। নিম্ন শ্রেণীর লোকের তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা বনের শাক কচু তুলিয়া সিদ্ধ করিয়া খায়—কোন দিন বা নিরম্বু উপবাস করে, কোন দিন বা সবলে দুর্ব্বলের প্রস্তুত অন্ন কাড়িয়া খায়। কেহ বা অপরে খাইতেছে চাহিয়া দেখে—কেহ বা স্ত্রী পুত্রের কাঠোর ক্ষুধার যাতনায় আত্মহারা হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া বেড়ায় আর সকলেই নিষ্ঠুর দুর্গাধিপতিকে অভিশাপ প্রদান করে। একদিন এই বুভুক্ষু প্রজার দল ক্ষীণ শরীরভার কষ্টে বহন করিয়া দুর্গাধিপতিকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ—তাহাদের অনাহারের সংবাদ জানাইতে গিয়াছিল কিন্তু দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জন সিংহ স্বীয় ভৃত্যদিগকে কতকগুলা ভুক্ত পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন অস্পর্শীয় স্থলে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিলেন। বলিয়া দিলেন ক্ষুধিত কুকুর গুলাকে এই সুপাচ্য উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়া পুষ্ট লাভ করিতে দাও"। সে হতভাগ্যেরা সেই দিন হইতে প্রতিকারের ভার ঈশ্বরের উপর সমর্পণ করিল। ইহার উপর আবার নিত্যই খুন জখম। তাই কতকগুলা প্রজা একত্রিত হইয়া মঙ্গলা তীরে এত গোলযোগ আরম্ভ করিয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ দুর্ভিক্ষের সময় যোড়শ বর্ষীয় বালক কিরণ সিংহ তাহার পীড়িত মাতার জন্য বহু কষ্টে অল্প গোধূম সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একখানি রুটী প্রস্তুত করিয়া পীড়িতা বৃদ্ধা মাতার নিকট আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মা—দেখ আজ কি আনিয়াছি?

বৃদ্ধা বলিল "কি বাবা এ রুটীখানি কোথায় পাইলে? তুই আজ দুই দিন পেট ভরিয়া খাইতে পাস নাই। তুই ঐখানি খা।"

"না—মা, আমি খাইয়াছি এখানি তোমার। মা—তোমার যে একমাস রোগের পথ্য হয় নাই।"

বালক রুটীখানি চারিখণ্ড করিয়া—তাহার তিনভাগ মাতার জন্য রাখিল। একভাগ তাঁহাকে তখনই খাওয়াইল আর এক ভাগ লইয়া সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মা'কে বলিল "এভাগটী কার জান।"

"না—বাবা—কার বল দেখি।"

"কেন—মা, যে তোমাকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়া পোষণ করিয়াছে, যে তোমার এই ভীষণ রোগে এই ভীষণ মন্বন্তরের মাঝেও আহার দিয়া রাখিয়াছে—যাহার জন্য আজ আমি তোমার সেবা করিতে পারিতেছি এখানি তাহাকেই দিব।"

কুঞ্চিত কেশগুলি কাঁপাইতে কাঁপাইতে—দুই মুঠার ভিতর সেই টুকরা রুটিখানি লইয়া বালক প্রাঙ্গণের এক কোণে চলিয়া গেল। বিশ হাত দূরে এক ক্ষুদ্র কুটীরের আগড় ঠেলিবমাত্র তাহার মধ্য হইতে করুণ স্বরে কোন জীব ডাকিয়া উঠিল—"মা-ম্যা"—বালক বলিল "হাঁরে আমি কি তোর মা?" সেই বাক্‌হীন পশু যেন সে কথা বুঝিতে পারিয়া একবার আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বালক তাহার যুক্ত অঞ্জলি তাহার মুখের কাছে—ভূমির উপর মুক্ত করিয়া দিল। আর সেই, বন্যছাগী, মহানন্দে লাফাইতে লাফাইতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে একটু একটু করিয়া সেই রুটীর টুকরা শেষ করিল। বালক দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—"কল্যাণি আজ তবে তুই থাক। দেশে ঘাস নাই কুয়ায় জল নাই, তোকে জল খাওয়াইতে পারিলাম না এই বড় কষ্ট। কাল তুই আমায় একটু বেশী দুধ দিস্। মার জন্য রুটী রাখিয়াছি।" দুধ দেওয়াটা যেন তাহার কল্যাণির ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সবে আগড়টি বন্ধ করিয়া কিরণ সিংহ উঠানে নামিয়াছে এমন সময়ে বাহিরে অস্ত্র ঝনঝনা শুনা গেল—দ্বারের কাছে চার পাঁচ জনের পদধ্বনি হইল। দ্বারের উপর দমাদম্ ঘা পড়িতে লাগিল বাহির হইতে একজন পরুষ কণ্ঠে বলিল—"কিরণ সিংহ দোয়ার খোল—"

কিরণ একটু ভয় পাইয়াছিল। ভাবিল—এরা একবারে আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিতে চায় কেন? কিরণ ধীরে ধীরে বলিল "দ্বার খুলিতেছি থামকা—দ্বারটা যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, কে হে তোমরা?

"তোমার যম—খোল শীঘ্র দ্বার খোল"—আবার দমাদম ঘা পড়িতে লাগিল।

যুবক কিরণ সিংহ দ্বার খুলিয়া দিবা মাত্রই একজন লোক কঠোর ভাবে বলিল কই কে তোমার কিরণ সিংহ দেখাইয়া দাও।"

কিরণ দেখিল তাহাদের সকলেই দুর্গাধিপতির লোক। কেবল একজন তাহার প্রতিবাসী। সেই দেখাইয়া দিল এই সেই নর পিশাচ কিরণ সিংহ।

একজন রক্ষী পরুষ স্বরে বলিল "কিরণ তুমি আমার বন্দী"

বন্দী—"কেন আমি কি করিয়াছি? কি অপরাধে আমি বন্দী?"

"তোমার নিকট আমরা তাহার জবাবদিহি করিতে চাই না। দুর্গাধিপতির আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তুমি রাজ-বিদ্রোহী হইয়াছ। বিদ্রোহের দণ্ড তোমার জীবন নাশ। দুর্গাধিপতির নিকট তোমার বিচার হইবে।"

অপরাধটা কি—কিরণ কিছু জানিতে পারিল না। অথচ বিষয়টা গুরুতর। দুষ্কর্ম্ম বলিয়া কোন একটা পদার্থ এই পৃথিবীতে সে জানিত না। কিশোর বয়সে "বিদ্রোহ" কথাটা তাহার অভিধানের বহিতে শব্দ ছিল। সে মনে মনে ভাবিল ইহারা আমায় ভ্রম ক্রমে ধরিয়াছে। দুর্গাধিপতির সাম্‌নে সে তাহাদের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিবে। আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে নীরস হাস্যের সহিত প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু একবার আমার মাকে দুটা কথা বলিয়া আসিতে দাও—"আর তোর মাকে কোন কথা বলিতে হইবে না" এই কথা বলিয়া তাহারা ধাক্কা দিয়া তাহাকে দুর্গের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিদিন প্রভাতে—দুর্গাধিপতি দুর্জ্জয় সিংহ বিচারাসনে উপবিষ্ট। দলে দলে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ভূমিয়ারা দুর্গাধিপতির বিচার দেখিতে আসিয়াছে। অপরাধও বিচিত্র, অপরাধীও বিচিত্র—বিচারটা কি হয় দেখিবার জন্য অনেকেই সেই প্রস্তর-প্রাকার বেষ্টিত দুর্গের দালানে আসিয়া জমিয়াছে।

দুর্গাধিপতির সম্মুখে কিরণ সিংহ বন্দী ভাবে দণ্ডায়মান। দুর্গের বাহিরে বধমঞ্চের উচ্চ শিখর উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সে একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতেই তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে নিজের জন্য তত চিন্তিত নহে। সে মরিলে তাহার মার কি হইবে তাই ভাবিয়া সে আকুল। দুর্গাধিপতি—সভার নিস্তব্ধ ভাব প্রথমেই ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"বালক! তোমার নাম কিরণ সিংহ?"

"হাঁ—মহারাজ।"

"তোমার অপরাধ কি জান?"

"আগে জানিতাম্ না—কাল শুনিয়াছি।"

"তুমি আমার ঘোষণা অমান্য করিয়াছ: রাজাদেশ লঙ্ঘনে বিদ্রোহ—বিদ্রোহীর পরিণাম প্রাণদণ্ড; তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

"আমি তাহাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু—"

"আমার মা"—বালক আর বলিতে পারিল না তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

দুর্গাধিপতি বলিলেন—"তোমার মা'র কি হইয়াছে" "আমার মা পীড়িতা—এক মাস ধরিয়া রোগে শোকে দুর্দ্দশায় অনাহারে জর্জ্জরিতা তাঁহাকে কে দেখিবে!"

"কিন্তু তাহা বলিয়া তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইতে পারে না। তুমি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ। যে রুটি মানুষে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে যাহার মুখ আমি নিজে অনেক সময় দেখিতে পাই না, তাহা তুমি কি না—একটা সামান্য ছাগীকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইলে?"

বালক—রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"দুর্গাধিপতি সেই ছাগী দুগ্ধ দিয়া এ পর্য্যন্ত আমার মাতার রুগ্ন জীবন রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। সে না থাকিলে এই অনাহারে আমার মা এতদিনে মরিয়া যাইতেন। দেশ জ্বলিয়া গিয়াছে; মাঠে ঘাস নাই, জলাশয়ে জল নাই—সে ঘাস জল না খাইয়াও আমার মাকে দুধ যোগাইয়াছে—আমি মাতৃসেবার প্রধান সহায় ভাবিয়া তাহাকে একখণ্ড রুটী দিয়াছি, তাহা কি রাজ বিদ্রোহিতা!"

"বালক! আমি পাষাণ নহি। সদ্‌গুণের আদর করিতে আমি জানি, কিন্তু আমার আদেশের একটুও এদিক ওদিক করিতে জানি না। আমার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড—"

কথাটা শেষ হইল না। দুর্গ দ্বারে একটা ভয়ানক কোলাহল জাগিয়া উঠিল। ভিড় ঠেলিয়া জন কতক লোক প্রবেশ করিয়া ধরাধরি করিয়া কি একটা রক্তাক্ত জিনিস সেই সভার মাঝখানে দমাস্ করিয়া ফেলিয়া দিল। সকলে সভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল একটী ছিন্নশির বৃহদাকার বন্য ছাগী। কেহ তাহার কিছু অর্থ বুঝিল না—কিন্তু কিরণ সিংহ তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সহসা একবার চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল নীরবে তাহার নেত্র দিয়া দরদর ধারা বহিতে লাগিল।

দুর্গাধিপতি বুঝিলেন কিরণ সিংহেরি ছাগী নিহত। তিনি রহস্য করিয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছেন—এই সময় বাহিরে ভীষণতর একটা কোলাহল উঠিল। সেই কোলাহলের মধ্যে "জয় দুর্জ্জন সিংহ কি জয়" এই কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুর্গাধিপতি চমকিয়া উঠিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া বাতায়ন পথে দাঁড়াইলেন—দেখিলেন সুজন সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সেনাদল দুর্গে প্রবেশ করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুজন সিংহের অল্প সৈন্য মাত্র দুর্গ প্রবেশ করিয়াছে, এই সময় দুর্জ্জন সিংহ দুর্গের জল প্রণালী উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বাহিরের সৈন্যাগম বন্ধ করিয়া দিলেন, সুজন সিংহ অসমসাহসে ভর করিয়া সসৈন্যে সন্তরণ দিয়া দুর্গ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তীর হইতে অসংখ্য সৈন্য তাঁহাদিগের উপর অস্ত্র চালাইতেছে তাঁহার বহু সৈন্য আহত বহু সৈন্য মৃত; তিনিও আর বুঝি জল হইতে জীবিত উঠিতে পারেন না, সহসা উন্মত্ত ভাবে অসি সঞ্চালন করিতে করিতে এক বালক-যুবা বজ্র অনুজ্ঞায় কহিল "নাম তোরা নাম নহিলে এখনি মৃত্যু" সৈন্যগণের মধ্যে একটা আতঙ্ক পড়িয়া গেল, তাহারা কেহ মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া সহসা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল কেহ বা পলায়নপর হইল। অবসর পাইয়া সুজন সিংহ তীরে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার জীবিত সৈন্য সকলেই উপরে উঠিয়া দুর্জ্জন সিংহের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল, সুজন সিংহ দুর্জ্জন সিংহের অন্বেষণে ধাবিত হইলেন,—কিরণ সিংহ অস্ত্র চালাইতে চালাইতে তাহার সহগামী হইয়া ভীমস্বরে বলিল—"তোরা ক্ষুধাতুর তোরা জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত প্রজাদল সুজন সিংহের জয়, দুর্জ্জনের মৃত্যু" সুজনের পুরাতন প্রজারা আনন্দে হুঙ্কার করিল "জয় সুজন সিংহের জয়" দেখিতে দেখিতে দুর্জ্জনের সমস্ত সেনা সুজনের পক্ষ গ্রহণ করিল দুর্জ্জন পরাজিত হইলেন কিরণ সিংহের সাহায্যে দুর্গ পুনরায় সুজনের অধিকার গত হইল।

উপসংহার।

কিরণ সিংহের সহিত সুজন সিংহের একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইল। কিন্তু এ উৎসব দিনে তাহার সুখ যেন সম্পূর্ণ হইল না, তাহার সেই মৃত ছাগীর শোক সে এখনও ভুলে নাই। বিবাহের পূর্ব্বাহ্নে তাহার ইচ্ছা ক্রমে সেই ছাগীর মৃত দেহ মহা সমারোহে ভূমি প্রোথিত হইল। পরে সুজন সিংহের মৃত্যুর পর দুর্গাধিপতি হইয়া কিরণ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া "কল্যাণীর" সমাধির উপর এক বিস্তৃত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল। মধ্যে এক প্রস্তরময় বেদীর উপর এক প্রস্তরময়ী ছাগী মূর্ত্তি। কিরণ এই মন্দিরের নাম রাখিয়াছিল "কল্যাণী মন্দির।"

"কল্যাণী মন্দিরের" সংশ্রবে ইতর প্রাণীদের জন্য এক পশুশালা নির্ম্মিত হইল। যত ব্যথিত পীড়িত, জীর্ণ শীর্ণ পথপরিত্যক্ত মূক চতুষ্পদ জন্তু সব কিরণ সিংহের পশু শালায় আসিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিল। তাহাদের আহারের জন্য প্রত্যেক দিন একখানি রুটির বন্দোবস্ত হইল। সে আজ কতদিনের কথা কিন্তু এখনও যশল্মীরের প্রান্তবর্ত্তী মঙ্গলা নদী তীরে ভ্রমণ করিতে গেলে কিরণ সিংহের ভগ্নাবশেষ "কল্যাণী মন্দির" ভ্রমণ কারীর নেত্র পথে পতিত হয়।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বৈশাখের ভারতীর ভ্রমসংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১১	শত	সাত
,,	২৬	স্কভ	স্ত্রুভ্ (Struve)
১৫	১৫	(দাঁড়ির পর 'কঠিন' শব্দ বসিবে।)	
১৮	২২	তাহাদিগের	গ্রহদিগের
৩৩	৯	Father Adam	Fallen Adam

সাত বৎসরে সখিসমিতি।

এই বৈশাখে সখিসমিতির সাত বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল! এই সাত বৎসরে ইহার উদ্দেশ্য কত দূর সাধিত হইয়াছে দেখা যাউক!

সখিসমিতির এক উদ্দেশ্য,—সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন। এ বিষয়ে সমিতি কিরূপ উপকার সাধিত করিয়াছে, তাহা এখনকার বর্দ্ধিতায়তন সখী সংখ্যা, কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সখী নহেন এমন কত মহিলা সমিতির শুভকল্পে ব্রতী,—বাৎসরিক শিল্পমেলায় একত্র মিলিত হইবার জন্য কত মহিলা ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে সেই মিলন উৎসবের দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এই সকল নিদর্শন হইতে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা দিনে, ১২৯৩ সালের এক বৈশাখী অপরাহ্নে সাত জন মহিলা মাত্র উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে দেশহিতকর ব্রত পালনে সঙ্কল্পী হইয়া পরস্পর সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আজ সখিদিগের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। সাত বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় সখিগণের অধিকাংশের মধ্যে আলাপ পরিচয়ই ছিল না, কাহারো কাহারো বা মৌখিক আলাপ ছিল মাত্র; কিন্তু সমিতির প্রসাদে তাঁহাদের অনেকেই এখন এক পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ স্বজনতুল্য। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনেকে ইহার দাতব্য কার্য্যের সহায়ক হইয়া ইহার সহিত সদ্ভাবসূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন। এইরূপে সখিসমিতি সাধারণ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে সদ্ভাব বৃদ্ধি করিবারও উপায় স্বরূপ হইয়াছে। এবং এই সূত্রে কেবল বঙ্গমহিলাগণ নহেন ভারতীয় এবং বিদেশীয় মহৎ হৃদয় অনেক নরনারীই সমিতির ধন্যবাদার্হ। ইহাছাড়া প্রতি বৎসর সমিতির শিল্পমেলায় কত সম্ভ্রান্ত মহিলার সমাগম হয়; এই মিলনে কত অপরিচিত মহিলাদিগের মধ্যে পরিচয় হইয়াছে, কত বিদ্বেষ অবসিত হইয়াছে; কত মহিলার সদনুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মিয়াছে। বঙ্গমহিলাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরোপকার কার্য্যে, দেশহিতকর কার্য্যে এরূপ একনিষ্ঠ অনুরাগ দেখাইতে পারেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা কল্পনা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সখিসমিতির সাত বৎসর স্থায়ীত্বে তাহা এখন প্রকৃত প্রত্যক্ষ ঘটনা!

সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কি—না, কোন সঙ্গতিহীনা বিধবা বা কুমারীকে তাহার অভিভাবক সখিসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠানে ব্রতী করিতে ইচ্ছুক হইলে সমিতি তাহাকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রদান করিবে; অন্ততঃ অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিবে।

যদিও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আমাদের আশা ও ইচ্ছানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই

তথাপি এই কয়বৎসরে সমিতি এই কল্পে দেশের যতটুকু উপকার সাধিত করিয়াছে, তাহা এই সামান্য সমিতির পক্ষে সামান্য কার্য্য নহে। চারিজন বিধবাকে সমিতি নিয়মিত মাসিক অর্থ সাহায্য করে। দুর্ভিক্ষের সময়, জলপ্লাবনের সময়, অথবা এইরূপ অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনা উপলক্ষে এবং উপযুক্ত ভিক্ষার পাত্র অর্থ ভিক্ষা চাহিলে সমিতি অনিয়মিতরূপে সাধ্যমত দান করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই কয়বৎসরে ছয়টি বালিকাকে সমিতি আশ্রয় দান, শিক্ষা দান করিয়াছে। একটি শিক্ষা সমাপন করিয়া এখন বেথুনস্কুলের শিষ্যয়িত্রীপদ লাভ করিয়াছে। সমিতির অর্থাভাব বশত বেতন এবং গাড়ীঘোড়া প্রভৃতির ব্যয় ভার সঙ্কুলান করিয়া তাহাকে অন্তঃপুর শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায় নাই। একটি বালিকাকে এই বৎসর হইতে সমিতির সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আর চারিটি বালিকা এখনো সমিতির আশ্রয়ে আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সমিতির মূলধন অধিক শুধে খাটান হইত; সেই জন্য শুধে এবং সখীদিগে মাসিক চাঁদায় ছয়টি বালিকার ব্যয় ভার সঙ্কুলান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি কোন কর্জ্জ দেওয়াস্থলে হাজার টাকা লোকসান হওয়ায় সম্পাদিকাকে সে টাকা নিজে হইতে পূরণ করিয়া দিতে হয়; সেই হইতে সমিতির সমস্ত মূলধন পোর্টট্রাষ্টে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সাড়ে আট হাজার টাকার পোর্টট্রাষ্টের মাসিক শুধ ৩৫শের অধিক নহে; আর সখিদিগের নিকট হইতে মাসিক চাঁদাও আন্দাজ ৩৫ মাত্র উঠিয়া থাকে। কিন্তু এক একটি বালিকার খরচ মাসে প্রায় পনের, তাহা ছাড়া সমিতির পূর্ব্বোক্ত দানাদি এবং পুস্তকাদি ছাপা খরচ এবং চাঁদা আদায়ক ও হিসাব লেখকের মাহিয়ানাদিতে সমিতির ৭০ টাকার অনেক অধিক খরচ পড়ে। এই জন্য সমিতি একটি বালিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে; এবং অর্থাভাবে আরো দু একটির শিক্ষা বন্ধ করিতে হইত। ইহা দেখিয়া, সমিতির একজন সখী, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ফেব্রুয়ারি মাস হইতে নিজে দুইটী বালিকার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই জুলাই মাস হইতে আরো একটী বালিকাকে তিনি নিজ আশ্রয়ে রাখিবেন। হিরণ্ময়ী দেবীর এই সহায়তার জন্য তিনি সমিতির বিশেষ ধন্যবাদভাজন। তিনি নিজে উহাদের ভরণপোষণ ব্যয় না দিলে উহাদিগকে আশ্রয় প্রদান সমিতির দুঃসাধ্য হইত। তাঁহার এইরূপ অর্থানুকূল্যে, বালিকা-দিগের শিক্ষাব্যয় লাঘব হওয়াতে সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনেরও সহায়তা হইতেছে। অন্তঃপুর-শিক্ষাকার্য্যে সমিতি এখন কথঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য কি ?—সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায় সমিতি সাত বৎসর ধরিয়া কয়েকজন বালিকাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যখন এক জন শিক্ষিত হইয়া এ কার্য্যের উপযুক্ত হইল তখন

উপযুক্ত অর্থাভাবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা গেল না। কিন্তু নূতন বৎসরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের বহুদিনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।—সখিসমিতির শিক্ষিতা বালিকা নহে, সমিতির এক জন হিতৈষিণী সখী নিজে এই পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি গান বাজনা শেলাই লেখা পড়া সকলি শিখাইতে পারেন। নিজে ইনি এল্, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। কোন বালিকাকে অন্তঃপুর শিক্ষায় প্রবৃত্ত করিতে হইলে তাহাকে বেতন দিতে হইত; কিন্তু এখন অন্তঃপুর হইতে যে বেতন পাওয়া যাইবে, তাহাতে গাড়ী ভাড়া দিয়া যদি কিছু উৎবৃত্ত থাকে তাহাও সমিতিতে যাইবে। আর যদি গাড়ী ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হয় তাহাও সমিতি দিতে সক্ষম; কেন না কয়েকটি বালিকার ব্যয় ভার এখন কমিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি অন্তঃপুরের ছাত্রী হইয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যা আরো অধিক হইলে তখন উক্ত সখীর অধীনে পালিতাগণও ক্রমে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে; তাহারা কেহ কেহ অল্প-দিনেই এই কার্য্যের উপযোগী হইবে; এইরূপ আশা করা যাইতেছে। উক্ত সদাশয়া সখী দুইজনের এই নিঃস্বার্থ উদারতার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং সমিতির যে সকল শুভাকাজ্ক্ষী দান দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে সমিতির উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই-তেছে। যে করুণাময় জগদীশ্বর এই সমান্য নারিগণের দ্বারা তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছেন; তাঁহার প্রসাদে সমিতির উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হউক; কায়মনে এই প্রার্থনা করিয়া আমরা নবীনবলে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

ফুলের মালা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বংশীহারী পুরের এক প্রান্তে বনস্থলীর উচ্চ মুক্তীকৃত প্রদেশে রাজা গণেশদেবের শিবির। শিবিরের নিম্নদিকে অদূরে এক নাতি বৃহৎ স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী। জনপ্রবাদ, কোন অলৌকিক দৈববলে এই দীর্ঘিকার উৎপত্তি। বাদসাহের সহিত গণেশদেবের যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে নাকি উক্ত ভূখণ্ড শুষ্ক বন্য ভূমিতল মাত্র ছিল। গণেশদেব রাজ-বিদ্রোহী হইলে পর আজিম খাঁ কর্ত্তৃক তাড়িত অনুসরিত হইয়াও সৈন্যস্বল্পতা বশত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া যে সময় পলায়নপর হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সৈন্য সামন্তগণ দুই দিন অনাহার অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত চলিয়া অবশেষে এই বনপ্রদেশে আসিয়া পড়ে। তখন গ্রীষ্মকাল; শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন, এক অঞ্জলি করিয়া জলপান করিতে পারিলেও তখন তাহাদের প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু বনের কোথাও জলের চিহ্নমাত্র

নাই; সৈনিকেরা জলান্বেষণে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিতেছে; নিজে গণেশদেব অনেক খুঁজিয়া কোথাও জল পাইলেন না; এদিকে শত্রু আগতপ্রায়। এখান হইতে চলিয়া যাইতে না পারিলে প্রাণ সংশয়, কিন্তু সৈন্যগণ একপদ অগ্রসর হইতেও আর অসমর্থ। গণেশদেব হতাশচিত্তে শত্রু-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবার অপেক্ষা করিতেছেন; এমন সময় সন্ন্যাসিনী আহার্য্য দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গত কল্য সন্ধ্যাবেলা খাদ্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া জলাভাবে সৈন্যদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিয়দ্দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দেখিয়াছ?" গণেশদেব বলিলেন "কোথাও আর দেখিতে বাকি নাই।" সন্ন্যাসিনী বলিলেন "তবুও আর একবার দেখা যাউক।" সন্ন্যাসিনীর অনুগামী হইয়া কিছুদূর না আসিতে আসিতে তাঁহাদের তৃষিত নেত্রের সম্মুখে বৃক্ষাবলীপ্রচ্ছন্ন তরলবারি ঢল ঢল করিয়া উঠিল; গণেশদেব এবং সৈন্যগণ আহ্লাদে আনন্দ ধ্বনি করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সন্ন্যাসিনীর চরণ ধূলি গ্রহণ করিলেন। সেই আনন্দ চীৎকার অবসন্ন শ্রান্ত সৈনিকদিগের কর্ণে পৌঁছিবামাত্র তাহারা আশার বলে বলীয়ান হইয়া দলে দলে এই বাপী তটে আসিয়া সন্ন্যাসিনীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ প্রাণ ভরিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। ইহা দ্বারা আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল; সেই জলপানে তাহারা যেন অমৃত পানের বল লাভ করিয়া উঠিল। ইহার অল্পক্ষণ পরে শত্রুসৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহারা অল্প সংখ্যক হইয়াও অমিতবলে সেই প্রচুর বিপক্ষ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন মর্দ্দিত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে এই দীর্ঘিকার নাম মিলনদীঘি; কেননা ইহারি প্রসাদে সসৈন্যে গণেশদেবের সে দিন জীবন মিলিয়াছিল।

এই পুষ্করিণীর শুভঙ্করী শক্তির প্রতি সেই দিন হইতে ইহাদের সকলেরি প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই আজ ইহার তীরবর্ত্তী বনপ্রদেশে রাজশিবির স্থাপিত। দ্বিপ্রহরের বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু আকাশ এখনো মেঘাচ্ছন্ন। শরতের অপরাহ্ণ আজ অস্তমান-সূর্য্যের কনক মাধুরী হারা। স্নিগ্ধ বৃক্ষ পত্র হইতে এখনো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। চঞ্চল স্নিগ্ধ বায়ুসঞ্চালনে দীর্ঘিকাবক্ষ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। ভেকেরা তটগহ্বরে লুকাইয়া আনন্দ রব করিতেছে; বনমধ্যে ঝিঁঝিঁর অবিশ্রান্ত সমতান উত্থিত হইয়া চারিদিকে প্রদোষ-গাম্ভীর্য্য ব্যাপ্ত করিয়াছে। শিবিররক্ষক সশস্ত্র সঙ্গীনধারী সবলকায় কোচ ও ভোজপুরী প্রহরীগণের সমকালবিক্ষিপ্ত পদশব্দ সেই গাম্ভীর্য্যের তাললয় রক্ষা করিতেছে।

দীর্ঘিকার প্রস্তর বাঁধান উপকূলে তিন চারি জন রাজভৃত্য উপবিষ্ট। ইহারা সৈনিক নহে, কিন্তু ইহাদের বেশ ভূষা অনেকটা সিপাহীদিগেরই মত। এই যুদ্ধ বিদ্রোহের সময় শিবিরের বাহির হইতে হইলেই সকলকে সসজ্জ সশস্ত্র হইয়া নির্গত হইতে হয়। তবে সৈনিকদের ন্যায় নানারূপ অস্ত্র শস্ত্রে ইহারা সুসজ্জিত নহে। ইহাদের কটিবন্ধে একখানি

করিয়া খড়্গ এবং হাতে কাহারো বা হাতের কাছে একটা করিয়া শড়কি মাত্র। পাঠক মনে রাখিবেন,—তখনকার বাঙ্গালী এখনকার বাঙ্গালী নহে। যুদ্ধ ব্যাপারটা তখনকার বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে কেবল পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির মত ছিল না, তখন তাহাদিগকে সত্য সত্য যুদ্ধ করিতে হইত; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পরিচারকদিগের সিপাহী সাজ অশোভন হয় নাই, কেবল একজনের অঙ্গ ছাড়া। ইনি আমাদিগের পরিচিতা রঙ্গিণী সুন্দরীর স্বামী, ওরফে নবীন অধিকারীর যাত্রার দলের খ্যাতনামা একজন নেতা, রাজসভা-কবি বলিলেও বলিতে পারা যায়, রাজা ইঁহার গানের বিশেষ পক্ষপাতী। সুতরাং নবীন অধিকারীর মানের সীমা নাই, তাঁহার মানভঞ্জনের পালা দিনাজপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে। ইঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ; চারিটি বিবাহ। পিতামাতা তিন বিবাহ দিয়াছেন, আর মামাতভাইয়ের সম্বন্ধ করিতে গিয়া নিজে সখ করিয়া এক বিবাহ করিয়াছেন। শেষের বধূটিই আমাদের রঙ্গিণী দেবী, এইরূপ অতিরিক্ত সৌভাগ্যবলে যাত্রা এবং সঙ্গে সঙ্গে চারি রত্নের অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণের জীবনটা সুখের মানভঞ্জনের পালাতেই কেবল কাটিতেছিল, ইতিমধ্যে হরিষে বিষাদ উপস্থিত! শান্তির রাজ্যে সহসা অশান্তি বিভ্রাট! নারীপুঞ্জ এবং প্রণয়কুঞ্জের স্থলে সহসা ধূম্রলোচনের আবির্ভাব! তাহা হইতে পলাইবারও যো নাই! রাণী রাজার সঙ্গ লইলেন রঙ্গিণী সুন্দরী ও রাণীকে ছাড়িয়া থাকিবেন না ব্রাহ্মণ কি করেন? তাঁহাকেও অগত্যা গানের ধূয়া ছাড়িয়া আগুনের ধূঁয়া সার করিতে হইয়াছে। শিবিরে তাঁহাকে রসুই করিতে হয়। সসজ্জ হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণ বড় একটা শিবিরের বাহির হন না। পোষাক পরা যে নিতান্তই তাঁহার অভ্যাসের বাহিরে তাহা যদিও নহে; বনবাসের পালাতে হনুমান সাজিবার সময় তাঁহাকে তদানীন্তন প্রহরীবেশই ধরিতে হইত, বাড়ার ভাগ পোষাকের উপর একটি লেজ থাকিত। এখন "সেই সব সেই সব, শুধু হাহাকার রব—" পোষাক সমস্ত সেই, কেবল লাঙ্গুল নাই; তাই পোষাক পরিতে ব্রাহ্মণের মন ওঠে না। যাহা হউক আজ দিনটা মেঘলা, বিরহ-টপ্পাগুলো কণ্ঠাগত হইয়া বহির্নির্গত হইবার জন্য ছটফট করিতেছে, কাজেই অগত্যা বেলাঙ্গুলে পোষাক পরিয়াই তাঁহাকে সারঙ্গটা হাতে করিয়া পুকুরের ধারে আসিয়া বসিতে হইয়াছে। পাঠক বোধ হয় জানেন পর্ত্তুগিজরা এদেশে আসিবার আগে যাত্রায় বেহালার চলন ছিল না। এখানে আসিয়া মাথার বোঝাটা তিনি আগে ভাগে নীচে নামাইয়াছেন, পোষাকের উপর টিকিওয়ালা মুণ্ডিত মস্তকটি গানের তালে তালে নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সারঙ্গের সুরে সুরে গান ধরিয়াছেন—

সখী নব শ্রাবণ মাস—
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা—
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ—

কিন্তু আজ গান গাহিয়া তেমন সুখবোধ হইতেছে না। একে সমজদারের অভাব, তাহার উপর পাশের সঙ্গীগণ কাণের গোড়ায় অনবরত বিড় বিড় করিতেছে। কেবল তাহাতেই রক্ষা নাই, মাঝে হইতে একজন তাহার গা ঠেলিয়া প্রশ্ন করিয়া বলিল—"তুমি কি বল ঠাকুর!" ঠাকুর তখন অন্তরা, একবার শেষ করিয়া আর একবার তাহাতে তান জমাইতেছেন—সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বেজায় চটিয়া বলিলেন—"আমি আর বল্ব কি, সম্বৎসর যেন বর্ষাটা তোদের প্রবাসে কাটে! বদরসিক; তোদের কি একটু রসজ্ঞান নেই? আমাকে যদি আর বিরক্ত কর্‌বি ত আমি কিন্তু এখানে আর এক তিল থাক্‌বো না।" শ্রীকান্ত পরামাণিক বলিল—"মুনসি মশায়; ঠাকুর কেমন গাচ্ছে শোন না; ওঁকে কেন বিরক্ত কর! গাও ঠাকুর! এত দিন প্রবাসে পড়ে আছি, বিরহে হাড় জ্বরে গেল; তুমি গাও ঠাকুর প্রাণটা তবু ঠাণ্ডা হোক—"

ঠাকুর আবার ধরিলেন—

ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম—
মুহুর্মুহু দামিনী বিকাশ—
আমার বঁধুয়া পরবাস—

পরামাণিক বলিল—"বাহবা ঠাকুর বাহবা; কি বল্‌বো পেলা কিছু হাতে নেই—" ঠাকুর আনন্দে গাহিয়া চলিলেন—মুন্সি পরামাণিক বলিল "তাপর তুই কি স্বপ্ন দেখেছিলি?" পরামাণিক বলিল—"যেন আকাশের দক্ষিণ দিক লালে লাল হয়ে গেছে!"

শ্যামসর্দ্দার—আর তার থেকে রক্ত উছলে মাটি ভেসে যাচ্ছে—কেমন?

পরামাণিক। সে কেমন রক্ত? রক্ততে চারিদিক সমুদ্র বইছে, তার মধ্যে তুফানের মত ঢেউ উঠছে, ঢেউগুলো সব মানুষ, ওমা; হঠাৎ দেখি, আমিও একটা ঢেউ; যেমনি দেখা, অমনি অঝ্‌ঝর ঝরে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেম, এমন সময়, সেই রক্তনদে কমলাসনা ভগবতী মূর্ত্তি আবির্ভাব হয়ে বল্লেন—"মাভৈঃ! মাভৈঃ! বেটা" অমনি স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

সকলে। তাই ত বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন, মূর্ত্তি কার মতন মনে হোল?

পরা। যেন সন্ন্যাসিনীর মতন!

মুনসি। তাই হবে। তিনিই একবার আমাদের বাঁচিয়েছেন; আর তাঁর প্রসাদে এ যুদ্ধে আমরাই জয়ী হব, এ স্বপ্ন শুভ।

সর্দ্দার। তাই বল; মুসলমানের দর্পচূর্ণ হোক, কিন্তু বাদসার সঙ্গে ঝগড়া বড় সহজ কথা নয়!

পরা। কেন আমাদের রাজা বাদসার চেয়ে কম কিসে?

মুনসি। বিশেষ ভগবতী সন্ন্যাসিনী যখন আমাদের সহায়—

সর্দ্দার। তবে এতদিন হোল, ঘরসংসার সব ডুব্‌লো, স্ত্রীপুত্রের যে কি দশা হয়েছে,

কিছুই বলা যায় না, প্রাণ আর বাঁধ্‌ছে না। আচ্ছা ভাই মহারাণীর সন্ন্যাসিনীর উপর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিনে কেন? তিনি মায়ের নামে জ্বলে উঠেন—বলেন, "ওই ত যুদ্ধ বাধালে,—ভণ্ডতপস্বিনী! রাজাকে ও না ছাড়্‌লে রাজার মঙ্গল নেই!"

মুনসি। মহারাণীর বিশ্বাস বাদসার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লে একদিন রাজ্যনাশ প্রাণনাশ হবেই। যুদ্ধ ছেড়ে তিনি তাই মাপ চাইতে বলেন।

সর্দ্দার। কথাটা কিন্তু ঠিক বটে! এখন সন্ধিটা হয়ে গেলে হয়।

পরা। মোলো যা! কথাঠা ঠিক হোল! মহারাজ যদি একবার বাদসার কাছে নীচু হন তাহলেই বাদসার লেজ ফুলে এমন কলাগাছ হবে, যে তখন হাজার তেল মল্লেও নিস্তার পাওয়া যাবে না! বাবা, দেশকে দেশ কলমা পড়াবে তবে ছাড়্‌বে। আর এই ধাক্কায় যদি আমাদের রাজা বাদসা হ'তে পারেন—তাহলে আবার রামরাজ্য,—দেশে ক্লোন অত্যাচার থাকৃবে না; কি সুখের দিন হবে বলদেখি?

সর্দ্দার। তা বটে, তা ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক, স্বপ্নটার অর্থ কি! ঠাকুর ঠাকুর—বলি স্বপ্নটা ত শুন্‌লে! বলদেখি আমাদের রাজা বাদসা হবে কি না?

ঠাকুর তাহার ঠেলায় পড়িতে পড়িতে মাটীতে বাঁহাতের ভর দিয়া বিস্ফারিত নেত্রে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আমি চল্লেম, আমার আর এখানে পোষাল না।" ঠাকুর সারঙ্গটা হাতে লইয়া উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিলেন, সর্দ্দার বলিল—"ঠাকুর যেয়ো না,—স্বপ্নের মানেটা বলে যাও।"

পরামাণিক ডাকিল—"সড়্‌কি গাছটা ফেলে গেলে ঠাকুর; যাবে যাও ওটা নিয়ে যাও।"

মুনসি বলিল,—"ঠাকুর পাগড়িটা পড়ে রইল যে, কেউ যদি মাথাটা লক্ষ্য করে ত আর আটকাতে পারবে?" ঠাকুর কাহারও কথা না শুনিয়া গোঁ হইয়া চলিয়া গেলেন। কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, তাহাদের আর দেখা যাইতেছে না, তিনি তখন একটা দ্বিমুখী বৃক্ষের দুই শাখার মধ্যে বসিয়া আপন মনে সারঙ্গ বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

সখি নব শ্রাবণ মাস!
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা,
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!
ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী আভাষ!
পবন বহে শীতি, তুহিন কণাভাতি—
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস!

উছলে সরোবর, পত্র মরমর—
কম্পে থর থর পান্থনিরাশ!
যুবতী যুবাজনা, পরম প্রীতমনা,
দুঁহু দোঁহে বাঁধা ভুজপাশ!
বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলল উল্লাস!
সহসা রক্তপাত, কড়াক্কড় নাদ,
কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস!
নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিশ্বাস!
আমার বঁধুয়া পরবাস!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পালাটি শেষ হইলে সারঙ্গটা কোলে নামাইয়া আর একটি গান ধরিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর আবার গুণ গুণ আরম্ভ করিয়াছেন, সহসা নজরে পড়িল, তাঁহার ঠিক বামদিকে একটি সেফালি বৃক্ষের পাশ হইতে দুইটি উজ্জল আঁখিতারা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; ব্রাহ্মণ সেইদিকে চাহিতেই এক রমণীমূর্ত্তি নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"ঠাকুর প্রণাম হই, চমৎকার গান!"

ঠাকুর স্তব্ধ হইয়া গেলেন, এ কোন বনদেবী আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রশংসাবাক্য ঢালিতেছেন! তাঁহাকে মৌন দেখিয়া রমণী বলিলেন,— "ঠাকুর থামিলেন কেন? আর একটি গান করুন।" তিনি আনন্দাপ্লুত হইয়া আস্তে আস্তে দুই একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "গাহিতেছি, কিন্তু কি গাহিব?"

রমণী বলিল, "কি গাহিবেন? আর একটি বিরহ গান; নবীন অধিকারীর টপ্পা বড় ভালবাসি; আগে যিটি গাহিলেন, সেটি তাঁহার না?"

ব্রাহ্মণের সঙ্গীতবিদ্যা সার্থক মনে হইল, জীবন ধন্য মনে হইল; তিনি আহ্লাদ গোপন করিতে না পারিয়া বলিলেন—"আমিই নবীন অধিকারী।"

শক্তি পূর্ব্বেই তাঁহাকে চিনিয়াছিল; আট দশ বৎসরে ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিশেষ পরিবর্ত্তিত হন নাই, কিন্তু শক্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। শক্তি বলিল—"আপনি নবীন অধিকারী? আপনার গানের প্রশংসাই শুনিয়া আসিতেছি; আজ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল; আমার মহাভাগ্য! আর একটি গান শোনান।"

ব্রাহ্মণ গান ধরিলেন—

এমনি ক'রে
তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে ?
সেথা—জোছনা রজনী, ম্লান কি, সজনি,
এমনি তাহারো নয়ন লোরে ?
ঐ দুটি তারা, আপনাতে হারা,
শুনিছে তারো কি বিরহ গান ?
মালাগাছি গলে, তেমনি কি দোলে,
শুকান তবু কি তেমনি মান ?
বুকে ধরে চেপে, উঠিছে কি কেঁপে,
শিহরে বা কভু অধরে রাখি !
স্মৃতির মিলনে, বিরহ বেদনে,
এমনি সজনি, আকুল সেকি !
প্রাণ কেঁদে কয়, নয় তাতো নয়,
সবি বিস্মরণ সে মায়াপুরে।
সেথা—পুরাতন বলে, কিছু নাহি ছলে—
শুধু—বাজে বাঁশি নিতি নতুন সুরে।

ব্রাহ্মণ তান মান দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গানটি গাহিতে লাগিলেন, শক্তি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ অনিমেষনেত্রে তাহা শুনিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; মেঘের আর চিহ্নমাত্র নাই; পরিষ্কার শুভ্র শরদ্গগণে চাঁদ উঠিয়াছে; বনতলে ছায়াসংযুক্ত জ্যোৎস্না ম্লানভাবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—আর সেই সুস্বর সঙ্গীতলহরী কম্পমান জ্যোৎস্নালোক স্তম্ভিত করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। হঠাৎ গান শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে, দেবি ?" এ কথা এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছিল,—শক্তি একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ দেখিয়া বুঝিতে পারেন নাই ? আমি ভিখারিণী, ঠাকুর !"

ব্রাহ্মণ সারঙ্গটা ভূমে ফেলিয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিল,—"আমাকে ছলনা করিতেছ ! তুমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা"। ব্রাহ্মণ প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, শক্তি ব্যাকুলতা দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল,—"ঠাকুর, আমাকে পাপমগ্ন করিবেন না, আমি কায়স্থকন্যা, আমার কেহ নাই, আমি সত্যই ভিখারিণী।"

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে বলিল,—"ভিখারিণী ! এমন ভিখারিণী ত কখনো দেখি নাই !"

শক্তি হঠাৎ বলিল,—"ঠাকুর, এ গানটিও কি আপনার—'এমন যামিনী, মধুর চাঁদনী, সে যদি গো শুধু আসিত' ? সেদিন একজন ভিখারীর মুখে শুনিতেছিলাম !"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমারি গান ! মা তুমি এত গান ভালবাস, নিজেও গাহিয়া থাক ?"

শক্তি। "হ্যাঁ, আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই, একটু আধটু গান গাহিতে হয় বই কি?"

ব্রাহ্মণ আগ্রহে কহিল,—"একটি কি শুনিতে পাই না? আমি, মা, তোমার পিতৃতুল্য, আমার কাছে গাহিতে ত লজ্জা নাই।" শক্তি একটু হাসিয়া বলিল; "তা সত্য, কিন্তু আপনার মত গায়কের কাছে আমার গান গাওয়া ধৃষ্টতামাত্র, তবে আপনি বলিতেছেন; গাই"—শক্তি আস্তে আস্তে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কণ্ঠ খুলিয়া গাহিল—

"এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন, আকুল তিয়াসা,
যদি—সে শুধু গো ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত এত শোভা হাসি
এ নব যৌবন এত রূপরাশি
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,
কেন এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি!
যদি—হলাহলে ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

নিজের গান অন্যের মুখে সুস্বরে সুলয়ে শুনিতে কিরূপ আনন্দ জন্মে, যিনি কবি তিনিই জানেন! শক্তির মুখে গান শুনিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগরের ন্যায় উথলিয়া উঠিল; ব্রাহ্মণ গদগদকণ্ঠে কহিল—"মা, আমি কি করিব?" এই অস্পষ্ট ভাষার অর্থ শক্তি বুঝিয়া বলিল, "আমি ভিখারিণী আমার জন্য আপনি কি করিবেন, ঠাকুর? তবে একটি কাজ করিতে পারেন, আমি একবার রাজারাণীর সহিত দেখা করিতে চাই, এই যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু গুপ্ত সংবাদ দিব।"

ব্রাহ্মণ একটু ভাবিয়া বলিল, "মহারাণীর আজ্ঞা আছে, যেন কোন সন্ন্যাসিনী ভিখারিণী রাজার কাছে যাইতে না পায়, তা আমাকে দিয়া কথাটা বলা হয় না?"

শক্তি। না,—তাহা হইলে ত আগেই বলিতাম।

ব্রাহ্মণ। তা বেশ, কিছু ভাবনা নাই, আমার গৃহিণীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে, তুমি আমার সঙ্গে এস।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাণীর সহিত দেখা করিবার জন্য শক্তি মোটেই ব্যস্ত ছিল না। কিন্তু মনে পাপ থাকিলেই বাহিরে যত সঙ্কোচ; কি জানি শুধু রাজার সহিত দেখা করিতে চাহিলে

ব্রাহ্মণ যদি কোনরূপ সন্দেহ করিয়া বসে তাই সে রাজার নাম করিতে গিয়া রাণীর শুদ্ধ নাম করিয়া বসিল।

আলোক উজ্জ্বলিত শিবিরের প্রধান কক্ষে সামান্য খাটিয়ার উপর এক বৎসরের শিশু নিদ্রিত, গণেশদেব সেই শয্যায় এক উচ্চ বালিশের উপর পার্শ্ব ঠেসান দিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া আছেন। মাঝে মাঝে তাহার নিদ্রিত অধরে চুম্বন করিতেছেন। নিরূপমা নীচে পা রাখিয়া রাজার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার ঘন চুলের মধ্যে সরু সরু আঙ্গুল গুলি সস্নেহে সঞ্চালিত করিতে করিতে তাঁহাকে সৌৎসুক্যে নানারূপ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে। রঙ্গিণী ভিখারিণীকে এই সময় কক্ষ দ্বারে আনিয়া কহিল, "তুমি দাঁড়াও আমি খবর দিয়া আসি"—রঙ্গিণী ভিতরে প্রবেশ করিল। শক্তি দ্বারেরকাছে আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল। গণেশদেবকে এই প্রথম সে রাণীর সহিত একত্রে দেখিল, তাঁহার একটি সন্তান হইয়াছে এই সে প্রথম জানিল। নিরুপমা কি সুখ শান্তির ক্রোড়ে অবস্থিত! তাহার কি সৌভাগ্য! স্বামীর সোহাগে, পুত্রের স্নেহে, সমাজের বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার মধ্যে তাহার জীবন আনন্দ স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়া যাইতেছে! তাহার প্রেমহীন, সুখহীন শান্তিহীন দুঃস্বপ্নপূর্ণ ভীষণতরঙ্গ-নিপীড়িত হতাশ জীবনের সহিত ইহার কি প্রভেদ! ভগবান কি অপরাধে তাহার এরূপ বিষম দশা করিলেন? জ্বলন্ত ঈর্ষায় শক্তির হৃদয়ে চিতাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রঙ্গিণী আসিয়া দেখিল শক্তি কক্ষদ্বার হইতে দূরে দাঁড়াইয়া। তাহাকে গৃহ প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলে সে বলিল, "রাজাকে এখানে ডাক আমি কাহারো সাক্ষাতে সে কথা তাঁহাকে বলিব না"। রঙ্গিণী চলিয়া গেল। কিছু পরে রাজা স্বয়ং তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "শুনিলাম কোন জরুরি গুপ্ত খবর দিতে আসিয়াছ। এখানে কেহ নাই, স্বচ্ছন্দে বলিতে পার"। শক্তি স্বর ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এখানে নয় পুষ্করিণী তীরে আসুন।" বলিয়াই শক্তি রাজার অপেক্ষা না করিয়া অগ্রসর হইল, রাজাও নীরবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শক্তি পুষ্করিণী তীরে আসিয়া মস্তকাবরণ খুলিয়া চাঁদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। সহসা যদি চন্দ্রমা স্বর্গচ্যুত হইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িত তাহা হইলেও গণেশদেব বুঝি তত বিস্মিত হইতেন না। তিনি মুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া গেলেন। কিছু পরে যেন সচেতন হইয়া সহসা একটু হঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণাসূচক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যবনি, তুমি কেন?" শক্তির মাথা ঘুরিতে লাগিল। সত্যই ত সে যবনী কোন সাহসে তবে সে আবার গণেশদেবের নিকট আসিল? শক্তি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাই সে এই অসহ্য-ঘৃণা-নিষ্পেষিত হইয়াও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নামে মাত্র; আমি তাহার শয্যাভাগিনী নহি। আমার হৃদয় মন দেহ অকলঙ্কিত ভাবে এখনো তোমারি। তবে তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর তাহা হইলে আমার এই বিশুদ্ধতা নষ্ট হইবে, তুমি উদ্ধার না করিলে আমার পাপানলে ঝাঁপ

দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।” সে দিন রাজা বালকের ন্যায়, প্রেমিকের ন্যায় শক্তিকে দেখিয়া আত্মহারা, বিহ্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনকার কথা ন্যায়ান্যায়-বোধরহিত, মুগ্ধ, আত্মবিলোপী প্রেমময় হৃদয়ের কথা; কিন্তু আজ তিনি প্রশান্ত গম্ভীর অপক্ষপাতী কঠোর বিচারক হইয়া বলিলেন, “সেদিন আর নাই। তুমি যবন গৃহে বাস করিয়াছ কিরূপে তুমি আমার পত্নী হইবে? ভবিতব্য উল্টান, কর্ম্ম খণ্ডিত করা আমার সাধ্যাতীত। সে দিন তোমাকে আমার করিতে পারিতাম কিন্তু তখন তুমি চলিয়া গেলে, পরদিন তোমাকে সন্ধান করিতে গিয়া শুনিলাম, তুমি গায়সুদ্দিনের বেগম হইয়াছ।”

শক্তি বলিলেন, ‘‘সত্যই আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল! মহারাণীর অমত সত্ত্বেও?’’

রাজা বলিলেন—“হাঁ।”

শক্তি দেখিল, নিজের পায়ে সে নিজে কুড়াল মারিয়াছে! প্রতিশোধপরবশ, ক্রোধ-পরবশ, জ্ঞানহারা, আত্মহারা হইয়া সুখের আশ্রয় ছাড়িয়া সে দুঃখের তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছে। কে আর এখন উঠাইবে তাহাকে? রাজা যদি তাহাকে উঠাইতে যান ত নিজে শুদ্ধ অতলে ডুবিবেন! তাহাকে রক্ষা করা তাহার কর্ম্মাভিশাপ খণ্ডন করা—এখন দেবতারো সাধ্য নহে। শক্তি আপনার দুরবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া যন্ত্রণা ব্যাকুল হইয়া কহিল, “তবে কি আমার কোন উপায় নাই?”

রাজা কহিলেন, “যে উপায় নিজে অবলম্বন করিয়াছ তাহাই আছে। যাহাকে বিবাহ করিয়াছ তাহার কাছে যাও, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন।”

রাজার মুখে—যাহার জন্য সে সুখ-শান্তি এমন কি ধর্ম্মহীন—তাহার মুখে এই কঠোর নির্ম্মম, উপদেশ বাক্য সাংঘাতিক হইতেও সাংঘাতিক! সেদিন যে গর্ব্বে সে রাজকুমারকে ত্যাগ করিয়াছিল আজিকার গভীর নৈরাশ্যময় দুঃখের কুল-কিনারা-হীন অবস্থায় সে গর্ব্বটুকু পর্য্যন্ত আর তাহার রহিল না! তাহার সব গিয়াছিল, আত্মগর্ব্ব, আত্ম গৌরবের জোরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সে নত হয় নাই। কিন্তু ঝটিকাচ্ছন্নরাত্রে দিগভ্রান্ত নাবিকের আজ সামান্য কম্পাসটি পর্য্যন্ত হারাইয়া গেল! সে হৃতগর্ব্ব, হৃতবল রোরুদ্যমান হইয়া কহিল—“যাহাকে ভাল বাসি না, যাহাকে হৃদয় দিতে পারি না, কি করিয়া তাহার সহবাস করিব? রাজকুমার, আমাকে ততদূর হীন কর্ম্মে বাধ্য করিও না। আমাকে বিবাহ করিতে না পার আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। যাহাকে ভালবাসি তাহার উপপত্নী হইতে পারি! কিন্তু যাহাকে ভালবাসিনা কি করিয়া তাহার পত্নী হইব? রাজকুমার সমাজ যাহাই বলুক, ভগবানের চক্ষে তুমি পতিত হইবে না, তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না, আমাকে আশ্রয় প্রদান কর, আমাকে ত্যাগ করিও না।”

শক্তির সেই মর্ম্মোত্থিত কাতরবাক্যে গণেশদেব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় নির্ব্বাক হইয়া

পড়িলেন; ক্ষণকাল পরে সংযত হইয়া বলিলেন, "শোন শক্তি, হাজার ইচ্ছা করিলেও আমি আর তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি না। প্রাণ বাহির করিলেও আমি আর তোমাকে আপনার করিতে পারি না, কেন না তাহা অকর্ত্তব্য, অন্যায়, পাপাচরণ। তুমি এখন অন্যের বিবাহিতা, অন্যের পত্নী। আমি যদি এখন তোমার স্বামী হইতে তোমাকে ছিন্ন করিয়া আশ্রয় প্রদান করি, তাহা হইলে তোমারো ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, আমারো ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। যে ভালবাসা ধর্ম্মের প্রতিকূল তাহা পরিত্যজ্য;—তাহা অবিশুদ্ধ। তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছ,—তোমাকে সে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণে বাধ্য করায় নাই; সুতরাং আমি কিরূপে বিবাহিত স্বামীর অধিকার হরণ করি! স্বামীই স্ত্রীলোকের গুরু, দেবতা, ধর্ম্ম। যাহাকে স্বামীরূপে বরণ করিয়াছ, অনন্যমনা হইয়া এখন তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ কর; শুভ ইচ্ছায়, ধর্ম্মসংকল্পে ভগবান বল প্রদান করিবেন।"

শক্তির আর সহিল না, রাজার উপদেশ, তাঁহার মঙ্গল ভাব সে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিল না। তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রেমহীন কঠোর বজ্রদণ্ডে তাহাকে আহত করিল মাত্র। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্তহৃদয়ে আবার তাহার অপমানব্যথা জাগিয়া উঠিল। রাজা যে তাহার প্রেমময় আত্মবিসর্জ্জনের মূল্য উপলব্ধি না করিয়া তাহা ঘৃণিত হেয় অসার দ্রব্যের মত অবহেলা করিলেন, ইহা তাহার সহ্য হইল না। রমণীর সব সহে, কেবল ইহা সহে না। সে পূর্ব্বের গর্ব্ব সহসা ফিরিয়া পাইয়া অশ্রুহীন গম্ভীরভাবে বলিল,—"গণেশদেব, আমি কুলটা নহি। আত্মসম্মান, সতীত্ব রক্ষার জন্যই তোমার আশ্রয় চাহিয়াছিলাম; তোমার নিকট দেহ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু সংসার যখন সে সম্মান রক্ষা করিতে চাহে না, সমাজসম্মানই যখন তোমাদের আদর্য্য বস্তু, তখন তাহাই হউক; আমি হৃদয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সমাজধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিব; ইহাতে যদি পাপ হয়, সে পাপ আমার নহে; এ পাপে আমাকে যে বাধ্য করিয়াছে—তাহার।"

এই কথা বলিয়া সেইদিনকার মতই ঝড়ের বেগে শক্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। রাজা অনেকক্ষণ ধরিয়া একাকী সেই জ্যোৎস্নাদীপ্ত দীর্ঘিকাতীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

*　　*　　*　　*

গায়সুদ্দিন যুদ্ধজয়ী হইয়া শক্তির নিকট আসিয়া দেখিলেন, শক্তির আর সে সন্ন্যাসিনীর সাজ নাই, মণি মুক্তা আভরণে সজ্জাবতী হইয়া শক্তি বঙ্গেশ্বরীর রূপ ধারণ করিয়াছে। সুলতান নিকটে আসিয়া পদতলে মুকুট রাখিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, বাঙ্গালার মুকুট এই তোমার পদতলে লুণ্ঠিত, এখন তোমার কথা রক্ষা কর—"

শক্তি তাঁহার আলিঙ্গনে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া দগ্ধহৃদয়ে কহিল—"আমি তোমারি হইলাম।"

ভালবাসা না চক্ষুলজ্জা ?

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত বৈশাখ মাসের ভারতীতে শ্রীমান্ কিরণচন্দ্রাখ্য প্রেমিকবর তাঁহার নববর্ষের স্বপ্নকাহিনী ওরফে আত্মপ্রেমকাহিনীর শেষভাগে পাঠকবর্গের প্রতি তাঁহার জীবনের একটী রহস্যোদ্ঘাটনের গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "দাম্পত্যের সেই পূর্ব্ব-উপহসিত সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটি, ছোটখাট সুখ দুঃখ ও রুচির তাহা এখন জানি, আমার এই বুভুক্ষায় কঙ্কালসার জীবন অসার তাহা জানি, কিন্তু তবু বিবাহে প্রবৃত্তি নাই। এ রহস্য পার ত তোমরা উদ্ঘাটন কর।" অনুমান হয় এ রহস্যের চাবি আমার নিকট আছে, যেহেতু এ অধীন একজন ভুক্তভোগী। ভবাদৃশ সুধীগণসমক্ষে মদীয় অভিজ্ঞতাচাবি তাঁহার হৃদয়দ্বারে লাগাইয়া একবার পরখ করিয়া দেখিতে চাহি, তাহার রহস্য অনাবরণে কৃতকার্য্য হই কি না। বিফলতার সম্ভাবনা অত্যল্পই বোধ হয়—এমন কি নাই বলিলেও হয়, যেহেতু জানা আছে, আমার এটী "প্যাটেণ্ট, ইউনিভার্সাল কি",—সব হৃদয়কলেই লাগিয়া থাকে। তবে আমার জীবনেতিহাস আপনাকে সংক্ষেপে জানাইতে হইল।

কিরণচন্দ্রের ন্যায় আমারও কিঞ্চিৎ শিশুকাল হইতেই কাব্যরসসেবনের প্রতি সবিশেষ আস্থা ছিল। হৃদয়, নিদয় ; চাঁদ, ফাঁদ ; ফুল, ভুল ;—এই সব মিলগুলি আমার প্রাণকে কেমনতর উতরোল করিয়া তুলিত। গুটীকতক বাঙ্গালা নভেলও মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমার প্রেমে পড়া অনিবার্য্য, এবং আমি সে বিষয়ে অযথা কালবিলম্বও করি নাই। আমাদের প্রতিবেশীদের সহিত আমাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য। তাঁহাদের একটী ছোট মেয়ে ছিল পারুল। তাহাকে দেখিলেই কি-যেন-কি-এক ভাবে, কি-যেন-কি-এক মোহে আমার কিশোর হৃদয় ডুবিয়া যাইত—তখন শুধু থার্ড ক্লাশে পড়ি। ইস্কুল ডিপার্টমেণ্ট ছাড়িয়া যখন কালেজে ঢুকিলাম, তখন পারুল অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, আমার হৃদয়ের উত্তাপও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সময়টা লিট্‌ল্ সাহেবের লেক্‌চারের স্বরূপ মর্ম্মগ্রহণে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটিত। যেহেতু কণিক্ সেক্‌যণের পৃষ্ঠায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পারুলের সৌন্দর্য্যবিকাশ-অনুধ্যানেই রত থাকিতাম। তাহাকে গৃহে দেখিতাম, আর ভাবে অভিভূত হইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সুর করিয়া করিয়া বলিতাম, "তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে মিলিয়ে মিলিয়ে রে।" এই মানবলতিকাটী আমার মনকে উত্তরোত্তর বেশী করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। পারুল বালিকা হইলেও জানিত, আমি তাহার ক্রীতদাস। আজ্ঞাদায়িনী রাণীর ন্যায় আমার প্রতি ব্যবহার করিত, আমি তাহাতে কৃতার্থ থাকিতাম।

কিন্তু পারুল আমার হইল না। ধনীর ঘরণী হইয়া চলিয়া গেল এবং আমি কাব্যরসের প্রতি অল্প বীতশ্রদ্ধ হইয়া অর্থোপার্জ্জনী বিদ্যায় মন দিলাম। কিন্তু এক বৎসর পরে সে ফিরিয়া আসিয়া আমার কোমল হৃৎপিণ্ডে আবার আলোড়ন উপস্থিত করিল। প্রথম যৌবনের প্রস্ফুট রূপরাশি লইয়া সে যখন আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল, আমার অন্তরের সুপ্তাগুণ আবার জ্বলিয়া উঠিল, তাহার প্রেমাগুণে আবার পুড়িতে লাগিলাম।

কিন্তু এখন যদিও তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ মেলামেশা চলিতে লাগিল তথাপি পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম, আমাদের মাঝখানে এক তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবধান ঘটিয়াছে। তাহার সামান্যতম আদেশটি পালন করিতে সেই পূর্ব্বের মত প্রভূত আনন্দ, তাহাকে দেখার সেই সুখ, তাহার প্রতি সমস্ত অস্তিত্বের সেই অনিবার আকর্ষণ,—কিন্তু হায় বিড়ম্বনা!—পূর্ব্বে আমি তাহার যতটুকু স্নেহের পাত্র ছিলাম, এখন তাহাও নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষপাতী, কৃপণ হৃদয়, তাহার স্নেহপাত্রের অংশ হইতে অত্যল্প পরিমাণও বাঁটিয়া লইয়া অন্য ক্ষুধার্ত্তজনের ক্ষুধার কথঞ্চিৎ উপশম করিতে স্বীকৃত নহে। আমি বুঝিতে পারিলাম, সে আমার জীবন ভরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু আমি আর তার জীবনের এতটুকু স্থানও পূর্ণ করিয়া নাই। তাহার স্বামী প্রায়ই যায় আসে, কখন কখন আমার সমক্ষেই একটা কথায়, একটা ভাবে তাহার প্রতি পারুলের স্নেহ ব্যক্ত হইয়া পড়ে, ছুরির মত তাহা আমার বুকে গিয়া বিঁধে। সেই সঙ্গে আমার প্রতি ঔদাসীন্যের মাত্রা মনে মনে আলোচনা করিয়া আরও বেশী মর্ম্মাহত হই। যত বুঝি আমি তাহার হৃদয় হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছি, ততই তাহার হৃদয়ের কাছাকাছি আগুয়ান হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা মনে প্রবল হয়। যতই তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের নিদর্শন পাই—ততই হিংসায় দুঃখে জ্বলিতে থাকি। এইরূপে সতত-জাগ্রত তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা, প্রেম ও হিংসায় দুই বৎসর কাটিল। জীবনটা এতাবৎকাল সমস্ত ক্ষণ নিখাদে চড়িয়াছিল, যেন আর সুরে চড়াইবার চেষ্টামাত্রে তাঁত ফাটিয়া যাইবে। দুই বৎসর পরে পারুল যখন পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেল, তখন মনে করিলাম, তাহার বিরহকল্পনা আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে এবং বিরহবিষয়ক কাব্যচর্চ্চার এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অন্তরাত্মা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম পাইয়া কিঞ্চিৎ আরাম অনুভব করিতে লাগিল। দেখিলাম পারুল চলিয়া গেলে তাহার বিরহ সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক বিষয়ে আনন্দোপভোগ করিতে পারিতেছি। কিন্তু সেজন্য মনে মনে একটু লজ্জিত হইলাম, বেশী করিয়া বিরহের কবিতা পড়িতে লাগিলাম, এমন কি দুই এক দিস্তে কাগজ স্বরচিত পয়াররসসিক্তও করিলাম। আমার পিসি এক জায়গায় আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলাম; তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইলাম আমি জীবনে কখন বিবাহ করিব না, চিরকাল অনূঢ় থাকিব। পিসি আমাকে কিছু না বলিয়া কহিয়া কোন সুযোগে কন্যা দেখাইলেন। আমি তাহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এ কন্যা

সুন্দরী বটে, এবং মুখে যদি হৃদয় প্রতিবিম্বিত হয়, তবে ইহার হৃদয়ও সুন্দর বটে। ইহাকে অন্যে সহজেই ভালবাসিতে পারে,—বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে। কিন্তু আমি?—আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমার হৃদয়-প্রস্তরে পারুলের যে মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে তাহা অক্ষয়, তাহা মূর্ত্ত্যন্তরের দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে না! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পারুলের উদ্দেশ্যে দুই এক ছত্র কবিতা আওড়াইলাম এবং মনে মনে বলিলাম—"না—আমি কিছুতেই ইহাকে ভালবাসিতে পারিব না, কিছুতেই ইহাকে বিবাহ করিতে পারিব না, পারুলমন্দিরে এ হৃদয় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এ আর কাহারও নয়!"

পারুল অল্প দিনের জন্য ফিরিয়া আসিল; আবার সেই উত্তেজিতাবস্থার পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু এবার যেন উত্তেজনা কিছু কম বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা অনুভব করিতেও লজ্জা হইল—এই বুঝি আমার হৃদয়ের একাগ্রতা? আমার এ প্রেম অবিনশ্বর, ইহা চিরদিনের,—নাইবা পারুল আমাকে ভালবাসিল, নাইবা তাহাকে পাইলাম—"কেনইবা ভুলিব তোমায়—কে ভোলে হৃদয়ধনে?" কিন্তু হৃদয়ধনের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও দিন দিন দাম্পত্যের রসবত্তায় অধিকতর বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিল। শ্রীমান্ কিরণেরও এ বিশ্বাসের অসদ্ভাব নাই, তবে তৎসত্ত্বেও যে প্রবৃত্তির অভাব রহিয়াছে—তাহার রহস্য—ঐ চাবি খট্ করিয়া উঠিল—কিরণচন্দ্র আমাকে মাপ করিবেন, আর কিছুই নয়—আমারই ন্যায় চক্ষুলজ্জা। অনেক সময় মৃত-দারিকের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহণের বাধা যেমন একমাত্র লোকলজ্জা, অস্মদ্দৃশজনের বিবাহে প্রবৃত্তির বিঘ্নও তদ্রূপ চক্ষুলজ্জা। সম্পাদক মহাশয়, হক্ কথা বলিব,—নভেলের নায়কাভিমানী আত্মাকে সাধারণ্যের ভূমে নামাইতে কিছুতেই সহজে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাণপণে বীরত্বের চূড়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বন্ধুর ও পিচ্ছিল প্রদেশে কোনমতে, কষ্টে পা ঠিক রাখিতে হয়; সামান্য উপসর্গেই সেখান হইতে পদস্খলনের গুরু সম্ভাবনা, কাঁটা খোঁচা বিস্তর; মনের অনুক্ষণ স্বগতোক্তি "ত্রাহি ত্রাহি, আমার বীরত্বে কাজ নেই রে বাবা, ছেড়ে দেহি"—কিন্তু চক্ষুলজ্জা নাছোড়বান্দা।

এইরূপে ত কিছুকাল যায়। ক্রমে ক্ষীণ বাঙ্গালীর শরীরে এত দীর্ঘকালস্থায়ী একনিষ্ঠতা কিছু বেশী উৎপীড়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। জীবনটা নিতান্ত আল্‌গা হইয়া আসিতেছিল; এযাবৎ কেবলমাত্র হাওয়ার উপর প্রাণের ধারণাশক্তি নির্ভর করায় ভিতরটায় হাঁসফাঁসানি ধরিয়াছিল, হাওয়াপেক্ষা কিঞ্চিৎ সারবান্ খাদ্যের জন্য অন্তর খাবি খাইতেছিল—বিবাহে প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বলবতী হইয়া উঠিতেছিল এবং পিসির কল্যাণে ও উদ্যোগে সে প্রবৃত্তি অচিরে চরিতার্থ হইল; শুভদিনে, শুভক্ষণে নলিনীর সহিত আমার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাপ্! আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, চতুর্দ্দশপুরুষে বরাবরই বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, গৃহে সম্বল থাকুক আর নাই থাকুক, তথায় যথাকালে নববধূ ও নবকুমারের শুভাগমনের ত্রুটী কখনই হয় নাই! পিতৃপিতা-

মহাগত সেই সনাতন প্রথা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা কি আমাদের সাজে? আস্ত-মানুষ-গ্রাসী এই পাশ্চাত্য বিভীষিকা ভালবাসা আর একটু হইলেই আমাকে মজাইয়াছিল আর কি! শর্ম্মা কেবলমাত্র নিজের পুরুষকারে তাহার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার সমবস্থাপন্ন প্রিয় স্বদেশীগণের হিতার্থে এই ইতি-হাস লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ভায়া কিরণচন্দ্র! আমার ন্যায় সাহসী হও, বাঙ্গালী পুরুষসিংহ নামের যোগ্য হও,—বিবাহ কর, সুখে থাক। ঐ শোন আমার "প্যাটেণ্ট-কি" তোমার হৃদয়কলের মুখে বসিয়া কি বলে? ভালবাসা—না চক্ষুলজ্জা?

কস্যচিৎ ভুক্তভোগিনঃ—

দেবপ্রয়াগে।

১০ই মে রবিবার,—পশ্চিম দেশে থাকৃতে গেলে অনেকেই একটু আধটু চা খাওয়া অভ্যাস করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমারো সে অভ্যাসটা ছিল এবং সব ছেড়ে এখনো সকাল বেলা একটু চা-পানের প্রবৃত্তি বলবতী হয়ে উঠে, তাই আজ ভোরে এই মহাদেব চটিতে একটু চায়ের যোগাড় করা গিয়েছিল। দোকানদার বেচারা তার ঝুলি ঝেড়ে চা সংগ্রহ করে আমাদের জন্যে প্রস্তুত কল্লে—তাতে খানিক বিলম্ব হয়ে গেল। 'স্বামীজী' ত চটেই লাল, তিনি বোল্লেন্ যার এত হাঙ্গামা তার আবার তীর্থভ্রমণে বাহির হওয়ার সখ কেন?—কিন্তু শর্করাসংযুক্ত চায়ের সঙ্গে তাঁর ভর্ৎসনাটা বেশ সহজে পরিপাক করে বাহির হওয়া গেল। গত কল্য আমাদের সঙ্গে যে বাঙ্গালী বৃদ্ধটি যুটেছিলেন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা কর্ত্তে লাগ্‌লেন—তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেওয়ার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা গেল কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব্বসঙ্গীদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গ নিতে কিছুতেই রাজী হ'লেন না।

আমরা সে বেলা ৬ মাইল হেঁটে প্রায় ১১টার সময় "কান্তি" চটিতে উপস্থিত হোলুম, কিন্তু যাদের ভয়ে আগের দিন একটু এগিয়ে এসেছিলুম, আজ তারা সকালে আমাদের পিছনে ফেলে এই চটিতেই এসে আশ্রয় নিয়েছে। এত বেলায় আর রৌদ্রের মধ্যে যাই কোথা? সেখানেই কোন রকমে কাটাতে হোল, কিন্তু রৌদ্রে বড়ই কষ্ট পাওয়া গেল, তার উপর কিছু আহারও যোগাড় হ'লো না, তখন সকালের সেই 'চা' পানের জন্যে মনে বিলক্ষণ অনুতাপ উপস্থিত হ'লো; সন্ন্যাসী মহাশয় ভারি খুসী।

এইখানে আর একজন বাঙ্গালী যুবক-সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গী হ'লেন, এঁর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি ঢাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরেজী জানেন না কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। প্রথমে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ

সুন্দরী বটে, এবং মুখে যদি হৃদয় প্রতিবিম্বিত হয়, তবে ইহার হৃদয়ও সুন্দর বটে। ইহাকে অন্যে সহজেই ভালবাসিতে পারে,—বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে। কিন্তু আমি?—আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমার হৃদয়-প্রস্তরে পারুলের যে মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে তাহা অক্ষয়, তাহা মূর্ত্ত্যন্তরের দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে না! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পারুলের উদ্দেশ্যে দুই এক ছত্র কবিতা আওড়াইলাম এবং মনে মনে বলিলাম—"না—আমি কিছুতেই ইহাকে ভালবাসিতে পারিব না, কিছুতেই ইহাকে বিবাহ করিতে পারিব না, পারুলমন্দিরে এ হৃদয় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এ আর কাহারও নয়!"

পারুল অল্প দিনের জন্য ফিরিয়া আসিল; আবার সেই উত্তেজিতাবস্থার পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু এবার যেন উত্তেজনা কিছু কম বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা অনুভব করিতেও লজ্জা হইল—এই বুঝি আমার হৃদয়ের একাগ্রতা? আমার এ প্রেম অবিনশ্বর, ইহা চিরদিনের,—নাইবা পারুল আমাকে ভালবাসিল, নাইবা তাহাকে পাইলাম—"কেনইবা ভুলিব তোমায়—কে ভোলে হৃদয়ধনে?" কিন্তু হৃদয়ধনের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও দিন দিন দাম্পত্যের রসবত্তায় অধিকতর বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিল। শ্রীমান্ কিরণেরও এ বিশ্বাসের অসদ্ভাব নাই, তবে তৎসত্ত্বেও যে প্রবৃত্তির অভাব রহিয়াছে—তাহার রহস্য—ঐ চাবি খট্ করিয়া উঠিল—কিরণচন্দ্র আমাকে মাপ করিবেন, আর কিছুই নয়—আমারই ন্যায় চক্ষুলজ্জা। অনেক সময় মৃত-দারিকের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহণের বাধা যেমন একমাত্র লোকলজ্জা, অস্মদৃশজনের বিবাহে প্রবৃত্তির বিঘ্নও তদ্রূপ চক্ষুলজ্জা। সম্পাদক মহাশয়, হক্ কথা বলিব,—নভেলের নায়কাভিমানী আত্মাকে সাধারণ্যের ভূমে নামাইতে কিছুতেই সহজে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাণপণে বীরত্বের চূড়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বন্ধুর ও পিচ্ছিল প্রদেশে কোনমতে, কষ্টে পা ঠিক রাখিতে হয়; সামান্য উপসর্গেই সেখান হইতে পদস্খলনের গুরু সম্ভাবনা, কাঁটা খোঁচা বিস্তর; মনের অনুক্ষণ স্বগতোক্তি "ত্রাহি ত্রাহি, আমার বীরত্বে কাজ নেই রে বাবা, ছেড়ে দেহি"—কিন্তু চক্ষুলজ্জা নাছোড়বান্দা।

এইরূপে ত কিছুকাল যায়। ক্রমে ক্ষীণ বাঙ্গালীর শরীরে এত দীর্ঘকালস্থায়ী একনিষ্ঠতা কিছু বেশী উৎপীড়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। জীবনটা নিতান্ত আল্‌গা হইয়া আসিতেছিল; এযাবৎ কেবলমাত্র হাওয়ার উপর প্রাণের ধারণাশক্তি নির্ভর করায় ভিতরটায় হাঁসফাঁসানি ধরিয়াছিল, হাওয়াপেক্ষা কিঞ্চিৎ সারবান্ খাদ্যের জন্য অন্তর খাবি খাইতেছিল—বিবাহে প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বলবতী হইয়া উঠিতেছিল এবং পিসির কল্যাণে ও উদ্যোগে সে প্রবৃত্তি অচিরে চরিতার্থ হইল; শুভদিনে, শুভক্ষণে নলিনীর সহিত আমার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাপ্! আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, চতুর্দ্দশপুরুষে বরাবরই বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, গৃহে সম্বল থাকুক আর নাই থাকুক, তথায় যথাকালে নববধূ ও নবকুমারের শুভাগমনের ত্রুটী কখনই হয় নাই! পিতৃপিতা-

মহাগত সেই সনাতন প্রথা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা কি আমাদের সাজে? আস্ত-মানুষ-গ্রাসী এই পাশ্চাত্য বিভীষিকা ভালবাসা আর একটু হইলেই আমাকে মজাইয়াছিল আর কি! শর্ম্মা কেবলমাত্র নিজের পুরুষকারে তাহার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার সমবস্থাপন্ন প্রিয় স্বদেশীগণের হিতার্থে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ভায়া কিরণচন্দ্র! আমার ন্যায় সাহসী হও, বাঙ্গালী পুরুষসিংহ নামের যোগ্য হও,—বিবাহ কর, সুখে থাক। ঐ শোন আমার "প্যাটেণ্ট-কি" তোমার হৃদয়কলের মুখে বসিয়া কি বলে? ভালবাসা—না চক্ষুলজ্জা?

কস্যচিৎ ভুক্তভোগিনঃ—

দেবপ্রয়াগে।

১০ই মে রবিবার,—পশ্চিম দেশে থাকৃতে গেলে অনেকেই একটু আধটু চা খাওয়া অভ্যাস করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমারো সে অভ্যাসটা ছিল এবং সব ছেড়ে এখনো সকাল বেলা একটু চা-পানের প্রবৃত্তি বলবতী হয়ে উঠে, তাই আজ ভোরে এই মহাদেব চটিতে একটু চায়ের যোগাড় করা গিয়েছিল। দোকানদার বেচারা তার ঝুলি ঝেড়ে চা সংগ্রহ করে আমাদের জন্যে প্রস্তুত কল্লে—তাতে খানিক বিলম্ব হয়ে গেল। 'স্বামীজী' ত চটেই লাল, তিনি বোল্লেন্ যার এত হাঙ্গামা তার আবার তীর্থভ্রমণে বাহির হওয়ার সখ কেন?—কিন্তু শর্করাসংযুক্ত চায়ের সঙ্গে তাঁর ভৎর্সনাটা বেশ সহজে পরিপাক করে বাহির হওয়া গেল। গত কল্য আমাদের সঙ্গে যে বাঙ্গালী বৃদ্ধটি যুটেছিলেন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা কর্ত্তে লাগ্‌লেন—তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেওয়ার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা গেল কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব্বসঙ্গীদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গ নিতে কিছুতেই রাজী হ'লেন না।

আমরা সে বেলা ৬ মাইল হেঁটে প্রায় ১১টার সময় "কান্তি" চটিতে উপস্থিত হোলুম, কিন্তু যাদের ভয়ে আগের দিন একটু এগিয়ে এসেছিলুম, আজ তারা সকালে আমাদের পিছনে ফেলে এই চটিতেই এসে আশ্রয় নিয়েছে। এত বেলায় আর রৌদ্রের মধ্যে যাই কোথা? সেখানেই কোন রকমে কাটাতে হোল, কিন্তু রৌদ্রে বড়ই কষ্ট পাওয়া গেল, তার উপর কিছু আহারও যোগাড় হ'লো না, তখন সকালের সেই 'চা' পানের জন্যে মনে বিলক্ষণ অনুতাপ উপস্থিত হ'লো; সন্ন্যাসী মহাশয় ভারি খুসী।

এইখানে আর একজন বাঙ্গালী যুবক-সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গী হ'লেন, এঁর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি ঢাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরেজী জানেন না কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। প্রথমে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ

দেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন, তার পর এঁর মাথায় কি একটা খেয়াল চাপে, কলিকাতায় থাকৃতে থাকৃতেই তিন মাসের জন্যে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তখন নাকি ইনি স্লেট হাতে ক'রে বেড়াতেন এবং বক্তব্য বিষয় স্লেটে লিখে দেখাতেন। মনে সব কথাই আস্‌চে, কিন্তু তা মুখ ফুটে না বলার মধ্যে যে কি পুণ্য লুকোন আছে তা আমার বুদ্ধির অগম্য, বোধ করি এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু আমার পক্ষে আমি এইটুকু বোল্‌তে পারি যে, সব রকম শাস্তি সহ্য করা যায়—কিন্তু মুখ বুঁজে থাকাটা অসহ্য; হাজার হাজার কথা একত্রে জমা হয়ে বের হবার জন্যে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি কচ্ছে কিন্তু বের হ'তে না পেরে পেটের ভিতর ভয়ানক একটা অরাজকতা উপস্থিত কর্‌ছে—এ বড়ই মুস্কিলের কথা। যাহোক তিনি সে পরীক্ষা হ'তে উত্তীর্ণ হয়ে কাশীতে আসেন এবং সেখানে এক গুরুর কাছে 'দণ্ড' ধারণ ক'রে 'দণ্ডী' সন্ন্যাসী হন; কিন্তু এ রকম মানুষের কোনটাই বেশী দিন পোষায় না। দণ্ডীদের অনেক কঠোরতা কর্ত্তে হয়। তাদের শূদ্রের বাড়ীতে যেতে নেই, তাদের গৃহে ভিক্ষা নিতে নেই এমন কি তাদের সঙ্গে একত্রে বসাও নিষেধ, ব্রাহ্মণগৃহেও একবেলার বেশী অতিথি হওয়ার যো নেই, পূজা অর্চ্চনা যথারীতি কর্ত্তে হয়, তাছাড়া দণ্ডখানি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাছছাড়া কর্‌বার যো নেই। দণ্ডীশ্রেণীতে এমনি ক'রে শিক্ষানবিশী শেষ হ'লে কয়েক বৎসর পরে গুরুর আদেশে দণ্ড ত্যাগ ক'রে পরমহংস শ্রেণীতে প্রবেশ কর্ত্তে পাওয়া যায়; প্রকৃত "পরমহংস" হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সব দণ্ডীই দণ্ড ত্যাগ ক'রে পরমহংসত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ দণ্ডী হ'তে পারেন না, আমাদের দেশে উপবীত গ্রহণ যেমন—দণ্ডগ্রহণও অনেকটা তাই। উপবীতের সময় ব্রাহ্মণসন্তান যেমন তিন দিন ঘরের মধ্যে ব'সে ফলমূলের সর্ব্বনাশ এবং মা বাপের ও গৃহসামগ্রীর মহাত্রাস জন্মিয়ে শেষে একবারে ব্রহ্মণ্যতেজে পরিপূর্ণ হয়ে বাহির হন, এঁরাও তেমনি দণ্ড গ্রহণ ক'রে দুচার মাস বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করেন, তার পর দণ্ড জলে ভাসিয়ে পরমহংস হন ও অভিমানের বোঝা ভারি করেন।

আমাদের এই নূতন সঙ্গী সন্ন্যাসীও দণ্ড ত্যাগ ক'রেছেন, কিন্তু পরমহংসক্লাসে প্রোমসন পাওয়ার আগেই কোন কারণে গুরুর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'দণ্ড'খানি জলে ফেলে দিয়েছেন, সুতরাং এখন তাঁর অবস্থা "না তাঁতী না বৈষ্ণব।" সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন, সঙ্গে একটি কাঠের কমণ্ডলু আর দু তিনখানা বেদান্তদর্শন, লোকটা ঘোর বৈদান্তিক। দাম্ভিকশ্রেণীকে আমার বিশেষ ভয়, কিন্তু এই জঙ্গলে এ বৈদান্তিককে পেয়ে মনে বড়ই আনন্দ হ'লো। লোকটা বেশ সরল প্রকৃতির, তবে বেদান্তের দোষেই হোক কি নিজের অদৃষ্টের দোষেই হোক তার দয়ামায়া কিছু কম বলে মনে হ'লো, তা না হলে আর মা বাপ, স্ত্রী সব ছেড়ে এই ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করেছে?—ভগবান জানেন তার মনে কতটুকু শান্তি আছে কিন্তু তাকে ত সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা অর্চ্চনা, ঠাকুর

দেবতাদের প্রণাম প্রভৃতি কিছুই কর্ত্তে দেখিনে, উপরন্তু বল্‌তে গেলে মহাতর্কজাল বিস্তার করে সব নস্যাৎ করে দেয়। রাস্তাঘাটে এমন তার্কিক লোক একটা সঙ্গে থাক্‌লে আর কিছু না হোক পথশ্রম অনেক কমে আসে। বাবাজীর এখনকার নাম 'অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।' বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠে সবই আনন্দ, আর রাস্তাঘাটের সন্ন্যাসীদের নামেরও অধিকাংশই আনন্দ; নামে আনন্দ আছে বটে কিন্তু তা কার কতটুকু ভোগে লাগে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ, শুধু চিনির বলদের মত ঘাড়ে বয়ে বেড়ান মাত্র।

'কাস্তী' চটির সম্মুখেই একখানা ছোট গ্রাম, সেই গ্রামে সেদিন একটা বিবাহ। ঢোল বাজ্‌ছিল, আর ছোট ছেলে মেয়েরা ভাল কাপড় চোপড় পরে হাত ধরাধরি করে নেচে বেড়াচ্ছিল, মুখ ভাবনাশূন্য এবং চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। সন্ধ্যার সময় দূরের এক গ্রাম হ'তে বর আস্‌বে, দেখলুম মেয়েমহলে ভারি উৎসাহ লেগে গেছে, তারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নানারকম আয়োজন কর্‌ছে। চটিতে যায়গা পাওয়া গেল না, দূরে একটা বড় সেওড়া গাছের ছায়ায় বসে একলা এই দৃশ্য দেখ্‌তে লাগলুম, আমার সঙ্গীদ্বয় তখন নিদ্রামগ্ন, আমার চক্ষে আর ঘুম এল না, আমি এই আনন্দের ছবির দিকে চেয়ে থাকলুম। একবার ইচ্ছা হ'লো আজ রাত্রে এখানেই থেকে গিয়ে এদের বিবাহের উৎসবটা দেখে যাই, কিন্তু উদাসী সাধুর দল আজ এখানে থাকবে, তারা একবেলার বেশী পথ চলে না, সুতরাং এখানে থাক্‌লে আজ রাত্রেও অনাহার; কাজেই বিকেল চার্‌টের সময় বের হয়ে পড়া গেল। খানিক পথ এসেই মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো, নিকটে গ্রামও নেই, কোন পর্ব্বত গহ্বরও নেই, আরো কষ্টের কারণ এই হ'লো যে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন ঝড় বইতে লাগলো যে প্রতি মুহূর্ত্তেই নীচে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। আমরা পর্ব্বতের গায়ে একটা অতি সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, আমাদের বাঁয়ে পর্ব্বতের মধ্যে গঙ্গা, আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখান হ'তে যদি কোন রকমে একবার হাত পা ছেড়ে দেওয়া যায় তো একবারে পাঁচ ছ'শ' ফিট নীচে গঙ্গার জলে দেহখানি নয় কখানা ভাঙ্গা হাড় মাত্র পড়্‌তে পারে। হাতে সেই ৪½ হাত পার্ব্বতীয় লাঠি, তারি উপরে ভর রেখে বহুকষ্টে কাপড় ও উত্তরীয় কম্বল ভিজোতে ভিজোতে একটা যায়গায় উপস্থিত হলুম; তখনো সমান তেজে বৃষ্টি ও ঝড় হচ্ছে, সেখান হ'তে ৫০০ ফিট নীচে নাম্‌তে হবে, রাস্তা এক রকম নেই বল্লেই হয়। পূর্ব্বের রাস্তাটি ভেঙ্গে গেছে, এখনো মেরামত হয়নি—সামান্য "পাকদাণ্ডি" মাত্র আছে। রাস্তা সংক্ষেপ কর্‌বার জন্যে বলবান পাহাড়ীরা এড়োএড়ি যে সমস্ত ভয়ানক পথে কখনো বা গাছের ডাল ধ'রে কখনো বা পাথর বুকে বাঁধিয়ে, কখন কখন এক পাথর হতে লাফ দিয়ে আর একটা পাথরে চ'ড়ে উঠা নাবা করে—তারি নাম "পাকদাণ্ডি।" একে ঝড় বৃষ্টি তাতে এই রকমের পথ, তার উপর আবার নীচে নাম্‌তে হবে, বেলাও বেশী নেই, সুতরাং আমরা যে মহাভাবনায় পড়ে গেলুম তা বলা বাহুল্যমাত্র। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, 'সহস্র ধারা' দেখ্‌তে

যাওয়ার সময়ের আমি ও আজকের আমিতে তফাৎ বিস্তর ; পাঠক মহাশয় হয় ত আমার এই গর্ব্বাতিশয্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ কর্‌বেন, কিন্তু বাস্তবিক বল্‌তে কি সে সময় পশ্চিমদেশে আমার প্রথম আসা, তার পর তিন বৎসর ধ'রে পাহাড়ে চলা ফেরা করাতে একটু শক্ত সমর্থ হয়েছি, নতুবা এ পাদুখানার উপর কখন এত বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তে পাত্তুম না। দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে ভিজ্‌লে কষ্ট কম হবে মনে ক'রে তিন জনে অতি ধীরে ধীরে, কখন ব'সে কখন গাছের গুঁড়ি ধ'রে নাম্‌তে লাগ্‌লুম এবং এক একবার জোরে বাতাস এসে আমাদের বিষম ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

ধীরে ধীরে নেমে অনেকক্ষণ পরে একটা পুলের ধারে এলুম, এ পুলটী ব্যাসগঙ্গার উপরে ; একটি ছোট নদী গঙ্গায় পোড়েছে, এই নদীর নামই ব্যাসগঙ্গা। আমরা বরাবর গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে চলেছি অর্থাৎ গঙ্গা দক্ষিণ মুখো চোলছে আর আমরা উত্তর মুখো চোলছি। লছমন ঝোলা হ'তে গঙ্গাপার হয়ে, বরাবর গঙ্গা বাঁয়ে রেখে চল্‌তে চল্‌তে এই নদী আমাদের পথরোধ কোল্লে। ব্যাসগঙ্গাও হিমালয় থেকেই বাহির হয়ে কতকটা দক্ষিণদিকে এসে শেষে পশ্চিম মুখো হ'য়ে গঙ্গায় প'ড়েছে। এখানে ইংরেজ বাহাদুর একটা ছোট টানা সাঁকো তৈয়েরী ক'রে দিয়েছেন ; সাঁকোটা ৪০ হাতের বেশী হবে না। সাঁকো খুব ছোট কর্ত্তে হয়েছে ব'লে এত নীচে তৈয়ের করান হয়েছে, এ জন্যে উপরের রাস্তা হ'তে আমাদের প্রায় পাঁচশ ফিট নীচে নেমে আস্‌তে হ'য়েছিল। সাঁকোর প্রায় ১৫০।২০০ হাত সম্মুখে ব্যাসগঙ্গা গঙ্গায় প'ড়েছে। এখানে একটা চটি আছে, তার নাম "ব্যাসচটি"—এ চটি একেবারে জলের ধারে, কাছে অনেক দিনের পুরান ভগ্ন-প্রায় দুটো মন্দির আছে, সেখানকার লোকে বোল্লে ঐ মন্দিরের সম্মুখে ব'সে ব্যাস অনেকদিন তপস্যা ক'রেছিলেন। যেখানে বড় মন্দিরটি আছে সে জায়গাটি বড় সুন্দর, নীচেই নদী, ওপারে ছোট বড় অনেক গাছের সার, গাছগুলো বাতাসে দুল্‌ছে আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নির্ম্মলজলে সর্ব্বদাই কাঁপচে। কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ময়ূরের শোভাই বেশী। ওপারের গাছগুলি ময়ূরের আড্ডা, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে, দলে দলে ময়ূর পুচ্ছ খুলে যে কি সুন্দর নৃত্য আরম্ভ করেছে তার আর কি বোলবো ? তাদের ডাকে সেই বনভূমি এবং নিস্তব্ধ নদী-তীর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, একটা দোকানে ব'সে এই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, কবির কথা আমার মনে আস্‌তে লাগলো—

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখির নৃত্য
এখনও হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ ছায়া শ্রাবণ তিমির।

কিন্তু এ যে বৈশাখ,—তা হোলেও বৈশাখের বৈকালে মধ্যে মধ্যে শ্রাবণের ঘনঘটা নজরে পড়ে।

নদীর ধারে এখানে কয়েকখানা দোকান আছে, অন্যান্য চটির চেয়ে ব্যাসচটিতে দোকানের সংখ্যা কিছু বেশী এবং তাদের অবস্থাও ভাল, কারণ শ্রীনগর * হ'তে এদিক দিয়ে ব্যাসগঙ্গার ধারে ধারে নাজিমাবাদের রাস্তা, আর এই রাস্তায় অনেক লোকজন চলে। ভিজে কাপড় কোন রকমে শুকিয়ে এখানেই রাত্রি কাটান গেল এবং যতক্ষণ নিদ্রা না এল অচ্যুতানন্দ বাবাজীর সঙ্গে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব নিয়ে অন্যের দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কওয়া গেল।

১১ই মে সোমবার—সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হলুম, কারণ এখানে যে দুটি মন্দির আছে, কাল সন্ধ্যার সময় তা আর দেখা হয়নি। মন্দির দুটি পাথরের, দেখ্‌লে অনেক দিনের ব'লে বোধ হয়, আর তা এমন জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে যে, বোধ হয় আর দু তিন বছরের মধ্যেই ভেঙ্গে একেবারে ভূমিসাৎ হবে; এ সমস্ত প্রাচীন মন্দির রক্ষা করার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। মন্দির দুটীর একজন পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে দেখ্‌লুম, কতকগুলি সিন্দুর মাখান পাথর, আর দুটি অস্পষ্টাকৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি; প্রত্যহ পূজা করা দূরে থাক, পুরুত ঠাকুর যে প্রত্যহ মন্দিরের দ্বারও খোলেন না, তা মন্দিরের ভিতরের চেহারা দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়, তবে যখন যাত্রীদল সে পথে যেতে আরম্ভ করে, তখন একটু পরিষ্কার রাখেন, আর যাত্রীদের মন্দিরের বাহিরে এক প্রস্তরখণ্ড ব্যাসের আসন" ব'লে দেখিয়ে তাদের ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আকর্ষণ ক'রে থাকেন। স্থানটি দেখে যে খুব ভক্তির উদয় হয় তার আর সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতি পদে যদি বিনা বাক্যব্যয়ে এই রকম কোরে পয়সা দিতে হয়, তাহ'লে বদরিকাশ্রম পৌঁছবার বহুপূর্ব্বেই রাস্তা হ'তে দেউলে হ'য়ে আমাদের দেশে ফির্‌তে হবে।

আজ আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছব। আজ অক্ষয়তৃতীয়া এবং বদরিকাশ্রমে বদরি-নারায়ণের মন্দির আজই প্রথম খোলা হবে। আমাদের ইচ্ছা ছিল আরো দুচার দিন আগে বের হ'য়ে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি, কিন্তু তা হয়নি, কাজেই এখন তাড়াতাড়ি পথ চল্‌তে আরম্ভ করেছি। আমরা স্থির করেছি, যেমন কোরেই হোক আজ দেবপ্রয়াগে পৌঁছব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার জন্যে যে শেষে খুব নাকাল হ'তে হবে তা কে জান্‌তো? সে কথা পরে বল্‌ছি। অনেক দূর আসার পর তিন চার দল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ ক'র্‌লে, এরা দেবপ্রয়াগ হ'তে খানিক রাস্তা এগিয়ে এসে যাত্রী ধর্‌বার জন্যে ব'সে থাকে; আমাকে নিয়ে মহা পীড়াপীড়ি।

* এ শ্রীনগরকে কারো যেন কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী ব'লে ভ্রম না হয়, এ গাড়োয়াল বিভাগের এক মিত্ররাজ্যের রাজধানী, এর কথা পরে বলা যাবে।

যাওয়ার সময়ের আমি ও আজকের আমিতে তফাৎ বিস্তর ; পাঠক মহাশয় হয় ত আমার এই গর্ব্বাতিশয্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ কর্‌বেন, কিন্তু বাস্তবিক বল্‌তে কি সে সময় পশ্চিমদেশে আমার প্রথম আসা, তার পর তিন বৎসর ধ'রে পাহাড়ে চলা ফেরা করাতে একটু শক্ত সমর্থ হয়েছি, নতুবা এ পাদুখানার উপর কখন এত বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তে পাত্তুম না। দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে ভিজ্‌লে কষ্ট কম হবে মনে ক'রে তিন জনে অতি ধীরে ধীরে, কখন ব'সে কখন গাছের গুঁড়ি ধ'রে নাম্‌তে লাগ্‌লুম এবং এক একবার জোরে বাতাস এসে আমাদের বিষম ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

ধীরে ধীরে নেমে অনেকক্ষণ পরে একটা পুলের ধারে এলুম, এ পুলটী ব্যাসগঙ্গার উপরে ; একটি ছোট নদী গঙ্গায় পোড়েছে, এই নদীর নামই ব্যাসগঙ্গা। আমরা বরাবর গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে চলেছি অর্থাৎ গঙ্গা দক্ষিণ মুখো চোলছে আর আমরা উত্তর মুখো চোলছি। লছমন ঝোলা হ'তে গঙ্গাপার হয়ে, বরাবর গঙ্গা বাঁয়ে রেখে চল্‌তে চল্‌তে এই নদী আমাদের পথরোধ কোল্লে। ব্যাসগঙ্গাও হিমালয় থেকেই বাহির হয়ে কতকটা দক্ষিণদিকে এসে শেষে পশ্চিম মুখো হ'য়ে গঙ্গায় প'ড়েছে। এখানে ইংরেজ বাহাদুর একটা ছোট টানা সাঁকো তৈয়েরী ক'রে দিয়েছেন ; সাঁকোটা ৪০ হাতের বেশী হবে না। সাঁকো খুব ছোট কর্ত্তে হয়েছে ব'লে এত নীচে তৈয়ের করান হয়েছে, এ জন্যে উপরের রাস্তা হ'তে আমাদের প্রায় পাঁচশ ফিট নীচে নেমে আস্‌তে হ'য়েছিল। সাঁকোর প্রায় ১৫০। ২০০ হাত সম্মুখে ব্যাসগঙ্গা গঙ্গায় প'ড়েছে। এখানে একটা চটি আছে, তার নাম "ব্যাসচটি"—এ চটি একেবারে জলের ধারে, কাছে অনেক দিনের পুরান ভগ্ন-প্রায় দুটো মন্দির আছে, সেখানকার লোকে বোল্লে ঐ মন্দিরের সম্মুখে ব'সে ব্যাস অনেকদিন তপস্যা ক'রেছিলেন। যেখানে বড় মন্দিরটি আছে সে জায়গাটি বড় সুন্দর, নীচেই নদী, ওপারে ছোট বড় অনেক গাছের সার, গাছগুলো বাতাসে দুল্‌ছে আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নির্ম্মলজলে সর্ব্বদাই কাঁপচে। কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ময়ূরের শোভাই বেশী। ওপারের গাছগুলি ময়ূরের আড্ডা, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে, দলে দলে ময়ূর পুচ্ছ খুলে যে কি সুন্দর নৃত্য আরম্ভ করেছে তার আর কি বোলবো ? তাদের ডাকে সেই বনভূমি এবং নিস্তব্ধ নদী-তীর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, একটা দোকানে ব'সে এই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, কবির কথা আমার মনে আস্‌তে লাগলো—

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখির নৃত্য
এখনও হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ ছায়া শ্রাবণ তিমির।

কিন্তু এ যে বৈশাখ,—তা হোলেও বৈশাখের বৈকালে মধ্যে মধ্যে শ্রাবণের ঘনঘটা নজরে পড়ে।

নদীর ধারে এখানে কয়েকখানা দোকান আছে, অন্যান্য চটির চেয়ে ব্যাসচটিতে দোকানের সংখ্যা কিছু বেশী এবং তাদের অবস্থাও ভাল, কারণ শ্রীনগর * হ'তে এদিক দিয়ে ব্যাসগঙ্গার ধারে ধারে নাজিমাবাদের রাস্তা, আর এই রাস্তায় অনেক লোকজন চলে। ভিজে কাপড় কোন রকমে শুকিয়ে এখানেই রাত্রি কাটান গেল এবং যতক্ষণ নিদ্রা না এল অচ্যুতানন্দ বাবাজীর সঙ্গে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব নিয়ে অন্তের দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কওয়া গেল।

১১ই মে সোমবার—সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হলুম, কারণ এখানে যে দুটি মন্দির আছে, কাল সন্ধ্যার সময় তা আর দেখা হয়নি। মন্দির দুটি পাথরের, দেখ্‌লে অনেক দিনের ব'লে বোধ হয়, আর তা এমন জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে যে, বোধ হয় আর দু তিন বছরের মধ্যেই ভেঙ্গে একেবারে ভূমিসাৎ হবে; এ সমস্ত প্রাচীন মন্দির রক্ষা করার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। মন্দির দুটীর একজন পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে দেখ্‌লুম, কতকগুলি সিন্দুর মাখান পাথর, আর দুটি অস্পষ্টাকৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি; প্রত্যহ পূজা করা দূরে থাক, পুরুত ঠাকুর যে প্রত্যহ মন্দিরের দ্বারও খোলেন না, তা মন্দিরের ভিতরের চেহারা দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়, তবে যখন যাত্রীদল সে পথে যেতে আরম্ভ করে, তখন একটু পরিষ্কার রাখেন, আর যাত্রীদের মন্দিরের বাহিরে এক প্রস্তরখণ্ড "ব্যাসের আসন" ব'লে দেখিয়ে তাদের ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আকর্ষণ ক'রে থাকেন। স্থানটি দেখে যে খুব ভক্তির উদয় হয় তার আর সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতি পদে যদি বিনা বাক্যব্যয়ে এই রকম কোরে পয়সা দিতে হয়, তাহ'লে বদরিকাশ্রম পৌঁছবার বহুপূর্ব্বেই রাস্তা হ'তে দেউলে হ'য়ে আমাদের দেশে ফির্‌তে হবে।

আজ আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছব। আজ অক্ষয়তৃতীয়া এবং বদরিকাশ্রমে বদরিনারায়ণের মন্দির আজই প্রথম খোলা হবে। আমাদের ইচ্ছা ছিল আরো দুচার দিন আগে বের হ'য়ে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি, কিন্তু তা হয়নি, কাজেই এখন তাড়াতাড়ি পথ চল্‌তে আরম্ভ করেছি। আমরা স্থির করেছি, যেমন কোরেই হোক আজ দেবপ্রয়াগে পৌঁছব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার জন্যে যে শেষে খুব নাকাল হ'তে হবে তা কে জান্‌তো? সে কথা পরে বল্‌ছি। অনেক দূর আসার পর তিন চার দল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ ক'র্‌লে, এরা দেবপ্রয়াগ হ'তে খানিক রাস্তা এগিয়ে এসে যাত্রী ধর্‌বার জন্যে ব'সে থাকে; আমাকে নিয়ে মহা পীড়াপীড়ি।

---

* এ শ্রীনগরকে কারো যেন কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী ব'লে ভ্রম না হয়, এ গাড়োয়াল বিভাগের কোন মিত্ররাজ্যের রাজধানী, এর কথা পরে বলা যাবে।

আমি তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে, আমার পাণ্ডার বড় দরকার নেই, তবে যদি নিতান্তই দরকার হয়, তাহোলে যে আমাকে প্রথমে বোলেছে, তাকেই পাণ্ডা কোর্‌বো; এই কথায় আশ্বাস পেয়ে একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লো, যতগুলি পাণ্ডা দেখ্‌লুম, তার মধ্যে এর বয়স কম, বেশভূষার পারিপাট্যও বেশী। গলায় সোনার হার, হাতে সোনার তাগা, কাঁকালে সোনার গোট, কানে বীরবৌলী; তার নাম লছমীনারায়ণ, বয়স ত্রিশ বত্রিশ হবে।

আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছে বাজারে একটা দোতলার উপর বাসা নিলুম। বাজারে কোঠা আছে, কিন্তু ছাতে পাথর দেওয়া; অনেকগুলি দোকান, জিনিষপত্রও মোটামুটি সব রকম পাওয়া যায়। পাণ্ডাদের জ্বালাতন হ'তে উদ্ধার হয়ে দোকান ঠিক ক'রে স্থির হ'য়ে বস্‌তে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগ্‌লো। বাসা করা হ'লে আমার সঙ্গী বৃদ্ধ স্বামীজী তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছতে গিয়ে দেখেন, তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্ম নেই! এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম-খানি তিনি ভাল ক'রে বেঁধে কোরিয়ার ব্যাগের মত পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলাফেরা করেন, তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি যাওয়াতে তাঁর কিঞ্চিৎ দুঃখ হ'লো বটে, কিন্তু আমার একেবারে চক্ষু স্থির!

দেরাদুন হ'তে বের হবার সময় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলুম। রাস্তায় নোট ভাঙ্গানর সুবিধে হবে না, কারণ এখানে খাদ্য দ্রব্যই মেলে না, তা আবার নোটের টাকা! কাজে কাজেই যা কিছু অর্থ নিয়েছিলুম তা সবই নগদ টাকা, আর সিকি দুয়ানী আদুলী। সঙ্গে ট্রঙ্ক কি ব্যাগ প্রভৃতি কিছু নেই, এতগুলি টাকা কোথায় রাখি?—তাই বন্ধুবান্ধববর্গের সুপরামর্শমত মোটা জীনের হাত তিনেক লম্বা ও দু আঙ্গুল কি আড়াই আঙ্গুল চওড়া একটা থলি কিনেছিলুম, তার মধ্যে টাকা কড়ি রেখে সেটা কোমরে জড়িয়ে রাখ্‌তে হয়। যেদিন রওনা হই সে দিন সেইরকমই করেছিলুম—কিন্তু চল্‌বার সময় সেটাতে বড় অসুবিধে বোধ হ'তে লাগ্‌লো তাই স্বামীজীর পরামর্শমত সেটা তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে দুই পাশে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দিলুম। এই ভাবে গত কয় দিন চলে এসেছে। আজ খুব শীঘ্র চল্‌তে হবে ঠিক ক'রে সকলেই ভারি তাড়াতাড়ি লাগিয়েছিলেন, কিন্তু খানিক রাস্তা তাড়াতাড়ি চ'ল্লেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌তে হয়, এই জন্যে আমাদের রাস্তায় দু তিন যায়গায় বস্‌তে হয়েছিল; একটা যায়গায় ব'সে স্বামীজী তাঁর স্কন্ধ হ'তে ব্যাঘ্রচর্ম্মটা একবার নাবিয়েছিলেন—কিন্তু উঠ্‌বার সময় তা পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে পয়সা কড়ি সব, সঙ্গে কিছু নেই বল্লেই হয়। স্বামীজী প্রথমে বল্লেন, তিনি কখনো সেটা রাস্তায় ফেলে আসেন নি, দেবপ্রয়াগে পৌঁছবার সময় পাণ্ডাবেটারাই কেউ হাতিয়েছে, তিনি আরো বোল্লেন যে, "এখানে পাণ্ডাদের যে রকম উপদ্রব, তাতে তারা গলায় ছুরি না দিয়ে যে ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে এ আমাদের ঢের পুণ্যির কথা।" আমি হতাশ

ভাবে বল্লুম, "আর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, আপনার শুধু ব্যাঘ্রচর্ম্ম গেছে মনে করেই পুণ্যির কথা বল্‌ছেন, আমার যে যথাসর্ব্বস্ব গেছে, এর চেয়ে গলায় ছুরী দেওয়াও ত অনেক ভাল ছিল।" আমার মন যে কি রকম খারাপ হ'লো তা আর কহতব্য নয়। কিন্তু যাকে পাণ্ডা স্থির কোরবো ব'লে আশ্বাস দিয়েছিলুম—সে বল্লে আমরা বাজারের মধ্যে বসিনি, আর পাণ্ডাদের দ্বারাও এ রকম কাজ হয়নি। আমরা নিশ্চয়ই সেটা রাস্তায় কোথাও ফেলে এসেছি। বাদানুবাদে প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল। শেষে সেই পাণ্ডা প্রস্তাব কোল্লে যে, রাস্তায় আমরা যেখানে যেখানে বসেছিলুম সেই সমস্ত যায়গা সে নিজে ও তার সঙ্গে অচ্যুতানন্দ বাবাজী গিয়ে খোঁজ করে আস্‌বেন। কিন্তু তাতে যে কিছু ফল হবে আমি একবারো সে আশা করিনি, মাথায় হাত দিয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। এই পাহাড়ের মধ্যে বন্ধুহীন দেশে কি রকম ক'রে দিন কাট্‌বে? এক উপায় আছে ভিক্ষা—কিন্তু তাত কখনো পার্‌বো না, তবে আর এক রকম সভ্যতা-সঙ্গত ভিক্ষা আছে, আতিথ্য স্বীকার করা—এ কতক অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু এ বৎসর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থাকায়—পাহাড়ের মধ্যে যে দুই চারিখানি গ্রাম আছে, সেখানকার লোকই এক রকম খেতে পায় না—তা তারা অতিথিকে কি খেতে দেবে? আমি এই সমস্ত কথা চিন্তা কর্ত্তে লাগলুম, স্বামীজী শুয়ে পড়্‌লেন, অচ্যুতানন্দ স্বামী পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে অসাধ্য সাধন কর্‌বার জন্য চ'লে গেলেন। রাস্তায় যদি ফেলে এসে থাকি ত তা যে কোথা তার কিছু ঠিক নেই, আর তার পর প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেছে, এঁদের খুঁজতে খুঁজতে কোন্ আরও এক ঘণ্টা না লাগ্‌বে, এই সময়ের মধ্যে কত যাত্রী, কত ছাগলওয়ালা সে পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে, এতগুলো লোকের মধ্যে কারো চোখে কি সে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পড়েনি?—যাহোক তবু তাঁদের পথ চেয়ে বসে রইলুম। এদিকেও ভিক্ষা—ওদিকেও ভিক্ষা, দেখা যাক্, তাঁরা ফিরে এলে যা হয় করা যাবে।

প্রায় দু ঘণ্টা পরে দেখি তাঁরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আস্‌ছেন, তাঁরা অনেক নিকটে এলে অচ্যুতানন্দ বাবাজী খুব চেঁচিয়ে বল্লেন, "মিল্ গিয়া, মিল্ গিয়া।" আমি অকুল পাথারে কুল পেলুম। তাঁরা একবারে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িয়েছিলেন, লছমীপ্রসাদ পাণ্ডা এসে থলিসুদ্ধ টাকা মাটিতে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে দেয়ালে পিট্ দিয়ে ব'সে পড়্‌লো। তাঁদের অবস্থা দেখে আর তখন টাকা কোথায়, কিরূপে পাওয়া গেল, তা জিজ্ঞাসা কল্লুম না। শেষে তাঁরা শান্ত হয়ে বল্লেন যে, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছে তাদেরই ব্যাঘ্রচর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বল্‌তে পারেনি, শেষে একজন সন্ন্যাসী বলেছিল যে, প্রায় দেড় মাইল তফাতে একটা ঝরণার পাশে একখণ্ড বড় পাথরের উপর সে একখানা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পড়ে থাক্‌তে দেখেছে, তার মনে হয়েছিল বুঝি কোন সন্ন্যাসী সেখানে আসন রেখে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কথা শুনে তাঁদের মনে আশা হলো, তাঁরা দৌড়তে দৌড়তে

সেখানে গিয়ে দেখেন যে ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি ঠিক সেখানে সেইরকম বাঁধাই পড়ে আছে। অচ্যুতানন্দ মহানন্দে তা তুলে নিলেন, কিন্তু হাতে করেই তাঁর হরিষে-বিষাদ উপস্থিত! আসন পাতলা, খুলে দেখেন ভিতরে কিছুই নেই, অথচ উপরে যেমন তেমনি বাঁধা! দুজনেই মাথায় হাতদিয়ে বসে পড়লেন, কিন্তু একটু পরেই পাণ্ডাঠাকুর উঠে চারদিক অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌তে লাগল, কিছুই দেখ্‌তে পেলে না। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে গেল, আরো একটু নীচে গিয়ে দেখে একটি রাখাল বালক কতকগুলি মেষ চরাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে সেখান দিয়ে কোন লোক নেবে গেছে কিনা; পাণ্ডাজীর কেমন বিশ্বাস হোয়েছিল যে, যে টাকা নিয়েছে সে কখন প্রকাশ্য পথ-দিয়ে যেতে সাহস করেনি, এদিক ওদিক দিয়ে নেবে গেছে। পশ্চিমে পাণ্ডার এতটা বুদ্ধির পরিচালনা অবিশ্যি একটু অসাধারণ। যাহোক প্রথমে ত সেই রাখালবালক পাণ্ডাজীকে কোন কথাই বলতে পাল্লে না, শেষে খানিক ভেবেচিন্তে বল্লে য়ে সে যেন সেই পথ দিয়ে একজন সন্ন্যাসীকে খানিক আগে যেতে দেখেছে। তাই শুনে পাণ্ডাঠাকুর ঠিক কল্লে এ টাকাচুরী সেই সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারো কাজ নয়। রাখাল যে পথ দেখিয়ে দিলে সে কাঁটা জঙ্গল ভেঙ্গে সেই দিকে দৌড়তে লাগলো, কাঁটায় সর্ব্বশরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, ভ্রুক্ষেপ না ক'রে দৌড়তে দৌড়তে খানিক আগে দেখ্‌লে একজন সন্ন্যাসী উপরের দিকে উঠ্‌চে, পাণ্ডাঠাকুর তার অলক্ষ্যে তার পাছু পাছু যেতে লাগলো, সন্ন্যাসী বেশ বলবান বোধ হওয়ায় এই নির্জ্জন প্রদেশে তাকে একেবারে চেপে ধরতে তার কিছু ভয় হোল। যাহোক রাখালবালকও ব্যাপার কি জানবার জন্যে ধীরে ধীরে পাণ্ডাজীর পিছনে পিছনে আস্‌তে লাগলো, অচ্যুত বাবাজীও একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চোর সন্ন্যাসী যখন ধীরে ধীরে নীচে হতে রাস্তার উপরে উঠবার আয়োজন কচ্ছিলো, তখন পাণ্ডা অদূরে রাস্তার উপর অচ্যুত বাবাজীকে দেখে সাহস পেয়ে এক-দৌড়ে সিংহবিক্রমে সেই সন্ন্যাসীর ঘাড় চেপে ধরে একেবারে "শালা চোর, নিকালো রুপেয়া" বলে চিৎকার করে উঠ্‌লো। ওদিকে অচ্যুতবাবাজী "ক্যাহুয়া" ব'লে একলম্ফে সেখানে উপস্থিত। সন্ন্যাসীচোর একেবারে থ, তার আর কোন কথা বল্‌বার শক্তি রইল না, সে নিজেও খুব জোয়ান বটে কিন্তু আগে পাছে দুজন ষণ্ডামার্ক দেখে তার বড়ই ভয় হোল, এবং সব কথা স্বীকার ক'রে পাণ্ডাজীর পায়ে ধ'রে কান্নাকাটী আরম্ভ ক'ল্লে। তার পর তিনজনে মিলে সেই ঝরণার কাছে এসে টাকা খুলে দেখেন যে একটী টাকাও কমেনি। সন্ন্যাসী চোরটা বড়ই নির্ল্লজ্জ, কোথায় চুরী ক'রে ধরা পড়েছে ব'লে পালাবার চেষ্টা করবে—না, কিছু ভিক্ষার জন্যে তাঁদের দুজনকে ধ'রে বোসলো। টাকা পেয়ে তাঁদের এতই স্ফূর্ত্তি হ'লো যে দয়ার্দ্র হয়ে তাঁরা তাকে একটাকা বকশিশ দিলেন, আর সেই রাখালকে ডেকে তাকে চার আনা পুরস্কার দিয়ে, এই সংবাদ আমাদের জানাবার জন্যে প্রাণপণে ছুটে আস্‌চেন। আমি পাণ্ডাজীকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিতে

গেলুম, সে কিছুতেই তা নিলে না, বল্লে "বাবুজী, ইনাম কা ওয়াস্তে ইত্না তকলিফ্ লেনেকো আদমী মেঁই নেহি হুঁ, আপকো ওয়াস্তে প্রাণ ব্যাকুল হুয়াথা।" তার এই স্বার্থ-শূন্য কথাগুলি শুনে, আমি যে টাকা দিয়ে তার পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্দেশ কর্ত্তে গিয়েছিলুম এ ভেবে মনে বড় লজ্জার উদয় হলো, কিন্তু তার এই মহৎ ব্যবহারে আমার খুব আনন্দও হ'লো। এই পর্ব্বতবাসী একজন অশিক্ষিত পাণ্ডা আমার মত অপরিচিতের জন্যে যে কষ্ট স্বীকার কল্লে দেশের কোন পরিচিত আত্মীয়বন্ধুও এর চেয়ে বেশী কর্ত্তে পার্ত্তেন না, এরকম মহত্বের দৃষ্টান্তও অতি বিরল।

দেবপ্রয়াগ গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, গড়োয়ালের মধ্যে দেবপ্রয়াগ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার হাট বাজার বেশ ভাল, বদ্রিনারায়ণের পাণ্ডাদের বাস এখানেই। প্রায় পাঁচশ ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করে, এদের অনেকেরই অবস্থা ভাল, ঘর বাড়ী পাকা এবং সকলেই এক যায়গায় থাকে। গঙ্গা ও অলকনন্দা যেখানে সম্মিলিত হয়েছে তারই ঠিক উপরে একটু সমতল স্থান আছে, সেই টুকুর মধ্যেই এই পাঁচশ ঘর গৃহস্থ কোন রকমে বাস কচ্ছে। দেবপ্রয়াগে একটা পুরাণো মন্দির আছে, মন্দিরটা পাণ্ডাদের বাড়ীর ঠিক মধ্যেখানে, এই মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তি আছে। গড়োয়ালের রাজা—এখন তাঁকে টিহরীর রাজা বলে,—এমন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অনেক ধনসম্পত্তি আছে, টিহরী রাজ্যের নিয়ম এই যে রাজার মৃত্যু হ'লে তাঁর নিজ ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষই এই মন্দিরে পাঠান হয়; মন্দিরের সমস্ত আয় ব্যয়ের ভার টিহরীর রাজার উপর, তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতের উপর দেবসেবার ভার আছে।

পাণ্ডার সঙ্গে গিয়ে সঙ্গমস্থলে স্নান কল্লুম; গঙ্গা ও অলকনন্দার মধ্যে অলকনন্দাকেই বড় ব'লে মনে হয়। এখন আমাদের অলকনন্দার ধারে ধারে যেতে হ'বে। আমাদের যেখানে বাসা সেখান হতে সঙ্গমস্থলে যেতে হ'লে অলকনন্দা পার হ'তে হয়; ইংরেজের প্রসাদে এখন আর ঝোলা পার হ'তে হয় না, যেখানে যেখানে ঝোলা ছিল সেই সমস্ত যায়গায় এখন এক একটা সুন্দর টানাপুল তৈয়েরি হয়েছে। ইংরেজরা যে কয়টি সাঁকো তৈরি করিয়েছেন তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। এর নির্ম্মাণপ্রণালী কলিকাতার কাছে চেতলার পুলের মত। এই সমস্ত ভয়ানক স্থানে বহু অর্থব্যয় ক'রে পুল তৈয়েরী করিয়ে ইংরাজরাজ বহুপ্রতিষ্ঠা ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়েছেন; প্রকৃতপক্ষে বদরিকাশ্রমের পথ ইংরেজের প্রসাদেই অনেক সুগম হয়েছে।

বিকেলে আমরা মন্দির দেখ্তে গেলুম, ঠাকুরের গায়ে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অনেক অলঙ্কার। আমার পাণ্ডা আমাকে বাঙ্গালীর এক কুকীর্ত্তির কথা শুনিয়ে দিলে, লজ্জায় আমার মুখ চোক লাল হয়ে উঠল। দেবপ্রয়াগে ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালীকে সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখে, এমন কি তার গতিবিধি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ ক'রে থাকে, বাঙ্গালীর পক্ষে এ বড় কম লজ্জার কথা নয়। যাকে বড় বেশী বিশ্বাসী বলে মনে হয় সে যদি অবিশ্বাসের

কাজ করে তা হ'লে তার পরে কি আর কাউকে তেমন সহজে বিশ্বাস করা যায়? ব্যাপারটা কি এখানে বলা যাক্।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হ'লো একদিন একজন বাঙ্গালী বাবু দেবপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হন, তীর্থদর্শন তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বাড়ী কলিকাতায়, তবে ঠিক সহরের মধ্যে কি না তা বলা যায় না। তিনি নিজের কি নাম বোলেছিলেন সেটা আমার ডাইরীতে লেখাছিল, কিন্তু পেন্সিলের লেখা মুছে গেছে, আর তাঁর নামটা মুছে যাওয়ায় আমি কিছু মাত্র দুঃখিতও নই। বাঙ্গালী জাতি হ'তে যদি তাঁর নামটা মুছে যেত ত তাঁর কুকীর্ত্তির কথা শুনে আমাকে এত লজ্জিত হ'তে হতো না। দেবপ্রয়াগে এসে তিনি প্রথমে একদিন থাক্‌বেন ব'লে বাসা নিয়েছিলেন, কিন্তু স্থানটি অতি মনোরম বোধ হওয়াতে তিনি এখানে বেশী দিন ধ'রে বাস কর্ত্তে লাগলেন। এখানে একটা ইংরেজের থানা আছে, থানার লোকজনের সঙ্গে বেশ ভাব হ'লো, ডাকঘরের বাবুর সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচয় হ'লো, বড় বড় পাণ্ডাদের সঙ্গেও বন্ধুতা স্থাপন কল্লেন, এবং একজন ইংরেজী জানা, ধনশালী (পশ্চিমে একটু ফিট ফাট থাকলেই সেদেশের লোক ভাবে এ ব্যক্তি একজন রাজা মহারাজা হবে) বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সকলেই আপনাকে একটু কৃতার্থ মনে কর্ত্তে লাগলো।

বাবু প্রত্যহই রামসীতা দর্শন কর্ত্তে যান, মহাভক্তির সঙ্গে ঠাকুরের দিকে—কি ঠাকুরের গহনার দিকে ঠিক বলা যায় না—চেয়ে থাকেন এবং আর সব দর্শক ও যাত্রী চলে গেলে তিনি সকলের শেষে মন্দির হতে বাহির হন। তিনি দেখলেন মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য লোক মন্দিরের বাহিরে থাকে এবং বাহিরের দিক হতে একটা বড় তালা দিয়ে মন্দির বন্ধ করা হয়, সুতরাং মন্দিরের এই তালার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়্‌লো। পোষ্টমাষ্টার বাবুর আফিসের তালাটীও অনেকটা এই রকমের কিন্তু সেদিকে আর কারও দৃষ্টি পড়েনি, আর পোষ্টমাষ্টারকেও বড় একটা আফিস বন্ধ কর্ত্তে হয় না কাজেই সে চাবিটা কোলঙ্গার উপর অযত্নে পড়ে থাকে। বাঙ্গালী বাবু সেই চাবিটা হস্তগত ক'ল্লেন এবং তাকে ঘসে সেই মন্দিরের তালায় লাগাবার উপযোগী করে নিলেন। শেষে একদিন রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত—সেই সময় তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার খুলে মন্দিরে প্রবেশ ক'ল্লেন এবং দ্বার বন্ধ না করেই ভিতরে চ'লে গেলেন। মন্দিরের বাহিরে একটা ছোট ঘরে পুরোহিতের একজন লোক শয়ন ক'রেছিল; সে কার্য্য বশতঃ উঠে দেখে মন্দিরের দ্বার খোলা, ভিতর হতে আলো আস্‌ছে। এত রাত্রে মন্দিরের দ্বার খোলা দেখে তার ভারি সন্দেহ হ'লো, চুপে চুপে মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতরে টুকটাক শব্দ হচ্ছে, সে উচ্চবাচ্য না করে প্রথমে মন্দিরের পাশে একটা দুয়োর ছিল (সেটা ভিতর হতে বন্ধ) সেই দুয়োরটাতে শিকল টেনে দিলে তার পর নিজের ঘর থেকে সেই বড় দরজার চাবি এনে দুয়োর বন্ধ করে চীৎকার আরম্ভ কল্লে। চোর

মহাশয় ইতিমধ্যে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অলঙ্কারগুলি—কতকবা ঠাকুরের গা হতে এবং কতক বাক্স ভেঙ্গে বের করে—কাপড়ে বেঁধেছেন। তিনি বিশ্বস্ত চিত্তে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত—সহসা মন্দিরদ্বারে জন কোলাহল শুনে তাড়াতাড়ি দুয়োরের কাছে এসে দেখেন দ্বার বন্ধ। দশমিনিটের মধ্যে চারদিকে পাণ্ডার দল এসে জুটলো, মেয়ে পুরুষে সেই মন্দির প্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়ে গেল। বাবাজী বিনা চেষ্টাতেই ধরা পড়লেন, কাপড়ে বাঁধা জহরত সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়লো। তিহরি রাজ্যে দু বৎসর মেয়াদ খেটে তারপর ইংরেজের কাছে বিচার হয়ে তাঁর আর দু বছরের জেল হ'লো। জেল থেকে বের হয়ে সেই পুরুষপুঙ্গব এখন যে কোথায় সরে পড়েছেন তা জানা যায় নি। এখন ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালী যুবক দেখ্‌লেই মন্দিরের লোক তারদিকে সন্দিগ্ধচিত্তে চেয়ে থাকে এবং বিশেষ সাবধান হয়; আমি যে তাদের সন্দেহ হ'তে এড়িয়ে ছিলুম তা বোধ হয় না, আমার বয়সের লোক যে কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছাড়া এতকষ্ট করে শুধু তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছে এ কথা আর তারা সহজে বিশ্বাস কর্ত্তে রাজী নয়। কেননা তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। শুধু এই হতভাগাই যে, এ দেশে আমাদের নামে কলঙ্ক রেখে গেছে তা নয়, পশ্চিমের আরো অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালীর কুকীর্ত্তির কথা শুনতে পাওয়া যায় এবং সে সমস্ত কথা শুনে অধোবদন হ'তে হয়। কিন্তু আজ কাল অনেক ভাললোক পশ্চিমে গিয়ে আমাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেছেন এবং ভরসা আছে তাঁদের মহত্ত্বে আমরা ভবিষ্যতে এ সব দেশে বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়া বিশেষ গর্ব্বের কথা মনে ক'রবো।

শ্রীজলধর সেন।

আপেল আঘ্রাণে।

এ বিষয় বুঝিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে হে দর্শনের পথ-প্রদর্শক! আমি জানিতে বাসনা করি যে চৌর্য্য, মদ্যপান, ছলনা, অবিচার, প্রবঞ্চনা, অহঙ্কার, আত্মগর্ব্ব, কামপরবশতা, অসত্যানুষ্ঠান, হিংসাদ্বেষ এবং অজ্ঞতা ইত্যাদি যে সকল বিষয় সকল মনুষ্যই নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করে তাহাদের এক কথায় এমন কোন সংজ্ঞা আছে কি না যাহা দ্বারা সকল প্রকার দোষই বুঝায় এবং যাহা দ্বারা আমি অতীত ঘটনা হইতে আমার ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

আরিঃ—এই সকল দোষের অধিকারক অন্যায় ও অসত্যপরায়ণ এবং আত্মান্ধ। কারণ, সে যে বস্তু নিজের নহে তাহা পাইবার জন্য লালায়িত।

নিঃ—কিরূপে ?—

আঃ—তুমি কি দেখিতে পাওনা যে লোভ বা ক্রোধ পরবশ না হইলে কেহ এ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ? লোভ ও ক্রোধের উদয় হইলে জ্ঞানের সাম্য থাকে না। জ্ঞানের সাম্য না থাকিলে লোকে ঠিক পথে না যাইয়া ভুল পথে যায়। যে সোজা পথে না যায় সেই অন্যায় করে। অপরাধী যন্ত্রণাভোগ করে।

নিঃ—আপনি সমুদয় দোষকে একটী ভাবের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। গুণ গুলি-কেও কি সেইরূপ করিতে পারেন ?

আঃ—অন্যায় পথ ত্যাগ করাই ন্যায়—অসত্য ত্যাগ করাই সত্য। দোষের অপকৃষ্টতা যদি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে তাহা হইলে গুণের উৎকৃষ্টতাও সেই সঙ্গে অবশ্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দোষ ত্যাগই গুণ।

নিঃ—দোষ এবং গুণের মধ্যবর্ত্তী স্থান কিছু কি নাই? মন্দ না করিলেই কি ভাল করিব? তাহা না করিয়া মাঝামাঝি নিষ্কাম থাকিতে পারি না কি ? একজন মিথ্যা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে—তাহা সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা হয় না। একজন কোন মন্দ কার্য্য না করিতে পারে কিন্তু ভাল কার্য্যও ত' না করিতে পারে।

আঃ—দুই কারণে লোকে চুপ করিয়া থাকিতে বা কার্য্যে নিযুক্ত না হইতে পারে। যদি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য করে তবে তাহা মিথ্যা কার্য্য অন্যায় মন্দ। যদি সত্যকে প্রশ্রয় দেয় তবে তাহা সত্য স্বরূপ।

নিঃ—আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে আমার জীবনে যে কার্য্যই করি তাহা হয় মন্দ নয় ভাল এবং যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা উহাদেরই তুল্য। ঈশ্বর—যিনি আপনাকে জ্ঞানদান করিয়াছেন, তিনি আপনাকে রক্ষা করুন ও উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন! কোন পিতা সন্তানকে জীবদ্দশায় এতদপেক্ষা উত্তম-রূপে পালন করেন নাই এবং মৃত্যুর পরে এরূপ বহুমূল্য উত্তরাধিকারিত্ব রাখিয়া যান নাই।

আঃ—তুমি যদি তোমার প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া থাক তাহা হইলে এক্ষণে ক্রিটো-নকে কথা কহিতে দাও ; আমি দেখিতেছি ক্রিটন কথা কহিতে সমুৎসুক।

ক্রিঃ—আপনাকে এখন কথা কহানও কষ্টকর আর আমার আন্তরিক প্রশ্নগুলির মীমাংসা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া এখন চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর।

আঃ—যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু প্রাণ আছে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা গোপন করিও না।

ক্রিঃ—আপনি লিসিয়াসকে যে সকল কথা বলিলেন তাহা আমি শুনিয়াছি এবং লিসিয়াসের ন্যায় আমিও স্বীকার করিতেছি যে বর্ত্তমান হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ জানি-বার বাসনাই অধিক বলবতী।

আঃ—বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ের মধ্যেই আমি জ্ঞান ও অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কোন গুণাগুণ আছে বলিয়া জানি না।

ক্রিঃ—বর্ত্তমান সম্বন্ধেই যে জ্ঞান ও অজ্ঞানতা একমাত্র গুণাগুণ ইহা আমি এখন পর্য্যন্ত স্বীকার করি নাই, সুতরাং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্বন্ধে কিরূপে তাহা স্বীকার করিব আর যদিও আপনি বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমাকে উহা স্বীকার করিতে বাধ্য করান তথাপি বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি উহা বিশ্বাস করিব না।

আঃ—যে প্রমাণ দ্বারা বর্ত্তমান সম্বন্ধে তুমি উহা বুঝিতে পারিবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেই প্রমাণ দ্বারাই বুঝিতে পারিবে।

ক্রি—কি প্রমাণ?

আঃ—সক্রেটিস সত্য অন্বেষণোদ্দেশে যে, পথ বলিয়া দিয়াছেন তাহা কি তুমি যথার্থ বলিয়া বিবেচনা কর না?

ক্রি—কি পথ?

আঃ—সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, যখন কোন বিষয়ে তোমার চিত্তে দ্বিধা উপস্থিত হয়, তখন উভয় ভাবই একে একে প্রথম সত্য বলিয়া গ্রহণ কর ও অপর ভাবটী দ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা কর। একটী খণ্ডন হইলে যথার্থ সত্যটী প্রকাশিত হইবে।

ক্রি—হাঁ আমি দেখিয়াছি তিনি এইরূপে কঠিন সমস্যা স্থলে কার্য্য করিতেন। এখন আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকৃতি বিষয়ে কি প্রমাণ আছে?

আঃ—তুমি স্বীকার কর না কি যে সংসারে কেবল জ্ঞান ও অজ্ঞানতা এই দুই বস্তু আছে?

ক্রিঃ—অবশ্য স্বীকার করি।

আঃ—স্বীকার কর না কি উভয় বস্তুই তাহার অনুরূপ বস্তু যোগে বর্দ্ধিত হয় এবং বিপরীত বস্তু যোগে হ্রাস হয়?

ক্রি—অবশ্য করি!

আঃ—তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে জ্ঞানের পুরস্কার যদি তদনুরূপ বস্তু না হয় তবে অবশ্য তদ্বিপরীত বস্তু হইতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞানীর পুরস্কার মূর্খতা হয়। ভাল কর্ম্মের পুরস্কার অপকার, এইরূপ হইলে তাহা পুরস্কার না হইয়া বরং দণ্ড স্বরূপই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে সুতরাং উহার বিপরীত যুক্তিই যথার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। দেখিতে চেষ্টা করার পুরস্কার দৃষ্টি, ভাল কার্য্যের পুরস্কার শুভ, এবং জ্ঞানান্বেষণের পুরস্কার জ্ঞানলাভ।

ক্রিঃ—আপনি আমাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছেন যে জ্ঞান পুরস্কৃত ও অজ্ঞানতা দণ্ডিত হইয়া থাকে।

আঃ—এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে অজ্ঞানতা দ্বারা যে ফললাভ হয় তাহা জ্ঞানলাভের

বিপরীত ফল, যিনি জ্ঞান অন্বেষণ করেন তিনি জ্ঞানলাভের পুরস্কার চাহেন ও অজ্ঞানতার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করেন।

ক্রি। এ কথার সত্যতা আমি উপলব্ধি করিতে পারি কারণ আমিও অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইতে এবং জ্ঞানের পুরস্কার লাভার্থে জ্ঞানান্বেষণ করিতেছি। কিন্তু আমি যদি অস্বীকার করি যে অজ্ঞানতা দণ্ডিত ও জ্ঞান পুরস্কৃত হয় তাহা হইলে কি হইবে ?

আঃ—তুমি আমার সঙ্গে এই আলোচনা করিতেছ—কেন ? জ্ঞানলাভ ও অজ্ঞানতা-মোচন ভিন্ন কি ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ?

ক্রিঃ। জ্ঞানের উপকার লাভ করা ও অজ্ঞতার অপকার হইতে মুক্তিলাভ করাই আমার আলোচনার উদ্দেশ্য।

আঃ। তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিতেছ যে, জ্ঞান উপকারক ও অজ্ঞতা অমঙ্গল-জনক ? পুরস্কারেরও অর্থ উপকারক ও দণ্ডের অর্থ অপকারক।

ক্রিঃ। আমি স্বীকার করি, জ্ঞান জীবদ্দশায় উপকারক, কিন্তু মৃত্যুর পরে নহে।

আঃ। জীবনে জ্ঞানের উপকার কি ? উহা কি সুখময় জীবন না জ্ঞানলাভ সুখ ?

ক্রিঃ। জ্ঞানের মূল্য আমি স্বীকার করি এবং জ্ঞান যে পার্থিব সুখের বিঘ্নকারী তাও স্বীকার করি—তাহা হইতে বুঝা যায় যে, জ্ঞানের পুরস্কার পরজীবনে লাভ হয়।

আঃ। তুমি যদি পরজীবনে জ্ঞানের উপকারিতা অস্বীকার কর এবং ইহজীবনেও জ্ঞানের পুরস্কার না থাকে তাহা হইলে কোন জীবনে জ্ঞানের মূল্য থাকে না।

ক্রিঃ। যদি আমি জ্ঞান উপকারক বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে দেখিতেছি, আমার স্বীকার করিতে হয় যে, মৃত্যুর পর জ্ঞানের পুরস্কার লাভ হয়, সুতরাং আমি এখন অস্বীকার করিতেছি যে, জ্ঞান কোনরূপে উপকারক নহে।

আঃ—অন্ধতা বধিরতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি ও বুদ্ধি কি তোমার নিকট অধিক বাঞ্ছনীয় মনে হয় না ?

ক্রিঃ—হাঁ।

আঃ—কেন ? ইহাদের অন্তর্গত কোন উপকারের জন্য কি ?

ক্রিঃ—হাঁ—ইহাদের উপকারের জন্য।

আঃ—তাহা হইলে তুমি আবার স্বীকার করিতেছ যে, উপকার আছে এবং তাহা হইলে আমার অন্য কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

ক্রিঃ।—আমি বরাবরই জ্ঞানের উপকার এইরূপে স্বীকার করি যে, তাহা দ্বারা অজ্ঞতা বিনষ্ট হয় ও মন শান্তিসুখ লাভ করে কিন্তু তাহা ভিন্ন অন্য উপকার আমি কিছু জানি না।

আঃ।—ইহার পর অর্থাৎ আমরা এক্ষণে এই জীবনে যাহা দেখিতেছি, তাহার পর আর কিছু এমন জিনিস কি আছে যাহা ইহা হইতে বিভিন্ন ?

ক্রিঃ।—কি প্রমাণ আছে যে, এই ভিন্ন এমন কোন জিনিস আছে, যাহা মৃত্যুর পরেও জীবদ্দশার ন্যায় থাকে ?

আঃ।—মৃত্যু কি কেবল দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছিন্নতা নহে ?

ক্রিঃ।—তাহা ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

আঃ।—তাহা হইলে তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, ভবিষ্যতে আত্মা কিসের দ্বারা উপকার লাভ করিবে ? বর্ত্তমানে যাহা দ্বারা উপকার লাভ করিবে, ভবিষ্যতেও তাহা দ্বারা উপকার লাভ করিবে। এখনও যাহার দ্বারা ক্ষতি হইবে, ভবিষ্যতেও তাহার দ্বারা ক্ষতি হইবে।

ক্রিঃ।—আপনি আমার অস্বীকার করিবার কিছুমাত্র পথ রাখেন নাই যে ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান উভয়কালেই জ্ঞান, অজ্ঞতা ও উভয়ের ফল ভিন্ন আর কিছু নাই। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, এতদ্ভিন্ন আরও কিছু অন্য কেহ জানিতে পারে, যদিও আমি জানি না।

আঃ—প্রশ্নের পূর্ব্বে কি উত্তর দেওয়া সম্ভব ?

ক্রিঃ—না।

আঃ—যে সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় সে সম্বন্ধে মনে কোন ভাব উদয় না হইলে কি প্রশ্ন করা সম্ভব ?

ক্রিঃ—না।

আঃ—তুমি যা জিজ্ঞাসা করিলে সে সম্বন্ধে তোমার মনে যদি একটা পরিষ্কার ভাব থাকে তবে এই জ্ঞান অজ্ঞতা ও তাহার ফল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা হইতে তুমি তাহার উত্তর পাইবে। যদি তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা না জান, তবে তাহার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি।

ক্রিঃ—যথার্থ—ওরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় নাই এবং আপনি তাহার উত্তর দিতে বাধ্য নহেন। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি।

আঃ—তাহা হইলে সিমিয়াসকে এক্ষণে কথা কহিতে দাও।

সিমিয়াস—আমি লিসিয়াস ও ক্রিটোনের প্রশ্ন ও আপনার উত্তর শুনিয়াছি কিন্তু ক্রিটোনকে যে আপনি বলিলেন, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানে জ্ঞান অজ্ঞতা ও তাহার ফল ব্যতীত আর কিছু নাই এ কথাটার অর্থ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। এই তিনটী ছাড়া আর কিছুই নাই তাহা আমি কিরূপে জানিব ?

আঃ—তুমি কি আর কিছু আছে বলিয়া জান ?

সিমিয়াস—আমি জানি, আকাশ আছে, পৃথিবী আছে, পর্ব্বত আছে, সমতল ভূমি আছে, এতদ্ব্যতীত জলে স্থলে নানা পদার্থ আছে, ইহাদের প্রমাণ ব্যতিরেকে আমি জ্ঞান বা অজ্ঞতা বা তাহার ফল কিছুই বলিতে পারি না।

আঃ—আমার চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকে আমি হার্মেসের একটী যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা স্বীকার কর কি না?

সিমিয়াস।—কি বচন?

আঃ—হার্মেস বলেন যে, কোন বস্তুই তাহার অনুরূপ বস্তুর যোগ ব্যতীত বলাধিক্য লাভ করে না এবং বিপরীত বস্তুর যোগ ব্যতীত দুর্ব্বলতা লাভ করে না।

সিমিয়াস।—হাঁ—অভিজ্ঞতা দ্বারা সর্ব্বত্রই হার্মেসের এই বচনের সত্যতা দেখা যায়?

আঃ—তাহা হইলেই তুমি স্বীকার করিতেছ যে জ্ঞান অজ্ঞতা ও তাহার ফল ভিন্ন আর কিছুই নাই।

সিমি—কিরূপে?

আঃ—তুমি পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা এই পৃথিবীর বস্তু নহে।

সিমি—নিশ্চয়ই।

আঃ—তুমি জান কি যে দার্শনিকগণ এই পৃথিবীর বস্তু ত্যাগ করেন কেন?

সিমি—তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারেন যে এই সকল বস্তু তাঁহাদের জ্ঞানের বিরোধী ও অপকারক স্থতরাং তাহা ত্যাগ করেন।

আঃ—তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিতেছ যে যাহা জ্ঞানের অপকারক তাহা জ্ঞানের বিরোধী এবং জ্ঞানের যাহা বিরোধী তাহা অজ্ঞতা?

সিমি—আপনি যাহা বলিতেছেন অর্থাৎ এই সকল বিষয় জ্ঞানের বিরোধী তাহা পৃথিবীস্থ বস্তু সম্বন্ধে সত্য হইলেও আকাশ সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না।

আঃ—আকাশ আমাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে। যাহা দৃষ্টির বিরোধী তাহা জ্ঞানের বিরোধী।

সিমি—এ কথা বর্ত্তমান সম্বন্ধে সত্য কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে সত্য হইবে?

আঃ—ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের অনুরূপ অথবা ভিন্নরূপ হইবে?

সিমিয়াস—হাঁ।

আঃ—যদি অনুরূপ হয় তবে অনুরূপ বস্তুকে সাহায্য করিবে কি না? এবং অন্যরূপ হইলে তাহাকে বাধা দিবে কি না?

সিমি—আপনি ক্রিটোনকে যাহা যাহা বলিলেন তাহা আমারও এখন মানিয়া লইতে হইতেছে। কিন্তু প্লেটোর পুস্তকের একটী কথার অর্থ আমি এখন জানিতে ইচ্ছা করি। কথাটী এই—: "যাহা দ্বারা ভাল হয় তাহাই মন্দ নিবারণ করে কিন্তু যাহার দ্বারা মন্দ নিবারণ করে তাহাই যে ভাল তাহা নহে। যে সকল বস্তু দ্বারা মন্দ নিবারণ ও ভাল হয় দার্শনিক তাহা বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন কিন্তু যাহা দ্বারা মন্দ নিবারিত হয় অথচ ভাল হয় না এরূপ বস্তু অল্প পরিমাণে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।"

আঃ—প্লেটো বলিতেছেন যে যে বস্তু উপকার করে ও অপকার নিবারণ করে তাহাই দার্শনিকের উপযোগী। অর্থাৎ জ্ঞান মনকে আলোকিত করিয়া উপকার করে ও অজ্ঞানান্ধকাররূপ অমঙ্গল নিবারণ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি বহু পরিমাণে জ্ঞান লাভার্থে চেষ্টা করিবেন। যে বস্তু অপকার নিবারণ করে কিন্তু উপকার করে না যথা আহার ও বস্ত্রাদি—তাহা অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। কারণ এই সকল বস্তু যে পরিমাণে নিতান্ত আবশ্যক তাহাপেক্ষা মাত্রাধিক লইলে জ্ঞানের হানি করে। উপযুক্ত মাত্রা গ্রহণ করিলে ইহারা অপকার নিবারণ করে কিন্তু উপকার করে না কারণ ইহা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং ইহার অর্থ এই যে দার্শনিক অধিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবেন ও অল্পমাত্রায় আহারাদি পাইলে সন্তুষ্ট থাকিবেন।

সিমি—উভয় দ্বারাই যখন মন্দ নিবারিত হয় তখন উভয়ই কেন উপকারক নহে ?

আঃ—যাহা দ্বারা উপকার হয় ও যাহা দ্বারা মন্দ নিবারিত হয় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে একটী সর্ব্বত্রও সর্ব্বতোভাবে উপকারক। জ্ঞান যতই লাভ কর ততই উপকারক। কিন্তু যাহা দ্বারা মন্দ নিবারিত হয় তাহার মাত্রা অধিক হইলে তাহা অপকারক হয়। আহারাদি যে পরিমাণে মন্দ নিবারণ করে তাহার অধিক হইলে তাহা অপকার উৎপন্ন করে, সুতরাং একটী অপকার নিবারণকারক। আর একটী উপকারক।

সিমি—এই দুটী ভিন্ন আর কোন প্রকার কার্য্য আছে ?

আঃ।—আর একটী অপকারক। যাহা দ্বারা অপকার নিবারণ করে তাহা অতিরিক্ত হইলে অপকারক হয়। কার্য্য তিন প্রকার, উপকারক অপকারনিবারক ও অপকারক।

সিমি।—এ বিষয় শেষ হইয়াছে। সূর্য্যের আলোকে চক্ষু যেরূপ জ্ঞান লাভ করে আপনার উপদেশে আমার মন হইতে সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে। এখন আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে চক্ষু ও মনের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না ?

আঃ।—উহাদের মধ্যে গঠন বা উপাদানের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। উভয়ের কার্য্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তোমার যদি আর কথা না থাকে তবে ডায়োজিনিসকে কথা কহিতে দাও।

সিমিয়াস চুপ করিলেন, ডায়োজিনিস বলিলেন।—"আমি দেখিয়াছি যে, যে সকল দার্শনিকগণের মনশ্চক্ষু তীক্ষ্ণ তাঁহারা পরিমিতাচারী। এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে মিতাচারিত্ব ও অন্যান্য সৎগুণ কি মনশ্চক্ষুর উজ্জ্বলতা হইতে উৎপন্ন হয় ?

আঃ।—নানা প্রকার প্রবৃত্তি ও নানা প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি আছে। প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপরে একটী সৎবৃত্তি আছে যাহা দ্বারা ঐ প্রবৃত্তি দমন করা সাধ্যায়ত্ত। বিলাসিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা উভয়ে এক উপাদান নহে। যদিও উভয়েই অপকারক কিন্তু তাহাদের উপাদান স্বতন্ত্র। সেইরূপ উহাদের বিরোধী আত্মদমন ও জ্ঞান এই দুই এক বস্তু নহে। অথচ জ্ঞান ও আত্মসংযম পরস্পরের বিরোধীও নহে। বরফে ও জলে

যেরূপ সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য ও সাদৃশ্য আছে। জল ও বরফ এই দুয়ের একটী তরল ও সূক্ষ্ম, আর একটী কঠোর ও কঠিন। সেইরূপ আবার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অজ্ঞানতা, আর প্রবল ধার্ম্মিকতা ও প্রবল বিলাসিতা ইহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে। যদি কাহারো মিতাচারের দুর্ব্বলতা থাকে আর জ্ঞানশক্তি প্রবল হয়, তাহা হইলে সে বিবেচনাশক্তি দ্বারা ঠিক বুঝিতে পারে কিন্তু ব্যবহারে স্বভাবের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। সেইরূপ আবার যাহার বিবেচনাশক্তি কম অথচ স্বভাব উত্তম সে বিপরীত ভাব দেখায়। [ইহার অর্থ এই যে, আত্মসংযম ক্ষমতা আর জ্ঞানবৃত্তি এক বস্তু নহে; উহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য ও বিভেদ দুই আছে।]

ডাঃ।—জ্ঞান ও অজ্ঞতা ভিন্ন বিলাসিতা ইত্যাদি প্রবৃত্তি আছে, আপনি এখন তাহা স্বীকার করিতেছেন।

আঃ—তুমি কি বুঝিতে পারিলে না যে জল ও বরফ পরস্পরের তুল্যরূপ। বিলাসিতা ও অজ্ঞতাও সেইরূপ এক পদার্থ।

সি।—কি করিয়া আমি জানিব যে বরফ ও জলে যেরূপ সম্বন্ধ, বিলাসিতায় ও অজ্ঞতায় সেইরূপ সম্বন্ধ?

আঃ—জল ও বরফ উভয়েই উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না—বিলাসিতা ও অজ্ঞতা উভয়েই জ্ঞানহানিকারক।

ডাঃ।—এ বিষয় হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমাকে বলুন, কোন্ শাস্ত্র আলোচনা করা আমার কর্ত্তব্য।

আঃ—দর্শন আলোচনা করা ইহজগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহার পুরস্কারও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং দর্শন আলোচনা করাই কর্ত্তব্য।

ডাঃ।—দর্শন ভিন্ন সংসারে আর কোনরূপ জ্ঞান আছে কি না?

আঃ—সাধারণ লোকের এক প্রকার জ্ঞান সত্য ন্যায় দয়া বদান্যতা ইত্যাদি আছে কিন্তু জীবিত বস্তুর সহিত তাহার ছবির তুলনা যেরূপ, যথার্থ জ্ঞানের নিকট এই জ্ঞানও সেইরূপ। সাধারণের উক্ত সমুদায় গুণ কোন ফলদায়ক হয় না।

ডাঃ।—আপনি সাধারণের এই জ্ঞানকে নিষ্ফল বলিতেছেন কেন?

আঃ—সাধারণে যেরূপ অজ্ঞভাবে তাহা ব্যবহার করে সেইজন্য।—

ডাঃ।—সে কি রকম?

আঃ—তাহারা জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহার জানে না। তাহাদের জ্ঞান উপকার বৃদ্ধি হয় না তাহারা এমন লোককে দয়া করে যে তাহার দণ্ড হওয়া উচিত। এমন স্থানে কথা রক্ষা করে যাহাতে অন্যের সর্ব্বনাশ হয়। এমন লোককে দান করে, যে দান পাইবার অনুপযুক্ত। এমন সত্য কথা বলে যাহা অশ্লীল। সেইজন্য এই সকল সদ্‌গুণ

নিঃসন্দেহে তাহারা অপব্যয় করে। সুতরাং তাহাদের জ্ঞান বিবেচনাপূর্ণ মার্জ্জিত জ্ঞানের তুলনায় জন্তুর সহিত তাহার ছবির তুলনার ন্যায়।

ডাঃ।—আপনার তুলনার দ্বারা কিরূপে জ্ঞানীদিগের ও সাধারণের গুণ ব্যাখ্যা হয়?

আঃ—তুমি কি জান না যে, জ্ঞানই জীবন এবং অজ্ঞতা মৃত্যু।

ডাঃ—হাঁ—

আঃ—জ্ঞানী লোকের কার্য্য তাঁহার জ্ঞান দ্বারা জীবন্ত হয়। অজ্ঞ লোকের কার্য্য মৃত্যুলাভ করে।

ডাঃ।—তাহা হইলে তাহাদের সৎকার্য্য কুকার্য্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহে?

আঃ—না অধিক মূল্যবান নহে।

ডাঃ—কেন?

আঃ—তাহাদের মধ্যে যাহারা ভাল কর্ম্ম করিতে চাহে, অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা ভুল পথে যায়—যাহারা মন্দ কার্য্য করিতে চাহে, অজ্ঞতাবশতঃ তাহারাও ভুল পথে যায়। সুতরাং কেহই যথার্থ অভীষ্ট পথে যায় না।

ডাঃ।—এখন বুঝিয়াছি, কেন তাহাদের সৎগুণ অপব্যয় হয়। এখন আমাকে জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বুঝাইয়া দিন। কেন তাহা ব্যতীত কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না?

আঃ—যিনি ভাল বুঝিয়া মন্দ পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিয়াছেন এবং যিনি ভাল ইচ্ছা করিয়া মন্দ করিয়াছেন কিম্বা মন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানপথ চ্যুত হইয়াছেন।

ডাঃ।—এ কথা শেষ হইয়াছে এখন আমাকে বলুন প্রথম কাহার নিকট এই জ্ঞান সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়?

আঃ।—চক্ষু যেমন আলোক ভিন্ন দেখিতে সমর্থ হয় না সেইরূপ মানুষের মন বিনা শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ডাঃ।—কাহার নিকট হইতে দার্শনিকগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন?

আঃ।—ভিন্ন ভিন্ন কালে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রচারকগণ মানবজাতিকে উহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। প্রথম হার্মেসের নিকট দেবানুগ্রহে প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

ডাঃ।—কিরূপে হার্মেসের নিকট প্রকাশিত হয়?

আঃ।—হার্মেসের মনকে দেবতারা স্বর্গে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট এই জ্ঞান ব্যক্ত করেন। দেবতাগণ ঈশ্বরের নিকট প্রথম জ্ঞান পাইয়াছিলেন।

ডাঃ।—কিরূপে আমরা জানিব যে স্বর্গ হইতে হার্মেস এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

আঃ।—যদি জ্ঞান সত্য হয় তবে উপর হইতে আসিতে পারে।—সকল বস্তুরই নিম্নভাগ অপেক্ষা উচ্চভাগ উত্তমতর। উপরের জল নীচের জল চেয়ে পরিষ্কার, উপরের

বাতাস নীচের বাতাস অপেক্ষা পরিষ্কার, গাছের ফল গাছের অন্যান্য অংশ হইতে উৎকৃষ্ট, সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। সেই কারণে স্বর্গ হইতে আসিবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বস্তু জ্ঞান এবং আর এক প্রমাণ এই যে জ্ঞান সর্ব্ব বস্তুর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

ভাঃ—হে জ্ঞানের পথ প্রদর্শক, আমাদের মনান্ধকার দূর হইয়াছে। আমাদের মধ্যে এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিন যে পরে আমরা পরস্পরের সহিত বিরোধী মত না হই।

আঃ—তোমরা যদি আমার পথানুসারে চলিতে চাও ত আমার পুস্তক অনুসরণ করিও।

ভাঃ—আপনার এত পুস্তক আছে, কোন পুস্তক দ্বারা আমাদের মতের বিরোধিতা দূর হইবে, যদি কখন ভবিষ্যতে সেরূপ হয়?

আঃ—প্রথম বিজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে হারমেস সম্বন্ধীয় পুস্তক দেখিও। রাজনৈতিক বিষয় হইলে রাজনৈতিক আলোচনা সম্বন্ধীয় বই দেখিও। পদার্থ বিদ্যা হইলে পদার্থ বিদ্যার পুস্তক দেখিও। ভালমন্দ কার্য্য বিবেচনা করিতে হইলে নীতি পুস্তক দেখিও। কথা সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে হইলে ন্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় চারিখানি পুস্তক দেখিও।

আরিষ্টোটল এই পর্য্যন্ত বলার পর তাঁহার আত্মা অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিল, হাত হইতে আপেল পড়িয়া গেল। 'যিনি জ্ঞানীলোকের আত্মার রক্ষক তাঁহার হস্তে আমি আত্মা সমর্পণ করিতেছি' এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

শিক্ষা-সঙ্কট।

(২)

আমাদের এখনকার "শিক্ষা-প্রণালী" বলিলেই বুঝায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা। এণ্ট্রান্স হইতে এম-এ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষতঃ বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাতে। আর, একটা গুল্মকে সজোরে টানিয়া তুলিলে যেমন আশে-পাশে কতটা আল্গা মাটী উঠিয়া আসে, তেমনই এণ্ট্রান্সের বৎসর তিন চার আগে পর্য্যন্তও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিকার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য অতি কম। সেই জন্য বিশেষ করিয়া না বলিলে "শিক্ষা" শব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাই বুঝায়।

এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার উদ্দেশ্য ও অধিকার ভালরূপে নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য স্থির করা বিশেষ কঠিন নহে। যে আইনের দ্বারা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রস্তাবনায় পাওয়া যায় ;—

"For the better encouragement of Her Majesty's Subjects of all classes and denominations within the Presidency of Fort William in Bengal and other parts of India in persuit of a regular and liberal course of education, it has been determined to establish an University at Calcutta for the purpose of ascertaining, by means of examination, the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, Science, and Art, and of rewarding them".

ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লোকের উৎসাহবর্দ্ধন। আর, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য পরীক্ষা করা ও পরীক্ষার ফল-স্বরূপ উপাধি দেওয়া।

যে যে অংশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য-চ্যুতি হইতেছে, যে যে অংশে আয়ত্ত-উপায়-গুলির উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে না—তাহাই যথার্থপক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ন্যূনতা। নতুবা ব্রহ্মার সৃষ্টি-ভার বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় নাই যে, সে ওজনে উহার মাপ হইবে। বিচার পূর্ব্বক বিশেষরূপে দেখিলে ইহাই পাওয়া যায় যে, পরীক্ষার বিষয় স্থির করা, পরীক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করা ও উপযুক্তরূপে পরীক্ষা করাই বিশ্ব-বিদ্যা-লয়ের কার্য্য। বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আনুষঙ্গিকরূপে ছাত্রবৃত্তি দিতেও হয়। অতএব এই সকল বিষয়ের কোন একটার সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ত্রুটি থাকিলে তাহাই যথার্থ দোষের কথা।

কিন্তু এরূপ বিচার না করিয়া অনেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ-মারা লোকের কোন ত্রুটি বা ন্যূনতা দেখিলেই তাহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দোষ বলিয়া গণনা করেন। একবার ভাবিয়া দেখেন না যে ইহা বস্তুর দোষ কি আধারের দোষ। কতটা শিক্ষা-প্রণালীর দোষ ও কতটা "শিক্ষিত" ব্যক্তির দোষ—ইহার মীমাংসা না করিয়া যে কোন সিদ্ধান্ত কর না কেন তাহার দাম বড় বেশী হইবে না।—

ডুাক অভ্ ওয়েলিংটন বলিতেন ঈটন ও হারোর স্কুলের খেলিবার মাঠে ইংরেজগণ ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জিতিয়াছিলেন—এই কথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন যে, "আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কোন কর্ম্মের নয়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ওয়াটার্লু কেন পিটার্লুর যুদ্ধও জিতিতে পারেন নাই।" এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর-শৌর্য্যের অভাব মোচন অভিপ্রায়ে শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব

করেন, তবে তাঁহাকে কি বলিব? অগত্যা তাঁহার প্রতি বলিতে হয় যে, "মহাশয়, কোদালীর দ্বারা গাছ কাটা যায় না বলিয়া তাহার বাঁট বাড়াইবার বা তাহাকে অতিরিক্ত শাণিত করিবার প্রয়োজন কি?"

What's the good of adding
to the tail
When it's the head that
needeth mending?

এখানে হয় ত কেহ কেহ বলিবেন যে, নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য একটা কিম্ভূত কিমাকার আহাম্মকী সৃষ্টি করিয়া তাহাকে মারিবার প্রয়াস হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্মরণ রাখিবেন যে, কথাটা ঠিক বুঝিবার জন্য একটু বাড়াইয়া বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে—যদি মূল ঠিক থাকে।

শ্রীযুক্ত অনারেবল জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল অলঙ্কার। বাঙ্গালী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রভাবে কি হইতে পারে গুরুদাস বাবু তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল—এ কথা বলিলে বোধ হয় কোন অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন দোষ গুণ সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্তির যদি যথার্থ ধারণার এদিক ওদিক হয় তাহা হইলে শ্রদ্ধাবাহুল্যই সে কার্য্যের কারণ-আগে হইতেই ইহা বলা যাইতে পারে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধি চালনার (Originality) ক্ষীণতা কেন—ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গুরুদাস বাবু বলিয়াছেন যে, ইংরেজির ন্যায় দুরূহ বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া ইহার একটী প্রধান কারণ। এরূপ একটা ভাষা শিক্ষা করিতে অনুকরণেরই প্রয়োজন অধিক। এই অনুকরণপ্রিয়তা ক্রমশঃ এতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির উপর ইহার আধিপত্য জন্মে। আর যে বহুমূল্য বিদেশীয় বেশে ছাত্রদিগকে ভাব ভূষিত করিতে হয় তাহাতে তাহাদের পরিমিত মানসিক ভাণ্ডারের উপর এত টান পড়ে যে, ভাবকে পরিপোষণ করিবার সম্বল থাকে না। ছাত্র-বর্গের এই সঙ্কট হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায় মানসিক সম্বলের পরিমিত ব্যয় এবং ভাষার জাঁকজমক পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিচালনাতেই উদ্যম নিযুক্ত করা। এইরূপ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, মহৎ ভাব সাদাসিধা ভাষায় পরিহিত হইলেও মনোযোগ আকর্ষণে অকৃতকার্য্য হইবে না।*

গুরুদাস বাবুর এই মানস-পুত্রকে 'সাধনায়' † পোষ্য পুত্র গ্রহণের উদ্যোগ হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ দত্তক অসিদ্ধ। মাননীয় ভাইস্‌চান্‌সেলর যে উপদেশ

---

* Calcutta University Minutes for 1891—92, p—259.

† "সাধনা" চৈত্র, ১২৯৯ সাল, পৃঃ ৪৪৯।

দিয়াছেন, তাহা শিক্ষা-দায়িনী ভাষা নিরপেক্ষ হইয়াও থাটে। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য, ভাষা গৌণ একথা সকল অবস্থাতেই সত্য। রঞ্জনময়ী ভাষাসিদ্ধি অল্প সাধকেরই অদৃষ্টে ঘটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় ও উন্নতিকারক ভাবকে—ভাষায় অল্লাধিকার থাকিলেও লোকে আতিথ্য প্রদান করিতে সক্ষম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দিবার অযুক্তি গুরুদাস বাবু কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই। আর "সাধনায়" প্রকাশিত পত্রেও এ মর্ম্মে কোন কথা বলেন নাই ;—বাঙ্গালা ভাষা-শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। নিঃসঙ্কোচে বলা উচিত, উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু উপায় লইয়া মতভেদের স্থল আছে।

গুরুদাস বাবু বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষিত লোকের মধ্যে ওরিজিনালিটির ক্ষীণতার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই "সাধনা"-লেখকের নিকট বিশেষরূপে উপাদেয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় দাঁড়াইবে যে, ভাইস্‌চান্‌সেলর মহোদয় নিজের ঘাড়ে অযথা দোষ ভার লইয়া মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শিক্ষা-প্রণালী ওরিজিনালিটির অভাবের প্রধান কারণ কিনা এ কথার মীমাংসা করিবার জন্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে মাতৃ-ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া লোকের ভিতর ওরিজিনালিটির উদ্বোধ হইয়াছে কি না ?

য়ুরোপে নিউটন ও কোপর্ণিকস্ যে অপরিমেয় ওরিজিনালিটির পরিচয় দিয়াছিলেন ইহা আর কোমর বাঁধিয়া সপ্রমাণ করিতে হইবে না। কিন্তু ইঁহারা কি মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন—না, মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ?

বাঙ্গালী যদ্যপি কোন ওরিজিনালিটি দেখাইয়া থাকে তাহা কেবল এই কয়েকটি বিষয়ে—(১) যৌন-প্রণয়ীভাবে ঈশ্বরের উপাসনা (২) সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার (৩) সকল প্রকার উপাসনার অন্তর্নিহিত ঐক্য। এখন দেখিতে হইবে যে, যাঁহারা স্বাধীন প্রতিভাবলে এই সকল বিষয়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাঁহারা কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথমোক্ত বিষয়ের সূচনা দুইখানি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবত ও গীত-গোবিন্দ। ভাগবতের রচয়িতা বঙ্গ-সন্তান বোপদেব, ইহাই একরূপ সপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি কি সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে লেখাপড়া শিখেন নাই, না, জয়দেবের উজ্জ্বলগীতি বঙ্গ-ভাষায় রচিত ?

দায়ভাগকর্ত্তা জীমূত-বাহন যিনি এদেশে প্রথম ব্যক্তিগত অধিকারের প্রবর্ত্তয়িতা, তিনি কি সংস্কৃতের সাহায্যে শিক্ষা লাভ করেন নাই, না, তাঁহার ভাবপ্রকাশের উপায় সংস্কৃত ভাষা নহে ?

প্রথমতঃ রামমোহন রায় কর্ত্তৃক পৃথিবীর উপাসনার সুতন্ত্রিত ভাবে সাম্য প্রদর্শন

সাধিত হয়। তিনি কি প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ সাধারণ্যে বিদিত।

এই সকল আলোচনার ফল ইহাই দাঁড়ায় যে, মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিলে যে ওরিজিনালিটির লোপ হয় এমন কোন নিয়ম নাই। যদি সংশয় উঠে যে দু'চারি জন লোক মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকেও অসাধারণ প্রতিভাবলে স্বাধীন বুদ্ধি চালনার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলে ওরিজিনালিটির প্রচার বৃদ্ধি হইত না এমন কোন কথা নাই। এ শঙ্কা নিবারণের জন্য স্মরণ করাইতে হয় যে, কোন অবস্থাতেই ওরিজিনালিটি বায়ুর ন্যায় সুলভ নহে। আর ওরিজিনালিটি প্রচারের অনুকুল অবস্থা যে কি তাহা নির্ণীত করা একপ্রকার অসাধ্য। ওরিজিনালিটি নিয়মের অধীন নহে। ওরিজিনালিটি যখন সাধারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন তখন সাধারণে কি নিয়ম করিবে যাহাতে ওরিজিনালিটির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে পারে? ওরিজিনালিটির স্বভাবই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা।

এখানে আর একটা কথা বলিতে হইবে। য়ুরোপে অল্পকাল পূর্ব্বেকার পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রধানতঃ লাটিন ও গ্রীক শিক্ষা ছিল এবং লাটিনগ্রীক শিখিয়াই লোকে Scholar and gentleman হইত। তবে সে সময়ে Scholars and gentlemenদের অবস্থা আমাদের শিক্ষিত লোকের মত হয় নাই কেন?

আলোচ্য বিষয়ের এই গেল প্রথম অংশ। ইহার পর দেখা উচিৎ যে ইংরাজি শিক্ষার অধিকারের বহির্ভাগে কোন ওরিজিনালিটি এদেশে আছে কিনা। এ প্রশ্নের সকলেই যে নিষেধাত্মক উত্তর দিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। অনেকে প্রশ্নের অন্য উত্তর অসম্ভব বলিয়া প্রশ্ন করাই দোষাবহ বলিবেন। যথার্থ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত করিবার জন্যই প্রশ্নের অবতারণা।

এই আলোচনার ফল স্বরূপ বোধ হয় সকলেরই মনে এ ভাব উদিত হইবে যে, শিক্ষা প্রণালীর সহিত ওরিজিনালিটির ক্ষীণতার বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। ভালরূপ নজর করিলে আমাদের মধ্যে যে ওরিজিনালিটি একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ও গুরুদাস বাবুর হিন্দু-আইনের ব্যবস্থা স্থাপনে * যে ওরিজিনালিটির সম্পূর্ণ অভাব একথা বলিতে প্রস্তুত নই।

আর একটা কথা। যদিইবা আমাদের শিক্ষা-প্রণালী পরিত্যজ্য হয় তাহার আসনে কাহাকে বসাইবে? শিক্ষার্থীদিগকে এক-সমাননৈতিক-বন্ধনে রাখিয়া অতর্কিতভাবে তাহাদের চরিত্র সংগঠন করা যাহা ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য তাহা আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থায় অসম্ভব।

---

* পুত্রের বিধবা পত্নী শ্বশুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী—এ ব্যবস্থা গুরুদাস বাবুই প্রথমে স্থাপন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষা-বাহিনীভাষা করাও অযৌক্তিক। যে বিষয়ক বিদ্যা শিখিতে হইবে সে বিষয়গুলি স্বাধীনরূপে বহুকালযাবৎ বহুলোক কর্ত্তৃক যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং যেভাষাব্যবহারী লোকের মধ্যে সে বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিতেছে সেই বিদ্যা শিখিবার তাহাই ভাষা। নতুবা ভাষান্তরে সঙ্কলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে বিদ্যা শিখিতে গেলে গ্রন্থের মলাটদ্বয়ের ভিতরই জ্ঞান আবদ্ধ থাকিবে, তাহার আর চলৎশক্তি থাকিবে না। একজন বাক্য-চতুর অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য লোককে পণ্ডিত করা নহে তাহাদের হাতে জ্ঞানের সিন্ধুকের চাবিগুলি দেওয়া মাত্র। কিন্তু বাঙ্গলায় শিক্ষা দিলে দূর হইতে জ্ঞানের সিন্ধুক দেখাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আরও দেখা যায় যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার একটা সুবিধা এই যে ভাষাটা অযত্নলব্ধ হইলে শিক্ষা করিতে অনেক পরিশ্রম লাঘব হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা যদি অযত্নলভ্য হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা হইতেছে না বলিয়া খুঁৎখুঁৎ করিবার প্রয়োজন নাই। আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে ভাষার উপকার হইতে পারে, শিক্ষার্থীর উপকার অতি অল্প। তবে উপায় বিশেষ অবলম্বন করিলে যে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিবার পরিশ্রম কিছুমাত্র কমে না তাহা নহে। কিন্তু কথাটা অনেক বিশেষ বিধির দ্বারা সঙ্কোচ করিয়া বলিলে হয়।

আসল কথাটা এই যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে এমন একটা সময় আছে যখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অসম্ভব। যদি নিউটন ইংরেজিতে লিখিতেন এবং অপরাপর য়ুরোপীয় দেশে বরাবর নিজ নিজ ভাষারই প্রচার থাকিত তাহা হইলে য়ুরোপের উন্নতি যেরূপ ভাবে চলিয়াছে তাহা কখনই ঘটিত না। যখন দেশে অল্প সংখ্যক লোক মাত্র জ্ঞান চর্চ্চা করে ও অধিকাংশ লোক লেখা পড়ার ধার ধারে না তখন সেই অল্প সংখ্যক লোকের সহিত তদ্দেশীয় অপরাপর লোকের বুদ্ধিগত স্বজাতীয়ত্ব থাকে না। তখন সেই অল্প সংখ্যক লোককে বুদ্ধি-গত স্বজাতীয়দিগের ভাষা ব্যবহার করিতেই হয় নতুবা উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। যাহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান না হয় তাহাদের নিমিত্ত গ্রন্থাদি রচনা করা বা তাহাদের সহিত অন্যরূপ সাহিত্যিক ব্যবহার রাখা দয়ার কার্য্য মাত্র, কিন্তু দয়ার প্রণোদনে পরমার্থিক সাহিত্য ভিন্ন অন্য প্রকার সাহিত্য স্ফূর্ত্তির অবসর পায় না। সেই জন্য জাতীয় সাধারণ-বুদ্ধিগত উন্নতির মূলে পারমার্থিক উন্নতি দেখা যায়। ইহার অন্যথা হইলে পরিণত বয়স্ক লোকের নিয়ত শিশুর মধ্যে বাসের ফল উৎপন্ন হয়—উভয়েরই হানি। বাঙ্গালাদ্বেষী বাঙ্গালীর মনে যদি আর একটা আধ্যাত্মিক বেগ আসে তবে দেখিবে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা কত বাড়ে। বৈষ্ণবদিগের গান ও ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

বাঙ্গালীর বাহিরের বা বাড়ীর ব্যবহার যেমন এক নহে তেমনি বাঙ্গালীর ভিতর ও বাহিরের ভাষা এক নহে। আর যতদিন এইরূপ বাঙ্গালীর ভিতর বাহিরের ভেদ থাকিবে ততদিন বাঙ্গালীর ভাষাও দুই থাকিবে। বাঙ্গালী ভিতরের জীবনের তুলনায় বাহিরের জীবনের দাম ধরেন বেশী, তাই বাহিরের ভাষার দামও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে। তবে বাহিরের জীবন বিলুপ্ত হইলে ভিতর বাহির এক হইবে এবং বাহিরের ভাষারও দরকার থাকিবে না। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনের সহিত মহাপরিবর্ত্তন মৃত্যুর কোন বিশেষ নাই।

সে যাহাই হউক ইংরেজি ভাষার সাহায্যে শিক্ষা হইবার কি কোন কারণ আছে? একটা কারণ ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আর একটা কারণ এই যে, ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষা দিতে হইলে স্কুলের সংখ্যা অনেক বাড়াইতে হয়। বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালায় শিক্ষা, হিন্দুস্থানীর জন্য হিন্দীতে শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কলেজের প্রয়োজন। উপস্থিত ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এরূপ কার্য্য সাধিত হইবার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক ব্যয়াধিক্য। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য যাহা করিতেছেন প্রয়োজন থাকিলেও তাহার অধিক এখন আর প্রত্যাশা করা যায় না। এণ্ট্রান্‌স্‌ পরীক্ষায় একবেলা ইংরেজি ভাষা হইতে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হয়। ইহাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষার উপর অনেকটা দাম দেওয়া হইয়াছে, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ায় স্বার্থ আছে। তবুও যদি তাঁহারা দেশীয় ভাষার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ দেশীয় ভাষাকে নির্ব্বাসিত করেন তবে ইহার জন্য দায়ী কে? প্রধান দায়ী বাঙ্গালী সাহিত্যকার। তাঁহারা সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া লোকের হৃদয় আকর্ষণে সক্ষম হইলে কখনই এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। *

তবে এণ্ট্রান্সের পূর্ব্বে সাবধানে সুযোগমত দেশীয়ভাষায় শিক্ষা দিয়া যে সুকুমার বাল্য-জীবনের উপর পরিশ্রমের ভার লাঘব হইতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু অতি সাবধানে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে আমরা উন্নতির প্রবাহ হইতে সরিয়া না পড়ি—যাহাতে ডাঙ্গার ধারে একটা ঘূর্ণপাকে পড়িয়া না যাই। †

---

* শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর নাই—ইহা সত্যের অনুরোধে অস্বীকার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের গান আদর করেন না, এরূপ সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত বাঙ্গালী কয় জন আছেন?

† এ বিষয়ে লোকেন্দ্রনাথ বাবু ("সাধনা", মাঘ পৃঃ ৯৬) যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য-মূলক। অনেক বিষয়ে তাঁহার কথা অনুমোদন যোগ্য। তিনি প্রবন্ধারম্ভে যে বলিয়াছেন বর্ত্তমান শিক্ষায় প্রত্যাশিত ফলের "উল্টাই" প্রসব করিয়াছে—ইহা অনুমোদনীয় নহে। তবে তাঁহার প্রবন্ধের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে। আরম্ভের বাক্যটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ভ্রম হয়, এ কথা বলিতে হইবে।

আমাদের দেশে শিক্ষা সম্যকরূপে বলবতী না হইবার প্রধান কারণ এই যে, আমরা চোক থাকিতে কানা, কাণ থাকিতে কালা। এই যে জগতের বিচিত্র দৃশ্য ও শব্দ ইহার প্রতি আমাদের তিলমাত্র মনোযোগ নাই, এ অবস্থায় আমাদের শিক্ষায় আনন্দই বা কি হইবে, আর ভাবও ভাষার মিলনই বা কি হইবে? পরিপাকশক্তিরই যখন অভাব, তখন আর খাদ্যাখাদ্য কি? এই জগতটা কি, আমি কে, এইরূপ অনুসন্ধানের দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান সঞ্চয়ের সহকারী বলিয়াই গ্রন্থাদির আদর।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।

উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার আরম্ভে বালক বালিকাকে চোখ কানের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে আলোচিত প্রবন্ধস্তবকে বর্ত্তমান শিক্ষার যে সকল যথার্থ দোষ বর্ণিত আছে, তাহার অধিকাংশেরই নিরাকরণ হইতে পারে।

উপসংহারে একটী বক্তব্য আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আমি ভুল ধারণা-বশতঃ "সাধনা"-লেখকগণের কথাগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি অযথা প্রয়োগ করিয়াছি। ইঁহাদের লক্ষ্য নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। এ আপত্তি কতদূর পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত তাহার তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা আবশ্যক। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, চৈত্র মাসের "সাধনায়" প্রকাশিত পত্রগুলিতে এ "বিপরীত ধারণা" নিরাপত্তিতে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কুমন্ত্রণা। *

ফোটে ফোটে বুঝি যৌবনের ফুল
ফুটোনা ফুটোনা হয়োনা আকুল,
মলয় অনিল যাক্ না বহিয়ে
কোকিল পাপিয়া যাক্ না গাহিয়ে
জোছনা ঢালিয়ে মধুনিশি যাক,
ওরূপ যৌবন অফুটই থাক।

নিরাশার ঢেউয়ে সারা হোক্ অলি
তুই শুধু থাক্ সেই ফুল কলি,
আপন গরবে আপনাতে ঢলি,
চাহিয়া আপন হৃদয়ে কেবলি,

* গত বৈশাখ মাসের ভারতীতে "সরস বসন্তে হরষে গাঁথিয়ে" এই মুখপাতে যে গান বাহির হইয়াছিল। তাহার প্রত্যুত্তরে।

রাখ্‌লো লুকায়ে হৃদয়ের মধু,
—ফুটে ওঠে সবে ঝরিবারে শুধু!

তুই থাক্ চির কলিকাকুমারী
স্বপনে কাটুক্ দিবা বিভাবরী;
ফোট ফোট থাক ফুটোনা কখন
ফুটিলেই জেনো টুটিবে যৌবন,
অনাদর আর হেলাফেলা শুধু,
ফিরে না চাহিবে ভ্রমর বঁধু।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

একটী পল্লী কাহিনী।

হরিচরণের ত্রিশ ও তাঁহার স্ত্রী নিস্তারিণীর বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি না হওয়াতে যদিচ তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত বোধ হইত না কিন্তু পাড়ার পাঁচজন স্ত্রীলোক সায়ংকালে গৃহকর্ম্ম সারিয়া বিশ্বেশ্বর দত্তর বাড়ীতে একত্র যুটিলেই দেখা যাইত তাঁহারা হরিচরণের আশুবংশ রক্ষার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, দুই একজন এজন্য হরিচরণের দ্বিতীয় দারগ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধেও নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; এবং সে কথা যে হরিচরণের কাণে গেল না এমন নয়। কিন্তু ইংরেজী না জানিলেও কালধর্ম্মে হরিচরণের মতামত কিছু আধুনিক রকমের হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সে পল্লীমহিলাগণের এই অযাচিত উপদেশ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল না। সুতরাং হরিচরণের স্ত্রৈণ অপবাদ রমণীমহলে কিছু প্রবল মাত্রায় ঘোষিত হইল, নিস্তারিণীর রূপগুণও এই সমালোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না। নিজের বক্ষে সন্তানের স্পর্শসুখ লাভ করিতে না পারিয়া সে পাড়াপরশীর প্রতি যে অপরাধ করিয়াছিল সে ত্রুটী অবশেষে সংশোধিত হইল, তাহার আরো দু'বৎসর কাটিয়া গেলে হরিচরণের একটী নবকুমার ভূমিষ্ট হইল। পুত্রের নামকরণ লইয়া অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বদিন রাত্রে সেই দম্পতির মধ্যে বিষম তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। অবস্থা খারাপ হইলেও নামটা জাঁকাল হইতে কিছু আপত্তি নাই, কাজেই হরিচরণের আন্তরিক ইচ্ছা পুত্রের নাম রাখিবে "নৃপেন্দ্রকুমার" কিন্তু অনেক দুঃখের পর পুত্র হইয়াছে বলিয়া নাপ্‌তিনি ঠাকুরঝির পরামর্শমত পুত্রের নাম "দুঃখীরাম" রাখে ইহাই হরিচরণ পত্নীর সংকল্প, তাহার সে সংকল্প বিচলিত করা হরিচরণের পক্ষে অসম্ভব হইল, কাজেই পুত্রের নাম "দুঃখীরাম"ই থাকিল।

কবিগণ পূর্ব্বাপরই শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় শিশুদিগকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন,

দুঃখীরামের পক্ষেও অবশ্য ভিন্ন রকম ব্যবস্থা হইল না, আট মাসেই দুঃখীরাম 'হুঁ হাঁ' করিতে শিখিল। এ দিকে হরিচরণের একবৃদ্ধা পিসি ছিল, সে অনেক কালের বুড়ী, কিন্তু তথাপি বেশ শক্ত সমর্থ; তবে বুড়ীর একটা বৃহৎ দোষ ছিল, সে কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কি পরের সুখে সুখ বোধ করিতে জানিত না, এমন কি শোক দুঃখে কিরূপ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হয়, সেটাও তাহার অজ্ঞাত ছিল। পাড়ার কোন বাড়ীতে কোন একটা আনন্দ উৎসব হইলে গ্রামস্থ প্রায় সকলকেই সেখানে দেখা যাইত, কেবল বৃদ্ধা সেদিকে ঘেঁসিত না। আবার কাহারো বাড়ী কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, যদি পাড়ার লোকের পর্য্যন্ত চোখের জল পড়িত তবু বৃদ্ধা সেদিকে ফিরিয়া চাহিত না, হয়ত গোলমাল শুনিয়া একবার কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত "ওদের বাড়ী কি হয়েছে গা?"—তার পর আর ভ্রুক্ষেপ নাই, আপন মনে বকিতে বকিতে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। এই সমস্ত কারণে গ্রামস্থ বালক বৃদ্ধা সকলেই তাহাকে ডাইনী মনে করিত; ছেলেমেয়ের দল তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যাইত, ছেলের মায়েরা দেখিলে সরিয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু বৃদ্ধার বিশেষ অপরাধ ছিল না। মানুষের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসেরও একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স এবং অবসর আছে—তা সে কি সুখেরই কি দুঃখের উচ্ছ্বাস—বৃদ্ধা সে বয়স এবং সে অবসর অতিক্রম করিয়াছে। যে সুখ এককালে তাহার সত্য ছিল, আজ তাহা স্বপ্নের মত মিথ্যা হইয়া পড়িয়াছে। একে একে স্বামী ও পুত্র-কন্যাগুলি যমের হাতে সমর্পণ করিয়া সে এখন জড় হৃদয়ে নূতন অনির্দ্দিষ্ট জগতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভবের উপকূলে বসিয়া রহিয়াছে। এই ভাবী আশুমহাপ্রয়ানই যাহার জীবনের এখন একমাত্র সত্য, তাহার চারিপার্শ্বের সংসারের জীবনস্পর্শ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু সংসার না পারুক এতটুকু শিশু দুঃখীরাম বড় গোল বাধাইল।

হরিচরণের পত্নীর শিশুপালনে তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকায় সে তাহার পিসির-কোলেই বেশী মানুষ হইতে লাগিল। বৃদ্ধার কোলে তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন এক জীর্ণ, শুষ্ক, অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষ শাখায় একটি নবীনপল্লব মুঞ্জরিত হইয়াছে।

শরতের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে যখন সমস্ত আকাশ ও সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইত ও পল্লী-গ্রামের কুটীর, বাঁশবন, ছোট ছোট পুকুর এবং জঙ্গলাবৃত আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথগুলি ছবির মত স্থির ও সুশোভন দেখাইত তখন বৃদ্ধা হরিচরণের সেই শিশুটি কোলে করিয়া গৃহদ্বারে বসিয়া তাহাকে চাঁদ দেখাইত ও দোলাইত। তখন বহুকালের একটা প্রাচীন সুপ্তস্মৃতি অল্পে অল্পে বৃদ্ধার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া—ঈষৎ বায়ু-প্রবাহে তরঙ্গহীন সরোবরের মৃণালান্দোলনের ন্যায় তাহার অসাড় হৃদয়েও কিঞ্চিৎ আলোড়ন উপস্থিত করিত।

নদীতীরে গঞ্জ, সেই গঞ্জে হরিচরণের একখানি দোকান ছিল। প্রায় সমস্ত দিনই

হরিচরণকে দোকানে থাকিতে হইত, কিন্তু দুঃখীরাম যখন চারি বৎসরের হইল, তখন সে বাড়ীতে মা ও দিদির কাছে আর কিছুতেই থাকিতে চাহিত না; সুবৃহৎ বকুলগাছের ফাঁক দিয়া হরিচরণের গৃহপ্রাঙ্গনে প্রভাত-সূর্য্যের মৃদু আলোক পতিত হইলে এবং অদূর-বর্ত্তী শিমুলগাছে পাখীরদল হর্ষকোলাহল আরম্ভ করিলে—দুঃখীরাম আর বাড়ীতে দাঁড়াইত না, মার কাছ হইতে ছোট নীলাম্বরী কাপড়খানি পরিয়া লইয়া, এক পয়সা দামের প্রথম-ভাগখানি হাতে লইয়া, গ্রাম্যপথ বাহিয়া—সেই গঞ্জে বাপের দোকানে চলিয়া যাইত। সেই সহর্ষ শিশুর কোমল পাদস্পর্শে পথের ধূলিরাশি পর্য্যন্তও যেন সজীব হইয়া উঠিত। সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিলে গৃহমধ্যস্থ মৃৎপ্রদীপের সম্মুখে বসিয়া কখন কখন সে তাহার প্রথমভাগ খুলিয়া গা দোলাইতে দোলাইতে 'ক'য়ে করাত, 'খ'য়ে খরা পড়িত। সেই সময় বকুলগাছের ঘন পাতার ভিতর হইতে একটা কোকিল 'কু—উ' করিয়া ডাকিয়া উঠিলেই সে তাহার শত প্রতিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিয়া তুলিত, এবং তাহার পিতা সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেই গৃহদ্বারে সমাগত হইলে বালক একমুখ হাসি লইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিত। সেই হাসি, সেই আদর তাহার পিতার সমস্তদিনের ক্লান্তি বিদূরিত করিয়া তাহার শ্রমক্লিন্নদেহে নব-প্রাণের সঞ্চার করিত।

এইরূপে হরিচরণের নিস্তব্ধ গৃহপ্রাঙ্গণ বহুদিন পরে শিশুর উজ্জ্বল হাসি ও মধুর কল-রবে আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তাহার বৃদ্ধা পিসি পৃথিবীর সহিত নূতন করিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। এই বিধবার হৃদয়-নিভৃতে যে স্নেহ বহুকাল নিরাশ্রয়ে যাপন করিতেছিল তাহা এই শিশুর উপর নির্ভর করিয়া আবার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইবার উপক্রম করিল, এবং যে একদিন ভাবিয়াছিল পৃথিবীতে তাহার কাজ অনেকদিন শেষ হইয়াছে এখন যে কয়দিন তাহার চক্ষু হইতে সূর্য্যালোক অপসারিত না হয় সে কয়দিন কোন রকমে কাটাইয়া দিবে সে আবার মায়ার বন্ধনে পড়িয়া হরিচরণের শিশুটিকে মানুষ করিতে লাগিল।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে বলিতে পারে?—দুঃখীরাম পাঁচ বৎসরের হইলে বৈশাখ মাসের একদিন তাহার ওলাউঠা হইল; এবং তিন দিন মাত্র ভুগিয়াই সে ইহলোকের এই সংক্ষিপ্ত পর্য্যটন শেষ করিয়া চলিয়া গেল। এ তিন দিন বৃদ্ধা একবারো তাহাকে বুকে হইতে নামায় নাই—পাছে আর তাহাকে বুকে না পায়; সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রাহীন চক্ষু ব্যাকুল ভাবে সেই শিশুর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং যখন দুঃখীরাম তাহার শুষ্ক ওষ্ঠ অল্প নাড়িয়া নিতান্ত ক্ষীণস্বরে বলিত "দিদি, জল?" তখন নিতান্ত আগ্রহ ও সতর্কতার সহিত সে তাহার মুখে দুই এক ঝিনুক জল ঢালিয়া দিত! কিন্তু পিতা মাতার অজস্র চেষ্টা, চিকিৎসকের পর্য্যাপ্ত যত্ন এবং এই অনন্যহৃদয়া বৃদ্ধার একান্ত স্নেহের টানও কিছুতেই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

বৈশাখ মাস, মধ্যাহ্নকাল—সূর্য্য মাথার উপর অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে, পথে জন মানবের সাড়াশব্দ নাই, দীর্ঘপথ খাঁ খাঁ করিতেছে এবং দুই একটা দমকা বাতাসে ধূলি উড়িয়া পথের ভীষণতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। দূরে বাঁশ বনে একটা ঘুঘু অতি করুণস্বরে ডাকিতেছে, ঘন আমবাগানের ভিতর হইতে একটা চাতকও এক একবার 'ফটিক জল' বলিয়া এই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আপনার কাতর প্রার্থনা প্রকাশ করিতেছে।

এমন সময় একটি বৃদ্ধা গ্রাম্যপথ বাহিয়া নদীর দিকে যাইতেছিল; সেই প্রখর রৌদ্র বোধ করি তাহার শরীরে লাগিতেছিল না, লাগিলে সে একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত;—পথের অগ্নিতুল্য বালুকারাশি বোধ হয় তাহার পদতল দগ্ধ করিতে পারে নাই, পারিলে সে এ পথ দিয়া এত সহজে চলিতে পারিত না।

বৃদ্ধার শরীর দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় মলিন ও নীরস, মুখ শ্মশানের মত বিবর্ণ ও নৈরাশ্য ব্যঞ্জক। এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে জনহীন পথে তাহাকে একাকী চলিতে দেখিয়া মনে হয় বুঝি একটি শব সমাধি হইতে উঠিয়া আসিয়া কোন অভিপ্রেত স্থানে চলিয়াছে।

পথে একটা বড় অশ্বথ গাছ আছে। সকালে দোকানে আসিবার সময় দুঃখীরাম এই বৃক্ষতলে অনেকক্ষণ খেলা করিত, কখন কখন স্থানে স্থানে ধূলিরাশি স্তুপাকার করিয়া রাখিত এবং দৈবাৎ তাহার দিদি সেখানে আসিলে সে অশ্বথ গাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহার সহিত কৌতুক করিত। আজও ধূলিরাশি তেমনি সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার উপর তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। বৃদ্ধা এখানে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল, আশাপূর্ণ হৃদয়ে একবার এ দিক ও দিক চাহিল, যদি দুঃখীরাম গাছের আড়াল হইতে তাহার হাসিমাখা মুখখানি বাহির করিয়া সকৌতুকে বলে "দিদি, টু—উক।"

বেশীক্ষণ বৃদ্ধার ভ্রম রহিল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে চৈতন্য হইল, সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং নিতান্ত কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল "দাদা আমার পিত্তিদিনই এই পথ দিয়ে আনাগোনা কর্ত্তো, আর আস্‌বে না রে আর আস্‌বে না।"

বৃদ্ধার অন্তস্তলভেদী এই কথা কয়টী একজন পথিকের কর্ণে পৌছিল। ঘটনা কিছু না জানিলেও বৃদ্ধার রুদ্ধ যন্ত্রণা কতক বুঝিতে পারিয়া সে করুণার্দ্র হৃদয়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর সে যে কয় দিন বাঁচিয়াছিল, কেহ তাহার মুখে কোন কথা শুনিতে পায় নাই। চক্ষু মুদিয়া সে এক কোণে পড়িয়া থাকিত, কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বায়ুর সহিত মিশিত এবং কদাচ তাহার জ্যোতিহীন চক্ষু উন্মীলিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া যেন কাহাকে না দেখিতে পাইয়া আবার হতাশ ভাবে রুদ্ধ হইত।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত "ভারতীতে" মৃণ্ময়ীর যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত হয় নাই সত্য কিন্তু উহাতে স্থানে স্থানে ভ্রম বশতঃ সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মৃণ্ময়ী-লেখক ও সমালোচক উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমি তাহার প্রতিবাদে যত্নশীল হইব।

অপূর্ব্ব বাবু লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্পর্কে তাহা (উন্নতিলাভ) বলিতে গেলে বাতুলতা প্রকাশ হইবে।" ইহা অতি যথার্থ কথা। বর্ত্তমান ইউরোপের সূক্ষ্মগণিতসাধিত জ্যোতির্ব্বিদ্যার নিকট আমাদের ভারতবর্ষের পুরাতন জ্যোতিষ সমান স্থান অধিকার করিতে পারে না। তাই বলিয়া হিন্দুজ্যোতিষী যে সূক্ষ্ম গণনা করিতে অপারক ইহা কখন বলিব না। মহারাজ জয়সিংহ অনেক ইউরোপীয় ও পারসীক জ্যোতিষীর গণনা সংশোধন করিয়াছিলেন। এবং বর্ত্তমান সময়ে ৮ বাপুদেব শাস্ত্রী পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু শিরোমণির সহিত ইউরোপীয় জ্যোতিষের অনৈক্য সহসা অসত্য বলিয়া খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি উভয় জ্যোতিষের মর্য্যাদা এবং তুলনায় যে জ্ঞানোদ্দীপন হয় ইহা বেশ বুঝিতেন।

অপূর্ব্ব বাবু ইউরোপীয় জ্যোতিষ যেমন মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই প্রকার যদি আমাদের পুরাতন জ্যোতিষ তাঁহার অধীত থাকিত তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান সমালোচনায় ইউরোপীয় জ্যোতিষের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, কেন না, ইউরোপীয় জ্যোতিষ যে দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে ইহা কে না জানে?

অপূর্ব্ব বাবু লিখিয়াছেন, "বেণ্টলি যে সকল যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই সকল যুক্তি খণ্ডন না করিলে কেবল গালি দ্বারা তাঁহাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না।" অবশ্য বেণ্টলিকে গালি দেওয়া উষ্ণশোণিত দেশহিতৈষীর কার্য্য; এ কার্য্যের প্রশংসা আমরা করি না। অপূর্ব্ববাবু তৎপরেই লিখিয়াছেন, "হিন্দুজ্যোতিষের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণার্থে তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া কিম্বা অপর কোন স্বসাধিত মত প্রতিপাদন করেন নাই বলিয়াই বেণ্টলির মত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" ইহা ঠিক নহে। কোলব্রুক সাহেব বেণ্টলির লেখার তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া Asiatic Researches এ প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অপূর্ব্ব বাবু Royal Society of Great Britain এর Library তে কোলব্রুকলিখিত প্রবন্ধ না দেখিয়াই ওপ্রকার মত প্রকাশ করিলেন। অপূর্ব্ব বাবুর অবগতির নিমিত্ত আমরা বলিতে বাধ্য যে উক্ত সোসাইটী বহুকাল হইতে ভারতীয় জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধের প্রতি কুসংস্কারবশীভূত

(prejudiced) হইয়াছেন সেইজন্য Brennand সাহেব প্রেরিত প্রবন্ধ তাঁহারা পত্রস্থ করেন নাই। Elphinstone সাহেব তাঁহার ইতিহাসে বেণ্টলির হঠকারিতার নিন্দা করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেব হিন্দুদের প্রাচীন জ্যোতিষবিষয়ক পুস্তক পর্য্যালোচনা করিয়া হিন্দুজ্যোতিষের প্রাচীনতাবিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন সেইগুলিই আমার মূলভিত্তি, এ প্রবন্ধে আমার নিজস্ব কিছু নাই।

অপূর্ব্ব বাবু আর্য্যভট্টের সময়নির্দ্ধারণ বিষয়ে লিখিয়াছেন, "আর্য্যাষ্টশতক গ্রন্থের স্থলবিশেষে দৃষ্ট হইয়াছে যে, আর্য্যভট্ট তথায় স্বীয় আবির্ভাবকাল যুধিষ্ঠির শকের ষোড়শ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" আমি আর্য্যাষ্টশতক কখন দেখি নাই সুতরাং এ বচনের সত্যাসত্যের বিষয় তর্ক করিতে পারি না। তবে যুধিষ্ঠির অব্দকে কলিগত কাল বলা হইয়াছে সে বিষয়ে আমার ঘোর আপত্তি আছে। তাহা ক্রমে লিখিতেছি।

অপূর্ব্ব বাবু যুগপদাঃ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর্য্যসিদ্ধান্তোদ্ধৃত বচনের এই অর্থ হইবে—"পৃথিবীতে আমার জন্মগ্রহণ করিবার পর (৬০+১৫+২০=) ৯৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। যুগ অর্থে ১২ বৎসর, ইহা বৃহস্পতি-বৎসরের পরিমাণ। যুগপদ অর্থে যুগের চতুর্থাংশ অর্থাৎ তিন। এই প্রকার যুগপদাঃ ৬০ বৎসরে ৫টী হয়, অর্থাৎ "তত্র যেচ যুগপদাঃ" অর্থে ১৫০ বৎসর হয়। এস্থানে বেশ প্রকাশ হইতেছে যে, আর্য্যভট্ট স্বয়ং আর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার ৯৫ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন কিন্তু গ্রন্থখানি তাঁহার রচনাপ্রসূত কি না, পুস্তক না দেখিয়া সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আর্য্যভট্ট ভারতবর্ষের কোপর্নিকস ও গ্যালিলিও উভয়ই ছিলেন, তিনি পাশ্চাত্য কোপর্নিকসের ন্যায় যেমন পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণন প্রকাশ করিয়াছেন তেমনই গ্যালিলিওর ন্যায় পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণও প্রকাশ করিয়াছেন। মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকার শেষোক্ত মতের প্রমাণ দিতে ভুলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার এবং অপূর্ব্ব বাবুর অবগতির জন্য আমি ৺ বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রাচীন "জ্যোতিষাচার্য্যাশয় বর্ণনং" নামক গ্রন্থ হইতে আর্য্যভট্টের সূর্য্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণবিষয়ক মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্চাত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলনিভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥"

অর্থাৎ নৌকা অগ্রবর্ত্তী গমন করিতেছে, কিন্তু আরোহী পৃথিবীকে পশ্চাৎ-ধাবিতা দেখিতেছেন। সেইরূপে নক্ষত্রমণ্ডল স্থির কিন্তু লঙ্কাবাসীর বোধ হয় যেন তাহারা (নক্ষত্রগণ) পশ্চিম দিকে গমন করিতেছে। অর্থাৎ পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে গমন করিতেছে। আর্য্যভট্টের এই বচন এবং অপূর্ব্ববাবুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত "ভূপঞ্জরঃ" ইত্যাদি বচন লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ মহা তর্কবিতর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত উক্ত উভয় মত খণ্ডনার্থে লিখিতেছেন—

"প্রাণেনৈতিকলাং ভূর্যদিতৎকুতো ব্রজেৎ কামধ্বানম্॥
আবর্ত্তমান মুর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ॥"

যদি বল প্রাণসময়ে পৃথিবী এক কলা গমন করে ত কোথায় যায় ও পথই বা কোথায়? এবং যদি বল পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছে, তাহা হইলে পর্ব্বতাদি উচ্চ বস্তুগুলি কেন পড়িয়া যায় না? লল্লাচার্য্য লিখিতেছেন—

যদি চ ভ্রমতি ক্ষমা তদা।
স্বকুলায়ং কথমাপ্নুয়ুঃ খগাঃ
ইষবোঽভিনভঃ সমুজ্ঝিতাঃ।
নিপতন্তঃ স্যুরপাং পতের্দ্দিশি॥
পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমেদ্‌ভুবো।
বরুণাশাভিমুখে ব্রজেদ্ ঘনঃ।
অথ মন্দগমাৎ তথাভবেৎ
কথমেকেন দিবা পরিভ্রমঃ॥

যদি বল পৃথিবী সূর্য্যের কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে পক্ষিগণ কি করিয়া নিজ নীড়ে আগমন করিতেছে। আকাশ অভিমুখে পক্ষিগণ নিক্ষিপ্ত হইলে পশ্চিমদিকে গিয়া পতিত হইত। পূর্ব্ব দিকে পৃথিবী গমন করিতেছে, মেঘ পশ্চিম দিকে গমন করিতেছে (সুতরাং প্রবহ বায়ু পূর্ব্বদিকের প্রতিকূলে) অতএব মন্দগমনপ্রযুক্ত এক দিনে পৃথিবীর পরিভ্রমণ কি করিয়া সিদ্ধ হইতেছে। পৃথিবীর পরিচ্ছদ বায়ু যে তাহার একাঙ্গীভূত ইহা লল্লের জ্ঞানের অগোচর ছিল।

শ্রীপতি লিখিতেছেন—

যদ্যেবমম্বরচরা বিহগা স্বনীড়ম্।
আসাদয়ন্তি ন খলু ভ্রমণে ধরিত্র্যাঃ।
কিঞ্চাম্বুদা অপি ন ভূরি পয়োমুচঃ স্যুঃ
দেশস্য পূর্ব্বগমনেন চিরয়াঽস্ত॥
ভূগোলবেগজনিতেন সমীরণেন
কেত্বাদয়োঽপ্যপরদিগ্‌গতয়ঃ সদা স্যুঃ
প্রাসাদভূধরশিরাংস্যপি সংপতন্তি
তস্মাদ্ ভ্রমত্যুড়ুগণঃ স্বচলাচলৈব॥

পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিলে আকাশবিহারী পক্ষিগণ কখন নিজ নীড়ে আসিতে পারিবে না এবং মেঘগণও একস্থানে অধিক বারিদানে বঞ্চিত হইবে, যেহেতু দেশগুলি ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছে। পৃথিবীর ভ্রমণবেগোৎপন্ন বায়ুদ্বারা কেতু আদি সর্ব্বদা পশ্চিমগামী হইবে এবং প্রাসাদ ও পর্ব্বতচূড়া পতিত হইবে। অতএব নক্ষত্রগণ

ভ্রমণ করিতেছে, অচলা অচলাই আছেন। পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় দেখিলে অপূর্ব্ব বাবু বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, আর্য্যভট্ট উভয় মত প্রকাশ করিয়া জ্যোতিষীগণের তর্কীভূত হইয়াছেন।

অপূর্ব্ববাবু যুধিষ্ঠির অব্দ ও কলিগত অব্দকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন যুধিষ্ঠিরাব্দ ও কলিঅব্দ এক সময়ে প্রচারিত হয়। চালুক্যরাজ পুলকেশীর তাম্রশাসনে এই প্রকার লিখিত আছে (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিত শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব বিষয়ক প্রবন্ধ দেখুন—জন্মভূমি ১২৯৯) ভাগবতাদিপুরাণেরও এই মত। আবার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যুধিষ্ঠিরাব্দ ১০৭৫ কল্যব্দে আরম্ভ হয়। (১২৯৮ সাল পৌষ জন্মভূমি "পুরাবৃত্তং" দ্রষ্টব্য)"মুরারেস্তৃতীয়ঃপন্থা" অবলম্বন করিয়া তর্করত্ন মহাশয় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ শকাব্দার ২০২৬ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। বরাহের মতই রাজতরঙ্গিণীর মূলভিত্তি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বরাহের গণনাই ঠিক। বরাহ বলিয়াছেন—

আসন মঘাস্বমুনয়ঃ শাসতিপৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিচ্‌পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সময় জানিতে হইলে শকে ২৫২৬ যোগ করিতে হয়। ইহাই মুখ্য অর্থ। তর্করত্ন মহাশয় শেষ পদে "তস্য রাজ্ঞশ্চ" লিখিয়া ইহার গৌণ অর্থ করিয়াছেন—"যুধিষ্ঠিরের শককাল ২৫২৬ বৎসর অর্থাৎ তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দ ২৫২৬ বৎসর চলিয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ গ্রহণ করিতে হইলে, "যুতঃ" বেচারা বেখোরে মারা যায়। যুতঃ তুলিয়া দেবার যো নাই—আর্য্যাছন্দের মুণ্ডপাত হয়। যুতঃ স্থানে মিতঃ না রাখিলে কোনমতেই তাঁহার যুক্তি স্থির থাকে না। তর্করত্ন মহাশয়ের মতে বরাহের সময় ৪২১ শকাব্দ, তাঁহার সময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল, সুতরাং যুধিষ্ঠির শকের ২১০৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০৭৫ কল্যব্দে প্রাদুর্ভূত হন। এবিষয়ে তিনি ভাগবতের প্রমাণও নির্দ্দেশ করেন কিন্তু ভাগবত এ প্রকার কোথাও লেখেন নাই তাহা প্রদর্শন করিতেছি। ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে লিখিত ভবিষ্যৎ-বর্ণন অধ্যায়ে লিখিত "তদা প্রবৃত্তশ্চ কলিঃ দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" বচনটীই তর্করত্ন মহাশয়ের যত কুযুক্তির মূল। তাঁহার মতে ঐ বচনের অর্থ তখন ১২০০ কলি-অব্দ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রম। শ্রীধর স্বামী টীকাকার যাঁহাকে তিনি মহাপণ্ডিত বলিয়া মান্য করেন, তিনি লিখিয়াছেন দ্বাদশ শতাব্দ দেববৎসর পরিমিত যে কলি তাহা আরম্ভ হইল। এবং ইহাই উক্ত বিশেষণ বচন ব্যক্তও করিতেছে। সুতরাং তাঁহার স্বকপোলকল্পিত অর্থের কোন মূল্য নাই। আমরা প্রাচীন রাজতরঙ্গিনীর সমর্থিত মতটী সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কলহণ স্পষ্টতঃ যুধিষ্ঠিরের সময় ৬৫৩ কল্যব্দ লিখিয়াছেন

তত্রাপি তর্করত্ন মহাশয় "কূটার্থের" সাহায্য লইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। পাঠকের অবগতির জন্য আমি রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গ হইতে তাঁহার স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টষষ্ট্যধিকামব্দ শতদ্বাবিংশতিঃ নৃপাঃ।
অপীপলংস্ত কাশ্মীরান্ গোনর্দ্দাদ্যা কলৌযুগে॥ ৪৮
ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূদ্ বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষাং তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥ ৪৯
শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ৫১
লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাদধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরা॥ ৫২
প্রায় স্তৃতীয় গোনর্দ্দাদারভ্য শরদাং তদা।
দ্বেসহস্রে গতে ত্রিংশদধিকঞ্চ শতত্রয়ম্॥ ৫৩
বর্ষাণাং দ্বাদশশতীষষ্টিঃষড়্ভিশ্চ সংযুতা।
ভূভুজাং কালসংখ্যায়াং তদ্দ্বাপঞ্চাশতোমতা॥ ৫৪
ঋক্ষাদৃক্ষ শতেনাব্দ যাৎস্থ চিত্রশিখণ্ডিষু।
উচ্চারে সংহিতারৈ রেবং দত্তোঽত্র নির্ণয়ঃ॥ ৫৫
আসনমঘাস্থ মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ॥
ষড়দ্বিচপঞ্চদ্বিযুতঃ শককাল স্তস্যরাজ্য॥ ৫৬

ইহার ভাবার্থ এই—গোনর্দ্দ আদি রাজগণ কাশ্মীরবাসীদিগকে কলিযুগে ২২৬৮ বৎসর পালন করেন। কুরুপাণ্ডবগণ দ্বাপরের শেষে প্রাদুর্ভূত হয়েন ইহা মিথ্যা কথা। যাঁহাদের ঐ মত তাঁহারাই রাজাদের উক্ত বৎসর ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৬৫৩ (৬০০+৫০+৩) কলি-অব্দে কুরুপাণ্ডব প্রাদুর্ভূত হয়েন। সম্প্রতি কাশ্মীরের লৌকিকাব্দ ২৪ এবং শকাব্দ ১০৭০ প্রবহমান। তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত (২০০০+৩০+৩০০+১২০০+৬০+৬=)৩৫৯৬ বৎসর হইয়াছে। এবং এই সময়ে ৫২ জন রাজা রাজত্ব করেন। এক নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে গমন করিতে সপ্তর্ষির ১০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। বরাহ স্বীয় সংহিতায় তাহার এ প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন—যখন যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করেন তখন সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। তাঁহার রাজ্যসময়ে শকাব্দ পূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসর হইল।

পুরাণ সকল বৃহৎসংহিতা হইতেই সপ্তর্ষির মঘানক্ষত্রে অবস্থানবিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন সুতরাং পুরাণের জ্যোতিষিক গণনার উপর বিশ্বাস করা যায় না। প্রবন্ধান্তরে জ্যোতিষ পুস্তক ও পুরাণের সময় নিরূপণবিষয়ে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দুজ্যোতিষীগণের আমি নিম্নপ্রকারে সময় অবধারণ করিয়াছি। ইহার প্রমাণ প্রবন্ধান্তরে লিখিব।

পরাশরসংহিতালেখক।	শকপূর্ব্ব	১৪৬৯	বৎসর	১৩৯২ B. C.
আর্য্যভট্ট	ঐ	১৫	ঐ	৬৩ A. D.
সূর্য্যসিদ্ধান্তলেখক সূর্য্যদাস	২০৬ শকাব্দ			২৮৪ A. D. কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী
সূর্য্যদাসপুত্র বরাহমিহির	ঐ	ঐ		ঐ
ব্রহ্মগুপ্ত	৪২১	ঐ		৪৯৯ A. D.

পৃথুদক স্বামী ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তের টীকা লেখেন এবং ভট্টোৎপল বরাহী সংহিতার টীকা করেন, বিষ্ণুচন্দ্র বাশিষ্ঠসিদ্ধান্ত ও শ্রীশেন রোমকসিদ্ধান্তের লেখক, ইহারা উভয়ে বরাহের পূর্ব্ববর্ত্তী। লল্ল শ্রীপতি নৃসিংহ মঞ্জুল ইহারা সকলেই বিখ্যাত ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। ভাস্করাচার্য্যের পুস্তকে ইহাদের উল্লেখ আছে।

ভাস্কর, ভারতবর্ষের নিউটন, জন্মবৎসর ১০৩৬ শকাব্দ—১১১৪ A. D.

পিতার নাম মহেশ্বর

সিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রনয়ণসময়—১০৭২ শক ১১৫০ A. D.

কর্ণকুতুহলপ্রনয়ণ ১১০৫ শক ১১৮৩ A. D.

ইহার পরে আর হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতি হয় নাই।

শ্রীকানাইলাল ঘোষাল।

ব্যাঘ্র-পূজা। *

বর্ত্তমানকালে আদিম মনুষ্যের বাসগুহায় যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সময়ে ঐরাবত-সদৃশ মামথ্, গুহা-ভল্লুক, গুহা-সিংহ এবং অন্যান্য পুরাকালীন পশু ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, সেই সময়েও পৃথিবীতে আদিম মনুষ্যের অস্তিত্ব ছিল। উক্ত ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যে চকমকিনির্ম্মিত বর্শার অগ্রভাগ, কুঠার, হাতুড়ী ও অপরাপর যন্ত্রাদি থাকায় ইহা ভূয়োঃ ভূয়োঃ প্রমাণ হইতেছে যে, আদিম মনুষ্য সেই পুরাকালে কেবল উক্ত পশু সকল শীকার করিয়া উহাদের

---

* এই প্রবন্ধটি মৎপ্রণীত "The Indian Folk-Beliefs about the Tiger" শীর্ষক ইংরাজী প্রবন্ধের সার মর্ম্ম। উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধটি বোম্বাই সহরের The Anthropological Society of Bombay নামক বৈজ্ঞানিক সভার গত জানুয়ারি মাসের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, এবং উক্ত সভা প্রণীত—The Journal of the Anthropological Society of Bombay নামক পত্রিকার তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় (Vol III, No. 1, pages 45—60) প্রকাশিত হইয়াছে।—লেখক।

মাংসে আপনার উদর পোষণ করিত না, পরন্তু উহাদিগকে বিশেষ ভয় করিত। উক্ত পশুদিগের দীর্ঘকায় ও বলাধিক্যজনিত ভয় হইতেই মনুষ্য-মধ্যে পশু-পূজার আবির্ভাব হইয়াছে। আদিম মনুষ্য আপনা হইতে পশুকে অধিক পরাক্রমশালী দেখিয়া, অজ্ঞানতাবশতঃ বিবেচনা করিত যে, ঐ সমস্ত পশুগণের আত্মা তাহার আত্মা হইতে মহত্তর। এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে তাহার মনে হইত যে, ঐ সমস্ত পশুগণ নিশ্চয় এমন কোন দেবদেবতা হইবে, মনুষ্যের সুখ দুঃখের উপর যাহাদের হাত আছে, এবং যাহাদের বরপ্রাপ্তি অথবা ক্রোধ শান্তির জন্য উপাসনা করা আবশ্যক। যে প্রক্রিয়া-বশতঃ পশু-পূজার আবির্ভাব হইয়াছে, এইটি সেই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ক্রম। পৃথিবীতে অনেক জাতির মধ্যে এই পশু-পূজা ভিন্ন ভিন্ন রূপে এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। যে যে জাতির মধ্যে পশু-পূজা আজ কালও প্রচলিত দেখা যায়, তাহাদের অবস্থা ও জীবন-নির্ব্বাহের উপায় প্রায় পুরাপ্রান্তরিক (Palaeolithic Age) নব-প্রান্তরিক (Neolithic Age) এবং কাংস্য (Bronze Age) যুগের মনুষ্যের অবস্থাসদৃশ।

সেই দেশের মনুষ্যজাতি সেই পশুকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে ও তাহারই উপাসনা করে, যে দেশে যে পশু বহুসংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা যাহা বেশী উপদ্রব করে। উত্তর আমেরিকার অত্যন্ত উত্তরপ্রান্তে গ্রিজ্‌লি ভল্লূক নামক এক প্রকার ভল্লূক বহুসংখ্যায় বাস করে এবং অনেক প্রাণি-নাশ করে, সেইজন্য ঐ দেশনিবাসী আদিম ইণ্ডিয়ানগণ উহাদিগকে বড় ভয় করে। মাংসলোলুপ নেকড়ে বাঘের বাসভূমি কেনেডাদেশে মনুষ্য-শোণিতলোলুপ নেকড়েজাতীয় এক প্রেত-পশুর কিম্বদন্তী আজও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, কেনেডাবাসীগণ ঐ পশুকে কত ভয় করে। আমাদের দেশে ব্যাঘ্রের, সর্পের ও মকরের পূজা এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষে যত প্রকার পশু আছে, তন্মধ্যে ব্যাঘ্রই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। উহার দীর্ঘকায় ও ভয়ানক উপদ্রবনিবন্ধন আজও পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যাঘ্রসম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এদেশে ব্যাঘ্রের এরূপ উপদ্রব যে, উহার হস্তে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক মনুষ্যগবাদির প্রাণনাশ হইয়া থাকে এবং সেইজন্য দেশের অনেক অংশ মনুষ্যশূন্য হইয়া যায় ও কৃষীগণের অনেক অর্থহানি হইয়া থাকে। সর্প ও মকর এদেশের আর দুইটি হিংস্রক জন্তু। ইহাদের উপদ্রবেও প্রতি বৎসর অনেক মনুষ্যের জীবন-নাশ হইয়া থাকে। সেই জন্যই বাঙ্গালীরা সর্পের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত শ্রাবণ মাসে মনসাপূজার দিন সর্প-রাজ্ঞী মনসাদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। দশ-হারার দিবস মকরারোহিণী গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া হাঙ্গরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে।

সেইরূপ ভারতবর্ষের অনেক আদিম জাতির মধ্যে ব্যাঘ্রের উপাসনা হইয়া থাকে। এই দেশের অন্যান্য অংশের লোক যদিও ব্যাঘ্রের বাস্তবিক উপাসনা করে না তত্রাপি

তৎসম্বন্ধে তাহাদের অনেক ভয়জনিত কুসংস্কার আছে। ভারতীয় কয়েকটি আদিম জাতির মধ্যে ব্যাঘ্র-দানব একটি উপাস্য দেবতা। ছোটনাগপুরের অন্তর্বর্ত্তী পালামৌ, সর্গুজা ও জাশপুরের সন্নিকটে কিসান * নামে একটি অর্দ্ধ-অসভ্যজাতি বাস করে, তাহারা কতক পরিমাণে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে। ইহারা ব্যাঘ্র-দানবের পূজা করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, উক্ত দানবের অর্চ্চনা করিলে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদের গৃহপালিত পশুগণ ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইবে। রামগড়-নিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে যে সকল লোকের কোন আত্মীয় স্বজন ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা কেবলই কুটুম্ববিনাশী ব্যাঘ্র-দানবের উপাসনা করিয়া থাকে। যে কারণে কিসান ও সাঁওতালগণ ব্যাঘ্র-দানবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সেই সেই কারণবশতঃ গোঁড় নামক আর একটি অসভ্য জাতিও ব্যাঘ্রের উপাসনা করে। সাঁওতাল পরগণাতে সাঁওতালগণ ব্যাঘ্রদংশনে মৃত্যু হওয়াকে ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করে। এমন কি উক্ত প্রদেশস্থ আদালতে সাঁওতালী সাক্ষীগণের এজেহার লওয়ার জন্য উহাদিগকে সাঁওতালী ভাষায় যে হলফ্ দেওয়া হয়, তাহার অর্থ এই যে, যদ্যপি তাহারা কোনরূপ মিথ্যা বলে, তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যাঘ্রদংশনে মৃত্যু হইবে। গোঁড় জাতির মধ্যে, কুস্রু, স্যুরী, মর্কাম, নিতিয়া এবং সার্ম্ন গোত্রীয় লোক সকল বাঘেশ্বর নামক দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। উক্ত জাতির মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। †

এক সময়ে কোন গোঁড় পরিবারে কুস্রু, স্যুরী, মর্কাম, নিতিয়া এবং সার্ম্ন নামক পঞ্চভ্রাতা ছিল। তন্মধ্যে কুস্রুর স্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্বা হয়, তখন এক ব্যাঘ্রশিশু গর্ভে ধারণ করিয়াছিল। সময়ক্রমে ঐ শিশুর জন্ম হইলে তাহার পিতামাতা তাহাকে অগ্রজ পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিল। শৈশবাবস্থা হইতেই ঐ ব্যাঘ্রশিশু সদাসর্ব্বদা তাহার পিতা কুস্রুর সমভিব্যাহারে থাকিত। যখন কুস্রু শস্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষেত্রে যাইত, ব্যাঘ্রশিশুও তাহার সহিত থাকিত। যখন নীলগাই, সম্বর প্রভৃতি হরিণ সকল তাহার শস্য নষ্ট করিতে লাগিল, কুস্রু তাহা কোনরূপে নিবারণ করিতে পারিল না। একদা একটি বৃহদাকার সম্বর হরিণ কুস্রুর কচি কচি মাসকলাইয়ের চারা সকল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া, কুস্রু রোদন করিয়া আপনার কেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। এই দেখিয়া ব্যাঘ্রশিশু ঐ সম্বরটিকে আক্রমণ করিল ও তৎক্ষণাৎ উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। এইরূপে যত বন্যপশু কুস্রুর শস্য নষ্ট করিতে আসিত,

---

* Indian Autiquary নামক পত্রিকার ১৯ খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকার ৪১ খণ্ডের প্রথম ভাগের ১১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

ব্যাঘ্রশিশু তাহাদিগকে বিনাশ করিত। সময়ক্রমে ব্যাঘ্রশিশুর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পরে সে ভূত হইল।

একদিন কুস্রুর কন্যার বিবাহোপলক্ষে, নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে একজনকে ভূতে পাইল। বয়গা অথবা গ্রাম্য-পূজারী ও ওঝাকে আহ্বান করা হইল। সে আসিয়া ভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে কুস্রুর ব্যাঘ্রশিশুর প্রেতই উহাকে পাইয়াছে ও তাহাদিগকে বলিল যে তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রেতের শান্তির জন্য উহার পূজা ও বলি দেওয়া আবশ্যক। কুক্কুট, ছাগবৎস, তাড়ী এবং ঘৃত দিয়া উহার পূজা করিতেই, ব্যাঘ্র প্রেত উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল। সেই জন্য ঐ দিবস হইতেই কুস্রুর ব্যাঘ্র-শিশুর প্রেত দেবতা বলিয়া গণিত হইয়াছে। এবং কুস্রু, সুরী, মর্কাম, নিতিয়া এবং সার্স্ন নামক পঞ্চ ভ্রাতা হইতে উদ্ভূত উপরোক্ত পাঁচটী গোড় গোত্রের মধ্যে উক্ত ব্যাঘ্র-প্রেতের পূজা হইয়া থাকে।

উক্ত পঞ্চ গোত্রের মধ্যে যখন কাহারও বিবাহ হয়, তখনই বাঘেশ্বরের উক্ত প্রকারে আবির্ভাব হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চ গোত্রের মধ্যেই বাঘেশ্বর দেবতা বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু অপরাপর শ্রেণীর গোঁড়দিগের মধ্যে বাঘেশ্বর কেবল একটি উপাস্য প্রেত বলিয়া গণিত হয় ও তাহার বাৎসরিক পূজা হইয়া থাকে। শেষোক্ত গোঁড়দিগের এইরূপ বিশ্বাস যে যে সমস্ত লোকের ব্যাঘ্র দংশনে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগের প্রেতগণ সম্মিলিত হইয়া বাঘেশ্বর নামক প্রেত-দেবতা হইয়াছে। আপন আপন গোমেষাদি যাহাতে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায় ও যাহাতে তাহাদের আপনাদেরও প্রাণ রক্ষা হয়, এই জন্য প্রত্যেক গ্রামের গোঁড় নিবাসীগণ প্রতি বৎসর ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকে।

গোঁড়দিগের মধ্যে কিরূপে ব্যাঘ্র-পূজার আবির্ভাব হইল, তাহার আর একটি স্বতন্ত্র বিবরণ পাওয়া যায়। কোন গোঁড় সর্দ্দার অল্প বয়সে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার প্রেত আপনার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া বলিয়াছিল যে যদ্যপি তাহার তাহারা প্রেতের পূজা করে তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদের গৃহপালিত পশুগণ আর কখন ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে না। ইহা শুনিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবগণ তৎপরামর্শানুযায়ী পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে ঐ প্রেত গোঁড়দিগের দেবসমূহের মধ্যে একটি দেবতা বলিয়া গণিত হইতে লাগিল। *

ভারতীয় আর কয়েকটি অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কোন কোন দুষ্টলোক ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিতে পারে এবং সেইজন্য তাহাদের জীবন্ত মনুষ্যের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। উড়িষ্যানিবাসী খণ্ড † জাতি বিশ্বাস করে যে

* Indian Antiquary নামক পত্রিকার ১৪শ খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

† উপরোক্ত পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

কোন কোন স্ত্রীলোক ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিতে পারে। কখন কখন দুষ্ট লোকেরা প্রচার করিয়া দেয় যে তাহাদের এইরূপ ক্ষমতা আছে এবং প্রতিবেশীদের নিকট হইতে এই বলিয়া নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া থাকে, যে তাহাদিগকে উৎকোচ দিলে তাহারা আর তাহাদিগের অনিষ্ট করিবে না। মধ্য ভারতের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহে ওরাওঁ * জাতির মধ্যেও এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাহারা বলে যে যে সমস্ত লোকের ব্যাঘ্রদংশনে মৃত্যু হয় তাহারাই ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া থাকে।

বর্ম্মাদেশের পূর্ব্বে যে সমস্ত পাহাড় আছে তথায় কামিয়েন নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে চিটিং ও মুরণ নামক দুইটি দেবতা আছেন, তাঁহারা তাহাদের শুভাশুভের উপর নজর রাখিয়া থাকেন। কামিয়েনদের এইরূপ বিশ্বাস যে যদ্যপি কামিয়েন শিকারীরা চিটিং দেবের পূজা না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবে। তাহাদের মধ্যে আর একটি দেবতা বা নাটের পূজা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম নডং নাট, † তিনি বাস গৃহের বহির্ভাগে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। উক্ত দেবতা সচরাচর বাসগৃহের অভ্যন্তরেই বাস করেন কিন্তু যদ্যপি উক্ত গৃহনিবাসী পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির ব্যাঘ্র দংশনে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার পূজা বাসগৃহের বহির্ভাগেই হইয়া থাকে।

মগেরা নডং নামক কামিয়েন নাটকে আইঙ-পিন-নাট নামে অভিহিত করিয়া থাকে। যদ্যপি পরিবারস্থ কোন লোক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয় তাহা হইলে তাহারা উক্ত দেবতাকে পূজা করিয়া থাকে। ‡ মগেরা এরূপও বিশ্বাস করে যে উক্ত দেবতা সময়ে সময়ে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন, কেননা ডাক্তার আণ্ডারসন বলেন "থেমব এঙ নামক স্থানে উক্ত প্রদেশের সর্দ্দার আসিয়া আমাদিগের নৌকা ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিল। কামিয়েনরা আমাদিগকে আক্রমণ করে নাই, পরন্তু রাত্রিতে ব্যাঘ্র আসিবে এই ভয় আমাদের হইয়াছিল। নৌকার মাঝিরা বলিল যে উহা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয় পরন্তু ব্যাঘ্ররূপধারী তত্রত্য নাট দেবতা যিনি আমাদের একটি বৃক্ষের কয়েকটি শাখা কাটার জন্য কুপিত হইয়াছিলেন।" § কুসংস্কারবশতঃ মগেরা ব্যাঘ্রকে এত ভয় করে যে যখন কোন মগ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা তাহার শব যত শীঘ্র পারে সমাহিত করিয়া ফেলে। ডাক্তার জন আণ্ডারসন যখন ভামোতে গিয়াছিলেন তখন এই কুসংস্কারের একটি উদাহরণ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ভামো নগরে একটি স্ত্রীলোক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক

* উপরোক্ত পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

† John Anderson M. D প্রণীত Mandalay to Momien নামক গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

‡ ঐ গ্রন্থের ৪৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

§ উপরোক্ত গ্রন্থের ৪৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিহত হয়। মগেদের প্রথানুসারে উক্ত স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সেই রাত্রিতেই সমাহিত করা হইয়াছিল। *

ইরানাওন প্রদেশস্থ সন্তা উপত্যকানিবাসী সান জাতিও একটি নাট দেবতাকে মানে, তিনি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া শিশু সন্তানকে চুরী করিয়া লইয়া যাইয়া থাকেন। ১৮৬৮ খৃঃ ডাক্তার আণ্ডারসন যখন উক্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন, তখন তিনিও উহাদের মধ্যে উক্ত কুসংস্কারের প্রচলন দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন সবয়ার পারিবারিক সমাধি-স্থানে একটি বড় দেবদারু বন আছে। তাহাদের (সানেদের) বিশ্বাস যে উক্ত স্থানে বন্দুক ছুঁড়িলে নিশ্চয়ই তত্রত্য সর্দ্দার ও তাঁহার পরিবারস্থ লোক সকল পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। সেইজন্য সহরের পশ্চাৎভাগে পাহাড়ের উপর আমাদের শীকার করিতে মানা করা হইয়াছিল।" ১৭৬৭ খৃঃ চীনদেশীয় সৈনিকেরা যথায় একটি কিল্লা নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত মাটী খনন করিয়াছিল তথায় একটি নাট দেবতা নিবাস করেন এরূপ প্রবাদ আছে। সানেদের বিশ্বাস যে যদ্যপি তথায় বন্দুক ছোঁড়া হয়, তাহা হইলে উক্ত দেবতা কুপিত হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ আসিবেন ও শিশু সন্তান চুরি করিয়া লইয়া যাইবেন। †

ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ব্যাঘ্র সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যখন কোন ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহার প্রেত তাহার নিহন্তা ব্যাঘ্রকে পাইয়া থাকে ও যে যে স্থানে বিপদের সম্ভাবনা ব্যাঘ্রকে তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডবলু এচ্ স্লিমান সাহেব অনেক দিন এই সমস্ত প্রদেশে বাস করিয়া এই সমস্ত প্রচলিত কিম্বদন্তীর বিষয় শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন ‡ একদা দিউরীর সর্দ্দার রামচাঁদ রু (যাহাকে লোকে সচরাচর সুরীমন্ত বলিয়া ডাকিত) প্রাতঃভোজনের পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী দিউরী ও সাগরের মধ্যে কতলোক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে একজন বলিল যে যখন কোন ব্যাঘ্র একটি লোক বিনাশ করে, তখন সে নিরাপদ হয়, কেননা তন্নিহত ব্যক্তির প্রেত তাহার মস্তকের উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে যে স্থানে বিপদ সম্ভব তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। প্রেতটি ভালরূপে জানে যে যথায় লোকটি বিনষ্ট হইয়াছে তথায় লোকে ব্যাঘ্রকে মারিবার জন্য

---

* J. Anderson M. D প্রণীত Report on the Expedition to Western Yunan via Bhamo নামক গ্রন্থের ২৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

† উপরোক্ত গ্রন্থের ২৬০ দেখুন।

‡ Sleeman সাহেব প্রণীত Rambles and Recollections of an Indian Official নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

সদা সর্ব্বদা সতর্কিত থাকিয়ে। সেই জন্য সে ব্যাঘ্রকে অপর কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যায় যেখানে ব্যাঘ্র নির্ভয়ে অপরাপর মনুষ্য বিনাশ করিতে পারিবে। ওই প্রেত তন্নিহন্তা ব্যাঘ্রকে কেন এত সাহায্য করিয়া থাকে তাহার কারণ উক্ত অনুচর বলিতে পারিল না। সে আরো বলিল যে প্রেত সকল প্রায়ই অনিষ্টকারক হইয়া থাকে। যদ্যপি প্রেতের শান্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন না করা হয় তাহা হইলে মানুষ আপন জীবনদ্দশায় যত ভাল থাকে, তাহার প্রেত ততই অনিষ্টকারক হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আর একটি ব্যাঘ্র কিম্বদন্তী বিস্তারিতরূপে প্রচলিত এই যে, এক প্রকার গাছড়া আছে, যাহার মূল ভক্ষণ করিলেই মনুষ্য ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হয় ও যদ্যপি সেই অবস্থাতেই সে আর এক প্রকার গাছড়ার মূল ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহার সম্বন্ধে স্লীমান সাহেব বলিয়াছেন, * সুরীমন্তের নিজেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে সাগর ও দিউরীর মধ্যবর্ত্তী বনে যে সমস্ত ব্যাঘ্র বিচরণ করে তাহারা ভিন্ন প্রকারের ব্যাঘ্র, তাহারা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয়, পরন্তু ব্যাঘ্ররূপধারী মনুষ্য। তিনি আরও বলিলেন যে বাস্তবিক ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্যের মধ্যে এই প্রভেদ যে, ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্যের লাঙ্গুল থাকে না ও বোরা অথবা বাস্তবিক ব্যাঘ্রের দীর্ঘ লাঙ্গুল থাকে। দিউরীর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এক প্রকার গাছড়া পাওয়া যায়, যাহার মূল ভক্ষণ করিলে মানুষ তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হয়। আর সেই অবস্থাতেই যদ্যপি আর এক প্রকার গাছড়ার মূল ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হয়। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার শৈশবাবস্থায় এইরূপ একটি ঘটনা তাঁহার আপনার পরিবারের মধ্যে হইয়াছিল। তাঁহার ধোপা (যাহার নাম ছিল রঘু) বড় মাতাল ছিল। মানুষ ব্যাঘ্র হইলে তাহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, ইহা জানিতে একদিন রঘুর বড়ই কৌতুহল হইল। তৎক্ষণাৎ জঙ্গলে যাইয়া দুই প্রকার মূল আনয়ন করিয়া একটি আপনার স্ত্রীকে দিয়া বলিল যে, যখন দেখিবে যে সে (রঘু) ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ সেই মূলটি রঘুর মুখে প্রবেশ করাইয়া দিবে। তাহার স্ত্রী ইহাতে সম্মত হইল। রঘু মূলটি ভক্ষণ করিয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী আপনার স্বামীকে ঐরূপ ব্যাঘ্র হইতে দেখিয়া ভয়ানক ভীত হইল ও মূলটি হস্তে লইয়া পলায়ন করিল। রঘু বেচারা জঙ্গলে যাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী অনেক বন্ধুবান্ধবকে হত্যা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইল এবং দেখা যাইল যে তাহার লাঙ্গুল নাই। সুরীমন্ত আমাকে আরও বলিলেন যে, আপনি যখনই কোন লাঙ্গুলহীন ব্যাঘ্র দেখিবেন, তখনই জানিবেন কোন হতভাগ্য ব্যক্তি সেই মূল ভক্ষণ করিয়া এইপ্রকার ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে ও আরও জানিবেন যে সকল ব্যাঘ্র অপেক্ষা ঐ ব্যাঘ্রই ভয়ানক অনিষ্টকারক।

* উপরোক্ত গ্রন্থের ১৬৩—৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

মধ্য-ভারতবর্ষে ব্যাঘ্রসম্বন্ধে আরও একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, এক প্রকার বিজ্ঞান আছে, যাহা অধ্যয়ন করিলে মানুষের এরূপ ক্ষমতা জন্মে যে, অধীতশাস্ত্র ব্যক্তি ইচ্ছামত ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতে পারে। মধ্যভারতবর্ষনিবাসী লোকদের আচার ব্যবহারজ্ঞ শ্রীমান সাহেব লিখিয়াছেন, "একদিন জব্বলপুর ও মুজা-পুরের রাস্তাতে যাইতে যাইতে আমার বন্ধু মৈহারের রাজার সহিত কথোপকথন হইতে-ছিল যে, উক্ত রাস্তার সন্নিকটবর্ত্তী কাট্রাপাস্ নামক স্থানে কত লোক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ও ব্যাঘ্রগণকে বিনাশ করিবার কি উপায় আছে। রাজা বলিলেন যে, যদ্যপি ঐ সকল ব্যাঘ্র বাস্তবিক ব্যাঘ্র হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করা সহজ হইত। কিন্তু আপনি জানিবেন যে, যে সমস্ত ব্যাঘ্র বহুসংখ্যক মনুষ্য বিনাশ করিতে পারে, তাহারা সামান্য ব্যাঘ্র নহে ; পরন্তু তাহারা সেই সকল অধীতশাস্ত্র লোক যাহারা বিজ্ঞান-বলে ঐ প্রকার ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। ঐরূপ ব্যাঘ্রদিগকে শাসন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। ঐ সকল লোক কিরূপে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া থাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, রাজা বলিলেন ;—"যে সমস্ত লোক ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ঐ রূপ ধারণ করা বড়ই সহজ। কিন্তু কিরূপে তাহারা এই প্রকরণ শিক্ষা করিয়া থাকে ও সেই শাস্ত্রই বা কি প্রকার, আমার মতন মূর্খ লোকে তাহা জানে না। মৈহারস্থ একটি মন্দিরের পুরোহিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও সেই বিজ্ঞানবলে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি পূর্ণ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি হইতেন, সেই সময়ে তাঁহার একজন শিষ্য তাঁহার গলায় একটি হার ফেলিয়া দিতেন। তিনি অনেক দিন হইতে এই অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রধান শিষ্য সকলও তীর্থ করিতে গিয়াছিল। ইত্যবসরে এক দিন ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিবার তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি একটি আশুদীক্ষিত শিষ্যের নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সে তাঁহার গলায় হারটি ফেলিয়া দিতে পারিবেক কি না।" শিষ্য বলিল ;—"আপনি অনায়াসে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতে পারেন। ঈশ্বরের ও আপনার উপর আমার এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি যে আমি কিছুতেই ভয় পাইব না।" পুরোহিত তখন শিষ্যকে হারগাছটি সমর্পণ করিয়া ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া শিষ্য কাঁপিতে লাগিল ও যখন ব্যাঘ্রকে চীৎকার করিতে শুনিল, তখনই পতিত হইয়া ভূমিতে হারটি ফেলিয়া দিল। ব্যাঘ্রও তাহার উপর লম্ফ দিয়া চলিয়া যাইল। সেই সময় হইতেই অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মন্দিরে যাইবার রাস্তায় উপদ্রব করিতে লাগিল।" কট্রাপাসে যে সমস্ত ব্যাঘ্র আছে, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্ররূপী পুরোহিত একটি কি না জিজ্ঞাসা করাতে রাজা বলিলেন ;—"না, কিন্তু তাহারা ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্য হইলেও হইতে পারে, যাহারা বিজ্ঞান-বলে এই প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছ। যখন মানুষ একবার এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে আপনাদের ও অপর লোকের অনিষ্টসত্বেও তাহারা ইহা অভ্যাস না করিয়া থাকিতে

পারে না।" যদ্যপি ইহারা বাস্তবিক ব্যাঘ্রই হয়, তাহা হইলে ইহাদের উপদ্রব নিবারণ করিবার কোন সহজ উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিলেন ;—"যে সমস্ত প্রেত তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়, তাহাদিগের পূজা করা উচিত ও তাহাদিগকে নৈবেদ্য প্রভৃতি দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা শান্ত হইবে। কেননা যে সকল লোক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহাদের প্রেতাত্মা ব্যাঘ্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বেড়ায় ও তাহাকে বলিয়া দেয় যে, কোথায় যাইলে শীকার পাওয়া যাইবে অথবা কোন স্থানে যাইলে বিপদের সম্ভাবনা নাই। গোঁড় অথবা অপর কোন জঙ্গলী লোককে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র আস্থান নির্ম্মান করিয়া দিয়া তথায় ঐ প্রেতদিগের পূজা দিতে আদেশ করুন। গোঁড়রা ঐ প্রেতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবেক যে, যদ্যপি তাহারা ব্যাঘ্রদিগকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে সেই আস্থানে তাহাদের নিয়মিতরূপে পূজা হইবে ও বলিদান করা হইবেক।" রাজা আরও বলিলেন ! "যদ্যপি এরূপ করা হয়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রেরা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইবে অথবা তাহারা আর মনুষ্য বধ করিবে না। যদ্যপি এরূপে ফললাভ না হয়, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, তাহারা সামান্য ব্যাঘ্র নহে, পরন্ত ব্যাঘ্ররূপী মনুষ্য। অথবা এরূপ হইতেও পারে যে, গোঁড়েরা ব্যাঘ্রদেবের পূজা না করিয়া স্বয়ং পূজার দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে।"

জাপানদেশে যে দ্বাদশ রাশী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র একটি। বাকী একাদশ রাশী হইতেছে ;—মূষিক, বৃষ, খরগোষ, ড্রেগন্, সর্প, অশ্ব, ছাগ, বাঁদর, কুক্কুট, কুকুর ও শূকর।* জাপানদেশীয় মন্দিরসমূহে যে সমস্ত কড়ীকাষ্ঠ থাকে, তাহাতে সচরাচর ব্যাঘ্রের মুখ খোদিত থাকিতে দেখা যায়।

তিব্বতদেশেও যে দ্বাদশ রাশী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র একটি। বাকী একাদশটির নাম মূষিক, বৃষ, খরগোষ, ড্রেগন, সর্প, অশ্ব, মেষ, বাঁদর, কুক্কুট, কুকুর এবং শূকর। এই দ্বাদশ রাশীকে লোথর চুনী বলে ও ইহাদের নাম দ্বারা দ্বাদশ বাৎসরিক যুগের বৎসর সকল অভিহিত হইয়া থাকে। তিব্বতীয়দের নববৎসর ব্যাঘ্ররাশী হইতেই আরম্ভ হয় ও হোর্দা-টাঙ-পো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, বৎসরের প্রথম মাসই ব্যাঘ্র-মাস। †

প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে, ব্যাঘ্র মর্টিখোরা নামে অভিহিত হইত। এই গ্রীক নামটি পারসী মর্দখোর অথবা মনুষ্যখাদক শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা টিসিয়াস মর্টিখোরার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়াছেন ;—সিংহসদৃশ ; লোহিত বর্ণ ; মনুষ্য

---

* Miss Isabella Bird প্রণীত Unbeaten Tracks in Japan নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

† The Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for. 1890 নামক পত্রিকার ৭৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

সদৃশ মুখ, চক্ষু ও নাসিকা, তিন পাটী দাঁত; শরীরের সর্ব্বাংশে কাঁটা; বিশেষতঃ লাঙ্গুলের উপর; যেহেতু ইহা বৃশ্চিক-সদৃশ।”

ভারতবাসী ও আসিয়ানিবাসী অপরাপর জাতিদের মধ্যে ব্যাঘ্রের অবয়ব সম্বন্ধেও নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এদেশী শীকারীদের বিশ্বাস যে ব্যাঘ্র, সিংহ ও অপরাপর বিড়ালজাতীয় পশুদের লাঙ্গুলের শেষভাগে একটি নখ সদৃশ কাঁটা থাকে। ভারতবর্ষীয় লোকেদের বিশ্বাস যে বৃশ্চিক যেরূপে আপনার হুল দ্বারা দংশন করিয়া থাকে, ব্যাঘ্রের কাঁটাও সেই হুলের কার্য্য করিয়া থাকে। আরো প্রবাদ আছে যে ব্যাঘ্রের গোঁফ মানুষের বড়ই অনিষ্টকারক। সেই জন্য ব্যাঘ্র নিহত হইলেই দেশী শিকারীরা তাহার গোঁফ উৎপাটন করিয়া ফেলে অথবা উহা জ্বালাইয়া দেয়, যেহেতু উহা থাকিলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ভারতীয় কয়েকটি জাতির মধ্যে এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে ব্যাঘ্রের গোঁফ উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে, মনুষ্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত কোন লোকই ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিতে পারিবে না। অপর কয়েকটি জাতির বিশ্বাস যে ব্যাঘ্রের গোঁফ শরীরে ধারণ করিলে সেই লোক ইচ্ছামত যে কোন স্ত্রীলোক হউক না কেন তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে। পুরাকালে বিচারালয়ে সাক্ষীগণকে ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর বসাইয়া হলফ দেওয়া হইত। প্রাচ্য রাজগণের মধ্যে ব্যাঘ্র রাজচিহ্ন বলিয়া পুরাকাল হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম রাজসিংহাসন ও বিচারাসনের উপর প্রসারিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে, মৃগচর্ম্মের ন্যায়, ব্যাঘ্রচর্ম্মও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। যোগী ও ফকিরগণ ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া আপন আপন পূজাপাঠ ও ঈশ্বর আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্যাঘ্রের সম্মুখের দাঁত, গোঁফ, নখ ও বীরনখ মাদুলীর স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলয় দেশনিবাসীদের বিশ্বাস যে ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিলে ভোক্তার ব্যাঘ্র সদৃশ বলবিক্রম হয়। জাপান দেশীয় চিকিৎসকেরা ব্যাঘ্রের যকৃৎ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। মিস্ ইসাবেলা বার্ড নামক জনৈক ইংরাজ মহিলা, যিনি জাপানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে বলেন, * “আমি পীড়িত হওয়াতে ডাক্তার নোসোকি নামক জনৈক জাপান দেশীয় চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্রে জিনসেং গুণ্ডারের শৃঙ্গ ও ব্যাঘ্রের যকৃৎ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।” চৈনীকেরাও ব্যাঘ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকে। মিস বার্ড, কিয়দ্দিবস কাণ্টনগরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে বলেন, † “মলয় দেশস্থ সালাঙ্গোর নামক স্থানে একটি ব্যাঘ্র মারিবার পর বড়ই কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। নিকটস্থ চৈনীকেরা ব্যাঘ্রের

* Unbeaten Tracks in Japan নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।
† উক্ত গ্রন্থের ২৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

মৃত দেহটি লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে লাগিল। কেহ তাহার যকৃৎটি কাটিয়া লইল। কেহ তাহার চক্ষুদ্বয় ও প্লীহা কাটিল, কেহ তাহার রক্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল। অপরাপর লোকেরা দেহ গ্রন্থির কোমল অস্থি সকল কাটিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের চক্ষুর তারার ঔষধিক গুণ আশ্চর্য্য। ব্যাঘ্রের রক্ত ১১০ ডিগ্রী উত্তাপে শুখাইলে অপূর্ব্ব তেজস্কর ও বলকারক ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং শুষ্ক যকৃৎ ও প্লীহা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক রোগ আরাম হয়। সুলতান আবদুল সমৎ যকৃৎটি লইলেন ও অপরাপর অংশগুলি চৈনীক চিকিৎসকেরা বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া লইল।" বাঙ্গালা দেশে ব্যাঘ্রের ঘি অথবা চর্ব্বি বাতরোগের ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ম্মার উত্তর প্রদেশনিবাসী সান জাতির মধ্যেও ব্যাঘ্রের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জে আণ্ডারসন তৎসম্বন্ধে বলেন, * "সানেরা বলে যে গর্ভিনী ব্যাঘ্রীর গর্ভস্থলী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বল প্রাপ্ত হয় ও শীঘ্র আরাম হয়। ব্যাঘ্রের পাকস্থলী শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য হয়। রোগীর শরীর দুর্ব্বল হইলে ব্যাঘ্রের পায়ের অস্থি গুঁড়া করিয়া সেবন করাইলে রোগী বল প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আলেখ্য। শ্রীসীতানাথ নন্দী প্রণীত। ইহাতে কয়েকটি কাল্পনিক চিন্তাপ্রসঙ্গ এবং দুই চারিটি গল্প আছে। শ্রীযুক্ত সীতানাথ নন্দী নূতন লেখক নহেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই কল্পনার উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসে একটু সংযতির অভাব। কল্পনা তাহার নবীন আরোহীকে বেশ চিনিয়া লইয়াছে; তাঁহার হাতে লাগাম, অথচ সেই প্রভু; আরোহী তাহাকে বাগ মানাইবেন কি, তাহার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিয়া সে তাঁহাকে ছুটিয়া লইয়া বেড়ায়। স্থানে স্থানে এইরূপ অসংযত কল্পনার উচ্ছ্বাস ব্যতীত লেখকের রচনা বেশ হইয়াছে। ভাষার উপর তাঁহার দখল আছে হৃদয়ের অনুর্ভাব বেশ ব্যক্ত করিতে পারেন। ইহা অতি সুন্দর উক্তি, "মানবহৃদয়ের সত্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস আছে, দয়াতে বিশ্বাস আছে, কিন্তু একমাত্র মানবহৃদয়ের প্রেমে অবিশ্বাস হয় বলিয়াই ত এত যন্ত্রণা পাই।"

---

* A Report on the Expedition to Western Ynuan Via Bhamo নামক গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

"আকাশপানে চেয়ে থাকা" প্রসঙ্গটিতে তাঁহার কল্পনাশক্তিও বেশ সুসঙ্গতরূপে খেলিয়াছে। পুস্তকের গল্পগুলির মধ্যে দুই তিনটি গল্প অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। 'জীবন না মৃত্যু' তাহার মধ্যে একটি। তবে যে ইংরাজি গল্পের ইহা অনুবাদ সেটি পড়িতে ইহা হইতেও ভাল লাগে।

আনন্দগুল ও দগ্ধজীবন, বড়ই সুন্দর হইয়াছে। বিশেষতঃ দগ্ধজীবনে যে দগ্ধ আর্ত্ত-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দৈনিক সামাজিক জীবনের অতি স্বাভাবিক চিত্র, তাই তাহাতে হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠে।

কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা। পুস্তকখানি ইংরাজির অনুবাদ। শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র অনুবাদক। লেখক শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল টেরি বিস্তর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, পুরুষশক্তির আধিক্যে কন্যা এবং স্ত্রীশক্তির আধিক্যে পুত্রসন্তান জন্মে। লেখকের সিদ্ধান্ত অকাট্য কি না তাহা মীমাংসা করা বহু সময় ও বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ; যদি নর নারীমাত্রেই বিষয়টির তত্ত্বনিরূপণে ইচ্ছুক হইয়া পরীক্ষাতৎপর হন, তবে শীঘ্র ফললাভ হইতে পারে। ইহা এমন একটি বিষয়, যাহার সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে সংসার বহু কষ্ট দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে; এক কথায় বৈজ্ঞানিক জগতের প্রকৃত নূতন এবং সুফল আরম্ভ হইবে। সুতরাং নরনারীমাত্রেরই ইহা অনুসন্ধিতব্য। শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

দারোগার দপ্তর। ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ সংখ্যা। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা প্রতি মাসে মাসে প্রকাশিত এক একটী ডিটেক্‌টিভ গল্প। ব্যাপারটী আমাদের দেশের পক্ষে নূতন। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভের অনুকরণে প্রিয় বাবু—স্বয়ং একজন ডিটেক্‌টিভ তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল এইরূপে গল্পে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রিয় বাবুর লেখনী ধারণ নিষ্ফল নহে, তাঁহার ভাষায় দখল আছে, অধিকন্তু গল্প জমাট করিবার শক্তি আছে—ভাল ডিটেক্‌টিভ গল্পের তাহাই প্রধান উপাদান।

প্রজাপতির মৃত্যুগান।

১

ছিল নাক কাজ কোন কিছু
জীবনটা শুধু হেলা ফেলা!
নিরানন্দ হাসি খেলা নিয়ে
কাটিত সুদীর্ঘ সারা বেলা।

একদিন সন্ধ্যা অতি ধীর,
বহিয়াছে প্রফুল্ল সমীর,
ক্লান্তি ভরা প্রমোদের ভারে
অবসন্ন স্তিমিত শরীর।

লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি করি
সারাদিন গিয়াছে কাটিয়া,
চলিতে না সরে পদ আর,
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।

চারিদিকে চাহিনু বারেক,
কেহ যদি তোলে স্নেহভরে,
জ্বলজ্বল হাসিল কৌতুকে,
তারকাটি মাথার উপরে!

মুদে এল ধীরে দুনয়ন,
বুঝিলাম পালা হোল সায়,
শ্রান্তিময় ধরণীর পাশে
শান্তিময় অন্তিম বিদায়!

পড়িল না অশ্রু এক ফোঁটা,
অধরে ফুটিল হাসি রেখা,
নিমেষের এই ত জীবন
কে আমার! আমি শুধু একা!

২

জীবনে আরম্ভ হোল কাজ
আজ আমার নূতন জীবন!
সমুখে এ কাহার মূরতি
শ্রান্ত আঁখি খুলিনু যখন।

কলিকাটি নতমুখী একা,
তুষার আবৃত হিমদেহ,
না ফুটিতে অবসন্ন ক্ষীণ
কেহ নাই করিবারে স্নেহ।

ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ,
দাঁড়াইনু তার পাশে আসি,
সযতনে আগ্রহে উদ্যমে,
ঘুচাইনু সে তুষার রাশি।

আনন্দ পুলক অভিনব,
শিরে শিরে হোল বহমান।
মিছে হাসি খেলাধূলা সব,
সেই দিন হতে অবসান।

৩

আজি আমার কাজ সমাপন,
চির তরে জীবনের ছুটি,
মলিন কলিকা সে আমার
মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি!

সযতনে পাখনায় ঢাকি,
গণিয়াছি মুহূর্ত্ত পলক,
প্রাণ ভরা সে স্নেহ আদর,
ধন্য বিধি! আজিকে সার্থক!

বিকশিত সুবাস সুহাস,
বিকশিত রূপের মহিমা,
বিকশিত সে নব যৌবন,
আজ নাহি আনন্দের সীমা।

আজি আর নহে সে একাকী,
আজি সেত নহে দীনহীন,
অলি কহে মধুর বচন,
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন!

প্রাণ ভোরে দান করে রবি,
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি মহাকবি,
রূপমুগ্ধ বিস্মিত নয়ন!

ধন্য ধন্য চারিদিকে স্তুতি,
প্রশংসা ধরে না কারো মুখে,
প্রসারিত রাজ হস্ত অই
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে!

উল্লাসে অধীর সে আমার,
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি!
সুসাধিত আমারো জীবন,
কাজ আর নাই কিছু বাকী!

শূন্য ছিল জীবন সেদিন,
পূর্ণ এবে জীবনের ঘের,
সুখভরা ধরণীর পাশে,
অন্তিম বিদায় মাগি ফের!

একা ছিনু সেদিন এখানে,
আজ আমি দোঁহে মিলে মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে,
এত হর্ষ নাহি যায় সহা!

বিদায় গো বিদায় ধরণী
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি,
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন,
দিয়েছে সে চিরতরে ছুটি!

শিক্ষা-সঙ্কটের কৈফিয়ৎ।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত "শিক্ষা-সঙ্কট" প্রবন্ধের প্রথম অংশের সমালোচনা করিতে গিয়া পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বাবু আষাঢ়ের "সাধনায়" "প্রসঙ্গ-কথা" শীর্ষক প্রস্তাবের উপসংহারে বলিয়াছেন :—"আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি (অর্থাৎ যাহার আমি আলোচনা করিয়াছি, সেইগুলি) লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।" *

কথাগুলি পড়িয়া আলোচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম বলিয়া এইটুকু অপ্রতিভ বোধ করিতে হয়—যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহাকে বিশ্রব্ধ অবস্থায় বে-আব্রু করিয়াছি, যেন কাহারও হৃদয়ের কাতরোক্তিকে ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চাঙ্গের মধ্যে কয়েদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এরূপ ইচ্ছার প্রণোদনে কাগজে

* "সাধনা" আষাঢ় ১৩০০ সাল শেষ পৃষ্ঠা।

কালীর অক্ষর বসাইয়াছি, এ কথা যেন কেহ মনে স্থান না দেন। রবীন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি এই নিবেদন অনাবশ্যক। এ প্রকারে আমাকে যদি কেহ ভুল বুঝেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে রবীন্দ্র বাবুর মমতার আস্পদ হইব, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর সহিত বিচারক্ষেত্রে তিনিও আমার আশঙ্কিত বিপদে পড়িয়াছিলেন। * রবীন্দ্রনাথ বাবু "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক প্রবন্ধের সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ কয়েক জন সর্ব্বত্র সমাদৃত মহাশয়গণের মত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে পবলিক্ ওপিনিয়ন নির্ম্মাণ করাও তাঁহার অভিপ্রেত এই বুঝিয়া "শিক্ষা-সঙ্কট" প্রবন্ধ লিখিয়া কর্ত্তব্য প্রতি-পালনের ইচ্ছা বিশেষরূপে বলবতী হয়। আমার উদ্দেশ্য সত্য নির্দ্ধারণ—তর্ক করা আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। তবে রবীন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় আমি ভাষা-প্রয়োগে সিদ্ধ-বিদ্য নহি, সেজন্য যদি শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া থাকি, তাহা আমার অকৃত্রিম অনুতাপের হেতু হইবে।

উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাবু আমাকে কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া-ছেন—১ম, আমি "মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন করিয়াছি; (২) "প্রতিপক্ষ কে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা" করি নাই (৩) "ভাষাকে স্বস্থান চ্যুত করিয়া" তাহার অর্থ বিপর্য্যয় করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বাবুর অভিপ্রায় যে আমি সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই, সেইজন্যই "ভাষার" স্বস্থানচ্যুতি ঘটাইয়াছি। নতুবা আমি যে কুমৎলবে কথাগুলিকে প্রকরণ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া লেখককে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এরূপ সন্দেহ কখনই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। আমি সকল স্থানে "ভাষাকে স্বস্থানচ্যুত" করিবার সময় টিপ্পনীর দ্বারা মূলের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ত্রুটি করি নাই। অতএব আমার ভাব গ্রহণের অক্ষমতা বা নিশ্চেষ্টতাবশতঃ ভ্রমোৎপত্তির সম্ভাবনা বিরল এবং আমার ভ্রান্ত-ধারণা নির্ব্বিষ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। আর একটী কথা বলা আবশ্যক। যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার ধারণার বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা নিশ্চেষ্টতাবশতঃ নহে, আমার অক্ষমতা বশতঃ। আমি আলোচিত প্রবন্ধগুলি বহুবার পড়িয়াছি। "শিক্ষার হের-ফের" আমি পড়িয়াছি ও তাহার দফা-ওয়ারী চুম্বকও করিয়াছি। তবে উহাকে যে আমি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছি—এ কথা বলিতে সাহসী নহি। কেননা এই প্রবন্ধে বিষয়ের ঐক্য সর্ব্বত্র আমার বুদ্ধিতে উদিত হয় নাই। সামান্যতঃ আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রবন্ধের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিচালিত শিক্ষা। এবং বঙ্কিম বাবু, গুরুদাস বাবু ও আনন্দমোহন বাবুর কথায় মনে হইয়াছিল যে ভুল বুঝি নাই। এখনও জানিলাম যে রবীন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের উহাই বিষয়। আষাঢ় মাসের "সাধনায়"

* "সাধনা চৈত্র ১২৯৯ সাল শেষ ও উপান্ত পৃষ্ঠা।

বিকশিত সুবাস সুহাস,
বিকশিত রূপের মহিমা,
বিকশিত সে নব যৌবন,
আজ নাহি আনন্দের সীমা।

আজি আর নহে সে একাকী,
আজি সেত নহে দীনহীন,
অলি কহে মধুর বচন,
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন!

প্রাণ ভোরে দান করে রবি,
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি মহাকবি,
রূপমুগ্ধ বিস্মিত নয়ন!

ধন্য ধন্য চারিদিকে স্তুতি,
প্রশংসা ধরে না কারো মুখে,
প্রসারিত রাজ হস্ত অই
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে!

উল্লাসে অধীর সে আমার,
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি!
সুসাধিত আমারো জীবন,
কাজ আর নাই কিছু বাকী!

শূন্য ছিল জীবন সেদিন,
পূর্ণ এবে জীবনের ঘের,
সুখভরা ধরণীর পাশে,
অন্তিম বিদায় মাগি ফের!

একা ছিনু সেদিন এখানে,
আজ আমি দোঁহে মিলে মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে,
এত হর্ষ নাহি যায় সহা!

বিদায় গো বিদায় ধরণী
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি,
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন,
দিয়েছে সে চিরতরে ছুটি!

শিক্ষা-সঙ্কটের কৈফিয়ৎ।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত "শিক্ষা-সঙ্কট" প্রবন্ধের প্রথম অংশের সমালোচনা করিতে গিয়া পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বাবু আষাঢ়ের "সাধনায়" "প্রসঙ্গ-কথা" শীর্ষক প্রস্তাবের উপসংহারে বলিয়াছেন :—"আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি (অর্থাৎ যাহার আমি আলোচনা করিয়াছি, সেইগুলি) লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।" *

কথাগুলি পড়িয়া আলোচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম বলিয়া এইটুকু অপ্রতিভ বোধ করিতে হয়—যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহাকে বিশ্রব্ধ অবস্থায় বে-আব্রু করিয়াছি, যেন কাহারও হৃদয়ের কাতরোক্তিকে ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চাঙ্গের মধ্যে কয়েদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এরূপ ইচ্ছার প্রণোদনে কাগজে

* "সাধনা" আষাঢ় ১৩০০ সাল শেষ পৃষ্ঠা।

কালীর অক্ষর বসাইয়াছি, এ কথা যেন কেহ মনে স্থান না দেন। রবীন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি এই নিবেদন অনাবশ্যক। এ প্রকারে আমাকে যদি কেহ ভুল বুঝেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে রবীন্দ্র বাবুর মমতার আস্পদ হইব, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর সহিত বিচারক্ষেত্রে তিনিও আমার আশঙ্কিত বিপদে পড়িয়াছিলেন। * রবীন্দ্রনাথ বাবু "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক প্রবন্ধের সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ কয়েক জন সর্ব্বত্র সমাদৃত মহাশয়গণের মত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে পবলিক্ ওপিনিয়ন নির্ম্মাণ করাও তাঁহার অভিপ্রেত এই বুঝিয়া "শিক্ষা-সঙ্কট" প্রবন্ধ লিখিয়া কর্ত্তব্য প্রতি-পালনের ইচ্ছা বিশেষরূপে বলবতী হয়। আমার উদ্দেশ্য সত্য নির্দ্ধারণ—তর্ক করা আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। তবে রবীন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় আমি ভাষা-প্রয়োগে সিদ্ধ-বিদ্য নহি, সেজন্য যদি শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া থাকি, তাহা আমার অকৃত্রিম অনুতাপের হেতু হইবে।

উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাবু আমাকে কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া-ছেন—১ম, আমি "মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন করিয়াছি; (২) "প্রতিপক্ষ কে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা" করি নাই (৩) "ভাষাকে স্বস্থান চ্যুত করিয়া" তাহার অর্থ বিপর্য্যয় করিয়াছি। বোধ হয়, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বাবুর অভিপ্রায় যে আমি সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই, সেইজন্যই "ভাষার" স্বস্থানচ্যুতি ঘটাইয়াছি। নতুবা আমি যে কুমৎলবে কথাগুলিকে প্রকরণ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া লেখককে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এরূপ সন্দেহ কখনই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। আমি সকল স্থানে "ভাষাকে স্বস্থানচ্যুত" করিবার সময় টিপ্পনীর দ্বারা মূলের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ত্রুটি করি নাই। অতএব আমার ভাব গ্রহণের অক্ষমতা বা নিশ্চেষ্টতাবশতঃ ভ্রমোৎপত্তির সম্ভাবনা বিরল এবং আমার ভ্রান্ত-ধারণা নির্ব্বিষ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। আর একটী কথা বলা আবশ্যক। যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার ধারণার বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা নিশ্চেষ্টতাবশতঃ নহে, আমার অক্ষমতা বশতঃ। আমি আলোচিত প্রবন্ধগুলি বহুবার পড়িয়াছি। "শিক্ষার হের-ফের" আমি পড়িয়াছি ও তাহার দফা-ওয়ারী চুম্বকও করিয়াছি। তবে উহাকে যে আমি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছি—এ কথা বলিতে সাহসী নহি। কেননা এই প্রবন্ধে বিষয়ের ঐক্য সর্ব্বত্র আমার বুদ্ধিতে উদিত হয় নাই। সামান্যতঃ আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রবন্ধের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিচালিত শিক্ষা। এবং বঙ্কিম বাবু, গুরুদাস বাবু ও আনন্দমোহন বাবুর কথায় মনে হইয়াছিল যে ভুল বুঝি নাই। এখনও জানিলাম যে রবীন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের উহাই বিষয়। আষাঢ় মাসের "সাধনায়"

*সাধনা চৈত্র ১২৯৯ সাল শেষ ও উপান্ত পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত প্রবন্ধের যথার্থ মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্র বাবু যাহা কহিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, "বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শন"ই তাঁহার উদ্দেশ্য। * "শিক্ষা-প্রণালী" শব্দের পর সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি নাই বলিয়া ঐ শব্দকে "বিশ্ব-বিদ্যালয়" শব্দের প্রতিবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

প্রবন্ধের মূল কথা বিশ্ববিদ্যালয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা স্থির-প্রকৃতি—যাহার তুলনায় বিশেষ বিশেষ দোষ গুণ আনুষঙ্গিক বিষয় মাত্র—তাহার কথা অবশ্য মূলের মূল কথা। আমাদের বিদ্যামন্দিরের প্রতি ব্যবহৃত "ওগুলা" শব্দ যে অশ্রদ্ধা-বাণের পক্ষ তাহার লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই স্থির-প্রকৃতি। এই বাণের গতিরোধ করিবার চেষ্টা, যে কিরূপে "মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথার আন্দোলন" রবীন্দ্রনাথ বাবু বুঝাইয়া দেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অথবা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শনে আমার "হৃদয়ে" আঘাত লাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় সুবুদ্ধি লোক যে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন, ইহাই আমার দুঃখের হেতু। আমাদের বিদ্যামন্দিরের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বাবু যে "ওগুলা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বিবেচনায় তৃণ তুল্য লঘু হইতে পারে কিন্তু একটী বিদেশীয় প্রবাদ অনুসারে সেই তৃণের সাহায্যে তাঁহার মানসিক বায়ুর গতি নির্ণয় করিতে যাওয়া কি মার্জ্জনীয় নহে ? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ স্বীয় বিদ্যাদাত্রী জননীর প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ যদি অক্ষুব্ধ হৃদয়ে শুনেন তাহা হইলে তাঁহাদের ঔদার্য্য প্রকাশ † পায় সত্য কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা ও কৃতজ্ঞতা কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকে তাঁহারাই বিচার করুন। আর একটা কথা এই যে, যখন শিক্ষা-সঙ্কট প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ত্রুটি আছে একথা আমি নিজেই স্বীকার করিয়াছি তখন ঐরূপ ত্রুটি প্রদর্শনে আমার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে রবীন্দ্রনাথ বাবুর এই অনুমানের হেতু দেখিতে পাই না। তবে কুকুরকে মারিবার জন্য লাঠির বাচ্‌বিচার নাই এই এক কথা।

সে যাহা হউক,। রবীন্দ্রনাথ বাবু নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার লক্ষ্য ও তাঁহার প্রবন্ধের মূলকথা বিশ্ববিদ্যালয়। অতএব বালকগণ রামায়ণ মহাভারত পড়ে না অথবা তাহাদের স্বেচ্ছাপাঠ্য বাঙ্গালা বই নাই এ অভাব উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাবু কাহার ত্রুটি দেখাইয়াছেন—বালকগণের পিতাপ্রমুখ কর্ত্তৃপক্ষের, না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কশূন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর, না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ? ইহার উত্তরে যদি শেষো-

* "সাধনা" আষাঢ় ১৩০০ সাল পৃঃ ১৯৪।

† "ভারতী" জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল পৃঃ ১১৭।

স্তকে নির্দ্দিষ্ট করিতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথ বাবু যে দোষভার নির্দ্দোষীর ঘাড়ে চাপান নাই কি করিয়া বলিব? রবীন্দ্রনাথ বাবু এখন বলিতেছেন, এ স্থলে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যেস্থলে অনেক কথা বলিয়াছেন সে স্থল হইতে এ স্থলকে আইল বা বেড়া বাঁধিয়া স্বতন্ত্র করেন নাই। এ অবস্থায় আমি যদি ভ্রমে পড়িয়া থাকি তাহার জন্য কি আমিই একেলা দায়ী?

বালকগণ রামায়ণ মহাভারত পড়ে না ইহা আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি কি? বালকদিগের ভিতর বুঝিবার ভাবিবার, প্রবৃত্তি অপেক্ষা মুখস্থ করিবার প্রবৃত্তি বলবতী কিন্তু ইহা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি না টোল হইতে প্রাপ্ত পৈতৃক ঋণভার? আমাদিগের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত দোষসমূহ মজ্জাগত জ্বরের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাকে দূর করিবার জন্য কিছুকাল ধরিয়া ইংরেজি শিক্ষার "ডিগুপ্ত" সেবন আবশ্যক। তাহাই অনুরোধ করিয়াছিলাম ইংলণ্ডে ওক জন্মে ও এ দেশে ধান জন্মে এ কথা যেন বিস্মরণ না হয়।

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত স্বীয় প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যে ভুল বুঝিয়া-ছিলাম—এ কথা এখনও বুঝি নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, শিক্ষার একটী অঙ্গ "মনোবৃত্তি চালনা করিবার ক্ষমতা" উৎপন্ন করা। আমাদের চরিত্রগত দোষ পরিহার যে মনোবৃত্তি চালনার ফল নহে—ইহা আমি বুঝিতে অক্ষম। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনার ইহা একটী প্রত্যাশিত ফল—ইহার "উল্টাই" যে কি ঘটিয়াছে—কি যে ভুল শিক্ষা হইতেছে—তিনিও দেখান নাই, আমিও দেখিতে অপারগ। শিক্ষার ফলের যে ন্যূনতা ঘটিয়াছে তাহা প্রথম প্রবন্ধেই আমি স্বীকার করিয়াছি—তবে অনুচিৎ অর্থ কোথায় গ্রহণ করিলাম? এবং কার্য্যারম্ভে যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যায় বাস্তবিক যে ততটা সুফল ঘটিবে না—ইহাও প্রত্যাশিত।

এখন একটী সন্তোষের বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে। ইংরেজি শিক্ষার সুফলের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বাবুর সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, সুখের বিষয়, কেননা যাঁহাদের ওরূপ বিশ্বাস নাই তাঁহারা যে রবীন্দ্র বাবুকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে।

আর একটী কথা আছে! বাদ প্রতিবাদের বিচারের ভার পাঠকের হস্তে। তাই যখন রবীন্দ্রনাথ বাবু আমার প্রবন্ধ সমাপন না হইতেই "প্রতিপক্ষ কে সমগ্র বুঝিবার চেষ্টা" করি নাই বলিয়া আমাকে দোষী করিয়াছেন—যখন তিনি "ভাষাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার জন্য আমাকে দোষী করিয়াও নিজের মূল প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া "ভাষাকে" স্বীয় অধিকারে পুনঃস্থাপনের যত্ন করেন নাই—তখন পাঠক সত্য-নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হউন, এই প্রার্থনা করিয়া আমার নীরব থাকাই কর্ত্তব্য।

স্বরলিপি। *

ইমন্ ভূপালী—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল,
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া,
পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল
নাজানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে
করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব
নিয়ে যাব সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে
আঁখি করিতেছে ছল ছল।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল।

ইমন্ ভুপালী—তাল কাওয়ালী।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বলহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম সকলি লও হে নাথ।

* ভারতীর জনৈক পাঠিকা—শ্রীমতী শৈলবালা রায়, নিম্নলিখিত ব্রহ্মসঙ্গীত দুইটীর স্বরলিপি করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভাং সং।

ইমন ভূপালি—তাল একতালা।

আ

গ১ । গমী১ পধ১ ধ১ । প১ মী১ পমী১ । গমগ১ র১ গ১ ।
তো মা ব ক থা হে থা কে হ ত

র১ স১ স১ । স১ ধ্১ স১ । স১ স১ র১ ।
ব লে না ক রে শু ধু মি ছে

গ১ গ১ গ১ ।—৩ ॥ স১ ধ্১ স১ । স১ স১ র১ ।
কো লা হ ল সু ধা সা গ রে র

শেষ।

গ১ গ১ গ১ । গ১ গ১ গর১ । গ১ র্স১ ধ১ ।
তী রে তে ব সি য়া পা ন ক

ন১ ধপমী১ প১ । মী১ প১ মীপধ১ । পমী১ গ২ ।—২ গ১ ॥
রে শু ধু হ লা হ — ল — তো

(আ—প্র)

[প১ ধ১ প১ । র্স১ র্স১ র্স১ । র১ র্স১ র্স১ ।—১ র্স১
আ প নি কে টে ছে আ প না র মূ

নর্স১ । ধ১ ধ১ ন১ । স১ র্স১ নর্সর১ । র্স১ ন১ ধন১ ।
ল না জা নে সাঁ তা র না হি পা

ধ১ প২ ।] প১ র্স১ র্স১ । ন১ ধ১ প১ । মী১ মীপধ১ ধ১ ।
য় কূল— স্রো তে যা য় ভে সে ডো বে বু

পা১ মী১ গ১ । গ১ গধ১ ধনধ১ । প১ মী১ পমী১ ।
ঝি শে ষে ক রে দি বা নি শি

গমগ১ র১ গ১ । গর১ স২ ॥ স১ ধ্১ স১ ।
ট ল ম — ল সু ধা সা

স১ স১ র১ । গ১ গ১ গ১ । গ১ গ১ গর১ ।
গ রে র তী রে তে ব সি য়া

গ১ র্স১ ধ১ । ন১ ধপমী১ প১ । মী১ প১ মীপধ১ ।
পা ন ক রে শু ধু হ লা হ

পমী১ গ২ ।—২ গ১ ॥ স১ ধ্১ স১ । স১ স১ র১ । গ১ গ১ গ১ ।
— ল — তো আ মি কো থা যা ব কা হা রে
(আ—প্র)

গ১ গ১ গমগ১ । রগ১ র১ গমী১ । পধ১ প১ মীপ১ ।
শু ধা ব নি য়ে যা য় স বে

গমগ১ র১ গ১ । রস৩ । প১ র্স১ র্স১ । ন১ ধ১ প১ ।
টা — নি য়া এ কে লা আ মা রে

মী১ প১ মীপধ১ । প১ মী১ গ১ । গ১ গমী১ পধ১ ।
ফে লে যা বে শে ষে অ কূ ল

প১ মী১ পমী১ । গমগ১ র১ গ১ । রস৩ ।
পা থা রে আ — নি য়া

প১ ধ১ প১ । র্স১ র্স১ র্স১ । র্র১ র্স১ র্স১ ।
সু হৃ দে র ত রে চা ই চা

র্স১ র্স১ র্সন১ । র্স১ র্সর্গ১ র্গ১ । র্র১ র্স১ নর্স১ ।
রি ধা রে আঁ খি ক রি তে ছে

ধ১ ন১ র্স১ । নধ১ প২ । প১ ধ১ প১ ।
ছ ল ছ — ল আ প না

র্স১ ন১ ধ১ । প১ মীপধ১ ধ১ । প১ মী১ গ১ ।
র ভা রে ম রি যে আ প নি

গ১ গধ১ ধনধ১ । প১ মী১ পমী১ । গম১ র১ গ১ । গর১ স২ ।
কাঁ পি ছে হৃ দ য় হী ন ব — ল

স১ ধ্১ স১ । স১ স১ র১ । গ১ গ১ গ১ ।
সু ধা সা গ রে র তী রে তে

গ১ গ১ গর১ । গ১ র্স১ ধ১ । ন১ ধপমী১ প১ ।
ব সি য়া পা ন ক রে শু ধু

মী১ প১ মীপধ১ । পমী১ গ২ ।—২ গ১ ॥
হ লা হ — ল — তো

(আ—প্র)

ইমন ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

[গ১ মগ১ র১ র১ । স১ ধ্১ স১ র১ ।
[এ — কি এ সু ন্‌ দ র

গ৪ ॥ { প২ মী১ পমী১ । }]প২ গ২ [প১ মীপ১ গ১ গ১ ।
শো — — ভা — ভা [কি — মু খ

শেষ।

গা১ গা১ গ২। প১ প১ প১ মীপ১।
হে রি এ — — — এ

{ গ১ র১ স১ র১। }] গ১ র১ স২
{ এ এ এ এ }] — — —

স২ ধ্১ স১ ।—১ র১ স১ র১।
আ জি মো — র ঘ রে

গ১ গ১ গ১ গ১। গ১ গ১ গ২।
আ ই ল হৃ দ য় নাথ

র্স১ নর্স১ ধ১ ধপমী১। ধ১ প১ মী১ গ১
প্রে — ম উ ৎ স উ থ

গমী১ পধ১ প১ মীপ১। গ২ ম১ গ১।
লি — ল — আ — জি

(আ—প্র)

[প১ প১ ঃ১ প১ ।—১ ধ১ প১ ধ১।
[ব ল হে প্রে — ম ম য়

র্স১ র্স১ র্স১ র্স১। র্স২ র্স২। র্স২ ধ১ ধ১। র্স১ র্স১ র্স২।
হৃ দ য়ে র স্বা মী কি ধ ন তো মা রে

র্স১ নসর১ র্স১ ন১। ধ১ নধ১ প১ পমী১।]
দি ব উ প হা — র —]

গ১ প১ গ১ গ১ ।—১ মগ১ র২।
হৃ দ য় প্রা — — ণ

র১ র১ গ১ প১ । প১ ধ১ র্স১ র্স১ । র্স১ র্স১ র্গ১ র্গ১
ল হ ল হ তু মি কি ব লি ব যা হা

র১ র১ র্স১ র্স১ । ধ১ ধ১ প১ মীপ১ ।
কি ছু আ ছে ম ম স ক

গ১ গ২ র১ । গ২ র১ গর১ । সর১ গ১ গ১ ম১ ।
লি ল ও হে — — — — না থ

(আ—প্র)

শ্রীশৈলবালা রায়।

ফুলের মালা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিনাজপুর এখন শান্তির রাজ্য। সুলতান সেকেন্দর সাহের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গণেশদেবের বিদ্রোহীতারও শেষ হইয়াছে। নবরাজের সহিত তাঁহার আর শত্রুতা নাই; পরস্পর মিত্রত্বে আবদ্ধ। সুতরাং তিনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যের যথাবিধি মঙ্গলসাধনে যত্নপর। যুদ্ধকালে পুরাতন যে সকল প্রাসাদাদি ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা নূতন-রূপে সংস্কৃত হইতেছে, রাজধানীর স্থানে স্থানে নূতন পথ, নূতন পরিখা, নূতন উদ্যানাদি নির্ম্মিত হইতেছে। প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দের সীমা নাই, যুদ্ধে তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, রাজা তাহা যথাসাধ্য পূরণ করিতেছেন। কেবল মৃতদিগকে প্রাণ দিতে পারেন নাই মাত্র। এই সুখ শান্তির দিনে দুই বৎসর পূর্ব্বের দুঃখ কষ্ট তাহাদের নিকট এখন দুঃস্বপ্নের স্মৃতিমাত্র; বিপদের সে বিভীষিকা নাই; আছে কেবল সেই বিভীষিকাময় জীবনকাহিনীর আলোচনার সুখ;—সংসারে কাঁটাহীন সুখ যদি কিছু থাকে ত ইহাই।

রাজবাটীর কাছে নদীর ধারে নূতন বাগান হইয়াছে; তাহার পাশ দিয়া কয়েকজন নগরবাসী স্নানে গমন করিতেছিল। প্রাসাদের নহবতে ভৈরবী বাজিতেছিল, তাহার সঙ্গে গুণ গুণ করিতে করিতে মালীযুবা ফুলতলার মাটী নিড়াইতেছিল; আর রক্তবস্ত্রধারী এক বালক ফকীর নিকটের বৃক্ষ হইতে ফুল তুলিতে তুলিতে দূরোত্থিত ঢাকবাদ্যের মৃদু শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছিলেন।—পথিক একজনের তাঁহার দিকে দৃষ্টি

পড়িল,—সে বলিয়া উঠিল,—"দেখ দেখ ফকীর দেখ! যেন সাক্ষাৎ পীর! যাই একবার বাবার কাছে, ছেলেটা ত কিছুতে সার্‌ছে না!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ফকীরের দিকে সৌৎসুক্যে দৃষ্টিপাত করিয়া অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়িল।

প্রথম বলিল—"ফকীরজিকে তুই চিনিস? দোহাই তোর, আমাকে নিয়ে চ; পাঁচ-পীরের সিন্নি দিয়েছি, কালী মাকে পাঁঠা মেনেছি, কিছুতেই ছেলেটা—"

তৃতীয় ব্যক্তি সহসা বলিয়া উঠিল; "ঢাকের বাদ্যি বাজে যে! আজ কি অমাবস্যা! কালীপূজো! ও বাদ্যি শুন্‌লেই আমার বুক গুড় গুড় কর্‌তে থাকে! সেদিন সকালে কি সর্ব্বনেশে ঢাকই বেজে উঠেছিল!" তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

চতুর্থ বলিল, "যাই বলিস বাপু, সে এক জবর দিন গেছে! প্রাণগুলো সেদিনে ঢেলামকুচি মনে হোত! একটা শক্রর গরদান নিতে পার্‌লে এক প্রাণ একশবার দিয়েও দুঃখ ছিল না! বেটাদের কি চড়কি ঘোরানটাই ঘোরান গিয়েছিল!".

তৃ। তারা যদি আর দুদিন সবুর কর্‌তো, তাহলে কে কাকে চড়কা ঘোরাতো, দেখা যেতো; ভাগ্যে ভাগ্যে আপনারা পালাল! ভাঁড়ারে ত আর চাল ডাল এক মুটো ছিল না; কার জোরে বাবা আর লড়্‌তে! ঢাক যে বড় জোরে জোরে বাজ্‌ছে!

প্রথম ব্যক্তি ইতিমধ্যে দ্বিতীয়কে বলিল—"ঘাড় নাড়লি যে! মাথার দিব্যি কি জানিস বল!

প্র। কিন্তু বলবিনে কাউকে!

দ্বি। না।

প্র। তিন সত্যি?

দ্বি। তিনসত্যি।

প্রথম চুপে চুপে বলিল—"ও ফকীর নয় সাহেবুদ্দিন।"

দ্বিতীয় বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"সাহেবুদ্দিন, নতুন বাদসার ভাইপো!"

অন্য সকলের কানে এ কথা পৌছিল। তৃতীয় বলিল,—"তাকে না সুলতান মেরে ফেলেছে।"

প্র। না, সাত ভাইকে মেরেছে, আর এঁয়াকে মার্‌বার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্চে। ইনি আমাদের রাজার চরণে শরণ নিয়েছেন।—

দ্বি। তুই কি করে জান্‌লি?

প্র। কেন অধিকারীর স্ত্রীর কাছে আমাদের কাদি শুনে এসেছে,—এ কথা কি মিথ্যে হয়!

তৃ। তবেই হয়েছে! ও ঢাক আর কিছু নয়, আবার লড়াইয়ের গোল! কানাই সর্দ্দার! শুনেছিস; তোর মনের সাধ মিটলো, রক্তের নদী বইলো আবার!

দ্বি। কিন্তু আমরা আর লড়্‌তে পার্‌বো না; একটা ছেলে ত সিঙ্গে ফুকেছে; গিন্নিও তার শোকে গেল; আর আধখানা ছেলে সেও যায় যায়; কে লড়্‌বে বলদেখি!

চতু। তোর ছেলের আর গিন্নির জোরেই কি না যুদ্ধ ফতে হোত! একবার কথা শোন; কে লড়্‌বে! রাজ্যে লক্ষি লোক থাক্‌তে কে লড়্‌বে!

তৃ। তুই লড়িস্; আমরা সব রাজার কাছে গিয়া বল্‌বো—একজনের জন্যে আমরা লক্ষি জন প্রাণ দিতে পার্‌বো না। তার চেয়ে সাহেবুদ্দিনকে রাজা ফেরৎ দিন।

চতু। তোর পরামর্শ নিয়েই রাজা রাজ্য চালাবে কি না!

দ্বি। রাজা না শোনে; রাণীমাকে বল্‌বো। তিনি যখন নাইতে আস্‌বেন, আমরা তাঁর দুপা চেপে ধরে বল্‌বো, "রক্ষা কর, নয় ত তোমার সন্তানদের বুকের উপর পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাও।"

প্র। কিন্তু তাও বলি, খুড়োবেটা একবার যদি ওকে হাতে পায় ত অমনি গলাটিপে মার্‌বে; ওদের ত দয়ামায়া নেই। আহা বালক, বাচ্ছা!

দ্বি। আমাদের রাজার কি দয়ার শরীর! যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!

বলিতে বলিতে তাহারা স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রজারা যাহা অনুমান করিয়াছিল, তাহাই ঠিক। সাহেবুদ্দিনকে গণেশদেব আশ্রয় দিয়াছেন এ কথা গোপনীয় হইলেও গায়সুদ্দিনের কর্ণে তাহা উঠিয়াছে। তাই তিনি কুতবকে তাহার সন্ধানে দিনাজপুর পাঠাইয়াছেন। গণেশদেবের মহাবিপদ, হয় শরণাগত বন্ধুকে মৃত্যুহস্তে সমর্পণ করিতে হয়—নহিলে আবার যুদ্ধ বাধে; রাজ্য ছার-খারে যায়। সন্ন্যাসিনীর পরামর্শ যুদ্ধ বাধে বাধুক, আশ্রিত রক্ষা, অন্যায় দমন, রাজধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, সেও ভাল।

গণেশদেবের মাতৃ-আজ্ঞা ইহার বিপরীত। তিনি বলিতেছেন,—সাহেবুদ্দিনকে আশ্রয় প্রদান করিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না; ধর্ম্মহানি হইবে। একজীবনের জন্য শত আশ্রিত প্রজার জীবননাশ রাজকর্ত্তব্য নহে, এই দণ্ডে সাহেবুদ্দিনকে কুতবের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেশ রক্ষা করা হউক। গণেশদেবের কিন্তু এ কথা মনে লাগিতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন আগে হইতে লাভ লোকসানের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, ফলাফল গণনা করিয়া কর্ত্তব্য মীমাংসা করা কি ক্ষীণদৃষ্টি মানবের পক্ষে সম্ভবে? তাহা হইলে ন্যায়, মহত্ব, ধর্ম্মের প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্যকারী অস্তিত্বই থাকে না। তাহা হইলে যেখানে দশ জনে মিলিয়া এক জনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, সেখানে অন্য পাঁচ জন দর্শক নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকুক, কেননা পাঁচ জন যদি দশ জনের সঙ্গে লড়িতে যায় ত ক্ষতি তাহাদেরই

নিশ্চিৎ। মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের লাভ, অনেক সময় অনির্দ্দিষ্ট, অপ্রত্যক্ষ, তাহার জন্য আপাত প্রত্যক্ষ ক্ষতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তাহা হইলে অন্যায় কার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপ লাভ লোকসানের বিচারে কাজ করিতে হইলে বিচারকার্য্য ও একেবারে অসম্ভব! কোন অপরাধেরই শাস্তি হয় না। কেমন করিয়া হইবে? একজন অপরাধীকে দণ্ড দিয়া সেই সঙ্গে কত নিরপরাধ ব্যক্তিকেও দণ্ডিত করিতে হইতেছে—কষ্ট দেওয়া হইতেছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ কে করে?

মানব সর্ব্বজ্ঞ নহে; মঙ্গল নিয়মপালনে মঙ্গল হইবে; ইহা স্থির করিয়ামাত্র সে কাজ করিতে পারে; কিন্তু ফলতঃ সে নিয়মপালনে মঙ্গল হইবে কি না—অদূরদর্শী মানবের পক্ষে তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া কাজ করিতে হইলে কোন কাজই করা হয় না। অনেক সময় বিচারে অবিচার ঘটে; মঙ্গল নিয়মপালন করিতে গিয়া অমঙ্গল উৎপন্ন হয় সত্য, তথাপি মানবের কার্য্য করিবার পথ তাহাই। তাহাকে মূল ধরিয়া শাখায় উঠিতেই হইবে; অতীত দেখিয়া ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিতে হইবে; একটি কণ্টক বিদূরিত করিতে শত শাখার উচ্ছেদ করিতে হইবে, একটি ফল বাঁচাইতে শত পত্রের নষ্ট করিতে হইবে; শত প্রাণের জলাঞ্জলিতে ন্যায়, মহত্ত্ব রক্ষা করিতে হইবে—আত্ম পর, ক্ষুদ্র মহৎ নির্ব্বিভেদে ন্যায়, বিচার, ঔদার্য্য, মহত্ত্বের সমাদর রক্ষা করিতে হইবে। অসম্পূর্ণদৃষ্টি মানবের কর্ত্তব্যমীমাংসার ইহাই একমাত্র উপায়।

শক্তির অবস্থা গণেশদেবের হৃদয়ে কণ্টকের মত বিঁধিয়াছিল। যদিও তিনি তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন—তথাপি এই ঘটনায় তিনি নিয়ত মনে মনে অপরাধীর আত্ম-গ্লানি অনুভব করেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এই ত একজন ক্ষুদ্র রমণীর সুখশান্তি ধর্ম্মের উপর কুঠারাঘাত করিয়া নিজের পৌরুষিক ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া লৌকিক ধর্ম্ম রক্ষা করিলাম, সমাজবিপ্লব রহিত করিলাম, কিন্তু তাহার ফল কি অপর্য্যাপ্ত হিত! লোকে জানুক না জানুক আমি জানি এই রাজ্যবিপ্লব সেই ক্ষুদ্র একজনের প্রতি অন্যায়ের প্রতিফল! সমগ্র বঙ্গদেশ আপনার রক্তপাতে সেই সামান্য নারীর কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বহন করিতেছে। সে পাপের এখনও শেষ নাই তাই আবার নূতন অশান্তির সূচনা! নিরাশ্রয় সাহেবুদ্দিনকে মৃত্যুহস্তে সঁপিলে সে পাপের বৃদ্ধি ছাড়া লাঘব নাই। ভগবানের ইহা পরীক্ষা! তাহাই হউক, আমার বীর সন্তানগণের দেহোত্থিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু আমার হৃদয়াশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়া আমার কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করুক! কিন্তু সেই নরক দুঃখের মধ্যেও কি আমার সান্ত্বনা নাই? আমি সেই বীর সন্তানগণের পিতা যাহারা আমার জন্য, দেশের জন্য, অসহায়ের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে, যাহারা পুণ্যকীর্ত্তিতে অমরত্ব লাভ করিয়া—মহত্ত্বের চিরদৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া স্বর্গের গৌরব রক্ষা করিবে! ভগবান! তাহাই হউক,—বাহিরের বাধা বিঘ্ন যেন আর তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমাকে হীনবল না করে।

সভা বসিয়াছে; রাজধানীর মুখ্য প্রজামণ্ডলী সভাস্থলে সমবেত। সাহেবুদ্দিন সম্বন্ধে তাহাদিগের মতামত জানিতে রাজা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সভা লোকপূর্ণ হইলে যথাসময়ে রাজা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎসগণ এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা আর এক বিপদের সম্মুখীন। গায়সুদ্দিন তাঁহার সপ্ত ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অশ্মশ্রুবান বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বিপদকালে আমি যদি বিপন্ন বন্ধুকে পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আমাদের আতিথ্যধর্ম্ম, বন্ধুত্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয়, আর যদি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করি তাহা হইলে গায়সুদ্দিনের সহিত যুদ্ধ বাধে। এই উভয় সঙ্কটস্থলে তোমরা কিরূপ পরামর্শ প্রদান কর?"

চারিদিক হইতে একটা কোলাহলময় সমবাক্য উত্থিত হইল, "মহারাজের যাহা বিবেচনা তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য—মহারাজ আমাদের পিতামাতা প্রভু, আমরা আপনার সন্তান, দাস। আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহা পালন করিয়া চলিব মাত্র।"

বহুকণ্ঠের এই বিপুল স্বর ক্রমে নিস্তব্ধতায় মিলাইয়া পড়িলে, মুহূর্ত্ত পরে একজন ধীর সুস্পষ্ট ধ্বনিতে কহিল, "মহারাজ আপনি যখন নির্ভয় প্রদান করিয়াছেন তখন এ সম্বন্ধে আমার যাহা বিবেচনা হইতেছে বলিব। সাহেবুদ্দিন বিপন্ন অসহায়, তিনি আপনার শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু আপনার সন্তানদিগের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা তদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাঁহাকে বাঁচাইতে গেলে আপনার সন্তানদিগকে মারিয়া তবে তাঁহাকে বাঁচাইতে হয়। বিগত যুদ্ধ বিগ্রহে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে এখনো তাহার সম্যক পূরণ হয় নাই, সে শ্রান্তি এখনো একেবারে দূর হয় নাই, এই সময় আবার যুদ্ধ বাধিলে দেশের সমূহ অমঙ্গল। একজনের জন্য শত সহস্র সন্তানের এই কষ্ট আনয়ন করা কি আপনি যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায় সঙ্গত বিবেচনা করেন?"

প্রজাদিগের মনের গতি এই কথায় বিশেষ দিকে ফিরিল, তাহারা কেহ কহিল, "শুভ শুভ, মহারাজ আপনার জন্য আমরা শতবার প্রাণ দিব, কিন্তু একজন যবনের জন্য কেন আমরা প্রাণ হারাই!"

কেহ কহিল "মহারাজের জয় হউক! গত যুদ্ধে আমার চারিটি পুত্র মরিয়াছে! একটি পুত্র মাত্র এখন আমার অন্ধের লড়ি। আপনার আজ্ঞা হইলে তাহাকেও যুদ্ধে পাঠাইয়া, এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহীন হইব। কিন্তু আপনি একজন পরের জন্য আপনার শত সহস্র সন্তানের এই অকাল মৃত্যু আনয়ন করিবেন?"

বহু কণ্ঠ হইতে ইহার পর রব উঠিল "জয় মহারাজের জয়! মহারাজ আপনার সন্তানদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন একজন যবনের জন্য তাহাদিগকে হত্যা করিবেন না।"

তাহারা নিস্তব্ধ হইলে রাজা বলিলেন, "বৎসগণ শোন। সন্তানের মঙ্গল পিতার সর্ব্বাগ্রে পালনীয় ইহা সত্য। কিন্তু সন্তানের শরীর রক্ষা করিলেই তাহার প্রধান মঙ্গল সাধিত হয় না, তাহাকে ধর্ম্ম পালন করিতে শিক্ষা প্রদান পিতা মাতার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। কেন না তাহাতেই তাহার প্রধান মঙ্গল। আমি যদি শরণাগত বন্ধুকে বিপদের ভয়ে পরিত্যাগ করি তাহা হইলে তোমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। তাহাতে কেবল তোমাদিগের আতিথ্য ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এমন নহে, তাহার পূর্ব্বকৃত সৎব্যবহারের বিনিময়ে কৃতঘ্নতাচরণ করা হইবে। তোমরা সকলেই বোধ হয় জান, সেকন্দর সাহ যখন আমার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া আমাকে রাজসভায় ডাকিয়া পাঠান; আমার নিরাপদতার নিদর্শন স্বরূপ সাহেবুদ্দিন তখন আমার শিবিরে জামিনরূপে ছিলেন।অতঃপর সেকেন্দর সাহ তাহার শপথ ভঙ্গ করিয়া আমাকে এবং আজিম খাঁকে বন্দী করিলে আমার সৈনিক দুইজন কৌশলে পলায়ন পূর্ব্বক সেই সংবাদ শিবিরে আনয়ন করে। সাহেবুদ্দিন এই খবর শুনিয়া স্বেচ্ছায় আমার উদ্ধার প্রয়াসী হইয়া দ্রুত অশ্ব ধাবনে ৮ ঘণ্টার পথ ২ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে প্রাসাদে গিয়া গোপনে আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। তাঁহার বিপৎকালে যদি আমি সেই সদ্ব্যবহার ভুলিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করি—তাহা হইলে কি উপযুক্ত কাজ হয়?—বৎসগণ তাহা হইলে তোমরা কৃতঘ্নতা পাপে লিপ্ত হইবে।—পিতা সন্তানদিগকে অক্ষত রাখিতে নিজের শোণিত ঢালিতে কুণ্ঠিত হন না; একা আমার রক্তপাতে যদি তোমাদের সুখ শান্তি রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা হইত; আমি অকাতরে সুখে তাহা সমর্পণ করিতাম!—কিন্তু হায়! এস্থলে তাহা হইবে না; এই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে হইলে তোমাদেরও রক্তপাত করিতে হয়; এইজন্য আমার হৃদয় যন্ত্রণপীড়িত,—কিন্তু এই দারুণ যন্ত্রণাসত্ত্বেও আমার সন্তানদিগকে আমি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে উপদেশ দিই।—ইহা একজন ক্ষুদ্র যবনের জন্য প্রাণ সমর্পণ নহে; অসহায়ের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য, পূর্ব্বকৃত উপকারের জন্য, ন্যায়ের জন্য, বন্ধুত্বের জন্য। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধে মৃত্যুতে ইহলোকে কীর্ত্তি, পরলোকে স্বর্গলাভ! যদি একদিন মরিতেই হইবে তবে এই পুণ্য সংগ্রামে কিসের ডর?"

"আমাদের মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির" "আমরা লড়িব"; "ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিব"—"জয় জয় মহারাজের জয়"—এইরূপ বাক্যে সভাস্থল আলোড়িত, তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"শোন বৎসগণ, মিথ্যা, অকারণে আমার প্রজাদিগের, আমার সন্তানদিগের একটি চুলও আমি নষ্ট হইতে দিব না। প্রথমে আমি গায়সুদ্দিনের নিকট সাহেবুদ্দিনের মুক্তি প্রার্থনা করিব। সাহেবুদ্দিন যে গায়সুদ্দিনের ক্ষতি করিবেন না; সেজন্য আমি স্বয়ং জামিন হইতে চাহিব। এবং তাহার বদলে সাহেবুদ্দিনকে কোন দূরদেশে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়া পাঠান হউক; এইরূপ প্রস্তাব করিব। যদি

এ প্রস্তাবে সুলতান সম্মত না হন, তাহা হইলেই আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, নচেৎ নহে।”

প্রশ্ন হইল “কিন্তু সাহেবুদ্দিন যদি তাঁহার শপথ ভঙ্গ করেন? মুক্তি পাইলে যদি রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন? তাহা হইলে?”

রাজা বলিলেন “সাহেবুদ্দিন অত্যন্ত সৎস্বভাব; ধর্ম্মভীরু; আমার এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তিনি কখনই তাঁহার শপথ ভঙ্গ করিয়া আমাকে অপমানিত করিবেন না। অন্ততঃ গায়সুদ্দিনের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহী হইবেন না। তাহার পর তিনি রাজত্ব চাহেন—আমি পর্য্যন্ত তাহার জন্য যুদ্ধ করিব।”

প্রজারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজার অভিমতে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। রাজা সেই দিনই অপরাহ্ণে কুতবকে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। কুতব তাঁহার সাহসে, স্পর্দ্ধায় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহার মুণ্ডপাত সঙ্কল্প জানাইয়া দিল। রাজা বলিলেন, “তবে তাহাই হউক, আমার মুণ্ডপাত করিয়া সাহেবুদ্দিনকে লইতে পারেন লউন, নহিলে তাহাকে পাইবেন না।”

ভাষা-বিভ্রাট।

আমাদের সকল কাজেই একটা বাহিরে ও ভিতরে প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের জীবনে আপিষ, চেয়ার, টেবিল, প্যাণ্টলুন ও ইংরাজি ভাষা। ভিতরের জীবনে—তক্তপোষ, তাকিয়া, হুঁকা, ধুতি ও বাঙ্গালা ভাষা। একৃজামিন দিবার সময় ও বক্তৃতা করিবার সময় মিল্ ও স্পেন্সরের ফিলজফি, গৃহমধ্যে পঞ্জিকা ও হাঁচি টিকৃটিকির ফল। আমাদের অন্তঃপুর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অন্তঃপুর হইয়া পড়িয়াছে, কেননা আগে বাহিরে ভিতরে তবু একটা সামঞ্জস্য ছিল; এখন অন্তঃপুর যথার্থ অন্তঃপুরই বটে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে প্রথমেই এই সামঞ্জস্যের অভাব চোখে পড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজি শিক্ষার ও ইংরাজি প্রণালীর প্রভাব আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রেই আসিয়া পড়িয়াছে; অন্তঃপুরে ও বিশ্রামের স্থানে এখনও পৌঁছাইতে পারে নাই। আমাদের ভাবের রাজ্যেও কর্ম্মক্ষেত্র, অন্তঃপুর ও বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। ভাবের রাজ্যের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের ভাষা ও ভাবের ছাঁচ ইংরাজি; অন্তঃপুরে ও বিশ্রামের স্থানে আমাদের ভাষা ও ভাবের ছাঁচ বাঙ্গালী।

কাজেই বাঙ্গলা লেখকদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট সকরুণ বিলাপধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় যে "বাঙ্গলা গ্রন্থ অবজ্ঞা ভরে অন্তঃপুরে নির্ব্বাসিত করিয়া" দেওয়া হয়, এবং বাঙ্গলা লেখককে কেহ কখনও Serious চক্ষে দেখেন না। হইবেই ত। আমাদের সমস্ত কাজের কথা আমরা ইংরাজিতেই চালাইয়া থাকি। বাঙ্গলা ভাষাটা কেবল অকেজো কথার এবং কবিতার জন্য। অতএব অন্তঃপুরই তাহার উপযুক্ত স্থান। আমাদের সমস্ত Serious চিন্তা ইংরাজি ছাঁচে ঢালা এবং ইংরাজি ভাষাই তাহার উপযুক্ত অবলম্বন।

"শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধের লেখক বঙ্গদেশের "লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা" সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, আমার ত মনে হয় যে তাহাকে "অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্ব্বাসিত" করিবার জন্য সে নিজেই কতক পরিমাণে দায়ী।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে বেশের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই "লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী" যদি অন্তঃপুর ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে চাহেন, তবে উপযুক্ত বেশ পরিধান করিতে হইবে। কালাপেড়ে সাড়ী পরিয়া ঘোড়ায় চড়িতে চেষ্টা করাটা ভাল সাজে না; তাহার জন্য পোষাকই শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ করিতে যদি বাহির হইতে হয়, তাহা হইলে কঙ্কন, নুপুর ও ময়ূরপুচ্ছ ছাড়িয়া মালকোঁচা ও শিরস্ত্রাণ আঁটাই সুবিধা।

"শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধের লেখক বঙ্গভাষার সহিত নব্য শিক্ষিত যুবাদের সম্পর্ক লইয়া অনেকরূপ বিদ্রূপ, ঠাট্টাতামাসা করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত দোষটাই কি তাহাদের? যুবাদের মধ্যে অনেকেরই বোধ হয়, আর আমাদের পুরাতন ধরণের কনে-বউ বঙ্গভাষা লইয়া কাজ চলে না, আজকালকার নূতন ধরণেরস্ত্রী,—স্বাধীনতার উপযোগী বধূর আবশ্যক, তাই তাঁহারা বঙ্গভাষার ঘোমটা খোলাইয়া, দু চারিটি ইংরাজি কথাস্বরূপ জুতা মোজা পরাইয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহেন। সাহিত্যসমাজের প্রাচীন নেতারা ঘাড় নাড়িয়া বলেন "উঁহু এ ত আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরের বউ বঙ্গভাষা নয়; এ যে কোন্ ফিরিঙ্গির ঝি।"

আমাদের লেখক সম্প্রদায় রাগ করিয়া বলিবেন, "কেন, আমাদের ভাষা কি সকল কাজের উপযোগী নয়? দেখ আমরা বাঙ্গলা ভাষায় কি না করিতেছি? কবিতা, উপন্যাস, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক সকল প্রকার প্রবন্ধ ভূরি ভূরি লিখিতেছি; এমন কি জ্ঞেয় অজ্ঞেয়, সাধ্য অসাধ্য কোন বিষয়েই প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছি না, দুঃখের মধ্যে এই যে কেহ পড়ে না।"

কবিতা ও উপন্যাস বাঙ্গলা ভাষায় যে কত ভাল লেখা যাইতে পারে তাহা আমাদের সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণ যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন গূঢ়তত্ত্ব গভীর ও গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে বসিলেই বিপদ। বিজ্ঞান, ফিলজফি, পলিটিক্স ইত্যাদি আলোচনা করিবার ক্ষমতা বঙ্গভাষার নাই। যাহা নিতান্ত ঘরের তাহারই জন্য আমাদের ভাষায় স্থান আছে, নূতন আমদানী তাহার মধ্যে আঁটে না।

ছেলেবেলার পোষাকের মতন আমাদের ভাষা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে ছোট হইয়া গিয়াছে। সকল জাতির ইতিহাসেই এই প্রকার একটা সময় আসিয়া থাকে। তাহারা তখন নিজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে থাকে। ইংলণ্ডে সেক্সপিয়রের সময় দেখ। সেই সময়ে হঠাৎ ভাবরাজ্যের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠাতে তাহাদের বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ জন্য লাটিন, ফরাসী ইটালীয় ভাষা প্রভৃতি চারিদিক হইতে মালমসলার সংগ্রহ আরম্ভ হইল।

আমাদের কিন্তু নূতন ভাবগুলা যেমন আমদানী মাত্র, তেমনি আমরা তাহাদের জন্য নূতন ঘর নির্ম্মাণ না করিয়া, তাহাদিগকে পৈতৃক বাড়ি হইতে কিঞ্চিৎ তফাতে হোটেলে কিম্বা ভাড়া বাড়িতে রাখিয়া দিই। না করিয়াই বা করি কি? এই সব বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া আগত অতিথিদের জন্য আমাদের সাবেক ধরণের দিশী ঘরের মধ্যে স্থান নাই; আর স্থান করিয়া দিতে পারিলেও তাহার মধ্যে তাহারা হাঁফাইয়া মরিয়া যাইবে।

অতিথিদিগকে ঘরের লোক করিয়া লইতে হইলে আমাদের নিজের গৃহেই তাহাদের স্থান দিতে হইবে, এবং সেই জন্য নূতন ঘর প্রস্তুত করিয়া বাড়ি বড় করিতে হইবে।

কিন্তু এই সব ইয়ুরোপ-জাত অতিথিদের জন্য পুরাতন ধরণের দিশী ঘর করিয়া দিলে চলিবে না। ইহাদের জন্য আমাদের বাড়ির গঠন ও ধরণ পরিবর্ত্তন করাও আবশ্যক।

রূপক ছাড়িয়া দিয়া, আসল কথা এই যে, আমাদের নূতন আইডিয়াগুলিকে যথার্থ আপনার করিয়া লইতে হইলে আমাদের নিজের ভাষার মধ্যে তাহাদের জন্য স্থান করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য বঙ্গভাষাকে আরও বিস্তৃত, সক্ষম ও বলবান করিতে হইবে। এখন আমরা আসল চিন্তা করিবার বিষয়গুলি আমাদের নিজের ভাষায় চিন্তা করিতে

কিম্বা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ বলিয়া আপনা হইতে দূরে ও বিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। সেগুলি আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।

চেষ্টা করিলে কতদূর পর্য্যন্ত ভাষার উন্নতিসাধন সম্ভব তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ভাষার গঠনের উপর অনেক পরিমাণে তাহার ক্ষমতা নির্ভর করে। সরল ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য সেণ্টেন্সের সরল গঠনই যথেষ্ট; কিন্তু কম্‌প্লেক্স্‌ ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে সেণ্টেন্সেরও কম্‌প্লেক্স্‌ গঠন আবশ্যক হয়। চিন্তারাজ্যে উত্তরোত্তর আমাদের যত উন্নতি হইতে থাকে আমাদের ভাবগুলিও সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর অধিক জটিল হইতে থাকে। যে পরিমাণে কোন ভাষায় সহজে সেণ্টেন্সকে কম্‌প্লেক্স্‌ ছাঁচে ফেলা যাইতে পারে, সেই পরিমাণে সেই ভাষার ক্ষমতা, এবং দুরূহ ও জটিল চিন্তার জন্য উপযোগিতা। সহজে নূতন কথা সৃজন করিতে পারাও ভাষার একটি মহা অস্ত্র। কোন ভাষায়, বিশেষ্য হইতে বিশেষণ, বিশেষণ হইতে বিশেষ্য, ধাতু হইতে বিশেষ্য ও বিশেষণ, একটা হইতে আর একটা সহজেই সৃজন করিয়া লইতে পারা যে কতটা বলের কারণ তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। ইংরাজি ভাষায় এই সব পারা যায় বলিয়াই তাহার এতটা ক্ষমতা, বলিতে পারি না বাঙ্গালাভাষাকে ইংরাজির সমান করিয়া তোলা কতদূর সম্ভব।

বাঙ্গলাতে কিন্তু এখনও যে অনেক নূতন কথার আবশ্যক তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সৃজন করিয়াই হউক বা অন্য ভাষা হইতে সংগ্রহ করিয়াই হোক, কোন রকমে আমাদের কথার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্তই আবশ্যক। নূতন কথা চালান প্রসিদ্ধ সুলেখকগণেরই কার্য্য; একমাত্র তাঁহারাই ইহাতে সফল হইতে পারেন।

লেখকগণ কিন্তু গোড়া হইতেই আক্ষেপ করিতেছেন,—"আমরা ত লিখে খালাস, কিন্তু পড়ে কে? আমরা ত অনেক রকম গূঢ় তত্ত্ব মাতৃভাষায় আলাচনা করিতেই আছি—কিন্তু পাঠক কোথায়?" আজ কাল দাঁড়াইয়াছে বটে যে বিজ্ঞানের, ফিলজফির কিম্বা পলিটিক্সের কোন কথা বাঙ্গালায় লিখিলে কেহ পড়ে না; এবং পড়ে না বলিয়াই যাঁহারা এ বিষয়ে যথার্থ পাঠ্য কিছু লিখিতে পারিতেন, তাঁহাদের লিখিবার উৎসাহ থাকে না।

শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়েরা বেয়াদবী মাপ করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে; তাঁহাদের Serious লেখা না পড়িবার বিলক্ষণ কারণ আছে। আমাদের দেশে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া, নূতন আবিষ্কার করিয়া, ওরিজিন্যাল কিছু একটা লিখিতে পারেন

এমন লেখক নাই বলিলেও চলে। ইংরাজি হইতে সঙ্কলিত ভাব সেকণ্ডহ্যাণ্ড বিতরণ করা মাত্রই হইয়া থাকে। তাহাতে আপত্তি নাই। এদেশে এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইয়ুরোপীয় জ্ঞান সেকণ্ডহ্যাণ্ড বিতরণ করিতে হইবে। কিন্তু আপত্তি এই যে যে রকম ভাষায় লেখা হয়, তন্মধ্যে সুখ ও অর্থ উভয়ই দুর্লভ। ভাষাটা প্রীতিকর না করিতে পারিলে নিদান পক্ষে বোধগম্য করা আবশ্যক।

নূতন কথা সৃজন করিয়া লিখিতে হইলে ভাষা যে দুর্বোধ্য হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু অনেক সময় কথা নূতন করিয়া সৃজন না করিয়া যদি সুপরিচিত ইংরাজি কথা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ভাষাটা ঢের বেশি বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা। আমাদের নূতন ভাবগুলি ইংলণ্ড হইতে আমরা ইংরাজি ভাষা-যোগে পাইয়াছি; এ অবস্থায় সেই সব ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য নূতন কথা সৃজন না করিয়া ইংরাজি কথাটি বাঙ্গালায় প্রচলিত করাই ত সহজ উপায় মনে হয়। তাহা ছাড়া, আইডিয়া আমরা কথার আকারেই পাই; তাহাকে কথা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা পাইতে পারি না। এক একটি কথার আবার মোটামুটি যে অর্থ আছে, তাহার ভিতর তদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি সূক্ষ্ম অর্থের ইঙ্গিত মাত্র আছে। সংস্কৃত হইতে কোন কথা লইয়া ইংরাজি কোন কথার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করার আশঙ্কা এই যে সেই কথার, সুতরাং সেই আইডিয়ার (কেননা আমরা আইডিয়া কথার আকারেই পাইয়াছি) মধ্যে যে সব সূক্ষ্ম অর্থের ইঙ্গিত মাত্র ছিল—সেগুলি হারাইয়া গিয়া, অন্য অর্থের আভাষ আসিয়া পড়িতে পারে।

তবে আমাদের অতি পেট্রিয়টিক লেখক মহাশয়েরা (আর আমাদের স্বদেশানুরাগের ভিতর খানিকটা আব্‌দার ও অভিমানের ভাব আছে) ইংরাজি ভাষার নিকট কোন কথার জন্য ঋণী হওয়া বরদাস্ত করিতে পারেন না। তাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবোধগম্য একটা সংস্কৃত কথা বাহির করিয়া ইংরাজি কোন সুপরিচিত কথার কোন রকমে কাজ চালাইবার মতন প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, অথচ সুপরিচিত, বোধগম্য ও সেই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ঠিক উপযুক্ত ইংরাজি কথাটি প্রাণান্তেও ব্যবহার করা হইবে না। কোন কোন লেখক আবার তাঁহার নূতন সৃষ্ট বাঙ্গালা কথাটির পার্শ্বে ব্র্যাকেটের মধ্যে তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দটি বসাইয়া দেন! এক একটি কথার অর্থ স্থির করিতে তাহার লেখক ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহেন। কিছু দিন হইল, কোন এক প্রবন্ধের মধ্যস্থিত "বিবিক্ত" শব্দটির অর্থ লইয়া কাহারও কাহারও বিষম গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে অনেক তর্ক বিতর্কের পর লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, "বিবিক্ত" মানে আবষ্ট্র্যাক্ট! আবষ্ট্র্যাক্ট অর্থে "বিবিক্ত" শব্দ ব্যবহার হইতে পারে

কি না মীমাংসা করা আমার সাধ্য নহে ; কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের নিকট "বিবিক্ত" অপেক্ষা "আবষ্ট্র্যাক্ট" যে শত সহস্রগুণে বোধগম্য হইত এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। ফলে দাঁড়ায় এই যে এই প্রকার ভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলি ইংরাজি না জানিলে ও প্রবন্ধের বিষয়টি তৎপূর্ব্বে ইংরাজিতে অধ্যয়ন করিয়া আয়ত্ত করিয়া না থাকিলে পাঠকের বুঝিতে পারার অতি অল্পই সম্ভাবনা।

এই সব অদ্ভুত গড়া কথা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি ? যাঁহারা ইংরাজি জানেন তাঁহাদের নিকট এই প্রকার কথা অপেক্ষা ইংরাজি কথাটা সহজেই বোধগম্য; আর যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদের নিকট "বিবিক্ত" ও "আবষ্ট্র্যাক্ট" উভয় শব্দই সমান দুর্বোধ্য। বরং আবষ্ট্র্যাক্ট শব্দের অর্থ যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সব টেনে-বুনে-তৈয়ার করা কথার দৌরাত্ম্যে বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলা পাঠ করা সুখহীন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা ইংরাজি জানেন তাঁহাদের এরকম মনে করা আশ্চর্য্য নয় যে এই সব অবোধগম্য বাঙ্গলা প্রবন্ধ পাঠ করা অপেক্ষা বিষয়টা মূল ইংরাজিতে পড়া ঢের সহজ আর তাহাতে ঢের বেশি সুখও প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না তাঁহারা এই সব প্রবন্ধের মধ্যে দন্তস্ফুট করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। লেখকের ভাবগুলি ইংরাজি ও কথাগুলি তাঁহার নূতন সৃষ্টি ;—যাঁহারা ইংরাজি জানেন না তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন ? যে "ইভোল্যুসন". শব্দ জানে না সে যে চট্ করিয়া "অভিব্যক্তি" শব্দের অর্থ বুঝিয়া লইবে এরূপ আশা করা কি নিতান্ত দুরাশা মাত্র নয় ? এ অবস্থায় "ইভোল্যুসন" শব্দটা ব্যবহার করাই ত সুবিধা।

চিন্তা করিবার মত উপযুক্ত বিষয়গুলি আমরা প্রথম হইতে ইংরাজিতেই শিক্ষা পাইয়াছি। আমাদের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই ইংরাজি ছাঁচে ঢালা ও ইংরাজি শব্দগুলাই আমাদের নিকট পরিচিত ও সেই সব আইডিয়ার জন্য ঠিক উপযোগী। কাজেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে মনে মনে আওড়াইয়া লইতে হয়, "বিবিক্ত" মানে "আবষ্ট্র্যাক্ট", "অভিব্যক্তি" মানে "ইভোল্যুসন" ইত্যাদি। নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে না হইলে এরকম করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উঠা যায় না। ফলে দাঁড়ায় এই বাঙ্গালায় কোনরূপ Serious প্রবন্ধ দেখিলেই আমরা ভয়ে পাতা উল্টাইয়া কোন্ পৃষ্ঠায় ছোট গল্প কিম্বা হাল্কা ধরণের লেখা আছে তাহাই অন্বেষণ করি।

একবার ইংরাজি কথা বাঙ্গালা লেখায় চালাইতে আরম্ভ করিলে অতি সহজেই আমাদের ভাষায় অনেক নূতন কথা প্রচলিত হইয়া পড়িবে। আমরা কেহই ত কথা

কহিবার সময় অসংখ্য ইরাজি কথা বাঙ্গালার সঙ্গে মিশাইতে কুণ্ঠিত হই না। কথিত ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার সামঞ্জস্য স্থাপন করিলে সুফল বই কুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া এখনও অনেক দিন ইয়ুরোপের নিকট আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে; যে সব বিষয়ে ইয়ুরোপের নিকট আমাদের শিক্ষা পাইতে হইতেছে ও হইবে, সেই সব বিষয়ের ইংরাজি কথা যদি আমরা বাঙ্গালা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ইংলণ্ডের জ্ঞানের উন্নতির সহিত আমাদের সম্পর্ক রাখা সহজ হইবে। আর এদেশে প্রচলিত প্রণালীমতে ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গালাতে শিক্ষা দেবারও সুবিধা হইবে।

লক্ষ্মী।

গভীর জলধি তলে পাতাল পুরীর মাঝ,
সাগরকুমারী লক্ষ্মী, একেলা করিতে বাস!
বিকশিত সৌন্দর্য্যের আরক্তিম শতদল,
চুম্বিয়া রহিত রাঙ্গা কোমল চরণ তল;
সুমধুর, সুকুমার সৌরভের মোহে তার;
মূরছি রহিত যেন শব্দহীন চারিধার!
প্রবাল পালঙ্ক পরে সে স্তব্ধ বিজন দেশে;
তুমি বুঝি ঘুমাইতে রাজনন্দিনীর বেশে!
কাঁদিলে নয়ন হ'তে ঝরিত মুকুতাগুলি,
শুকুতা কৌটার মাঝে সিন্ধু তা' রাখিত তুলি!
হাসিলে মাণিক কণা ঝর ঝর যেত পড়ে',
যতনে রাখিত সিন্ধু রতন ভাণ্ডারে ভরে'!
প্রাণীশূন্য সে প্রদেশে, তুমি সৌভাগ্যের রাণি,
রূপেতে আঁধার আলো করেছিলে একাকিনী!
একদা সায়াহ্নে, নীল প্রশান্ত গগন বুক,
সিন্ধু প্রান্তে পূর্ণচন্দ্র আধেক তুলেছে মুখ;
সাগরের স্ফীত বক্ষে জ্যোৎস্নার শ্বেত রেখা,
তরঙ্গিত ছায়াপথ সমান যেতেছে দেখা!
অনন্ত হিল্লোল মুখে অস্ফুট কল্লোল ভাষে;
সীমাশূন্য কি কাহিনী শোনে সিন্ধু মহোল্লাসে!

গভীর রহস্য তার ভেদ করিবার তরে,
দাঁড়াইয়া সুরাসুর সমুদ্রসৈকত পরে ;
হেরিল বিস্ময়ে সব হেনকালে ধীরে, ধীরে ;
অতুল মূরতি তব উঠিছে নীলাম্বু নীরে !
(যেন, নিদ্রার অতল হতে স্বপন উঠিছে ভাসি !)
এলায়ে পড়েছে কালো দীর্ঘ আর্দ্রকেশ রাশি ;
নিখিলেতে নিরুপম সুন্দর মুখের মাঝে,
মধুর ঈষৎ হাসি অরুণ অধরে রাজে।
সুবর্ণখচিত সূক্ষ্ম লোহিত বসনাঞ্চল,
বারিসিক্ত, ঢাকা তায় চারু শুভ্র বক্ষঃস্থল !
রতন ভূষিত বাহু অনাবৃত শোভা তার,
গলে মুকুতার মালা, সেকি দৃশ্য চমৎকার !
জ্যোৎস্নালোকে সিন্ধু বক্ষে, নীল তরঙ্গের পর,
পদ্মপুষ্পে বিরাজিত প্রতিমাটি মনোহর !
আকাশ মোহিত হয়ে হেরিছে নীরবে হাসি,
দু একটি কেশগুচ্ছ নাড়িছে সমীর আসি !
ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, নুয়ে নুয়ে দুলিছে কমল, পায়,
অতি লঘু তনুলতা, মৃদুল হেলিছে তায় !
সর্ব্বাঙ্গে সলিলসিক্ত পূত বিমলতা-ভাতি,
হেরি মুগ্ধ দেবগণ প্রণময়ে জানু পাতি !
দেবতার আবাহনে, লইতে সবার পূজা ;
নীর হ'তে তীরে ধীরে আসিলে মৃণাল ভুজা !
হেরিলে চরণতলে দরিদ্র মলিন অতি,
ধূলি মাখা তনু লয়ে প'ড়ে আছে বসুমতী ;
প্রসন্ন করুণাদৃষ্টি পাতে মাত্র মা তোমার ;
ধন ধান্যে ফল ফুলে পূর্ণ হ'লো গৃহ তার !
আনন্দে বসিয়া হৃদি-কমল কুটীরে কবি,
আঁকিছে কল্পনা পটে কমলা, তোমার ছবি !

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

দেবপ্রয়াগ।

১২ই মে মঙ্গলবার,—আজ দেবপ্রয়াগে অবস্থান। অনেকদিন পরে লোকালয়ে এসেছি; বোধ হ'লো এতদিন যেন জীবনের নেপথ্যে নেপথ্যে বেড়াচ্ছিলুম—তার মধ্যে না ছিল জনকোলাহল না ছিল কিছু; কেবল মুক্ত প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য থরে থরে সাজিয়ে—আমার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠান করেছিল, আজ হঠাৎ মানবকোলাহলে সে দৃশ্যের পরিবর্ত্তনে একটু নূতনত্ব পাওয়া গেল। বাজারে দোকানদারদের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রী সম্বন্ধে আলোচনা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাসি গল্প প্রভৃতি শুনে মনে হলো এতদিন পরে বুঝি সংসারে ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম ও সুখভোগের ইচ্ছাটাও বেশ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। এ কদিন ত অবিশ্রাম পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, খানিক ব'সে আয়েস করার কথা তখন একবারো মনে হয়নি কিন্তু আজ পাছুটো একবার ছুটী নেবার জন্যে মহা ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে; আমি ফিলজফাইজ কল্লুম যতক্ষণ মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে, যতক্ষণ দেখে যে কষ্ট ছাড়া আর কিছু লাভের কোন সম্ভাবনা নেই ততক্ষণ সে তা বেশ ঘাড় হেঁট ক'রে সহ্য করে যায় কিন্তু যখনই তার ফাঁক দিয়ে একটু সুখের ছায়া নজরে পড়ে তখনই আবার সব ছেড়ে সেই সুখটুকুর পাছু পাছু ছুটে, আর তা লাভ কর্ত্তে না পাল্লেই নিজেকে মহা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করে। আমার আজ আর উঠ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু নগর ত দেখা চাই, কাজেই আলস্য ছেড়ে উঠে, নগর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল।

দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড়ই সুন্দর, আমার পূর্ব্বপত্রে বোধ করি তার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হয়েছে; পূর্ব্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম হয়েছে, গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশী তাই লোকে বলে গঙ্গায় অলকনন্দা মিশেছে কিন্তু ঠিক কথা বল্‌তে হ'লে বলা উচিত অলকনন্দার সঙ্গে গঙ্গা মিশেছে। অলকনন্দা ঘোর রবে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে যাচ্ছে; তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গ কল্লোল আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি ব'লে বোধ হয়, সেই ভৈরব দৃশ্যের মধ্যে গঙ্গা কুলকুল রবে তার নির্ম্মল জলরাশি ঢেলে দিচ্ছে। আমাদের বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দুটো নদীর একটা সঙ্গম বড় বিশেষ ব্যাপার নয়, দৃশ্যতেও তেমন কিছু বৈচিত্র্য থাকে না,—কেবল সঙ্গমস্থলটা খানিকটা প্রশস্ত হয় মাত্র, আর দুটো নদী যে কেমন ক'রে মিশে গেল তার খবরও পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্ন ত দূরের কথা। কিন্তু এদেশের পার্ব্বত্য নদী, পার্ব্বত্য জাতির মত তেজস্বী, সহজে আত্ম বিসর্জ্জন কর্ত্তে রাজী নয়, যথেষ্ট আয়োজন ক'রে তবে বিসর্জ্জন করে।

গভীর রহস্য তার ভেদ করিবার তরে,
দাঁড়াইয়া সুরাসুর সমুদ্রসৈকত পরে ;
হেরিল বিস্ময়ে সব হেনকালে ধীরে, ধীরে ;
অতুল মূরতি তব উঠিছে নীলাম্বু নীরে !
(যেন, নিদ্রার অতল হতে স্বপন উঠিছে ভাসি !)
এলায়ে পড়েছে কালো দীর্ঘ আর্দ্রকেশ রাশি ;
নিখিলেতে নিরুপম সুন্দর মুখের মাঝে,
মধুর ঈষৎ হাসি অরুণ অধরে রাজে।
সুবর্ণখচিত সূক্ষ্ম লোহিত বসনাঞ্চল,
বারিসিক্ত, ঢাকা তায় চারু শুভ্র বক্ষঃস্থল !
রতন ভূষিত বাহু অনাবৃত শোভা তার,
গলে মুকুতার মালা, সেকি দৃশ্য চমৎকার !
জ্যোৎস্নালোকে সিন্ধু বক্ষে, নীল তরঙ্গের পর,
পদ্মপুষ্পে বিরাজিত প্রতিমাটি মনোহর !
আকাশ মোহিত হয়ে হেরিছে নীরবে হাসি,
দু একটি কেশগুচ্ছ নাড়িছে সমীর আসি !
ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, নুয়ে নুয়ে দুলিছে কমল, পায়,
অতি লঘু তনুলতা, মৃদুল হেলিছে তায় !
সর্ব্বাঙ্গে সলিলসিক্ত পূত বিমলতা-ভাতি,
হেরি মুগ্ধ দেবগণ প্রণময়ে জানু পাতি !
দেবতার আবাহনে, লইতে সবার পূজা ;
নীর হ'তে তীরে ধীরে আসিলে মৃণাল ভুজা !
হেরিলে চরণতলে দরিদ্র মলিন অতি,
ধূলি মাখা তনু লয়ে প'ড়ে আছে বসুমতী ;
প্রসন্ন করুণাদৃষ্টি পাতে মাত্র মা তোমার ;
ধন ধান্যে ফল ফুলে পূর্ণ হ'লো গৃহ তার !
আনন্দে বসিয়া হৃদি-কমল কুটীরে কবি,
আঁকিছে কল্পনা পটে কমলা, তোমার ছবি !

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

দেবপ্রয়াগ।

১২ই মে মঙ্গলবার,—আজ দেবপ্রয়াগে অবস্থান। অনেকদিন পরে লোকালয়ে এসেছি; বোধ হ'লো এতদিন যেন জীবনের নেপথ্যে নেপথ্যে বেড়াচ্ছিলুম—তার মধ্যে না ছিল জনকোলাহল না ছিল কিছু; কেবল মুক্ত প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য থরে থরে সাজিয়ে—আমার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠান করেছিল, আজ হঠাৎ মানবকোলাহলে সে দৃশ্যের পরিবর্ত্তনে একটু নূতনত্ব পাওয়া গেল। বাজারে দোকানদারদের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রী সম্বন্ধে আলোচনা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাসি গল্প প্রভৃতি শুনে মনে হলো এতদিন পরে বুঝি সংসারে ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম ও সুখভোগের ইচ্ছাটাও বেশ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। এ কদিন ত অবিশ্রাম পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, খানিক ব'সে আয়েস করার কথা তখন একবারো মনে হয়নি কিন্তু আজ পাছুটো একবার ছুটী নেবার জন্যে মহা ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে; আমি ফিলজফাইজ কল্লুম যতক্ষণ মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে, যতক্ষণ দেখে যে কষ্ট ছাড়া আর কিছু লাভের কোন সম্ভাবনা নেই ততক্ষণ সে তা বেশ ঘাড় হেঁট ক'রে সহ্য করে যায় কিন্তু যখনই তার ফাঁক দিয়ে একটু সুখের ছায়া নজরে পড়ে তখনই আবার সব ছেড়ে সেই সুখটুকুর পাছু পাছু ছুটে, আর তা লাভ কর্ত্তে না পাল্লেই নিজেকে মহা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করে। আমার আজ আর উঠ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু নগর ত দেখা চাই, কাজেই আলস্য ছেড়ে উঠে, নগর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল।

দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড়ই সুন্দর, আমার পূর্ব্বপত্রে বোধ করি তার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হয়েছে; পূর্ব্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম হয়েছে, গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশী তাই লোকে বলে গঙ্গায় অলকনন্দা মিশেছে কিন্তু ঠিক কথা বল্‌তে হ'লে বলা উচিত অলকনন্দার সঙ্গে গঙ্গা মিশেছে। অলকনন্দা ঘোর রবে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে যাচ্ছে; তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গ কল্লোল আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি ব'লে বোধ হয়, সেই ভৈরব দৃশ্যের মধ্যে গঙ্গা কুলকুল রবে তার নির্ম্মল জলরাশি ঢেলে দিচ্ছে। আমাদের বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দুটো নদীর একটা সঙ্গম বড় বিশেষ ব্যাপার নয়, দৃশ্যতেও তেমন কিছু বৈচিত্র্য থাকে না,—কেবল সঙ্গমস্থলটা খানিকটা প্রশস্ত হয় মাত্র, আর দুটো নদী যে কেমন ক'রে মিশে গেল তার খবরও পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্ন ত দূরের কথা। কিন্তু এদেশের পার্ব্বত্য নদী, পার্ব্বত্য জাতির মত তেজস্বী, সহজে আত্ম বিসর্জ্জন কর্ত্তে রাজী নয়, যথেষ্ট আয়োজন ক'রে তবে বিসর্জ্জন করে।

বদরিকাশ্রমের পথে যে কটা যায়গা দেখেছি, তার মধ্যে দেবপ্রয়াগই আমার সবচেয়ে ভাল বোধ হ'লো। এ যেন ঠিক একখানা ছবি, পর্ব্বতের বিবিধ দৃশ্য, ছোট ছোট ঘর বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা রাস্তা, অনুচ্চ মন্দির, যেন পর্ব্বতের গা খুঁদে বের করা হয়েছে ; তার পর, বৃক্ষলতা, নানা রকম সুন্দর সুন্দর ফুল, স্বচ্ছন্দচিত্ত গাড়োয়ালী-দের নিঃশঙ্ক পদচারণা ও বেশবিন্যাসশূন্য প্রফুল্ল বালকবালিকার ছুটাছুটি বা শাখাপত্র-প্রচুর দীর্ঘ বৃক্ষমূলে জটলা, এ সব দেখে মনে হয় না যে এ আমাদের সেই বহু প্রাচীন, জ্ঞানবৃদ্ধ, নিয়মবদ্ধ এবং দুঃখ ও অশান্তি পূর্ণ পৃথিবীব একটা অংশ। এখানে এসে বাস্তবিকই—

"শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুব
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি' জীবন কুহরে
মঙ্গল আনন্দ ধ্বনি বাজে।"

আমরা এখানে এসে যেখানে বাসা নিয়ে ছিলুম সেথান হতে পাণ্ডাদের যেখানে বাস সেখানে যেতে হ'লে একটা টানা সাঁকো পার হ'তে হয়, এ সাঁকোটা অলকনন্দার উপর। দেবপ্রয়াগ আবার দুভাগে বিভক্ত, বাজারটা ইংরেজদের আর বাকি সহরটা তিহরীর রাজার। এই অলকনন্দা বৃটীশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা।

এখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে বেশ লেখাপড়ার চলন আছে, তবে এখানে বড় কেউ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারে না, হিন্দী ও সংস্কৃতেরই চর্চ্চা বেশী। কলকাতার কোন হিন্দী সাপ্তাহিক কাগজ এখানে তিন চারখান আসে। এখানে আমাদের দেশের কাগজ আসে শুনে মনে বড় আনন্দ হলো ; আমার পাণ্ডা আমাকে সেই কাগজ একখানা এনে দিলে, তাতে আমাদের দেশে শেয়ালের উপদ্রবের খবর পাওয়া গেল, একটা গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন হয়েছিল তার এক দীর্ঘ বিবরণ ; আরো কত কি পড়লুম,—পরনিন্দা, পরকুৎসা এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিসংকীর্ত্তন ও হরিসভার সঠীক বিবরণ পাঠ করে আমার যথেষ্ট উপকার ও প্রচুর আনন্দ হ'লো, কিন্তু এ সকল সংবাদে এই পাহাড়ী জাতির কি লাভ তা অনুমান করা আমার সাধ্যাতীত, বিকেলে পোষ্টমাষ্টার বাবুর কাছে শুনলুম এদেশে কারো নামে একখানা খবরের কাগজ আসা বিশেষ গৌর-বের বিষয়।

দেবপ্রয়াগে প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডার বাস, কিন্তু এত লোকের বাসের জন্যে আমাদের

দেশে যতখানি প্রশস্ত যায়গার দরকার, ততখানি দূরের কথা, সমস্ত গড়োয়াল রাজ্যে তার অর্দ্ধেক সমতল ভূমি আছে কিনা সন্দেহ। দেবপ্রয়াগে সমতল ভূমি নেই, পাহাড়ের গায়ে যে ঢালু আছে তারই উপর লোকে বসবাস করে; একটা যায়গা একটু বেশী ঢালু—সেইখানে এই পাঁচশ ঘর পাণ্ডা বাস কচ্চে। একটা বাড়ীর মধ্যে হয়ত দশ পনেরটি গৃহস্থের বাসস্থান। বাড়ীগুলি বড়ই অপ্রশস্ত, ঘরে জানালার সম্পর্কমাত্র নেই, যেন এক একটা সিন্দুক, আলো ও বাতাসকে যতদূর সম্ভব তাদের ভিতর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেওয়া হয়েছে; কোন কোন বাড়ী তিন চার তলা। রাস্তার ভাল বন্দোবস্ত নেই, কারো ঘরের বারান্দা দিয়ে, কারো ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা কর্ত্তে হয়। এইত বাড়ীর অবস্থা—এরই এক এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক এক বৃহৎ পরিবারের বাস, তার মধ্যেই রান্না ঘর, গোরুর ঘর এবং নিজেদের থাকবার বন্দোবস্ত; পাদুটো জুতো জোড়াটার ভিতরকার সমস্ত স্থানটা অধিকার ক'রে, জলকাদা থেকে আপনাদের বাঁচিয়ে যেমন দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করে, এদের এই সব সংকীর্ণ ঘরে বাসও অনেকটা সেই রকমের। আলাদীনের প্রদীপের দৈত্য যেমন এক রাত্রির মধ্যে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা তৈয়েরী ক'রেছিল, সেই রকম একটা দৈত্য এসে যদি এই সব ক্ষুদ্র কুটীর ভেঙ্গে এক রাত্রির মধ্যে বড় বড় ঘর তৈয়েরী ক'রে দিয়ে যায় তবে এই পাণ্ডা বেচারীরা তার মধ্যে একদিন বাস কর্ত্তেই হাঁপিয়ে ওঠে।

পাণ্ডাদের ঘর দ্বারের অবস্থা এরকম হলেও তারা খুব গরীব নয়। বদরিনারায়ণের অনুগ্রহে প্রতি বৎসর এই সময় তারা বেশ দু দশটাকা রোজগার করে, আর তাতেই তাদের সমস্ত বছরটা চলে যায়। কাশী গয়া হরিদ্বার কি অযোধ্যার পাণ্ডারা যে রকম জোর জবরদস্তী ক'রে যাত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে এরা সেরকম নয়, আর এরা অল্পেই সন্তুষ্ট। মধ্যে মধ্যে এরা নীচে নাবে, অনেকে কাশী পর্য্যন্তও যায়, কিন্তু বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত এগোয় না। গ্রীষ্মের ভয়েই তারা বাঙ্গলায় যেতে চায় না; হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি যায়গা হ'তে তারা যাত্রীদের সঙ্গ নেয়। পাণ্ডারা অতি শুদ্ধাচারী, এদের মধ্যে কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী সৌরাষ্ট্রী ও মারাটী ব্রাহ্মণই বেশী। এদেশে মোটেই মুসলমান নেই। পাণ্ডারা মাছ মাংস স্পর্শও করে না; এদের চলন মিতাক্ষরার মতে।

সঙ্গী সন্ন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন ঠিক কল্লেন, আমি বেচারী দিনটা কেমন ক'রে কাটাই ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ান গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। আমি খানিক বেড়াচ্চি খানিক বা একখানা পাথরের উপর ব'সে প্রকৃতির শোভা দেখ্‌চি, অস্তমান সূর্য্যের রশ্মিজাল পর্ব্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়চে। আমার দৃষ্টি কখন ধূসর পর্ব্বত অঙ্গে, কখন সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময়ী অলকনন্দার উপর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কতকগুলি পর্ব্বতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালে, এই নির্জ্জন প্রদেশে আমাকে একা ব'সে থাকতে দেখে তাদের যে বিস্ময় তা তাদের চাহনীতেই

বেশ বুঝ্তে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহসী হ'য়ে তারা আমাকে দুই একটা করে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কল্লে, কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে ফিরবো,—এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে দেখলুম আমার প্রতি সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বল্লেও তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ হ'লো। এই দূরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা, বোনের স্নেহের আভাষ ভারি প্রীতিকর।

অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের একটু উপরে বেশ একটু নির্জ্জন যায়গা আছে, বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে ব'সে পড়লুম, নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো, সন্ধ্যা হতে আর বেশী বিলম্ব নেই কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠ্তে ইচ্ছে হ'লো না। নদীর দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে পেছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে, বেশ সুন্দর দেখ্তে; অরচিতবেশ, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়েছে, হাতে কতকগুলো সুন্দর লতা পাতা, ও ফুল ফল। তারা উপর হতে নেবে আস্‌ছিল। আমাকে দেখে তারা একটু থমকে দাঁড়াল, দুজনে কি বলা বলি কল্লে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবার যোগাড় কল্লে। আমি তাদের সঙ্গে কথা কবার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ কর্ত্তে পাল্লুম না, তাদের ডাকতেই তারা ফিরে এল। মেয়ে দুটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড় সে একটু বেশী লাজুক, সলজ্জ ভাবে পাশের একটা বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আজন্ম পার্ব্বত্যপ্রকৃতির মধ্যে বর্দ্ধিত হ'লেও তার লজ্জাশীলতা দেখলুম আমাদের বঙ্গবালিকাদের মতই প্রবল এবং সেই রকম মধুর। ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালে, আমি তাদের বাড়ী কোথা, কে আছে, ক' ভাই, ক' বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আরম্ভ কল্লুম, প্রথমে তার কথা কইতে একটু বাধবাধ ঠেকল, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল, সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা কথা আমার মনে বড় বেজেছিল তাই সেটা বেশ মনে আছে। আমি যখন তাকে বল্লুম যে "আমার মা মাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই," তখন সে তার করুণ এবং আয়ত চক্ষু দুটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমল স্বরে ব'ল্লে "লেড়্‌কি ভি নহি?" কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হ'লো, আমার একটি "লেড়্‌কি" ছিল, জানি নে কোন অপরাধে তাকে তিন বৎসর হারিয়েছি। আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নে সেই সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো, আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেল, সে তার অপরিষ্কার ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে, তার কোমল ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের আঙ্গুল নাড়তে লাগলো। আর সেই স্নেহস্পর্শে, তার অকপট সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম, বালিকা আমাকে আর কোন কথা বল্‌তে পার্‌লে না। আমি জান্‌তে পাল্লুম মেয়েটি

তার মাবাপের একমাত্র সন্তান, তাই বুঝি তার মনে হয়েছিল মানুষের একটি মেয়েও না থাকা কতটা অসম্ভব!

সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে এল; মেয়ে দুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চল্‌তে লাগলো, আর ঘন ঘন "হুসিয়ারি" "খবরদারি" কর্ত্তে লাগলো, পাছে পাথরে ঠক্কর লেগে আমার পায়ে ব্যথা হয়। আমাকে তারা রাস্তায় তুলে দিয়ে বিদায় নিলে; আমার প্রাণের মধ্যে বড় কষ্ট বোধ হ'ল। হায়, আবার কখন কি জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যদিই বা হয়, তা হ'লে আর কি তাদের সেই করুণারূপিনী সরলা বালিকা মূর্ত্তিতে দেখ্‌বো?— দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসার দিকে অগ্রসর হ'লুম।

বাসায় এসে দেখি, পাণ্ডারা অনেকে সেখানে উপস্থিত। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় আমার জন্যে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা সন্ন্যাসী তাঁদের নিজের গতিবিধি বেশ ঠিক আছে, কিন্তু আমি গৃহস্থ, মনের চাঞ্চল্য যথেষ্ট আছে, কখন কোথায় চ'লে গিয়ে কি বিপদে পড়ি এই ভয়ে তাঁরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমি যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই তীর্থ ভ্রমণে বের হয়েছি তিনি আমাকে প্রতিপদে হারান, দু পা আগে গেলে ব্যস্ত হন, দু পা পাছে পড়'লে রাস্তায় বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। আজ দেখলুম অনেকক্ষণ আমাকে না দেখে তিনি ঠিক ক'রে বসে আছেন আমি হয়তো কোথাও চ'লে গিয়েছি, যাহোক আমাকে পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। সন্ধ্যার পর আমাদের অনেক কথা হ'লো, পূর্ব্বপত্রের সেই বাঙ্গালী বাবুর কথাও উঠ্‌লো, আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী এ গল্প শুনে বড়ই মর্ম্মাহত হ'লেন, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের লোকজন ধর্ম্মে ভূষিত হয়ে যাতে মনুষ্যত্ব লাভ কর্ত্তে পারে এই চেষ্টায় তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে যুবকের মত পরিশ্রম করছেন, আজ সেই বাঙ্গালীর একজন এতদূরে এসে বাঙ্গালীর নামে এমন একটা কলঙ্কের ছাপ রেখে গেছে মনে করে তাঁর চোখে জল এল।

পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ের মধ্যে এসে মনে করেছিলুম, ঝগড়া বিবাদ বাদ-বিসম্বাদ, ভ্রাতৃবিরোধ ও আত্মীয় বিচ্ছেদ বুঝি বহু পশ্চাতের সমভূমিতে ফেলে এসেছি; কিন্তু ক্রমে দেখলুম এখানেও ঝগড়া বিবাদ মামলা মকর্দ্দমা আমাদের দেশেরই মতন। এখানেও ভাই ভাইকে প্রবঞ্চিত কর্ত্তে ছাড়ে না;—জ্ঞাতি জ্ঞাতির বুকে ছুরী মারবার জন্যে প্রস্তুত। আমার পাণ্ডার সঙ্গে তার ছোট ভাইএর এক মকর্দ্দমা উপস্থিত; তাদের পিতা মৃত্যুকালে দুই ভাইয়ের দু রকম প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে তাঁর যা-কিছু ছিল সমস্ত ভাগ ক'রে দিয়ে যান, এমন কি খাতা পর্য্যন্ত ভাগ করে দেন। 'খাতা' কথাটা একটু পরিস্কার হওয়া দরকার। প্রত্যেক পাণ্ডার কাছে এক একখানা খাতা থাকে, যিনি যখন তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে যে পাণ্ডার যজমান হন, তিনি সেই পাণ্ডার খাতায় নিজের নাম, গ্রামের নাম, ভাই, বোন বাপ মা—এমন কি ছেলে পিলের নাম পর্য্যন্ত লিখে

দিয়ে আসেন। পাণ্ডারা পুরুষানুক্রমে সেই নামগুলি মুখস্ত ক'রে রাখে এবং অনেক বৎসর পরে কোন ভদ্রলোক তীর্থ ভ্রমণে গেলে তাঁর পিতা বা পিতামহের পরিচয় নিয়ে তারা সেই খাতা দেখিয়ে নিজেদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে। খাতা দেখাতে না পাল্লে কিন্তু দাবী নামঞ্জুর। আমার পাণ্ডার পিতা সেই খাতাখানা পর্য্যন্ত দুভাগ করে ছেলেদের দিয়ে যান, সুতরাং ভাইদের মধ্যে বিবাদের কোন কারণই ছিল না; কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়ীর পিছনে আধহাত চওড়া ও ১৫।১৬ হাত লম্বা উচু নীচু যে জমীটুকু ছিল সে টুকুর কথা অন্যান্য বিষয়ভাগের সময় তাঁর মনে আসে নি। সেই জমীটুকু নিয়েই দুই ভায়ে এত বিবাদ; সে যায়গাটুকু যে আপাততঃ সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বিড়াল ও আবর্জ্জনা ছাড়া আর কারো কোন কাজে আস্‌তে পারে এমন সম্ভাবনা আমার একবারো মনে উদয় হয় নি; কিন্তু তাদের অভিপ্রায় অন্য রকম, দুজনেই বলে যে চির দিন কিছু এমন অবস্থা থাকবে না, কিছুকাল পরে যদি এই কোঠা ভেঙ্গে নূতন কোঠা তৈয়ের কর্ত্তে হয় তবে ঐ যায়গটায় খুব কাজ দেখ্‌বে। এ দিকে দুই ভাই মিলে যে মকর্দ্দমা কাঁদিয়েছে তাতে যা কিছু আছে তাও যে যাবে—সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্রও দৃকপাত নেই। আমরা ছোট ভাইটিকেও সেখানে ডাকালুম, দুজনকেই অনেক বোঝান গেল, কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলে না,—আমাদের দেশের শিক্ষিত ভায়েরাই বোঝে না, ত এরাত অশিক্ষিত পাহাড়ী। দুই ভাইএর পক্ষেই অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী জুটেছেন; বড়র পক্ষীয়েরা সাক্ষী দেবেন বাপ মৃত্যুকালে এ জমীটুকু বড় ভাইকেই দিয়ে গেছেন, কারণ বড় ভাইএর পোষ্য অনেক; ছোটর পক্ষ হতে প্রমাণ হবে এটা মিথ্যে কথা। আমি ভাবলুম এরা ধার্ম্মিক, হয়ত ধর্ম্ম কথায় এদের মন একটু নরম হবে সুতরাং "যদুপতি ক গতা মথুরা পুরী" ও "নলিনী দলগত জলবৎ তরলং" প্রভৃতি বড় বড় বাঁধি শ্লোক আউড়ে তাদের মন নরম করবার চেষ্টা কল্লুম, কিন্তু চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী, এ বৈষয়িক ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতা কিছুতেই খাট্‌লো না। শেষে উভয়ে আমাকে অনুরোধ কল্লে যে তিহুরির রাজদরবারে বিচার হবে, যদি কাউন্সিলের কোন মেম্বরের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকে ত তাঁর কাছে একখানা অনুরোধ পত্র দিতে হবে যেন পুনঃ পুনঃ দিন ফিরিয়ে তাদের হয়রান করা না হয় এবং বিচারটা যেন ন্যায়সঙ্গত হয়। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তিহরির রাজদরবারের দুই একজন মেম্বরের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল, আমি একটা অনুরোধ পত্র লিখে দিলুম যে যেন এসম্বন্ধে একটু বিশেষ অনুসন্ধান হয় ও বিচারটা শীঘ্র শেষ হয়।

১৩ই মে বুধবার—আজ খুব ভোরে পাঁচটার আগে উঠে দেবপ্রয়াগ ছেড়ে চল্লুম। এখন হ'তে আমরা বরাবর অলকনন্দার ধার দিয়ে চল্‌তে লাগলুম। ন'মাইল চলে 'রাণী বাড়ী' চটিতে এসে পৌছন গেল। এ যায়গাটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই, আমরা বৈকালে রওনা হওয়ার যোগাড় কল্লুম কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারদিক ঘোর করে বেশ মেঘ হয়ে এলো, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পথে যে কষ্ট পাওয়া গিয়েছিল তা বেশ মনে আছে,

সেই জন্যে আর মেঘ মাথায় ক'রে বের হওয়া কারো ভাল ব'লে মনে হলো না। এখানে রাত্রিটাও কাটান গেল, রাত্রে বৃষ্টির বেগ দেখে মনে হলো না বেরিয়ে ভালই হয়েছে।

১৪ই মে বৃহস্পতিবার—প্রাতে যাত্রা। সাত মাইল চ'লে এসে একটা ঝরণার ধারে উপস্থিত হলুম, ঝরণার উপরে একটা প্রকাণ্ড শিব মন্দির, শিবের নাম "বিল্বকেশর"। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় মন্দিরের মধ্যে গিয়ে শিব দেখে এলেন, সেখানে কিন্তু আমার "প্রবেশ নিষেধ", কারণ সন্ন্যাসীদের পয়সা দিয়ে শিবদর্শন কর্ত্তে হয় না বটে কিন্তু গৃহীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, ঠিক সে সময় আমার হাতে পয়সা ছিল না সেও এক কারণ বটে আর এক বিশেষ কারণ এই যে এই রকম পয়সা দিয়ে ক্রমাগত ঠাকুর দেখার প্রবৃত্তি আমার বলবতী ছিল না, এই দুই কারণে আমার শিবদর্শন ঘটলো না। ঝরণার জলপানে তৃপ্ত হয়ে আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। খানিক পরে পণ্ডিতজী শিব দেখে ফিরে এলেন, তাঁর মুখে শুনলুম সেই মন্দিরের মধ্যে পাথরের উপর খুব বড় পায়ের চিহ্ন আছে, পাণ্ডারা তা অর্জ্জুনের পদচিহ্ন ব'লে ব্যাখ্যা করে থাকে; শুনলুম সেই অসাধারণ পদচিহ্নের মধ্যে আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর তিনখানি পা বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে; অর্জ্জুন অত বড় বীর, তাঁর পা আমাদের পায়ের মত হলে আর তাঁর পদগৌরব থাকে কোথায়? সুতরাং তাঁর পায়ের চিহ্ন খুব জাঁকাল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; এ সব বিষয়ে আমাদের আর্য্যজাতির খুব বাহাদুরী আছে, হনুমান বেচারীকে খুব প্রকাণ্ড ক'রে আঁকতে হবে, অতএব সূর্য্যকে তার কুক্ষিগত করান হোল; বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সূর্য্যের আকার বিস্তৃততর হযেছে সুতরাং হনুমানজীর মহিমা তাতে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নি। এই রকম কুম্ভকর্ণের নাসারন্ধ্র খুব বড় দেখান দরকার—অতএব তার এক এক নিশ্বাসে বিশ পঁচিশটে রাক্ষস বানর উদরে প্রবেশ কর্‌ছে আর বের হচ্ছে; কিন্তু তারপর যখন যুক্তি ও তর্কের কাল আসে তখন এই সমস্ত গাঁজাখুরী গল্পের এক একটী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুতের অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে, তাতে দিনকত চারদিকে খুব বাহবা প'ড়ে যায় বটে কিন্তু শেষ ফল এই হয় যে এই সমস্ত গল্পের সেই প্রাচীন স্নিগ্ধ ভাবগুলিও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং তাহ'তে একটা নূতন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কথা চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে আরো দু মাইল চ'লে এসে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করা গেল।

শ্রীজলধর সেন।

বার্ত্তাবহ কপোত।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

গতবারে আমরা বার্ত্তাবহ কপোতের প্রস্তাবে তাহাদের বার্ত্তাবহন প্রণালীসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইবারে দেখাইব, মানুষের কৃত্রিম নির্ব্বাচনে এক আদিম পারাবত জাতি হইতে কত বিবিধবংশীয় বার্ত্তাবহ কপোতের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

সমুদায় পারাবত জাতি (Species) অতি প্রাচীন কাল হইতে অভ্যুত্থিত হইলেও ইহার বিবিধ বংশ (Races and Varieties) সম্পূর্ণ প্রাচীন নহে। বাস্তবিক, বর্ত্তমান বার্ত্তাবাহী কপোতদিগের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ অবগত ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারো কাহারো এতৎ সম্বন্ধীয় পুস্তকে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব বর্ত্তমান বার্ত্তাবাহী কপোত যে নিতান্তই আধুনিক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

যদি ইহারা বাস্তবিকই অতি অল্প শতাব্দীমাত্র প্রাণী-জগতে আপনাদিগের অস্তিত্বের বিকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভরসা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিধাতার হস্ত নাই। কেননা, সৃষ্টিবাদীদের মতে বিধাতা সেই অনেক প্রাচীনকালে জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার দ্বারা আর কোন নূতন সৃষ্টি বা নূতন উদ্ভাবন হইবার নয়। কিন্তু যখন অব্যর্থ প্রমাণসাহায্যে দেখিতেছি যে, এই কপোতগণ পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে রহিয়াছে, তখন, নিশ্চয়ই ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক এরূপ কোন প্রমাণ নাই যাহাতে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানের বার্ত্তাবহ কপোত কোন অতীত কালে বিদ্যমান ছিল। অন্য পক্ষে শত শত প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে যে, অমুক সময় হইতে ইহাদের আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং কপোত, বিশেষতঃ বার্ত্তাবাহী কপোত সৃষ্টিতে বিধাতার কোন হস্তই নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে সমুদায় জাতি-বৈচিত্র্যের অভ্যুদয়ের প্রধানতম হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনও বিবিধ বার্ত্তাবাহী কপোতবংশের অভ্যুত্থানের কারণ নহে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই ইহাদের উৎপত্তি বা বিকাশের মূলে মানবের হস্ত। কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিমান মনুষ্যের সুচতুর কৌশল দ্বারাই এই নূতন বংশ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপেই কপোতপালক মানববিশেষের খাম-খেয়ালি ও পরে উহার বা অন্যান্য কপোতপালক-দিগের সুনিপুণ অধ্যবসায় প্রভাবেই বর্ত্তমানে বার্ত্তাবাহী কপোতদিগের কথা আমরা শুনিতেছি।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতে মানুষের এই প্রক্রিয়াকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য ইহাকে কৃত্রিম নির্ব্বাচন বলা হয়। বর্ত্তমান প্রাণীজগতে অনেক শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও মহদুপকারী গৃহপালিত পশু পক্ষী এই কৃত্রিম নির্ব্বাচনের ফল। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, শিকারী কুকুর প্রভৃতি জীব এই কৃত্রিম নির্ব্বাচন-প্রসূত প্রাণীসমূহের অন্যতম উদাহরণ। আমরা এখানে কেবল জীবজগতেরই কথা বলিলাম, কিন্তু উদ্ভিদ্-জগতেও এইরূপ মানবের কৌশলে বিবিধ নূতন, অদ্ভুত পত্র পুষ্প ফল ও কত নূতন উদ্ভিদ বংশ সৃজিত হইয়াছে ও হইতেছে। মানবজ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর বিষম প্রতিযোগিতানিবন্ধন, এই কৃত্রিম নির্ব্বাচন বর্ত্তমানে জীব ও উদ্ভিদরাজ্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকার-ভেদোৎপত্তির একটি অতি প্রধান, মূল্যবান ও আবশ্যকীয় কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাণী বিজ্ঞানে Cross নামে একটী শব্দ চলিত আছে। বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে ইহাকে 'অসবর্ণ সঙ্গম' বলা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ যদি দুই স্বতন্ত্র Speciesএর হয়, অথবা দুই স্বতন্ত্র Varietyর হয়, আর যদি এরূপ স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম হয়, তবে তাহাকে 'ক্রস' বলে। যথা—অশ্ব ও গর্দ্দভ দুই স্বতন্ত্র Species; যদি এতদুভয়ের সঙ্গম হয়, ইহাকে ক্রস বলা যাইবে। আবার, আরব্য ঘোটক ও অষ্ট্রেলিয়ান ঘোটক, ইহারা দুই স্বতন্ত্র Varieties; যদি ইহাদের পরস্পর সঙ্গম হয়, তাহাকেও ক্রস বলা যাইবে। কিন্তু দুই আরব্য ঘোটক ঘোটকী, অথবা দুই অষ্ট্রেলিয়ান অশ্ব, অশ্বিনীর মিলনকে ক্রস বলে না। যেখানে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে জাতিগত বা বর্ণগত পার্থক্য থাকে, এবং তাদৃশ স্ত্রীপুরুষের মিলন হয় তাহাকেই ক্রস বা অসবর্ণ সঙ্গম কহে। তারপর এখানে আর একটি কথা মনে রাখিবার আছে। অশ্ব ও গর্দ্দভের সম্মিলনে যে সন্তান বা অশ্বতর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Hybrid বলে। (বাঙ্গালায় ইহাকে আমরা দ্বিজাতীয় বলিব) আর আরব্য ও অষ্ট্রেলিয়ান ঘোটক ঘোটকীর সম্মিলনে যে শাবক উৎপন্ন হয়, তাহাকে Mongrel বলে। (বাঙ্গালায় ইহাকে আমরা সঙ্কর বর্ণ বলিব।) সুতরাং হাইব্রিড ও মঙগ্রেলের পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত Species বা জাতিমূলীয়, শেষোক্তটি Variety বা বর্ণমূলীয়। অর্থাৎ দুই স্বতন্ত্র জাতি হইতে জাত সন্ততিদিগকে হাইব্রিড আর দুই স্বতন্ত্র বর্ণ হইতে উৎপন্ন সন্তানদিগকে মঙ্‌গ্রেল বলে। যদিও হাইব্রিড ও মঙ্‌গ্রেল দুইই 'ক্রসে'র ফল, উৎপত্তিগত অসদৃশতানিবন্ধন ইহাদের প্রকৃতিগত ভিন্নতা আছে। বিশেষ ও প্রধান পার্থক্য এই যে, হাইব্রিডগুলি সাধারণতঃ সন্তানোৎ-পাদিকা শক্তিহীন আর মঙ্‌গ্রেলগুলি সাধারণতঃ সেই শক্তিবান, অবশ্য এ শক্তির অস্তিত্ব বা অভাব অর্থাৎ তাহাদের উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা অনেক অংশে আবার ক্রসের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন হাইব্রিডকে অনুর্ব্বর বলিলেই উহারা যে একেবারেই উর্ব্বর হইতে পারে না, এরূপ নহে। অনেক হাইব্রিড পুনঃ পুনঃ "ইন্‌টারক্রস্‌ড" হইলে উহাদের অনুর্ব্বরতার মাপ হ্রাস হইয়া আসে এবং সেইজন্য উর্ব্বতার মাপ আবার বর্দ্ধিত

হয়, এবং কালে হাইব্রিডও সম্পূর্ণ উর্ব্বরা হইয়া থাকে। কিন্তু সকল হাইব্রিড সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণ সত্য যে কোন দুটি স্বতন্ত্র স্পিশীসের সঙ্গমে প্রথম যে সন্তানগুলি উৎপন্ন হয়, তাহারা সর্ব্বথা সম্পূর্ণরূপেই অনুর্ব্বর অপর পক্ষে মঙ্‌গ্রেলদের কোন অবস্থাতেই অনুর্ব্বরতা পরিদৃষ্ট হয় না! ইহারা সর্ব্বকালেই উর্ব্বর।

এক্ষণে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করি। উপরে আমরা দেখিলাম দুটি স্বতন্ত্র জাতি বা দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের সম্মিলন দ্বারা এক নূতন বংশ অনায়াসে জন্মিতে পারে। আরণ্যাবস্থাতেও ঈদৃশ 'অসবর্ণ সঙ্গম' দ্বারা সময়ে সময়ে নূতন বংশ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সংখ্যা অত্যল্প। দুই স্বতন্ত্র জাতীয় পশু পক্ষীর স্ত্রী ও পুরুষ ক্বচিৎ আপনাপনি মিলিত হয়। বস্তুতঃ ঈদৃশ মিলন উহাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিলেই হয়। কিন্তু মানবের সহায়ে ও কৌশলে ঈদৃশ মিলন সম্ভাবিত হইতে পারে। এইজন্য 'ক্রস' বলিলেই মনুষ্যের হস্ত থাকিতে হইবে। আরণ্য পশুপক্ষী অপেক্ষা গৃহপালিত পশুপক্ষীদের মধ্যেই ক্রস দ্বারা নানাবিধ নূতন নূতন বংশ এবং ক্রমশঃ নূতন বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু শেষোক্তেরা সচরাচর মানব সমাজের মধ্যে লোকালয়ে বাস করে এবং সহজেই মনুষ্যের পরীক্ষাধীন হইতে পারে।

পশুপালকেরা স্ব স্ব ব্যবসায়ের কঠোর প্রতিযোগিতায় পড়িয়া কোন বিশেষত্ব সম্পন্ন এক স্থায়ী বর্ণ উৎপাদন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কোন পশু বা পক্ষীতে কোনরূপ বিশেষত্ব ভাল করিয়া ফুটন্ত করিতে পারিলেই উহার বিশেষ আদর হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং পশুপালকেরও অত্যধিক লাভের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত সুচতুর ও বুদ্ধিমান পশু বা পক্ষীপালকগণ নিয়তই বাছিয়া বাছিয়া এমন দুটির 'যোড়' বাঁধে, অথবা এমন দুটিতে ক্রস করায়, যাহাদের মধ্যে কোন একটু বিশেষত্বের অধিক সামঞ্জস্য আছে। এইরূপে ক্রমশঃ বাছিয়া বাছিয়া এবং ক্রস দ্বারা আদৌ একটি সামান্যতম বিশেষ গুণ বা লক্ষণটিকে এইরূপ পরিস্ফুট করে যে, ইহা হইতেই এক স্বতন্ত্র বর্ণের সূচনা হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কপোতপালকদিগের ঈদৃশ কৌশলপূর্ণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এবং আপন আপন কপোতগুলির উন্নতিসাধনার্থ স্বাভাবিক ইচ্ছা-প্রণোদিত এক অক্লান্ত উদ্যম ও প্রযত্নের ফলস্বরূপ আমরা বর্ত্তমানে কত বিভিন্ন প্রকারের কপোত দেখিতে পাই। বর্ত্তমান বার্ত্তাবাহী কপোতও বিভিন্ন কপোতপালকের অপরিশ্রান্ত উদ্যম ও সুকুশল বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন।

পুরাকালে তুরস্ক, পারস্য, আরব্য, মিসর প্রভৃতি দেশে যে কপোত বার্ত্তাবহন করিত, তাহারা সকলেই বোগদাদ কপোত। বোগদাদ কপোত এই মহৎ ক্ষমতার জন্য তৎসাময়িক অন্যান্য কপোত অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ও আদৃত হইত। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ অঞ্চলে যে এক প্রকার বার্ত্তাবাহী কপোত দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সাধারণতঃ বসোরা বা বোগদাদ কপোত নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। বসোরা কপোতও

যে পারস্য হইতে আসিয়াছে ইহার নাম হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। আর, আমরা আমাদের প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, ওলন্দাজ বণিকগণ পারস্য হইতেই এক যোড়া বোগদাদ কপোত সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে লইয়া গিয়া তত্রত্য জঙ্গলি কপোতের সহিত সঙ্গম করাইয়া বার্ত্তাবাহী কপোতের এক নূতন বংশের সৃজনা করে। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও অন্যত্রের বার্ত্তাবাহী কপোতদিগের প্রাচীন নাম সকল বার্ত্তাবহ কপোতের আদৌ পারস্য হইতে অন্যত্র আনয়নসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ।

বর্ত্তমানে য়ুরোপে চারি প্রকারের বার্ত্তাবহ কপোত চলিত। লেজোয়া, আঁভার্সোয়া, ক্রাভাতে, আর ক্যারিয়ার। ইহাদের সকলেরই মধ্যে বোগদাদ কপোতশোণিত প্রবাহিত। ইহারা প্রত্যেকেই আদিম বোগদাদ বংশ হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। ঈদৃশ উৎকর্ষের কারণ বেশী দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। বৈজিক নিয়মানুসারে (Law of Heredity) পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ গুণ সন্ততিতেই বর্ত্তিয়া থাকে। সুতরাং যদি দুটি এমন কপোত কপোতীর মিলন করা যায়, যাহাদের প্রত্যেকেরি একটি বা কতকগুলি বিশেষ গুণ সমধিক প্রস্ফুট এবং এই গুণ উভয়েরি সাধারণ, তাহা হইলে ইহাদের সন্তান সন্ততিতে ঐ সাধারণ বিশেষ গুণগুলি আরও ফুটন্ত ভাবে প্রকাশ পাইবে। যদি এই দুইটি কপোত কপোতী সমবংশের না হইয়া বিভিন্ন বংশের হয়, তাহা হইলে অসবর্ণ সঙ্গম হইল বলিয়া সন্ততিদের মধ্যে Variationএর দিকে বিশেষ প্রবণতা হইবে। (Tendencey to variation ক্রসের একটি বিশেষ অবান্তর ফল !) এক্ষণে যদি এইরূপ অসবর্ণ সঙ্গমপ্রসূত কোন কপোত পরিবারের বংশ পরিবর্দ্ধন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের উপর ন্যস্ত না করিয়া বুদ্ধিমান মানবের নির্ব্বাচন শক্তির উপর সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেই কপোত পরিবার উত্তরোত্তর এক বিশেষত্বের দিকে সত্বর অতি উৎকৃষ্টতর ভাবে অগ্রসর হইবে। কেননা মনুষ্য বাছিয়া বাছিয়া উত্তম উত্তম কপোত কপোতী অর্থাৎ যাহারা আপনাদের মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষমতা বা গুণকে অপরাপেক্ষা অধিকতর স্ফুটরূপে বিকাশ করিয়াছে তাহাদিগেরই যোড় বাঁধিয়া উহাদের সন্ততিগণের মধ্যে সেই বিশেষত্বটি আরও উৎকৃষ্ট ও পরিস্ফুট করিবে। এইরূপে মনুষ্যের নির্ব্বাচন দ্বারাই বর্ত্তমান অত্যুৎকৃষ্ট বার্ত্তাবাহী কপোত ও বেগগামী কপোত সমুদ্ভূত হইয়াছে।

আমরা একটি দৃষ্টান্ত লই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ক্যারিয়ার বোগদাদ কপোত ও য়ুরোপীয় জঙ্গলি কপোতের (Bizet) ক্রসে উদ্ভূত। বোগদাদ কপোত অতি পুরাতন কাল হইতেই আপন অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া মানব সমাজে আদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার ঈদৃশ ক্ষমতা উদ্ভাবনের মূলেও মানবের সুদক্ষ হস্ত। মনুষ্যেরা অর্থাৎ কপোতপালকেরা কেবলি বিশেষ উড্ডয়নপটু, স্বাবাসপ্রিয় ও কষ্টসহিষ্ণু কপোত যুগলের ক্রমান্বয়িক 'যোড়' বাঁধিয়া বাঁধিয়া অবশেষে বর্ত্তমান বোগদাদ কপোত জন্মাইতে পারিয়াছে। বোগদাদ কপোতও সৃষ্টির বিশেষ বিধানের অন্তর্ভূত নহে। সামান্য

বা জঙ্গলি কপোত হইতেই মানবের অনেক যত্নে অনেক অধ্যবসায়ে অনেক কৌশলে বোগদাদ কপোত সৃষ্ট হইয়াছে। বোগদাদ কপোতের স্বাবাসপ্রিয়তা, উড্ডয়নক্ষমতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা অতি প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে একটি গল্প নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

ফরেষ্ট নামক এক আলেপো বণিক একদা দুই যোড়া কপোত বোগদাদ হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের পালক কাটিয়া অন্যান্য কপোতসহ স্বীয় কপোতনিবাসে রাখিয়াছিলেন। ইহারা ছয় মাসের মধ্যে এই নবাবাসে আসিয়া তিন যোড়া শাবক প্রসব করে। বণিক এক্ষণে মনে করিলেন যে, যখন ইহারা এতদিন এখানে রহিয়াছে, আর যখন ইহাদের এতগুলি শাবক হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইহারা আপনাদের প্রাচীন আবাস ভুলিয়া গিয়াছে। আর তা না ভুলিলেও, অন্ততঃ শাবকদিগের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াও আর কোথাও যাইবে না। বিশেষতঃ বোগদাদ আলেপো হইতে অনেক দূরে। অহোরাত্র তিন দিবস অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিলে তবে বোগদাদে পৌছান যায়। আরো এই নিকটতম পথ নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমির উপর দিয়া। বণিক এই সব নানা অন্তরায় চিন্তা করিয়া অবশেষে একযোড়াকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাদের পক্ষের নূতন পালক সেইমাত্র বহির্গত হইতেছে। কপোতটা আপনাকে স্বাধীন দেখিয়াই আর কপোতনিবাসে প্রবেশ করিল না,—যদিও তখন ইহাদের কতিপয় ডিম্ব সেই সবেমাত্র ফুটিয়াছিল। ইহা তিন দিবস কপোতনিবাসের ক্ষুদ্র দ্বার সমীপে রহিয়া সঙ্গিনী কপোতীকে ক্রমাগত আহ্বান করিতে লাগিল। কপোতী তখনও নব স্ফুটিত শাবকগুলির উপর বসিয়া রহিয়াছে। সে কপোতের পুনঃ পুনঃ আহ্বান শব্দ শুনিয়াও সহজে সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিতেছিল না। কপোত এই সুদীর্ঘকাল সহচরীর জন্য অপেক্ষা করিয়া, অবশেষে একাকীই প্রাচীন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিল। বলা বাহুল্য ইহা নিরাপদে প্রাচীন আবাসে অর্থাৎ বোগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহার পুরাতন প্রভু (যিনি ইহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছিলেন) ছয় মাসের পর স্বীয় কপোতকে পুনরায় আপনার নিকট প্রত্যাবৃত হইতে দেখিয়া নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং প্রথমে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কপোতী একান্ত যখন দেখিল যে প্রিয় সহচর কপোত আর ফিরিল না, তখন ক্রোধে শাবকদিগের উদরে চঞ্চু ফুটাইয়া উহাদিগকে বধ করিয়া নিজে উড়িয়া প্রাচীন আবাসে ফিরিয়া গেল। কপোতের প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবসের পরে কপোতী প্রত্যাবৃত হইয়াছিল।

এই গল্পটী নিতান্ত গল্প নহে। যিনি স্বচক্ষে এই ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি স্বহস্তে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা তিনটী বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি; (১) বোগদাদ কপতের স্বাবাসপ্রিয়তা; (২) উহার সহিষ্ণুতা ও উড্ডয়নক্ষমতা; (৩) দিকনির্ণয়জ্ঞান। Bizet য়ূরপ অঞ্চলের জঙ্গলি কপোত। জঙ্গলি কপোতও

স্বভাবতঃ উড্ডয়নক্ষম, কষ্টসহিষ্ণু ও নীড়প্রিয়। ইহারা আরণ্যাবস্থায় উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে অথবা উহার গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে সচরাচর নীড় বাঁধিয়া বাস করে। আপনাদের ও শাবকদের আহারান্বেষণে উহাদিগকে অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিয়তই যাইতে হয়, আবার ফিরিয়া আসিতেও হয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যেও স্বাভাবিক নীড়-প্রিয়তা, উড্ডয়নশীলতা কষ্ট সহিষ্ণুতা ও স্বীয় বাস চিনিয়া লইবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এক্ষণে, যদি এইরূপ ছুটি বিভিন্ন বংশের (বোগদাদ ও জঙ্গলি) কপোতকে পরস্পরের সহিত সঙ্গম করান যায়, তাহা হইলে ইহাদের শাবকদিগের মধ্যে উক্ত বিশেষ গুণগুলি যে আরো প্রকৃষ্টতররূপে বিকাশ পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বিশেষতঃ যখন পিতামাতার বিশেষ গুণগুলি সন্তানেই বর্ত্তায়, আর যখন অসবর্ণ সঙ্গম জন্য সন্তান-দিগের মধ্যে একটা বিশেষ উত্তেজনা ও Tendency to Variation প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পর যদি মনুষ্য বাছিয়া বাছিয়া কেবল খুব দ্রুতগামী, উড্ডয়নপটু ও স্ব-নীড়-প্রিয়, কপোত কপোতীর মিলন করাইয়া, তাহাদের হইতে নূতন শাবক এবং ক্রমশঃ নূতন বংশ (সেইগুণ গুলিকে আরো পরিস্ফুট আরো স্থায়ী করিয়া লইয়া) উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সময়ে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বার্ত্তাবাহী কপোত উদ্ভূত হইবেক। এইরূপ করিয়াই আদৌ বোগদাদ কপোত ও য়ুরোপীয় আরণ্য কপোতের সঙ্গমে বর্ত্তমানের ইংলিস ক্যারিয়ায় অভ্যুত্থিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংলিশ ক্যারিয়ার দেখিতে অনেকটা বোগদাদ কপোতেরই ন্যায়। (প্রথম প্রস্তাবের বোগদাদ কপোতের চিত্র দেখুন।) বোগদাদ কপোতের বাহ্যিক বিশেষত্ব প্রথমতঃ এই যে, নাকের উপর, কুক্কুটের মস্তকের উপরিস্থ ফুলের ন্যায়, খানিকটা অনাবৃত অর্থাৎ পালক বা লোমশূন্য স্থূল মাংস থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Caruncles বলে। ঠিক চঞ্চুর গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া নাসারন্ধ্রের উপর ও চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ Nasal Caruncles বা নাসিক ফুল বলে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের চক্ষুর চতুস্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে খানিকটা প্রশস্ত মাংস ফিতার মত চক্ষুকে তিন চার ফের বেষ্টন করিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে Wattle বলে। ইহাদের চক্ষুর তারা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। গ্রীবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সমুন্নত; মস্তক ঈষদানত। চঞ্চু দীর্ঘ ও শক্ত। সমুদায় শরীরের পালকের রং কাল, কেবল গলার পালকগুলিতে লাল ও সবুজের মিশ্রাভ। স্কন্ধদেশ গৃধ্রের ন্যায় উচ্চ ও সতেজ। পা ছুটি লাল। ইহার প্রধান গুণ জন্মস্থানপ্রিয়তা ও দিকনির্দ্দেশ শক্তি।

Bizet ইউরোপ অঞ্চলের আরণ্য কপোত। ইহা হইতেই ইউরোপখণ্ডের অন্যান্য সমুদায় প্রকারের কপোতই উদ্ভূত হইয়াছে। আদিম আরণ্য কপোত হইতে ইহা অতি সামান্যমাত্র ভিন্ন। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে ইউরোপের আদিম কলুম্বা লিভিয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করেন। কবি হোমার তাঁহার ইলিয়েড ও ওডেসিতে,

বা জঙ্গলি কপোত হইতেই মানবের অনেক যত্নে অনেক অধ্যবসায়ে অনেক কৌশলে বোগদাদ কপোত সৃষ্ট হইয়াছে। বোগদাদ কপোতের স্বাবাসপ্রিয়তা, উড্ডয়নক্ষমতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা অতি প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে একটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ফরেষ্ট নামক এক আলেপো বণিক একদা দুই যোড়া কপোত বোগদাদ হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের পালক কাটিয়া অন্যান্য কপোতসহ স্বীয় কপোতনিবাসে রাখিয়াছিলেন। ইহারা ছয় মাসের মধ্যে এই নবাবাসে আসিয়া তিন যোড়া শাবক প্রসব করে। বণিক এক্ষণে মনে করিলেন যে, যখন ইহারা এতদিন এখানে রহিয়াছে, আর যখন ইহাদের এতগুলি শাবক হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইহারা আপনাদের প্রাচীন আবাস ভুলিয়া গিয়াছে। আর তা না ভুলিলেও, অন্ততঃ শাবকদিগের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াও আর কোথাও যাইবে না। বিশেষতঃ বোগদাদ আলেপো হইতে অনেক দূরে। অহোরাত্র তিন দিবস অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিলে তবে বোগদাদে পৌছান যায়। আরো এই নিকটতম পথ নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমির উপর দিয়া। বণিক এই সব নানা অন্তরায় চিন্তা করিয়া অবশেষে একযোড়াকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাদের পক্ষের নূতন পালক সেইমাত্র বহির্গত হইতেছে। কপোতটা আপনাকে স্বাধীন দেখিয়াই আর কপোতনিবাসে প্রবেশ করিল না,—যদিও তখন ইহাদের কতিপয় ডিম্ব সেই সবেমাত্র ফুটিয়াছিল। ইহা তিন দিবস কপোতনিবাসের ক্ষুদ্র দ্বার সমীপে রহিয়া সঙ্গিনী কপোতীকে ক্রমাগত আহ্বান করিতে লাগিল। কপোতী তখনও নব স্ফুটিত শাবকগুলির উপর বসিয়া রহিয়াছে। সে কপোতের পুনঃ পুনঃ আহ্বান শব্দ শুনিয়াও সহজে সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিতেছিল না। কপোত এই সুদীর্ঘকাল সহচরীর জন্য অপেক্ষা করিয়া, অবশেষে একাকীই প্রাচীন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্ত পক্ষ বিস্তার করিল। বলা বাহুল্য ইহা নিরাপদে প্রাচীন আবাসে অর্থাৎ বোগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহার পুরাতন প্রভু (যিনি ইহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছিলেন) ছয় মাসের পর স্বীয় কপোতকে পুনরায় আপনার নিকট প্রত্যাবৃত হইতে দেখিয়া নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং প্রথমে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কপোতী একান্ত যখন দেখিল যে প্রিয় সহচর কপোত আর ফিরিল না, তখন ক্রোধে শাবকদিগের উদরে চঞ্চু ফুটাইয়া উহাদিগকে বধ করিয়া নিজে উড়িয়া প্রাচীন আবাসে ফিরিয়া গেল। কপোতের প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবসের পরে কপোতী প্রত্যাবৃত হইয়াছিল।

এই গল্পটী নিতান্ত গল্প নহে। যিনি স্বচক্ষে এই ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি স্বহস্তে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা তিনটী বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি; (১) বোগদাদ কপতের স্বাবাসপ্রিয়তা; (২) উহার সহিষ্ণুতা ও উড্ডয়নক্ষমতা; (৩) দিকনির্ণয়জ্ঞান। Bizet য়ুরপ অঞ্চলের জঙ্গলি কপোত। জঙ্গলি কপোতও

স্বভাবতঃ উড্ডয়নক্ষম, কষ্টসহিষ্ণু ও নীড়প্রিয়। ইহারা আরণ্যাবস্থায় উচ্চ পর্ব্বত শৃ অথবা উহার গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে সচরাচর নীড় বাঁধিয়া বাস করে। আপনাদের শাবকদের আহারান্বেষণে উহাদিগকে অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিয়ত যাইতে হয়, আবার ফিরিয়া আসিতেও হয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যেও স্বাভাবিক নীড় প্রিয়তা, উড্ডয়নশীলতা কষ্ট সহিষ্ণুতা ও স্বীয় বাস চিনিয়া লইবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল এক্ষণে, যদি এইরূপ দুটি বিভিন্ন বংশের (বোগদাদ ও জঙ্গলি) কপোতকে পরস্পরের সহি সঙ্গম করান যায়, তাহা হইলে ইহাদের শাবকদিগের মধ্যে উক্ত বিশেষ গুণগুলি ে আরো প্রকৃষ্টতররূপে বিকাশ পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বিশেষতঃ যখ পিতামাতার বিশেষ গুণগুলি সন্তানেই বর্ত্তায়, আর যখন অসবর্ণ সঙ্গম জন্য সন্তান দিগের মধ্যে একটা বিশেষ উত্তেজনা ও Tendency to Variation প্রবর্ত্তিত হয় ইহার পর যদি মনুষ্য বাছিয়া বাঁছিয়া কেবল খুব দ্রুতগামী, উড্ডয়নপটু ও স্ব-নীড়-প্রিয় কপোত কপোতীর মিলন করাইয়া, তাহাদের হইতে নূতন শাবক এবং ক্রমশঃ নূতন বংশ (সেইগুণ গুলিকে আরো পরিস্ফুট আরো স্থায়ী করিয়া লইয়া) উৎপন্ন করে, তাহ হইলে সময়ে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বার্ত্তাবাহী কপোত উদ্ভূত হইবেক। এইরূপ করিয়াই আদৌ বোগদাদ কপোত ও য়ুরোপীয় আরণ্য কপোতের সঙ্গমে বর্ত্তমানের ইংলিস ক্যারিয়ার অভ্যুত্থিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংলিশ ক্যারিয়ার দেখিতে অনেকটা বোগদাদ কপোতেরই ন্যায়। (প্রথম প্রস্তাবের বোগদাদ কপোতের চিত্র দেখুন।) বোগদাদ কপোতের বাহ্যিক বিশেষত্ব প্রথমতঃ এই যে, নাকের উপর, কুক্কুটের মস্তকের উপরিস্থ ফুলের ন্যায়, খানিকটা অনাবৃত অর্থাৎ পালক বা লোমশূন্য স্থূল মাংস থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Caruncles বলে। ঠিক চঞ্চুর গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া নাসারন্ধ্রের উপর ও চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ Nasal Caruncles বা নাসিক ফুল বলে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের চক্ষুর চতুস্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে খানিকটা প্রশস্ত মাংস ফিতার মত চক্ষুকে তিন চার ফের বেষ্টন করিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে Wattle বলে। ইহাদের চক্ষুর তারা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। গ্রীবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সমুন্নত; মস্তক ঈষদানত। চঞ্চু দীর্ঘ ও শক্ত। সমুদায় শরীরের পালকের রং কাল, কেবল গলার পালকগুলিতে লাল ও সবুজের মিশ্রাভ। স্কন্ধদেশ গৃধ্রের ন্যায় উচ্চ ও সতেজ। পা দুটি লাল। ইহার প্রধান গুণ জন্মস্থানপ্রিয়তা ও দিকনির্দ্দেশ শক্তি।

Bizet ইউরোপ অঞ্চলের আরণ্য কপোত। ইহা হইতেই ইউরোপখণ্ডের অন্যান্য সমুদায় প্রকারের কপোতই উদ্ভূত হইয়াছে। আদিম আরণ্য কপোত হইতে ইহা অতি সামান্যমাত্র ভিন্ন। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে ইউরোপের আদিম কলুম্বা লিভিয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করেন। কবি হোমার তাঁহার ইলিয়েড ও ওডেসিতে,

অ্যারিষ্টটল তাঁহার "History of Animals" গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দেখিতে কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণের, পা দুটি লাল। ইহা কোনমতেই পোষ মানে না। ইহার মূল শরীর ক্ষুদ্র, কিন্তু চঞ্চু খুব বড়। নাসিক ফুল ইত্যাদি নাই। চক্ষু গাঢ় ধূসর বর্ণের; মস্তক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত।

ইংলিশ বা আইরিশ ক্যারিয়ারের বৈজ্ঞানিক নাম কলুম্বা টুবার্কুলোসা। আইরিশ ক্যারিয়ার ইংলিশ ক্যারিয়ার অপেক্ষা অনেক প্রাচীনকালের। এই জন্য ইহাতে আদিম পিতা মাতার বিশেষ লক্ষণগুলি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান আছে। বোগদাদ কপোতের ন্যায় ক্যারিয়ারের নাসিকফুল বিলক্ষণ পরিস্ফুট। ইহারও চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে সূক্ষ্ম মণ্ডলাকার তিন চারিটি মাংসের পটি আছে। অধুনা লণ্ডনের ক্যারিয়ারদের মধ্যে নাসিক ফুলের অসম্ভব আকার অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বস্থ পটি এখনও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বার্ম্মিংহাম ও লণ্ডনের কোন কোন উপবংশ মধ্যে ক্যারিয়ারের এই বিশেষ লক্ষণ দুটি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বলা আবশ্যক ক্যারিয়ার বা বোগদাদ কপোতের সুবৃহৎ নাসিকফুল এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বের মণ্ডলাকার মাংস পটি, ইহার বার্ত্তাবহন কার্য্যের এক বিন্দুও সহায়ক নহে। এই অদ্ভুত দৈহিক বিকাশগুলি কেবল কপোতপালকদিগের খামখেয়ালি মতলব বা সখের জন্যই উদ্ভূত হইয়াছে। বোধ হয়, শুদ্ধ দেখিবার বাহার হইবার জন্যই কপোতপালকেরা নির্ব্বাচন করিয়া করিয়া এই বিকাশগুলি ফুটন্ত, পরিবর্দ্ধিত ও স্থায়ী করিয়াছে।

ক্রাভাতের বৈজ্ঞানিক নাম কলুম্বা টুর্বিটা। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী লেজ নামক দেশে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার লক্ষণ এই,—চঞ্চু অত্যন্ত ক্ষুদ্র; নাসিক ফুল প্রায় নাই বলিলেই হয়। চক্ষু দুটি বেশ ফুটন্ত, চারি পাশে সরু মাংসের পটি দ্বারা ঘেরা; চক্ষুর বর্ণ সীসের মত ঘোলা। গ্রীবার সম্মুখদেশে পালকগুলি বোণাটের ফুলের মত বেশ সুন্দর ধরণের। পালকগুলি বোনাটের মত বলিয়া উহাই কপোতের নামকরণ হইয়াছে। (ফরাসী ক্রাভাৎ অর্থ বোনাট।) ইহারা অনেকক্ষণ ও অনেকদূর উড়িতে পারে। কপোতপালকেরা ইহার সহিত বোগদাদ কপোতের ক্রস করাইয়া এক নূতন বংশের উৎপত্তি করিয়াছে। এই নূতন বংশের নাম টাম্বলার (এ দেশের গিরেবাজ।)

বোগদাদ ও হিরণ্ডেল নামক এক প্রকার কপোতের সঙ্গমে আর এক নূতন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকে মোচেন বলে। হিরণ্ডেল শব্দের অর্থ Swallow বা ভরতপক্ষী। ভরতপক্ষীগণ প্রসিদ্ধ Migratoy birds, শীতাবসানে সোয়ালো ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসে, শীত আরম্ভ হইলে য়ুরোপের দক্ষিণ প্রদেশে চলিয়া যায়। প্রতি বৎসর অভ্রান্তরূপে ইহার এইরূপ দেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সুতরাং সোয়ালোর দিকজ্ঞান যে অতি পরিস্ফুট তাহার সন্দেহ নাই। হিরণ্ডেল কপোত অতি দ্রুতবেগে চক্রাকারে অনেক উচ্চে উড়িতে পারে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব বড় বড় চক্র দিয়া থাকে।

সোয়ালোর ন্যায় ইহাদেরও দিকজ্ঞান বেশ পরিস্ফুট। বোগদাদ ও ছিরণ্ডেল
জাত মোচেনেরও উড্ডয়ন শক্তি অতি প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমানে টম্বলার ও মোচেন বংশ প্রায় নির্মূল হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পরিবর্ত্তে
এক্ষণে বেলজিয়মে ও উহার সন্নিকটস্থ প্রদেশে অন্য দুই নূতন বংশীয় কপোতের অভ্যুত্থান
হইয়াছে। মূলতঃ এই নব বংশদ্বয় টম্বলার ও মোচেনেরি সন্তান সন্ততি। এই দুই
নূতন বংশের নাম আঁভার্সোয়া ও লেজোয়া।

আঁভার্সোয়া ক্যারিয়ার ও টম্বলারের ক্রস জাত। উহা দ্রুতগামিত্ব ও কষ্টসহিষ্ণু
তায় অদ্বিতীয়। ইহার শরীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, চঞ্চু দীর্ঘ ও দৃঢ়, পক্ষের পালক শক্ত
লম্বা। ডানা মুড়িলে লেজের পালকের শেষ সীমাতে আসিয়া পড়ে। গ্রীবাদেশ যথে
বলশালী, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ পালকে অতি সুন্দররূপে আবৃত, উজ্জ্বল ধাতুর ন্যায় সুচিকণ বর্ণযুক্ত
ইহা এক্ষণে জার্ম্মণির সমরসংক্রান্ত সমুদয় কপোত নিবাসেই নিযুক্ত হইয়াছে। প্রথম
প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি এই আঁভার্সোয়া বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়, পারি
অবরোধকালে ফরাসী জাতি দ্বারা সংবাদ বহনে নিয়োজিত হইয়াছিল।

লেজোয়া টম্বলার ও মোচেন এই দুই বংশীয় কপোতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহা
সকল প্রকার বার্ত্তাবাহী কপোতের তুলনায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। ইহার যেমন সাহস, তেমনি
বল, তেমনি অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। দিকনির্ণয় শক্তিতেও ইহার সমতুল্য কেহ
নাই। ফ্রান্সে ইহার বহুল আদর। ফরাসীরা অপর কোন বার্ত্তাবাহী কপোত অপেক্ষা
লেজোয়াকেই অধিক পছন্দ করে। ইহার গলদেশের পালকের রঙ অতি সুচিকণ ও
ধাতুর ঔজ্জ্বল্য সমন্বিত। ইহার গ্রীবার সম্মুখের পালকগুলি কখন কখন জ্যাভাতের
ন্যায় উস্কো খুস্কো হয়। আঁভার্সোয়া অপেক্ষা ইহার দেহ ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ, চঞ্চু অত্যন্ত ক্ষুদ্র;
নাসিকার উপর অনাবৃত মাংস অতি অল্পই থাকে। চক্ষুদ্বয় সতেজ ও উজ্জ্বল।
চতুষ্পার্শ্বে অতি সূক্ষ্ম বৃত্তাকার মাংসপটি। পক্ষ সুদীর্ঘ; দশটি বারটি পালক এমনিভাবে
উপর্য্যুপরি সন্ন্যস্ত থাকে যে সমুদয় পালক গুটায়িত অবস্থায় একটি পালকের ন্যায় হয়।

এক্ষণে, সংক্ষেপতঃ, বার্ত্তাবাহী কপোত সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে—ইহারা সক-
লেই অধুনাতন সময়ের, সকলেই কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রসূত। বোগদাদ কপোত অনেক
প্রাচীনকাল হইতে বার্ত্তাবহনে নিয়োজিত আছে। ইহার এই মহৎগুণের জন্য প্রাচীন
কপোতপালকগণ যথাসাধ্য ইহার বংশ অমিশ্র ও পরিশুদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য
কপোতের ন্যায় ইহাও কপোত পালকদিগের খামখেয়ালি রুচির ফল। ইহার নাসিক ফুল,
চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ চক্রাকার মাংসপটিগুলি, শুদ্ধ দেখিবার বাহারের জন্য, সখ করিয়া
কপোতপালকগণ ঈদৃশ অপূর্ব্ব বাহ্য বিকাশগুলি উৎপন্ন করিয়াছে। বার্ত্তাবাহী কপোতের
কোন প্রয়োজন ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আদৌ বোগদাদ কপোত ও আরণ্য বা জঙ্গলি
কপোতের সংমিশ্রণে বর্ত্তমানের বিবিধ বার্ত্তাবাহী কপোত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—

অ্যারিষ্টটল তাঁহার "History of Animals" গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দেখিতে কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণের, পা দুটি লাল। ইহা কোনমতেই পোষ মানে না। ইহার মূল শরীর ক্ষুদ্র, কিন্তু চঞ্চু খুব বড়। নাসিক ফুল ইত্যাদি নাই। চক্ষু গাঢ় ধূসর বর্ণের; মস্তক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত।

ইংলিশ বা আইরিশ ক্যারিয়ারের বৈজ্ঞানিক নাম কলুম্বা টুবার্কুলোসা। আইরিশ ক্যারিয়ার ইংলিশ ক্যারিয়ার অপেক্ষা অনেক প্রাচীনকালের। এই জন্য ইহাতে আদিম পিতা মাতার বিশেষ লক্ষণগুলি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান আছে। বোগদাদ কপোতের ন্যায় ক্যারিয়ারের নাসিকফুল বিলক্ষণ পরিস্ফুট। ইহারও চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে সূক্ষ্ম মণ্ডলাকার তিন চারিটি মাংসের পটি আছে। অধুনা লণ্ডনের ক্যারিয়ারদের মধ্যে নাসিক ফুলের অসম্ভব আকার অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বস্থ পটি এখনও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বার্ম্মিংহাম ও লণ্ডনের কোন কোন উপবংশ মধ্যে ক্যারিয়ারের এই বিশেষ লক্ষণ দুটি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বলা আবশ্যক ক্যারিয়ার বা বোগদাদ কপোতের সুবৃহৎ নাসিকফুল এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বের মণ্ডলাকার মাংস পটি, ইহার বার্ত্তাবহন কার্য্যের এক বিন্দুও সহায়ক নহে। এই অদ্ভুত দৈহিক বিকাশগুলি কেবল কপোতপালকদিগের খামখেয়ালি মতলব বা সখের জন্যই উদ্ভূত হইয়াছে। বোধ হয়, শুদ্ধ দেখিবার বাহার হইবার জন্যই কপোতপালকেরা নির্ব্বাচন করিয়া করিয়া এই বিকাশগুলি ফুটন্ত, পরিবর্দ্ধিত ও স্থায়ী করিয়াছে।

ক্রাভাতের বৈজ্ঞানিক নাম কলুম্বা টুর্বিটা। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী লেজ নামক দেশে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার লক্ষণ এই,—চঞ্চু অত্যন্ত ক্ষুদ্র; নাসিক ফুল প্রায় নাই বলিলেই হয়। চক্ষু দুটি বেশ ফুটন্ত, চারি পাশে সরু মাংসের পটি দ্বারা ঘেরা; চক্ষুর বর্ণ সীসের মত ঘোলা। গ্রীবার সম্মুখদেশে পালকগুলি বোণাটের ফুলের মত বেশ সুন্দর ধরণের। পালকগুলি বোনাটের মত বলিয়া উহাই কপোতের নামকরণ হইয়াছে। (ফরাসী ক্রাভাৎ অর্থ বোনাট।) ইহারা অনেকক্ষণ ও অনেকদূর উড়িতে পারে। কপোতপালকেরা ইহার সহিত বোগদাদ কপোতের ক্রস করাইয়া এক নূতন বংশের উৎপত্তি করিয়াছে। এই নূতন বংশের নাম টাম্বলার (এ দেশের গিরেবাজ।)

বোগদাদ ও হিরণ্ডেল নামক এক প্রকার কপোতের সঙ্গমে আর এক নূতন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকে মোচেন বলে। হিরণ্ডেল শব্দের অর্থ Swallow বা ভরতপক্ষী। ভরতপক্ষীগণ প্রসিদ্ধ Migratoy birds, শীতাবসানে সোয়ালো ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসে, শীত আরম্ভ হইলে য়ুরোপের দক্ষিণ প্রদেশে চলিয়া যায়। প্রতি বৎসর অভ্রান্তরূপে ইহার এইরূপ দেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সুতরাং সোয়ালোর দিকজ্ঞান যে অতি পরিস্ফুট তাহার সন্দেহ নাই। হিরণ্ডেল কপোত অতি দ্রুতবেগে চক্রাকারে অনেক উচ্চে উড়িতে পারে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব বড় বড় চক্র দিয়া থাকে।

সোয়ালোর ন্যায় ইহাদেরও দিকজ্ঞান বেশ পরিস্ফুট। বোগদাদ ও ছিরগুেল ক্রস জাত মোচেনেরও উড্ডয়ন শক্তি অতি প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমানে টম্বলার ও মোচেন বংশ প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পরিবর্ত্তে এক্ষণে বেলজিয়মে ও উহার সন্নিকটস্থ প্রদেশে অন্য দুই নূতন বংশীয় কপোতের অভ্যুত্থান হইয়াছে। মূলতঃ এই নব বংশদ্বয় টম্বলার ও মোচেনেরি সন্তান সন্ততি। এই দুইটি নূতন বংশের নাম আঁভার্সোয়া ও লেজোয়া।

আঁভার্সোয়া ক্যারিয়ার ও টম্বলারের ক্রস জাত। উহা দ্রুতগামিত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতায় অদ্বিতীয়। ইহার শরীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, চঞ্চু দীর্ঘ ও দৃঢ়, পক্ষের পালক শক্ত ও লম্বা। ডানা মুড়িলে লেজের পালকের শেষ সীমাতে আসিয়া পড়ে। গ্রীবাদেশ যথেষ্ট বলশালী, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ পালকে অতি সুন্দররূপে আবৃত, উজ্জ্বল ধাতুর ন্যায় সুচিকণ বর্ণযুক্ত। ইহা এক্ষণে জার্ম্মণির সমরসংক্রান্ত সমুদয় কপোত নিবাসেই নিযুক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি এই আঁভার্সোয়া বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়, পারি অবরোধকালে ফরাসী জাতি দ্বারা সংবাদ বহনে নিয়োজিত হইয়াছিল।

লেজোয়া টম্বলার ও মোচেন এই দুই বংশীয় কপোতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহা সকল প্রকার বার্ত্তাবাহী কপোতের তুলনায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। ইহার যেমন সাহস, তেমনি বল, তেমনি অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। দিকনির্ণয় শক্তিতেও ইহার সমতুল্য কেহ নাই। ফ্রান্সে ইহার বহুল আদর। ফরাসীরা অপর কোন বার্ত্তাবাহী কপোত অপেক্ষা লেজোয়াকেই অধিক পছন্দ করে। ইহার গলদেশের পালকের রঙ অতি সুচিকণ ও ধাতুর ঔজ্জ্বল্য সমন্বিত। ইহার গ্রীবার সম্মুখের পালকগুলি কখন কখন ক্রাভাতের ন্যায় উস্কো খুস্কো হয়। আঁভার্সোয়া অপেক্ষা ইহার দেহ ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ, চঞ্চু অত্যন্ত ক্ষুদ্র; নাসিকার উপর অনাবৃত মাংস অতি অল্পই থাকে। চক্ষুদ্বয় সতেজ ও উজ্জ্বল। চতুষ্পার্শ্বে অতি সূক্ষ্ম বৃত্তাকার মাংসপটি। পক্ষ সুদীর্ঘ; দশটি বারটি পালক এমনিভাবে উপর্য্যুপরি সন্ন্যস্ত থাকে যে সমুদয় পালক গুটায়িত অবস্থায় একটি পালকের ন্যায় হয়।

এক্ষণে, সংক্ষেপতঃ, বার্ত্তাবাহী কপোত সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে—ইহারা সকলেই অধুনাতন সময়ের, সকলেই কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রসূত। বোগদাদ কপোত অনেক প্রাচীনকাল হইতে বার্ত্তাবহনে নিয়োজিত আছে। ইহার এই মহৎগুণের জন্য প্রাচীন কপোতপালকগণ যথাসাধ্য ইহার বংশ অমিশ্র ও পরিশুদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য কপোতের ন্যায় ইহাও কপোত পালকদিগের খামখেয়ালি রুচির ফল। ইহার নাসিক ফুল, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ চক্রাকার মাংসপটিগুলি, শুদ্ধ দেখিবার বাহারের জন্য, সখ করিয়া কপোতপালকগণ ঈদৃশ অপূর্ব্ব বাহ্য বিকাশগুলি উৎপন্ন করিয়াছে। বার্ত্তাবাহী কপোতের কোন প্রয়োজন ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আদৌ বোগদাদ কপোত ও আরণ্য বা জঙ্গলি কপোতের সংমিশ্রণে বর্ত্তমানের বিবিধ বার্ত্তাবাহী কপোত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—

বোগদাদ ও আরণ্য কপোত বিজের সংমিশ্রণে ক্যারিয়ার, বোগদাদ ও ক্রাভাতের সংমিশ্রণে টম্বলার, বোগদাদ ও হিরণ্ডেলের সংমিশ্রণে মৌচান, ক্যারিয়ার ও টম্বলার ও মৌচনের সংমিশ্রণে লেজোয়া। টম্বলার ও মৌচান এক্ষণে আর নাই, ইহাদের বংশ নির্মূল হইয়াছে। পরোক্ষভাবে, আঁভার্সোয়া ও লেজোয়ার মধ্যে ইহাদের শোণিত অদ্যাপি বিদ্যমান। ক্যারিয়ার ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে, আঁভার্সোয়া জার্ম্মাণিতে লেজোয়া ফ্রান্সে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বোগদাদ কপোত এখনও আরব্য ও পারস্য দেশে সংবাদ বহনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ক্রাভাতে বেলজিয়মেই বিশেষ প্রচলিত।

এই কপোত তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে একটি অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা হৃদয়ে উদয় হয়, তথ্যটি এই যে, কেমন করিয়া এক মূল আদি বীজ হইতে ধীরে ধীরে নানা শাখা প্রশাখা সম্পন্ন প্রকাণ্ড আয়তনের কোন বিকাশ সম্ভাবিত হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণ, বংশ, জাতি ও প্রকার ভেদ কেবল সময়ের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ জগতে বা জীব জগতে কোন একটি উদ্ভিদ বা জন্তুবিশেষে কোন একটি (প্রথমতঃ নিতান্তই আকস্মিক) পরিবর্ত্তন বংশপরম্পরায় ক্রমশঃ স্থায়ী হইয়া একটি স্বতন্ত্র বংশের উদ্ভব হয়। এই নববংশ কালে একটি বংশধরদিগের মধ্যে আরো নানা স্থায়ী পরিবর্ত্তনের বিকাশ করিয়া ক্রমে একটি জাতিরূপে পরিণত হয়। এই জাতির অন্তর্গত বংশগুলি যতই নানাবিধ পরিবর্ত্তনের স্থায়ী বিকাশ করিয়া পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইতে থাকে, আপনাদের মধ্যে নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে, ততই সেই ক্ষুদ্র মূল বংশটী শাখা-প্রশাখা হইতে এত বিভিন্ন হইয়া পড়ে যে তখন ইহাকে ক্রমশঃ Species, genus, order, family বলিয়া বাচ্য করিতে হয়। পরিবর্ত্তন প্রত্যেক জীবও উদ্ভিদের অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ ধর্ম্ম। সেই জীব বা উদ্ভিদ রাজ্যে এত বৈচিত্র্য। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা কত অসংখ্য কালও যুগ হইতে অতি ধীরে ধীরে এইরূপে কোন একটী পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ. বিবিধ বর্ণ, জাতি, শ্রেণী ও পরিবার সকল সূচিত হইয়াছে। এক্ষণে, মনুষ্য স্বকীয় জ্ঞান বুদ্ধি বলে কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারাও জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া কত নূতন বংশ কত নূতন বর্ণের সৃজনা করিতেছে। কালে ইহারাই আবার এক এক জাতি বা শ্রেণী বা পরিবার রূপে ভবিষ্য বৈজ্ঞানিকবংশ কর্ত্তৃক অভিহিত হইবে। কপোতের প্রায় শতাবধি বর্ণ আছে। আজ এই তিন সহস্র বর্ষ ধরিয়া মনুষ্যগণ আপন আপন রুচি ও সখ অনুসারে এত বিবিধ বর্ণের কপোতের সৃষ্টি করিয়াছে। দেখা যায় আদৌ ইহারা সকলেই কৃত্রিম নির্বাচনে ও মনুষ্যের যত্নে এক আরণ্য কপোত হইতেই সমদ্ভূত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপ্রতিচরণ রায়।

সন্ন্যাসী।

নিদাঘের প্রখর রবি পার্ব্বত্যজনপদে সারাদিন অবিচ্ছেদে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এখন ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে সমুপস্থিত। গোধূলির অরুণ-কিরণ সুশ্যামল বৃক্ষপত্রের উপর তাহার সুবর্ণচ্ছটা ছড়াইয়া দিয়াছে ; দূরে—অতি দূরে সমুচ্চ পর্ব্বতোপরি ঝালাবার অধিপতির সুরম্যপ্রাসাদ তখনও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছিল।

সুন্দরপতি রাঠোররাজের একমাত্র পুত্র দেববল মৃগয়া উপলক্ষে বহির্গত হইয়াছেন। বেলা ফুরাইয়া যায় তথাপি তিনি বনমৃগের অনুসরণে নিযুক্ত। অসংখ্য গিরিনির্ঝরিণী অতিক্রম করিয়া বহুক্ষণ পিতৃরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া আসিয়াছেন ; গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষি প্রখর রৌদ্রোত্তাপে সুকুমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, তথাপি তিনি অশ্বচালনা করিতেছেন। এদিকে সূর্য্য যখন অস্তাচল গমনোন্মুখ এমন সময় দূরে ঝালাবার প্রাসাদশীর্ষ হইতে মনোহর বাদ্য বাজিয়া উঠিল, অমনি দেববল সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বুঝিতে পারিলেন কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন দিন প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। সমস্ত দিনের শ্রান্তি, ক্ষুধা এবং মৃগয়ালাভ বঞ্চিত হওয়ার ক্লেশ যুগপৎ তখন তাঁহার হৃদয়াধিকার করিল। সঙ্গীয় কতিপয় রাঠোর শরীররক্ষককে তিনি পথিমধ্যে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহারাও নিকটে নাই। দেববল ভাবিলেন গৃহে ফিরিয়া যাই ; কিন্তু ষোড়শবর্ষীয় বালক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সুতরাং অনিচ্ছাসত্বেও ক্রমশঃ অদূরবর্ত্তী দুর্গসান্নিধ্যে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। ধীরে ধীরে অশ্ব পর্ব্বতপথে চলিতেছে, দেববল অশ্বারূঢ় হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, পূর্ণিমার চাঁদ যেন তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে উঠিয়া সহসা এখানে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রমার রজত মধুপ্লাবনে পর্ব্বতপ্রদেশ সহসা হাসিয়া উঠিল—চন্দ্রকিরণপাতে প্রফুল্ল পথপার্শ্ববর্ত্তী বিবিধ আরণ্য কুসুমরাজি, নৈশসমীরের হিল্লোলে ঈষন্নমিত হইয়া রাঠোররাজপুত্র দেববলকে যেন রাজঅতিথি বোধে আবাহন করিল।

ঝালাবার রাজপ্রাসাদের পাদদেশে একটী সুন্দর হ্রদ পরিশোভিত। হ্রদের চারিদিকে চারিটি ঘাট, তাহা মর্ম্মর-প্রস্তর-বিমণ্ডিত। হ্রদের জল যমুনা জলের ন্যায় নীলাভ ; তন্মধ্যে রক্তকুবলয়, শ্বেতকুবলয় প্রভৃতি কত রকম ফুল ফুটিয়া থাকিত। ঝালাবার প্রাসাদের নিম্নে সেই হ্রদটি রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য আরও শতগুণে বাড়াইয়া তুলিত। যে দিন দেববল ঝালাবার হ্রদ প্রথম দেখিয়াছিলেন সেদিন তাহার শোভা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেববল যখন হ্রদপার্শ্বে অশ্বারোহণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আকাশে চাঁদ তখন পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোক ঝালাবার হ্রদের ফুলশোভাকে সহস্র-ভাবুক-পরিসেব্য করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্গের জ্যোৎস্নায় এবং পৃথিবীর

হ্রদনীরে এমন মেশামিশি, স্বর্গের চাঁদে আর পৃথিবীর ফুলদলে এত হাসাহাসি দেববল জীবনে বুঝি এই প্রথম দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন সেই সরসীসলিলে, পদ্মবন মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র তরী দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ভাসিতেছিল ও তদুপরি তিনটি বালিকা বসিয়া বসিয়া যে যত পারে ফুল তুলিতেছিল। ফুলে ফুলে নৌকার প্রান্তভাগ স্তূপীকৃত হইয়াছে; ফুলের মালায়, ফুলের বালায়, ফুলের হারে, ফুলের দুলে বালিকা তিনটি ফুলরাণী সাজিয়াছে তবুও তাহাদের ফুলের সাধ মিটিতেছেনা। দেববল ভাবিলেন, এ স্বর্গ না পৃথিবী? এ শোভা কি পৃথিবীর? পৃথিবীর শোভা যদি হয়, তবে কৈ সুন্দর রাজপ্রাসাদে ত এত শোভা নাই। সুন্দর রাজ্যে সরসী ত এমন ফুল এমন জল ধারণ করে না। সেখানে কৈ দেববালার মতন এমন সুন্দর বালিকা ত দেখি নাই; সুন্দর রাজ্যে আকাশে যে চাঁদ হাসে তাওত এমন সুন্দর দেখায় না। সৌন্দর্য্যের আবেশে দেববল ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছেন, সৌন্দর্য্যামুধ্যানে দেববল দেখিতে দেখিতে মানসরাজ্যে এ জগৎছাড়া যেন আরো উচ্চতর কোন স্থান খুঁজিতে লাগিলেন;—রাঠোর-রাজকুমার দেববলের মৃগয়ালিপ্সু ক্ষত্রোচিত উগ্রপ্রকৃতি স্বর্গের এই সৌন্দর্য্যমদিরায় মাতোয়ারা—মন্ত্র-বিমুগ্ধ হইল। আজিকার এই শোভা মোহময় তাড়িৎশক্তিতে দেববলকে প্রেম ও সৌন্দের্য্যের উপাসক করিয়া তুলিল। ইহার প্রভাবে চিরসুখপালিত রাজপুত্র রাজগুণ বিসর্জ্জন দিয়া ভবিষ্যতে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে নিষ্কাম প্রাঙ্গনের পবিত্র ধূলি মাখিয়াছিলেন। কিন্তু সংসার—এই ক্ষতিলাভগণনা এবং পাশবশক্তিপ্রধান সংসার কি প্রেমিকের মর্য্যাদা বোঝে? প্রেমিকের আশা কি এ সংসারে পূর্ণ হয়? রাঠোর রাজকুমার দেববলের ভবিষ্য-কাহিনী তাহার বিচার করিবে।

দেববল সেই হ্রদতটস্থ প্রস্তরপথোপরি দাঁড়াইয়া নির্নিমিষ নয়নে হ্রদমধ্যবর্ত্তী শোভা দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ তমালতরু-শাখায় অশ্ব সংযুক্ত করিয়া অবিলম্বে তিনি সম্মুখবর্ত্তী ঘাটের সোপান নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরিধানে তাঁহার শ্বেত সমরসজ্জা; স্কন্ধে ধনুক সংযোজিত, পৃষ্ঠে তূণীর বিলম্বিত, মস্তকে শুভ্র মস্‌লিন নির্ম্মিত শিরস্ত্রানোপরি উজ্জ্বল হীরককল্কা শোভা পাইতেছিল এবং হীরক কল্কাগ্রভাগ হইতে কুন্দশ্বেত মুক্তাগুচ্ছ আনত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছিল; সলিল সমীরণস্পর্শে তাহা ধীরে ধীরে দুলিতেছিল।

আর এক মুহূর্ত্ত! নিমেষ মধ্যে বালিকাত্রয় নৌকাখানিকে চালিত করিয়া যে সোপানোপরি দেববল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন ঠিক্ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সমরসজ্জিত দেববলের উজ্জ্বলমূর্ত্তি মুহূর্ত্তে তাহাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বালিকাত্রয় এরূপ স্থলে অপরিচিত ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারে নাই তাই মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা বিস্মিত হইল। হস্তস্থিত ক্ষেপণী নিস্তব্ধ হইয়া গেল, তিনজনে পরস্পর মুখ চাহিতে লাগিল। দেববল সুশ্রী এবং বয়সে বালক;

বালিকাগণ সে সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায় নাই, কিন্তু অচিন্তিত ও অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া বিস্মিত হইল। এতক্ষণে নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেববল বলিলেন,—'আমি এখানকার অপরিচিত; মৃগয়া উপলক্ষে পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া ঘটনাক্রমে এই খানে আসিয়া পড়িয়াছি। রাত্রি হইল, সঙ্গের লোকদেরও সকলকে হারাইয়াছি। আমি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধিত; এ প্রাসাদ যদি তোমাদের হয় আজ তবে আমাকে এখানে আশ্রয় দাও।" যে বালিকা ফুলরাণী সাজিয়া নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়াছিল এই কথা শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ ভগ্নকণ্ঠে বীণাধ্বনির ন্যায় বলিল, "পিতার কাছে চল, তিনি তোমায় আশ্রয় দিবেন।"

নৌকা ইতিপূর্ব্বেই থামিয়াছিল; দেববল বালিকার আতিথেয়তায় কৃতজ্ঞহৃদয়ে নৌকায় উঠিয়া গভীর হ্রদবক্ষে তরীচালনার ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সে কথা শুনিয়া তিনটি বালিকা হাসিয়া সমস্বরে বলিল,—'আমরা জ্যোৎস্না রাত্রে রোজই এমনি করি।"

দেববল আর কিছু কহিলেন না; আনন্দ উদ্বেগময় হৃদয়ে এই ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন, এবং সরোজভাসিত হ্রদবক্ষে সরোজবালা পরিবৃত হইয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ভাসিয়া চলিলেন। ক্রমে প্রাসাদপাদদেশে তরী চালাইয়া তিনটি বালিকা রাজপুত্র দেববলকে সঙ্গে করিয়া কিয়ৎকাল মধ্যেই ঝালাবারপতি যে গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। দূর হইতে ঝালাবারপতি আপন দুহিতার সহিত একটি অপরিচিত বালককে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন; তাহার পর নিকটে আসিলে দেববলকে চিনিয়া ত্রস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্মিতস্বরে বলিলেন,—'রাঠোর-রাজপুত্র এখানে?" তখন দেববলও ঝালাবারপতিকে চিনিতে পারিলেন, এবং মনে ভাবিয়া সুখী হইলেন ঐ দেববালা সদৃশী বালিকাটি ঝালাবার সর্দ্দারের দুহিতা। দেববল বলিলেন,—'আমি ঝালাবারপতির গৃহে অতিথি হইয়াছি জানিতে পারি নাই; যাহা হউক্ খুব সুখের বিষয় হইল।"

দেববল অবশেষে সেদিনকার আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন; তাঁহার দুহিতার আতিথ্যের প্রশংসা করিলেন। প্রাণাধিক দুহিতা আজ রাঠোর-রাজপুত্রের সম্মাননা করিয়া রাজ-আতিথ্যের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে জানিয়া তিনি সস্নেহে তাঁহার দুহিতার মুখচুম্বন করিলেন। বালিকা যুগপৎ পিতার সস্নেহাশীর্ব্বাদ এবং তাহার প্রতি রাজকুমারের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পিতৃপার্শ্বে মুখ লুকাইল।

অবিলম্বে রাঠোরপতিকে রাজপুত্রের কুশল বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। রাঠোররাজকুমার আজ ঝালাবার প্রাসাদে অতিথি, তোরণদ্বারে আনন্দ-বাদ্য বাজিতে লাগিল, প্রাসাদশিরে সহস্র প্রদীপালোকের মধ্যবর্ত্তী হইয়া শত শত পতাকা সমীরণ-হিল্লোলে দুলিতে লাগিল। রাজ্যের কত দীন দুঃখীকে ঝালাবারপতি সেই

রাত্রিতেই অন্ন ও বস্ত্র দান করিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রগম্ভীর নিনাদ ঝালাবার শৈলপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর রাঠোররাজপ্রাসাদে রাজতনয়ের মঙ্গল জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

ঝালাবারপতি সুস্নেহ সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক দেববলকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন। রাজপুত্রের আগমন-সংবাদে রাণী রাজোপভোগ্য আহার্য্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেববল পুরনারীগণের হুলুধ্বনির মধ্যে রাজান্তঃপুরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কত আদরে, কত যত্নে ঝালাবার রাজমহিষী তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন। দেববলের সুঠাম বদনের দেবসুলভ আকৃতি দেখিয়া রাজরাণীর হৃদয়ে সন্তানবাৎসল্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে রাত্রি দেববল ঝালাবার-প্রাসাদেই বিশ্রাম করিলেন; পরদিন আর থাকিলেন না। বিদায় লইবার সময় দেববল রাণীকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। মাতৃসম্বোধনে সাহস পাইয়া তিনি রাজপুত্রকে পুনরায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। ঝালাবার হ্রদের বিগত সান্ধ্যশোভা দেববলের হৃদয়ে যে রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা আজও বিলীন হয় নাই; ভবিষ্যজীবনেও তাহা বিলীন হইবার নহে। দেববল তাই ঝালাবার সন্দর্শনে পুনরায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অবিলম্বে অশ্বারোহিত হইলেন; ঝালাবার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, দূরে—ঝালাবারপ্রাসাদশীর্ষে একটি বালিকামূর্ত্তি একধ্যানে তাঁহার বিদায়দৃশ্য দেখিতেছে। সমুচ্চ পর্ব্বতচূড়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিল; সে মূর্ত্তি আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। প্রাসাদশীর্ষে দণ্ডায়মানা এই মূর্ত্তি কি ঝালাবাররাজদুহিতার? ইহা কি সেই সান্ধ্য-হ্রদের সরোজবাসিনী?

সেই দিন হইতে দেববল ঝালাবার রাজপরিবারের সন্তানস্থানীয় হইয়াছেন।

(২)

উক্ত ঘটনার অনেক দিন পরে, এক দিন দুর্গনিম্নবর্ত্তী কমলাবনে ঝালাবার রাজনন্দিনী একাকিনী বসিয়া ফুলহার গাঁথিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে বনপথ হইতে অদৃশ্য কোকিলের কুহুধ্বনি মলয়ানিলের সহিত সমগ্র বনপ্রদেশকে বসন্তসমাগমসংবাদে মুখরিত করিতেছিল। রাজকুমারী মালা গাঁথিতেছিলেন কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত বিমনস্ক বোধ হইতেছিল। যেন কাহারও আগমন প্রত্যাশায় তিনি প্রতিক্ষণে পশ্চাদ্বর্ত্তী বনপ্রদেশে চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন। কিয়ৎকালের জন্য তিনি ফুলমাল্য-রচনায় প্রগাঢ় মনোনিবেশ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার লোচনদ্বয় করপুটে আচ্ছন্ন করিল। স্নিগ্ধ কোমল করপুটাচ্ছন্ন কিশোরী অমনি বলিয়া উঠিলেন,—'দেববল, কখন্ আসিবে বলিয়া গিয়াছিলে বলদেখি! সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তোমার আসার আশায় পথ চাহিয়া চাহিয়া আজ শ্রান্ত হইয়াছি।" দেববল তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া বিষণ্ণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'অনামিকা, বুঝি এই সাক্ষাৎ শেষ সাক্ষাৎ। আর বলিয়া কষ্ট দাও কেন? এ হতভাগ্যের আগমন

প্রতীক্ষায় আর সজলনয়নে বসিয়া থাক কেন? আর কেন, সব ভুলিয়া যাও; আমি পুরুষ, আমার পাষাণহৃদয়ে সব সহ্য হইবে, কিন্তু তোমার কোমল প্রাণে এ দুর্ভাগ্যের মূর্ত্তি স্থান দিয়া দুঃখ বাড়াইও না। তুমি পবিত্র অন্তঃপুরচারিণী কুমারী, তোমার ইচ্ছায় কোন্ কাজ নিষ্পন্ন হইবে? জীবনের ভবিষ্য সুখ আশায় যে সকল নবীন কল্পনায় হৃদয় ভাসাইয়া দিয়াছ, আজ ইষ্টদেবতার নামে সব বিসর্জ্জন দাও।'

দেববলের কথা শুনিতে শুনিতে অনামিকা এতক্ষণ চক্ষুজলে বুক ভাসাইতেছিলেন; দেববল নিস্তব্ধ হইলে তিনি শিশিরসিক্ত শ্বেতপদ্মের ন্যায় অশ্রুসিক্ত মুখকমল উন্নত করিয়া দেববলের দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন, দেববলের বদন বিশুষ্ক, চক্ষু অনিবার অশ্রুপাতের চিহ্নস্বরূপ রক্তবর্ণ, সমগ্র মুখশ্রী যেন বিঘোর নৈরাশ্যের পাণ্ডুতায় সমাচ্ছন্ন। বিস্ফারিত-নয়নতলে কজ্জলরেখার ন্যায় গাঢ় কালিমা পরিস্ফুট, তাহাতে সজীবতার লেশমাত্র নাই, তাহা শীতল মৃতদেহের নামান্তর। প্রাণাধিক প্রণয়ীর মুখের দিকে তাকাইতে অনামিকার বুক শতধা বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নয়নসমক্ষে বিঘূর্ণিত হইতেছিল, হৃৎপিণ্ডের পরতে পরতে কিসে যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকা মুহুর্মুহু চাপিয়া ধরিতেছিল। হায়, এক দিনে দেববলের এত পরিবর্ত্তন! অনামিকা উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—'দেববল, তুমি আমায় কি উপদেশ দাও? তুমি কি আমায় পাগল করিবে? প্রাণাধিক, ভালবাসা বিসর্জ্জন দিতে হয় সমূলে তুমি বিসর্জ্জন দাও, আমাকে ও কথা বলিয়া আর কষ্ট দিও না। যত দিন এই ক্ষুদ্রদেহে এক বিন্দু শোণিত থাকিবে, আমি তোমা বৈ অন্য কাহারও নই। পিতা যদি হৃদয় না বুঝিয়া এই অসার শরীরের সহিত অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহ দেন, ভাল, আমি তখনও তোমারই। আমি যে দেবতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় অস্তিত্বের কল্পনা ত আমার মন প্রাণ জানে না। সংসার যাহাকে 'বিবাহ' বলে তুমি তাহার অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার কি? যে একদিন পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া একজনকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, পবিত্র, স্বর্গীয় প্রেমডোরে যাহারা মনে মনে একদিন অনুস্যূত হইয়াছে, নাই বা থাকিল সেখানে শঙ্খ ঘণ্টা হুলুধ্বনি, সংসার যদি সেই পবিত্র দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার তাহাদিগকে অন্যের সহিত বিবাহ দিতে চায়, সে বিবাহ কি ধর্ম্মের চক্ষে সিদ্ধ? তাহা কি কপট নীতির নামান্তর নয়? তাহা কি ব্যভিচারের ঘৃণিত রূপান্তর নয়? পরম পিতা কোন্ বিবাহের সমর্থন করিবেন? বাদ্যোৎসব করিয়া যে বিবাহ হয়, তাহাই কি একমাত্র যথার্থ বিবাহ? সরলা বালিকা মৃণ্ময়ীর যেরূপ বিবাহ দেয়, পিতা যদি আমার মৃত্তিকার রূপান্তরিত প্রাণহীন জড়দেহ লইয়া বিবাহ দিয়া সুখী হন, তবে বেশ, আমার বিবাহ হইবে; মৃণ্ময় অংশে, জড়শরীরাংশে আমি পিতার নিকট, ক্রীড়নক স্বামীর নিকট আজও পবিত্র, চিরকাল পবিত্র থাকিব, কিন্তু এই সজীব প্রাণ—এই অবিনশ্বর প্রাণ যাহাকে একদিন ভালবাসিয়াছে, চন্দ্র সূর্য্য যদি কক্ষভ্রষ্ট হয়, সৌরজগৎ

যদি বিধ্বংস হয়, তাহা অটুট এবং অচল। প্রাণের এই মিলকর্ত্তা মিলনরাজ্যের বিধাতা। মাটির সংসার আত্মা কলুষিত করিতে পারে, ইহা কোন্ দিন শুনিয়াছ? তুমি আমাকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? পতি পত্নীতে কোন কালেও ছাড়াছাড়ি হইতে পারে না। শরীর ছাড়ে, আত্মার অদৃশ্য শক্তি ত ছাড়িতে পারে না। ইহা অসম্ভব। যে দিন পতি পত্নী পৃথক্ হইবে, যে দিন রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন বিচ্ছিন্ন হইবে, সেই দিন বিশ্বপতির পুরুষ-প্রকৃতি-লীলা সহসা বিচ্ছিন্ন হইবে; সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য খসিবে, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর ঘর্ষিত হইবে, সৌরজগৎ চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইবে। সেই দিন প্রলয়ের জলে সব ডুবিবে। দেববল, এখন আর আমার বেশী বলিবার ক্ষমতা নাই; কেবল এইমাত্র বলি, তোমার সহিত কি আমি শরীরের সম্বন্ধ রাখিয়াছি? কিন্তু জানিও, প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঐ নাম, ঐ রূপ, ঐ স্নেহ, ঐ করুণা ঐ সব বিজড়িত।" দুঃখের আবেগে রাজকুমারী অনামিকা আজ প্রাণের কপাট খুলিয়া দিয়াছেন। আজ প্রাণের সব কথা দেববলের নিকট বলিয়াছেন। অনামিকা এখন সেই সান্ধ্যহ্রদের ফুলময়ী বালিকাটী নহেন, যৌবনের উষায় এখন তিনি পদার্পণ করিয়াছেন। আজ প্রাণাধিক মানসপতির বক্ষে আশ্রিত হইয়া তাঁহার সংসারের শেষ প্রীতিকথা কহিতেছেন, তাঁহার লজ্জা কি?

দেববল, অনামিকার হৃদয়ের প্রগাঢ়তা অনেক দিন বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার কথা শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। দেববল জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু কিছুদিন হইতে তিনি এক যোগীগুরুর শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। স্বভাবতঃ তিনি প্রেমময়, করুণাময়, ভক্তিময়। যেদিন তিনি ঝালাবার দুহিতাকে দর্শন করেন সেই দিন তাঁহার হৃদয় প্রথম প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হয়। তাহার পর গুরুর উপদেশে এই ভাব ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিষ্কাম প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছে; তিনি দ্বেষ, হিংসা যুদ্ধ শোণিতপাতের সম্পূর্ণ বিরাগী হইয়া অহিংসা পরমোধর্ম্ম এই বাক্য জীবনের বীজমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—

"প্রাণাধিকে, ভগবানের ইচ্ছা যাহা সম্পূর্ণ হউক, মানুষের শোণিতপাত করিতে আমার আর অভিলাষ নাই। যে পবিত্র প্রেম-সাধনা আমাকে বারম্বার স্বার্থশূন্য হইতে উপদেশ দিয়াছে, যে দেব আশীষ আমাকে সমগ্র জীব এবং জড়জগতের সহিত ভ্রাতৃবন্ধনে একীকৃত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে; তাহাই আমাকে মনুষ্যের শোণিত পানের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, নহিলে তোমার জন্য আবার সমর ক্ষেত্রে নিষ্কোষিত অসি হস্তে অযুতজীবের জীবন সংহার করিতাম। শোণিত হ্রদে মিবাররাজের ঘৃণিত জিগীষা বৃত্তির পরিতর্পণ করিতাম। কিন্তু তাহা আমি অন্যায় মনে করি—নিজের স্বার্থের জন্য রক্তপাত করিব না। যাহা ঘটিবে, দিব্যচক্ষে আমি সকলই দেখিতেছি; কিন্তু প্রাণাধিক, আমরা ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষা করি; যাহা সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে

তজ্জন্য প্রস্তুত হই। অনামিকে! যাও, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি ঝালাবার প্রাসাদে আর মুখ দেখাইব না। ঠাকুরাণীকে আমার কথা বলিয়া আমার শেষ প্রণাম জানাইও।"

যাহা হইবার, হইয়া গেল। অনামিকার মাতা কত কাঁদিলেন, কত পায়ে ধরিলেন, ঝালাবার রাজ কিছুতেই এ বিবাহে সম্মত নহেন। মিবারপতি কুম্ভের সহিত তিনি তাঁহার দুহিতার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। বিবেকবিহীন ঝালাবার সর্দ্দার বাক্যদান করিয়াও শিশোদীয় কুলগৌরবকে কন্যা দান করিবার আশায় পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইলেন। আর এক সপ্তাহ মধ্যে মিবাররাজ কুম্ভের সহিত ঝালাবার রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল। নবপরিণীতা বধূ লইয়া রাণা কুম্ভ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রাজকুমারী পিতৃগৃহ পরিত্যাগের সময় কাঁদিলেন না, ধীর চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মিবার রাজগৃহে অনামিকা এখন রাজমহিষী। রাণা কুম্ভ, অনামিকার ইতিহাস জানেন; কি জানি কেন, বিবাহের পর একপক্ষ অতীত হইয়াছে তিনি অনামিকাকে প্রেম সম্ভাষণ করিতে যান নাই। রাজন্তঃপুরবাসিনীগণের স্নেহ এবং শৈশব সহচরী পিতৃগৃহের সঙ্গিনী তিনটী এখন অনামিকার হতাশ, পীড়িত জীবনের অবলম্বন।

(৩)

অনেক দিন হইতে মিবারপতির সহিত রাঠোররাজের বৈরভাব প্রধূমিত হইতেছিল। রাঠোররাজপুত্রের সহিত ঝালাবার সর্দ্দার-দুহিতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরতর হইয়াছে এই সংবাদ দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। রাঠোর বৈরী মিবারপতি যেন আরও অধিক বৈরতা সাধনের জন্যই সহসা গুপ্তভাবে ঝালাবার সর্দ্দারের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাঠোররাজ, মিবারপতির এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হন নাই; কিন্তু ঝালাবার সর্দ্দার যে কুব্যবহার করিলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে তিনি নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাঠোররাজ হৃদয়বান পুরুষ, প্রাণাধিক পুত্র দেববলের মলিন মুখ দেখিয়া তিনি সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অনতিকাল মধ্যে রাঠোররাজ সেনাগঠনাজ্ঞা প্রচার করিলেন। প্রথমে মিবারেশ্বর কুম্ভের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়া পরে ঝালাবার সর্দ্দারকে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। রাঠোরপতি প্রিয়পুত্র দেববলকে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন,—"চিরশত্রু মিবারপতি এবং কাপুরুষ ঝালাবারসর্দ্দার তোমার মনোবেদনার সহিত রাঠোররাজকুলের যে অপমাননা করিয়াছে, সমর ক্ষেত্রে সহস্র শত্রু-শোণিতে অনুরঞ্জিত হইয়া সেই দুরারোগ্য মনোবেদনার শান্তিবিধান কর।' দেববল কৃতাঞ্জলিপুটে, আনত-নয়নে পিতৃ-সান্নিধ্যে বলিলেন,—'পিতঃ! আমাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া কাজ কি? অনুমতি করুন, রাঠোর সেনা সমরাভিনয়ে ক্ষান্ত থাক্।' 'কাপুরুষ' 'কুলকলঙ্ক' বলিয়া রাঠোরপতি দেববলকে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। দেববলের প্রার্থনায় সমর-ভেরী-নিনাদ নিস্তব্ধ হইল না,—স্বয়ং রাঠোররাজ সেনাপতির স্থান অধিকার করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। মিবাররাজধানী এবং রাজপ্রাসাদ লোকশূন্য; সকলেই সংগ্রামক্ষেত্রে সমুপস্থিত। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সৈন্যগণের বিকট কোলাহল, আহতের করুণ চীৎকার এবং অজস্র শোণিতপাতে মিবারভূমি মহাশ্মশানে পরিণত। রাঠোররাজ এই সময় একবার পুত্র দেববলকে অশ্বারোহণে রণভূমিতে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইলেন।

আজ মিবাররাজপ্রাসাদে বড়ই অশান্তি। কেহ কাহারও খোঁজ লয় না—কেহ কাহাকেও দেখে না। এই সুযোগে রাজান্তঃপুরমধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে অনামিকার সখী চন্দ্রা অনামিকাকে সৈনিকের অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত করিয়াছে। অনামিকা কালবিলম্ব করিলেন না; ক্ষত্রিয় রমণী বাল্যাবধি অশ্ব চালনায় শিক্ষিতা—দুর্গপ্রাচীরপার্শ্বে অশ্ব সজ্জিত ছিল, অনামিকা অসিহস্তে তদুপরি আরোহণ করিয়া অদূরবর্ত্তী সমরক্ষেত্রে অশ্ব ধাবিত করিলেন। লাবণ্যময়ী অনামিকা আজ কিসের আশায় দুরন্ত সমরসাগরে সাঁতার দিতে চলিলেন? সেখানে তিনি কাহার জয় পরাজয় দেখিবেন?

সংগ্রাম ক্ষেত্রের প্রান্তদেশে একস্থানে একজন রাঠোর সেনা একটি মিবার সৈন্যের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণধার ভল্লচালনা করিয়াছে। আর এক মুহূর্ত্তেই মিবার সৈন্য চিরকালের জন্য ভূশায়িত হয়; এমন সময়ে নক্ষত্র বেগে একজন অশ্বারোহী সেই রাঠোর এবং মিবার সৈন্যের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল,—মুহূর্ত্ত মধ্যে রাঠোরচালিত সুশাণিত ভল্ল অশ্বারোহীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল! তৎক্ষণাৎ রাঠোরবীর আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল,—'সর্ব্বনাশ! রাজপুত্র!!'—আর এক মুহূর্ত্ত; নীরবে আর একজন অপূর্ব্ব অশ্বারোহী নিমেষ মধ্যে রাঠোররাজ পুত্রের বক্ষঃপ্রথিত রক্তানুরঞ্জিত ভল্লাগ্রভাগে নিজের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিমীলিত নয়নে হেলিয়া পড়িলেন। রাঠোর সৈন্য ভীতি-বিস্ফারিত চক্ষে দেখিল, তাহার রাজপুত্রের সুঠাম সুন্দর শরীর পার্শ্বে আর একটি ততোধিক সুন্দর মূর্ত্তি শায়িত। সুতীক্ষ্ণ তরবারী চালনা করিয়া ঝালাবার সর্দ্দার ঠিক্ সেই স্থান অতিক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় মন্ত্র-রুদ্ধ-বীর্য্য বিষধরের ন্যায় তিনি কি দেখিয়া নিশ্চল হইলেন, তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক হৃদিস্পৃক্ চীৎকার করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। ঝালাবার সর্দ্দারের বুঝিতে কি বাকী আছে? দেখিতে দেখিতে শ্রবণ-ভৈরব সমর-নিনাদ থামিয়া গেল,—রণভূমে শোকবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ঝালাবারপতির ক্রোড়-দেশে তাঁহার দুহিতার শোণিতসিক্ত দেহ বিলম্বিত,—পার্শ্বে রাঠোর-রাজপুত্র অনন্ত রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছেন, তাঁহার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। আজ দেববল এবং অনামিকার প্রাণশূন্য মুখশ্রী যে দেখিয়াছে সেই আশ্চর্য্য হইয়াছে। যুগল বদন প্রস্ফুটিত শতদলের মত হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে যেন বলিতেছে,—'সংসার! কৈ, আমাদিগকে রাখিতে পারিলে কৈ?' অনামিকা যেন প্রেমের হাসি হাসিয়া বলিতেছে,—'দেববল! সংসার আত্মাকে ছুঁইতে পারিল কৈ?' ঠিক্ সেই স্থলে রাঠোররাজ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায়

সন্তানের মস্তকপার্শ্বে দাঁড়াইয়া। পুত্রশোকক্লিষ্ট পিতার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তিনিই জানিতেছিলেন। অগণিত প্রজাপুঞ্জের ক্রন্দনরোল থামাইয়া রাঠোররাজ বলিলেন,—'পাষণ্ড ঝালাবার সর্দ্দার! দেবতা দেববলের বাক্য না মানিয়া আজ আমি তাহাকে হারাইলাম, নতুবা এই সুশাণিত খড়্গ তোর ঐ পাপমস্তকে প্রহৃত হইত। তোর মত পাপীর রক্তপাত করিয়া হস্ত কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না।' এমন সময় মিবারপতি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'প্রেমিক দম্পতি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে!' ইহাই বলিয়া সহসা তিনি দেববলের কটিস্থ তরবারী উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। সকলে দেখিল, তাহা রক্তস্পৃষ্ট নহে, উজ্জ্বল তরবারী গঙ্গাজলের ন্যায় শুভ্র। 'দেববল তাঁহার একটি শত্রুরও প্রাণ নষ্ট করেন নাই।' এই কথা বলিয়া অনুতপ্ত—ব্যথিত রাণা সেই অসি সাহায্যে নিজের হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, শার্দ্দূলের ন্যায় অমিততেজে তরবারী কাড়িয়া লইয়া রাঠোররাজ অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—'দেবতার অসি পাপরক্তে কলুষিত করিও না; পুণ্যতরবারী গঙ্গাজলের ন্যায় শুভ্র থাক্।'

প্রেমিক দেববলের অমানুষিক আত্মত্যাগ এবং শত্রুর প্রতি অপার্থিব প্রেম দেখিয়া সকলেই অশ্রুপাত করিল। একে একে সকলে সেই প্রেমিক দেবতার পদধূলি মস্তকে দিল। রাণা কুম্ভ সাক্ষাৎ দেবদেবী জ্ঞানে তাঁহাদের পবিত্র পদধূলি গ্রহণ করিয়া উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

দেববল এবং অনামিকার যুক্ত-আত্মা দেবলোকে বৈকুণ্ঠে অনন্ত সুখভোগ করিতেছে। সেখানে বিচ্ছেদ কেহ জানে না। অনামিকা যদি স্বর্গে না যাইবে—দেববল যদি স্বর্গে না যাইবে, তবে স্বর্গের অধিকারী কে?

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

সুমন্ত্রণা।*

(১)

খাম্বাজ—একতাল।।

গুঞ্জরিছে অলি মঞ্জরীর কাণে,—
"ফোট্ না, অফুট বকুল-নারী,
জুড়া সুধা দিয়ে এ বিধুর প্রাণে,
আর না বেদন সহিতে পারি;
মলয়-অনিল ওই বহে যায়,
কুহরে কোকিল চ্যূতের শাখায়,

* গত আষাঢ় মাসের ভারতীর "কুমন্ত্রণা"র প্রতিবাদ।

প্রকৃতি, লো, আজি
ফুলদলে সাজি,
গেঁথেছে মাথায় যূঁথিকা-সারি !"
কহিল কলিকা সুরভি বচনে,—
"না ফুটিব, অলি, এ সারা জীবনে,
যৌবন অস্ফুট
রাখিব অটুট,
ফুটিলে পাপ্ড়ি ঝরিবে তারি !"
বলে অলি,—"দাও, নাহি দাও মোরে,
শুকাইবে মধু, দল যাবে ঝরে,
কি ফল জীবনে,
বিফল যৌবনে ?—
কেবল কলিকা-জনম সার-ই !"

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সুমন্ত্রণা। *

(২)

কুঁড়িটি থাকিবে দেবেনাক মধু ?
ঝরে পড় পাছে এই ভয় শুধু ?
বাসন্তী যামিনী—বসন্ত বায়
উদাস পরাণে বহে যাবে হায় !
ভ্রমরের দল গুমরি মরিবে
শিশির মানেতে মাটিতে শুখাবে
জোছনা কিরণ জলদে মিশাবে
কোকিল পাপিয়া নীরবে রহিবে
এততেও সখি রবে অভিমানী ?
—মরম হইতে উঠে এক ধ্বনি
"ফুটিলে ঝরিব ফুটিব না তবে"
কলিকাব্রতই ধরিয়া কি রবে ?

---

* আষাঢ় মাসের ভারতীর "কুমন্ত্রণা" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া।—

হয়োনা পাষাণী ওগো ফুলরাণি,
যৌবন লাবণ্যে হাসুক ধরনী,
পরিমল দাও বসন্ত অনিলে,
প্রমোদ পিয়াও পাপিয়া কোকিলে;
এমন মধুর শারদ যামিনী
কুলু কুলু তানে গাহিছে তটিনী
গুঞ্জরিছে অলি তোমারি আশায়
উথলিত রূপ-মধু দাও তায়,
উঠ ফুঠে সখি হরষের ভরে
থেকনা কলিকা চিরদিন তরে,
ঝরাই নিয়তি, ঝরিতেই হবে
অফুট থাকিয়া কি ফল তবে?
রূপসী না হেরি যদি গো তোমায়
ভ্রমর বঁধূয়া উড়ে চলে যায়,
আপন মরমে সহি অনাদরে
তবু ফুটে রহ ভ্রমরারি তরে।

শ্রীসুবোধকুমার বসু।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আকাশ-কুসুম।

বৈশাখের মধ্যাহ্নসূর্য্যের খরতাপে উত্তপ্ত বালুকাময় পথে অনাবৃতপদে তৈলকুম্ভ মস্তকে করিয়া চলিতে চলিতে নির্ব্বোধ কলু কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে; তৈল বিক্রয় করিয়া কিরূপে ভবিষ্যতে সুখৈশ্বর্য্যের দুরন্ত কামনা পূর্ণ করিবে, তাহাই ভাবিতেছে; কল্পনা বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের অনুসরণ করিল, বর্ত্তমান তিরোহিত হইল—ভবিষ্যৎ করতলগত;—অমনই সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ মধুর স্নিগ্ধতা বর্ষণ করিতে লাগিল, উত্তপ্ত বালুকা কুসুম-সুকোমল, স্নিগ্ধ মর্ম্মরে পরিণত হইল। সুখের তীব্র দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া অভিমানে মস্তক নড়িল, অমনই তৈলকুম্ভ ভূমিসাৎ হইল, সুখস্বপ্ন মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইল,—অমনই আকাশে যেন দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হইল, পদতলের বালুকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হইল। ললাটে মৃত্যু-স্বেদ দেখা দিল। ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে অন্ন-গ্রাস দিবার আর সম্বল নাই! সুখ-স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কেন জীবন-লীলা শেষ হয় না?

এই সুখ স্বপ্নের নামই আকাশ-কুসুম। যাহারা সুখ-স্বপ্ন দেখে, যাহারা আকাশ-কুসুমের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, তাহারাই সংসার পথে নিতান্ত অর্ব্বাচীন; তাহারা সুখের অন্বেষণে যাইয়া দুঃখের ভার লইয়া ফিরিয়া আইসে, সংসারাতীত প্রীতি বিতরণ করিতে যাইয়া কেবল অপ্রেমের বীজ বপন করে; ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে যাইয়া তাহাদের ভাগ্যে কেবল তীব্র হলাহলই উঠিয়া থাকে। এই কল্পনাপ্রিয় আকাশ-কুসুম-মুগ্ধ লোক বাস্তবের অলঙ্ঘ্য সীমা বিস্মৃত হইয়া পদে পদে প্রতিহত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন? স্বপ্ন না দেখিলে চলে না? বর্ত্তমানের বাস্তব লইয়া কেন মানুষ সন্তুষ্ট হয় না? মেঘরাজ্যের জন্য কেন মানুষ লালায়িত হয়? ভবিষ্যতের কুহকজালে কেন মানুষ অন্ধ হয়?

এ 'কেন'র উত্তর, স্বপ্ন দেখা মানুষের স্বভাব; স্বপ্ন না দেখিয়া মানুষ থাকিতে পারে না, বোধ হয় তাহা হইলে মানুষ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়াই যাইত। এই ক্ষুদ্র বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের হস্তগত বাস্তব লইয়া সারাটা জীবন অতিবাহিত করা!—ভাবিতে হৃদয়ের শোণিতস্রোত রুদ্ধ হইয়া আইসে। অনন্তাভিমুখী মানবাত্মা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাই বর্ত্তমান ছাড়িয়া অপরিসীম ভবিষ্যতের অনুসরণ করে। যে অভীষ্টলাভে আজ মানুষ ব্যর্থ-মনোরথ হইতেছে, কালে তাহা লাভ হইবে;—এই আশায় বুক বাঁধিয়া মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে আপন শক্তি নিয়োগ করিতেছে। এ আশা না থাকিলে কোন্ মানুষ কাজ করিতে সমর্থ হইত? মুহূর্ত্তের জন্যও কে জীবনপথে স্থির থাকিতে পারিত? তাই বর্ত্তমানের বাস্তব অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা লইয়াই মানুষ জীবিত রহিয়াছে, মানুষ—মানুষ হইয়াছে। এ কল্পনা ছাড়িলে আর জীবন কি?

তবে আকাশ-কুসুম এত উপহাসের বিষয় কেন? কল্পনা-জীবী লোক সাধারণের এতটা কৃপাপাত্র কেন? আকাশ-কুসুম দেখে না কে?—তবে স্থানবিশেষে তজ্জন্য এতটা নিন্দা কেন?

দশজনে যে স্বপ্ন দেখে, তাহা বাস্তবের আকার ধারণ করে; তাই, তাহা যে স্বপ্ন, সে কথা ক্রমে লোকে বিস্মৃত হয়। তোমার স্বপ্ন যদি দশ জনের স্বপ্নের সহিত না মিলিল, তাহা হইলে অমনই দশ দিক হইতে দশ জনে বলিয়া উঠিল, "লোকটা ক্ষেপিয়াছে, চোক্ চাহিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে!" অমনই লোক-সাধারণ তোমাকে অবজ্ঞার চক্ষে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। এই দশের সহিত তোমার স্বপ্নের পার্থক্য যত বেশী, ততই তোমার বাতুলতা সুনিশ্চিত। দশজনে যাহা চায়, তুমি তাহা যদি পরিহার কর, দশজনে যাহার বিষয় ভাবে না, তুমি যদি স্বপ্ন-চরের ন্যায় তাহারই অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমার মতিচ্ছন্নের আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন কি? তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যদি স্বপ্ন দেখিতেই হয়, তবে দশ জনের মত স্বপ্ন দেখিবে,

নহিলে ডন্ কুইক্সোটের কথা স্মরণ থাকে যেন! নেহাৎ যদি সৃষ্টি ছাড়া স্বপ্ন দেখ, তাহা হইলে, তাহা মনে মনেই রাখিবে। সাবধান, যেন লোকের কাছে প্রকাশ করিও না। স্বপ্ন জীবনে পরিণত করা?—সে ত বাতুলের কথা। আকাশ-কুসুম আকাশেই শোভা পায়, পৃথিবীর মাটিতে তাহা রোপণ করিবার বৃথা প্রয়াস কেন? তাহা হইলে পদে পদে লাঞ্ছনা! কল্পনার কথা কবিতাতেই শোভা পায়, জীবনের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে সে সব কেন? তোমাদের শেলী যদি আপনার আকাশ-কুসুম কাব্যেই রাখিয়া যাইতেন, তবে কে তাঁহার নিন্দা করিতে সাহসী হইত? কিন্তু তিনি আকাশ-কুসুম পৃথিবীতে ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন, তাই ত তিনি এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, নির্ব্বাসিত হইয়াই জীবন যাপন করিলেন। তুমি যদি দশ জনের মত না হও, তবে দশ জনের বিচারের হাত এড়াইবে কিরূপে? বলিবে, অন্যায় বিচার। দোষ কাহার? তুমি কেন দশ জনের মত হইলে না? তাহা হইলে ত লোকে তোমায় ভুল বুঝিত না।

যাহা কিছু আমাদের বুদ্ধির অতীত, যাহা কিছু তমসাচ্ছন্ন, তাহার সহিতই ভয়ের কারণ মিশিয়া থাকে। তুমি যদি এমন কথা বল, যাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না,—তোমার প্রাণের ভাবের গতি যদি এমন হয়, যে সাধারণ হৃদয় তাহার বক্র ও জটিল গতির অনুসরণ করিতে পারে না, তবে সাধারণ লোক তোমায় ভুল বুঝিলে তুমি দোষ দিবে কেন? অবিচারে বা নির্য্যাতনে কাতর হইবে কেন? যদি অদৃষ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া সাধারণ বুদ্ধির অতীত কোন ভাবের অধিকারী হইয়া থাক; যদি ঐকান্তিক, আত্মহারা ভালবাসায় হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে, তবে যদি সুখে শান্তিতে থাকিতে চাও, তাহা লোক-চক্ষুর অন্তরালে, আপন হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে গোপনে রক্ষা করিবে। "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।" কে তোমার সততায় বিশ্বাস করিবে? সংসার দশ জনের জন্য, দশ জনের উপযোগী—তোমার ও অসাধারণ ভাব সংসারের বাজারে চলে না। যদি মানে মানে থাকিতে চাও, ও জিনিস বাহির করিও না। সংসারের কষ্টিপাথরে উহা টিঁকিবে না। লোকে হিতে বিপরীত বুঝিবে।

তবে "Nothing so successful as success." একবার যদি সেই সর্ব্বজনপূজিত সাফল্য লাভ করিতে পার, ত সে স্বতন্ত্র কথা; তখন তোমার সে আকাশ-কুসুম আর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা হইবে না, তুমি সংসার-সংগ্রামে বিজয়ী, সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে; তখন তাহা মহাপ্রাণতা ও দূর দৃষ্টিতে পরিণত হইবে। এক দিন বুদ্ধ ও খৃষ্টের, আলেক্জাণ্ডার ও আকবরের আকাশ-কুসুম আকাশ-কুসুমই ছিল। সে স্বপ্নের কথা শুনিয়া এক দিন কে উপহাস করে নাই? আর আজ? সে স্বতন্ত্র কথা।

"এত বড় আকাশ-কুসুম দেখিলে কে নিন্দা করে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্পনা লইয়া থাক কেন?"

ফুল ছোট বড় আছে, মানুষ ছোট বড় আছে, আকাশ-কুসুম কেন ছোট বড় হইবে না? আর তাই বা কি? বিফল-কাম লোকের আকাশ-কুসুম কি বড় হইলেই রক্ষা পাইয়াছে? ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য কি কখন কোন চেষ্টা করা হয় নাই? কেহ কি সে সুখ-স্বপ্ন দেখে নাই? কিন্তু বিফল চেষ্টা, বিফল কল্পনার কে খোঁজ খবর রাখে? জীবন সংগ্রামে পরাজিত যে, কে কবে তাহার জীবনী লিখিয়াছে?

যদি সুখে শান্তিতে থাকিতে চাও, আকাশ-কুসুম দেখিও না, আকাশকুসুমের শোভায় বিমুগ্ধ হইও না। যদি সে কথা প্রকাশ কর, যদি আকাশ-কুসুম পৃথিবীতে ফুটাইতে চাও, তবে সংসারের ক্রুশের কথা স্মরণ রাখিও। আর যদি তোমার সে স্বপ্নের কথা প্রকাশ না করিয়া মনে মনে রাখিয়া দেও, তাহা হইলেও শান্তি নাই—আজীবন অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। তাই বলি হে কবিতাপ্রিয়, কল্পনাজীবী, অল্প বুদ্ধি লোক, আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিও না, কল্পনার পাখায় নির্ভর করিয়া মেঘ রাজ্যে উড়িতে চাহিও না, সংসারের প্রস্তরে পড়িয়া তোমার অস্থি চূর্ণ হইবে। ইহাতেও যদি তুমি নিরস্ত না হও, তবে বলি, সংসারের নিন্দা প্রশংসা, অনুগ্রহ, অবিচার অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া আপন আকাশ-কুসুমের অনুসরণ কর, তোমার মস্তকের উপরকার প্রখর সূর্য্য কিরণ, পদতলের উত্তপ্ত বালুকা স্নিগ্ধ ও সুখস্পর্শ হইবে। তাহা হইলে তোমার হার হইলেও জিৎ।

শিক্ষা-সঙ্কট।

(৩)

বাদপ্রতিবাদের জঙ্গল এড়াইয়া এখন ঐকমত্যের গ্রাম দেখা দিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর সুখসাধ্য বিবাদ-বিরহিত কয়েকটী সংস্কার ও উন্নতির আলোচনা এখন সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী না হইবার প্রধান কারণ আমাদের চক্ষু কর্ণের অভাব একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ অভাব সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু ইহার মোচনের জন্য তাদৃশ যত্ন দেখা যায় না। যদি এই নিরাকরণের উপায় বিশেষ কষ্টকর হইত তাহাহইলে এই নিশ্চেষ্টতার উপযুক্ত হেতু লক্ষিত হইত। কিন্তু উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না—কেবল ইচ্ছারই অভাব দেখা যায়।

যেমন চাষের আরম্ভে জমির পাট আবশ্যক তেমনি শিক্ষার আরম্ভে শিক্ষার গ্রহণোপযোগী যন্ত্রগুলিকে পরিষ্কার ও কার্য্যকারী করিয়া লওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় ও

মন শিক্ষা গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যন্ত্র অপরিষ্কার বা বিকল থাকিলে যন্ত্রী ও যন্ত্র চালনা প্রণালী নির্দ্দোষ হইলেও ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষার্থীর, চোক কাণ ফুটাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা হয় না। তাই যাহা কিছু শিক্ষা দাও না কেন তাহা ভালরূপ মনে বসেনা—কেবল মনের উপর আবছায়ার মত পড়ে। বুদ্ধির আবার প্রকৃতি এমন যে তাহা নিজে বন্ধ্যা—নূতন কোন বস্তু তাহা আপনার ভিতর হইতে বাহির করিতে পারে না। যাহা মনের ভাণ্ডারে আছে কেবল তাহাকেই যথা নিয়মে সাজাইতে ও তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বুদ্ধি সক্ষম। ইহা সত্য কি মিথ্যা—এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন বুদ্ধির কাছে অপর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। দার্শনিকগণ বলেন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। এজন্য আমাদের বুদ্ধি চালনায় প্রবৃত্তিই বড় কম হয়। এদিকে বুদ্ধি চালনার অভাবে আপনার ভিতর কোন বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করা যায় না—মনের ভিতর সবই একরকম গোলমালে জড়ান থাকে, কিছুই পরিষ্কার হয় না। সহজেই দেখা যায় যে এরূপ অবস্থা ঘটিলে লোককে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। কাজে কাজেই পাঠ মুখস্থ করা ভিন্ন আর গত্যন্তর রহিত হইতে হয়। আলোচ্য বিষয় লইয়া এইরূপধারাবাহী ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষা এখন আশানুরূপ ফলবতী না হইবার প্রধান কারণ হইতেছে চক্ষু কর্ণের অসদ্ভাব।

শিক্ষা-প্রণালীর অন্য যে কোন সংস্কার কর না কেন যতদিন আমাদের কার্য্যগত নিরিন্দ্রিয়তা থাকিবে ততদিন শিক্ষা বন্ধ্যা না হয় মৃতবৎসা থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক।

এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের প্রধান উপায় শৈশবে চক্ষু কর্ণের ব্যবহার শিক্ষা করা। গড়ে ধরিতে গেলে বোধ হয় এদেশে পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেদের শিক্ষা আরম্ভ হয়। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত লেখা পড়া পরিমাণ মত শিখাইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চর্চ্চার প্রতি বিশেষরূপে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে বর্ণপরিচয় করাইয়া সামান্যরূপ পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতে হয়। এবং সেই সঙ্গে সংখ্যা গণনা শিখানও আবশ্যক। তাহার পরেই শিশুদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্তু দেখাইয়া চক্ষের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপলব্ধি করিতে শিখান উচিত। ক্রমে সেই সকল বস্তুর নাম ইংরেজি ও বাঙ্গালায় শিখিতে পারে।

কলিকাতার শিশুদিগকে চিড়িয়াখানায় লইয়া গিয়া বিবিধ জন্তুর ক্রীড়া কৌতুক, চাল চলন দেখাইলে বিশেষ সুফল লাভ হইতে পারে। কৌতুহলবশতঃ দৃষ্ট বস্তুতে শিশুদিগের মনোযোগ আপনা হইতে সন্নিবিষ্ট হইবে এবং সেই বস্তুর সমক্ষে তাহা বর্ণনা করিতে শিখিলে মনের বিকাশ অনেকটা আপনা আপনিই হইয়া উঠিবে। পথে ঘাটে গাছপালা মানুষ, পশু বা অন্য বস্তু দেখিলে শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ যে, অমুক বস্তু কয়টা দেখিতেছ, এখানে কয়টা গাছ আছে তাহার মধ্যে কয়টা অমুক গাছ। এইরূপ সহস্র শিক্ষার বিষয় সহজেই মনে উদিত হয়। ফুলের বাগানে লইয়া গিয়া শিশু-

দিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এখানে কয়রকমের ফুল ফুটিয়াছে, অমুক ফুলের পাপ্‌ড়ি কয়টা ইহার কি রঙ। এইরূপ অযত্নলভ্য সহস্র উপায়ে শৈশবেই শারীরিকও মানসিক যথার্থ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে। অল্প স্বল্প সঙ্গীত শিক্ষার এ বিষয়ে সহকারিতা আছে—কাওয়াদ শিক্ষাও বিশেষ উপকারী।

সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে। প্রথমতঃ সঙ্গীত শিখিতে সুরকে অবিকৃত রাখিবার জন্য সপ্তকের প্রত্যেক সুরের বিভিন্নতা ও সুরের পরস্পর বিভিন্নতা অনুভব করিয়া সেই বিভেদের উপর মনোযোগ রাখিতে হয় তাহাতে কাণের পটুতা ও মনোযোগ সন্নিবেশের চর্চ্চা হয়। তাহার পর সমুদয় সুরটা অবিকৃত রাখিবার জন্য নিয়ম-জ্ঞান ও নিয়মের বশবর্ত্তীতা শিক্ষা করিতে হয়। সাধারণতঃ ভাব অনুভব ও সুর শিক্ষায় অনেক রকমে মনের উন্নতি ও পরিসর বৃদ্ধি অলক্ষিত ভাবেই হইয়া যায়। আর শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র চালনায় শারীরিক উন্নতিও হইয়া থাকে ও বিদেশী ভাষার উচ্চারণ ও গ্রন্থ আবৃত্তির শক্তি ও সঙ্গীত চর্চ্চায় বাড়ে। বিশেষতঃ আমাদের জীবন যেরূপ নিরানন্দ অথবা কলুষিত আমোদপূর্ণ তাহাতে সঙ্গীতশিক্ষা অতিশয় উপাদেয়।

কাওয়াদ শিক্ষায় অঙ্গ সঞ্চালনজনিত শারীরিক সুফল ও সমবেত চেষ্টাপ্রসূত মানসিক সুফল সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

কেহ কেহ এপ্রস্তাবের সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারেন যে, এ উপায়ে শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে শিখাইবার জন্য ব্যয়িত অর্থ তত ফলবান হইবে না—পরীক্ষা পাস করিতে বিলম্ব হইবে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন যে পীড়া ও প্রাইভেট মাষ্টারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ছেলেরা এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে ও পরীক্ষা পাস করিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বয়সের নিম্নসীমা লোপ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কতদূর ভাল করিয়াছেন, সন্দেহ স্থল।

আর একটা কথা ভয়ে ভয়ে বলিতে হয়। বোধ করি শিশুদিগের প্রথম শিক্ষার ভার শিক্ষকের হাতে না দিয়া শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিলে ভাল হয়।

শিক্ষাকে ফলবতী করিবার জন্য প্রধান আবশ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের প্রতি অনুকূল মনের ভাব। যদি শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর স্বচ্ছন্দতার লোপ হয় তাহা হইলে ফলের ন্যূনতা হইবেই হইবে। বালক বালিকারা মাতৃভাবে পরিপ্লুত স্ত্রীলোকের নিকট যে পরিমাণ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে, পুরুষের অপেক্ষাকৃত রৌদ্র সান্নিকট্যে যে সে পরিমাণ স্বচ্ছন্দতা পায় না—এ বিষয়ে বিসম্বাদের স্থল নাই। আর চরিত্রের খুঁটি নাটি বুঝিবার যে নিসর্গ-নিপুণতা আছে তাহা পুরুষের নাই—এ কথাও বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য স্ত্রীলোকের হাতে প্রথম শিক্ষার ভার পড়িলে জোর জবরদস্তির শিক্ষার কুফল একেবারে বিলুপ্ত হইবে। এবং যেমন স্বাভাবিক নিয়মে ফুল

ফুটে, গাছ গজায় তেমনি অলক্ষিতভাবে আপনা হইতেই যেন শিশুরা শিক্ষিত হইবে। এবং প্রত্যক্ষতঃ যে পরিমাণ শিক্ষা হইবে, অপ্রত্যক্ষতঃ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ মনুষ্যত্ব শিক্ষা হইবে।

এ প্রস্তাবে বোধ হয় প্রধান আপত্তি হইবে এই যে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুর্লভ কিন্তু এখন স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রচার হইয়াছে, তাহাতে এ আপত্তি যে বিশেষ বলবান— এরূপ বোধ হয় না।

প্রথম শিক্ষার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু ও লোকেন্দ্রনাথ বাবু কয়েকটী সারবান কথা বলিয়াছেন, তাহা এখানে বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। বালকদিগের ভালরূপ শিক্ষা না হইবার দুইটি কারণ রবীন্দ্রনাথ বাবু অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন—প্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তকের অযথা নির্ব্বাচন, দ্বিতীয়, অশিক্ষিত প্রথম শিক্ষক নিয়োগ।

প্রথমোক্তের সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন ;—

"হয়ত কোন একটা শিশুপাঠ্য readerএ haymaking সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এই জন্য বিশেষ আনন্দ-দায়ক অথবা Snowball খেলায় Katie এবং Charlie র মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সে গুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগা গোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।"

শেষোক্তের বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর মত এই ;—

"আবার নীচের ক্লাশে সে সকল মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স পাস, কেহবা এণ্ট্রেন্স ফেল, ইংরাজি ভাষা, ভাব, আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভাল বাঙ্গলা, না জানে ভাল ইংরাজি ; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করে।"

এই দুইটি দোষের পরিহার বিশেষরূপে আবশ্যক। ৺ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের রচিত ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ডবুকে ইংরেজি ভাষা প্রয়োগের ভুল ছিল সত্য কিন্তু এখনকার শিশু-পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উহারা শিশুদিগের পক্ষে প্রীতিকর ছিল সন্দেহ নাই।

শেষোক্ত বইগুলির একটী প্রধান গুণ ছিল এই যে, উহার বর্ণিত বিষয় শিশুদিগের পুরাতন পরিচিত বিষয়। এজন্য পড়িবার সময় শিশুদিগকে শিক্ষার কার্য্যে চক্ষু কর্ণ ও মনের যুগপৎ প্রয়োগ করিতে হইত। ৺ প্যারী বাবু শিক্ষাকার্য্যে নিজের প্রভূত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বলিয়াছেন যে, তাঁহার রচিত শিশুপাঠ্য পুস্তকে ইংরেজি গল্প সন্নি-বেশিত করিবার পূর্ব্বে গল্পে উল্লিখিত নাম ও ঘটনাগুলি দেশীয় আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ওরূপ না করিলে গল্পগুলি কখনও আমা-দের শিশুদিগের হৃদয়গ্রাহী হওয়া অসম্ভব।

অশিক্ষিত প্রথম শিক্ষকের কথা এখনও ভুলি নাই। বিশেষরূপে মনে আছে যে, মাষ্টার মহাশয়ের উপদেশমত "a rat, এক লেংটি ইন্দুর, a rat, এক লেংটি ইন্দুর" কত বার মুখস্থ করিয়াছি। এখনও ব্যারামে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, "a rat, এক লেংটি ইন্দুর" বলিবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপ আছে। বিলাতে ভাল স্কুলের নিয়ম এই যে, উত্তম

শিক্ষক অধস্তম ক্লাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু এ দেশে এ বিষয়ে বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শিক্ষার প্রারম্ভে জ্যামিতির ন্যায় একটা দুরূহ বিষয় যে ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে এবিষয়ে লোকেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একমত হইবে। স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে প্রথম জ্যামিতি ধরান হয়। সাধারণতঃ ঐ ক্লাসের ছাত্রদিগের বয়স ১০। ১১ বৎসরের অধিক হয় না। এ অবস্থায় "A point is that which has no part or magnitude" ইহা তাহাদের বোধগম্য হওয়া অতি সুকঠিন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রচলিত জ্যামিতি গ্রন্থের সাহায্যে এই কাঠিন্যের হ্রাস হইতে পারে, এমত বোধ হয় না। তবে যদি ছাত্রদিগকে বুঝাইবার জন্য একটা মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় লওয়া যায়—ইংরেজি পারিভাষিক শব্দকে অপরিবর্ত্তিত রাখা যায়—তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রটিকে যদি এইরূপে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে বালকদিগের সুখবোধ্য হইবার সম্ভাবনা—"যাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহার পরিমাণ বা অংশ হয় না তাহার নাম Point" পারিভাষিক শব্দ অপরিবর্ত্তিত রাখিবার সুবিধা এই যে, পরে ইংরেজিতে জ্যামিতি পড়িবার সময় আর নূতন করিয়া য়ুরোপীয় জ্যামিতির পরিভাষা শিক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না—এবং য়ুরোপীয় জ্যামিতি না পড়িলেও উচ্চ গণিত ও বিজ্ঞান—যাহা এখন কিছুকাল অন্ততঃ ইংরেজিতে শিখিতে হইবে—তাহারও শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত দেখা যায় না।

বর্ত্তমান পরীক্ষা-প্রণালীর কোন বদল না করিয়াও প্রস্তাবিত সংস্কার সাধিত হইতে পারে। যদি উপরোক্ত নিয়মে প্রথমে জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ফোর্থ ক্লাস হইতে সেকেণ্ড ক্লাসের মধ্যে য়ুক্লীডের প্রথম চারি অধ্যায় সম্যকরূপে আয়ত্ত হইতে পারে। তাহার পর এণ্ট্রান্স ক্লাসে ইংরেজিতে জ্যামিতি শিক্ষা হইলে বর্ত্তমান প্রণালীরও কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না এবং শিক্ষার কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

ইতিহাসশিক্ষা নীচের ক্লাসে বাঙ্গালায় হইলে বিশেষ উপকার হইবে, এমন বোধ হয় না। বাঙ্গালা স্কুলে যাহারা ছাত্রবৃত্তির জন্য পড়ে, তাহারাও অনেকে বাঙ্গালার ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস না বুঝিয়া মুখস্থ করে দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ ইংরেজিতে ইতিহাস পড়িলে অনেকটা ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষা হয়। এ জন্য ইতিহাস ধরাইবার পর অন্য ইংরেজি সাহিত্য কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে সাহিত্য পাঠের ফলের ব্যতিক্রম ঘটিবেনা। এই সকল কারণে গতবারে একটুকু সঙ্কুচিতভাবে লোকেন্দ্রনাথ বাবুর মতের অনুমোদন করা হইয়াছিল।

ভূগোল বিবরণ যে প্রণালীতে শিক্ষা হয়, তাহা দোষাশ্রিত—তা' বাঙ্গালাতেই শিক্ষা হউক আর ইংরেজিতেই হউক। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার বিবরণ পড়িতে অবশ্যই আনন্দপ্রদ হইবে—কিন্তু অমুক দেশের রাজধানী অমুক শুদ্ধ ইহা মুখস্থ করাইলে আর কি হইবে? ভালরূপ ম্যাপ দেখাইলে ভূগোল গ্রন্থ প্রথমে না পড়িলেও ক্ষতি নাই। নিম্ন শ্রেণীতে ভূগোল গ্রন্থ পড়াইবার আবশ্যক নাই। উত্তমরূপে ম্যাপ ও গ্লোব দেখাইলেই যথেষ্ট।

আমাদের শিক্ষা প্রণালীর সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটী কথা আলোচিত হইল। প্রসঙ্গক্রমে যে প্রবন্ধগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত তাহাদের মতামতও স্থূলতঃ বিচার করা হইয়াছে। এখন কেবল সস্তার শিক্ষা ও য়ুনিবর্শিটির শিক্ষার সহিত সরকারী চাকুরি ও শিক্ষিত ব্যবসায়ের (Liberal professionsএর.) সম্বন্ধ স্থাপনার দোষ গুণ দেখা আবশ্যক।

পরীক্ষার দ্বারা কেবল একটা শিক্ষার গড় পড়তার মাপ হয়। পরীক্ষা পাস করিলেই যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এমন কোন কথা নাই। আরও দেখা যায় যে, কেম্ব্রিজের সিনিয়ার র‍্যাঙ্গলার অনেক সময়েই পরবর্ত্তী জীবনে প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে উঠিতে অসমর্থ। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যে, যাঁহারা পরীক্ষায় বিশেষ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারা বিশেষ কৃতী। ইতিবেত্তা ফ্রীমান ইহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি পরীক্ষা সমাপন হইলে বলিয়াছেন যে, "আঃ, এতদিনে শান্তচিত্তে পড়িবার অবসর পাইলাম।" খ্যাতনামা লেখক কিংস্লি এবিষয়ের আর একটী দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র প্রস্তাবিত সত্যটি সপ্রমাণ করিয়াছেন। অনেকেই পরীক্ষায় স্যর রমেশের অগ্রবর্ত্তী কিন্তু আইন ব্যবসায়ে বা বিচারকার্য্যে তাঁহার তুল্য কয়জন আছেন? বাঙ্গালী আইন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দুই চারি ক্রোশের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন কয়জন? কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়টা পরীক্ষা পাস করিয়াছেন?

এইরূপ আলোচনার ফল স্বরূপ ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পরীক্ষা শিক্ষার আনুষঙ্গিক মাত্র, শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন যে আসলে পরীক্ষা শিক্ষার চাকর। চাকর যদি মনিবের মনিব হয়, তাহা হইলে বিপদের আর সীমা থাকে না।

এই বিপদ ঘোরতররূপে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী চাকুরী ও শিক্ষিত ব্যবসায়ের দ্বারস্বরূপ হওয়ায় এই আক্রমণ নিবারণের উপায় দেখা যায় না। যতদিন কেবল রোজকারের জন্যই শিক্ষার সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা থাকিবে ততদিন শিক্ষার রোগমুক্ত হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষার জন্য শিক্ষা না হইলে শিক্ষা একটা গলগ্রহ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে ছাড়িতে পারিলে লোকে বাঁচে। যতদিন রোজকারের সহকারী বলিয়া কালেজের কাটতি থাকিবে, ততদিন সস্তার কালেজের শ্রীবৃদ্ধি ও যথার্থ শিক্ষার শ্রীহানি হইবে। সস্তার শিক্ষার—বিশেষতঃ আমাদের এখানকার বেসরকারী রোজকারের অন্যতর উপায় স্বরূপ কালেজে বিতরিত সস্তার শিক্ষার—প্রথম দোষ এই যে যতটুকু পরীক্ষার জন্য আবশ্যক ততটুকুর অধিক আর শিক্ষা হয় না। ওরূপ শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাস। যদি কোন অধ্যাপক ভুলক্রমে যথার্থ শিক্ষার দিকে টানেন, তাহা হইলে অধিকারী মহাশয় অমনই রাস টানিয়া ধরেন,—"ছিঃ! ও রকম করিতে নাই—মিথ্যা সময় নষ্ট হইতেছে। নোট টোট লিখিয়া দাও, যাতে এগ্‌জামিনে কাজ দেখ্‌বে।"

এ বিষয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে নির্দ্দোষ তাহা বলা যায় না। বেসরকারী কালেজ অ্যাফিলিয়েট করিবার সময় বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক।

এই যে অবস্থাটি ঘটিয়াছে, ইহা অনেকগুলি জটিল সামাজিক শক্তির ক্রিয়াফল। ইহার নিরাকরণ বড় দুরূহ এবং ইহার নিরাকরণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হঠাৎ সাহস হয় না। তবে এই একটা কথা মনে হয় যে, দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বৃত্তি দিয়া যদি কোন কালেজ স্থাপন করেন এবং উপযুক্ত হস্তে তাহার কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে—প্রেসিডেন্সি কালেজের দৃষ্টান্তে, এই কথাটি বলিতে সাহস হয়।

আর একটা কথা এই যে, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টা না হইলে বিশেষ কোন সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। আমাদের উন্নতি আমাদেরই হাতে—বিশ্ববিদ্যালয় তাহার কি করিতে পারে? তবে রাজা রাজপুরুষ মনে করিলে সবই করিতে পারেন, এ বিশ্বাস বহুকাল হইতে আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে এখনও

কোন বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা ভঙ্গ হইলে আমরা "অব্রহ্মণ্যং, অব্রহ্মণ্যং" বলিতে বলিতে বক্ষতাড়না করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হই, ভুলিয়া যাই যে, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

তুর্কী বর কনে।

আমাদের দেশে আট দিনের দিন ছেলের আটকৌড়ি হয়, তুরস্কে সেই দিন নামকরণ হইয়া থাকে। সে নামকরণের বিধিই স্বতন্ত্র। ধাত্রী অল্প লবণ এবং একখানা চালনী লইয়া আসে, শিশুকে সেই চালনীর ভিতর রাখিয়া, ধাত্রী ও প্রসূতি চালনীখানি নাড়াইতে থাকে, এবং ধাত্রী মধ্যে মধ্যে মুখ নত করিয়া শিশুর কানের কাছে তাহার নাম উচ্চারণ করে। শেষে তাহার শরীরে খানিক লবণ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর অল্পক্ষণ উপাসনার পর আবার চালনী নাড়ান হয়, এই সময় শিশুকে বলিয়া দেওয়া হয় সে যেন তাহার পিতামাতার আদেশ পালন করে। তাহার পর শিশুকে উঠাইয়া বিছানায় লইয়া যাওয়া হয়, এই সময় শিশুর পিতা গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রীকে সোণার কর্ণাভরণ এবং ধাত্রীকে গাত্রবস্ত্র উপহার প্রদান করেন।

এই ত গেল গোড়ার কথা। তারপর বড় হইলে ছেলেকে ইয়ুরোপে লেখা পড়া শিখিতে পাঠান হয়, এবং মেয়েকে ঘরেই ইয়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

তাহাদিগকে আজকাল রীতিমত শিক্ষিতা হইতে হইলে লেখাপড়া, গীতবাদ্য, চিত্র ও শিল্প বিদ্যাদি ত শিখিতেই হয়, তাহা ছাড়া সূচিকর্ম্ম, প্যারিসের নূতন নূতন ফ্যাসনের জামা তৈয়ারী করা, রাঁধাবাড়া, এমন কি ইস্ত্রী করা পর্য্যন্ত শিখিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বেই অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এ সমস্ত কাজ শেষ করিতে হয়, সুতরাং বলা বাহুল্য তুর্কী বালিকাগণের জীবন অসলভাবে কাটে না। অতি শৈশবকাল হইতেই তুর্কী বালিকাগণ শুনিতে পায় যে বিবাহই তাহাদের জীবনের চির আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য এবং সৎপাত্র লাভের আশাতেই তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষিত করা হয়। জ্ঞানোন্মেষ হইতে না হইতেই তাহাদের জানান হয়, যে পিতৃগৃহ তাহাদের পক্ষে একটি পান্থনিবাস মাত্র, স্বামীগৃহই তাহাদের মুখ্য গন্তব্য স্থান। কিন্তু কোন বালিকা বাক্‌দত্তা হইলে বাক্‌দান সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রাখা হয়; পিতৃগৃহে যাহারা বিশেষ আদরের সহিত প্রতিপালিত হয় বাক্‌দানের অঙ্গুরী পরাইবার সময় তাহাদিগকে কাঁদিতে হয়, কিন্তু তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধীয় লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা প্রিয়তমা সখীর নিকটও স্বীকার করিতে পারে না যে এই অঙ্গুরী সম্বন্ধীয় রহস্যের অর্থ তাহারা অবগত।

তুর্কী বালিকাগণ একটু অধিক বয়সে বিবাহিত হয় সুতরাং বিবাহের গুরুত্ব অনেকটা বুঝিতে পারে—কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল নাই কারণ বিবাহের পূর্ব্বে বর কনের দেখা শুনা প্রায়ই হইতে পারে না, যদিবা বিবাহের পূর্ব্বে কনে যবনিকার অন্তরাল হইতে একবার বরের ছায়া দেখিতে পায় কিন্তু বরের কনে দেখা একেবারে অসম্ভব। কনের বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা পাড়িবার অধিকার নাই সুতরাং কিরূপ বর জুটিবে ভাবিয়া কনেকে বিশেষ চিন্তিত থাকিতে হয়।

বর সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বিবাহের কনের পক্ষে যে কি গুরুতর ব্যাপার তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি হইতে বেশ বুঝা যায়। সতের আঠারো বৎসর বয়স্কা এক যুবতীর সহিত কোন যুবকের বিবাহ হইবার কথা হয়, যুবতী

কিন্তু এ বিবাহে নারাজ, তবে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করিবার জন্য এক নূতন উপায় স্থির করিল। একদিন তাহার ভাবী শ্বাশুড়ী—সেই যুবকের মা—তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কনের মা তখন কার্য্যোপলক্ষে অন্য বাড়ী গিয়াছিলেন, কনে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল, এবং দুই একটি কথার পর গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার ছেলের কি তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে," অভ্যাগত রমণী ত প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক্! তিনি বিস্ময়ের সহিত যুবতীর দিকে চাহিলেন। কনে আবার সেই প্রশ্ন করিল। বরের মা বেশী কিছু না বলিয়া অপ্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন বরের বাড়ী হইতে বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গের পত্র আসিয়া উপস্থিত; কারণ এমন বেহায়া মেয়ের সহিত তিনি কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন না। কনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

কিন্তু আজ কাল তুর্কী-বালিকাদিগের বিবাহ সম্বন্ধে এই সমস্ত কঠোরতা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এখন তুর্কী বালারা সখিগণের নিকট নিজ নিজ বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে, এমন কি অনেক সময় উপহারের দ্বারা বৃদ্ধ ঘটকদিগকে বশ করিয়া বরের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লয়।

কনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। এখন বর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা হউক। বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে তুর্কী যুবক মায়ের নিকট আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে, পিতার সহিত এ সম্বন্ধে কোন কথা হইতে পারে না। বরের মা তাঁহার স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া কনে খুঁজিতে বাহির হন। মেয়ে দেখার প্রথা তুরস্কে খুব প্রবল, কিন্তু এ প্রথা যুবতীদের বিশেষ অপ্রীতিকর, কারণ এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে কোন বয়স্কা কনেকে দুই তিন বা ততোধিক বরের আত্মীয়েরা আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে কিন্তু পছন্দ করিতেছেনা। ছোট মেয়ে হইলে কোন কথা হয় না, কিন্তু বড় মেয়েরা এইরূপে ক্রমাগত মনোনীত না হওয়ায় তাহাদের মনে যে শুধু অপমানের ভাবই জাগিয়া উঠে তাহা নয়, তাহারা হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনাও পায়।

যাহা হউক বরের মা খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক মনোমত কনে বাহির করিলেন, বিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটি কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, উভয় পক্ষ হইতে কোন লোককে মধ্যস্থ মানা হয়। বিবাহে কনের পিতার সম্মতি থাকিলে বরের পিতা টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করেন। তাহার পর বরের মা একদিন ভাবী বৈবাহিকের বাড়ী গিয়া কনের অঙ্গুলীতে এক হীরকাঙ্গুরীয় পরাইয়া সম্বন্ধ পাকা করিয়া আসেন।

তুর্কী বিবাহে অঙ্গীকার পত্রের ব্যাপার আমাদের দেশের পানপত্রের ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে সম্পন্ন হয়। কনে সভাস্থলে না আসিয়া গৃহ দ্বারে যবনিকার অন্তরালে বসিয়া থাকে; কনের সখী কি পিতা মাতা কেহ দুই জন সাক্ষী লইয়া কনের কাছে গিয়া তাহার সম্মতি ক্রমে তাহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন; এখানে বলা উচিত কনের এই সম্মতির কোনই মূল্য নাই, এ একটি চলিত প্রথামাত্র। তাহার পর কাজী এই বিবাহ বরের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, বর সম্মতি জ্ঞাপন করিলে কাজী তাঁহার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রুমাল দিয়া তাহা জড়াইয়া দেন। অনন্তর উপাসনা আরম্ভ হয়; উপাসনান্তে কাজী একখানি কাগজ লইয়া বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, পণের টাকা ইত্যাদির বিবরণ লিখিয়া সে দিনের মত কাজ শেষ করেন। পণের টাকা ষাট হাজার পর্য্যন্ত হইতে পারে। যদি ভবিষ্যতে কোন কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় কি স্বামীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে স্ত্রী পাইতে পারিবে এই অভিপ্রায়ে পণের অর্দ্ধেক টাকা কন্যের জন্য রাখা হয়

অপরার্দ্ধ কনের পিতাকে বিবাহের খরচ নির্ব্বাহের জন্য দেওয়া হয়। পণ ভিন্ন কোন বিবাহ আইন মতে শুদ্ধ নহে।

বিবাহপণে আবদ্ধ হওয়ার পর যদি কোন বর বিবাহ করিতে অসম্মত হয় তবে তাহাকে আইনমতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। বর ইচ্ছা করিলে তাহার বাক-দত্তা স্ত্রীকে বিবাহের পূর্ব্বেই বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় গৃহে আনিতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটিয়া থাকে।

তুরস্কে বিবাহে কনের পরিচ্ছদ আড়ম্বরপূর্ণ, সুন্দর ও মূল্যবান। কনস্টাণ্টিনোপলের তুর্কী মহিলাগণ স্বুবর্ণখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পরিচ্ছদ ভিন্ন অন্য কোন পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক বিবাহ করিতে সাহসী হন না, কারণ এ পরিচ্ছদ না হইলে বিবাহ-সভায় কিছুতেই তাঁহাদের ভদ্রতা রক্ষিত হয় না এবং সভ্যসমাজেও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান থাকে না। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত বিবাহোৎসব উপলক্ষে এই পরিচ্ছদ ভাড়া করিয়া আনে। এই মূল্যবান পরিচ্ছদ, হীরকখচিত চন্দ্রহার ও মণিমুক্তাভূষিত কবরী বিশোভিত হইয়া কনে বিবাহসভায় নীত হয়, কিন্তু তাহার মুখ অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত করা হয়। দুই থোকা স্বর্ণতার নির্ম্মিত চামরের ন্যায় একরূপ পদার্থ কাঁণের দুই পাশে ঝুলান থাকে, অনেক সময় উহা এত অধিক ভারি হয় যে অন্য লোককে তাহা ধরিয়া চলিতে হয়। কনে বরের বাড়ী বিবাহ করিতে আসে, বর বেচারী পূর্ব্ব হইতেই নববধূর আগমন প্রত্যাশায় গৃহদ্বারে বসিয়া থাকে; কনে উপস্থিত হইলে তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া বর স্থানান্তরে চলিয়া যায়; এই সময় কনের কাছ হইতে তাহার পিতৃদত্ত চন্দ্রহার খুলিয়া লওয়া হয়, বর ফিরিয়া আসিয়া আর এক গাছি হীরকালঙ্কৃত চন্দ্রহারে কনের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া দেয়।

তাহার পর কনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বিবাহসভায় উপবিষ্ট পিতামাতার করতল চুম্বন দ্বারা তাহার কুমারীজীবনের শেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; অনন্তর তাহার শ্বশুর মহাশয়ের করতল চুম্বন করে। শেষে স্বামীর হস্তে আত্মসমর্পণ জ্ঞাপনার্থ তাহার কোটের প্রান্তভাগ চুম্বন করা হইলে বিবাহব্যাপার সাঙ্গ হয়। বিবাহের সাধারণ নিয়ম এই, তবে কোথাও কোথাও এ আচরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে তুর্কীবালিকাদিগের বিবাহভূষণের এক আশ্চর্য্য নূতনত্ব বাড়িয়া-ছিল। স্বুবর্ণালঙ্কৃত চারি খণ্ড হীরক কনের উভয় গণ্ডে, ললাটে ও চিবুকে আঁটিয়া দেওয়া হইত। পাছে সেগুলি খসিয়া পড়ে, এইজন্য একজন দাসী কনের কাছে বসিয়া থাকিত এবং হীরকখণ্ড খসিয়া পড়িলেই আটা লাগাইয়া তাহাকে পুনরায় স্বস্থানে বসাইয়া দিত। আজ কাল এ প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর বিবাহে কদাচ দেখা যায় মাত্র।

কনষ্টাণ্টিনোপলে বিবাহ উপলক্ষে ভারতোৎপন্ন শাল কিম্বা হীরক উপহার দেওয়া হয়, হীরকের ন্যায় বহুমূল্য দ্রব্য ধনাঢ্য এবং নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারে না; শালই সর্ব্বসাধারণে উপহার দিয়া থাকে, এমন কি এই উপহার না লইয়া বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হইতে সকলেই সঙ্কুচিত হয়; আমাদের দেশে আইবুড়োভাতে নববস্ত্র লাভের মত তুরস্কে নবদম্পতি ৫০ কি ৬০ জোড়া শাল উপহার পাইয়া থাকে, তাহারা আবার এই সমস্ত শাল অন্যান্য বিবাহে উপহার উপলক্ষে দান করে। যেদিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়, সেই দিন অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মূল্যবান রুমাল উপহার দেওয়া হয়; এই রুমালগুলি অন্য কোন কাজে লাগে না, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এইরূপ অনেক

কুমার পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বাড়ীতে কোন বিবাহ উপস্থিত হইলেই সেগুলি আবার অন্য লোকের মধ্যে বিতরিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে নবদম্পতি পরস্পরকে প্রচুর উপহার প্রদান করে। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলেই পাত্রী তাহার ভাবী স্বামীর বিশেষ অধিকারের মধ্যে আসে, বিবাহার্থী যুবকও তাহার ভাবী পত্নীর সর্ব্ববিধ মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আপনাকে দায়ী বিবেচনা করে। যদি কোন কারণে কিছুদিনের জন্য বিবাহ স্থগিত থাকে, তাহা হইলে সেই যুবককে ভাবী পত্নীর নিকট মধ্যে মধ্যে নবপরিচ্ছদ ও তাহার সাজসজ্জার জন্য এবং মনোহরণের নিমিত্ত হীরকাদি নানাবিধ উপহার পাঠাইতে হয়। বলা বাহুল্য এই সমস্ত উপহারেই কনের প্রতি যুবকের গভীর প্রেম ব্যক্ত হইয়া থাকে। বালিকাও বিবাহদিবসে স্বামীকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে। একজোড়া হীরকের বোতাম, একটি স্বর্ণখচিত মণিব্যাগ, বহুমূল্য প্রস্তরখচিত দুইখানি ক্ষুর, ভারতীয় শালের ও শ্বেত সাটীনের প্রভাতে পরিধানোপযোগী দুইটি জোব্বা এবং চুরট রাখিবার একটি মূল্যবান বাক্স, সেই সমস্ত উপহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

তুরস্কে যুবকগণের দুই শ্রেণীর মেয়ের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। প্রথম খাঁটি তুর্কী, দ্বিতীয় সার্কেশিয়ান। আমরা উপরে বিবাহসম্বন্ধে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহা খাঁটি তুর্কী মেয়ের বিবাহেই ঠিক অনুষ্ঠিত হয়; সার্কেশিয়ান বালিকা বিবাহ করা তুর্কী যুবকদিগের পক্ষে তেমন সম্মানের পরিচায়ক নহে, কারণ সার্কেশিয়ানরা বংশমর্য্যাদায় খাঁটি তুর্কীদের অপেক্ষা অনেক নীচে। কিন্তু সার্কেশিয়ান বিবাহ অনেকটা প্রণয়ের ব্যাপার। পূর্ব্বে প্রেমবন্ধন না হইলে সার্কেশিয়ান কুমারীর সহিত তুর্কী যুবকের বিবাহবন্ধন প্রায়ই হয় না। কিন্তু তথাপি খাঁটি তুর্কী বিবাহ অপেক্ষা সার্কেশিয়ান বিবাহে ছাড়াছাড়ির অভাব নাই এবং তুর্কীবিবাহের উপক্রমণিকায় প্রণয়ের নামগন্ধ না থাকিলেও সে বিবাহবন্ধন যে স্থায়ী হয় তুর্কীমহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই তাহার কারণ।

তুরস্কে ভদ্রলোকের গৃহ দুই অংশে বিভক্ত এক অংশের নাম সিমালিক অর্থাৎ বহির্বাটী অপরাংশের নাম হারেম বা অন্তঃপুর। খাঁটি তুর্কী মহিলা সার্কেশিয়ান রমণী অপেক্ষা স্বামী গৃহে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। সার্কেসিয়ান রমণীগণ স্বামীর উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, কারণ তাহারা পিতৃগৃহ হইতে অর্থ বা দাসী লইয়া আসে না। সুতরাং স্বামীর নিযুক্ত পরিচারিকার উপর তাহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত নয় কিন্তু তুর্কী রমণীগণ পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় পরিচারিকা লইয়া আসে এবং অনেকে পিতার নিকট যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও পায়, এই সমস্ত কারণে অন্তঃপুরে সার্কেশিয়ান রমণী অপেক্ষা খাঁটি তুর্কী রমণীর প্রাধান্য অনেক বেশী। কিন্তু বহির্বাটী স্বামীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে তবে স্ত্রীও মধ্যে মধ্যে বহির্বাটী পরিচালনের ভার লইয়া থাকেন। দাসী নিযুক্ত, বিক্রয় বা স্থানান্তরে প্রেরণ করা স্ত্রীর ইচ্ছাধীন, আবার পরিচারকের সমস্ত ভার স্বামীর উপর। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডেও স্বামী স্ত্রীর অধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে।

তুরস্কে বিবাহ বিচ্ছেদ একটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয় না। এবং কোন রমণী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাধারণের অবজ্ঞাভাজন হয় না, এমন কি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহারা পুনর্ব্বার বিবাহিত হইতেও পারেন। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ সম্বন্ধে কোন কঠোর নিয়ম না থাকায় অতি সামান্য কারণেই এখানে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ রহিত হয়; সে জন্য কাহাকেও আদালতে যাইতে হয় না—"তোমাকে ত্যাগ করিলাম"—বলিলেই

ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। অনেক সময় কাজীর নিকট আবেদন করিলেও কাজী বিবাহ-চ্ছেদের অনুমতি দিয়া থাকেন। এইরূপে দুই একবার স্ত্রী ত্যাগ করিয়া তাহাকে গৃহে পুনঃ গ্রহণ করিতে স্বামীর কোন নিয়ম পালনের আবশ্যক হয় না, কিন্তু তিনবার ত্যাগের পর কোন ব্যক্তি আর কখন তাঁহার সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারেন না। সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বিবাহচ্ছেদ তত অধিক হয় না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কথায় কথায় স্ত্রী ত্যাগ করে। পরিত্যক্ত স্ত্রী পুনগ্রহণ করিতেও তাহারা সেই রকম ক্ষিপ্রহস্ত।

তুর্কী মহিলার স্ত্রী-ধনে স্বামীর আইন সঙ্গত কিছুমাত্র অধিকার নাই। কোন দুষ্ট লোক কিছু অর্থ সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে যদি কোন ধনবতী রমণীকে বিবাহ করে এবং যদি সেই রমণী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজীর নিকট বিচার প্রার্থিনী হয় তবে ঐ দুষ্ট ব্যক্তি অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত প্রতিপালন করিতে না পারিলে স্বামী বেচারীকে দণ্ডভোগ করিতে হয়, কিন্তু রমণীও কোন সামান্য কারণে স্বামীত্যাগ করিতে পারেন না এবং এরূপ করিলে স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার বিবাহকালের গচ্ছিৎ টাকা দিতে বাধ্য নহেন, এমন কি স্ত্রীর স্ত্রীধন পর্য্যন্তও বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে। কোন কোন রমণী স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃ গৃহে আশ্রয় লয়, স্বামী তাহাকে আর পুনঃ গ্রহণ করিবার নামও করে না, এ দিকে পিতার অবস্থা যদি তেমন স্বচ্ছল না হয় ত—কিছুদিন পরে পিতৃ গৃহেও তাহার স্থান হওয়া কঠিন হইয়া উঠে—সুতরাং তখন সেই দুর্ভাগ্য রমণীর ভিক্ষাপাত্র লইয়া পথে দাঁড়ান ভিন্ন উপায় থাকে না। এই জন্যই তুরস্কে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিবাহ-চ্ছেদের চেষ্টা অনেক কম; কিন্তু প্রেম যেখানে অনাদৃত হয় সেখানে অন্নচিন্তা উপস্থিত হইয়া প্রেমের অধিকার হরণ পূর্ব্বক গর্ব্ব প্রকাশ করে।

বিবাহিত রমণীকে পুরুষ সমাজে মিশিতে দিতে স্বামীদের আপত্তি থাকিলেও তুরস্কে রমণীবর্গের সম্মানের অভাব নাই; তুরস্কে রমণীগণ নির্ভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতে পারেন, কোন পুরুষ তাঁহাদের সম্মান হানীকর একটি কথা বলিলে তাঁহাকে আইন অনুসারে শ্রীঘরে যাইতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে তুর্কী বালিকা আপন ইচ্ছানুসারে বন্ধুবান্ধবের গৃহে অনায়াসেই যাইতে পারেন কিন্তু বিবাহ হইলে এ সমস্ত বিষয়ে স্বামীর উপর নির্ভর করিতে হয়; তুর্কী বধুগণের বাঙ্গালী রমণীর মত ভাশুরের সম্মুখে যাওয়া নিষিদ্ধ, ভাশুর দৈবাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা ভয়ানক বিব্রত হইয়া, খাটের তলায় বা আলমারির পাশে বা এমনি কোথাও লুকাইয়া পড়ে। পুরুষগণও অনেক সময় স্ত্রীর ভগিনীর মুখদর্শনে বঞ্চিত থাকেন।

তুরস্ক ইয়ুরোপ মহাদেশেরই একটা টুকুরা অথচ ইয়ুরোপীয়ান ও তুর্কী আচার ব্যবহারের কত প্রভেদ। সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার আবেষ্টনের মধ্যে একটুখানি প্রাচ্য কুসংস্কার বেশ আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট ভাবে নিরাপদে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রবাস যাত্রা।

জলপথে।

এইত সংসার তলে সবে দুটি ফেলেছি চরণ,
এরি মাঝে এত শ্রান্তি কুয়াষায় আঁধার নয়ন।
জড় জগতের সাথে জড় হয়ে শুধু বসে আছি,
কিসের এ গুরু ভার ঘিরে সদা থাকে কাছাকাছি।
কাজ নাই গৃহ-সুখে, বাহিরিব হেরিতে জগৎ,
আঁধার ছাড়িয়া কভু মিলিবেনা আলোকের পথ ?

বসন্তের এক প্রাতে আকুলিত দখিনা সমীরে,
কেমন উদ্যমে নব ছাইল অসাড় প্রাণ ধীরে।
প্রভাতদেবতা রবি কি আশীষ আনিয়াছে আজ !
সহসা আঁধার প্রাণে আলোকিত-পুলক বিরাজ।
জড় প্রাণে নব আশা অশ্রু ছেড়ে মুখে আসে হাসি,
যাইব সুদূরে আজি বিজনেতে একেলা প্রবাসী !

বিদায়ের বেলা শেষ, চলিনু কোথায় নাহি জানি !
সমীর হিল্লোলে মৃদু ভাসিল সে ক্ষুদ্র তরীখানি !
কম্পিত তরঙ্গরাশি দেহে পড়ে উছলি উছলি,
কেমন স্বপন প্রায় মনে হল নিখিলে সকলি !
বিচিত্র রহস্যময় বিপুল এ বিশ্বের নিকটে,
আমি শুধু চিত্র এক, লেখা যেন শ্যামনভপটে !

ক্রমেতে বাড়িল বেলা মধ্যাহ্নের রবির কিরণ !
আবার ফিরিল শ্রান্তি,—আশামাঝে তৃষার দহন !
তীরলগ্ন তরীখানি, শ্রান্ত আমি পড়িলাম জলে,
কি কথা সে তরঙ্গেরা কয়েছিল মধু কলরোলে !
যেন সাধ হল হায় প্রশান্ত সে সুবিমল নীরে
ঢালিয়ে পরাণখানি ঘুমাইয়ে পড়ি ধীরে ধীরে।

তীরতরু ছায়ে চেয়ে আধনগ্ন গ্রাম্য বালিকারা,
আকুল বিস্ময়ে যেন ভরিয়াছে নয়নের তারা !

রাখাল বালক এক একদৃষ্টে হেরে তরীখানি,
একবার সাধ যেন সুধাইবে তাহার কাহিনী।
এল মুখে মৃদু হাসি! এমনিত অজ্ঞাত কোথায়
গেহহীন উদাসীন চলিয়াছি কিসের মায়ায়!

আবার চলিনু ভাসি অনুকূল মধ্যাহ্ন সমীরে,
শ্যাম বৃক্ষশ্রেণীগুলি অঙ্কিত রয়েছে নদী নীরে।
মনে হল মেঘ যেন তার পরে পড়িতেছে ঢুলে,
ধরণী আকাশে আজ মেশামেশি হল বুঝি ভুলে!
এমন সময়ে কেন ঊর্দ্ধ কণ্ঠে চাতকের গীত!
উপরে দেখিনু চেয়ে পরিপূর্ণ জলদে শোভিত।

তাই বুঝি কল্লোলিনী ঢেউএ-ঢেউএ উঠিছে উলসি,
ভ্রূভঙ্গে ছড়ায় তাই ফেনমালা উছসি উছসি।
ধীর শান্ত সমীরণ এবে বুঝি তাই ক্রীড়াশীল
চঞ্চল তরঙ্গ হেরি আবেগেতে অধীর অনিল!
ক্ষুদ্র তরীখানি মোর অনুকূল বাতাসের ভরে
ভাসিয়া যাইতেছিল, দিক্‌হারা এবে কিবা করে!

সে চায় চলিয়া যেতে আপনার বাসনার স্রোতে,
উন্মত্ত সমীর যুঝে সবলে সে অসহায় সাথে।
উপরে আকাশ পরে ঢাকিয়াছে কালো মেঘমালা,
বজ্রের কঠিন ভাষা চপলার মুহূর্মুহু খেলা!
ছিন্ন ভিন্ন তরীখানি ক্রুদ্ধ সেই ফেণোর্ম্মির বলে
যায় বুঝি ডুবে যায় তটিনীর গভীর অতলে।

ঝর ঝর বারিপাতে কেটে গেল ধীরে মেঘমালা,
অশান্তসমীর এবে ক্লান্ত স্তব্ধ খেলে ঝড় খেলা।
উন্মত্ত তরঙ্গদল অলসে বহিছে ঢুলে ঢুলে,
পরিপূর্ণ বারিরাশি ভরিয়াছে দুকূলে দুকূলে!
তরীখানি ভেসে যায় ক্লান্তিহীন বিশ্রামবিহীন!
একেলা চাহিয়া আমি গেহহীন শ্রান্ত উদাসীন।

ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত শ্রান্তিপূর্ণ মানব আবাসে,
বিহঙ্গেরা কল কলে ক্লান্ত দেহে ফেরে নিজ বাসে।

এমন সুধীরে বহে সন্ধ্যার অলস সমীরণ !
কি স্নিগ্ধ সুশান্তিমাখা হৃদয়েতে জাগায় স্বপন !
উপরে আকাশ চেয়ে মনোহর গাঢ় নীলিমায়,
ললাটে তারকাখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় উজল বিভায় !

থামিল সৈকতে তরী, বসিলাম সিক্ত বালুতীরে,
পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাধারা ঢাকিয়া ফেলেছে ধরণীরে !
যতদূর দেখা যায় বালুময় বিশাল প্রান্তর
এরি মাঝে সুপ্ত যেন বিপুল এ বিশ্ব চরাচর।
সম্মুখে বহিয়া যায় স্রোতস্বিনী মৃদু কলরোলে,
পশ্চাতে সুদীর্ঘনিশি অন্ধকারে পড়িতেছে ঢোলে।

বিজন বনানী স্তব্ধ উন্নত সুন্দর গিরিশিরে,
ক্ষুদ্র বনলতাগুলি জড়ায়ে উঠিছে ধীরে ধীরে।
তারি মাঝে জোনাকীর মৃদু মৃদু আলো বিকিরণ,
আলেয়ার ছায়াবলি, হেরে তাহে ভ্রান্ত এ নয়ন !
থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে বিহগ কূজন
তারা কি ঘুমের ঘোরে হেরিতেছে প্রভাত স্বপন,

কেন মোর মনে হয় নিরালায় এইখানে যদি,
এখনি স্বপনে মাঝে হোত এই দেহের সমাধি !
তটিনী বহিয়া যেত সোহাগেতে সদাই উছলি,
বিহগেরা উপহার দিয়ে যেত মধুর কাকলি।
গিরিশির হতে ওই শ্যাম সিক্ত পাদপের দল
ঢালিত সমাধিপরে অবিরল পল্লব সকল !

দীর্ঘ যাত্রা জানিনাক কত দিনে শেষ হবে হায়,
প্রবাসী যেতেছি, হায়, জানিনাত বিরাম কোথায় !
সুদীর্ঘ দিবস নিশি ফিরিব আশ্রয়হারা দীন
কোন্ মনোমত গেহে এ জীবন হইবে বিলীন !
জানিনাত এরি মাঝে ফুরাবে কি জীবনের খেলা,
এত সন্ধ্যা নয়—যেন খর তীব্র মধ্যাহ্নের বেলা !

২

প্রথম বিহগ স্বরে মেলিলাম অলস নয়ন
সবি তন্দ্রাবিজড়িত ঘুম ঘোরে সকলি মগন!
চলিনু আবার ভাসি একেলা সে পথহারা পথে;
কি শীতল শান্ত বায়ু বহে সেই মধুর প্রভাতে।
তখনো ঘুমের ঘোরে মগনা রয়েছে স্রোতস্বিনী
ফোটেনি তখনো তার তরঙ্গের মধু কলধ্বনি।

আকাশের প্রান্তদেশে তখনো পাণ্ডুর মুখ লয়ে
মৃত জ্যোছনার পানে শুক তারা রহিয়াছে চেয়ে।
তখনো শিশিরসিক্ত নিশীথের আলু থালু কেশে,
তরুণা বালিকা উষা চাহে নাই বিহ্বলেতে হেসে,
এখনো ঘুমেতে মাখা বিহগের মধুর কাকলি
ঘুমের জগতে যেন ঘুমেমগ্ন রয়েছে সকলি।

আমারো নয়নে ঘোর একেলা গো যেতেছি কোথায়
সুধা কিম্বা হলাহল মিলিবে এ তীব্র তিয়াষায়?
শরতের স্নিগ্ধ মেঘে উজলিবে রবির কিরণ
অথবা নিদাঘে তীব্র জ্বালাময় অসহ দহন।
এ সংসার মরুভূমে আমরা যে তৃষিত পথিক
আলেয়ার আলো হেরি ভ্রান্ত আঁখি হারাইছে দিক্।

সবি ভুল হল মোর, গগণের পূর্ব্ব প্রান্তদেশে
সহসা এ কি রাঙিমা ছাঁইয়া ফেলেছে ধীরে এসে।
গাঢ় নীল বিভা ওই উজলিছে বিশাল আকাশে
গিরিশিরে সেই আভা দুজনে যেতেছে যেন মিশে!
উষা এসে দাঁড়ায়েছে দোঁহার মিলন মাঝখানে
কি মধুর জ্যোতির্ম্ময় শান্তিপূর্ণ স্নেহের নয়ানে!

এতো নয় আলু থালু ক্রীড়াক্লান্ত দেহ বালিকার,
এ যে গো রহস্যময়ী গাম্ভীর্য্যের মূরতি আধার!
তটিনীর স্নিগ্ধ বক্ষে ধ্যানমগ্ন তাপস যখন
সহসা মেলিবে তার জ্যোতির্ম্ময় বিশাল নয়ন!

হেরিবে এ মূর্ত্তিখানি দেবী বুঝি ধ্যান ধারণার—
এসেছেন ধীরে নামি অশ্রুজল মুছাতে ধরার।

সারানিশি গবাক্ষেতে বসি আছে বিরহী রমণী
কি দারুণ দুঃখভারে মলিন পাণ্ডুর মুখখানি,
নিশি জাগরণে শ্রান্ত অবশ সে ক্ষীণ দেহভার,
ঊষার শীতল বায়ে মুছেফেলে ম্লান অশ্রুধার।
কণক কিরণধারা কি আনন্দ পুলক বরষে
দুঃখের ধরণী হাসে সুখময়ী ঊষার পরশে।

মৃদুল মধুর তানে নদীবক্ষে বহে বিচীমালা
অলসে অবশ'যেন ভুলে গেছে দুরন্ত সে খেলা।
দুধারে পর্ব্বত শৃঙ্গ উন্নত হইয়া আছে চেয়ে,
সুশ্যাম পাদপরাজি কোলে কোলে পড়েছে ঢলিয়ে।
নিবিড় আঁধার মেঘ আঁকা যেন আছে তারি পাশে
কোথা হতে আসিয়াছে আকুল আগ্রহ ভরা আশে।

সমীর দিতেছে বাধা উড়ে যায় তাই, সরে যায়,
দু এক নীহার বিন্দু ফেলে বুঝি গেছে নিরাশায়।
চলিনু এমনি ভাসি কতদিন কাটিল এমনে
কি যেন মদিরামাখা কি বিভুল নেশার স্বপনে।
কত দূরে চলে যাই শেষ হবে এ নদী কোথায়!
কোথা সে বিপুল সিন্ধু কতদিনে যাইব সেথায়!

বিশাল তটিনী হেথা অস্পষ্ট কিনারা দেখা যায়,
শ্যাম বৃক্ষরাজি সব একাকার নয়নে না ভায়!
শুধু দেখা যায় সেই বালুকার বিশাল প্রান্তর
তারি পরে উজলিছে মধ্যাহ্নের খর রবিকর।
এমন সময়ে একি সুভীষণ মধুর কল্লোল
কম্পিত হৃদয় মোর আবেগে অধীর উতরোল।

কোথা হতে সহসা এ অতি স্নিগ্ধ শীতল সমীরে
আকুল আগ্রহ-স্রোতে স্রোতস্বিনী উছলে অধীরে।
দেখিলাম দূর হতে সুনীল বিশাল পারাবার,
বহিয়া যেতেছে বেগে উন্মত্ত ফেনোর্ম্মি চারিধার।

তটিনী সহসা আসি মিশিল তাহার মাঝখানে
কি সে দৃশ্য দুজনার আকুলিত মধুর মিলনে।

শুভ্র বারিরাশি পরে মিশে গেল সুনীল সে বারি
কি মৃদু হিল্লোলে বায়ু বহে যায় মাঝখানে তারি!
এমনি ভাসিয়া যাই দিবা বুঝি হইল অতীত
অস্তাচলে রবিকর লোহিত আভায় সুরঞ্জিত।
এখনো যেতেছে দেখা তপনের মৃদুল কিরণ,
আর পারে অর্দ্ধ চাঁদ উজলায়, মুগধি নয়ন।

কেনা মুগ্ধ হয় হেরি সিন্ধুতীরে তপনের আলো
আলিঙ্গিছে আত্মহারা নিশীথের অন্ধকার কালো।
ধীরে ধীরে ডুবে যায় মিশিবে বা বারিধির নীরে,
অথবা সে প্রসারিত সুনীল বিশাল নভ-তীরে।
আলু আলু শ্রান্ত প্রাণ কোন মোহে হইছে মগন,
কোন দূর হতে কার অজানিত মধু আকর্ষণ!

সাগর সঙ্গমে এসে খুঁজিয়া পেয়েছি আপনারে
নবীন উদাসী প্রাণ উছলি পড়িছে চারি ধারে।
বুঝিলাম এ নিখিলে আজ আমি কিসের উদাসী
গেহহীন পথহারা কেন ভ্রমি একেলা প্রবাসী।
এই তটিনীর মত মিলিব কবে কে বল জানে?
উন্মত্ত বিশাল সিন্ধু! ডুবে গিয়ে তারি মাঝখানে!

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল।

বিগত আষাঢ় মাসের ভারতীতে "মৃণ্ময়ী" সমালোচনার ভ্রম সংশোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কলির সপ্তম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরাদি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রাজতরঙ্গিণীকার এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা। স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন প্রভৃতি মনীষিগণ এই মতাবলম্বী। আমরাও এক সময়ে এই মতের পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া সম্প্রতি উহা পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন আমাদের ধারণা, কলির ১ম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠির বিদ্যমান ছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীকার বলেন,—"ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূৎ বার্ত্তয়েতি বিমোহিতঃ।" অর্থাৎ ভারত যুদ্ধ দ্বাপরান্তে সংঘটিত হইয়াছিল একথা সত্য নহে। তাঁহার মতে কলির সপ্তম শতাব্দী যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাবকাল। রাজতরঙ্গিণীকারের এই সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত ঘটনার বিরুদ্ধ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ডাক্তার কের্ণ তৎসম্পাদিত বৃহৎ সংহিতার ভূমিকায় বলেন,—It (গর্গসংহিতা) records the war (of Mohabharata) at the close of Dwopara Age." (Vide p. p. 36). মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় বলেন,—In the historical portion of his work, Garga speaks of the four yugas, the third ending and the fourth beginning with the war of Mohabharat." (Vide R. C. Dutt's "Ancient India." p p. 601) এতদ্দ্বারা জানা গেল, গর্গসংহিতা মতে দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভকালে কুরুপাণ্ডবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মত এই গর্গ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী (১)।

রাজতরঙ্গিণীকার বলেন,—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। (সপ্তর্ষিগণের এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল এক এক শত বৎসর)। এই তত্ত্ব তিনি বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বরাহ মিহির "বৃদ্ধ গর্গসংহিতা" হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, বোধ হয় (২)। সে যাহা হউক, এখন অনুসন্ধেয় এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল কোন্ সময়ে মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল? উত্তরে রাজতরঙ্গিণীকার বলেন,—কলির সপ্তম শতাব্দীতে। কিন্তু কহ্লণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্ট উৎপল (৯৬৭ খৃঃ অঃ) "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে, দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বীয় টীকায় বৃদ্ধ গর্গসংহিতা ও কাশ্যপসিদ্ধান্ত হইতে উক্ত মতপরিপোষক রচনাবলীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "The same position of the seven rishis (in মঘা নক্ষত্র) at the junction of the Dwopara and Kali-yuga is confirmed by the quotation from বৃদ্ধ গর্গ and কাশ্যপ by the commentator Bhattotpala."

---

(১) রাজতরঙ্গিণী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কহ্লণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংকলিত। গর্গসংহিতা তাহার প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ডাঃ কের্ণএর মতে গর্গসংহিতার রচনাকাল ৫০ খৃঃ পূঃ। কিন্তু তাহাতে শকজাতির বিনাশের প্রসঙ্গ থাকায় উহাকে আমরা (অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতানুসরণ করিয়া) খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত বা সংকলিত বলিতে বাধ্য হইতেছি।

(২) কেননা, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে এইরূপ ভাবের একটা কথা আছে যে,—বৃদ্ধ গর্গের মতানুসরণ করিয়া আমি সপ্তর্ষি-বারের বিষয় বর্ণনা করিতেছি।" সম্প্রতি বৃহৎ সংহিতা আমার নিকট এখানে নাই; সুতরাং কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছি।

(Vide Max Muller's Preface to the Rigveda Sanhitá Vol IV.) বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে কলির প্রারম্ভকালে (সপ্তম শতাব্দীতে নহে) সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। বরাহ মিহিরের মতে এই সময়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন করিতে ছিলেন (৩)। মহাভারতেও এই সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা ;—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥"

অর্থাৎ দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভকালে কুরু পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিষ্ণু, ভাগবত, বরাহ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণেও এতদ্বিষয়ক ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তৎসমূহ উদ্ধৃত লইল না। এইরূপে বৈষ্ণবাদি পুরাণ, বৃদ্ধ গর্গসংহিতা, কশ্যপসিদ্ধান্ত বৃহৎসংহিতা ও (ভট্টোৎপল কৃত) বৃহৎ সংহিতার টীকা প্রভৃতি গ্রন্থের মতের সামঞ্জস্য করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, কলির প্রারম্ভকালে

---

(৩) পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার "পাণিনি" শীর্ষক প্রবন্ধে রাজতরঙ্গিণীর মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—"এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মঘানক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে যে, কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।" এই উক্তির অন্তর্গত "এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি," এই বাক্যাংশের অর্থ কি ? "এক্ষণে" অর্থে যদি শকাব্দের ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদ (খৃষ্টীয় ১৯ শতাব্দীর শেষ ভাগ) স্বীকার করা যায়,তবে (এক শত বৎসর করিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের স্থিতিকাল ধরিলে) বর্ত্তমান সময়ের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে (শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হইবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে) একবার, ৩৪ সহস্র ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ শকাব্দের ২৯ শত বৎসর পূর্ব্বে) আর একবার সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন। প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে শকাব্দের ৩২ শত বৎসর পূর্ব্বে কলি যুগের প্রারম্ভ ধরিলে কলির তৃতীয় শতাব্দীতে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়।

আবার "এক্ষণে" অর্থে যদি "রাজতরঙ্গিণী রচনার সমকালে" স্বীকার করা যায়, তবে শকাব্দের ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে একবার ও (শকাব্দের) ৩৯ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কলির বিংশ শতাব্দীতে একবার ও কলি প্রারম্ভের ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে আর একবার সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। কোনও ক্রমেই কলির ৭ম শতাব্দীতে সপ্তর্ষিগণের মঘায় অবস্থান সম্ভব বোধ হইতেছে না। ফল কথা, আমরা রামদাস বাবুর পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

কলির প্রথম শতাব্দীতে সপ্তর্ষিগণের মঘাতে অবস্থিতি স্বীকার করিলে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। কেননা, ৪৮টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে সপ্তর্ষিগণের ৫০ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে।

রামদাস বাবু "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও জনমেজয়ের রাজত্বকালে নৈমিষারণ্যীয় মুনিগণকর্ত্তৃক মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যূন ৩ শত বৎসরের ব্যবধান" স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মহাভারতীয় নির্দ্দেশানুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৯৬ বৎসর পরে জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক হয়। জনমেজয় ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সুতরাং ভারত-সংগ্রাম ও মহাভারত প্রচার এতদুভয় ঘটনার মধ্যে ১৪৫ বর্ষাপেক্ষা অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীতে) সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিল ও সেই সময় যুধিষ্ঠিরাদি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা ও পুরাণাদি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীধরস্বামীও কলির প্রারম্ভকালে এমন কি, দ্বাপরের অন্তিমেও কুরুপাণ্ডবাদির আবির্ভাব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত মহারাষ্ট্র-পতি চালুক্যরাজ পুলকেশী সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভের একটি প্রস্তরলিপিতেও যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কলির প্রথম শতাব্দীতেই স্বীকৃত হইয়াছে (৬)। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও শঙ্করনাথ পণ্ডিত মহোদয় ও ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এই মতের পক্ষপাতী।

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতি মে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনধৃত ব্রহ্মপুরাণবচনম্।

ইহাতে জানা গেল যে, ব্রহ্মপুরাণের মতে ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে কলি যুগে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই বচনে এরূপ কিছুই নাই যাহাতে রাজতরঙ্গিণী বা পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতের পোষকতা হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ইহার সহিত মহাভারতীয় উক্তির সম্পূর্ণই ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। কেননা, মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, কলি ও দ্বাপরের অন্তরকালে অর্থাৎ সন্ধিকালে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। "দ্বাপরের ও কলির সন্ধি বলিলেও—হয় দ্বাপরের শেষ, না হয় কলির প্রথম বুঝায়; এস্থলে কলির সন্ধ্যাই (ক)—দ্বাপর ও কলি যুগের সন্ধি। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত (ব্রহ্মপুরাণীয়) বচনের সহিত বিরোধ ঘটে।" (৭)

---

(৬) প্রস্তরলিপিতে উৎকীর্ণ শ্লোকটি এই :—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু॥ ৩৩॥
পঞ্চাশৎসু কলৌকালে ষট্‌সু পঞ্চশতেষু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজামম্॥ ৩৪॥

*   *   *   *   *

সত্যাশ্রয়স্য পরমাপ্তবতা প্রসাদম্।
নির্ম্মাপিতং মতিমতা রবিকীর্ত্তিনেদম্॥ ৩৭॥"

এই প্রস্তরলিপি ৫৫৬ শকাব্দে রবিকীর্ত্তিনামক জনৈক জৈন কবি কর্ত্তৃক রচিত ও নির্ম্মিত।

(ক) কলি সন্ধ্যার পরিমাণ এক শত বৎসর মাত্র; একথা মল্লিখিত "এটা কোন্ যুগ?" (মূল্য এক আনা। আদি ব্রাহ্মসমাজে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য) পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমরা কলির ১ম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাবকাল স্থির করিয়াছি।

(৭) জন্মভূমি—বৈশাখ (১৩০০ সাল) ২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফল কথা, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর মত ভ্রমশূন্য নহে। আশা করি, কানাই বাবু রাজতরঙ্গিণীর ভ্রান্ত মত (অন্যান্য বিষয়ে প্রামাণিক হইলেও এ বিষয়ে ভ্রান্ত) পরিত্যাগ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। * বারান্তরে জন্মভূমির লেখক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্তের ভ্রমাত্মকতা প্রদর্শনে যত্নবান্ হইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ফুলের মালা।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গণেশদেবের স্থির বিশ্বাস সাহেবুদ্দিনকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি ন্যায়কার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং এজন্য যুদ্ধ করিতে তাঁহার দুঃখ নাই, অনুতাপ নাই। কিরূপে এই ন্যায়যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিবেন, এই অশান্তিময় অত্যাচার দমন করিয়া আবার শান্তি, ন্যায় ফিরাইয়া আনিবেন, ইহাই কেবল তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

সমস্ত দিনের সভাকার্য্য, বাদানুবাদ, অবশেষে অনিবার্য্য যুদ্ধ সঙ্কল্পের পর তিনি যখন রাত্রিকালে অন্তঃপুরে আগমন করিলেন, তখনও তাঁহার এইরূপ চিন্তাবেগে মস্তক আলোড়িত হইতেছিল।

রাজাকে দেখিয়া নিরুপমা বলিল,—"মা বড় রেগেছেন, সাহেবুদ্দিনকে তুমি আশ্রয় দাও, তাঁর এরূপ ইচ্ছা নয়।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার কি মনে হয়? তাকে আশ্রয় দিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি?"

নিরুপমা বলিল,—"অন্যায় করিয়াছ! তোমাদের মত লোকেও যদি অসহায়ের সহায়তা না করে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় না দেয়—তাহা হইলে সংসারে, দুর্ব্বল আতুরের দশা কি হয়? তুমি তোমার মত কাজই করিয়াছ।"

রাজা স্বহস্তস্থিত রাণীর হস্ত অধর স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"ইহাই স্ত্রীলোকের কথা!" নিরুপমার এই অনুমোদনবাক্যে রাজাকে আহ্লাদিত হইতে দেখিয়া সে আনন্দ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং সেই আনন্দ গোপন করিতে গিয়া সহসা বলিল—"একটা নতুন খবর শুনিয়াছ? শক্তিকে অবশ্য মনে আছে? সে গায়সুদ্দিনের বেগম হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"সত্যি?"

---

* দুঃখের বিষয় এই যে, "বিশ্বকোষ" নামক বৃহদভিধানে ও পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-প্রণীত "নিরুক্তালোচন" নামক বহুল গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে রাজতরঙ্গিণীর এই ভ্রমপূর্ণ মত স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রাণী। তুমি জান না ? কুতবের শিবির হইতে এ কথা রাষ্ট্র হইয়াছে,—ইহা ত মিথ্যা হইতে পারে না। ছি! ধনের লোভে যবনী হইল! মাগো!

শক্তির প্রতি এই ঘৃণাসূচিত বাক্যে রাজার হৃদয় ব্যথিত হইল। ইহা বৃথা অপবাদ; শক্তি যথার্থ পক্ষে হীন রমণী নহে; তাহার এ দুর্দ্দশা কেবল তাঁহাকে ভালবাসিয়া; তিনিই তাহার এই হেয় জীবন গ্রহণের কারণ; রাজা বলিলেন, "কি জন্য সে যবনী হইয়াছে, তুমি কি করিয়া জানিলে ? আর মুসলমান হইলেই কি মানুষ হেয় হয়! হিন্দু মুসলমান সকলেই ত সেই বিধাতৃপুরুষের সন্তান,—তুমি কেন মনে করিতেছ—তুমি শ্রেষ্ঠ—আর তাহারা নিকৃষ্ট!"

রাণী। কে জানে! আমার মুসলমানকে বড় ঘৃণা করে। স্বর্গ আমার হাতে দিলেও আমি মুসলমান ধর্ম্ম নিইনে।"

রাজা। অন্যায় ঘৃণা। তাহা হইলে যবনেরা হিন্দুদিগকে ঘৃণা করিলে কেন তাহাদিগের দোষ দাও ? হিন্দুজাতির যথার্থ গৌরব তাহাদের উদারতায়; যদি হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব থাকে ত অন্য কাহাকেও ঘৃণা করিও না।—সকলকেই আত্মবৎ মান্য করিও।"

রাজার কথা সত্য বুঝিয়া নিরূপমা লজ্জিত হইল; অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"তা যাই হ'ক শক্তি যদি আসে আমি কিন্তু তার সঙ্গে সমভাবে মিশতে পারিব না।" রাজা বলিলেন, "সে হইল বঙ্গেশ্বরী, তুমি হইলে সামান্য দিনাজপুরের রাণী,—তাহার অধীন সামন্তপত্নী, সে যদি তোমার সহিত সমভাবে মেশে ত তোমারই গৌরবের কথা!"

নিরূপমার বড় দুঃখ হইল; শক্তির প্রতি রাজার সেই সম্মান ভাবে সে আপনাতে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল। তাহার সেই পুরাতন কথা মনে পড়িল। "সত্যই ত নিরূপমা কি শক্তির সমযোগ্য! রাজা শক্তির গলায় ফুলের মালা পরাইয়াছিলেন,—তাহাকে ত পরান নাই!" নিরূপমা হৃদয়ে আঘাত অনুভব করিয়া মুখে বলিল—"তাই ত।"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত পড়িল।—রাজা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও ?" রঙ্গিণী উত্তর করিল—"ভগবতী সন্ন্যাসিনী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"—

রাজা সচকিতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তোমার মাতা কুতবকে সাহেবুদ্দিনের গৃহের সন্ধান দিয়াছেন, সাহেবুদ্দিন বোধ হয় এতক্ষণে বন্দী হইল কোন উপায় করিতে পারত দেখ।"

রাজা ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "আপনি সহরকোতোয়ালকে বলুন—সৈন্য লইয়া শীঘ্র আমার সাহায্যে আইসে, আমি ততক্ষণ প্রাসাদের প্রহরী সৈনিক যাহাদের পাই লইয়া অগ্রসর হই।"

রাজা দ্রুতপদে চলিলেন, দ্বারদেশে যে সকল প্রহরীদিগকে দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকেই সঙ্গে লইয়া চলিলেন, তাঁহারা কুতবসেনার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারিলে

তখন অন্য সৈনিকেরা আসিয়া যোগ দিতে পারিবে। ন্যায়োত্তেজিত প্রাণভয়শূন্য রাজা অসম সাহসে ভর করিয়া কতিপয়মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া কুতবের সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে সাহেবুদ্দিন উদ্ধার পাইলেন না; কেবল সেই অন্ধকার রজনীতে কুতবের সৈন্যব্যূহের মধ্যে অভিমন্যুর ন্যায় গণেশদেব তৎক্ষণাৎ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদ শক্তিময়ীর আবাস নহে। তিনি নদীতীরস্থ এক উদ্যান ভবনে স্বতন্ত্র থাকেন। অন্য বেগমদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। মুসলমান রাজার এই প্রমোদ নিকেতনে যথেষ্ট হিন্দুরুচি হিন্দু ভাব বিদ্যমান। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিয়াছে, ফুলের তারকা ফুটিয়াছে, পদ্ম পত্র শোভিত সুদীর্ঘ ঝিল কানন বিসর্পিত করিয়া চলিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে অধিকাংশ হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজমান। কোথায় সুসজ্জিতা রাধিকা, কোথায় মুরলীধারী কৃষ্ণ, কোথাও বীণাপাণি সরস্বতী, কোথাও পদ্মাসনা লক্ষ্মী, কোথাও বল্কল পরিধানা মৃগ সান্নিধ্যা মৃৎপাত্রহস্তা শকুন্তলা, কোথাও বা রত্নাবলী উদয়ণ রাজাকে দেখিয়া লজ্জাবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

রজত সন্ধ্যা। উদ্যান প্রান্তে পূর্ণভাগা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হইয়া আনন্দ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। ফোয়ারার ঝর ঝর তান এবং বায়ুহিল্লোলিত বৃক্ষাবলীর মৃদুরব নদীর সেই মৃদুমধু কল্লোলে মিশিয়া সান্ধ্য কানন সুমধুর সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছিল। কাননের সেই মধুর গীতোচ্ছ্বাস সহসা যেন স্তব্ধ করিয়া শক্তি উগ্র কঠোর স্বরে কহিলেন, "এ কি শুনিতেছি, বালক সাহেবুদ্দিনকে ফাঁসি দিবার জন্য নাকি তাহাকে ধরিতে লোক গিয়াছে! ছি ছি—এমন নিষ্ঠুরকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম?

গায়সুদ্দিন এই কাননে আসিয়া কদাচ তৎক্ষণাৎ শক্তির দেখা পান; কোন দিন বারবার ডাকিতে ডাকিতে শক্তি এ উদ্যানে আগমন করেন—কোন দিন বা তাহাতেও তাঁহার অবসর হয় না—তিনি কন্যাকে লইয়া এমনি ব্যস্ত থাকেন।—আজ সুলতান তাঁহাকে এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই বুঝিলেন—মহিষী প্রেমালাপের উদ্দেশ্যে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন না।—তিনি শক্তির নিকট মর্ম্মরাসনে বসিয়া তাঁহার কথার উত্তরে বলিলেন,—"তোমা হইতেও নিষ্ঠুর! প্রিয়ে, হৃদয় মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াও তোমার মন পাইলাম না। আমি আমার শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া নিষ্ঠুর বলিতেছ—কিন্তু—"

গায়সুদ্দিনের নিকট হইতে অত্যাচার শক্তিময়ী সহিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার প্রেমালাপ তাঁহার পক্ষে অসহ্য! শক্তি স্বামীর প্রেমসম্ভাষণ কঠোর ভৎর্সনায় নীরব করিতে প্রয়াস পাইয়া বলিলেন,—"ইহা নিষ্ঠুরতা নহে! হইতে পারে, তোমাদের

যবন ভাষায় ইহাই বীরত্ব। সাত ভাইকে মারিয়া আশ মিটিল না; আবার বালকের রক্তপাত! সব সহে—পুরুষের কাপুরুষত্ব সহে না।"

সুলতান বলিলেন,—"তোমাদের হিন্দুবীরেরা কেহই ত তোমার মত রত্নের মর্য্যাদা বুঝিল না। কাপুরুষত্ব যদি তোমাকে লাভ করিতে পারে ত তাহাই আমি পৌরুষ মনে করি।"

শক্তিকে মাঝে মাঝে এইরূপ আহত করিতে সুলতানের লাগে ভাল। তাহার গর্ব্বিত উপেক্ষাময় ভাবের ইহাই একমাত্র প্রতিশোধ।

ক্রোধে শক্তির গৌরমূর্ত্তি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সেই পুরাতন অপমানের সহিত নূতন অপমান মিশ্রিত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া তুলিল,—শক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না—কেবল ক্রুদ্ধ নিরুপায় জনের মর্ম্মোত্থিত ভীষণ অভিশাপ গণেশদেবের প্রতি নীরবে বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই তাঁহার এই অবস্থা করিয়াছে!

সম্মুখে ফোয়ারার জলরাশি রজতোচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া উপরে উঠিতেছে—ছুটিয়া ছুটিয়া নীচে নামিতেছে; নির্ঝর হ্রদে তারা ফুটিয়াছে; চাঁদ, ভাসিতেছে শক্তিময়ী ওষ্ঠাধর দৃঢ় সংযুক্ত করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত আরক্ত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া হস্তসন্নিহিত বৃক্ষের ফুলদল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। সুলতান শক্তির সেই চন্দ্রদীপ্ত ক্রোধোজ্জ্বল মুখকান্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে—এই সৌন্দর্য্যে পুড়িয়া মরিতেছি, তবু দূরে যাইতে পারি না,—হাজার তাড়াইলেও"—বলিয়া সোহাগভরে শক্তির মুখচুম্বন করিলেন। শক্তির পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর আদরে এখনো সে আপনাকে অভ্যস্ত করিতে পারে নাই; ইহা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই সে ভাল থাকে। তাহার পর এখনকার এই মনের অবস্থায় ইহা তাহার বিষতুল্য লাগিল,—সে শিহরিয়া মনে মনে গর্জ্জন করিয়া মনে মনে বলিল,—"গণেশদেব, তুমি—তুমি আমার এই অবস্থা করিয়াছ! ইহার প্রতিশোধের জন্য কেবল আমার এ জীবন বহনীয়।"

এই সময় একজন দাসী একটি রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া বলিল,—"বেগম সাহেব—সাহাজাদিকে কিছুতেই ঘরে রাখিতে পারিলাম না—তাই লইয়া আসিয়াছি।"

বালিকা দাসীর ক্রোড় হইতে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট আসিয়া বলিল,—"আমি যাব না; আমি তোমার কাছে থাকব,"—

শক্তি দাসীকে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া মুখ চুম্বন করিলেন, সে তখন তাঁহার কোল হইতে নামিয়া বলিল,—"তুমি দুষ্টু! কেন পালিয়ে এলে—আমি বাবার কাছে যাব।"

বালিকা সুলতানের কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কোমল মাতৃস্নেহে শক্তির কঠোর ভাব দ্রব হইয়া গেল; তাহার উগ্রতা করুণ নৈরাশ্যে পরিণত হইল। সে দেখিল,—যে তাহার কেহ নহে, সেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা

তখন অন্য সৈনিকেরা আসিয়া যোগ দিতে পারিবে। স্থায়োত্তেজিত প্রাণভয়শূন্য রাজা অসম সাহসে ভর করিয়া কতিপয়মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া কুতবের সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে সাহেবুদ্দিন উদ্ধার পাইলেন না; কেবল সেই অন্ধকার রজনীতে কুতবের সৈন্যব্যূহের মধ্যে অভিমন্যুর ন্যায় গণেশদেব তৎক্ষণাৎ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদ শক্তিময়ীর আবাস নহে। তিনি নদীতীরস্থ এক উদ্যান ভবনে স্বতন্ত্র থাকেন। অন্য বেগমদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। মুসলমান রাজার এই প্রমোদ নিকেতনে যথেষ্ট হিন্দুরুচি হিন্দু ভাব বিদ্যমান। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিয়াছে, ফুলের তারকা ফুটিয়াছে, পদ্ম পত্র শোভিত সুদীর্ঘ ঝিল কানন বিসর্পিত করিয়া চলিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে অধিকাংশ হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজমান। কোথায় সুসজ্জিতা রাধিকা, কোথায় মুরলীধারী কৃষ্ণ, কোথাও বীণাপাণি সরস্বতী, কোথাও পদ্মাসনা লক্ষ্মী, কোথাও বল্কল পরিধানা মৃগ সান্নিধ্যা মৃৎপাত্রহস্তা শকুন্তলা, কোথাও বা রত্নাবলী উদয়ণ রাজাকে দেখিয়া লজ্জাবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

রজত সন্ধ্যা। উদ্যান প্রান্তে পূর্ণভাগা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হইয়া আনন্দ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। ফোয়ারার ঝর ঝর তান এবং বায়ুহিল্লোলিত বৃক্ষাবলীর মৃদুরব নদীর সেই মৃদুমধু কল্লোলে মিশিয়া সান্ধ্য কানন সুমধুর সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছিল। কাননের সেই মধুর গীতোচ্ছ্বাস সহসা যেন স্তব্ধ করিয়া শক্তি উগ্র কঠোর স্বরে কহিলেন, "এ কি শুনিতেছি, বালক সাহেবুদ্দিনকে ফাঁসি দিবার জন্য নাকি তাহাকে ধরিতে লোক গিয়াছে! ছি ছি—এমন নিষ্ঠুরকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম?

গায়সুদ্দিন এই কাননে আসিয়া কদাচ তৎক্ষণাৎ শক্তির দেখা পান; কোন দিন বারবার ডাকিতে ডাকিতে শক্তি এ উদ্যানে আগমন করেন—কোন দিন বা তাহাতেও তাঁহার অবসর হয় না—তিনি কন্যাকে লইয়া এমনি ব্যস্ত থাকেন।—আজ সুলতান তাঁহাকে এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই বুঝিলেন—মহিষী প্রেমালাপের উদ্দেশ্যে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন না।—তিনি শক্তির নিকট মর্ম্মরাসনে বসিয়া তাঁহার কথার উত্তরে বলিলেন,—"তোমা হইতেও নিষ্ঠুর! প্রিয়ে, হৃদয় মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াও তোমার মন পাইলাম না। আমি আমার শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া নিষ্ঠুর বলিতেছ—কিন্তু—"

গায়সুদ্দিনের নিকট হইতে অত্যাচার শক্তিময়ী সহিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার প্রেমালাপ তাঁহার পক্ষে অসহ্য! শক্তি স্বামীর প্রেমসম্ভাষণ কঠোর ভৎর্সনায় নীরব করিতে প্রয়াস পাইয়া বলিলেন,—"ইহা নিষ্ঠুরতা নহে! হইতে পারে, তোমাদের

যবন ভাষায় ইহাই বীরত্ব। সাত ভাইকে মারিয়া আশ মিটিল না; আবার বালকের রক্তপাত! সব সহে—পুরুষের কাপুরুষত্ব সহে না।"

সুলতান বলিলেন,—"তোমাদের হিন্দুবীরেরা কেহই ত তোমার মত রত্নের মর্য্যাদা বুঝিল না। কাপুরুষত্ব যদি তোমাকে লাভ করিতে পারে ত তাহাই আমি পৌরুষ মনে করি।"

শক্তিকে মাঝে মাঝে এইরূপ আহত করিতে সুলতানের লাগে ভাল। তাহার গর্ব্বিত উপেক্ষাময় ভাবের ইহাই একমাত্র প্রতিশোধ।

ক্রোধে শক্তির গৌরমূর্ত্তি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সেই পুরাতন অপমানের সহিত নূতন অপমান মিশ্রিত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া তুলিল,—শক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না—কেবল ক্রুদ্ধ নিরুপায় জনের মর্ম্মোত্থিত ভীষণ অভিশাপ গণেশদেবের প্রতি নীরবে বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই তাঁহার এই অবস্থা করিয়াছে!

সম্মুখে ফোয়ারার জলরাশি রজতোচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া উপরে উঠিতেছে—ছুটিয়া ছুটিয়া নীচে নামিতেছে; নির্ঝর হ্রদে তারা ফুটিয়াছে; চাঁদ, ভাসিতেছে শক্তিময়ী ওষ্ঠাধর দৃঢ় সংযুক্ত করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত আরক্ত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া হস্তসন্নিহিত বৃক্ষের ফুলদল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। সুলতান শক্তির সেই চন্দ্রদীপ্ত ক্রোধোজ্জ্বল মুখকান্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে—এই সৌন্দর্য্যে পুড়িয়া মরিতেছি, তবু দূরে যাইতে পারি না,—হাজার তাড়াইলেও"—বলিয়া সোহাগভরে শক্তির মুখচুম্বন করিলেন। শক্তির পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর আদরে এখনো সে আপনাকে অভ্যস্ত করিতে পারে নাই; ইহা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই সে ভাল থাকে। তাহার পর এখনকার এই মনের অবস্থায় ইহা তাহার বিষতুল্য লাগিল,—সে শিহরিয়া মনে মনে গর্জ্জন করিয়া মনে মনে বলিল,—"গণেশদেব, তুমি—তুমি আমার এই অবস্থা করিয়াছ! ইহার প্রতিশোধের জন্য কেবল আমার এ জীবন বহনীয়।"

এই সময় একজন দাসী একটি রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া বলিল,—"বেগম সাহেব—সাহাজাদিকে কিছুতেই ঘরে রাখিতে পারিলাম না—তাই লইয়া আসিয়াছি।"

বালিকা দাসীর ক্রোড় হইতে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট আসিয়া বলিল,—"আমি যাব না; আমি তোমার কাছে থাকব,"—

শক্তি দাসীকে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া মুখ চুম্বন করিলেন, সে তখন তাঁহার কোল হইতে নামিয়া বলিল,—"তুমি দুষ্টু! কেন পালিয়ে এলে—আমি বাবার কাছে যাব।"

বালিকা সুলতানের কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কোমল মাতৃস্নেহে শক্তির কঠোর ভাব দ্রব হইয়া গেল; তাহার উগ্রতা করুণ নৈরাশ্যে পরিণত হইল। সে দেখিল,—যে তাহার কেহ নহে, সেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা

আপনার, সে তাহার স্বামী, সে তাহার কন্যার পিতা, নিজেকে শক্তি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে,—কিন্তু এই আত্মীয়তা সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কি বিষম ভাগ্য লইয়া সে জন্মিয়াছে!

গায়সুদ্দিন পার্শ্বের ফুল-বৃক্ষ হইতে ফুল তুলিয়া কন্যার হাতে দিতেছিলেন,—সে পিতার সহিত আধো-বাধো করিয়া কথা কহিতে কহিতে হাসিয়া হাসিয়া তাহা ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফোয়ারা-হ্রদে ফেলিতেছিল—ফুলগুলি চাঁদের কিরণে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল তাহার মুখটিতে হাসি ধরিতেছিল না; কচি কিশলয়ের মত অধর ওষ্ঠ দুখানি হাসিতে ক্লান্ত হইয়া—প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত মুখখানি অপরূপ লাবণ্যময় হইয়া উঠিতেছিল। শক্তি ঈর্ষাপূর্ণ স্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া হৃদয়ে নৈরাশ্যের জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। সুলতান কন্যার মুখে চুম্বন করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে,—আমি কি নিজের সুখের জন্যই শত্রু দমন করি। মনে কর দেখি; আমি মৃত—রাজ্য শত্রুহস্তে—তখন এই কুসুমকলিকার কি হইবে!"

শক্তি বলিল,—"মনে করদেখি—এই দণ্ডে যদি এখানে বজ্রপাত হয় তাহা হইলে কি হইবে! একজন অসহায় বালকের রক্তপাত না করিলে কি তোমার রাজ্য থাকিবে না!

গায়। অসহায়তাই তাহার সহায়। বালকের পক্ষ লইয়া কত লোক বিদ্রোহী হইবে; রাজ্যে অশান্তির সীমা থাকিবে না।"

শক্তি। তাই বলিয়া আগে থাকিতে নির্দ্দোষীকে বধ করিতে হইবে! ইহাই রাজ-কর্ত্তব্য, রাজার মত বিচার বটে। যদি বিদ্রোহ দমন করিতে চাও, যদি রাজ্য নির্ভয় করিতে চাও ত দোষীর দণ্ডবিধান কর। সাহেবুদ্দিনের কোন দোষ নাই; বালক প্রাণভয়ে আত্মগোপন করিয়াছে; তাহাতে তাহার দোষ নাই। কিন্তু যে তোমার আজ্ঞা তাচ্ছিল্য করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহার কি করিলে? দণ্ডনীয় যদি কেহ থাকে, তবে সেই; সাহেবুদ্দিন নহে।"

সুলতান আশ্চর্য্য হইলেন;—গণেশদেবকে শক্তি ভালবাসিত, তাহা তিনি জানি-তেন; সে ভালবাসা যে তাহার হৃদয় হইতে একেবারে মুছে নাই—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সুতরাং তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, স্ত্রীলোকের ভালবাসা এবং প্রতিশোধস্পৃহার ব্যবধানটুকু কোথায় বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।—কিন্তু মনে মনে ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"গণেশদেব বন্দী।"

"বন্দী!"

"হ্যাঁ—"

বালিকা বলিল—"গণেশ! আমি ভেঙ্গে ফেলেছি! আমাকে সুন্দরলাল দিয়ে-ছিল। বিশ্রী!"

সুন্দরলাল এই উদ্যানের মালী।

স্বরলিপি।

মিশ্র—একতালা।

এমনি ক'রে।

তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে ?
সেথা—জোছনা রজনী,　　ম্লান কি, সজনি
এমনি তাহারো নয়ন লোরে ?
ঐ দুটি তারা,　　আপনাতে হারা,
শুনিছে কি তারো বিরহ গান ?
মালাগাছি গলে, তেমনি কি দোলে,
শুকান তবু কি তেমনি মান ?
বুকে ধরে চেপে, উঠে কেঁপে কেঁপে,
শিহরে বা কভু অধরে রাখি !
স্মৃতির মিলনে,　　বিরহ বেদনে,
এমনি সজনি, আকুল সেকি !
প্রাণ কেঁদে কয়,　　নয় তাতো নয়,
সবি বিসঁরণ সে মায়াপুরে।
সেথা—পুরাতন বলে,　　কিছু নাহি ছলে—
শুধু—বাজে বাঁশি নিতি নূতন সুরে।

র১ । র১ গ১ গপ১ । প৩ । —১ —২ । প১ প১ ধপ১ । গপ১ মগ১ র১ ।—২
এ ম নি ক রে — তা রো কি কাঁ দে প্রা —

শেষ।

সন্১ । ন্১ স১ র১ । গ১ ম১ প১ । মীপ১ মীধ১ প১ । পধপ১ মগ১ রগর১ ।
ণ আ মা রো — — — — — ত রে — —

সন্১ স১ র১ ॥ র১ গ১ গপ১ । প৩ ।—১ প১ প১ । প১ মীপধ১
স খি এ ম নি ক রে — সে থা . জো ছ
স্মৃ তি

ধ১ । ধ১ ধ১ নোধ১ । প১ র্স১ র্সন১ । ধ১ নধ১ প১ । প১ প১ র্স১ ।
না র জ নী ম্লা ন কি স জ নী এ ম নি
র মি ল নে বি র হ বে দ নে এ ম নি

নর্স১ ধনধ১ প১ । গমগ১ র১ প১ । ম১ গ২ । —১ সন্স১ র১ ॥
তা হা বো ন য ন লো রে— — এ
স জ নি আ কু ল সে কি— — —

(আ—প্র)

মগ১ র১
ঐ —
[র২ র১ । র১ র১ র১ । —৩ । র১ ম১ মগ১ । র১ গর১ স১
ঐ দু টি তা রা — আ প না তে হা রা

{ —২ রগম১ | — — }]—৩ । র১ গ১ ম১ । প১ প১ মপধ১ । পমগ১ র১ গ১ । ম১
— শু নি ছে কি তা রো — — — বি

র র্স১
প১ মপ১ । ধনোধ১ প২ । —৩ [ন১ ন১ ন১ । ধনর্স১ র্স১ স১
র হ — গা ন মা লা গা ছি গ —

—৩ । র্স১ র্স১ র্স । নর্সর১ র১ র১ । —২ গর্স১ ।]
— তে ম নি কি দো লে — —

র্স১ র১ র্স১ । নো১ নোধ১ প১ । প১ ধ১ প১ । মগর১ গস১ র১ ॥
শু কা নো ত বু কি তে ম নি মা ন এ

(আ—প্র)

ম১ ম১ গ১ । র২ র১ । র৩ । —৩ । র১ ম১ প১ । নোধ১ প১ ধ১ ।
বু কে ধ রে চে পে — উ ঠে কেঁ পে — কেঁ

প৩ ।—১ রস১ ন্১ । ন্১ স১ রগ১ । মপ১ প১ প১ । ম১ মগ১ র১ । র১ গ১
পে — — — শি হ রে — বা ক ভু অ ধ রে —

ম১ । প৩ ।—৩ ॥ স১ ধ১ ধ১ । ধ১ ধ১ মগ১ । ম১ গমগ১ প১ ।
রা খি — প্রা ণ কেঁ দে ক য় ন য় তা

প১ প২ । প১ প১ পধ১ । ধ১ প১ ম১ । গমগ১ র১ রম১ । ম১ গ২ ।
ত নয় স বি বি স র ণ সে মা য়া পু রে

—১ প১ প১ । [প১ ধ১ ধ১ । পধন১ নধ১ ধ১ । ধর্স১ র্স১ র্সন১ ।
— সে থা [পু রা ত ন ব লে কি ছু না

ধ১ নধ১ প১ ।] —২ পপ১ । প১ পর্স১ র্স১ । নর্স১ ধনধ১ প১ ।
হি ছ লে] — শুধু বা জে বাঁ শী নি তি

গমগ১ র১ রপ১ । ম১ গ২ ।—১ সন্স র১ ॥
নূ ত ন সু রে — — এ

(আ—প্র)

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বাহার—ঠুংরী।

গাও কোকিল বিহঙ্গ কুল
　ফুল কুল পরিমল ঢাল সোহাগে ॥
হাসি ভাষি তমাল বিলাসী
　খেল তমাল সনে নব অনুরাগে ॥
খেল অনিল অরুণ উদিল
　নীল গগন সাজ রঞ্জিত রাগে ॥
শ্যাম বসন পরি সাজ শ্যামা মেদিনী
　শ্যামচাঁদ মম হৃদি মাঝে জাগে ॥

নোধ১

[ধ১ নো১ । প১ ম১ । ম২ । ম২ । ম১ ম১ । প১ প১ । ম২ । মগ২ । ম১
গা — ও কো কি- ল বি হ — ঙ্গ কূ ল ফু

ম১ । ম১ ধ১ । ধ১ ধ১ । ধ১ ধনোধ১ । প১ র্স১ । র্স১ ন১ । ন১ র্স১ । র্স২॥]
ল কু ল প রি ম ল ঢা — ল সো হা — গে

শেষ।

ম২ । ম২ । ম১ প১ । প২ । ম১ গো১ । গো১ ম১ । র২ । স২ । ন২ ।
হা সি ভা — ষি ত মা ল বি লা সী খে
খে লঅ নি — ল অ রু ণ উ দি ল শ্যা

ন১ ন১ । র্স১ র্স১ । ন১ র্স১ । ন১ র্স১ । ন১ র্সর১ । র্স১ নো১ । ধ২॥
ল ত মা ল স নে ন ব অ নু রা — গে
ম ব স ন প রি সা জ শ্যা মা মে দি নী॥

ম২ । ম১ ম১ । প১ প১ । ম১ গ১ । ম১ ধ১ । ধ১ ধনোধ১ প১
নী ল গ গ ন সা জ র — ঞ্জি ত রা
শ্যা ম চাঁ — দ ম ম হৃ দি মা ঝে জা

র্সন১ । র্স২ ॥
— গে
— গে

(আ—প্র)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

শ্রীনগর।

১৪ই মে বৃহস্পতিবার। বেলা প্রায় এগারটার সময় গড়োয়ালের প্রধান নগর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। ভারতবর্ষের উত্তরে দুই শ্রীনগর আছে; এক হচ্ছে ভূস্বর্গ, কবিতা ও কল্পনার চির লীলানিকেতন, সমগ্র হিমালয় প্রদেশের রম্য কুঞ্জকানন কাশ্মীররাজধানী, আর অন্যটি এই গাড়োয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এ শ্রীনগর অবশ্য অনেকটা হীন, কারণ এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বেশী করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোন আয়োজন এখানে হয় নি, কিম্বা মানবের রুচি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে নি; কিন্তু তবু এ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা মহান্ গম্ভীর ভাব আছে, তা শুধু প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করবার জন্যে দাঁড়িয়ে

আছে, মধ্যে গঙ্গা ও অলকনন্দা নির্ম্মল জলপ্রবাহে উপলখণ্ড ধুয়ে চলে যাচ্ছে, দুই একটা যায়গায় বড় বড় প্রস্তরস্তূপ পড়ে তাদের গতি ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে; সেখানে তাদের বেগ বড়ই ভয়ানক, নির্ম্মল তরল প্রবাহ বটে, কিন্তু তাদের গতি কে রোধ কর্ত্তে পারে। নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্ব্বত উপত্যকায় নানা রকমের গাছ, ফুলের গাছ যে কত তার সংখ্যা নেই; কোথাও রাশি রাশি ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, একরাশ সতেজ লতা তাদের জড়িয়ে ধরে—বেশীর ভাগ জায়গা সবুজ পাতায় ঢেকে আশ পাশের দুপাঁচটা গাছকে তাদের "ললিত লতার বাঁধনে" বাঁধবার চেষ্টা কচ্ছে। তার অল্প দূরেই শ্রীনগরের পূর্ব্ব গৌরবের লুপ্ত চিহ্ন পুরণো রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আর স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীন দেবালয়। শ্রীনগরের দৃশ্য শোভার মধ্যে মূলেই বিলাসের ভাব নেই, এখানে আমি এমন একটাও জায়গা দেখিছি ব'লে মনে হয় না যেখানে নদীতীরে, জ্যোৎস্নাপুলকিত, কুসুমসুরভিপ্লাবিত রাত্রে নৈশবায়ুহিল্লোলিত লতাকুঞ্জে নায়ক নায়িকা পরস্পরের কানে তাঁদের হৃদয়াবেগ ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব কর্ত্তে পারেন, সমস্ত স্থানটা যেন যোগীঋষির জপতপের পক্ষেই একান্ত উপযোগী। হৃদয়ে শান্তি আনে, প্রেমের চাঞ্চল্য জাগায় না।

আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ করে একটা ছোট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোতালা ঘরে বাসা নিলুম। হরিদ্বার ছেড়ে ইস্তক যত জায়গা দেখিছি তার মধ্যে শ্রীনগরকেই সহর বলা যায়; পর্ব্বতের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত সমভূমি আর কোথাও দেখিনি। অন্য যে সমস্ত নগর দেখিছি, তার কোনটা পর্ব্বতের গায়ে, কোনটা বা তিনচার বিঘে সমভূমির উপর, কিন্তু শ্রীনগর পনেরো ষোল বিঘে কি তার চেয়েও বেশী সমতল যায়গা দখল করে আছে। বাজারের সমস্ত দোকানই প্রায় কোটাঘর, দোকান বিস্তর, আর সে দোকানে নানা রকম জিনিষ পাওয়া যায়, এমন কি নিকটে আর কোন যায়গায় যে সকল জিনিষ দেখা যায় না এখানে তাও পাওয়া যায়। আর এই জন্যই সমস্ত গাড়োয়ালের লোক এখান থেকে দরকারী জিনিষ কিনে নিয়ে যায়, তবে এদেশের লোকের দরকারী জিনিষের সংখ্যা নিতান্ত কম- লবণ, লঙ্কা, আটা ও কাপড় হলেই সকলের বেশ চলে যায়, এগুলি ছাড়া আর সমস্ত জিনিষই বিলাসের উপকরণ ব'লে সাধারণের বিশ্বাস। বাজারে যে পঞ্চাশ ষাটখানা দোকান আছে তার প্রায় সকলগুলিই হিন্দুর—দুই একখানামাত্র মুসলমানের দোকান; শ্রীনগরের এই দুই একঘর মুসলমান দোকানদার ছাড়া সমস্ত গড়োয়ালে আর মুসলমান অধিবাসী নেই।

শ্রীনগরে পৌঁছে বাসাভাড়া করার পর সেখানে পরিচিত যে দুই একজন লোক ছিলেন তাঁদের কাছে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাঠান গেল; তাঁরা অবিলম্বে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে যথোচিত পীড়াপীড়ি আরম্ভ কল্লেন কিন্তু আমি তাঁদের বল্লুম এখানে আমরা এযাত্রা এক-

নোধ১
[ধ১ নো১। প১ ম১। ম২। ম২। ম১ ম১। প১ প১। ম২। মগ২। ম১
গা — ও কো কি- ল বি হ — ঙ্গ কূ ল ফু

ম১। ম১ ধ১। ধ১ ধ১। ধ১ ধনোধ১। প১ র্স১। র্স১ ন১। ন১ র্স১। র্স২॥]
ল কু ল প রি ম ল ঢা — ল সো হা — গে]

শেষ।

ম২। ম২। ম১ প১। প২। ম১ গো১। গো১ ম১। র২। স২। ন২।
হা সি ভা — ষি ত মা ল বি লা সী খে
খে লঅ নি — ল অ রু ণ উ দি ল শ্যা

ন১ ন১। র্স১ র্স১। ন১ র্স১। ন১ র্স১। ন১ র্সর১। র্স১ নো১। ধ২॥
ল ত মা ল স নে ন ব অ নু রা — গে
ম ব স ন প রি সা জ শ্যা মা মে দি নী॥

ম২। ম১ ম১। প১ প১। ম১ গ১। ম১ ধ১। ধ১ ধনোধ১ প১
নী ল গ গ ন সা জ র — ঞ্জি ত রা
শ্যা ম চাঁ — দ ম ম হৃ দি মা ঝে জা

র্সন১। র্স২॥
— গে
— গে

(আ—প্র)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

শ্রীনগর।

১৪ই মে বৃহস্পতিবার। বেলা প্রায় এগারটার সময় গড়োয়ালের প্রধান নগর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। ভারতবর্ষের উত্তরে দুই শ্রীনগর আছে; এক হচ্ছে ভূস্বর্গ, কবিতা ও কল্পনার চির লীলানিকেতন, সমগ্র হিমালয় প্রদেশের রম্য কুঞ্জকানন কাশ্মীররাজধানী, আর অন্যটি এই গাড়োয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এ শ্রীনগর অবশ্য অনেকটা হীন, কারণ এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বেশী করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোন আয়োজন এখানে হয় নি, কিম্বা মানবের রুচি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে নি; কিন্তু তবু এ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা মহান্ গম্ভীর ভাব আছে, তা শুধু প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করবার জন্যে দাঁড়িয়ে

আছে, মধ্যে গঙ্গা ও অলকনন্দা নির্ম্মল জলপ্রবাহে উপলখণ্ড ধুয়ে চলে যাচ্ছে, দুই একটা যায়গায় বড় বড় প্রস্তরস্তূপ পড়ে তাদের গতি ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে ; সেখানে তাদের বেগ বড়ই ভয়ানক, নির্ম্মল তরল প্রবাহ বটে, কিন্তু তাদের গতি কে রোধ কর্ত্তে পারে। নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্ব্বত উপত্যকায় নানা রকমের গাছ, ফুলের গাছ যে কত তার সংখ্যা নেই ; কোথাও রাশি রাশি ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, একরাশ সতেজ লতা তাদের জড়িয়ে ধরে—বেশীর ভাগ জায়গা সবুজ পাতায় ঢেকে আশ পাশের দুপাঁচটা গাছকে তাদের "ললিত লতার বাঁধনে" বাঁধবার চেষ্টা কচ্ছে। তার অল্প দূরেই শ্রীনগরের পূর্ব্ব গৌরবের লুপ্ত চিহ্ন পুরণো রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আর স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীন দেবালয়। শ্রীনগরের দৃশ্য শোভার মধ্যে মূলেই বিলাসের ভাব নেই, এখানে আমি এমন একটাও জায়গা দেখিছি ব'লে মনে হয় না যেখানে নদীতীরে, জ্যোৎস্নাপুলকিত, কুসুমসুরভিপ্লাবিত রাত্রে নৈশবায়ুহিল্লোলিত লতাকুঞ্জে নায়ক নায়িকা পরস্পরের কানে তাঁদের হৃদয়াবেগ ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব কর্ত্তে পারেন, সমস্ত স্থানটা যেন যোগীঋষির জপতপের পক্ষেই একান্ত উপযোগী। হৃদয়ে শান্তি আনে, প্রেমের চাঞ্চল্য জাগায় না।

আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ করে একটা ছোট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোতালা ঘরে বাসা নিলুম। হরিদ্বার ছেড়ে ইস্তক যত জায়গা দেখিছি তার মধ্যে শ্রীনগরকেই সহর বলা যায় ; পর্ব্বতের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত সমভূমি আর কোথাও দেখিনি। অন্য যে সমস্ত নগর দেখিছি, তার কোনটা পর্ব্বতের গায়ে, কোনটা বা তিনচার বিঘে সমভূমির উপর, কিন্তু শ্রীনগর পনেরো যোল বিঘে কি তার চেয়েও বেশী সমতল যায়গা দখল করে আছে। বাজারের সমস্ত দোকানই প্রায় কোটাঘর, দোকান বিস্তর, আর সে দোকানে নানা রকম জিনিষ পাওয়া যায়, এমন কি নিকটে আর কোন যায়গায় যে সকল জিনিষ দেখা যায় না এখানে তাও পাওয়া যায়। আর এই জন্যই সমস্ত গাড়োয়ালের লোক এখান থেকে দরকারী জিনিষ কিনে নিয়ে যায়, তবে এদেশের লোকের দরকারী জিনিষের সংখ্যা নিতান্ত কম– লবণ, লঙ্কা, আটা ও কাপড় হলেই সকলের বেশ চলে যায়, এগুলি ছাড়া আর সমস্ত জিনিষই বিলাসের উপকরণ ব'লে সাধারণের বিশ্বাস। বাজারে যে পঞ্চাশ ষাটখানা দোকান আছে তার প্রায় সকলগুলিই হিন্দুর—দুই একখানামাত্র মুসলমানের দোকান ; শ্রীনগরের এই দুই একঘর মুসলমান দোকানদার ছাড়া সমস্ত গড়োয়ালে আর মুসলমান অধিবাসী নেই।

শ্রীনগরে পৌঁছে বাসাভাড়া করার পর সেখানে পরিচিত যে দুই একজন লোক ছিলেন তাঁদের কাছে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাঠান গেল ; তাঁরা অবিলম্বে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে যথোচিত পীড়াপীড়ি আরম্ভ কল্লেন কিন্তু আমি তাঁদের বল্লুম এখানে আমরা এযাত্রা এক-

রাত্রিমাত্র থাক্‌বো, বাসাতেই আহারাদির আয়োজন করেছি অতএব এখন আর কোথাও নড়াচড়া না ক'রে বদরীনারায়ণ হতে ফেরবার সময় এদিক দিয়ে যাব ; এই কথায় বন্ধু-বর্গকে আশুনিবৃত্ত করা গেল। আহার ও বিশ্রামের পর বিকেলে সহর দেখ্‌তে বের হলুম। শ্রীনগরে দর্শনযোগ্য স্থানের বিবরণের আগে—উপক্রমণিকায় তার একটু ইতিহাস দেওয়া দরকার, কারণ ইতিহাসের সঙ্গে তাদের একটু সম্বন্ধ আছে।

অনেকদিন আগে একবার নেপালের রাজা গড়োয়ালরাজ্য আক্রমণ করেন। গড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্ব্বতে পলায়ন করেন ; এই সময় হ'তে গড়োয়াল নেপালেরই অধিকারভুক্ত হয় কিন্তু এই সময়টা এখানে কি রকম শাসন প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছিল তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গে নেপালীদের অত্যাচারের চিহ্ন আজও বেশ দেখা যায়। যাহোক, গড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কল্লেন এবং তাঁদের সাহায্যে গড়োয়াল স্বাধীন হ'লো, কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্দ্ধেক গড়োয়ালের পরিবর্ত্তে ক্রীত হয়েছিল, কারণ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ গড়োয়ালের অনেকখানি অংশ ইংরেজরাজ গ্রহণ করেন ;—এই অংশের নামই "বৃটীশ গড়োয়াল," আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গড়োয়াল, তবে নেপাল বা ভোটের মত স্বাধীন নয় ; যাঁরা অনুগ্রহ ক'রে পরের হাত হ'তে রাজ্য জয় করে দিলেন—আবশ্যক হলে যে তাঁরা তা কেড়ে নিতেও পারেন একথা বলাই বাহুল্য, তবে এ রকম অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা—গড়োয়ালের তা যথেষ্ট আছে ; আর স্বাধীন গড়োয়ালের আর একটু ভরসা এই যে তাতে প্রলোভনের এমন কিছুই নেই যেজন্যে এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্ত্তে রাতারাতিই ইংরেজের টুপী ও ছড়ির আমদানী হ'তে পারে, বরং প্রলোভনের যেটুকু ছিল—সেটুকুর আপদ অনেক আগেই চুকে গেছে, নেপালের কবল হ'তে গড়োয়াল উদ্ধার ক'রে ইংরেজ গড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশটুকই অধিকার করেছেন।

অলকনন্দার পূর্ব্ব পার ইংরেজের অধিকার, পশ্চিম পার গড়োয়াল রাজ্য বা তিহরীর রাজার সীমানা। দেবপ্রয়াগে অলকনন্দা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে সুতরাং গঙ্গার পূর্ব্ব পার ইংরেজের পশ্চিম অংশ তিহরীর রাজার ; কিন্তু হরিদ্বার ও হৃষিকেশ যদিও গঙ্গার পশ্চিম পারে কিন্তু তা ইংরেজের অধিকারে, ওদিকে মসুরী ও ল্যাণ্ডর সহরও ইংরেজের। ল্যাণ্ডরের পূর্ব্বপ্রান্তের একটা রাস্তা হ'তেই তিহরীর সীমানা আরম্ভ। মসুরী ও ল্যাণ্ডর আগে তিহরীর রাজারই ছিল পরে গবর্ণমেণ্ট তা কিনে নিয়েছেন। তিহরীর রাজা মাটীর দরে পর্ব্বতের যে জঙ্গলময় অংশ বেচেছিলেন কে জান্‌তো যে কয়েক বছর পরে সেখানে মহাসমৃদ্ধ দুটি নগর স্থাপিত হবে এবং তা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিলাসীদের জন্য গ্রীষ্মকালের বিরামকুঞ্জে পরিণত হবে ?

নেপালরাজ গড়োয়াল আক্রমণ করার পর—গড়োয়ালরাজ রাজ্য ত্যাগ ক'রে

পলায়ন কল্লে, নেপালীরা অরক্ষিত প্রাসাদ ও সুরম্য রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট ক'রে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গড়োয়াল পুনর্বিজিত হ'লো তখন গড়োয়া-লের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরে এলেন না, তিনি শ্রীনগর হ'তে বত্রিশ মাইল উত্তরপশ্চিমে অলকনন্দার অপর পারে তিহরীতে পলায়ন ক'রেছিলেন,—সেই যায়গাটা সুন্দর ও সুরক্ষিত দেখে সেখানেই তিনি বাস কর্ত্তে লাগলেন। শ্রীনগর ইংরেজ রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হ'য়ে বৃটীশ গড়োয়ালের প্রধান নগররূপে পরিণত হলো। তা হ'লো বটে কিন্তু ইংরেজের কাছারী সেখানে রৈল না; শ্রীনগর হতে ৬ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে "পাউড়ি"তে কমিশনর সাহেবের পীঠস্থান হলো,—একটা রেজিমেণ্টের আড্ডা পড়লো এবং আফিস আদালত সমস্তই সেখানে স্থাপিত হলো, কেবল ডাক্তারখানা শ্রীনগরে। "পাউড়ী"র কাছারী বাড়ী ও সাহেবদের বাড়ী তৈয়েরীর জন্যে গড়োয়াল রাজের বহুমূল্য সুন্দর প্রাসাদের অনেক ভগ্নাবশেষ সেখানে চালান হয়েছে, "পাউড়ী"তে একবার যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে যাওয়া হয়নি।

আমার বন্ধু পণ্ডিত হরিকিষণ অপরাহ্ণে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই ডাক্তার খানায় গেলেন। ডাক্তার খানায় অনেকগুলি রোগী দেখা গেল; ডাক্তারবাবু বাঙ্গালী কায়স্থ, বাড়ী কলিকাতায়, বাগবাজারে। তিনি এখানে সপরিবারেই বাস কচ্চেন। এই পর্ব্বতের মধ্যে একঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোক গৃহস্থ দেখে ভারি প্রীতি হলো; তাঁর সুন্দর, প্রফুল্ল ছেলে-মেয়েগুলি দেখে বোধ হ'ল আমরা আবার যেন বাঙ্গালা দেশে ফিরে এসেছি। ডাক্তার বাবু আমাদের যথেষ্ট যত্ন কল্লেন, এবং তাঁর বাসাতেই থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ কল্লেন। তাঁর যত্ন ও আগ্রহে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে ডাক্তারখানা পরিদর্শন কর্ত্তে বের হলুম; গবর্ণমেণ্টের সাধারণ ডাক্তার খানায় রোগী সম্বন্ধে সচরাচর যেরকম বন্দোবস্ত হয়ে থাকে এখানেও সেই চিরাগত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। সুতরাং সেখানে আর বেশী সময় না কাটিয়ে পুরাণো রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি সে এক লঙ্কাদগ্ধের ব্যাপার, রাশি রাশি ইট আর পাথর স্তূপাকারে পড়ে আছে,—আর যদি দুই এক বছর পরে কোন পর্য্যটক এখানে আসে ত এই স্তূপাকৃত ইট পাথরকে সুশ্যামল শৈবাল সজ্জিত দেখে একটা ছোট খাট গিরিশৃঙ্গ বলে মনে ক'রবে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেয়াল গুলো হাঁ করে রয়েছে, তার খানিকটে তফাতে একটা পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার—বহুকাল হতে এমনি অসহায় অবস্থায় ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধে ক'রে কাৎ হ'য়ে পড়েছে এবং এই অবস্থাতেই আরো কয়েক বছর ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করার দুঃসাহস প্রকাশ কচ্চে। একধারে একটা ভাঙ্গা মন্দির, বহুদিন আগে তার দরজা জোড়া একদল ধর্ম্মধ্বজী নেপালী এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে, বোধ করি তা দিয়ে বুদ্ধদেবের কোন মন্দিরের সিঁড়ী তৈয়েরী হয়েছে। আমরা সেই পুরাণো রাজবাড়ী ঘুরেফিরে দেখতে লাগলুম, অনেক দূরে একটা

বড় মন্দির, পাথরে নানা রকমের দেবদেবীর মূর্ত্তি, সমস্ত হিন্দুদেবমূর্ত্তি কিনা ঠিক বুঝতে পারলুম না,—বুঝবার জন্যে তেমন চেষ্টাও করিনি ; একটা যায়গায় দেখলুম শ্রীযুৎ গজানন মহাশয়—তিনিই দেবতাকুলে সব চেয়ে নিরীহ—হস্তচতুষ্টয়ে গদা ও তীরধনুক নিয়ে মহাতেজে অগ্রসর হচ্ছেন,—এই নিরীহ কেরাণী দেবতাটির এই যুদ্ধ সাজ বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল ; মহাভারতে ত কোথাও গণেশের এতটা বীর পরাক্রম প্রকাশের কারণ উল্লেখ দেখা যায় না. তবে যদি অন্য কোন পুরাণে এসম্বন্ধে কিছু থাকে তাহলে একটা কথা বটে। কতকগুলি দেবতার চেহারা চক্ষে একটু নূতন ঠেকলো, তেত্রিশকোটীর মধ্যে হতে তাঁদের চিনে নেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন ব্যাপার—তবে এটা মনে হলো যে যদি সেগুলি হিন্দু দেবমূর্ত্তি না হয় তবে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি হবে, কারণ নেপালীরা যখন এখানে ছিল তখন তারা যে দুই এক যায়গায় নিজেদের ভাস্কর বিদ্যা প্রকাশ করে নি এ কখন সম্ভব নয়। একটা চক এখনো বর্ত্তমান আছে, শুনলুম তার ভিতর সাপ ও বাঘ ভাল্লুকের চিরস্থায়ী আড্ডা হয়েছে। দেখলুম তার ফুকোরের মধ্যে রাজ্যের পাখী বাসা করেছে, আর ভিতের দুই একটা ফাটল দিয়ে বড় বড় অশ্বথ গাছ মাথা তুলেছে। এই সমস্ত দেখে শুনে চকের মধ্যে আর প্রবেশ কর্ত্তে সাহস হ'লো না।

চকের সমুখেই নহবতখানা। এটা এখনো ঠিক আছে, কোন দিক আজও ভেঙ্গে পড়ে নি ; আমাদের সঙ্গী একটা ছোকরা ভিতরে গিয়ে কোন্ দিক দিয়ে একেবারে নহবতের চূড়ায় উঠে বসল। শুনা গেল উপরে উঠবার রাস্তা সহজে চিনে নেবার যো নেই, যারা সে রাস্তা বেশ চেনে তারাই সহজে উপরে উঠতে পারে। আবার তার ভিতরে হারানও নাকি খুব সহজ, কিন্তু তাতেও আমরা উপরে উঠবার ঝোঁক ছাড়ি নি, শেষে যখন শুনলুম তার ভিতর বহুজাতীয় সর্পবংশের নির্বাধ বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হচ্ছে তখন আমাদের সেই প্রবল ঝোঁক অবিলম্বে ছেড়ে গেল। বেলা যায় যায়, সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ এসে প্রাসাদের ছাদহীন উন্মুক্ত প্রাচীরের গায়ে হেলে পড়েছে ;—চোখে বড় খট্‌কা লাগ্‌লো, এই অতীত কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও মনুষ্য গৌরবের অসারতার চিহ্নের উপর অমানিশার গাঢ়ান্ধকার যবনিকাই সম্পূর্ণ উপযোগী।

এখান হতে আমরা কেদারনাথ মহাদেব দেখতে গেলুম, কাশীর বিশ্বেশ্বরের আকার ও কেদারনাথের আকার অনেকটা একরকম, একটির অনুকরণে যেন আর একটি তৈয়েরী হয়েছে কিন্তু কোন্‌টি "ওরিজিনাল" তা স্থির করা বড় কঠিন। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মাথায় কলসী বা ঘটি করে জল ঢাল্‌তে হয়, কিন্তু এখানে কেদারনাথের মাথায় হিমালয় একটি ঝরণা উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তা হতে অবিরাম অবিশ্রাম জল পড়ে কেদারনাথের মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। কেদারনাথের মন্দির অলকনন্দার ঠিক উপরে ; মন্দিরের কোন রকম জাঁকজমক নেই, কাছেই একঘর সেবাইতের বাড়ী, তার অবস্থা

দেখেই কেদারনাথের আর্থিক অবস্থা বেশ অনুমান করে নিলুম, উভয়েই দেখলুম কোন উপায়ে দুর্ভিক্ষের হাত হতে আত্মরক্ষা করে আপনাদের সম্মান ঘোষিত কচ্ছেন। এখান হ'তে ফিরে বাজারে এলুম, দেখ্‌লুম ভিন্ন ভিন্ন দোকানে নানারকম জিনিষ খরিদ বিক্রী হচ্ছে। আমরা সন্ন্যাসী বটে কিন্তু তাই ব'লে ভাল জিনিষের প্রলোভন ত্যাগ করার সংযম আদপেই শিখিনি, কাজেই আমাদের খানিকটা সময় জিনিষপত্রের দর দাম কর্ত্তেই কেটে গেলো, বৈরাগ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছি তখনো দর কচ্ছি "না বাপু তিন পয়সা হবে না, দুপয়সা পাবে, দাও।"—এবং দুপয়সায় যখন তা পাওয়া গেল, তখন যেই একজন বল্লে "ওটার এক পয়সা দাম হওয়াই উচিতছিল"—এমনি একপয়সা ঠকিচি মনে করে আমাদের দীর্ঘকালের এত আদরের সন্ন্যাস একটা পয়সার চিন্তাকে জড়িয়ে তার পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজ্‌তে ব্যগ্র হয়ে, উঠ্‌লো। সুধু আমরা নই, এরকম সন্ন্যাসী বিস্তর। আমার মনে পড়ে অনেক দাম দিয়ে আমরা এখানে তিনটে গোল বেগুণ কিনেছিলুম; বাজারে একবার পানের অনুসন্ধান করা গেল কিন্তু তা পাওয়া গেল না; শীত কালে মধ্যে মধ্যে এখানে পানের আমদানী হয়, কিন্তু বছরের অন্য কোন সময়ে তা পাওয়া কঠিন।

এখানকার বাজারের রাস্তাগুলি সমস্তই পাথরে বাঁধান। সব রাস্তাগুলি পরিসরে তেমন বড় নয়, তবে একটা আছে খুব চওড়া। বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ইস্কুল দেখলুম, ইস্কুলটিতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়ান হয়, এটা খৃষ্টান মিসনরীদের স্কুল; ইস্কুলের লাগাও হেড্‌মাষ্টারের বাসা, হেড্‌মাষ্টারের বাড়ী এই দেশেই, আগে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এখন খৃষ্টান হয়েছেন, "ইয়ং বেঙ্গল"দের যে সকল গুণ সচরাচর দেখা যায় এলোকটিতে তার কিছুরই অভাব দেখ্‌লুম না; বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী; তিনি খৃষ্টান বটে কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে তাঁর যে বিশেষ কিছু আস্থা আছে তা বোধহ'ল না, ধর্ম্ম একটা থাকলেই হলো এই রকম যেন তাঁর মনের ভাব; তবু যে কেন তিনি খৃষ্টান হয়েছেন তা আমি বুঝ্‌তে পারলুম না; যদি একটা বিশ্বাস বদলিয়ে নূতন কোন বিশ্বাস অবলম্বন কর্ত্তে হয় ত আমাদের সেই নবাবলম্বিত বিশ্বাসের উপর প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত—যার বলে আমরা পাপ ও অন্যায়ের খানিকটে উপরে উঠতে পারি; তা নাক'রে যদি "যথাপূর্ব্ব তথাপর" রকমেই কাল কাটাই তবে ধর্ম্মমত বদলান যা না বদলানও তাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর মাষ্টারজির নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে বাসায় ফিরে এলুম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় আর "পাদমেকং নগচ্ছামি" ব'লে বসে পড়লেন। চারি দিকে এত সুন্দর দৃশ্য আর চাঁদের উজ্জ্বল শুভ্র আলোতে তা এমন মধুর দেখাচ্ছিল যে এমন চুপ করে ঘরে পড়ে থাকা আমার কিন্তু কিছুতেই পুষিয়ে উঠলো না। পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে আবার বের হয়ে পড়লুম। পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার এই নূতন পরিচয় নয়—কিছু দিন আগে তাঁর সঙ্গে প্রায় এক বৎসর একত্রে কাটিয়েছি।

তাঁর পুরো নাম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ দুর্গাদত্ত রুরোলা। তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ, কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁর কবিত্ব শক্তি অনেক বেশী ছিল, তিনি তাঁর প্রণীত একখানা কবিতাপুস্তক মোক্ষমূলরকে উপহার পাঠিয়েছিলেন, মোক্ষমূলর প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন "আমি যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই প্রকার কবিতার একটি লাইনও লিখিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে জন্ম সফল মনে করিব।"—অবিশ্যি এতে অধ্যাপকবরের যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হয়েছে কিন্তু যাঁর কবিতা প'ড়ে তিনি এরকম একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রতিভাও প্রশংসনীয়। আজ নির্জ্জন পথে এই জ্যোৎস্নারাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের অনেক পুরাণ কথা উঠ্‌লো। পশ্চিমদেশে দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে,—একদল হিন্দু আর একদল আর্য্য; হিন্দুর দল আমাদের দেশের হিন্দুর মত, তাঁদেরও 'হরিসভা' আছে, তবে সে সভার নাম 'ধর্ম্মসভা,' ধর্ম্ম সভা অর্থ "হিন্দুধর্ম্মসভা", কিন্তু আমাদের দেশের হরিসভার অপেক্ষা এই ধর্ম্মসভার আলোচনার প্রসর একটু বিস্তৃততর। আমাদের দেশের হরিসভায় হরিনাম কীর্ত্তন পুরাণাদি পাঠ ইত্যাদিই হয়ে থাকে—বড়জোর বাৎসরিক উৎসবের সময় কোন কোন সনাতন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতা উপলক্ষে সেই পবিত্র সভায় দাঁড়িয়ে অন্যধর্ম্মের বাপান্ত করেন, কিন্তু পশ্চিমের ধর্ম্মসভায় এসমস্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা চলে। 'ধর্ম্মসভার' প্রতিদ্বন্দী সভার নাম "আর্য্যসমাজ"—এই সমাজ দয়ানন্দস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যসমাজীগণ শুদ্ধ বেদের অনুমোদন করে চলেন এবং বেদ অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্মও তাঁরা মানেন না। ইংরেজী লেখাপড়া জানা এবং উদার মতাবলম্বী প্রায় অধিকাংশ লোকই আর্য্য। আর্য্যদের সঙ্গেই আমাদের কিছু বেশী মেশামিশি ছিল; তবে পণ্ডিত হরিকিষণ ধর্ম্মসভার সম্পাদক ও একজন দিগ্বিজয়ী বক্তা হলেও তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুতা হয়েছিল। যখন দেরাদূনে ছিলুম এই দুই দলের তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতার জ্বালায় তিষ্ঠান ভার হ'ত। সে সমস্ত বক্তৃতায় শাস্ত্র কথা তত থাক্ না থাক্ প্রতিপক্ষের উপর তীব্র বাক্য বাণবর্ষণ কর্ত্তে উভয় দলই সমান মজবুদ্। একবার আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই রকম একটা সভায় গিয়ে পড়েছিলুম, সেদিন একপক্ষে আমাদের পণ্ডিতজী বক্তৃতা করবেন—অপর পক্ষে আর্য্য সমাজের একজন প্রচারক বল্‌বেন। সভায় উপস্থিত হ'য়ে দেখি কুরুপাণ্ডবের মত দুদল দুদিকে সার দিয়ে বসে গিয়েছেন; আমরা কোন্ দিকে বসি প্রথমে ত এই ভাবনাতেই অস্থির—শেষে কিছু ঠিক কর্ত্তে না পেরে বক্তার টেবিলের সুমুখে ব'সে পড়লুম। বক্তৃতা হিন্দীতে নয় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে; বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা তর্ক করবার স্পর্দ্ধা রাখেন সংস্কৃতে তাঁদের এতটা দখল থাকাই কর্ত্তব্য, তবে আমাদের বাঙ্গালী প্রচারক মহাশয়েরা সেটা অনাবশ্যক মনে করেন। সভায় প্রথমে এক একজন ক'রে বক্তৃতা কল্লেন—শেষে ব'সে ব'সে উভয় পক্ষে ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হলো, সুর পঞ্চম ছেড়ে সপ্তমে উঠ্‌ল, তার পরেই হাতাহাতির জোগাড়; বেগতিক দেখে আমি

পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব কারণে হঠাৎ সভা ভেঙ্গে গেল, তর্ক কর্ত্তে কর্ত্তে আর্য্যসমাজের একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটা ব্যাকরণ অশুদ্ধ কথা প্রয়োগ ক'রেছিলেন—তাই শুনে হিন্দুসভার দল হোহো ক'রে চীৎকার করে উঠল—এবং হাত তালি দিয়ে "ব্যাকরণ নেহি জান্তা, বেদবিচার করণেকো আয়া"—বলে সভা ভেঙ্গে দিলে। এই রকমে হঠাৎ সভাভঙ্গ না হলে সেদিনকার প্রচার কার্য্য হয়ত শ্রীঘর পর্য্যন্ত পৌছত। এরকম ঘটনা আমাদের দেশেও খুব বিরল নয়। অনেকদিন পরে পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে দেখা হওয়াতে দুই সমাজ কি রকম কাজ কর্‌ছে এসম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম; কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেল—আমরাও এক পা দু পা ক'রে কমলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

কমলেশ্বর শ্রীনগরের খুব নিকটে, এমন কি এক মাইলের মধ্যে। কমলেশ্বরের নাম আগেই শুনেছিলুম, ভেবেছিলুম হয়ত একটা পাহাড়ের উপর একটা শিব মন্দির ছাড়া এখানে আর কিছু নেই, কিন্তু কাছে এসে বুঝলুম এশুধু মন্দির নয়, একটি ছোটখাট রাজবাড়ী। চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সিংহদ্বার, দ্বারে—"ভীষণ মূরতি" দ্বারবান; তাদের মুখে বিনয়ের অভাব এবং উদ্ধত ভাব দেখে স্বতঃই মনে হয় এরা দেবমন্দিরের সংস্পর্শে আসবারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকের ব্যাপার দেখে বুঝলুম এটা কখন সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়,—মঠধারী যদিও সন্ন্যাসী, কিন্তু মন্দিরের ত্রিসীমানায় সন্ন্যাসের কিছুই নজরে পড়ে না। সুতরাং তারকেশ্বর বৈদ্যনাথের মহান্ত মহারাজাদের কথা আমার মনে হলো; তাঁরাও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং যদিও তাঁরা সন্ন্যাসী তবু যে রকম বিলাস লালসা ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁরা চিরজীবন ডুবে থাকেন তাতে তাঁদের সন্ন্যাস ধর্ম্মের বর্ণপরিচয় টুকুও হয় কিনা সন্দেহ। এই কমলেশ্বরের মহান্ত সম্বন্ধেও আমার এই রকম একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু ভিতরের ব্যাপার জানবার জন্যে আমার বিশেষ কৌতুহলও হলো। আমরা সিংহদ্বার পার হয়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বিতল চকের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলুম; সেই প্রাঙ্গনের এক পাশে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত পিতল ও লোহার গরাদে দেওয়া এক অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির, মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিঙ্গ মূর্ত্তিতে বিরাজমান, মন্দিরের বাইরে একটা প্রকাণ্ডকায় পিতলের ষাঁড়। প্রাঙ্গনটি পাথরে বাঁধান, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অতিথি অভ্যাগত ও যাত্রীদলে সেই প্রাঙ্গণ এবং টানা বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ; আমরা গিয়ে শুনলুম আরতির সময় হয়েছে তাই এত জনতা। অন্যান্য দর্শকের মত আমরাও একপাশে দাঁড়ালুম; অবিলম্বে ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হলো।

হঠাৎ চারিদিকে "তফাৎ তফাৎ" শব্দ পড়ে গেল। বুঝলুম মহান্ত বাবাজী আস্‌ছেন, তার আগে তিনচার জন চাকর উগ্রমূর্ত্তিতে দর্শকদের তফাৎ কর্ত্তে লাগলো। একজন বৃদ্ধা একটী ছোট ছেলের হাত ধ'রে আরতি দেখ্‌তে এসেছিল, মহান্ত বাবাজীর পরিচারকের ধাক্কায় ছেলেটি দর্শকদের পায়ের তলায় প'ড়ে গেল, বৃদ্ধা ভয়ে চীৎকার করে

তাঁর পূরো নাম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ দুর্গাদত্ত ক্বরোলা। তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ, কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁর কবিত্ব শক্তি অনেক বেশী ছিল, তিনি তাঁর প্রণীত একখানা কবিতাপুস্তক মোক্ষমূলরকে উপহার পাঠিয়েছিলেন, মোক্ষমূলর প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন "আমি যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই প্রকার কবিতার একটি লাইনও লিখিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে জন্ম সফল মনে করিব।"—অবিশ্যি এতে অধ্যাপকবরের যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হয়েছে কিন্তু যাঁর কবিতা প'ড়ে তিনি এরকম একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রতিভাও প্রশংসনীয়। আজ নির্জ্জন পথে এই জ্যোৎস্নারাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের অনেক পুরাণ কথা উঠ্‌লো। পশ্চিমদেশে দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে,—একদল হিন্দু আর একদল আর্য্য; হিন্দুর দল আমাদের দেশের হিন্দুর মত, তাঁদেরও 'হরিসভা' আছে, তবে সে সভার নাম 'ধর্ম্মসভা,' ধর্ম্ম সভা অর্থ "হিন্দুধর্ম্মসভা", কিন্তু আমাদের দেশের হরিসভার অপেক্ষা এই ধর্ম্মসভার আলোচনার প্রসর একটু বিস্তৃততর। আমাদের দেশের হরিসভায় হরিনাম কীর্ত্তন পুরাণাদি পাঠ ইত্যাদিই হয়ে থাকে—বড়জোর বাৎসরিক উৎসবের সময় কোন কোন সনাতন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতা উপলক্ষে সেই পবিত্র সভায় দাঁড়িয়ে অন্যধর্ম্মের ব্রাপান্ত করেন, কিন্তু পশ্চিমের ধর্ম্মসভায় এসমস্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা চলে। 'ধর্ম্মসভার' প্রতিদ্বন্দী সভার নাম "আর্য্যসমাজ"—এই সমাজ দয়ানন্দস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যসমাজীগণ শুদ্ধ বেদের অনুমোদন করে চলেন এবং বেদ অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্মও তাঁরা মানেন না। ইংরেজী লেখাপড়া জানা এবং উদার মতাবলম্বী প্রায় অধিকাংশ লোকই আর্য্য। আর্য্যদের সঙ্গেই আমাদের কিছু বেশী মেশামিশি ছিল; তবে পণ্ডিত হরিকিষণ ধর্ম্মসভার সম্পাদক ও একজন দিগ্বিজয়ী বক্তা হলেও তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুতা হয়েছিল। যখন দেরাদূনে ছিলুম এই দুই দলের তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতার জ্বালায় তিষ্ঠান ভার হ'ত। সে সমস্ত বক্তৃতায় শাস্ত্র কথা তত থাক্ না থাক্ প্রতিপক্ষের উপর তীব্র বাক্য বাণবর্ষণ কর্ত্তে উভয় দলই সমান মজবুদ্‌। একবার আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই রকম একটা সভায় গিয়ে পড়েছিলুম, সেদিন একপক্ষে আমাদের পণ্ডিতজী বক্তৃতা করবেন—অপর পক্ষে আর্য্য সমাজের একজন প্রচারক বল্‌বেন। সভায় উপস্থিত হ'য়ে দেখি কুরুপাণ্ডবের মত দুদল দুদিকে সার দিয়ে বসে গিয়েছেন; আমরা কোন্ দিকে বসি প্রথমে ত এই ভাবনাতেই অস্থির—শেষে কিছু ঠিক কর্ত্তে না পেরে বক্তার টেবিলের সুমুখে ব'সে পড়লুম। বক্তৃতা হিন্দীতে নয় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে; বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা তর্ক করবার স্পর্দ্ধা রাখেন সংস্কৃতে তাঁদের এতটা দখল থাকাই কর্ত্তব্য, তবে আমাদের বাঙ্গালী প্রচারক মহাশয়েরা সেটা অনাবশ্যক মনে করেন। সভায় প্রথমে এক একজন ক'রে বক্তৃতা কল্লেন—শেষে ব'সে ব'সে উভয় পক্ষে ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হলো, সুর পঞ্চম ছেড়ে সপ্তমে উঠ্‌ল, তার পরেই হাতাহাতির জোগাড়; বেগতিক দেখে আমি

পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব কারণে হঠাৎ সভা ভেঙ্গে গেল, তর্ক কর্ত্তে কর্ত্তে আর্য্যসমাজের একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটা ব্যাকরণ অশুদ্ধ কথা প্রয়োগ ক'রেছিলেন—তাই শুনে হিন্দুসভার দল হোহো ক'রে চীৎকার করে উঠ্‌ল—এবং হাত তালি দিয়ে "ব্যাকরণ নেহি জান্তা, বেদবিচার করণেকো আয়া"—বলে সভা ভেঙ্গে দিলে। এই রকমে হঠাৎ সভাভঙ্গ না হলে সেদিনকার প্রচার কার্য্য হয়ত শ্রীঘর পর্য্যন্ত পৌছত। এরকম ঘটনা আমাদের দেশেও খুব বিরল নয়। অনেকদিন পরে পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে দেখা হওয়াতে দুই সমাজ কি রকম কাজ কর্‌ছে এসম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম; কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেল—আমরাও এক পা দু পা ক'রে কমলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

কমলেশ্বর শ্রীনগরের খুব নিকটে, এমন কি এক মাইলের মধ্যে। কমলেশ্বরের নাম আগেই শুনেছিলুম, ভেবেছিলুম হয়ত একটা পাহাড়ের উপর একটা শিব মন্দির ছাড়া এখানে আর কিছু নেই, কিন্তু কাছে এসে বুঝলুম এশুধু মন্দির নয়, একটি ছোটখাট রাজবাড়ী। চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সিংহদ্বার, দ্বারে—"ভীষণ মূরতি" দ্বারবান; তাদের মুখে বিনয়ের অভাব এবং উদ্ধত ভাব দেখে স্বতঃই মনে হয় এরা দেবমন্দিরের সংস্পর্শে আসবারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকের ব্যাপার দেখে বুঝলুম এটা কখন সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়,—মঠধারী যদিও সন্ন্যাসী, কিন্তু মন্দিরের ত্রিসীমানায় সন্ন্যাসের কিছুই নজরে পড়ে না। সুতরাং তারকেশ্বর বৈদ্যনাথের মহান্ত মহারজাদের কথা আমার মনে হলো; তাঁরাও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং যদিও তাঁরা সন্ন্যাসী তবু যে রকম বিলাস লালসা ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁরা চিরজীবন ডুবে থাকেন তাতে তাঁদের সন্ন্যাস ধর্ম্মের বর্ণপরিচয় টুকুও হয় কিনা সন্দেহ। এই কমলেশ্বরের মহান্ত সম্বন্ধেও আমার এই রকম একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু ভিতরের ব্যাপার জানবার জন্যে আমার বিশেষ কৌতূহলও হলো। আমরা সিংহদ্বার পার হয়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বিতল চকের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলুম; সেই প্রাঙ্গনের এক পাশে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত পিতল ও লোহার গরাদে দেওয়া এক অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির, মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিঙ্গ মূর্ত্তিতে বিরাজমান, মন্দিরের বাইরে একটা প্রকাণ্ডকায় পিতলের ষাঁড়। প্রাঙ্গনটি পাথরে বাঁধান, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অতিথি অভ্যাগত ও যাত্রীদলে সেই প্রাঙ্গণ এবং টানা বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ; আমরা গিয়ে শুনলুম আরতির সময় হয়েছে তাই এত জনতা। অন্যান্য দর্শকের মত আমরাও একপাশে দাঁড়ালুম; অবিলম্বে ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হলো।

হঠাৎ চারিদিকে "তফাৎ তফাৎ" শব্দ পড়ে গেল। বুঝলুম মহান্ত বাবাজী আস্‌ছেন, তাঁর আগে তিনচার জন চাকর উগ্রমূর্ত্তিতে দর্শকদের তফাৎ কর্ত্তে লাগলো। একজন বৃদ্ধা একটী ছোট ছেলের হাত ধ'রে আরতি দেখ্‌তে এসেছিল, মহান্ত বাবাজীর পরিচারকের ধাক্কায় ছেলেটি দর্শকদের পায়ের তলায় প'ড়ে গেল, বৃদ্ধা ভয়ে চীৎকার করে

উঠ্‌ল, সেই ছেলেটিই তার অন্ধের নয়ন, বার্দ্ধক্যের যষ্টি। পরিচারকের এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখে, মহান্ত বাবজী যে কিছু অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হলেন তা বোধ হ'লো না। তিনি কমলেশ্বরের সেবাইত—তাঁর পথের সম্মুখে দাঁড়ালে—এরকম দু পাঁচটা খুন জখম হওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান্তের এরকম ভাব দেখে আমার মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল; পুরোহিত রঘুপতির অস্ফালন ও স্পর্দ্ধায় নিরাশ ক্ষুব্ধ গোবিন্দ-মাণিক্যের মত আমারো মনে হ'লো—

"এ সংসারে বিনয় কোথায় ? মহাদেবি,
যারা করে বিচরণ তোমার চরণ-
তলে, তারাও শেখেনি কত ক্ষুদ্র তারা !
তোমার মহিমা হরণ করিয়া লয়ে
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার !"

যাহোক যখন এসেছি তখন শেষ পর্য্যন্তই দেখে যাই ঠিক করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মহান্ত প্রথমে কমলেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম কল্লেন, তারপর যতক্ষণ আরতি হ'লো ততক্ষণ ধ'রে মন্দির প্রদক্ষিণ কল্লেন, অন্যান্য অনেক দর্শকও দূরে থেকে মন্দির প্রদক্ষিণ কর্ত্তে লাগলো। আরতি শেষ হ'লে মহান্ত ভিতরে প্রবেশ কল্লেন। পণ্ডিতজী বল্লেন মহান্ত এখন বৈকঠখনায় যাবেন—সেখানে আমাদের যাওয়ারও কোন আপত্তি নেই; সুতরাং আমরাও তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম একটা প্রকাণ্ড ফরাস বিছান আছে—এক পাশে একটা উঁচু গদী ও তাকিয়া, খুব কারুকার্য্য খচিত এবং বেশ সুকোমল; বুঝলুম মহান্ত মহাশয়ের সেইটিই আসন,—সন্ন্যাসীর উপযুক্ত আসনই বটে !

আমরা যে সময় বৈঠকখানায় গেলুম তখন মহান্ত মহাশয় হাত মুখ ধুতে বারান্দায় গিয়েছিলেন, আমরা ব'সে ব'সে ভিতরের দিকের আর একটা খুব জমকালো চক দেখ্‌লুম, সেটা মহান্তের অন্তঃপুর। এই অন্দরে অবশ্য তাঁর পরিবারাদি কেউ নেই, সেখানে তাঁর শয়নকক্ষ, বিশ্রাম কক্ষ ইত্যাদি আছে। অন্যান্য অনেক মহান্তের ন্যায় কমলেশ্বরের মহান্তেরাও চিরকুমার থাকেন, মৃত্যুকালে চেলাদের মধ্যে কাকেও উত্তরাধিকারী করে যান। বর্ত্তমান মহান্তের বয়স পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে বলে বোধ হ'ল, দেখ্‌তে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কোন মঠের মহান্তকেই ত এ পর্য্যন্ত কাহিল দেখলুম না; মহাদের সেবাইৎও ষণ্ড উভয়েই চিরকাল দিব্য সুগোল দেহ। কথাবার্ত্তায় মহান্তজী মন্দ নন,—আমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন, বাঙ্গালা দেশ ভাল কি এদেশ ভাল এ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশীজি গিয়েছিলেন—সেখানে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল সে কথাও বল্লেন। তারপর তিনি নানা রকমের গল্প আরম্ভ কল্লেন—খোসামুদেরাও খুব প্রতিধ্বনি কর্ত্তে লাগলো, দেখলুম বাবাজীর আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্ভক্তি আমাদের চেয়ে বড় জেয়াদা

নয়, অন্ততঃ কথাবার্ত্তায় ত এই রকমই বোধ হ'ল। যিনি সব ছেড়ে শুধু শ্মশান ও ভস্ম মাত্র সার করেছিলেন, তাঁর সেবাইতের এরকম বিলাসপ্রিয়তা, এরকম মোসাহেবের দল এবং এই প্রকার রাজভোগ কতটা ন্যায়সঙ্গত সে বিষয়ের বিচার বাহুল্য। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে মনটা খাঁটী ও নির্লিপ্ত রাখায় বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে সে কাজটা বোধ হয় বিশেষ শক্ত। চারিদিকের অগণ্য স্তুতিবাদ ও দেশবিদেশ হ'তে প্রেরিত বহুমূল্য উপহার সামগ্রীর যথেচ্ছব্যবহার যথার্থ বৈরাগ্যাবলম্বী সন্ন্যাসীর কখনই প্রীতিকর নয়। কমলেশ্বরের মহান্তকে দেখে তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত সমালোচনা আমার মাথায় আস্‌ছিল। তিনি কি জানতেন যে চারিদিক হতে যখন তাঁর কথার প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে এবং তাঁর অনুচরগণ শত মুখে তাঁর মহিমাকীর্ত্তন কচ্ছে সে সময়ে তাঁরই গৃহ প্রান্তে ব'সে একজন প্রবাসী অতি রূঢ়ভাবে তাঁর বিষয়ে আলোচনা কচ্ছিল?—আমিও জানতুম না যে আমার সেই অসংযত সমালোচনা আজ কাগজে বের হয়ে অনেকের সম্মুখে উপস্থিত হবে।

যাহোক মহান্ত বাবাজীর সেই সমস্ত বাজে গল্প ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক শোনা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। আমি পণ্ডিতজীকে ইসারা ক'রে উঠ্‌বার জন্যে বল্লুম। আমাদের উঠ্‌বার উপক্রম দেখে মহান্তজী প্রসাদ পাবার জন্যে অনুরোধ কল্লেন, কিন্তু আমার সঙ্গে আরো লোক আছেন, তাঁরা হয়ত খাবার প্রস্তুত ক'রে আমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন এই রকম একটা কথা ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম; বাস্তবিক সেখানে প্রসাদ পাবার তেমন কিছু প্রলোভন ছিল না কারণ পণ্ডিতজী অপরাহ্নে এমন এক সিধে পাঠিয়ে ছিলেন যে তাতে আমাদের পাঁচদিন বেশ সমারোহ ক'রে চল্‌তে পারে। এর উপরে আবার আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ দেখা কর্ত্তে এসে যথেষ্ট মিষ্টান্ন উপহার দিয়ে গিয়েছেন; আমার সঙ্গী বৈদান্তিক ভায়া পৃথিবীটা মায়াময় ব'লে নস্যাৎ কর্ত্তে সম্পূর্ণ রাজী, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিদ্যমান মিষ্টান্নগুলি মায়াময় ব'লে ত্যাগ কর্ত্তে কিছুতে রাজী হন নি, বৈদান্তিকের দন্তের ক্রিয়া দেখে আমিও অবাক্! আমার ভয় হয়েছিল সন্দেশগুলো বৈদান্তিকের যথেষ্ট মুখরোচক হলেও তাঁর পাকযন্ত্র সেগুলো হয় ত খুব সমাদরে গ্রহণ করবে না।

কমলেশ্বর মন্দির হতে যখন বাসায় ফিরলুম তখন অনেক রাত হয়েছে। বাসায় এসে দেখি সেখানে দলে দলে লোক জমে গিয়েছে, আর পূজনীয় স্বামীজি সেখানে তুলসীদাসের পদ ব্যাখ্যা কচ্চেন। পাউড়ী হ'তে একজন বন্ধুর আসবার কথা ছিল, তিনি তখনও এসে পৌছন নি, সুতরাং পরদিন তাঁর জন্যে শ্রীনগরে অপেক্ষা করবো কিনা এই ভাবতে লাগলুম, এবং, শেষে আর একদিন শ্রীনগরে থাকাই স্থির কল্লুম।

১৫ই মে শুক্রবার।—আজ শ্রীনগরে অবস্থিতি। সকাল কি দুপুরে কোথাও বের হই নি, বিকেলে নদী পার হয়ে অপর পারে পাহাড় বেড়িয়ে এলুম। দর্শনযোগ্য

বিশেষ কিছু নেই, দু তিনটে ভগ্নপ্রায় শিব মন্দির দেখা গেল, পাহাড়ের উপরই মন্দির—খুব প্রাচীন, পাহাড়ের নাম ইন্দ্রাকিল পাহাড়। শ্রীনগরের গায়ে যে পাহাড় তার নাম অষ্টাবক্র পর্ব্বত। স্থানীয় লোকের মুখে শুনলুম অষ্টাবক্র মুনি এই পর্ব্বতে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তপস্যার উপযুক্ত স্থান তার আর সন্দেহ নেই কিন্তু অষ্টাবক্র ঠাকুরের আশ্রম বা তপোবন ছিল তা বিশেষ চেষ্টা করেও জান্‌তে পারি নি; কারও কারও মত এই যে যেখানে ইংরেজরা 'পাউরী' নগর স্থাপিত করেছেন সেখানেই অষ্টাবক্র মুনির গুহা ছিল। এখানকার রাজকার্য্য করবার জন্য একজন "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" আছেন—আমাদের দেশে মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর এবং পুলিসের যে কাজ তা এই সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের হাতে। এতদ্ভিন্ন এখানে চারজন ডেপুটী ও চারজন তহসিলদার অর্থাৎ সবডেপুটী আছেন। এ ছাড়া কাজ বেশী পড়লে সময় সময় বাহিরের লোকও নেয়া হয়। অন্যান্য আফিসের মত পাউড়ীতে একটা টেলিগ্রাফ্‌ আফিসও আছে;' এক কথায় এই সুদূর এবং দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে ইংরেজ তাদের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আরাম বিরাম এবং আবশ্যকের জন্য যতটুকু দরকার সব ঠিকঠাক করে নিয়ে বেশ নিরুদ্বেগে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে।

শ্রীজলধর সেন।

প্রত্যুত্তর।

গত আষাঢ়ের ভারতীতে মৃণ্ময়ী সমালোচনার যে "প্রতিবাদ" প্রকাশিত হইয়াছে তদুত্তরে দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। স্থল বিশেষে প্রবন্ধটী "মৃণ্ময়ী সমালোচনার" প্রতিবাদ না হইয়া "মৃণ্ময়ী" গ্রন্থেরই প্রতিবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে সমালোচনার প্রতিবাদে ব্যক্তিগত ভাবে যে কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে।

প্রতিবাদকারী লিখিয়াছেন "অপূর্ব্ববাবু লিখিয়াছেন—'ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্পর্কে তাহা (উন্নতিলাভ) বলিতে গেলে বাতুলতা প্রকাশ হইবে।' ইহা অতি যথার্থ কথা।"—আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা এই "হিন্দুজ্যোতিষ যদিও ভাস্করাচার্য্যের পর প্রায় কিছুমাত্রই উন্নতিলাভ করে নাই, কিন্তু ইয়ূরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্পর্কে তাহা বলিতে গেলে বাতুলতা প্রকাশ পাইবে।" এস্থলে 'তাহা' শব্দটীর পুরোশব্দ কি 'উন্নতিলাভ' হইবে অথবা 'কিছুমাত্রই উন্নতিলাভ করে নাই' এই অংশটুকু হইবে তাহা বিচারসাপেক্ষ হইতে পারে। কিন্তু কানাই বাবু যে অর্থ করিয়াছেন আমি সে অর্থে উহা ব্যবহার করি নাই; এবং পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে ভাষাদৃষ্টে আমার অর্থ অযৌক্তিক হয় নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কানাইবাবুর মন্তব্যটী কি আমার অর্থানুযায়ী অথবা তিনি নিজে যে অর্থ করিয়াছেন তদনুযায়ী ? যদি তাঁহার নিজ অর্থের উপর ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি আত্মপ্রতারিত হইয়াছেন।

'হিন্দুজ্যোতিষী যে সূক্ষ্ম গণনা করিতে অপারগ' তাহা কেহই বলে নাই ; বিশেষতঃ আমি ত তাহা কখনই বলি নাই। কারণ আমি হাতে কলমে ঐ সূক্ষ্মগণনার পরিচয় দিয়া দেখাইয়াছি। (জৈষ্ঠের 'ভারতী'—১০৩।৪ পৃষ্ঠা, ১০৬।৭ পৃষ্ঠা ও ১১০ পৃষ্ঠা দেখ।) কাজেই ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদে যদি কোন কথা উক্ত হইয়া থাকে তবে তাহা অপ্রাসঙ্গিক, এবং "বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত" না হইলেও "ভ্রমবশতঃ সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে।"

আমি যে হিন্দুজ্যোতিষ অতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করি নাই তাহা আদৌ স্বীকার করিয়া নিতেছি ; আমি কেবল মাত্র "সূর্য্য সিদ্ধান্ত," এবং ভাস্কর প্রণীত "গোলাধ্যায়" ও "গণিতাধ্যায়" গ্রন্থদ্বয় এবং তাহাদের টীকা সম্বলিত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" এই কয়খানা মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিতে সক্ষম হইয়াছি। তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতেছি যে গ্রন্থকারের জীবনকাল ও গ্রন্থের প্রণয়নকাল নির্দ্ধারণ করাপেক্ষা গ্রন্থোক্ত বিষয় সমূহের সূক্ষ্ম ও গণিতপ্রতিপন্ন সত্য মীমাংসার তত্ত্বোদ্ঘাটন করাই আমার অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

কানাইবাবু আরও লিখিয়াছেন যে আমার যদি পুরাতন হিন্দুজ্যোতিষ অধীত থাকিত তবে আমি "বর্ত্তমান সমালোচনায় ইউরোপীয় জ্যোতিষের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন মনে" করিতাম, "কেন না ইউরোপীয় জ্যোতিষ যে দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা কে না জানে ?"—কারণটী আমার কাছে এখনও সুস্পষ্ট না হওয়াতে আমি এখনও আমার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতে পারিতেছি না। ইয়ূরোপীয় জ্যোতিষ দিন দিন উন্নতিপথে কত অগ্রসর হইতেছে তাহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে এখনও সক্ষম হইতেছি না বলিয়াই তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, এবং মৃণ্ময়ী গ্রন্থে ইয়ূরোপীয় জ্যোতিষের প্রসঙ্গ উঠাইয়া তাহার সহিত হিন্দুজ্যোতিষের তুলনা করা হইয়াছে বলিয়াই আমি সহজে মনে করিয়া নিয়াছি যে মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকার এবং পাঠকবর্গের ভিতরে এমত লোক রহিয়াছেন যাঁহারা এখনও ইয়ূরোপীয় জ্যোতিষের উন্নতির মাত্রা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই তাই তাঁহাদিগকে আমার সমশ্রেণীস্থ মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত আপোষে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কানাইবাবুর মতন অনেকেই উক্ত উন্নতির মাত্রাতে জ্ঞানশালী আছেন জানিতে পারিলে আমি সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হইতাম কি না সন্দেহ। আজিও আমি ঐ ভ্রমান্ধকার বিদূরণ করিতে না পারিয়া পুনরায় এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বেণ্টলির মতামতের বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তদুত্তরে কানাইবাবু বলি-

তেছেন যে "কোলব্রুক সাহেব বেণ্টলির লেখার তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া Asiatic Researches এ প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অপূর্ব্ববাবু Royal Societyর Libraryতে কোলব্রুক লিখিত প্রবন্ধ না দেখিয়াই ও প্রকার মত প্রকাশ করিলেন।" Royal Societyর পুস্তকাগারে Asiatic Researches সমস্তই রহিয়াছে কিন্তু আমার মতন হীনজীবীর তাহা গ্রহণে অধিকার পাওয়া দুর্ঘট। যাহা হউক আমি ঐ Researches সমস্তই অন্যত্র পাঠ করিয়াছি এবং কানাইবাবু যাহা জানেন আমি তাহা সমস্তই জ্ঞাত আছি ; তদ্ভিন্ন ইহাও জ্ঞাত আছি যে ঐ বাদানুবাদ সাঙ্গ হইলে পর বেণ্টলি সাহেব "On the Antiquity of Surya Siddhanuta" নামে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাতে প্রতিবাদকারীদের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তৎপর বেণ্টলির মত খণ্ডন করিয়া আর কেহ কোন প্রবন্ধ লেখেন নাই। আমার অবগতির জন্য কানাইবাবু যাহা বলিয়াছেন তদুত্তরে তাঁহার অবগতির জন্য আমি ইহা বলিতেছি যে Royal Societyর বর্ত্তমান কার্য্য কেবল মাত্র Original Researches সাধন করা এবং তাহাতে লোককে উৎসাহিত করা। Brennand সাহেবের প্রবন্ধ তাহার কোন উদ্দেশ্য সফল করে নাই ; অধিকন্তু Playfair এর পরে সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রাচীনত্ব নিয়া যে সকল বাদানুবাদ হইয়াছে তাহার কোনটী খণ্ডন কিম্বা উল্লেখ না করিয়া তিনি Playfair এরই মত পুনঃ প্রচারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এইহেতু উক্ত Society তাহা original মনে না করাতে যদি কুসংস্কার বশীভূত হইয়াছে বলিতে হয় তবে জগতে ঐরূপ কুসংস্কারেরই জয় বাঞ্ছনীয়।

এস্থলে আমার ইহা বলা উচিত হইতেছে যে আমি বেণ্টলির মতকে গ্রাহ্য করিয়া নিতেছি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় মনে করিতেছি যে স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আগে বেণ্টলির মত খণ্ডন করিতে হইবে। (আমার Royal Societyর বন্ধুটীকে কথা প্রসঙ্গে এই কথাটী বলিয়াছিলাম, তিনি উত্তর করিলেন যে 'আশা করি তুমি সফলকাম এবং জয়ী হইবে, আমি যেন তাহা দেখিবার জন্য জীবিত থাকিতে পারি')।

আমি যে আর্য্যসিদ্ধান্তোদ্ধৃত শ্লোকে 'যুগপদাঃ' শব্দের অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলাম তদুত্তরে কানাই বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে তাঁহার অর্থ মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকারের অর্থের সহিত অনর্থ ঘটাইতেছে। এস্থলে তাঁহার কথাগুলি সমালোচনার প্রতিবাদ না হইয়া মূল গ্রন্থেরই প্রতিবাদ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক কানাই বাবুর অর্থটীও সুস্পষ্ট হইতেছে না, তিনি বলেন, "যুগপদ অর্থে যুগের চতুর্থাংশ তিন (বৎসর)। এই প্রকার যুগপদাঃ ৬০ বৎসরে ৫টি হয়,"—আমার বিশ্বাস আর্য্যভট্টের পাটীগণিত জ্ঞান এত স্থূল ছিল না যে তিনি '৬০ বৎসরে ৫টী' মাত্র 'তিন বৎসর' আছে মনে করিতেন! তদ্ভিন্ন 'ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টিঃ' যে কেবল ৬০ বৎসর বুঝাইবে তাহাও আমার ভাষাজ্ঞানের অগোচর রহিয়াছে।

কোপর্ণিকস্ এবং গ্যালিলিও কিজন্য বিখ্যাত এবং তাঁহারা কি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা কানাই বাবু বোধ হয় জানেন না। কোপর্ণিকসই প্রথম পৃথিবীর সূর্য্য-কেন্দ্রক পরিভ্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'De Revolutionibus Orbium Celestium'—ইহাতে গ্রহমণ্ডলীর সূর্য্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণের গণিত প্রতিপাদিত তত্ত্ব মীমাংসিত হইয়াছে।

কানাই বাবু যে শ্লোকটী 'জ্যোতিষাচার্য্য বর্ণনং' হইতে উদ্ধৃত করিয়া মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকারের এবং আমার অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মৃণ্ময়ীর ৯ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং আমি তাহার সমালোচনা করিতে ভুলি নাই। (কানাই বাবু যদি কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে কথা বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থটী একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তবে একান্ত বাধিত হইব।) আমি এস্থলে কানাই বাবুর শ্লোকার্থের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে তাঁহার অনুবাদ হইতে মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকারের অনুবাদ প্রায়ই সুবোধ্য ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। (যে ২।১ স্থলে জটিল আছে তাহা সমা-লোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে।)

(আমি যে শ্লোকটী মৃণ্ময়ী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম তাহা "ভপঞ্জরঃ ;—" ইত্যাদি কিন্তু কানাই বাবু তাহাকে "ভূপঞ্জরঃ" করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি দায়ী নহি।)

ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই, দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর কেন্দ্রবিঘূর্নন গতিরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। যথা ;—"প্রাণেনৈতিকলাং ভূর্যদি—" ইত্যাদি ; ইহা দ্বারা অতি বিশদরূপে দৈনন্দিন আবর্ত্তন বুঝায়। কারণ এক 'প্রাণ' সময় এক দিবসের ৬×৬০×৬০ ভাগের এক ভাগ মাত্র ; পৃথিবী এক বিঘূর্ণনে দিবসে ৩৬০ অংশ অর্থাৎ ৩৬০×৬০ কলা গমন করে, ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে এক 'প্রাণ' সময়ে পৃথিবী এক কলামিত বৃত্তাংশ ঘুরিয়া যায়। নতুবা সূর্য্যকেন্দ্রক গতিবশে পৃথিবীর এককলা স্থান যাইতে একদণ্ড সময় লাগে।

"যদি চ ভ্রমতি ক্ষমা তদা—" ইত্যাদি

(মৃণ্ময়ী, ১১ পৃষ্ঠা)

এবং "যদ্যোবমম্বর চরা বিহগা স্বনীড়ম্

আসাদয়ন্তি ন খলু ভ্রমণে ধরিত্র্যাঃ।—"

ইত্যাদি সমস্তই কেবল পৃথিবীর চলনশীলতার প্রতিবাদ। ইহার কোনটাকেই আবর্ত্তনের প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

কানাইবাবু আর্য্যভট্টের বয়ঃক্রম কাল লইয়া যে ঐতিহাসিক তর্ক যুড়িয়া দিয়াছেন তাহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীয় অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া নিতেছি কারণ আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিম্বা প্রস্তাবিত প্রবন্ধ কিছুই ঐতিহাসিক নহে। কিন্তু উপসংহারে ইহা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে যে কানাইবাবু যে কথার প্রতিবাদ নিয়া প্রবন্ধারম্ভ করিয়াছিলেন সেই

কথাটি স্বীকার করিয়াই আপন প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন ; যথা,—'ভাস্করের পরে আর হিন্দু জ্যোতিষের উন্নতি হয় নাই।"

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

হিজরী ও বাঙ্গলা সাল।

বৎসর গণনাকে অব্দ কহে। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কোন্ অব্দ প্রচলিত ছিল তাহার তত স্থিরতা নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িককালে মহাভারতের রাজসূয়যজ্ঞ নিষ্পন্নের পর হইতে যে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। এই অব্দ প্রচলনের পর বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ এবং শালিবাহনের শকাব্দা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপিও উহা ভারতের হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও অনেকানেক সন ব্যবহৃত আছে। চট্টগ্রামের মণিসন, ত্রিপুরার ত্রিপুরাসন ওহিন্দি কমলিসন তাহার দৃষ্টান্ত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে খৃষ্টীয় শক, সম্বৎ শকাব্দা এবং "তারিখে এলাহি" বাঙ্গলা সন ও হিজরীসাল বিশেষ প্রচলিত। এই সমস্ত সনগুলির মধ্যে হিজরী ও বাঙ্গলাসনের ঐতিহাসিকতা উল্লেখ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা লইয়া অব্দ প্রচলন হইয়া থাকে। প্রচলিত ধর্ম্মের সমন্বয়, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব, পরাক্রান্ত রাজার সিংহাসন আরোহণ, দিগ্বিজয়, জাতিবিশেষের পতন বা অভ্যুদয়, ঝড় ঝঞ্ঝা, জলপ্লাবন, ভূকম্পন, দেশব্যাপী-দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বা অতিবৃষ্টি, মারিভয় প্রভৃতি নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনাদি লইয়াই অব্দকল্পিত হইয়া থাকে। যে সময় ভারতে মুসলমানপ্রাধান্য একাধিপত্য করিতেছিল, সেই সময় হইতে আরব দেশীয় হিজিরী সন ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। মোগলকুল-প্রদীপ আকবর সাহ হইতে এলাহী সন বা বাঙ্গালা সন প্রচলিত হয়।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ মস্তফার আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবে অনেক প্রকার অব্দ প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে আবেসেনিয়ার রাজা আবরাহা কর্ত্তৃক মক্কা আক্রমণ অব্দ এবং হেজাজ ওমরবেন রাবিয়ারের রাজত্ব অব্দ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সমস্ত অব্দ লইয়া সাল গণনা অসুবিধা হইত বলিয়া, প্রাচীন আরবীয়েরা একটি অব্দ প্রচলন করিয়াছিল উহাকে হিজরী কহে। কোন এক সময় খলিফা ওমররাজি আবুত্তর নিকট এসনের শাসনকর্ত্তা আবুমুষা আশারি লিখিয়া পাঠান যে, "আপনার সাবনমাসের পত্র পাইলাম কিন্তু, উহা কোন সালের তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।" এই কথায় খলিফা য়িহুদী, পারসিক, প্রভৃতি জাতির পণ্ডিতমণ্ডলীদিগকে একত্র করিয়া অনেক

তর্ক বিতর্ক বিচারের পর একটী সময় স্থির করতঃ অব্দ গণনা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পারসিকগণ তাঁহাকে তাহাদের "মাহরোজ" নামক সাল গণনার নিয়ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে খলিফা মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা গমনের দিনকে সাল গণনার প্রথম দিন ধরিয়া অব্দ কল্পনা করিলেন। কোরাণ সরিফের মতে এই সালকে "আমলেইজাঁ" অর্থাৎ আদেশ প্রাপ্ত বৎসর কহে। মহম্মদের মক্কা হইতে গমনের নামকে আরবীয় ভাষায় "হেজরত" কহে। এই হেজরত হইতে হিজরী অব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই হইতে হিজরী সাল আরম্ভ হইল। মুসলমানেরা ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে পরে, এদেশে হিজরী সন চলিতে লাগিল। ক্রমাগত একের পর এক করিয়া মুসলমান আক্রমণ সময় ও পূর্ণ পাঠানকালে ভারতে হিজরীর প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যখন সমদর্শী উদারচেতা মহম্মদ জেলালউদ্দিন আকবর মোগলবংশকে কীর্ত্তি ও সম্ভ্রমে সমান্বিত করিয়া মোসেনজাতির গৌরব দেখাইতেছিলেন সেই সময় হইতে "তারিখে এলাহি" বা বাঙ্গলা সন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়।

আকবরসাহর রাজত্বকালীন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত জাতি তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার হিন্দুপ্রজা ও কর্ম্মচারীগণের প্রচলিত হিজরীসাল গণনায় অনেক অসুবিধা বোধ হইত। যে হেতু হিজরী চান্দ্রমাস, আর হিন্দুদিগের সম্বৎ এবং শকাব্দা সৌরমাস। এই গোলযোগে এবং দেশের হিন্দু অধিবাসী-গণের ধর্ম্মান্ধতা বা জাতীয় বিদ্বেষের কারণ সমতা স্থাপন জন্য মহামতি বাদসাহের অনুমতিতে তাঁহার সভাসদ বিখ্যাত পণ্ডিত আমির ফতেউল্লাসিরাজী সৌরমাসের সহিত চান্দ্রমাস একত্র গণনা করিয়া একটি অভিনব অব্দ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন "তারিখে এলাহি" অর্থাৎ আকবরের পরাক্রান্তার উল্লেখ করিয়া এলাহি শব্দের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। এই অব্দ গণনা ৯৯২ নয় শত বিরনব্বই হিজরীতে আরম্ভ হয়। তখন আকবরের সপ্তবিংশতি বর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হইয়াছিল। এই "তারিখে এলাহি"সন বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বাঙ্গালা সাল নামে অভিহিত।

আজকাল আমাদের দেশে ইংরেজ প্রবর্ত্তিত খৃষ্টীয় শক প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আকবরের অব্দ লয় হয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ "খৃষ্টাব্দই" বেশীরভাগে ব্যবহার করেন ; কিন্তু এখনও বাঙ্গলাসন অক্ষুন্ন।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু সমাধি-প্রথা। *

হিন্দু, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত প্রধান প্রধান বৈলক্ষণ্য আছে তন্মধ্যে এইটিই সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে যে হিন্দুরা মৃতব্যক্তির শব অগ্নিতে দাহ করিয়া থাকে ও মুসলমানেরা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা শব ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া সমাহিত করে। সাধারণতঃ এই প্রভেদটির দ্বারাই উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোককে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু বাস করে তাহাদের আচার ব্যবহার সম্যকরূপে আলোচনা করিলে জানা যায় যে উপরোক্ত প্রভেদটী হিন্দুদের মধ্যেও সব সময়ে ঠিক খাটে না। যেহেতু কয়েকটি সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও সময়ে সময়ে বিশেষ কারণ বশতঃ মৃত ব্যক্তির শব ভূমধ্যে সমাহিত করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যুগী নামে খ্যাত এক সম্প্রদায়ের হিন্দু আছে, তাহারা অপর অপর জাতির হিন্দুর ন্যায় শব চিতানলে দগ্ধ না করিয়া, ভূমধ্যে সমাহিত করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমতঃ মুখাগ্নিপ্রকরণ সম্পন্ন করিয়া তৎপরে উক্ত শব ভূমধ্যে সমাহিত করিয়া ফেলে। উপরোক্তরূপে বৈষ্ণবপন্থাবলম্বী কয়েক সম্প্রদায়ের বৈরাগীরাও মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে শবকে উপবিষ্ট করাইয়া তৎপরে মৃত্তিকা নিক্ষেপকরতঃ সমাধি করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে, কয়েকটি সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও শব সমাহিত করিয়া থাকে। উক্ত প্রদেশে এই সমাধিপ্রথাকে উত্তর-ক্রিয়া প্রথা বলিয়া থাকে। তথায় লিঙ্গধারী বা লিঙ্গায়ৎ নামে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু আছে, তাহারা দেবাদিদেব শিবের উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও সমাধি-প্রথা প্রচলিত। এই লিঙ্গধারীরা প্রথমতঃ কবরটির অভ্যন্তরে শবকে উপবেশন করায়। তৎপরে শবের কটিদেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতঃ কবরটি পরিপূর্ণ করে। তৎপরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাঁহারা সমাধি স্থলে উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা একাদিক্রমে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা তৎযাবৎ শবের উপর নিক্ষেপ করিতে থাকেন যতক্ষণ না কবরের উপর বেশ একটি ছোট খাট স্তূপ হয়। এস্থলে ইহা অবশ্য বলা আবশ্যক যে মৃত্তিকা

---

* The Journal of the Anthropological Society of Bombay নামক পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় (২—৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত A short Note on Burial Customs among the Bhuinhâr Brâhmans in the Sârdn District, Behar শীর্ষক মৎপ্রণীত ইংরাজী প্রবন্ধ দেখুন।

নিক্ষেপের পূর্ব্বেই অপরাপর দেশাচার সম্মত বিধিব্যবহার ও মন্ত্রাদি পাঠ সম্পন্ন করা হয়। যে সমস্ত সন্ন্যাসীরা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করে তাহাদেরও সমাধি হইয়া থাকে। ইহাদের বেলায়, অপরাপর যে সমস্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিধিব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা পালন করা হয় না। কয়েকটি জাতির হিন্দুরাও অনূঢ়া কন্যার শব সমাহিত করে। শূদ্রদের মধ্যে যে সমস্ত কন্যার বয়স দশ বৎসরের কম ও যাহাদের বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়, তাহাদেরও সমাধি হইয়া থাকে। যে সমস্ত হিন্দ সৈনিকের রণক্ষেত্রে মৃত্যু হয়, তাহাদের শব সমাহিত করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত বালকের উপনয়ন হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তাহাদের সমাধি হইয়া থাকে।

এই জেলায় (সারণে) 'ভূঁইহার ব্রাহ্মণ' নামধারী এক সম্প্রদায়ের হিন্দু বাস করে। শেষোক্ত প্রথাসদৃশ সমাধি-রীতি ইহাদেরও মধ্যে প্রচলিত আছে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই জেলায় অপরাপর যে যে উপবীতধারী হিন্দু সম্প্রদায় আছে, তাহারাও শব সমাহিত করে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে এই জেলায় একটী দায়রার মোকদ্দমার বিচারক্রমে ভূঁইহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে উক্ত সমাধি প্রথার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই মোকদ্দমায় সরকার বাহাদুর অবশ্যই বাদী ছিলেন ও প্রতিবাদী একজন ভূঁইহার ব্রাহ্মণ। বাদী বলিতেছিলেন যে প্রতিবাদী প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনজন লোকের উপর এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ করে যে উক্ত তিন ব্যক্তি প্রতিবাদীর ভ্রাতুষ্পুত্রের অঙ্গে যে সমস্ত আভরণ ছিল তাহা লইবার মানসে তাহাকে (ভ্রাতুষ্পুত্রকে) হত্যাকরতঃ তাহার মৃতদেহটি কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ঘটনা হয় নাই। বাস্তবিক ঘটনাটি এই যে বাদীর ভ্রাতুষ্পুত্র কোন পীড়াগ্রস্ত হইয়া কালকবলে পতিত হয় ও ভূঁইহার ব্রাহ্মণদের প্রথানুসারে উহার শব ভূমধ্যে সমাহিত হয়। কিন্তু প্রতিবাদী দেখিল যে প্রতিশোধ লইবার এই এক উত্তম সুযোগ। সে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃতদেহটি কবর হইতে উত্তোলন করিয়া একটি কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পুলিসে ইত্তেলা দিল যে উপরোক্ত তিনজন লোক তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুন করিয়া কূপমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। এই মোকদ্দমা বিচারিত হওয়াতেই প্রকাশ পাইয়াছিল যে এই জেলার ভূঁইহার ব্রাহ্মণ ও অপরাপর যে যে উপবীতধারী হিন্দু সম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে যদ্যপি দ্বাদশবর্ষীয় অথবা তন্ন্যূনবর্ষীয় কোন বালক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহা হইলে তাহাদের সমাহিত করা হয়। কিন্তু দুই সময়ে এই নিয়মটি খাটে না। প্রথমতঃ যদ্যপি বালকটির 'জনেও' * হইয়া থাকে তাহা হইলে—এদেশে উপনীত হওয়াকে অর্দ্ধ বিবাহিত হওয়া মনে করে,—এবং দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি বালকটির বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও না। যে পর্য্যন্ত কোন বালক উপনীত-না হয়, তদ্‌যাবৎ তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

---

* উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উপনয়ন সংস্কারকে জনেও বলিয়া থাকে।

যে সমস্ত বালকের উপনয়ন অথবা বিবাহ হইয়া মৃত্যু হয়, চিরপ্রসিদ্ধ প্রথানুসারে তাহাদের শব চিতানলে দগ্ধ করা হয় ও অশৌচান্তে তাহাদের কারয্ * অথবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় কিন্তু যে সমস্ত দ্বাদশবর্ষীয় অথবা তন্ন্যূনবর্ষীয় বালকের উপরোক্ত সংস্কার ক্রিয়াদ্বয় সম্পাদিত না হয়, তাহাদের সমাধি বিধেয়। কোন পুষ্করিণীতটে কবর খনন করিয়া তন্মধ্যে উপরোক্ত অনুপনীত ও অনূঢ় বালকদের শব সমাহিত করা হয়। কখন কখন অশ্বত্থবৃক্ষের একটি শাখা তাহার উপরে সমাধিচিহ্নস্বরূপ রোপিত করা হয়। এই সব স্থলে প্রেতঃশান্তির জন্য কারয্ অথবা কোন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না।

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র।

সিংভূমের কোলজাতি।

বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুর পার্ব্বতীয় প্রদেশ, ইহার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নিবিড় অরণ্য ও অসংখ্য পর্ব্বতরাজিতে পরিপূর্ণ, পূর্ব্ব সীমা বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন। সিংভূম ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। তাহার প্রধান নগর চাঁইবাসা। তাহার চারিদিকেই প্রাকার স্বরূপ উচ্চ শৈলমালা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বৃহৎ বৃহৎ শাল এবং অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষ দ্বারা পাহাড় সকল পরিপূর্ণ। এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে মনুষ্য গমনাগমনের পথ পূর্ব্বে একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত সমূহ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান—তন্মধ্যে নানাবিধ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ঘোর অরণ্য, এই ভয়সঙ্কুল বিপদপূর্ণ স্থানে একাকী পথ চলা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। রাস্তা যে প্রকার অসমান ও দুর্গম ছিল, তাহাতে লোকের যাতায়াতে কষ্টের পরিসীমা ছিল না। আজকাল রেলওয়ে বিস্তারিত হওয়াতে মনুষ্যের গমনাগমনের পথ অনেক সুবিধাজনক হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এমন অনেক অরণ্যময় স্থান আছে যেখানে সূর্য্যের রশ্মি কখন প্রবিষ্ট হয় না এবং দিবাভাগেও বিদেশী লোকের পক্ষে পথ চলা দুঃসাধ্য।

এই সকল অরণ্যময় পর্ব্বতসন্নিকটে কোল জাতি নির্ভীক চিত্তে মনের আনন্দে বাস করে। এই দুর্গম জঙ্গলই ইহাদের জন্মভূমি ও প্রিয় বাসস্থান। ইহারা অনেকে একত্রিত হইয়া একস্থানে বাস করে। সচরাচর নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যে প্রকার খড় আচ্ছাদিত মাটির ঘরে বাস করে, ইহাদের গৃহাদি অবিকল সেই প্রকারের না হইলেও প্রায় তদনুরূপ। ইহারা সমভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং চারিদিকে ঢালু স্থানে পল্লী

---

* উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকে কারয্ নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

নির্ম্মাণ করে। চারিদিকে ভূমি ঢালু থাকায় তাহাদিগের বাটির নিকটে বৃষ্টির জল ও কর্দ্দমাদি বড় দেখা যায় না। সুতরাং বর্ষাকালে তাহাদিগের বহুশ্রমসাধ্য ক্ষুদ্র কুটীর সমূহের কোন ক্ষতি হয় না। ইহাদের পল্লীগুলির স্বাভাবিক জলনির্গমনোপায় অতি সুন্দর, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্যক অবগত না হইলেও ইহারা স্বভাবতঃই পয়ঃপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখে। গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে অর্থের বিশেষ আবশ্যক হয় না। নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষাদির অভাব নাই, তথা হইতে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী সামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে।

ইহাদের বাসস্থানের নাম কোলহান্। বোধ হয়, ইহা কোলস্থানের অপভ্রংশ। লোহারডাঙ্গা জেলাতেও কোল আছে—তাহাদিগকে মুণ্ডা বা গৃহস্থ কোল বলে। মুণ্ডা কোল বরাবরই চাষ আবাদ করিয়া থাকে। সিংহভূমির কোলদিগকে লাড়কা বা যোদ্ধা কোল বলে। ইহারা চাষবাসের তত প্রিয় নহে; তীর ধনুক লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়ায়। ইংরাজ শাসনাধীন হওয়া অবধি ইহারা চাষ আবাদ যাহা করে, তাহাতে বৎসরের অর্দ্ধেকের বেশী আহার সংস্থান হয় না—অবশিষ্ট কয়েকমাস জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইয়া মৃগয়া ও ফল মূলাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমার প্রবন্ধের বিষয় এই লাড়কা কোল,—সুতরাং ইহার পর যাহা কিছু বলা যাইবে তাহা এই লাড়কা কোলদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

বাসস্থানের নিম্নভূমিতেই ইহারা শস্যাদির চাষ করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শস্য উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা ৭।৮ মাস ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। অবশিষ্ট ৪।৫ মাস তাহারা জঙ্গল হইতে বন্য আলু ইত্যাদি খুঁড়িয়া আনে এবং তাহা পোড়াইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া আহার করে। ইহা ব্যতীত মহুল ফুলও সিদ্ধ করিয়া খায়। মহুল বৃক্ষ আমাদের দেশে দেখা যায় না। ইহার ফুলগুলি সাদা ও ডিম্বাকৃতি। আস্বাদ মধুর,—কিঞ্চিৎ তিক্ত। ইহারা মহুল ফলের বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রদীপে ব্যবহার করে। এই সকল পর্ব্বতে আলু এবং অন্যান্য বন্য ফলমূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহাদিগকে দুর্ভিক্ষের কষ্টভোগ করিতে বড় একটা দেখা যায় না।

এখন দরিদ্র ও মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন কোন স্ত্রীপুরুষ জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী সহরে বিক্রয় করে,—ইহা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদিও আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট সিংভূমের অরণ্য সকল রক্ষা করিবার বিধি করিয়াছেন। ইহাতে ইহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ জঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে হইলে মাশুল দিয়া অনুমতি পত্র লইয়া কাঠ কাটিতে হয়। সুতরাং ইহাদের লাভের অংশ অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে নিজ ব্যবহারের জন্য ইহারা কাঠ, খড় ও বাঁশ কোন কোন রক্ষিত জঙ্গল হইতে আনিতে পারে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে। পরিশ্রমের ভাগ বরং স্ত্রীলোকের

উপরই বেশী। পুরুষেরা স্বভাবতঃ অলস, আলস্যবশতঃ পুরুষদিগের শরীর স্ত্রীলোক-দের শরীর ন্যায় সবল নহে। স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত শিশুসন্তান গুলিকেও ক্ষেত্রে লইয়া যায় ; এবং তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

ইহাদের বিশ্বাস, যে ভূমিতে শয়ন করিলে অসুস্থ হইতে হয়, এজন্য ইহারা দড়ির খাটিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করে। কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেরই এক একখানি খাটিয়া আছে।

ইহারা গো মহিষাদির অতিশয় যত্ন করে। বড় বড় কাঠ দ্বারা গোয়াল ঘরের বেড়া নির্ম্মাণ করে এবং প্রত্যেক দুইটি কাঠের মধ্যে ৪।৫ আঙ্গুল পরিমাণে ফাঁক রাখে। মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকাতে, ঘরের মধ্যে বায়ু বেশ যাতায়াত করে এবং গরুগুলিও বেশ সুস্থকায় থাকে। শক্ত বেড়া থাকাতে রাত্রিকালে হিংস্রজন্তু পালিত পশুগুলির কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। একবার আমরা চাঁইবাসা হইতে ৩২ মাইল দূরে একটি নির্জ্জন পর্ব্বত সন্নিকটে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম—তথায় কোন ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি কয়েক ঘর কোল বাস করিত। আমরা একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের গৃহাদি দেখিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। তাহাদের ভাষায় আমাদিগকে কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতে ও নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন কোলকে স্ত্রী পুত্র লইয়া ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি বাস করিতে দেখিলাম—সে বড়ই দরিদ্র, একটি গরু মাত্র তাহার সম্বল। সেই গরুটির নিকট একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রত্যহ একটি ভল্লুক এই গরুটিকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের কুটীরের সন্নিকটে আইসে, কিন্তু এই প্রজ্বলিত অগ্নি থাকায় গোয়ালগৃহের নিকট আসিতে পারে না। সকল কোলেরাই হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে গো ছাগলাদি রক্ষা করিবার এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শৈশবাবস্থা হইতে এই প্রকার হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত স্থানে পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় ইহারা হিংস্র জন্তুকে তত ভয় করে না।

পূর্ব্বে ইহারা একরূপ অসভ্য সাধারণতন্ত্রের বশীভূত ছিল। তৎপরে ইহাদের প্রথম রাজার অধীনতা স্বীকার করিবার একটি প্রবাদ আছে; ঘটনাক্রমে একটি বড় অশ্ব ইহাদের কোলহানে উপস্থিত হয়, এবং তৎসময়ের প্রধান প্রধান লোক ঐ অশ্বে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে—কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তৎপর তাহারা স্থির করে, যে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে চালাইতে পারিবে সে তাহাদের রাজা হইবে। দৈবঘটনাক্রমে কোন ক্ষত্রিয় এই অরণ্যপূর্ণ কোলহান্ দিয়া পুরীর জগন্নাথদেব দর্শনমানসে যাইতেছিলেন—ইহারা তাঁহাকে অনুরোধ করায়, তিনি এই অশ্বে আরোহণ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট অশ্বারোহণ বাল্যক্রীড়া স্বরূপ, সুতরাং ইনি কোলদের রাজা হইলেন—ইনিই পোড়াহাটের রাজা।

কিন্তু তাহারা রাজাকে নামমাত্র রাজা বলিয়া মানিত, জমি কিম্বা বাসভূমির জন্য রাজাকে বিশেষ কোন কর দিত না—তবে পার্শ্বস্থ রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে অকাতরে যুদ্ধে যোগ দিত। যুদ্ধে ইহাদের বিশেষ আনন্দ বলিয়া পোড়াহাটের রাজার সৈন্যদলভুক্ত হইতে ইহারা কোন আপত্তি করিত না। সিপাহিবিদ্রোহের সময় পোড়াহাটের রাজা ইহাদের সাহায্যে কতকগুলি বিদ্রোহি সিপাহী ধরিয়া রাঁচির কমিশনর সাহেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হাণ্টার সাহেব বলেন, পোড়াহাটের রাজা পরে স্বয়ং ইহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহী হন। ইহার কারণ কি বলা যায় না। ইংরেজরাজ ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য কয়েক দল পল্টন পাঠান। সভ্যজাতির নিকট অসভ্যদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া থাকে, ইহাদেরও তাহাই হইল। তীর ধনুক এন্‌ফিল্ড বন্দুকের নিকট পরাস্ত হইল—কোল ইংরাজ-বশীভূত হইল এবং পোড়াহাটের রাজা বন্দী হইয়া কাশীতে প্রেরিত হইলেন। অনেকের বিশ্বাস রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্রোহী হন নাই। বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

শুনিতে পাই, কয়েক বৎসর হইল পোড়াহাটের রাজার কাশীতে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্রদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পোড়াহাট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের এক অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইংরাজবশীভূত হইয়া লাড়কা কোলের যুদ্ধবৃত্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অন্যান্য জাতি হইতে ইহারা এখনও কম কর দেয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহারাও ইংরাজের অন্য অন্য প্রজার ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। এখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোলহানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে—আর পঞ্চাশ বৎসর পর ইহারা অন্য অন্য প্রজা হইতে যে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না।

ইহারা স্বভাবতঃ নম্র। সামান্য বিষয় লইয়া কলহ করিবার প্রয়াস পায় না—এবং সহসা রাগান্বিত হয় না, তবে বিদেশীয় লোকের সঙ্গে মিশিতে ততটা ভালবাসে না। স্বজাতীয় আত্মীয়ের সহিত আমোদ আহ্লাদে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। ইহাদের পূর্ব্বের সাহস ও বলবীর্য্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বন্য হিংস্রজন্তু দেখিলে ইহারা ভীত হয় না সত্য, কিন্তু বিদেশীয় লোক বিশেষতঃ সাহেব দেখিলে দূরে পলায়ন করে। স্বভাবের সন্তান, সভ্যতা হইতে দূরে থাকাই যেন ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু যদি কেহ ইহাদের স্ত্রীজাতির উপর কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ইহারা ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যাচারীকে ভালরূপ প্রতিশোধ দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়।

ইহারা তীর ধনুক ব্যবহার করে, এবং ইহাতে ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনুর্ব্বাণ দ্বারা ইহারা পক্ষী ইত্যাদিও শিকার করে, বাটীর বাহির হইতে হইলেই ইহারা তীর ও ধনুক লইয়া বাহির হয়। ইহারা শরসন্ধানে এত পটু যে ইহাদের লক্ষ্য প্রায় ভ্রষ্ট হয় না। সাহেবদের বড়দিন উপলক্ষে চাঁইবাসায় প্রতি বৎসর একটি

মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তথায় একদিন নানারূপ ক্রীড়া ও তামাসা প্রদর্শিত হয়। ধনুর্ব্বিদ্যায় কোলেরাই জয়ী হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

ইহাদের গঠন সুন্দর ও শরীর বলিষ্ঠ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের শরীর অধিকতর দৃঢ় ও সবল। স্ত্রীলোকেরা বড় বড় ভারি বোঝা অনায়াসে মস্তকে বহন করিয়া আনে—এই প্রকার বোঝা মস্তকে করিয়া সঙ্গিনী-দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে হাসি হাসি মুখে ৪।৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আইসে।

ইহাদের কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও ইহাদের মুখে বেশ একটু লাবণ্য আছে। কাহারও কাহারও আবার কুঞ্চিত কেশ, উজ্জল চক্ষু, বলিষ্ঠ দেহ। দেখিতে বেশ সুশ্রী বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে বাঙ্গালির ন্যায় এবং সুন্দর গৌরবর্ণ। কথিত আছে, ছোটনাগপুরের উন্নত ভূমি হইতে যখন ইহারা সিংভূমে আইসে, তখন সিংভূমে অনেক জৈনের বাস ছিল। এখনও এখানে অনেক মথুরাবাসী গোয়ালা এবং অন্য অন্য কয়েক প্রকার হিন্দু জাতি দেখা যায়, তাহাদের গঠন ও মুখশ্রী বেশ সুন্দর এবং তাহাদিগকে দেখিলে আর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, এই মথুরাবাসী গোয়ালা এবং অন্যান্য জাতিরা পূর্ব্বে জৈন ছিল এবং ইহাও অনেকের বিশ্বাস যে, অধিকাংশ জৈন কোলকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই বর্ত্তমান কোলদিগের মধ্যে সুশ্রী পুরুষ ও রমণী দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও সর্ব্বদা হাস্যমুখ। স্ত্রীলোকেরা ফুল বড় ভালবাসে, ফুল দেখিলেই আনন্দ প্রকাশ করে, এবং ইচ্ছামত ফুল লইয়া মাথায় পরে। কোল-রমণীরা কখন বেণী বন্ধন করে না—কেহ কেহ অলঙ্কার পরিয়া থাকে—মস্তকের অলঙ্কার ভিন্ন হস্ত পদের অলঙ্কার সকলই কাঁসা নির্ম্মিত, এবং ওজনে প্রায় ২।৩ সের। মস্তকে রূপার গহনা পরিয়া থাকে। এই প্রকার ভারি অলঙ্কার—বিশেষ পায়ের অলঙ্কার পরিবার সময় কোল রমণীগণ অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে।

ইহাদের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। নিজ ভাষা ভিন্ন ইহারা অন্য কোন ভাষাই জানিত না—তবে সম্প্রতি বাঙ্গালির সংশ্রবে থাকিয়া কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষা শিখিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা তাহারা বড়ই পছন্দ করে, দুই একটি কথা শিখিলেই মুখে আর হাসি ধরে না। ইহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোলহানের অনেক স্থানে স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন। চাঁইবাসা জেলা স্কুল হইতে কয়েকটি কোলবালক এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইহাদের ভাষা অতি সুললিত। বোঝা না গেলেও যখন ইহারা পরস্পর কথোপকথন করে, শুনিতে মিষ্ট বোধ হয়। ইহাদের ভাষায় অনুনাসিক বর্ণ সমূহের আধিক্যপ্রযুক্ত.

এবং বঙ্গীয় বর্ণমালার পঞ্চম বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণগুলি (অর্থাৎ খ, ছ, ঠ, থ, ফ) এবং শ ষএর অভাব বোধ হয় ইহাদের ভাষার সুমিষ্টতার কারণ। ইহাদের ভাষার শব্দসংখ্যা অতি অল্প, বোধ হয় পাঁচ ছয় শতের অধিক নয়। অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশিবার পূর্ব্বে ইহাদের শব্দসংখ্যা আরও কম ছিল। তৎপরে আবশ্যক মত অন্য অন্য ভাষা হইতে ইহারা কতকগুলি শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। জৈনদিগের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় কতকগুলি সংস্কৃত কথাও ইহাদের ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দারু (বৃক্ষ) তুলা (ওজন করা) কর্‌তল (করতালি) তাম্বা (তাম্র) সুতাম (সুতা) সুকু (সুখ) ইত্যাদি। উৎকল-বাসী কতকগুলি লোকের বহুকাল হইতে সিংভূমে অধিবাস আছে, তজ্জন্য উৎকল ভাষার সহিত কোল ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভাষায় কোন অক্ষর নাই, মুখে মুখেই ইহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস প্রচলিত রহিয়াছে। আজকাল দেবনাগর অক্ষরে ইহাদের ভাষা লিখিত হইতেছে এবং কয়েকখানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাদের ধর্ম্মপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার। সূর্য্য ইহাদের প্রধান দেবতা এবং বিশেষ পূজনীয়। সূর্য্যকে ইহারা "শিং বোঙ্গা" বা "শিম্ বোঙ্গা" বলে। শিম্ ইহাদের ভাষায় কুক্কুট বুঝায় এবং বোঙ্গা অর্থাৎ ভূত বা দেবতা। কুক্কুট (শিম্) দ্বারা ইহারা সচরাচর সূর্য্যের পূজা করে বলিয়া সূর্য্যকে "শিম্ বোঙ্গা" অর্থাৎ কুক্কুটগ্রাহী দেবতা বলে। পূজায় অধিক মন্ত্র নাই। তবে ইহাদের দেবতার উপর কতটা নির্ভরতা, তাহা ইহাদের মন্ত্র দ্বারা বেশ বুঝা যায়। মন্ত্রের অর্থ এই "আমরা বিপদে পড়িয়াছি, আমাদের পীড়া হইয়াছে, তোমায় এই কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া বলি দিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত কর। তুমি আমাদের বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে—আমাদের আর কে আছে। অতএব আমাদের এই বলিতে সুপ্রসন্ন হও এবং বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।" ইহারা মধ্যে মধ্যে সূর্য্যের নিকট মহিষও বলি দিয়া থাকে। উহাদের পুরোহিত বলিদানান্তে মহিষের মস্তক ও কয়েক খণ্ড মাংস লইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া উপরোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে।

আজ কাল কোলদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে—প্রকৃত বিশ্বাসের জন্য তাহারা যে খ্রীষ্টান হইতেছে, ইহা ঠিক বলা যায় না। চাঁইবাসায় শুনিয়াছিলাম যে লোহারডাঙ্গা জেলায় একদিনে বহুসংখ্যক কোল খ্রীষ্টান হইয়াছিল। শুনা যায়, খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ উপরোক্ত কোলদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম। তোমরা খ্রীষ্টান হইলে তোমাদিগকে কর দিতে হইবে না। এই প্রলোভনে পড়িয়া তাহারা অনেকে খ্রীষ্টান হইতে স্বীকৃত হইল। তৎপর পাদ্রী সাহেব একটি বিস্তৃত মাঠে উহাদিগকে একত্রিত করিলেন এবং একটি আম্রশাখা জলে সিক্ত করিয়া তাহাদিগের মস্তকোপরি সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিলেন। তাহারা খ্রীষ্টান হইয়া পাদ্রীদিগের কথানুসারে

কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় লোহারডাঙ্গায় যে মোকর্দ্দামাদি হইয়াছিল, তাহা অনেকেই সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন।

ইহারা দিবাভাগে ভাত প্রায় খায় না, ভাত পচাইয়া এক প্রকার মদ প্রস্তুত করে, তাহা খাইয়াই দিবসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। এইরূপে প্রস্তুত মদকে ইহারা ডিয়েং বলে। ইহা দেখিতে অনেকটা আমানির ন্যায়—ডিয়েং মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বেশ সহজ—কয়েকটা গাছের শিকড় কাটিয়া ছোট ছোট সাদা কদমার ন্যায় প্রস্তুত করে; এবং দুই এক দিন ভাত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া উহার কয়েকটি তাহাতে মিশ্রিত করে এবং তাহার দুই তিন দিন পরে উহা ব্যবহারোপযোগী হয়। ইহা অধিক পরিমাণে খাইলে মত্ততা জন্মে; কিন্তু ইহারা ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য যতটুকু খায়, তাহাতে ইহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। তবে কোন পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ এই ডিয়েং অধিক পরিমাণে খাইয়া প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়। স্ত্রীলোকেরাও সময় সময় অতিরিক্ত ডিয়েং পান করিয়া থাকে। সন্তান জন্মিবামাত্র ইহারা সন্তানের মুখে একটু ডিয়েং স্পর্শ করায়। ইহাদের বিশ্বাস, জন্মাবধি এই প্রকার মদ খাইতে অভ্যাস না করিলে ভবিষ্যতে খাইতে পারিবে না। এইরূপে সন্তানের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিয়েঙ্গের মাত্রাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রসূতি প্রসবান্তে আট দিন অশুচি বিবেচনা করে, এই অশুচিকালে স্বামী, প্রসূতি এবং নবপ্রসূত সন্তান ব্যতিরেকে গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিরা স্থানান্তরে যাইয়া বাস করে এবং তদন্তে সকলে গৃহে আসিয়া ভোজ ও নৃত্য গীত আমোদ করিয়া থাকে। এই দিনেই সন্তানের নামকরণ হয়—সচরাচর পিতা-মহের নাম পৌত্র পাইয়া থাকে। নামকরণের সময় একটি হাঁড়িতে জল রাখিয়া, সন্তানের পিতামহের নামোচ্চারণ করিয়া একটি কলাই ঐ জলে ফেলিয়া দেয়—যদি কলাইটি ভাসিতে থাকে তবে সন্তানের ঐ নাম রাখা হয়। নতুবা বারম্বার ঐরূপ পরীক্ষা করিয়া যে নামে কলাইটি ভাসিতে থাকে, সেই নাম রাখে।

ইহারা গরু, মহিষ, কুক্কুট, শূকর, মৎস্যাদি এবং কুম্ভীরও খাইয়া থাকে। বড় বড় ইন্দুর ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। সিংভূমে এক প্রকার বড় ইন্দুর আছে; ইহারা তাহা পাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং চারি পাঁচ পয়সা মূল্যেও ইহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়। ইহারা গোমাংস অত্যন্ত সন্তোষের সহিত আহার করে, কিন্তু গোদুগ্ধ ইহাদের নিকট অখাদ্য বলিয়া পরিত্যক্ত।

সহরে এবং সহরের চতুষ্পার্শ্বে যাহারা বাস করে, তাহাদিগের পরিচ্ছদ প্রায় বাঙ্গালির ন্যায়। কিন্তু ইহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে না। অরণ্যমধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা এক খণ্ড অপ্রশস্ত কৌপিন ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র প্রায় ব্যবহার করে না। শীতকালেও কেহ কেহ অনাবৃত দেহেই থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্যেও সভ্যতা প্রবেশ করিতেছে; জঙ্গলে থাকিয়াও দুই একজন প্রশস্ত বস্ত্র দ্বারা দেহাবৃত করিয়া থাকে। কেহ

কেহ বা মোটা চাদর গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করে। কোন কোন কোলকে শীতকালে অনাবৃত দেহে বক্ষে রৌদ্র লাগাইতে দেখা যায়—তখন সে শকুনির পক্ষের ন্যায় হাত দুইটি উচ্চ করিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকে। শীতকালে ইহারা খাটিয়ার উপর খড় বিছাইয়া শয়ন করে এবং খাটিয়ার নীচে আগুন রাখিয়া দেয়—ইহার দ্বারা মাঘের দারুণ শীত কতকটা নিবারিত হয়। শীতাধিক্য হইলে কেহ কেহ বা বাহিরের গৃহ-দ্বারের নিকট এক খণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখে। কোলদের আনন্দময় প্রকৃতি, এজন্য তাহারা অল্পেতে কষ্ট অনুভব করে না। যাহার যে অবস্থা সে তাহাতেই সুখী। নৃত্য গীতাদিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে বলিয়া তাহাদের জীবন আনন্দে ও প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ।

ইহাদের বিবাহ হওয়া কষ্টসাধ্য। অধিকাংশ কোলরমণীদিগকে চির কৌমার্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়। কন্যার পিতামাতা বরের নিকট অধিক পণ প্রার্থনা করাতে ইহাদের শীঘ্র বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। পূর্ব্বে পঞ্চাশ ষাটটি গরু বিবাহের পণ ছিল। এই অত্যাধিক পণের নিয়মবশতঃ দরিদ্র কোলদের পক্ষে বিবাহ একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। বিবাহে এইপ্রকার কষ্ট দেখিয়া একজন ডেপুটী কমিশনর ডাঃ হেজ্ সাহেব তাহাদের পল্লীর প্রধান প্রধান লোকদিগকে একত্রিত করিয়া এক জোড়া বলদ, একটি গাই ও সাতটি টাকা পণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই পণ স্বীকৃত হইবার পর দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে এখন পূর্ব্বনিয়মানুযায়ী পণের কঠিন নিয়ম দেখা যায় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং ধনী কোলদিগের মধ্যে ডেপুটী কমিশনর সাহেবের নিয়ম বড় খাটে না। তাহারা পূর্ব্ব নিয়মেই বিবাহের পণ আদায় করিয়া থাকে। পণের এই কঠোর নিয়ম বশতঃ ইহাদের বিবাহ হওয়া বড় দুষ্কর, তজ্জন্য অনেক সুশ্রী কোলরমণীকেও অবিবাহিতা থাকিতে হয়। যদি কেহ তাহাদের সৌন্দর্য্যের বিষয় কখন উল্লেখ করে—তবে তাহারা মুখখানি ম্লান করিয়া দুঃখের হাসি হাসিয়া বলে, "আমাদের যখন বিবাহই হইতেছে না, তখন আর এই সৌন্দর্য্যে কি ফল।" ইহাদের বিবাহের বিশেষ কোন প্রক্রিয়া নাই; কোন যুবক বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলে একটি যুবতীকে পসন্দ করে এবং স্বীয় পিতার নিকট বিবাহের মত প্রকাশ করে। পিতা তদনুসারে গ্রামের কয়েকজন প্রধান প্রধান লোকসহ কন্যার পিতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া পণ ধার্য্য করিয়া আইসে। সমুদায় নির্দ্ধারিত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যার আত্মীয়গণ এবং গ্রামের অন্যান্য লোক ও যুবক যুবতীগণ সকলে একত্রে কন্যাকে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে বরের গ্রামের দিকে যাইতে থাকে; এ দিকে বরের আত্মীয়গণ ও গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ বরের সহিত নাচ গান করিতে করিতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রামে লইয়া যায়। তাহার পর স্বামী স্ত্রী অন্যান্য সকলের সহিত একত্রে নৃত্য করিতে থাকে। পরে ভোজন ও ডিয়েং

পান আরম্ভ হয়। স্বামী ও স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ডিয়েং পান করিতে দেওয়া হয় এবং পরস্পর ডিয়েং পরিবর্ত্তনান্তর অল্প পরিমাণে পান করে। ইহা হইলেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। স্ত্রী তিন দিন স্বামীর সহিত বাস করিয়া পলায়ন করিয়া যায়, স্বামী তাহার অনুসন্ধানার্থে বাহির হয় এবং তাহাকে দেখিলেই বলপূর্ব্বক গৃহে লইয়া আইসে। এই পলায়ন পালাতেই স্বামী বেচারার প্রাণান্ত হয়। ইহারা স্ত্রীকে জীবনের পবিত্র সঙ্গিনী স্বরূপ জ্ঞান করিয়া উভয়ে মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কোন বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে স্বামী স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে; এবং সঙ্গত বোধ হইলে তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে।

কোলেরা মৃতদেহ দাহ করে এবং অবশিষ্ট অস্থি গৃহে আনিয়া একটি হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া যে ঘরে মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে, এমত স্থানে হাঁড়িটিকে একমাস ঝুলাইয়া রাখে। মাসান্তে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে হাঁড়িটি স্থাপিত করে, এবং মৃতব্যক্তির দ্রব্যাদি ও কতকগুলিন আহারীয় বস্তু উহার মধ্যে রাখিয়া প্রোথিত করে এবং তদুপরি একখানি প্রস্তর স্থাপন করে। কেহ কেহ সমাধির উপরে এক এক খানি স্তম্ভাকৃতি প্রস্তরও স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দেয়। ইংরাজ এবং অন্য অন্য জাতির কবর প্রস্তরের প্রথা এই অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘ মাসে ইহাদের শস্যাদি কাটা হইয়া গৃহজাত হইলে ইহাদের মাঘি-পর্ব্ব আরম্ভ হয়। এই পর্ব্ব ইহাদের সর্ব্ব প্রধান। প্রায় পনেরো দিন পর্য্যন্ত ইহারা এই পর্ব্বে আমোদ করে। নৃত্য গীত বাদ্য এবং ডিয়েং পান দিবারাত্র অবিরাম চলিতে থাকে। বাদ্যের গুম্ গুম্ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হয়। সেই একঘেয়ে বাজনার তালে তালে স্ত্রী পুরুষ একত্রে হস্তে হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। দশ বারো হইতে প্রায় একশত স্ত্রীপুরুষ এই প্রকারে একত্রে নৃত্য করে। ইহারা কখন উচ্চকণ্ঠে গান করে না। স্ত্রীলোকদের স্বর কোমল ও মধুর। ইহাদের গানগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, দুই তিনটি পদের অধিক নয়। কিন্তু গানের সুর বড়ই শ্রুতিমধুর। এই পর্ব্ব সময়ে ইহারা এত অধিক পরিমাণে ডিয়েং পান করে যে ইহাদের হিতাহিত জ্ঞান প্রায় থাকে না এমন কি সেই সময়ে ইহারা অনেকটা পশুর প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর এই পর্ব্বের দুই তিন মাসের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। এই পর্ব্ব ভিন্ন ইহাদের আরও ছয়টি পর্ব্ব আছে; কিন্তু আর কোনটিতে ইহারা এত স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে না।

প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে মুণ্ডা বলে এবং দশ হইতে পঁচিশ গ্রাম লইয়া একটি পিড়; প্রত্যেক পিড়ে একটি মানকি পূর্ব্বে শাসনকার্য্য চালাইত। ইংরাজ আমলে এই মানকি ও মুণ্ডাগণ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করিয়া দেয় এবং তজ্জন্য তাহারা পারিশ্রমিক স্বরূপ শতকরা আঠাইশ টাকা পায়। অন্য অন্য স্থানের ন্যায়

গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব আদায় করিতে কোন গোলমাল কিম্বা জমাজমি নিলাম করিতে হয় না। কোলদের বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা যাহাতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহা প্রাণ-পণে সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই মুণ্ডা ও মানকীরা বিচার ও সকল প্রকার বিবাদ মীমাংসা করিত। এখনও সামান্য সামান্য বিবাদের মীমাংসা করে এবং অনেকটা পুলিসের কার্য্যও করিয়া থাকে। কাহারও গ্রামে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ইহারা আসামীকে আদালতে হাজির করিয়া দেয়। কোলদের মধ্যে এই মানকী ও মুণ্ডার বিশেষ সম্মান আছে, তাহারা ন্যায় বিচার করিতে চেষ্টা করে, এবং তাহাদের অধীনস্থ সকলে তাহাদের বিচারে সন্তুষ্ট হয়। সচরাচর মানকীর ও মুণ্ডার পুত্র মানকী ও মুণ্ডা হয়। কিন্তু পুত্র বালক অথবা অনুপযুক্ত হইলে সেই বংশ হইতে সকলে মিলিয়া অন্য এক জনকে বাছিয়া লয়। ইংরাজ আদালতে বিচারকদিগকে বিচার করিঁতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। যে দোষী সে সকল কথাই খুলিয়া বলে; কোন কথা গোপন করে না। যদি কোন মোক্তার কিম্বা উকিল কোন কথা সাক্ষী দিগকে শিখাইয়া দেয়, তাহা পর্য্যন্ত অকপটচিত্তে বলিয়া ফেলে এবং যে শিখাইয়া দেয় তাহারও নাম বলিয়া দেয়। সুতরাং উকিল মোক্তারদিগকে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। ইহাদের সত্যবাদিতার জন্য ইহারা কোন অন্যায় কার্য্য গোপন রাখিতে পারে না। ইহাদের সাক্ষ্য দিবার সময় উহাদের ভাষায় যে শপথ দেওয়া হয়, তাহা বিচিত্র। উহার অর্থ এই, "যদি তাহারা মিথ্যা কথা বলে, তবে অন্ধ হইবে এবং সর্প অথবা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে—ইত্যাদি।"

ইহাদের সৃষ্টিবৃত্তান্ত কৌতুকাবহ। ওতে বোরাম এবং শিংবোঙ্গা নামক দুই দেবতা ছিলেন। ইঁহারা পৃথিবীতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ইঁহারাই প্রস্তর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পৃথিবী, তরু লতাদি এবং গ্রাম্য পশুসকল প্রথমে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে অরণ্যের পশু পক্ষী সৃষ্ট হইল। যখন দেবতাদ্বয় দেখিলেন যে পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপ-যোগী হইয়াছে, তখন তাঁহারা একটি বালক ও বালিকা সৃষ্টি করিলেন এবং একটি উপ-ত্যকার পার্শ্বস্থ গিরিগহ্বর তাহাদিগের আবাসস্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সৃষ্টি-কর্ত্তার ইচ্ছানুরূপ প্রেম এই বালক বালিকার মনে উদয় না হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে ডিয়েং প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দিলেন এবং তাহারা ঐ ডিয়েং খাইয়া হর্ষোৎ-ফুল্ল মনে দিন যাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে উহাদের দ্বাদশটি পুত্র এবং দ্বাদশটি কন্যা জন্মিল। তৎপর শিংবোঙ্গা মহিষ, গরু, শূকর, কুক্কুট ও শাকসবজির দ্বারা একটি ভোজের আয়োজন করিলেন এবং বালক বালিকাদিগকে বিবাহ দিলেন। প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ খাদ্য দ্রব্য মনোনীত করিয়া লইতে লাগিল। প্রথমে চারিজন গো ও মহিষ মাংস ভক্ষণ করিল—তাহারা কোল ও ভূমিজ জাতিতে পরিগণিত হইল। দুইটি শাকসবজি আহার করিল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহাদের বংশোদ্ভুত। যাহারা ছাগ

মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করিল তাহারা শূদ্র, যে দুই জন কচ্ছপাদি ভক্ষণ করিল তাহারা ভুঁইয়া এবং চারিজন শূকরের মাংস আহার করিল, তাহারা সাঁওতাল হইল। অবশিষ্ট দুইজনের আহারীয় দ্রব্যের কোন অংশ না থাকায় তাহারা প্রথম দুইজনের উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্যের কতক অংশ গ্রহণ করিয়া আহার করিল—ইহারা ঘাসিজাতি (মেথর) হইল।

ইহাদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে। তন্মধ্যে ডাইনে বিশ্বাসই প্রধান। মনুষ্য এবং পালিত পশুদের মধ্যে পীড়াধিক্য হইলে উহা ডাইনের কার্য্য বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে, এবং ওঝা দ্বারা ডাইন স্থির করিয়া তাহার উপর নানারূপ উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইংরাজাধীন হইবার পূর্ব্বে ইহারা ডাইনদিগকে হত্যা করিত; কিন্তু এখন এই প্রকার হত্যার কথা বড় শোনা যায় না। ওঝাকে ইহারা "শোকা" বলে, উক্ত "শোকা" কথন কথন পীড়া সকল ভূতের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেরূপ বিবেচিত হইলে ইহারা মুরগী ইত্যাদি বলি দিয়া ভূতের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করে। পূর্ব্বে সকল জাতির মধ্যেই ডাইনে বিশ্বাস ছিল। অপরাপর জাতির বিশ্বাসে ডাইনী একটি কদাকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোক; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি সুশ্রী, কি কুৎসিত সকলেই ডাইন হইতে পারে। একবার কোন গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় "শোকা" আসিয়া আটজন স্ত্রীলোককে ডাইনী স্থির করিল। তাহাদের উপর এরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে লাগিল যে তাহারা অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া সকল প্রকার উপদ্রব তাহাদের কৃত বলিয়া স্বীকার করিল। তাহাদের মধ্যে একটি যুবতী এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একটি গভীর কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল।

এখন ইহাদের মানসিক বৃত্তির বিষয় কয়েকটি কথা লিখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহারা সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয়। ইহারা যে কাজ নীচ বলিয়া মনে করে, তাহা কদাপি করিতে সম্মত হয় না। ইহাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান এবং অভিমান প্রচুর পরিমাণে আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইহাদের স্ত্রীলোকের উপর বিদেশী লোক অত্যাচার করিলে ইহারা তাহার প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্য কারণেও ইহাদের মনে কষ্ট দিলে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ইংরাজের অধীন হওয়া অবধি ইহাদের মধ্যে হত্যা-সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আত্ম-হত্যার সংখ্যা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক। ইহারা মনে কোনরূপ কষ্ট পাইলে এমন কি কাহারও সততা অথবা সত্যবাদিত্বে সন্দেহ করিলে আত্মহত্যা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। স্ত্রীলোকদের অভিমান আরও বেশী। যৎসামান্য কথার জন্যও মনে কষ্ট পাইলে ইহারা আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। যদি স্বামী অথবা অন্য কোন আত্মীয় কোন কর্কশ কথা বলে, অথবা তিরস্কার করে, তবে সর্ব্বদা যে হাস্যমুখী ও

প্রফুল্ল সেও একেবারে ম্রিয়মানা হইয়া পড়ে; এবং যদি শীঘ্র তাহার মনস্তুষ্টি না করা হয়—তবে নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করিয়া মনোকষ্ট দূর করে। শুনা যায়, একটি যুবতীর প্রস্তুত খাদ্য তাহার পিতৃব্য খাইতে অস্বীকার করে। তাহাতে সে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষ পান করিয়াছিল।

অন্যান্য নীচ জাতির ন্যায় কোল রমণীরা কলহ-প্রিয় নহে। সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সাতিশয় প্রণয়, উভয়ের ভালবাসা নয়নে ও বাক্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। কেহ কাহারও প্রতি কর্কশ কথা প্রয়োগ করে না অথবা কেহ কাহারও নিকট কোন কথা সংগোপন করে না। ইহারা অসভ্য হইলেও এবং ইহাদের ভাষায় মনের সকল ভাব প্রকাশিত না হইলেও ইহারা সুখ ও শান্তি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া থাকে। এই অসভ্য ও অশিক্ষিত কোলজাতির মধ্যে দাম্পত্য-প্রেম সভ্যজাতির অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বিরাজিত।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

পাদুকা-রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। স্বর্গে বর্ষা উপস্থিত; পৃথিবীর বর্ষার সৌন্দর্য্য, শোভা সকলই সেখানে রহিয়াছে, শুধু মর্ত্ত্যের অসুবিধা, ক্লেশ, অশোভনত্ব কিছু নাই। সুরনদী মন্দাকিনী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভে নন্দন কানন আমোদিত, দেববালাগণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া পারিজাত কুড়াইতেছে, কেহবা মন্দাকিনীর প্রবল স্রোতে একটি ফুল ভাসাইয়া স্রোতের খেলা দেখিতেছে। ঘন ঘন কোমল মেঘ গর্জ্জনে কদম্ব ফুল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং দেবসেনাপতির ময়ূর কিছুকালের অবকাশ পাইয়া মেঘের দিকে চাহিয়া মুক্তপুচ্ছে মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। সন্ধ্যা আগমনের অনেক পূর্ব্বেই রতি শচীদেবীর ললাটদেশ হরিচন্দনাঙ্কিত করিতেছেন।

দেবসভা বন্ধ, দেবগণের এখন দীর্ঘ অবসর; শুধু বরুণেরই কিছুমাত্র অবকাশ নাই। দেবরাজের প্রশস্ত ক্রীড়াকুঞ্জে বরুণ ভিন্ন আর সকলেই উপস্থিত। ইন্দ্র, যম, কুবের, বায়ু ও দিক্‌পালগণ মহাসুখে গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। কথায় কথায় যম ও ভাগ্য দেবতার মধ্যে এক তর্ক উঠিল, ভাগ্য দেবতা বলিলেন, "আমি যে মানুষকে অনুগ্রহ করি সেই শুধু সুখী হয়," যম বলিলেন, "কখন না, যাহার প্রতি আমার দৃষ্টি নাই তুমি তাহার কি করিতে পার?"

তর্ক ক্রমেই বাড়িয়া উঠে দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন,

এবং উভয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "স্থির হও বৎসগণ, পৃথিবীতে লোকে আত্মপক্ষের জয় ঘোষণা করিবার জন্য প্রবল কূটতর্কের সাহায্য লয় বটে কিন্তু স্বর্গের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কিছু দিন পূর্ব্বে লক্ষ্মী ও শনিতে একবার এইরূপ পরস্পরের ক্ষমতার ন্যূনাধিক্য লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইলে সে আন্দোলনের কিরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তোমাদের স্মরণ আছে; পৃথিবীতে আমরা মানুষকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান করিয়াছি অতএব আমার ইচ্ছা মানুষের দ্বারাই তোমাদের এ তর্কের মীমাংসা হউক।"

দেবগুরুর পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করা স্থির হইল। ভাগ্য দেবতা বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা একজোড়া কাষ্ঠ বিনামা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন; পাদুকা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইল বটে কিন্তু তাহা চর্ম্মপাদুকা অপেক্ষা কোমল ও কারুকার্য্য সম্পন্ন। বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্ত নির্ম্মিত সুতরাং তাহা যে কতদূর উৎকৃষ্ট হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পাদুকা পাইয়া ভাগ্য দেবতা সহর্ষে যমরাজকে বলিলেন, "এইবার আমাদের তর্কের মীমাংসা হইবে। আমার এই জুতা নরলোকে প্রেরণ করিব, যে ব্যক্তি ইহা যতক্ষণ পরিয়া থাকিবে ততক্ষণ তাহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" যমরাজ ঈষৎ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমার যেমন অভিপ্রায়; কিন্তু নিশ্চয় জানিও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, যে এই জুতা পায়ে দিবে ইহা যতক্ষণ তাহার পায়ে থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে ঘোর অশান্তি ভোগ করিতে হইবে।"

"আচ্ছা দেখা যাউক"—বলিয়া ভাগ্যদেবতা বিশ্বকর্ম্মারচিত সেই অপূর্ব্ব পাদুকা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত পাদুকা সুরলোক হইতে নিঃশব্দে নামিয়া হাবড়ার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাবড়ায় যে ভদ্রলোকের বাড়ী এই কাষ্ঠ পাদুকার আবির্ভাব হইল তাঁহার নাম বনমালী মুখোপাধ্যায়, সেই দিন তাঁহার কন্যার বিবাহ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বিবাহোপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইতেছে, বিভিন্ন গৃহদ্বারে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের রাশি রাশি পাদুকা স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে; কেহ কাল, কেহ বার্ণিশ, কেহবা বাদামী রঙ্গের, কোন জোড়া বুট, কোন জোড়া চটি; হণ্টিং, স্প্রিংওয়ালা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকারের বহুতর পাদুকা। সন্ধ্যাকালে সেই দৈব পাদুকা ইহাদের মধ্যে মিশিয়া রহিল, নানাকার্য্যে ব্যস্ত লোকজন ইহার হঠাৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করিল না।

সমস্ত দিন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যার পর হইতে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বরযাত্রীর দল ঘরের ভিতর বসিয়া খেলা, গাওনা, তর্ক ও আলোচনাতে সময় ক্ষেপ করিতেছিলেন। একটা ঘরে তাস চলিতেছিল, দশ বারো জন দর্শক চারিদিকে বসিয়া

খেলা দেখিতেছিলেন ; একজন হরতনের টেক্কার উপর ইস্কাবনের সাহেব মারিয়া "কাবার ইস্তক বিন্তি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, যতখানি জোরে সাহেব মারা হইল, তাহাতে সাহেব কাগজের না হইয়া যদি রক্তমাংসের হইত, তাহা হইলে তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত। আর এক পাশে দুইজন লোক দাবাখেলার স্বপ্নে মগ্ন, তাঁহাদের একজনের হাতে হুঁকা, কন্যাযাত্রীদলের একটি দুষ্টু ছেলে হুঁকার উপর হইতে বহুকাল হইল কলিকাটি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু খেলোয়ার মহাশয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি সেই কলিকাহীন হুঁকা টানিতে টানিতেই 'কিস্তী' হাঁকিলেন। ঘরের আর এক কোণে পাশাখেলা হইতেছিল, এক পক্ষ জিতিয়া মহা সোরগোল করিয়া উঠিলেন। জেতাগণের মধ্যে একটি বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি কিছু বেশী রসিক ; আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া পাশাখেলার ছকখানি লইয়া প্রতি পক্ষের মাথায় ঝাড়িয়া দিলেন এবং মস্তকে চাদর বাঁধিয়া "রণমাঝে দিগম্বরী নাচ গো" বলিয়া মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন।

আর একটি প্রকোষ্ঠে কয়েক জন ভদ্র লোক উপবিষ্ট ; ইহাঁদের মধ্যে একজন একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ; তিনি একাল ও সেকাল সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলেন, কথায় কথায় তিনি একালে দেশের দুরবস্থা, শিক্ষায় মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ, রেলের বিস্তারে আমাদের অসম্ভব ক্ষতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিতেছিলেন, শ্রোতাগণ মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহার বাক্যসুধা পান করিতেছেন, এমন সময় আহারের ডাক পড়িল, অমনি যেখানে যাহা ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া সকলে আহারার্থে ছুটিলেন।

প্রায় দীর্ঘ পৌনে দুই ঘণ্টার পর আহার শেষ হইল। সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতার তখনো উপসংহার হয় নাই, আহারান্তে তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিবিষ্টচিত্ত শ্রোতাকে ধরিয়া ধূমপানাভিলাষে পূর্ব্ববর্ণিত কক্ষে গিয়া বসিলেন, অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "হাজার দুঃখ কল্লেও সে সুখের দিন আর ফিরে আস্‌বে না, বেশী দিনের কথা যাক্, দেড়শ দুশ বছর আগে আমাদের কি সুখই না ছিল, টাকায় দুমোণ চা'ল, পাঁচ সাত সের ঘি, তেল নুন ত কেউ দাম দিয়েই কিন্‌তো না, সেই সুখের কালে একবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সেকাল কি আর আস্‌বে?"—এমন সময় তাঁহার মনে হইল বন্ধুবর্গ খাইয়া উঠিয়াই কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ী বাহির হইবার জন্য একবার ডাকিয়াছিলেন কিন্তু বক্তৃতার অনুরোধে অনেকটা বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন সুতরাং আর বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিলেন, দ্বারদেশে একজোড়া পাদুকা পড়িয়াছিল, পায়ে দিতেই বুঝিলেন, ইহা তাঁহারই পাদুকা, কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে রাজপথে গিয়া উঠিলেন।

সম্পাদক মহাশয় নিজের পাদুকাভ্রমে ভাগ্যদেবতা-নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিয়াছিলেন, পাদুকাসম্বন্ধে প্রায় কাহারো ভ্রম হয় না, কারণ বিনামায় পদ প্রবেশ

হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়, তাহা নিজের কি অপরের, কিন্তু এই দৈব পাদুকার এই বিশেষ গুণ ছিল যে, যিনিই তাহা পায়ে দিন সকলের পায়েই ঠিক বসিত—কাহারো নিকট তাহা অপরের বলিয়া মনে হইত না।

রাজপথে উঠিয়া সম্পাদক মহাশয় দেখিলেন, তিনি রাজপথে নাই, অন্ধকারপূর্ণ, দুর্গন্ধময় একটা গলির ভিতর দিয়া যাইতেছেন; কর্দমে পথ পূর্ণ, কোথাও একটি আলোর নাম নাই, চারিদিকে সুবৃহৎ বৃক্ষরাজী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দূরে হিংস্র পশুর গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। "এ কোথায় আসিয়াছি"—বলিয়া সম্পাদক মহাশয় দ্রুতপদে পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিলেন; চারিদিকে বন ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সংকীর্ণ পথের দুই ধারে কাঁটা গাছ, তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকে বিদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন, ভাবিলেন, এইবার হাবড়ারপুল কিন্তু একোন পথদিয়া আসিলাম, এত বন, রাস্তায় এত কাদা, কি উৎপাৎ! একখানা গাড়ীও যে দেখিতেছি না, একটা আলোও নেই, রাস্তার আলো পর্য্যন্ত নিবিয়ে দিয়েছে কারণটা কি?—সহরের মধ্যে এমন বদ রাস্তা, এমন জঙ্গল, এর মিউনিসি-পালিটি কি উঠে গেছে, আগামী সপ্তাহের কাগজে স্বায়ত্ব শাসন প্রথাকে একদম খুব আক্রমণ করা যাবে।"—ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাবড়ার পুল খুঁজিতে লাগিলেন। পাদুকা পরিয়া তাঁহার কি বিভ্রাট ঘটিয়াছে তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। পাদুকামাহাত্ম্যে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি দেড়শত বৎসর পিছাইয়া পড়িয়াছেন; তখন হাবড়ার পুলই বা কোথায় ছিল, আর এখনকার প্রশস্তপথ, গ্যাসের আলো, ঘোড়ার গাড়ীর কথাই বা কে জানিত?

নদীর ধারে পুল খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, অনেকদূরে—নদীতীরে খুব আলো জ্বলিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে ঢাকের বাজনা শুনা যাইতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন, গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির! দেখিলেন, জ্বলন্ত চিতায় একটি বৃদ্ধের মৃতদেহ, চিতানল শবদেহ বেষ্টন করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কতকগুলি লোক একটি সুন্দরী বালিকাকে ধরিয়া সেই চিতানলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বংশদণ্ড দ্বারা চিতার সহিত সবলে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে, বালিকা অসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং যখন তাহার নবনীসুকোমল শরীরে চিতাবহ্নির লোল জিহ্বা অতি কঠোরভাবে স্পর্শ করিতেছে, তখন বালিকা অতি কাতর চীৎকারে চিতা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার চীৎকার যাহাতে কেহ শুনিতে না পায়—এই অভিপ্রায়ে প্রবলবেগে ঢাক বাজিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সম্পাদক মহাশয় এই দৃশ্য দেখিয়াই দুই চক্ষে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

অনেকক্ষণ পরে চাহিয়া দেখিলেন, চিতাবহ্নি নির্ব্বাণপ্রায়; বালিকার কুসুমসুকুমার

দেহ, সেই রূপরাশি, সেই নিবিড় অলকদাম ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, উন্মত্তের ন্যায় আর একদিকে ছুটিয়া চলিলেন, নৈরাশ্য পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আমি কি পাগল হয়েছি, এই ত সন্ধ্যার সময় বেশ ছিলেম, এর মধ্যে এ কি পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি, নিশ্চয়ই আমি পাগল হয়েছি, না হয় স্বপ্ন দেখ্‌চি, স্বপ্নই বা কেমন ক'রে হবে? এইত চল্‌চি, না না এ স্বপ্ন নয়, নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার।"

জলকাদা ভাঙ্গিয়া সম্পাদক মহাশয় দৌড়িতে লাগিলেন; কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন একটি বৃহৎ অশ্বত্থ মূলে একখানি ক্ষুদ্র দোকান, দোকানের ভিতরে সামান্য একটি মৃৎ প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহাতে গৃহের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় নাই, গৃহমধ্যে চারি পাঁচজনলোক কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সম্পাদক মহাশয় দৌড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়—কতকগুলি লোক একটি বালিকাকে পুড়াইয়া ফেলিল, এ কি সর্ব্বনাশ দেখিলাম?"—দোকানের লোকেরা তাঁহার আকার প্রকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, যেন এমন ব্যক্তি তাহারা আর কখন দেখে নাই। একজন অনেকক্ষণ পরে উত্তর করিল—"মশায়ের নিবাস?—আপনি কি নূতন এদেশে আস্‌চেন? বুঝি কেউ সতীদাহ ক'রে গেল, তাই দেখে থাক্‌বেন, এ রকম সতীদাহ ত সর্ব্বদাই হয়।"—বিস্মিতসম্পাদক উত্তর করিলেন,—"সতীদাহ সর্ব্বদাই হয়! বলেন কি এ কি ইংরেজের রাজ্য নয়? ইংরেজের রাজ্যে কি সতীদাহ আছে?"—আশ্চর্য্য হইয়া দোকানের লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। একজন বলিল—"ইংরেজের রাজ্যি কোথায় দেখ্‌লেন,—নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার, তা কি আপনি জানেন না?"

"আলিবর্দ্দী খাঁ সুবাদার? আপনারা ক্ষেপেচেন দেখ্‌চি!"

"না আমরা ক্ষেপিনি, আপনিই ক্ষেপেচেন, আপনি কি চান্?"

সম্পাদক উত্তর করিলেন, "আপনারা কেউ দয়া করে হাবড়ার পুলটা দেখিয়ে দেন, অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনে, আজ গ্যাস জ্বলচে না কেন?"

সকলের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "হাবড়ার পুল গ্যাস—আপনি কি সব কথা বলচেন? ও সব আমরা বুঝিনে।"

সম্পাদক হতাশভাবে বলিলেন "আপনারা আমার বিপদে সাহায্য করবেন না ব'লে এ রকম চালাকী কচ্চেন; ভাল আপনাদের কাছে কোন উপকার চাইনে। আমি দাম দিচ্ছি—একটা ম্যাচবাক্‌স দেন, অন্ধকার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে জ্বেলে পথ দেখে নেব।"

চতুর্দ্দিকে আবার একটা কৌতুহল দৃষ্টির তরঙ্গ চলিয়া গেল। দোকানদার দাঁড়াইয়া বলিল "মশায় ম্যাচবাক্‌স কি বুঝ্‌তে পারি নি, ভাল করে বলুন।"

সম্পাদক—"আঃ—এ আর বুঝলে না, দিয়েশালাইয়ের বাক্স, গো, দিয়েশলাইয়ের বাক্স, এবার বুঝেছ তো?"

দোকানদার—"আজ্ঞে এ জিনিষের নাম এই প্রথম শুনচি, ও ত আমাদের দোকানে নেইই—অন্ত কোথায়ও পাবেন কি না তাও জানিনে;—আপনি যাবেন কতদূর?"

সম্পাদক—"বৌবাজার পর্য্যন্ত, একখানা গাড়ীও নেই, এ হোল কি?"

দোকানদার—"কৈ বৌবাজারের কথা ত কখন শুনিনি, আপনি সুতানুটী যাবেন না গোবিন্দপুর যাবেন?—আর এ রাজ্যে গাড়ী পাবেন কোথা? ভদ্রলোকের বাস না থাক্‌লে কি গাড়ী ঘোড়া থাকে?"

সম্পাদক মহাশয় দেখিলেন তাহাদের সহিত কথা কহিয়া কোন লাভ নাই, কেহ তাঁহার কথা বুঝিতে পারে না, তিনি ভাবিলেন, "হয় আমি পাগল হয়েছি না হয় এরা পাগল হয়েছে, এতগুলি লোক এক সঙ্গে পাগল হয়েছে এমন বোধ হয় না, আমার মাথাটাই খারাপ হয়েছে।"

ললাট হইতে ঘর্ম্ম মুছিয়া ক্লান্তপদবিক্ষেপে তিনি স্থানান্তরে গমন করিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে সম্পাদক মহাশয় আবার নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, একখানি সামান্য নৌকায় বহুকষ্টে নদী পার হইয়া একটি অপ্রশস্ত গলি ধরিয়া চলিলেন এবং অনেকক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে সমাগত হইলেন, দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন লোক,—তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি পথভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত পথিক, বড়ই বিপদে পড়েছি, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রয় দেন, রাত্রে এখানে বিশ্রাম করে সকালে চলে যাই।" লোকটি বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে অনেকক্ষণ সম্পাদক মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে বলিল, "আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখ্‌ছি, ঘরের ভিতর শয্যা আছে, আপনি বিশ্রম করুন, সকালে আপনার সমস্ত কথা শুনব।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয় শয্যার উপর গিয়া বসিলেন, হঠাৎ তাঁহার পূর্ব্বকাল ফিরিয়া আসিল; দেখিলেন, তিনি বৌবাজারের থানায় তাঁহার চিরপরিচিত বন্ধুর আলোকিত কক্ষে শয্যার উপর বসিয়া আছেন, সম্মুখে সেই বিস্তৃত রাজপথ, শ্রেণীবদ্ধ আলোকস্তম্ভে উজ্জ্বল গ্যাসালোক প্রজ্জ্বলিত; এবং নির্জ্জন পথে দুই একখানি গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ঠং করিয়া একটা বাজিয়া গেল।

বিস্ময়াভিভূতচিত্তে সম্পাদক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, তবে সত্যই কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, উঃ—কি ভয়ানক স্বপ্ন, না, আমি নিশ্চয়ই তিন চার ঘণ্টার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। এ কয় ঘণ্টা কি যন্ত্রনাই না পেয়েছি, দুই ঘণ্টা আগে যা দেখেছি, সেই চিতা, বালিকার সহমরণ, কর্দ্দমময় দুর্গম পথ, বহু কষ্টে নদী পার, এ সমস্ত কি সত্য ঘটনা? যাই হউক এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা প্রকাশ করলে লোকে পাগল বলবে। বরযাত্রে গিয়ে কি কেউ এমন বিপদে পড়ে?"

সম্পাদক মহাশয় নানাকথা চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিলেন। অবিলম্বে

তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তিনি আর কখন সেকালের সুখ্যাতি করিতে সাহস পাইতেন না, দেড় শত বৎসর আগেকার সুখ তিনি চারি ঘণ্টা ধরিয়া বেশ অনুভব করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্পাদক মহাশয় নিদ্রিত হইলে গৃহদ্বারে একজন কনেষ্টবল আসিয়া উপস্থিত হইল, সে দেখিল, তাহার বাবুর বন্ধু বেশ ঘুমাইতেছেন, দ্বারদেশে একজোড়া বিনামা পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহা দারোগা বাবুর হইবে।

জুতা জোড়াটি দেখিয়া পাহারাওয়ালা বেচারীর একটু লোভ হইল, অবশ্য তাহা লাভ করিবার উচ্চাভিলাষ তাহার মনে উদয় হয় নাই, সে ভাবিল, তাহার শক্ত নাগরা জুতা অপেক্ষা এ জুতা কত ভাল, দেখিতে কেমন নূতন; ইচ্ছা করিল, এই অবসরে একবার পায়ে দিয়া সে একটু সখ মিটাইয়া লয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে অনেক কথা উঠিল, ভাবিল, "বাবু হওয়ার কি আরাম! কেমন পুরু গরম বিছানায় শুইতে পাওয়া যায়, কোন চিন্তা নাই, সুখে বাবুগিরি করিয়া বেড়াইতে কত আনন্দ; আহা, আমি যদি পাহারাওয়ালা না হইয়া দারোগা বাবু হইতাম ত আমার কত সুখই হইত।"

ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা জুতা জোড়া পায়ে দিয়া ফেলিল। অমনি তাহার আত্মা দারোগা বাবুর দেহে প্রবেশ করিল, সে পকেট হইতে একটি কবিতা বাহির করিল, দেখিল, তাহারই রচনা, কতবার তাহা পড়িল, তৃপ্তি হইল না। তাহার মনে হইল, সে একটি রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, কিন্তু এ প্রণয়ে সে সুখী নহে; কিছুতেই সে তাহার প্রিয়তমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে কিন্তু মনে শান্তি নাই, আরো অধিক অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, উচ্চাভিলাষ তাহার হৃদয়ে অগ্নির মত জ্বলিয়া সন্তোষ সুখশান্তি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। এই গভীর রাত্রে বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া সে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল,

"হায়, আমার চেয়ে অসুখী আর কে আছে? যে পাহারাওয়ালা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, সে আমার চেয়ে কত সুখী, অভাব কাকে বলে, তা সে জানে না, তার সুখে সুখ প্রকাশ করতে, দুঃখে অশ্রু ত্যাগ করতে স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে, কিন্তু আমার কে আছে?—হায়, আমি দারোগা না হয়ে যদি ঐ পাহারাওয়ালা হতেম, সেও আমার পক্ষে ঢের ভাল ছিল"।

ভাগ্যদেবতার পাদুকা তখনো তাহার পায়ে, ইচ্ছা করিবামাত্র সে পাহারাওয়ালা

দোকানদার—"আজ্ঞে এ জিনিষের নাম এই প্রথম শুনচি, ও ত আমাদের দোকানে নেইই—অন্য কোথায়ও পাবেন কি না তাও জানিনে;—আপনি যাবেন কতদূর ?"

সম্পাদক—"বৌবাজার পর্য্যন্ত, একখানা গাড়ীও নেই, এ হোল কি ?"

দোকানদার—"কৈ বৌবাজারের কথা ত কখন শুনিনি, আপনি সুতানুটী যাবেন না গোবিন্দপুর যাবেন ?—আর এ রাজ্যে গাড়ী পাবেন কোথা ? ভদ্রলোকের বাস না থাক্‌লে কি গাড়ী ঘোড়া থাকে ?"

সম্পাদক মহাশয় দেখিলেন তাহাদের সহিত কথা কহিয়া কোন লাভ নাই, কেহ তাঁহার কথা বুঝিতে পারে না, তিনি ভাবিলেন, "হয় আমি পাগল হয়েছি না হয় এরা পাগল হয়েছে, এতগুলি লোক এক সঙ্গে পাগল হয়েছে এমন বোধ হয় না, আমার মাথাটাই খারাপ হয়েছে।"

ললাট হইতে ঘর্ম্ম মুছিয়া ক্লান্তপদবিক্ষেপে তিনি স্থানান্তরে গমন করিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে সম্পাদক মহাশয় আবার নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, একখানি সামান্য নৌকায় বহুকষ্টে নদী পার হইয়া একটি অপ্রশস্ত গলি ধরিয়া চলিলেন এবং অনেকক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে সমাগত হইলেন, দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন লোক,—তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি পথভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত পথিক, বড়ই বিপদে পড়েছি, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রয় দেন, রাত্রে এখানে বিশ্রাম করে সকালে চলে যাই।" লোকটি বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে অনেকক্ষণ সম্পাদক মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে বলিল, "আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখ্‌ছি, ঘরের ভিতর শয্যা আছে, আপনি বিশ্রম করুন, সকালে আপনার সমস্ত কথা শুনব।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয় শয্যার উপর গিয়া বসিলেন, হঠাৎ তাঁহার পূর্ব্বকাল ফিরিয়া আসিল; দেখিলেন, তিনি বৌবাজারের থানায় তাঁহার চিরপরিচিত বন্ধুর আলোকিত কক্ষে শয্যার উপর বসিয়া আছেন, সম্মুখে সেই বিস্তৃত রাজপথ, শ্রেণীবদ্ধ আলোকস্তম্ভে উজ্জ্বল গ্যাসালোক প্রজ্জ্বলিত; এবং নির্জ্জন পথে দুই একখানি গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ঠং করিয়া একটা বাজিয়া গেল।

বিস্ময়াভিভূতচিত্তে সম্পাদক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, তবে সত্যই কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, উঃ—কি ভয়ানক স্বপ্ন, না, আমি নিশ্চয়ই তিন চার ঘণ্টার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। এ কয় ঘণ্টা কি যন্ত্রনাই না পেয়েছি, দুই ঘণ্টা আগে যা দেখেছি, সেই চিতা, বালিকার সহমরণ, কর্দ্দমময় দুর্গম পথ, বহু কষ্টে নদী পার, এ সমস্ত কি সত্য ঘটনা ? যাই হউক এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা প্রকাশ করলে লোকে পাগল বলবে। বরযাত্রে গিয়ে কি কেউ এমন বিপদে পড়ে ?"

সম্পাদক মহাশয় নানাকথা চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিলেন। অবিলম্বে

তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তিনি আর কখন সেকালের সুখ্যাতি করিতে সাহস পাইতেন না, দেড় শত বৎসর আগেকার সুখ তিনি চারি ঘণ্টা ধরিয়া বেশ অনুভব করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্পাদক মহাশয় নিদ্রিত হইলে গৃহদ্বারে একজন কনেষ্টবল আসিয়া উপস্থিত হইল, সে দেখিল, তাহার বাবুর বন্ধু বেশ ঘুমাইতেছেন, দ্বারদেশে একজোড়া বিনামা পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহা দারোগা বাবুর হইবে।

জুতা জোড়াটি দেখিয়া পাহারাওয়ালা বেচারীর একটু লোভ হইল, অবশ্য তাহা লাভ করিবার উচ্চাভিলাষ তাহার মনে উদয় হয় নাই, সে ভাবিল, তাহার শক্ত নাগরা জুতা অপেক্ষা এ জুতা কত ভাল, দেখিতে কেমন নূতন; ইচ্ছা করিল, এই অবসরে একবার পায়ে দিয়া সে একটু সখ মিটাইয়া লয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে অনেক কথা উঠিল, ভাবিল, "বাবু হওয়ার কি আরাম! কেমন পুরু গরম বিছানায় শুইতে পাওয়া যায়, কোন চিন্তা নাই, সুখে বাবুগিরি করিয়া বেড়াইতে কত আনন্দ; আহা, আমি যদি পাহারাওয়ালা না হইয়া দারোগা বাবু হইতাম ত আমার কত সুখই হইত।"

ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা জুতা জোড়া পায়ে দিয়া ফেলিল। অমনি তাহার আত্মা দারোগা বাবুর দেহে প্রবেশ করিল, সে পকেট হইতে একটি কবিতা বাহির করিল, দেখিল, তাহারই রচনা, কতবার তাহা পড়িল, তৃপ্তি হইল না। তাহার মনে হইল, সে একটি রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, কিন্তু এ প্রণয়ে সে সুখী নহে; কিছুতেই সে তাহার প্রিয়তমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে কিন্তু মনে শান্তি নাই, আরো অধিক অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, উচ্চাভিলাষ তাহার হৃদয়ে অগ্নির মত জ্বলিয়া সন্তোষ সুখশান্তি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। এই গভীর রাত্রে বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া সে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল,

"হায়, আমার চেয়ে অসুখী আর কে আছে? যে পাহারাওয়ালা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, সে আমার চেয়ে কত সুখী, অভাব কাকে বলে, তা সে জানে না, তার সুখে সুখ প্রকাশ করতে, দুঃখে অশ্রু ত্যাগ করতে স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে, কিন্তু আমার কে আছে?—হায়, আমি দারোগা না হয়ে যদি ঐ পাহারাওয়ালা হতেম, সেও আমার পক্ষে ঢের ভাল ছিল"।

ভাগ্যদেবতার পাদুকা তখনো তাহার পায়ে, ইচ্ছা করিবামাত্র সে পাহারাওয়ালা

হইয়া পড়িল, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি বদ্ স্বপ্ন, আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!—তাই ত, আমি যেন স্বপ্ন দেখলুম আমি দারোগা বাবু হয়েছি, কিন্তু তাতেও সুখ নেই, আমার স্ত্রী, ছেলেপিলে তাদের জন্যে ত আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।"

ঠিক এই সময় আকাশ হইতে একটি উল্কাপাত হইল। পাহারাওয়ালা বলিয়া উঠিল "ঐ যে একটা তারা খ'সে পড়লো, ওঃ—ওগুলো অনেক দূরে রয়েছে, যদি ওদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পেতুম বড় মজা হত! ছেলে বেলা হতেই আমার একবার চাঁদে যাবার ইচ্ছে আছে, শুনেছি মানুষ মোরলে সেখানে যায়, আমি যদি একলাফে ওখানে যেতে পাত্তুম ত একবার গিয়ে সমস্ত জিনিষ দেখে আসতুম, শরীরটে এখানে পড়ে থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না।"

যেমন চিন্তা অমনি কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে পাহারাওয়ালা একলক্ষ বিশহাজার ক্রোশ দূরবর্ত্তী চন্দ্রালোকে আসিয়া উপস্থিত। এখানে পদার্পণ করিয়াই সে দেখিল চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, পর্ব্বতের ভিতর গভীর গহ্বর তাহার পাদদেশে একটি বৃহৎ নগর,—শ্বেতবর্ণ, যেন তুষার মণ্ডিত, প্রচুর উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দির এবং সুবৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তরবৎ শুভ্র প্রাসাদ-শ্রেণীতে পূর্ণ, সেখান হইতে পৃথিবী একটি ঘোর লালবর্ণ গোলার মত দেখা যাইতে লাগিল।

সে চন্দ্রালোকে অনেক প্রাণী দেখিতে পাইল; মনুষ্য যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, চন্দ্রালোকেও সেইরূপ একপ্রকার জীব তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, কিন্তু মনুষ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য অনেক, তাহাদিগের স্বরূপ ধারণা করিতে এই পৃথিবীর জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের অনেক অধিক কল্পনা পরিচালন করা আবশ্যক। এই চন্দ্রালোকগামী আত্মা তাহাদের কথা বেশ বুঝিতে পারিল—কারণ দেহমুক্ত আত্মার জ্ঞান আমাদের জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী।

চন্দ্রালোকের শ্রেষ্ঠ জীবগণ পৃথিবী সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল; কেহ কেহ বিবিধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতেছিল পৃথিবী জীববাসের অযোগ্য এবং পৃথিবীর বায়ুস্তর এত গাঢ় যে সেখানে তাহাদের বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনেকে একমত হইয়া বলিল গ্রহ উপগ্রহ সমূহের মধ্যে চন্দ্রই একমাত্র বাসোপযোগী।

পাহারাওয়ালা এই সমস্ত তর্ক বিতর্ক শুনিয়া বড়ই আমোদ বোধ করিল। তাহার আত্মা চন্দ্রালোকে কিন্তু তাহার দেহ বৌবাজারের থানার সম্মুখে দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার নির্নিমেষ স্থির চক্ষুদ্বয় সুদূরবর্ত্তী চন্দ্রের দিকে উৎক্ষিপ্ত, তাহার রুল হস্তবিচ্যুত, যেন সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

একজন পথিক রাত্রিশেষে সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পাহারাওয়ালা, কটা বেজেছে?"—উত্তর না পাইয়া পথিক তাহার সুদীর্ঘ নাসিকা ধরিয়া সজোরে নাড়া দিল পাহারাওয়ালার দেহ ভূতলে পতিত হইল। তবে কি পাহারাওয়ালা মরিয়া

গিয়াছে ? ক্রমেই সেখানে দুই একজন করিয়া লোক জমিতে লাগিল, অবশেষে প্রভাতে তাহার দেহ হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল, শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ পরীক্ষা করিতে হইবে।

পাহারাওয়ালার দেহ হাঁসপাতালে আনীত হইলে ডাক্তারেরা সর্ব্বাগ্রে তাহার পাদুকা খুলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই জড় দেহে আত্মার পুনরাবির্ভাব হইল, পাহারাওয়ালা চক্ষু মেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সকলের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না, তাহার কি হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিল,—সমস্ত রাত্রি সে অতি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছে, দুই শত টাকা পাইলেও সে আর কখন এমন স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি কাটাইতে রাজী নহে।

তাহার পর তাহার মনে হইল, পূর্ব্বরাত্রে সে তাহাদের দারোগা বাবুর পাদুকা জোড়া সখ করিয়া পায়ে দিয়াছিল, আজ সকালে উঠিয়াই হয় ত তিনি জুতার অনুসন্ধান করিবেন ; তাঁহাকে কি জবাব দিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে জুতা জোড়াটি পাগড়ির ভিতর ঢাকিয়া লইয়া সে প্রস্থান করিল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

থানায় আসিয়া পাহারাওয়ালা বিনামা সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য শুনিতে না পাওয়ায় তাহার ভয় অনেক কমিয়া গেল। সে দেখিল, গত রাত্রে তাহার কি হইয়াছিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে সকলে ব্যস্ত। বেশী কোন জবাব না করিয়া সে আফিস ঘরের টেবিলের কাছে জুতাজোড়াটি চুপে চুপে রাখিয়া আসিল। কিন্তু দারোগা কিম্বা থানার অন্য কোন লোক বিনামা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিল না, সুতরাং পাহারাওয়ালা যেখানে রাখিয়া গেল, সেখানেই পড়িয়া রহিল।

বেলা দশটার সময় ইনেস্‌পেক্টরের কেরাণী বাবু আসিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া যাইবেন তখন দেখিলেন টেবিলের নীচে একজোড়া জুতা পড়িয়া রহিয়াছে, জুতা জোড়াটি খুব নূতন ; দেখিয়া তাঁহার অনেকটা কৌতুহল উপস্থিত হইল, "আচ্ছা যারই হোক আমার পায়ে লাগে কিনা দেখি না" এই কথা বলিয়া তাহা পায়ে দিলেন। পায়ে দিয়া বলিলেন "বাঃ—বেশ জুতো ত, একবার আজ ইডেনগার্ডেনে বেড়িয়ে আসা যাক, বহুকাল সেদিকে যাওয়া হয় নি।" কতকগুলি দরকারী কাগজ পত্র পকেটে পুরিয়া কেরাণী বাবু ইডেন গার্ডনের দিকে চলিলেন।

উদ্যানের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার একটি কবি বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন, উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল; কবি বন্ধু বলিলেন "আমি ভাই, শীঘ্রই দারজিলিং যাচ্ছি, বোধ হয় তিন চার দিন পরেই যাব।"

"তোমরাই ভাই সুখী, যেখানে ইচ্ছে বেড়াচ্ছ, কোন চিন্তা নেই, ক্ষুদ্র প্রাণী আমরা রাতদিন খেটে খেটে মারা গেলুম।"

কবি উত্তর করিলেন "তা বটে কিন্তু তোমারই বা এমন চিন্তা কি, বেশ জলের মত দিন কেটে যাচ্ছে, কাল কি করে চলবে সে ভাবনা নেই, কিছু দিন এই রকমে কাটিয়ে দিতে পাল্লেই একটা পেন্সনের যোগাড় হবে মন্দই বা কি?"

কেরাণীবাবু—"যাইহোক ভাই, তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী, নিভৃত কুঞ্জবনে সারাদিন বসে সরস কবিতা লেখা, চারদিক হতে লোকের অবিরাম প্রশংসাবৃষ্টি, পরের হুকুম শুন্‌তে হয় না, আমার মত যদি একদিন আফিসে ব'সে কলম ঠেল্‌তে আর কারণে অকারণে সাহেবের তাড়া খেতে ত বুঝতে আমার জীবন কেমন সুখের।"

অনন্তর উভয়ে দুইদিকে প্রস্থান করিলেন।

কেরাণীবাবু ঘুরিতে ঘুরিতে একটা ঝিলের ধারে আসিয়া পড়িলেন, লতাবিতান মধ্যবর্ত্তী একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "কবি হওয়া বেশ, আমি যদি কবি হতুম ত বেশ হ'তো, তা হলে আমি নিশ্চয়ই বাজে কবিতা লিখতুম না। আজকের দিনটা বাস্তবিকই কবির মনের মত। মেঘগুলি কি সুন্দর! চারিদিক হতে ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে, আমার মনে এত আনন্দ হচ্ছে! অনেক দিন এমন হয় নি।"

বলা বাহুল্য পাদুকাপ্রভাবে কেরানী বাবু কবি হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি হৃদয়ে এক অনন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস অনুভব করিলেন, তাঁহার কল্পনা শক্তি তীব্র হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রের কঠোরতার কথা ভুলিয়া শুধু শৈশবের সুখ ও স্বাধীনতা মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যে পিতামাতার স্নেহ, বিহঙ্গ নীড়ের ন্যায় স্তব্ধ পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শোভা, প্রথম যৌবনের অদম্য আবেগ, বিবাহ রাত্রে চারি চক্ষুর সবিস্ময় সম্মিলন, অস্ফুট প্রেমের প্রথম সলজ্জ আবাহন, এবং সামান্য কারণে গুরুতর অভিমান ও প্রবল অশ্রুবর্ষণ, সমস্ত তাঁহার মনে আসিতে লাগিল।

সহসা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে একটি পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল, তাঁহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ লইল; ভাবিলেন "তাই ত, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম, স্বপ্নে প্রকৃত ঘটনার ছবি কেমন উজ্জ্বল দেখা যায়! ঐ পাপিয়ার গানে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, বাস্তবিক, পাপিয়ায় কি সুন্দর গান কর্ত্তে পারে, এই পাপিয়ার জীবন কবির জীবনের চেয়েও সুখী; কোন বন্ধন নেই, যেখানে ইচ্ছা উড়ে যাচ্ছে, সমস্ত জীবনে আনন্দ ও মুক্তি, অনন্ত নীল আকাশে অবারিত গতি, কিন্তু আমাদের?—কবি' সত্যই বলেছেন—

"আমরা এ মর্ত্তবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি
আগে পাছে চেয়ে যাই
যদি কিছু নাহি পাই
অমনি হতাশ হয়ে কাঁদি অবিরত।"

আমারো মনে হচ্ছে যদি এই পাপিয়ার জীবন পেতুম ত কবিতা তরঙ্গ ঢেলে জগৎ ভাসাতুম।"

মুহূর্ত্তমধ্যে কেরাণী বাবু পাপিয়া-দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন তিনি বুঝিতে পারিলেন, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমি স্বপ্নই দেখ্‌চি, কিন্তু এমন অদ্ভুত স্বপ্ন ত কখন দেখিনি।"—তিনি কবি হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পাদুকাপ্রভাবে কবি হইয়াছিলেন, এখন আবার ইচ্ছা করিবামাত্র পাপিয়া হইতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব ছুটিয়া গেল। "দিনের বেলা কেরাণীগিরি কর্‌বো, আর রাত্রে পাপিয়া হয়ে গাছে গাছে উড়ে বেড়ানর স্বপ্ন দেখ্‌বো—এ বড় মন্দ আমোদ নয়" বলিয়া তিনি নিবিড় পত্রপূর্ণ একটি ছোট কামিনীর ডালে গিয়া বসিলেন।

হঠাৎ একটি বালক তাঁহাকে চাদর চাপা দিয়া ধরিয়া ফেলিল, পক্ষীরূপী কেরাণী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি ছোঁড়া, তোর এত বড় দুঃসাহস যে পুলিশের লোকের গায়ে হাত দিস্?"—কিন্তু এই পরুষ ভাষার পরিবর্ত্তে বালক শুধু পাপিয়ার চিঁ চিঁ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল মাত্র।

কেরাণী বাবু বলিলেন "আমি স্বপ্নই দেখ্‌চি, না হলে ছোঁড়াটার উপর বড় রাগ কর্ত্তুম, ছিলুম কবি, হলুম পাপিয়া—আবার পড়াগেল একটা ছোঁড়ার হাতে। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি —"

বালক পাপিয়াকে বাড়ী লইয়া গেল এবং তাহাকে এক খাঁচায় পুরিয়া যেখানে একটি টিয়া ও একটি শ্যামা বিভিন্ন খাঁচায় বসিয়া গল্প করিতেছিল সেখানে ঝুলাইয়া রাখিল। পাপিয়াকে দেখিয়া শ্যামা টিয়াকে বলিল "দেখ, দেখ আজ আবার একটা ছোট পাখী ধরে এনেছে, বেচারীর জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, আজ না জানি ওর কত কষ্ট, ওকে দেখে যে দিন আমাকে এরা প্রথম ধরে আনে সেই দিনের কথা মনে পড়ছে; সে কত দিনের কথা, কিন্তু যেন সেদিন বলে মনে হচ্ছে, এ সঙ্গীহীন, একঘেয়ে জীবনটা বড় দুর্ব্বহ; দিনের পর দিন আস্‌চে যাচ্ছে কিন্তু তার মাধুর্য্য ভোগ করবার যো নেই, শুধু সেই একরকম খাওয়া, ঘরের সেই এক কোণে খাঁচার মধ্যে বসে মুখস্ত বুলি আউড়ে সকলকে সন্তুষ্ট করা এই যেন আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এরা শুধু খাইয়েই আমাকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে চায়, হায়, এরা জানেনা সঙ্গী সঙ্গিনীদের সাথে মুক্তপক্ষে ইচ্ছামত নীল আকাশে, সবুজ পাতায় ছাওয়া বড় বড় বনে, সরোবরের শস্য পূর্ণ উর্ব্বর তীরে ঘুরে বেড়ানতে কতসুখ, আমার সে পূর্ব্ব জীবনের কথা আমার কাছে একটা সুখ স্বপ্নের মত। আমার আরো মনে পড়ে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বিজন মধ্যাহ্নে একটি দীর্ঘ বকুলের পাতার ভিতর বসে আমি শিশ দিতুম, তার বিস্তৃত ছায়ায় বসে পাড়ার মেয়েরা বউ বউ খেলা কর্ত্তো, তাদের হাসিতে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হোত। সন্ধ্যার আলো নদীর কালোজলে পড়লে বউরা কলসী কাঁখে জল নিতে আস্‌তো, ছেলেরা জলে দাপাদাপি কর্ত্তো, আমি নদীর ধারে লিচু বাগানে পাকা লিচুর রস আস্বাদন কর্ত্তাম, আমার নখস্পর্শে তাদের সরসদেহ বিদীর্ণ হয়ে যেতো।"

টিয়া উত্তর করিল "তা বটে কিন্তু আমি এখানে ঢের ভাল আছি, আর যাই হোক খাওয়াটা আগে চাই, এখানে তার অভাব নেই, সুখী হওয়া মনের খেয়ালের উপর নির্ভর করে মাত্র। তোমার প্রকৃতি কবির মত, আমার তা নয়; আমার উপস্থিত বুদ্ধি খুব বেশী, আর আমার ঠোঁট ও খুব ধারাল, সাধ্য কি আমার গায়ে কেউ হাত দেয়! বুদ্ধিবলে আমি সকলকে আশ্চর্য্য করে ফেলি, কিন্তু তুমি শুধু সে কালের কথা ভেবেই মর।"

শ্যামা টিয়ার কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া শিশ্ দিয়া বলিল "হায়, কোথায় চিরনির্ব্বাসিত সঙ্গীসুখহীন আমি, আর কোথায় আমার সেই প্রিয়তম জন্মভূমি! সেখানে শ্যামল তরুর সতেজ শাখা পল্লব বায়ু হিল্লোলে নির্ম্মল সরোবর জলে কেমন কম্পিত ছায়া ফেলে। আমার আত্মীয়গণ সেই সকল বৃক্ষশাখায় কতসুখে সময় কাটায় আর হতভাগ্য আমি পিঞ্জরাবদ্ধ, অতীতের সুখস্বপ্ন মনে করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলচি।"

টিয়া বলিল "ওসব দুঃখ এখন রেখে দাও, এস একটু আমোদ করা যাক।" শ্যামা পাপিয়াকে ডাকিয়া বলিল "তুমিও আমাদের মত আজ পিঞ্জরাবদ্ধ, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট ভাল, পালাও পালাও; ঐ দেখ ভুলে তোমর খাঁচার দুয়োর খুলে রেখে গেছে, পালাও!

এই সময় গৃহমধ্যে একটি বৃহৎ বিড়াল আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামা ভীত ভাবে খাঁচার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, টিয়া ডানা নাড়িয়া কহিল—"কি বিপদ, মানুষ হওয়া ঢের ভাল, মানুষের এত শত্রুনেই।"

পাপিয়ারূপী কেরাণী মহাভীতচিত্তে মুক্তদ্বার পিঞ্জর হইতে বাহিরে উড়িয়া গেল; অনেক দূর উড়িয়া ক্লান্তিবোধ করিলে একটি বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িল। বাড়ীটি তাহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। জানালার ভিতর দিয়া গৃহমধ্যস্থ একটি বিছানার উপর বসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "কি বিপদ, মানুষ হওয়া ঢের ভাল, মানুষের এত শত্রু নেই"—টিয়ার শেষ কথা তখনো তাহার কাণে বাজিতেছিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে পাপিয়া কেরাণীদেহ পুনর্প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রসারিত শয্যায় দেহ বিস্তার করিল। এই গৃহ এবং এই শয্যা তাহারই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে কেরাণী মহাশয় তখনো শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় দ্বারদেশে কে আঘাত করিল, তিনি তাড়াতাড়ী দ্বার খুলিয়া দেখেন তাঁহার বন্ধু ললিত বাবু।

"কিহে ললিত, এত সকালে যে?"

"আর ভাই, কাল রাত্রে আমার জুতো জোড়াটা কে সরিয়েচে, আর এক জোড়া না কিন্লে আর চল্বে না, তার জন্যে বড় ভাবিনে তবে চিরকালই সকালে খানিক বেড়ান অভ্যেস, সেইটে আটকাচ্চে,—তোমার জুতো জোড়াটা দেওত খানিক ঘুরে আসি।"

কেরাণী বাবু উত্তর করিলেন "এই? এরজন্যে চিন্তা কি ঐ আছে পায়ে দিয়ে যাও।"

ললিত বাবুর নিতান্ত দুর্ভাগ্য তিনি ভাগ্যদেবতার পাদুকা পায়ে দিয়া চলিয়া গেলেন। সকাল পাঁচটা বাজিয়াছে, রাস্তায় দুই একখানা গাড়ী চলিতেছে, গঙ্গাস্নানের জন্য দুপাঁচজন ভদ্র মহিলা আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছেন, এবং মস্তকে

চাদর বাঁধিয়া ছাতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুই একজন লোক তাহাদের নৈশভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিতেছে।

ললিত বাবু দ্রুত পদে চলিতেছেন আর বলিতেছেন "বেড়ানর চেয়ে আর কিসে বেশী আমোদ আছে? যদি দেশেদেশে ঘুরে বেড়াতে পারি ত আর কিছু চাইনে, যেমন করেই হোক একবার আমাকে রাজপুতানা যেতে হবে, সেখান হতে—।"

কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহার সম্মুখে ধূসর পর্ব্বত শ্রেণী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল, পর্ব্বতের উপর শত শত বৃক্ষ, অনেক উপরে বলিয়া বৃক্ষগুলিকে অতি ছোট বোধ হইতে লাগিল, পর্ব্বত চূড়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে।

ললিত বাবু বলিলেন "এই রাজপুতানা নাকি?—আমি পথ চল্‌তে চল্‌তে স্বপ্ন দেখচি? কিন্তু কৈ চিতোর কৈ, কোথায় আরাবলীর সেই পাষাণ স্তূপ যার প্রত্যেক উপত্যকায় বীরপ্রবর প্রতাপসিংহের গৌরব কাহিনী লেখা আছে; হায়, এখোনো কি চারণগণ সেই পূর্ব্ব গৌরব গীতি গান করেন; সেই অমৃত গাথা শুন্‌তে শুন্‌তে কি রাজপুত বালার চোখ এখনো তেমনি অশ্রুপূর্ণ হয়; সেই মধুর দৃশ্য আমার একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে চিতোরের উন্নত গিরিদুর্গ ফুটিয়া উঠিল; দুর্গ আর তেমন সুন্দর তেমন সজ্জিত নহে, প্রাচীন মহত্বের জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভ মাত্র। ললিত বাবু দেখিলেন তিনি আরাবলীর এক উপত্যকায়, একটি দীর্ঘ বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আছেন: সূর্য্য প্রায় অস্তগত, সুন্দর অপরাহ্ণ এবং চতুর্দ্দিক অত্যন্ত নিস্তব্ধ। এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে অল্প গীত ধ্বনি শুনিতে পাইলেন—শব্দ মধুর এবং গম্ভীর, কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন একটি পার্ব্বত্য পল্লী, একটি বৃক্ষমূলে প্রসারিত আসনের উপর একজন বৃদ্ধ চারণ, তিনি প্রতাপ সিংহের মৃত্যু শয্যার কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছেন! দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর অক্লান্ত ভাবে মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও তাঁহার দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, কারণ তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন; কিন্তু আজ তিনি অভিনব বেশে দেবতার দেশে যাইবেন, আজ তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে কেন? তাঁহার আজন্মের পবিত্র ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, তবে আজ তাঁহার চক্ষে অশ্রু কেন?—কেন, তাহাই চারণদেব মধুর ভাষায় গাহিতেছিলেন, বৃদ্ধের স্বর ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, এবং অবশেষে তাহা সেই ক্ষুদ্র পল্লী নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য-প্রদেশ প্লাবিত করিয়া বহু উচ্চে—নীলাকাশে প্রেরিত হইল, দীপহস্তে রাজপুত বালাগণ চারণ দেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক অনন্যমনে তাঁহার অমৃত কাহিনী শুনিতে লাগিল, শুনিতে শুনিতে তাহাদের চক্ষু জল পূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই অশ্রুপূর্ণ উজ্জ্বল নয়নে কম্পিত দীপশিখা পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলোকতরঙ্গ উত্থিত করিল। একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া ললিত বাবু এই সঙ্গীত ও দৃশ্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল, চারণদেব নিস্তব্ধ হইলেন, বালিকাগণ ধীরে ধীরে নিজ নিজ কুটীরে চলিয়া গেল। ভয়ানক অন্ধকার বৃক্ষশাখায় আরণ্যপক্ষীগণ বিকট শব্দ করিতে লাগিল, ঝাঁকে ঝাঁকে মশক আসিয়া ললিত বাবুকে আক্রমণ করিল, দংশন যন্ত্রণায় তিনি ছটফট্ করিতে লাগিলেন, ক্ষুৎ পিপাসায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ললিত বাবু মনে মনে বলিলেন "এই সব উৎপাতের জন্যে দেশভ্রমণেও সুখ নেই, যদি শরীর না থাক্‌তো, তাহলে দেহ মুক্ত আত্মা স্বাধীন অবারিত গতি হয়ে বায়ুতরঙ্গের মত যথেচ্ছা বেড়াতে পাত্তো। আমি যেখানে যাই সব সময়ই আমার প্রাণে একটা

অতৃপ্তি জেগে থাকে, কেন তা জানিনে। আমি যা পাই তার চেয়ে যেন একটা কিছু ভাল চাই একটা পরিপূর্ণ কিছু চাই কিন্তু তা কি ?—সুখ : পূর্ণ, অনন্ত সুখ।”

এই কথা বলিবামাত্র তিনি নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন নির্জ্জন গৃহে তাঁহার দেহ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাঁহার প্রাণ পার্থিব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে, শুদ্ধ প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে। তখন গ্রীক দার্শনিক সোলনের উক্তি তাঁহার মনে পড়িল, সোলন বলিয়াছেন মৃত্যুর পর ভিন্ন কাহাকেও প্রকৃত সুখী বলা যায় না। আজ তিনি সেই বিজ্ঞ দার্শনিকের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলেন।

দুই দিন পূর্ব্বে তিনি পড়িয়াছিলেন।

“কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন নর গেছে সেখানে,
সেই মানস সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
সেই রবিহীন মণিদীপ্তি প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।”

আজ বুঝিলেন দেহ সুখ ও দুঃখের মধ্যে পূর্ণ ও অপূর্ণতার মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দেয়, মৃত্যু তাহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করে।

মৃতদেহের পার্শ্বে ছায়ারূপী দুইটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল ; ভাগ্যদেবতা ও যমরাজ উভয়েই উপস্থিত।

যমরাজ মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া ভাগ্যদেবতাকে বলিলেন “তোমার পাদুকা মানুষকে কিরূপ সুখী করিতে পারে তাহা দেখিয়া লও।”

ভাগ্যদেবতা উত্তর করিলেন “অন্যের কথা যাহাই হউক—এই মৃত ব্যক্তিকে সুখী করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।”

যমরাজ মস্তক আন্দোলন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন “তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নহে, এই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত্যু লাভ করিয়াছে, এখনো ইহার কালপূর্ণ হয় নাই ; যে সমস্ত অমূল্য রত্নে পৃথিবী পরিপূর্ণ ইহার আত্মা এখনো তাহা দেখিবার অধিকারী হয় নাই, ইহার জীবনের কার্য্য এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, আমি ইহার প্রকৃত উপকার সাধন করিব।”

যম মৃতদেহ হইতে ভাগ্যদেবতার পাদুকা উন্মোচন করিয়া লইলেন। মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল, উদ্যম, উৎসাহ সমস্ত ফিরিয়া আসিল।

বিজয়ী যম পাদুকা লইয়া অদৃশ্য হইলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভাষা-পুষ্টি।

গতবারের ভারতীতে “ভাষা-বিভ্রাট” শীর্ষক প্রবন্ধে অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় আছে। মাতৃভাষায় যে আমাদের সমুদায় প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ভাষার এই ন্যূনতা নিবারণের উপায় লইয়া পূর্ব্বাবধি মতভেদ চলিতেছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নূতন কোন ভাব প্রকাশের জন্য কথার অভাব হইলে সংস্কৃত বা সংস্কৃত ধরণে গড়া ভিন্ন অপর কোন কথা ব্যবহার করিতে নারাজ। আর এক শ্রেণীর

লোক ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন, যে ভাষার সম্পর্ক হইতে যে নূতন ভাব পাওয়া যায়, সেই ভাষায় সেই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে কথা ব্যবহার করা হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। প্রথম শ্রেণীর লোকের চেষ্টা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, শেষোক্ত শ্রেণীর লক্ষ্য বুঝিবার আয়াস লাঘব করা। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ আত্মগৌরব ও পূর্ব্ব সংস্কারের দোহাই দেন, শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞানই শরণ্য।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয় শ্রেণীর মতের মধ্যেই সত্যকে আংশিকরূপে পাওয়া যায়, এবং উভয়ে সমগ্র সত্য নির্দ্ধারণের বিশেষ সহায়তা করে। শুধু সংস্কার ও অভিমানের সাহায্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, শুধু জ্ঞান অবলম্বনে বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মানুষ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। যেমন ভাল করিয়া উড়িবার জন্য পাখীর দুইটি ডানার আবশ্যক তেমনি মানুষের যথার্থ উন্নতির জন্য সংস্কার ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন। শুধু গতানুগতিক হওয়া পশুদিগের ধর্ম্ম। এবং দেশকাল পাত্র বিচারশূন্য জ্ঞান অজ্ঞানের বিশেষ নিকট সম্বন্ধীয়। সংসার প্রবাহ শুধু জ্ঞানেও চলে না, শুধু সংস্কারেও চলে না। যেমন বিশুদ্ধ ধাতুতে বিনা খাদে চলিত মুদ্রা হয় না, তেমনি জ্ঞান ও সংস্কার—দুইকে না মিশাইলে কোন কাজই হয় না। এ কথাগুলি এত সহজ যে, হঠাৎ চোখে পড়ে না।

ভাষার যে পরিসর বৃদ্ধি বা পুষ্টি তাহা শুধু জ্ঞানেও হয় না, শুধু সংস্কারেও হয় না। জ্ঞান বলেন অল্প শক্তি ব্যয় করিয়া যাহাতে অধিক ফল লাভ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। সংস্কার বলেন, যেমন চলিতেছে, তেমনি চালাও, ফলের ন্যূনাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাষাটা কিছু আমাদের হাতধরা নয় যে আমরা যাহা বলিব তাহাই শুনিবে। ভাষা একটা নৈসর্গিক বস্তু, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সেই নিয়ম জানিয়া ভাষাকে চালাইতে পারিলে তবে তাহা চলিবে। জ্ঞানবিরোধী বা সংস্কার-বিরোধী বলিয়া সেই নিয়মকে অশ্রদ্ধা বা অঙ্গহীন করিলে আর যাহা ঘটুক ভাষার উপর আধিপত্য চলিবে না।

ফরাসীদেশে একটী পণ্ডিতদিগের সভা আছে। তাহার উদ্দেশ্য ভাষাকে সুনিয়মে আবদ্ধ করা, কিন্তু ভাষা সুনিয়মও জানে না, কুনিয়মও জানে না, আপনার মনে আপনি চলে। সভার সুনিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া ফরাসী ভাষা "ওটা কি?" না বলিয়া বলে, "ওটা কি যে বস্তু ওখানে?" এইরূপ অকারণে বুঝিবার আয়াস বৃদ্ধি দেখিয়া জ্ঞান অবাক হইয়া যায়। ইংরেজদের ভিতর মিল্টন ও কার্লাইল ভাষা প্রয়োগ বিষয়ে স্বদেশীয়দিগের সংস্কারের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ—অথচ তাঁহাদের তুল্য পূজনীয় লেখক কয় জন আছেন?

আসল কথা বোধ হয় এই যে, ভাষা জ্ঞানের গণ্ডীতেও আবদ্ধ নহে, সংস্কারের গণ্ডী-তেও আবদ্ধ নহে। যে ভাষার ধাতু চেনে, ভাষা তাহারই অধীন। ভাষার ধাতু একটা স্বতন্ত্র জিনিস—জ্ঞান ও সংস্কার উভয় হইতেই ভিন্ন। তাই শেষ কথাটা এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গালা ভাষার ন্যূনতা পূরণের জন্য ইংরেজি কথাই লও, আর সংস্কৃত কথাই লও—বে-ধাতুর কথা লইও না।

ভাষা-বিভ্রাটের লেখক বলিয়াছেন, "আমাদের নূতন ভাবগুলি আমরা ইংলণ্ড হইতে ইংরেজি-ভাষাযোগে পাইয়াছি। এ অবস্থায় সেই সব ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য নূতন কথা সৃজন না করিয়া ইংরাজি কথাটি বাঙ্গালায় প্রচলিত করাই ত সহজ উপায় মনে হয়"—ইহা সত্য। কিন্তু ভাষা গড়া অত সহজ নয়। ব্যারামের জন্য নীমের বড়ী

খাইতে হইবে—তবে তাহা অপর একটা বস্তুর ঠুলি করিয়া খাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু এ কথা কয় জন লোকে শুনিবে? ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোন ভাষার শব্দ ভাষান্তরে লইলে তাহা কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। নতুবা ভাষার ধাতের সঙ্গে মিলে না। Centralise এই ক্রিয়াবাচক ইংরাজী শব্দ জার্ম্মান ভাষায় "Centralisen" রূপে গৃহীত হইয়াছে। জার্ম্মান ভাষায় ক্রিয়াবাচক প্রত্যয় 'en', সেইটা যোগ না করিলে জার্ম্মানদের ঐ শব্দ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। জ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্য করিলে জার্ম্মানেরা ইংরাজী ক্রিয়া-বাচক প্রত্যয় "ise" পরিত্যাগ করিয়া "Centralen" শব্দ করিত, কিন্তু সংস্কারের ব্যভিচার হয় বলিয়া শব্দের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়াও Centralisen" শব্দ গড়িয়াছে। ইংরাজী হইতে ক্রিয়াবাচক শব্দ বাঙ্গালায় গ্রহণ করিবার সময় তাহাতে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা ক্রিয়াবাচক "করা" শব্দ যোগ করিতে হয়, যথা,—পালিশ করা, বার্ণিশ করা, কারেক্ট করা, ইত্যাদি।

ইংরেজি কথা হুবহু বাঙ্গালায় ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে কিন্তু যে সকল কথা বাঙ্গালার ধাতুর সহিত মিলে না, তাহা বাঙ্গালায় লিখিলে যে পরিমাণ বেমক্কা ঠেকিবে, তাহার চাহিতে অনেক অধিক পরিমাণে সুবিধা না হইলে কথনই সে কথা বাঙ্গালায় স্থান পাইবে না। Aesthetic sense—এই বাক্যে যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা বোধ হয় আমরা সকলেই "ইংলণ্ড হইতে ইংরেজি ভাষাযোগে পাইয়াছি।" কিন্তু "সৌন্দর্য্য-জ্ঞান" না বলিয়া ঐ ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করিতে কয় জনের প্রবৃত্তি হইবে? যদি বল, "সৌন্দর্য্য-জ্ঞান" এখন বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে তাই ইংরেজি ভাষার সাহায্য অনাবশ্যক তবে বলিতে হয় কিন্তু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে যদি সকলে "ভাষা-বিভ্রাটের" লেখকের মতানুযায়ী হইত, তাহা হইলে ত আর চলিত না। যদি কোন গতিকে প্রথমতঃ Aesthetic sense—বাক্যই চলিত, তাহা হইলে একথা বলা দুঃসাহসিক নহে যে, যতদিন উহার পরিবর্ত্তে "সৌন্দর্য্য-জ্ঞান" না চলিত ততদিন লেখক পাঠক কেহই সুস্থির হইত না। মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে কিছু দূরবীনের প্রচলন হয় নাই—তবে কেন আমরা Telescope বা দূরবীক্ষণ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ফারসী দূরবীন শব্দ ব্যবহার করি। আরও বোধ হয়, পরভাষাকাতর কোন পণ্ডিত দূরবীন শব্দকেই দূরবীক্ষণ বলিয়া সংস্কৃত করিয়াছেন।

অপর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। লেখক বলেন, "বিবিক্ত" ও "অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট" শব্দ সমানার্থবাচক হইলেও প্রথমোক্ত হেয় ও শেষোক্ত উপাদেয়—কেন না উহা সহজে বোধ-গম্য হয়। "বিবিক্ত" শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর ব্যবহার হয় না, সত্য। কিন্তু শব্দের অর্থ যে বাঙ্গালীর মনে সচরাচর তোলাপাড়া করে না—ইহা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তবে এতদিন অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট কথাটা বাঙ্গালায় চলে নাই কেন? কেন তবে "প্রত্যাহৃত" "বিশ্লিষ্ট" প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে? এখনও কি সকলে নিঃসঙ্কোচে অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট শব্দ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত? যদি না হ'ন তাহা হইলে এ অপ্র-বৃত্তির কারণ কি একটা গোঁ ভিন্ন কিছুই নহে? আর যদি তাহাই হয়, তবে ইহা মনে রাখা উচিত যে, এ গোঁ বাঙ্গালীর প্রকৃতির গুণ, এ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইলে এ গোঁ ঘুচিবে না। যদি অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট শব্দ বে-ধাতুর বলিয়া পরিত্যজ্য হয়, তাহা হইলে "বিবিক্ত" শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নাই যাহা অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট শব্দের বাচ্যের বাচক। স্বভাবতঃ আত্ম-গত কোন বস্তু বিকৃতিবশতঃ অন্য বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া

আনিবার নাম প্রত্যাহার; এ অবস্থায় "প্রত্যাহৃত" ও অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট পর্য্যায়শব্দ হইতে পারে না। একজাতীয় একাধিক বস্তুর বিচ্ছেদকে বিশ্লেষ বলে, তবে "বিশ্লিষ্ট" শব্দ কি করিয়া অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট শব্দের সমানার্থবোধক হইতে পারে?

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের পক্ষে "ভাষা-বিভ্রাট"-লেখক আর একটি যুক্তি দিয়াছেন:—ভাব কথার আকারেই পাওয়া যায়, অতএব যে কথায় যে ভাবকে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভিন্ন সে ভাব প্রকাশের জন্য অপর কথা ব্যবহার করিলে মূল ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও আশে পাশের অনেক ভাবের রেশ মরিয়া যায়। একই ভাষায় পর্য্যায়কল্প ভিন্ন ভিন্ন শব্দ অবিচারে যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে এই দোষটি ঘটিতে পারে, কিন্তু একভাষাযোগে লব্ধভাব অন্য ভাষায় প্রকাশ করিবার সম্বন্ধে এ কথাটি খাটে না। কেননা ভাব ও ভাষার ওজন রক্ষা করিতে না পারিলে কেহ সুবক্তা বা সুলেখক হয় না। যদি কোন বাঙ্গালা লেখক বা বক্তা ইংরেজি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহারের জন্যই হউক বা অপর যে কোন কারণেই হউক যথাযথরূপে ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম হ'ন তবে তাহা দোষের বিষয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত কোন ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে, এমন অবস্থায় যদি তাঁহার ব্যবহৃত কোন সংস্কৃত কথার সহিত ইংরেজি প্রতিশব্দের সর্ব্ববিষয়ে মিল না হয়—তাহাতে কি দোষ?

এই সকল আলোচনার ফলস্বরূপ দাঁড়ায় এই যে, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজন, বাঙ্গালীর সকল প্রকার মনোভাব ছল পরিত্যাগ করিয়া সরল অন্তরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা। এ চেষ্টা করিতে হইলে ইংরেজি সংস্কৃত ফারসী আরবী গ্রাম্য নানা প্রকারের শব্দ সময়ে সময়ে ব্যবহার করিতে হইবে। এক প্রকারের শব্দ ব্যবহার করিব অন্য প্রকারের শব্দ ব্যবহার করিব না—এরূপ কোট করিলে চলিবে না। তবে যে কোন ভাষাজাত শব্দ ব্যবহার কর না কেন—মাতৃভাষার ধাতুর প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইও না।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস যে, সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার পক্ষে কখনই বেধাতুর হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে স্মরণ করান উচিত যে, সংস্কৃত-প্রসূত ভাষামাত্রেরই তিনটী অঙ্গ আছে,—তদ্রূপ, তদ্ভাব ও দেশজ শব্দ। হুবহু সংস্কৃত শব্দের নাম তদ্রূপ, সংস্কৃত ছাঁচে গড়া শব্দের নাম তদ্ভাব, এবং সংস্কৃতের সহিত সম্পর্ক শূন্য শব্দের নাম দেশজ। এই তিন প্রকারের শব্দকে লইয়াই বাঙ্গালা ভাষা গঠিত। ইহার কোন একটীকে পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গলা ভাষা আর থাকে না। বাঙ্গলায় এমন অনেক ফার্সি শব্দ আছে যে, তাহা ছাড়িয়া বাঙ্গলা ভাষা তিষ্ঠিতে পারে না। গোলাম শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র দাস শব্দ ব্যবহার করিলে বাঙ্গলা ভাষা অঙ্গহীন হয়, এইরূপ বহু ফারসী শব্দ আছে, যাহার অভাব সংস্কৃত শব্দের দ্বারা পূরণ হইতে পারে না, সেইরূপ ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাজাত শব্দও আছে। সংস্কৃতাভিমানীদিগের গোচরার্থ একটী কথা উপস্থিত করা যাইতে পারে। খোদ সংস্কৃত ভাষাতেই বিদেশী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে আর বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি বড় করিবার আবশ্যক কি? হোরা, নেমি, তামরস, পিক প্রভৃতি শব্দ অসংস্কৃত ম্লেচ্ছ ভাষা হইয়াও পূজ্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ভাষা নৈসর্গিক বস্তু, কতকগুলি নিয়মের অধীন। তাহার মধ্যে কতকগুলি ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, আর কতকগুলি এখনও অনাবিষ্কৃত রহস্য। যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ভাষাবিশেষে শব্দ-বিশেষ স্বধাতুর বা বে-ধাতুর হয়—তাহা এখনও বিশদরূপে বোধায়ত্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ নিয়মের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য—সন্ধি, বিসন্ধি শব্দের বিকার ও সংস্কার প্রভৃতি নিয়মের

অপেক্ষা কোন অংশে সন্দেহজনক নহে। তবে এই নিয়মটী এত সূক্ষ্ম এবং এত দুরূহ যে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত বা ভাষায় ব্যক্ত করা একরূপ অসম্ভব। এই নিয়মের জ্ঞানই সচরাচর রুচি শব্দের বাচ্য এবং ভাষার ধাতু বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ইহারই উল্লেখ হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশের নূতন যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইবে বাঙ্গালীর রুচিই তাহার কষ্টি পাথর। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এ কষ্টি পাথরের শরীর নাই, তাহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না; বাঙ্গলা ভাষায় নূতন ভাব প্রকাশের জন্য শব্দের সৃষ্টি বা যোজনা করিলে তাহা সোনা কি রাঙ্‌ হঠাৎ কষিয়া বলিবার যো নাই। এই অভাব মোচনের একমাত্র উপায় এই যে সকলে মিলিয়া বিশেষ বিশেষ নূতন ভাবকে লইয়া তাহার উপযোগী বাঙ্গলা শব্দ বা পদ গড়িয়া বিচারের জন্য আনা, তাহার পর যেটী বাঙ্গলা রুচির অনুকূল হইবে, সেইটীই ভাষায় গৃহীত হইবে। এইজন্য সাধারণের সম্মুখে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

যে সকল নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাঙ্গলায় প্রচলিত শব্দ নাই, তাহার উপযোগী শব্দ বা পদ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভারতীতে লিখিয়া পাঠাইলে আলোচনার জন্য প্রকাশিত হইলে ভাল হয় না কি? এইরূপ করিলে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইতে পারে, ভরসা করি বাঙ্গালা-ভাষা যাঁহাদের প্রিয় তাঁহারা এ বিষয় আমাদের সাহায্য করিবেন। আলোচনার উপযোগী যে কয়টী কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি তাহা এইখানে সন্নিবেশিত হইল।

১। Suggest শব্দের বাঙ্গলা কি হইতে পারে।

২। Theory ও Practice এই দুইটী শব্দকে বাঙ্গলায় বিচার ও আচার বলা যাইতে পারে কি না? যে সকল স্থলে 'আচার' শব্দ Practice এর প্রতিবাক্য নহে সেই সকল স্থলে ব্যবহার শব্দ সুপ্রযুক্ত হয় কি না? যথা—This should be reducd into Practice—ইহাকে ব্যবহারে পরিণত করিতে হইবে—এখানে 'আচার' শব্দ খাটিবে না।

৩। বিবিক্ত শব্দ Abstract শব্দের প্রতিবাক্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? কিন্তু তাহা করিলেও Abstraction এর বাঙ্গালা কি হইবে। বিবিক্তি ভাল হয় না, তবে কি "বিবিক্তগুণ" বলা যাইবে?

৪। Ideal এর বাঙ্গলা কি? কোন কোন স্থলে আদর্শ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সব জায়গায় উহা খাটে না। যেখানে না খাটে সেখানে আইডিয়াল শব্দই ব্যবহৃত হইবে কি না?

৫। টেকচাঁদ ঠাকুর একস্থলে "কাহনে কাণা কড়ায় কুশল" লিখিয়াছেন; যদি ইহা "Pennywise pound foolish"এর অনুবাদ হয়, তাহা হইলে ইহা একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অনুবাদ না একটী প্রচলিত বাঙ্গলা প্রবাদ?

৬। "Art" শব্দের বাঙ্গলা কি?

আশা করি আগামীবারের ভারতীতে এই বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হইবে এবং আলোচনা-যোগ্য অন্যান্য কথাও উত্থাপিত হইবে।

মহাপ্রেম।

আমি তোমারে না চাই।
তুমি আপনারে লয়ে, থাক সদা সুখী হয়ে
আমি তোমারই নামে আপনা হারাই।
আমি তোমারে না চাই।
ক্ষুদ্র হ'তে তুমি ক্ষুদ্র অপার প্রেমসমুদ্র
তৃণ হেন তাহে আমি ভেসে চলে যাই—
আমি তোমাকে না চাই।
প্রেম নিত্য এক রস আমাতেই আমি বশ
তুমি আমি সুখ দুঃখ সব এক ঠাঁই—
আমি কারে আর চাই?
বাসনা তরঙ্গ থেমে গলিয়া পড়েছে প্রেমে,
তুমি আমি সুখ দুঃখ কিছু যেন নাই!
আমি আমারে না চাই।

ফুলের মালা।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুতবের বুদ্ধিতে সাহেবুদ্দিনের প্রাণ দণ্ড করাই যুক্তিসিদ্ধ, শত্রুর জড় রাখা কিছুই নয়। বাদসাহের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া কুতব তাঁহাকে এই পরামর্শ দিতেছে। সভাসদগণ এ কথা কেহ জানে না, বালক সাহেবুদ্দিনের জন্য কাতর হইয়া তাহারা কুতবকেই ধরিয়া পড়িয়াছে যে তিনি সুলতানকে বলিয়া রাজ পুত্রের প্রাণ রক্ষা করুন। সভাসদদিগের বিশ্বাস বাদসাহ যদি কাহারো কথা রাখেন ত কুতবের কথাই রাখিবেন—অবশ্য নূতন রাণীর কথা ছাড়া। পাঠকও জানেন তাহাদের এই বিশ্বাস অমূলক নহে।

কুতব সভাসদদিগের কথা শোনে; শুনিয়া অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বলে "আগের দিন কি আছে যে কুতবের কথা আর সুলতানের কাজ একই হইবে; এইত দেখিলে সপ্ত রাজ পুত্রের প্রাণবধ হইল, কুতব কি তাহা নিবারণ করিতে পারিয়াছে?

আজিম খাঁ লোকটা সরল হৃদয়, মুক্তকণ্ঠ, অন্যায় অসহিষ্ণু, অযথা অত্যাচারের বিরোধী, ইহার উপর আবার সে সাহেবুদ্দিনের নিকট আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য ঋণী, কৃতজ্ঞ;

সুতরাং এরূপ কথায় তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না, সে ক্রোধোত্তেজিত ভীষণ হইয়া বলে,—

সুলতান সেকন্দর সাহের বিদ্রোহী হইয়া আমরা যে গায়সুদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইলাম সে কি কেবল আবার যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে? যদি সাহেবুদ্দিনকে বাদসাহ মুক্তি প্রদান না করেন ত আবার সমরানল বাধিবে। আর কেহ অস্ত্র না ধরে কুমারের জন্য এই হাত অস্ত্র ধরিবে।"

এই কথায় কুতব নৈরাশ্যের স্বরে বলিয়া ওঠে, "তাহাতে কেবল মরিবে তুমি, রাজপুত্র বাঁচিবেন না। রাজার রাজ্য আর নাই, এ সয়তানীর রাজ্য।"

অন্যেরা কুতবের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজপুত্রের ভাগ্য পরিণাম দর্শনে শিহরিয়া ওঠে, এবং অন্য কোন কথা না বলিয়া সমস্বরে কুতবের শেষ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া গায়সুদ্দিনের অন্যায়াচরণের জন্য নূতন রাণীকে অভিসম্পাদিত করে। শক্তির বিবাহের পর হইতে, সয়তানী বেগম, রাক্ষসী রাণী, বাঘিণীমহিষী,—প্রভৃতি তাহার এমনতর অনেক নূতন নামকরণ হইয়াছে। বলা বাহুল্য কুতবই তাঁহার এই সকল সুনাম রটনার মূল। প্রথমতঃ—যা শত্রু পরে পরে; কুতবের মন্ত্রণায় যে সকল মন্দ কাজ হয়, সে তাহা রাণীর ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে নিষ্কলঙ্ক থাকিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ রাণীর নিন্দা রটনা করিয়া সে বেশ সুখ অনুভব করে। সে ভাবে রাণী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাই সে তাঁহাকে বিষ নয়নে দেখে। কুতবের বিশ্বাস শক্তি আসিবার পূর্ব্বে সে যেমন রাজার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল এখন আর তাহা নাই; তাহার আসনে এখন শক্তি প্রতিষ্ঠিত সে তাহার নীচে পড়িয়াছে, শক্তির সহিত রাজার বিবাহ ঘটাইয়া সে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিয়াছে। কুতবের এরূপ ঈর্ষার যে বাস্তবিক কোন সঙ্গত কারণ আছে, তাহা যদিও নহে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনো কুতব সুলতানের দক্ষিণ হস্ত, বস্তুতঃ কুতবের দ্বারাই তিনি চালিত। তাহার প্রধান কারণ রাজাকে বশ করিতে রাণীর কোন চেষ্টাই নাই। রাণী দৈবাৎ রাজার কার্য্যাকার্য্যের দিকে চাহিয়া দেখেন, দৈবাৎ তাঁহাকে কোন অনুরোধ করেন। হইলে কি হয়; রাজা যদি কোন সামান্য বিষয়ে কুতবের কথা অমান্য করেন ত কুতব রাণীকে তাহার মূলে দেখিয়া তাঁহার প্রতি চটে। এইরূপে সম্প্রতি উপর্য্যুপরি এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে তাহার এই ঈর্ষা মহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েকজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে না পারায় কুতবের আজ্ঞায় তাহাদের রাজবাটীর নিকটস্থ একগাছে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করা হইতেছিল। রাজকুমারি গুলবাহার বহির্বাটীর বারেন্দা হইতে তাহা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গিয়া সেই কথা বলে। শক্তি ইহাতে রাজাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রাজ সরকারে চাকরী দান করেন। তাহাদেরি একজন অন্তঃপুরের বাগানের নূতন মালী সুন্দরলাল। কুতবের ইহাতে ক্ষোভের সীমা নাই; কিন্তু পরিপক্কবুদ্ধি সুচতুর সভাসদ হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, কুতব নিজের যথার্থ মনোভাব গোপন করিয়া

রাজার নিকট রাণীর করুণার প্রশংসাই করিল, আর সভাসদ ও সেই গরীব প্রজাদিগকে কৌশলে জানাইয়া দিল যে কুতবের অনুগ্রহেই কেবল সে বেচারাগণের অব্যাহতি ঘটিল, নহিলে রাক্ষসী রাণীর কৃপায় তাহাদের হাড় মাস একত্রে থাকিত না।

কুতব দেখিল রাজকুমারী বাহিরে আসিলে অনেক বিপদ, তাহাকে মহা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। রাজার সহিত হয়ত সে গোপনীয় কথা কহিতেছে রাজকুমারী আসিয়া উপস্থিত, কোন কথা কখন শুনিয়া গিয়া রাণীর নিকট বলিয়া হুলস্থুল বাধাইবে তাহার ঠিক কি। সে রাজাকে বলিল "সাহাজাদি এখন বড় হইতেছেন, এখন তাঁহাকে অন্তঃপুরবদ্ধা করাই ভাল, নহিলে রাজ কায়দা বজায় থাকে না।" রাজা কুতবের সহিত এক মত হইলেন, অথচ কার্য্যতঃ সাহাজাদির বাহিরে আসা বন্ধ হইল না, কুতব বুঝিল কাহার হাতে কলকাটি। কুতব মনে মনে চটিল; তবে কি করিবে নীরবে তাহা সহিয়া গেল। কিন্তু সহিবারও ত একটা সীমা আছে, কুতব যখন দেখিল রাজনৈতিক বিষয়েও রাণী ইচ্ছা করিলে রাজাকে চালিত করিতে পারেন, সেখানেও কুতব কেহ নহে তখন সে ইহার প্রতিকারে কৃতসঙ্কল্প হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুতবের পরামর্শে সাহেবুদ্দিনকে বধ করাই উচিত, রাজাও ইহাতে রাজি, কোন দিন ফাঁশি হইবে, তাহাই স্থির করিয়া কেবল হুকুম দেওয়া মাত্র বাকী, ইহার মধ্যে রাজা কুতবকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন, "কুতব, তাহাতে আর কাজ নাই সাহেবুদ্দিনকে মাপ করা যাউক"।

কুতব আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া বলিল, "ইহা আপনার বুদ্ধি না আর কাহারো? সাহেবুদ্দিন আপনার জ্যেষ্ঠের পুত্র, প্রকৃত রাজ্যাধিকারী; ইহা মনে রাখিবেন।" গায়সুদ্দিন বলিলেন, "রাজ্য আমার, ধন আমার, সৈন্য আমার, সে একা বিপক্ষ হইয়া আমার কি করিবে? সে বিদ্রোহী হইলে আমার ক্ষতি নাই; তাহারি ক্ষতি।"

কুতব বলিল, "আর গণেশদেব তিনিও মাপ পাইবেন?"

রাজা বলিলেন, "যদি শপথ করেন যে, জীবনে কখনো কোন অবস্থায়, আমার বিপক্ষ না হইয়া স্বপক্ষ থাকিবেন তাহা হইলে তাঁহাকেও মুক্তি প্রদান করিব। গণেশদেব একবার কথা দিলে যে তাহা ভঙ্গ করিবেন না ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কুতব। যদি কথা না দেন?

রাজা। তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইবে। গণেশদেবের সহায়তায় উপরেই সাহেবুদ্দিনের নির্ভর। শপথে হউক, মৃত্যুতে হউক গণেশদেব নিরস্ত হইলে সাহেবুদ্দিনকে আর ভয় নাই। তাহাকে অনায়াসে তখন মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ সেই হত্যাকাণ্ডে আমার যেরূপ অপযশ হইয়াছে সাহেবুদ্দিনকে মুক্তি দিলে সে কলঙ্ক অনেক পরিমাণে ক্ষালিত হইবে।"

কুতব বুঝিল সুলতান মন্দকথা বলিতেছেন না। অন্য সময় হইলে সে রাজবুদ্ধিকে তারিফ করিয়া তাঁহার সহিত একমত হইত। কিন্তু ইহা রাণীর পরামর্শ জ্ঞানে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল

"বালক বড় হইলে ঢের গণেশদেব তাহার পক্ষ হইবে। তবে আপনার মঙ্গল আপনি ভাল বোঝেন, আমাদের অধিক কথা কহা নিষ্প্রয়োজন।"

কুতবের মনে এতদিন ঈর্ষার যে আগুন ধূমায়িত হইতেছিল, এই ঘটনার পর তাহা বিষম প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাণীর নিন্দা রটনা করিয়াই আর সে তৃপ্ত থাকিতে পারিল না। তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ভাগ্য অতি শীঘ্র তাহার এই মনস্কামনা পূর্ণ করিবার অবসর ঘটাইয়া দিল।

সেক্ষপীর যে তাঁহার কাব্য জগতেই কেবল একটি মাত্র ইয়াগোর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এমন নহে, সত্য জগতেও এমন অনেক ইয়াগো আছে। কুতবের আন্তরিক ভাব রাণী কিছুই জানেন না বরঞ্চ বিপরীত। তিনি জানেন, কুতব তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি কুতবের সাহায্যেই সন্ন্যাসিনী সাজে অন্তঃপুর ছাড়িয়া গণেশ দেবের সহিত দেখা করিতে পারিয়াছিলেন। কুতব যে তখন তাঁহারি সহায়তা করে, তাহার প্রধান কারণ, তাহার ইচ্ছা ছিল শক্তি আর না ফেরেন, দ্বিতীয়তঃ, যদি বা ফেরেন তাহা হইলেও এই উপকারে একদিকে রাণী হাতে থাকিবেন অন্য দিকে আবশ্যক হইলে ইহা ব্যক্ত করিয়া রাণীর সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে। এখন সে ভাবিতে লাগিল, নিজের দোষ টুকু ঢাকিয়া কিরূপ কৌশলে রাজাকে সেই কথা জানাইয়া রাণীকে অপদস্থ করে। কিন্তু সহসা ভাগ্যবলে আপনা হইতে আর এক নূতন উপায় আসিয়া জুটিল, আর তাহার সে পুরাতন ঘটনা অবলম্বন করিতে হইল না। রাণী কুতবকে ডাকিয়া বলিলেন তিনি কারাগারে গনেশদেবের সহিত একবার দেখা করিতে চাহেন।

এইখানে বলা উচিত কুতব সেই শ্রেণীর লোক যাহাদের রাজ-অন্তঃপুরে গমনের বাধা নাই। রাণীর কথা শুনিয়া কুতব তাঁহাকে জানাইল, অবশ্যই কুতব সে সুযোগ ঘটাইবে। রাণীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে জীবন দিতে পারে, ইহা ত সামান্য কথা।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তির আজ সন্ন্যাসিনী সাজ নাই রাজরাজেশ্বরী বেশ। বিবাহের পর পাঠক তাহাকে ক্ষণকালের জন্য যেরূপ মণিময় সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াছিলেন আজ সেই সাজে সে গণেশ দেবকে দেখা দিতে আসিয়াছে। হাঁ; আজ সে বাল্যসখা প্রিয়তম রাজকুমারকে দেখিতে আসে নাই, চিরশত্রু, বিরাগ ভাজন, ঘৃণার পাত্র গণেশদেবকে স্বপ্রভাব দেখাইতে আসিয়াছে। তিনি শক্তিকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া যে ভালই করিয়াছেন সেই জন্যই যে আজ সে সামান্য সামন্তরাণীর পরিবর্ত্তে রাজরাজেশ্বরী সুলতানা,—একদিন যে তাঁহার অনুগ্রহের

ভিখারিণী দীনহীন নারী ছিল, ভাগ্য ক্রমে সেই যে আজ তাঁহার প্রভু, ভাগ্যনিয়ন্তা ইহাই সে দেখাইতে আসিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে আসে নাই। তাহার বাল্য প্রেম, বাল্যস্মৃতি এখন লজ্জায় বিষয়,—অপমানের কথা; জ্বলন্ত প্রতিশোধে সে তাহা ভস্ম করিতে চাহে, প্রতিশোধই এখন তাহার প্রাণের সুখ, জীবনের তৃপ্তি। তাই সে তাহার সুখশান্তিহারী শত্রুকে নিজের মুখে মৃত্যুদণ্ড জ্ঞাপন করিয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছে।

কারাগার। মুক্তবাতায়ণ পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গণেশদেব কঠোর ভূমিশয্যায় শয়ান আছেন। সন্ধ্যাকালে বাদশাহের নিকট হইতে তাঁহার মুক্তির প্রস্তাব আসিয়াছিল। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই, কোন সূত্রে কখনো গণেশদেব বাদশাহের প্রতিকূলাচরণ না করিয়া যদি ন্যায়ান্যায় অবিচারে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে শপথ করেন তাহা হইলে সুলতান তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

গণেশদেব রাজানুগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এইরূপ চিরদাসত্বে আপনাকে বদ্ধ করা অপেক্ষা মৃত্যুও তাঁহার প্রার্থনীয়। সেই ঘৃণিত প্রস্তাব মনে করিয়া এখনো মাঝে মাঝে তিনি ক্রোধ কম্পিত হইয়া উঠিতেছেন,—আবার প্রিয় বিচ্ছিন্ন মুমূর্ষু ব্যক্তির কাতরতা সেই ক্রোধের স্থান গ্রহণ করিতেছে। রাজার মরিতে দুঃখ নাই, ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতে তিনি কাতর নহেন; কিন্তু তিনি মরিলে তাহার আত্মীয় স্বজনের কি দুর্দ্দশা হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যন্ত্রনা পীড়িত হৃদয়ে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। শেষ সময়ে একবার কাহারো সহিত দেখা পর্য্যন্ত হইল না;—এমন বন্ধুও কেহ নাই, যাহাকে তাহাদের সম্বন্ধে কোন একটি কথা পর্য্যন্ত বলিয়া যাইতে পারেন।—গণেশদেব যতই এই নৈরাশ্যবেদনা গভীররূপে অনুভব করিতেছেন; ততই মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইয়াও মৃত্যুতে অবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের উপর বিশ্বাস জন্মিতেছে, তাঁহার মনে হইতেছে কোন ঐশীশক্তি প্রভাবে এখনি কারাগারের কঠিন দেয়াল দ্বিধাযুক্ত হইয়া তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করিবে।

এই বিশ্বাসে নীত উত্তেজিত আত্মহারা হইয়া গণেশদেব সবলে সহসা দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, কঠিন দেয়াল ভাঙ্গিল না,—টলিল না; যেমন ছিল তেমনি রহিল, তিনি কেবল হাতে বেদনা অনুভব করিয়া আত্মস্থ হইলেন; তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল, তিনি কি পাগল হইয়াছেন! তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতে দেয়াল ভাঙ্গিবে! তাঁহার সন্ন্যাসিনীকে মনে পড়িল তিনি কি রাজার জীবনের জন্য নিশ্চেষ্ট আছেন! তাহা হইতেই পারে না,—অবশ্য গণেশদেব মুক্তিলাভ করিবেন, ন্যায়ের জন্য কার্য্য করিয়া কখনই তিনি জীবন হারাইবেন না। সহসা শক্তিকে মনে পড়িয়া অনুতাপের দংশনে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল; তিনি শক্তির সম্বন্ধে যে অন্যায় করিয়াছেন এসমস্তই তাহার ফল! তাঁহার আশা ভরসা সমস্ত বিদূরিত হইল, তিনি বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য! বিশ্বাসের উত্তেজনা, ক্রমে নৈরাশ্যের ক্লান্তিতে পরিণত হইয়া তাঁহার শ্রান্ত নয়নে তন্দ্রা আনয়ন করিল।—তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—

চতুস্পার্শ্বে আর দেয়ালের বাধা নাই, মস্তক দেশ অবারিত, তিনি মুক্ত শ্যামক্ষেত্রে নক্ষত্র

খচিত আকাশতলে দণ্ডায়মান, সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বিরাজিত। অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইবেন, এমন সময় দ্বার মোচন শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, সত্যই পরিচ্ছদের মণি কান্তিতে অন্ধকার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া গৃহ দ্বারে এক রমণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান,—স্বপ্নে সত্যে মিশিয়া গণেশ দেবের হৃদয় আশাপূর্ণ বিস্ময়জনক অপরূপ ভাবে পূরিয়া গেল।

কৃত্রিম রেশম।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কি অভাবনীয় কার্য্যই হইতেছে! প্রকৃতিদেবীর পরাক্রান্ত সন্তানগণ বুদ্ধি নৈপুণ্যে জননীর চিরঅধিকৃত রাজ্যে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং অনেক চেষ্টাতেই কৃতকার্য্য হইতেছে! ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের কথা? কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হওয়া ইহার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন। রেশম-কীটের সাহায্য ব্যতীত রেশম প্রস্তুত হইতে পারে, এ কথা বোধ হয় কেহ কখন কল্পনাই করিতে পারেন নাই; কিন্তু অল্প দিন হইল ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে ডি শারডোনে একটী সম্পূর্ণ নূতন এবং সহজ উপায়ে রেশম প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কল্পনাটীর সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

এই রেশম প্রস্তুত প্রণালীটী বুঝিতে হইলে কীটজাতি কর্ত্তৃক রেশম কি প্রকারে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা একটু জানা আবশ্যক। অনেকেই বোধ হয় জানেন, রেশম-কীট-ভুক্ত তুত্‌পাতা এবং কীটের উদরস্থ কয়েকটী জীর্ণকারক রসই রেশমের প্রধান উপাদান। ভুক্ত পত্রের কোষ জীর্ণ হইলে কীট-শরীরাভ্যন্তরীণ কয়েকটী যন্ত্রের সাহায্যে ঐ পত্র-কোষগুলি অন্য একটী স্বতন্ত্র স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই রেশম লালা। এই লালা উৎপন্ন হইবা মাত্র কীট-শরীরস্থ দুইটী থলিতে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং উপযুক্ত পরিমাণ সঞ্চিত হইলে ঐ থলি দুইটী হইতে সূক্ষ্ম সূত্রাকারে বাহির হইয়া এবং পরক্ষণে আপনা হইতেই সূত্র দুইটী মিলিয়া একগাছি স্থূলতর সূত্রে পরিণত হইয়া রেশম আকার ধারণ করে। পত্র কোষের এই সূত্রাকারে পরিবর্ত্তনে ইহার রাসায়নিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে—কীট-শরীরে অবস্থান কালীন ইহাতে নাইট্রোজেন প্রবেশ করিয়া এটিকে আর একটী স্বতন্ত্র পদার্থ করিয়া ফেলে। এই রেশমের সূত্র প্রায় ৮০০ আটশত হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়; ইহার স্থূলতা এত অল্প যে সাড়ে চারি লক্ষ গাছি সূত্র একত্র করিলে ইহার ব্যাস কেবল এক ইঞ্চি মাত্র হয়।

কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ ইহার প্রধান উপাদান উদ্ভিজ্জ-কোষ সংগ্রহ

করা আবশ্যক। কিন্তু কোষ সংগ্রহ ব্যাপারটী অতি সহজেই হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল কাষ্ঠখণ্ড, তুলা এবং ছিন্ন বস্ত্রাদিতে অধিক পরিমাণ উদ্ভিজ্জ-কোষ আছে দেখিয়া, তুত-পত্রের কোনই সাহায্য না লইয়া উক্ত পদার্থ সকল রেশমের প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে তুলা প্রভৃতি দ্রব্য আবশ্যক বলিয়া কৃত্রিম রেশম ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ একটী সুবিধা হইয়াছে। কারণ ভাল কাগজ প্রস্তুত করিতে তুলা, ছিন্নবস্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক; আর রেশম প্রস্তুত করিতে হইলেও ঠিক ঐ সকল দ্রব্যের আবশ্যক, সুতরাং কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহারোপযোগী সংগৃহীত উপাদান দ্বারা আনায়াসেই রেশম প্রস্তুত হইতে পারিবে। গত ফরাসী প্রদর্শনীতে বাস্তবিকই কাগজের জন্য প্রস্তুত দ্রব্য (Pulp) হইতে রেশম প্রস্তুত করা হইয়াছিল; এবং অন্যান্য স্থানেও কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতে ঐ উপায়ই অবলম্বন করা হইয়াছে।

কাগজের কারখানা হইতে ঐ সকল উপাদান পাইলে রেশম প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এই পদার্থগুলিতে নাইট্রোজেন সংযুক্ত করিবার জন্য, নাইট্রিক এসিড সংযুক্ত সল্‌ফিউরিক এসিডে এগুলি কিয়ৎকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়, এবং পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া, শুষ্ক করিতে হয়; এই প্রক্রিয়াটী অতি সাবধানের সহিত করা আবশ্যক; কারণ এই অবস্থায় পদার্থটী ভয়ানক দাহ্যগুণ-সম্পন্ন হয়। তাহার পর, কিঞ্চিৎ ঈথরে প্রায় সম পরিমাণ * আলকোহল মিশাইয়া তাহাতে উপরোক্ত প্রকারে প্রস্তুত শুষ্ক পদার্থগুলি নিক্ষেপ করিতে হয়; এগুলি ইহাতে ডুবাইবামাত্র গলিয়া গিয়া স্বচ্ছ লালার ন্যায় একটী পদার্থে পরিণত হয়। এই লালা এবং রেশম-কীট-শরীর-সঞ্চিত লালা একই পদার্থ। এই লালা অপর আর একটী যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বাহির করাইয়া এবং পরে শীতল জলে ডুবাইয়া জমাট করিয়া, সূত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সূত্র প্রস্তুতের যন্ত্রটী কিছু জটিল, সাধারণ পাঠক পাঠিকার নিকট ইহার বিবরণ প্রীতিকর হইবেনা বলিয়া এখানে তাহার কিছু উল্লেখ করা হইল না। পূর্ব্বোক্ত রেশম প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ সম্পূর্ণ নয়, কারণ ইহাতে যে রেশম পাওয়া যায়, তাহার দাহ্যগুণ অত্যন্ত অধিক—এমন কি, ইহাতে সামান্য উত্তাপ দিলে বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। এই ভয়ানক দাহ্যগুণ নষ্ট করিবার জন্য উক্ত প্রণালীর শেষ প্রক্রিয়াতে ঈথর ও আলকোহলের সহিত আরও কয়েকটী পদার্থ মিশ্রিত করিতে হয়। কিন্তু সে কয়েকটী যে কি পদার্থ তাহা আজও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। কৃত্রিম-রেশম প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবনকর্ত্তা শারডোনে তাঁহার ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য পদার্থ কয়েকটীর নাম গুহ্য রাখিয়াছেন।

গত পারিস প্রদর্শনীতে কৃত্রিম রেশম এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে ইহার সহিত প্রকৃত রেশমের কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় নাই। উজ্জ্বলতা ও ব্যবহারোপ-

* ৩৮ ভাগ ঈথরে ৪২ ভাগ আলকোহল মিশ্রিত করিতে হয়।

যোগীতায় ইহা প্রকৃত রেশম হইতে কোন অংশেই হীন নহে। বিশেষতঃ ইহার প্রস্তুত ব্যয় এত অল্প যে প্রকৃত রেশমের মূল্যের এক তৃতীয়াংশ হইতে এক ষষ্ঠাংশ মূল্যে কৃত্রিম রেশম বিক্রয় হইতে পারিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আজও কোন স্থানে রীতিমত কৃত্রিম রেশমের কুঠি সংস্থাপিত হয় নাই। শীঘ্রই পারিসে একটী কারখানা খুলিবার কথা চলিতেছে। দুই একটী কুঠি স্থাপিত হইলে কীটজাত রেশমের অবস্থা কি দাঁড়াইবে বলা যায় না। *

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হিন্দুজ্যোতিষীগণের বিবরণ।

ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকায় রাজাগণের বিবরণ জানিতে অল্প বিস্তর অসুবিধা আছে কিন্তু জ্যোতিষী মহাশয়দিগের সময় অবধারণ করিতে তাদৃশ অসুবিধা নাই, যেহেতু তাঁহারা নিজ নিজ পুস্তকে শক, বৎসর বা কলি অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন জ্যোতিষীদিগের পুস্তকে সে প্রকার কোন উল্লেখ নাই বটে, তত্রাপি তাঁহাদের নিরূপিত ঋতুর তাৎকালিক অবস্থান বিষয়ের গণনা তাঁহাদের সময় অবধারণ করিতে কথঞ্চিৎ সাহায্য করে।

আমরা প্রথমে বরাহমিহির ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখকের সময়ের বিচার করিব—যেহেতু ইহাদের সময় অবধারিত হইলে ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণের সময় নিরূপণে অনেক সাহায্য হইবে। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় লিখিয়াছেন—

অশ্লেষার্দ্ধাদ্দক্ষিণ মুত্তরয়ণং রবের্ধনিষ্ঠাদ্যাৎ।
নূনং কদাচিদাসীদ্ যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু।
সাম্প্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটাদ্যাৎ মৃগাদিতশ্চান্যৎ। ১
উক্তাভাবে বিকৃতিঃ প্রত্যক্ষপরিক্ষনৈর্ব্যক্তিঃ। ২
দূরস্থচিহ্নৈর্বেদ্যাদুদয়েহস্তময়েহপি বা সহস্রাংশোঃ।
ছায়াপ্রবেষ নির্গমচিহ্নৈর্বা মণ্ডলেমহতি॥ ৩
অপ্রাপ্যমসরমর্কো বিনিবৃত্তোহন্তি সাপরান্ যাম্যান্
কর্কটমসম্প্রাপ্তো বিনিবৃত্ত শ্চোতরান্সৈন্দ্রীন্॥ ৪

---

* ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বরের "Engineering" পত্রিকা দেখুন।

উত্তরময়ণমতীত্য ব্যাবৃত্তঃ ক্ষেমস্থ বৃদ্ধিকরঃ।
প্রকৃতিস্থশ্চাপ্যেবং বিকৃতিগতির্ভয়কৃতুষ্ণাংশুঃ ॥ ৫

ইহার অর্থ অশ্লেষার শেষার্দ্ধে দক্ষিণায়ণ এবং ধনিষ্ঠার আদিতে রবির উত্তরায়ণ নিশ্চয় কোন কালে আরম্ভ হইত যেহেতু পূর্ব্বশাস্ত্রে এপ্রকার উল্লেখ আছে। (১) সম্প্রতি রবির দক্ষিণায়ণ কর্কটের আদিতে এবং উত্তরায়ণ মকরের আদিতে আরম্ভ হইতেছে সুতরাং প্রাচীন অয়নের অভাবে উহার পরিবর্ত্তন বেশ উপলব্ধ হইতেছে। (২)। (অয়ন পরিবর্ত্তন জানিবার বিধি) সূর্য্যের উদয়াস্ত সময়ে দূরস্থচিহ্ন (নক্ষত্রাদি) দ্বারা ইহা অবগত হইবে অথবা বৃহৎ মণ্ডলের (কেন্দ্রস্থ কীলকের) ছায়ার নির্দ্দিষ্ট চিহ্নে প্রবেশ ও নির্গম দ্বারা অবগত হইবে। (৩) উত্তরায়ণে মকর পর্য্যন্ত গমন না করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে দক্ষিণ পশ্চিম দিক এবং দক্ষিণায়ণে কর্কট পর্য্যন্ত গমন না করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে উত্তরপূর্ব্ব দিক নষ্ট হয়। (৪) মকরের আদিতে গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে সূর্য্য মঙ্গলদায়ক হয়েন এবং ইহাই তাঁহার সহজগতি ; বিবৃত্ত গতি হইলে সূর্য্য অমঙ্গলদায়ক হয়েন (৫)।

বরাহের প্রথম দুই শ্লোকদ্বারা আমরা দুই জন জ্যোতিষীর সময় নিরূপণে সাহায্য পাইতেছি—প্রথম পূর্ব্বশাস্ত্রকারী এবং দ্বিতীয় স্বয়ং বরাহ। বরাহের টীকাকার ভট্টোৎপল পূর্ব্বশাস্ত্র অর্থে 'পরাশরী সংহিতা' লিখিয়াছেন। তিনি উক্ত শাস্ত্র হইতে ঋতুর অবস্থান বিষয়ক বচনগুলিও টীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই—শ্রবিষ্ঠাদ্যাৎপৌষ্ণার্দ্ধান্তং চরঃশিশিরঃ। বসন্তঃ পৌষ্ণাদ্যাদ্ রোহিণ্যান্তম্। সৌম্যাদ্যাদশ্লেষার্দ্ধান্তং গ্রীষ্মঃ। প্রাবৃড়-শ্লেষার্দ্ধাদ্হস্তান্তম্। চিত্রাদ্যাদ্জ্যেষ্ঠার্দ্ধান্তং শরৎ। হেমন্তো জ্যেষ্ঠার্দ্ধাদ্ বৈষ্ণবান্তম্॥ ধনিষ্ঠার আদি হইতে রেবতীর পূর্ব্বার্দ্ধপর্য্যন্ত শিশির কাল। রেবতীর শেষার্দ্ধ হইতে রোহিণীর শেষ পর্য্যন্ত বসন্তকাল। মৃগশিরার আদি হইতে অশ্লেষার পূর্ব্বার্দ্ধপর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল। অশ্লেষার শেষার্দ্ধ হইতে হস্তার শেষপর্য্যন্ত বর্ষাকাল। চিত্রার আদি হইতে জ্যেষ্ঠার পূর্ব্বার্দ্ধপর্য্যন্ত শরৎকাল। জ্যেষ্ঠার শেষার্দ্ধ হইতে শ্রবণার শেষ পর্য্যন্ত হেমন্তকাল।

হিন্দুদের রাশিচক্র সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে এক এক নক্ষত্র Constellation অবস্থান করে ; সুতরাং প্রত্যেক নক্ষত্রের ব্যাপ্তিস্থান রাশিচক্রের ১৩ অংশ ২০ কলা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য, বসন্তকালে রাশিচক্রের যেস্থানে অবস্থান করিলে দিবা-রাত্র সমান হয়, তাহাই মেষ রাশির আদি এবং সেই স্থানে আমাদের জ্যোতিষের যোগতারা রেবতী এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষের Piscum অবস্থিত। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে যোগতারা রেবতী রাশিচক্রের ৩৫৯°-৫০´ কলায় অবস্থান করিতেছে কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তাদির মতে রেবতী ৩৬০ অংশে অর্থাৎ রাশিচক্রের আদিতে অবস্থিত। জ্যোতিষীগণের নিরূপিত নক্ষত্রের ধ্রুবক অক্ষাংশাদি তালিকান্তরে যথাস্থানে প্রকাশ করিব।

নিম্ন তালিকা দৃষ্টে প্রকাশ হইবে যে পরাশরের নিরূপিত ঋতু সকল রাশিচক্রের কোন্ কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আরম্ভ				শেষ			ঋতু	
২৯৩°	অংশ ২০´	কলা	হইতে	৩৫৩°	২০´	পর্য্যন্ত	শিশির	উত্তরায়ণ
৩৫৩°	„ ২০´	„	„	৫৩°	২০´	„	বসন্ত	
৫৩°	„ ২০´	„	„	১১৩°	২০´	„	গ্রীষ্ম	
১১৩°	„ ২০´	„	„	১৭৩°	২০´	„	বর্ষা	দক্ষিণায়ণ
১৭৩°	„ ২০´	„	„	২৩৩°	২০´	„	শরৎ	
২৩৩	„ ২০´	„	„	২৯৩°	২০´	„	হেমন্ত	

বরাহের সময় সকল ঋতুই রাশির আদিতে আরম্ভ হইত সুতরাং রাশি চক্রের ২৭০ অংশ গত হইলে তাঁহার সময়ে শিশির ঋতু আরম্ভ হইয়াছিল অর্থাৎ পরাশর সংহিতা লেখকের সময় হইতে বরাহের সময় পর্য্যন্ত অয়ন (২৯৩.২০ – ২৭০) = ২৩ অংশ ২০ কলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে সংহিতাকারের সময় ঋতুর যে পরিবর্ত্তন হইত, বরাহের সময় তাহা অপেক্ষা ঋতুর ২৩°-২০´ অগ্রে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই গতিকে ইংরাজিতে সমরাত্রিন্দিববিন্দু বা ক্রান্তিপাতের পূর্ব্বে অগ্রসরণ বলে। ইংরাজি গণিতমতে ক্রান্তিপাতের বাৎসরিক গতি ৫০.১ বিকলা সুতরাং ২৩°-২০´ বিকলা অগ্রসর হইতে ১৬৭৬ বৎসর অতিবাহিত হয় অতএব ইংরাজি গণনামতে উভয় জ্যোতিষীর মধ্যে উক্ত বৎসর সংখ্যার অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। এখন বরাহের সময় যথার্থরূপে অবধারিত হইলে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, পরাশর কত কাল হইল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন দেখিতে হইবে বরাহের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অয়ন কত অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের দেশীয় পঞ্জিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে ১৮১৫ শকাব্দার প্রারম্ভে অয়ণ—২০-৫৪-৩৬ বিকলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ঋতু সকল বরাহের সময় হইতে উক্ত অংশ পূর্ব্বে আরম্ভ হইতেছে। আমাদের বর্ত্তমান রাশি সকল নিরয়ণপ্রযুক্ত রাশি ও মাসের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির রহিয়াছে। সুতরাং অয়নাংশ রাশি গুলিতে যোগ করিলে বর্ত্তমান সময়ের স্পষ্ট সূর্য্য সিদ্ধ হয়।

আমাদের পঞ্জিকাসাধিত ঋতু নিম্নপ্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রায়	আরম্ভ	ঋতু	মন্তব্য
১০ই পৌষ	মকর রাশি	… … …	Wintre Solstice
১০ই মাঘ	কুম্ভ	শিশির	
১০ই ফাল্গুন	মীন	বসন্ত	উত্তরায়ণ
১০ই চৈত্র	মেষ	… … …	ক্রান্তিপাত Vernal Equinox
১০ই বৈশাখ	বৃষ		
১০ই জ্যৈষ্ঠ	মিথুন	গ্রীষ্ম	

প্রায়	আরম্ভ	ঋতু	মন্তব্য
১০ই আষাঢ়	কর্কট	... ...	Summer Solstice
১০ই শ্রাবণ	সিংহ	বর্ষা	
১০ই ভাদ্র	কন্যা	... ...	দক্ষিনায়ণ
১০ই আশ্বিন	তুলা	শরৎ	ক্রান্তিপাত Autumnal Equinox.
১০ই কার্ত্তিক	বৃশ্চিক		
১০ই অগ্রহায়ণ	ধনুক	হেমন্ত	

অতএব বাৎসরিক গতি ৫৪ বিকলা ধরিলে আমাদের পঞ্জিকা লিখিত অংশ অগ্রসর হইতে অয়নের ১৩৯৪ বৎসর অতিবাহিত হয়,সুতরাং আমাদের পঞ্জিকামতে বরাহ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক ৪২১° শকাব্দে প্রাতুর্ভূত হয়েন। পশ্চিম দেশীয় পঞ্জিকা সকল ভিন্ন ভিন্ন অয়নাংশ দিয়াছেন। তাঁহাদের কাহার মতে বর্ত্তমান বৎসরের অয়নাংশ ২২° - ৫৩´;কাহারমতে ২২° ৩৯´; কাহার মতে আমাদের দেশীয় পঞ্জিকা লিখিত অয়নাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। ৺বাপুদেব শাস্ত্রীর পঞ্জিকা সকল পঞ্জিকা অপেক্ষা শুদ্ধ। এই পঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে অয়নাংশ ২২°-৯´-২৪ বিকলা প্রবহমান। এখন ক্রান্তিপাতের বাৎসরিক গতি ৫০.১ বিকল স্থির করিয়া গণনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১৫৯২ বৎসর পূর্ব্বে বরাহ প্রাতুর্ভূত হয়েন। এই উপপত্তির সমর্থনার্থে আমি ইউরোপীয় ও মিশর দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতিষী হিপার্কসের গগনদর্শন ফল প্রকাশ করিতেছি।

হিপার্কস লিখিয়াছেন তাঁহার সময়ে চিত্রা নক্ষত্র ক্রান্তিপাত বিন্দুর ৬ অংশ পশ্চিমে ছিল এবং হার্শেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উক্ত নক্ষত্র ক্রান্তিপাতের ২০ অংশ ২৪ কলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং হিপার্কসের সময় হইতে হার্শেলের সময় পর্য্যন্ত ক্রান্তিপাত বিন্দু ২৬ অংশ ২৪ কলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মগণিতের মতে অবগত হওয়া যায় যে হিপার্কস হার্শেলের ১৮৯৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গগন দর্শন করিয়াছিলেন। চিত্রানক্ষত্র হিপার্কসের সময়ে রাশিচক্রের ১৭৪ অংশে অবস্থিত ছিল কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক ও বরাহের সময়ে উহা ৬ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে অর্থাৎ ক্রান্তিপাত ও চিত্রানক্ষত্র রাশি-চক্রের একস্থানে অথবা ১৮০ অংশে অবস্থিত ছিল। সুতরাং অয়নের বাৎসরিক গতি ৫০.১ বিকলা স্থির করিয়া গণনা করিলে জানা যায় যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক ও বরাহ হিপার্কসের ৪৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রাতুর্ভূত হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পরাশরী লেখক বরাহের ১৬৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ঋতুর অবস্থান প্রকাশ করেন অতএব তিনি খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ১৩৯২ বৎসরে প্রাতুর্ভূত হয়েন।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক আদিত্যদাস কি না এখন তাহা প্রকাশ করিতেছি। বরাহ মিহির

বৃহৎসংহিতা ও বৃহজ্জাতকে স্বীয় পিতার নাম আদিত্যদাস লিখিয়াছেন। বৃহজ্জাতকের শেষে লিখিত আছে—

আদিত্যদাস তনয়স্তদবাপ্তবোধঃ।
কাপিত্থকে সবিতৃলব্ধ বরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতামবলোক্য সম্যগ্।
হোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার। ৯
দিনকার মুনিগুরুচরণ প্রণিপাতকৃতপ্রসাদমতিনেদম্।
শাস্ত্রমুপসংহৃতং নমো নমোঽস্তু পূর্ব্বতৃভ্যঃ॥

অর্থ—অবন্তীবাসী বেদে লব্ধজ্ঞান আদিত্যদাস-পুত্র বরাহমিহির কাপিত্থ নগরে সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানীগণের মত উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া মধুর হোরাশাস্ত্র রচনা করিলেন। সূর্য্যমুনি ও গুরুচরণে প্রণিপাতজাত যে অনুগ্রহ তাহাই শাস্ত্রের উপসংহারে মুখ্য কারণ অতএব তাঁহাদের বারম্বার নমস্কার করি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে প্রকার তাৎকালিক নক্ষত্রাবস্থান প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা এই অবগত হওয়া যায় যে উহা বরাহের সমকালে প্রণীত হয়। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছি—১। হয়ত বরাহ স্বয়ং সিদ্ধান্তখানি প্রণয়ণ করিয়া স্বীয় পিতার বা সূর্য্যের নামে তাহার নামকরণ করিতেছেন, অথবা ২। তাঁহার পিতাই ইহা প্রণয়ণ করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত নাম দিয়াছেন। বরাহ স্বীয় পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে পঞ্চসিদ্ধান্তের অন্তর্গত সৌর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করায় বেশ প্রকাশ হইতেছে সূর্য্যসিদ্ধান্তখানি তাঁহার প্রণীত নহে, অতএব বোধ হইতেছে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহার পিতা আদিত্যদাসের প্রণীত। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ব্রহ্মগুপ্ত লিখিত নক্ষত্রাবস্থান প্রকাশ করিতেছি।

* নক্ষত্র	কল্পিত আকার	সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিত ধ্রুবক পূর্ব্ব পশ্চিম।	ব্রহ্মগুপ্ত লিখিত ধ্রুবক।	অক্ষাংশ উত্তর বা দক্ষিণ	প্রত্যেক নক্ষত্রের তারকা হইতে যোগ তারার দূরতা +।	প্রত্যেক নক্ষত্রে নক্ষত্র সংখ্যা।	সংখ্যা একাদিক্রমে।
অশ্বিণী	তুরঙ্গমুখ	৮°	৮	১০ উ	৪৮ উ	৩	১
ভরণী	যোণী	২০°	২০	১২ উ	৪০ দ	৩	২
কৃত্তিকা	ক্ষুর	৩৭°.৩০′	৩৭.২৮	৪.৩০ উ	৬৫ দ	৬	৩
রোহিণী	শকট	৪৯°.৩০	৪৯.২৮	৪.৩০ দ	৫৭ পূ	৫	৪

* পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রগুলির পাশ্চাত্য নাম যথাক্রমে এইঃ—আল্ফা, বেটা ওগামা আরিএটীয়াই, মুস্কা, এপসাইলন টরাই বা প্লীয়েডিস্, আল্ফাটরাই বা আল্ডেবোরন্, লাম্ডা ওরাইনিস্, আল্ফাওরাইওনিস্, বেটা জেমিনোরম্, ডেল্টা ক্যানসেরাই, আল্ফাক্যান্সেরাই, আল্ফালেয়োনিস্ বা রেগুলেস্, ডেল্টালেয়োনিস, বেটালেয়োনিস্, গামা ক্যানসেরাই, আল্ফাভার্জিনিস বা স্পাইকা, আল্ফাবুটিস্ বা আর্কটুরেস্, আল্ফা

মৃগশিরা	হরিণমুখ	৬৩	৬৩	১০ দ	৫৮ উ	৩	৫
আর্দ্রা	রত্ন	৬৭°.২০′	৬৭	১১ দ	মধ্য ৪	১	৬
পুর্নবসু	গৃহ	৯৩°	৯৩	৬ উত্তর	৭৮ দ	৪	৭
পুষ্যা	বাণ	১০৬	১০৬	উত্তর	৭৬ মধ্য	৩	৮
অশ্লেষা	চক্র	১০৯	১০৮	৭° দ	১৪ পু	৫	৯
মঘা	গৃহ	১২৯	১২৯	০ উ	৫৪ দ	৪	১০
পুর্ব্বফল্গুনী	শয্যা	১৪৪	১৪৭	১২° উ	৪৬ উ	২	১১
উত্তরফল্গুণী	শয্যা	১৫৫	১৫৫	১৩ উ	৫০ উ	২	১২
হস্তা	হস্ত	১৭০	১৭০	১১° দ	৬০	৫	১৩
চিত্রা	মুক্তা বা প্রদীপ	৯৮০	১৮৩	২০ দ	৪০	১	১৪
স্বাতী	প্রবাল	১৯৯	১৯৯	৩৭° উ	৭৪	১	১৫
বিশাখা	তোরণ	২১৩	২১২.৫	১৩০ দ	৭৮ উ	৪	১৬
অনুরাধা	বলি	২২৪	২২৪.৫	১°-৪৪′ দ	৬৪ মধ্য	৪	১৭
জ্যেষ্ঠা	কুন্তল	২২৯°	২২৯.৫	৪° -দ ৩-৩০ দ	১৪ মধ্য	৩	১৮
মূলা	ক্রুদ্ধকেশরী	২৪১	২৪১	৮°-৩০′ দ	৬ পু	১১	১৯
পূর্ব্বাষাঢ়া	শয্যা	২৫৪°	২৫৪	৫°-৩০ দ	৪ উ	৪	২০
উত্তরাষাঢ়া	হস্তিবিলাস	২৬০	২৬০°	৫ দ	পূর্ব্বাষাঢ়ার মধ্য নক্ষত্র উ	২	২১
অভিজিৎ	ত্রিকোণ	২৬৬°-৪০′	২৬৫	৬০° উ ৬২° উ	পূর্ব্বাষাঢ়ার শেষ উজ্জ্বল	৩	
শ্রবণা	ত্রিবিক্রম	২৮০	২৭৮	৩০ উ	উত্তরাষাঢ়ার শেষ মধ্যে	৩	২২
ধনিষ্ঠা	মৃদঙ্গ	২৯০	২৯০	৩৬ উ	শ্রবণার শেরপাদ পশ্চিম	৪	২৩
শতভিষা	বৃত্ত	৩২০′	৩২০	০′-৩০′ দ ০′-১৮′ দ ০-২০′ দ	৮০ উজ্জ্বল	১০০ ১৮০	২৪
পূর্ব্বভাদ্র পদা	যমল	৩২৬°	৩২৬	২৪° উ	৩৬ উত্তর	২	২৫
উত্তরভাদ্র পদা	শয্যা	৩৩৭	৩৩৭	২৬° উ	২২ উত্তর	২	২৬
রেবতী	মুরজ	৩৫৯° ৫০″	৩৬০°	উ °	৭৯ দ	৩২	২৭

অন্য অন্য প্রধান নক্ষত্রের ধ্রুবক ও অক্ষাংশ।

সিরিয়াই, ডেল্টা স্কর্পিওনিস্, আল্ফাস্কর্পিওনিস্, মুস্কর্পিওনিস্ ডেল্টা সাজিটেরিয়াই, আল্ফালাইরী, আল্ফা আকুইলী, আল্ফা ডেল্ফিনি, লামডা আকোয়ারি, আল্ফা পেগেসাই, আল্ফা এণ্ড্রোমেডী, জিটা পাইসিকম্।

† অংশের ষষ্ঠভাগে লিখিত।

নক্ষত্র	ইংরাজিনাম	সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ধ্রুবক ব্রহ্মগুপ্ত মতে	সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌম মতে ধ্রুবক ২	গ্রহলাঘব মতে ধ্রুবক ৩	অক্ষাংশ ১ মতে দক্ষিণ উত্তর	অক্ষাংশ ২ মতের বা ঐ	অক্ষাংশ ৩ মতে দ বা ঐ
অগস্ত্য	Conopus	৯০ ৮৭	৮৫-৫´	৮০	৮০ দ ৭৭	৭৭°-১৬ দ	৭৬ দ
লুব্ধক	Sirius	৮০ ৮৬	৮৪°-৩৬	৮০	৪০ দ	৪০´-৫´ দ	৪০° দ
অগ্নি	বেটা Tauri	৫২	৫৭-৪	৪৩	৮ উ	৮-১৪	৮ উ
ব্রহ্মহৃদয়	Capella	৫২	৫৮.৩৬	৫৬	৩০ উ	৩০.৪৯	৩১ উ
প্রজাপতি	ডেল্টা Aurigi	৫৭	৫৬-৫৩	৬১	৩৭ উ	৩৮.৩৮	৩৯ উ
আপস্বসে আপঃ	ডেল্টা Virginis	১৮০	১৮০	১৮৩	৩ উ ৯ উ	৩	৩ উ
ক্রতু					৫৫ উ		সাকল্য সংহিতা মতে
পুলহ					৫০ উ		
অত্রি					৫৬ উ		
অঙ্গিরস					৫৭ উ		
বশিষ্ঠ					৬০ উ		
মরীচী					৬০		
পুলস্ত্য					৫০ উ		

ব্রহ্মগুপ্তের সময় চিত্রা নক্ষত্র ১৮৩ অংশে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক ও বরাহের সময় হইতে চিত্রানক্ষত্র তিন অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে অতএব ব্রহ্মগুপ্ত বরাহের ২১৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪২১ শকাব্দায় প্রাদুর্ভূত হয়েন।

এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে পারস্য রাজ নৌশেরওয়ানের "বুজুর্গচেমেহের" নামে কোন মন্ত্রী ছিলেন। এই নরপতি খৃষ্টাব্দ ৫৩৪ হইতে ৫৯০ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। এই নামের সহিত বরাহ মিহিরের শ্রুতিগত সৌসাদৃশ্য বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে তিনি উক্ত নরপতির সভাসদ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা জানিলে তাঁহাদের সে ধারণা দূর হইবে যে এই মন্ত্রীর আজ্ঞায় বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয় এবং বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্রে বরাহমিহিরের উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং বরাহমিহির উক্ত নরপতির সমসাময়িক হইতে পারেন না।

বৃহজ্জাতকে বরাহমিহির তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক জ্যোতিষীর নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম এই—ময়, যবন, মণিৎথ, শক্তি, সত্য, বলী, বিষ্ণুগুপ্ত দেবস্বামী সিদ্ধসেন জীবশর্ম্মা পৃথুযশা ইত্যাদি। জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যবনদের (Ionians, Greeks) বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদংস্থিতং
ঋষিবৎতেঽপি পূজ্যন্তেকিং পুনঃদৈববিদ্দ্বিজঃ॥

ম্লেচ্ছ (কদাচারী) যবনদের মধ্যে এই শাস্ত্রের (ফলিতজ্যোতিষ) বিশেষ আলোচনা আছে সুতরাং তাঁহারাও ঋষি তুল্য পূজনীয় শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হইলেত কথাই নাই। এই বচন দৃষ্টে আমি অনুমান করি তিনি মিশর দেশীয় জ্যোতিষীগণের নিকটও জ্যোতিষ বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

আর্য্যভট্টের সময় অবধারণ করিবার পূর্ব্বে অয়নাংশের বিষয় কিছু লেখা আবশ্যক। বৎসরের পরিমাণ বিষয়ে যেমন আমাদের জ্যোতিষীগণ এক মত নহেন, তদ্রূপ অয়নাংশের বিষয়ে ও ঘটিয়াছে। পরাশরী লেখক প্রমুখ প্রাচীন জ্যোতিষীগণ অয়নাংশের দোদুল্যমানাবস্থা কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু বাশিষ্ঠসিদ্ধান্ত লেখক বিষ্ণুচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে ক্রান্তিপাতের পরিধিবৎ পরিভ্রমণ প্রকাশ করেন।

আর্য্যভট্টের মতে এক কল্পে অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ১৫৮২২৩৭৫০০০০০০ নক্ষত্রোদয় হইয়া থাকে সুতরাং উক্ত সংখ্যক বৎসরে ১৫৭৭৯১৭৫০০০০০০ দিবস হয়। আর্য্যভট্টের নিরূপিত বৎসর পরিমাণ পরবর্ত্তী অনেক জোতিষীগণ নিজ নিজ পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত লেখক এক কল্পে "পরিবর্ত্তাখচতুষ্টয়শরাব্ধিরসগুণ যমদ্বিবসুতিথয়" অর্থাৎ ১৫৮২২৩৬৪৫০০০০০ নক্ষত্রোদয় লিখিয়াছেন ইহাই ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত লেখক ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃকও লিখিত হইয়াছে। যথা ঃ—

ব্রহ্মোক্তং গ্রহগণিতং মহতাকালেন যৎখিলীভূতং।
অভিধীয়তেস্ফুটং তৎ জিষ্ণুসুতব্রহ্মগুপ্তেন॥
যেঽজ্ঞান পটলারুদ্ধদৃশোঽন্যদ্ব্রহ্মাদ্বদন্তি সিদ্ধান্তাৎ।
তেষাংযুগাদিভেদাদ্যে দোষাস্তান প্রবক্ষামি॥
চত্বারিশূন্যানি পঞ্চবেদরসাগ্নি যমপক্ষাষ্ট।
শরেন্দবঃ কল্পে ন প্রতি নক্ষত্রোদয়া॥

ব্রহ্ম কর্ত্তৃক উক্ত গ্রহ গণনা প্রাচীনতা প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হওয়ায় জিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মগুপ্ত তাহার স্ফুট লিখিতেছেন। যে অজ্ঞানগণ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন কথা বলেন তাঁহাদের যুগাদিভেদে যে দোষ তাহা বলিতেছি। এক কল্পে ১৫৮২২৩৬৪৫০০০০০ নক্ষত্রোদয় হয়।

ব্রহ্মগুপ্তের বহুমানকারী ভাস্করাচার্য্যও তাঁহার নিরূপিত বৎসর পরিমাণ ও নক্ষত্রা-

বস্থান স্বীয় শিরোমণিতে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত সৌরবৎসর যে প্রায় তিন মিনিট ন্যূন এ সংস্কার পরবর্ত্তী কোন জ্যোতিষী কর্ত্তৃক সাধিত হয় নাই। ইহা ইউরোপীয় গণনার ফল।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখকপ্রমুখ জ্যোতিষীগণ অয়নের দোদুল্যমানাবস্থা কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু ভাস্কর উক্ত মত খণ্ডনার্থে বাসনাভাষ্যে লিখিয়াছেন—যদ্যেবমনুপলব্ধোঽপি সৌরসিদ্ধান্তৈঃ স্বাগম প্রমাণ্যেন—ভগণপরিধিবিবৎ কথং তৈর্নোক্তঃ। অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্তাদির সময় যদি অয়নাংশ মোটেই ছিল তাহা হইলে আগমেনর (বাশিষ্টসিদ্ধান্ত) প্রমাণ মতে নক্ষত্র চক্রের পরিধিবৎ ভ্রমণ বিষয়ক মত কেন তাঁহারা প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ইহার কারণ ভাস্কর যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই উক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরে লিখিব। সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন।

ত্রিংশৎ কৃত্যোযুগেভানাং চক্রংপ্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুনাদ্ভূদিনৈর্ভক্তাদ্‌দ্যুগুনাদ্ যদবাপ্যতো।
তদ্‌দ্যোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধা॥

এক মহাযুগে নক্ষত্রচক্র ৬০০ (৩০ × ২০) বার পূর্ব্বে অগ্রসর হয়। অভিলষিত দিন বা বৎসরকে ৬০০ দ্বারা গুণিত করিয়া যুগের ভূদিন বা বৎসর দ্বারা হরণ করিয়া দ্যু অর্থাৎ ৩৬০ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইবে—সেই দ্যুকে তিন দ্বারা গুণিত করিয়া দশ দ্বারা হরণ করিলে অয়নাংশ প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকের লিখন ও অর্থ উভয়ই অত্যন্ত জটিল। এক কথায় যাহা সুগম হয় তাহা প্রকাশে এত প্রয়াস কেন। অঙ্কশাস্ত্রে এ রীতি প্রার্থনীয় নহে, ভাস্করাচার্য্য ইহার অন্য অর্থ বুঝিয়াছেন তাহা পরে লিখিত হইবে।

আর একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থেও অয়নাংশ নিরূপক শ্লোকটীর শেষ চরণের অর্থ জটিল হইয়াছে, যথা—

যুগেষট শতকৃত্বাহি ভচক্রং প্রাক্ বিলম্বতে।
তদ্‌গুনো ভূদিনৈর্ভক্তো দ্যুগুনোঽয়ন খেচর॥

এস্থানে 'দ্যু' শব্দের অর্থ ১০৮ অংশ না ধরিলে কোন মতে পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। ডেভিস সাহেবও উক্ত শ্লোকের অর্থ ঠিক করেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন Multiply Ahargan (number of mean solar days for which the calculation is made) by 600 and divide the product by Savan days in a yug. Of quotient take sine and multiply by 3 & divide by 10 to get ayanansha.

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে অয়নের বাৎসরিক গতি ৫৪ বিকলা।

পরাশরের মতে এক কল্পে নক্ষত্র চক্র ৫৮১৭০৯ বার এবং আর্য্যভট্টের মতে ৫৭৮১৫৯ বার দোদুল্যমান হয় সুতরাং তাঁহাদের মতে ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসর অয়ন ৫২.৩ ও ৫২০-১″ বিকলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে।

পরাশরী সংহিতাই আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি; কারণ ইহাই তাঁহার পুস্তকের উদ্ধৃতাংশ হইতে অনুমিত হয়। পরাশরী লেখক অয়নের দোদুল্যমানাবস্থার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার মতে অয়নচক্র মেষরাশির ২৭ অংশ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে এই উভয় বিন্দুর মধ্যে দোদুল্যমান হয়। আর্য্যভট্ট পরাশরীলিখিত গগণদর্শনের সহিত নিজকৃত গগণদর্শন তুলনা করিয়াছিলেন এবং অন্য অন্য বিষয়েও স্বীয় বুদ্ধি চালনা করিয়াছিলেন। আর্য্যাষ্টশতিকা গ্রন্থে তিনি অয়ন বিষয়ে একটী বিভিন্ন মত লিখিয়াছেন—তাঁহার মতে—"চতুর্বিশত্যংশৈশ্চক্রমুভয়তোগচ্ছেৎ" অর্থাৎ অয়নচক্র উভয়দিকে ২৪ অংশ করিয়া গমন করে। তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ দশগীতিকায় উক্ত মতের নিরাকরণ করিয়া প্রাচীন মতই বলবৎ রাখিয়াছেন। তাঁহার এপ্রকার দুইমত প্রকাশ করায় আমি অনুমান করি যে তিনি ২৪ অংশ লিখিয়া স্বীয় সময়ে অয়নের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে যখন অয়নচক্র পশ্চিম বিন্দু হইতে ২৪ অংশ অগ্রসর হইয়াছে তখন তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েন। বরাহ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখকের সময় অয়নচক্র পশ্চিম বিন্দু হইতে ২৭ অংশ অগ্রসর হইয়াছিল অতএব আর্য্যভট্টের সময় অয়নচক্র মেষের ৩ অংশ পশ্চিমে ছিল সুতরাং তিনি বরাহের ২১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শকাব্দার ৯ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। অপূর্ব্ব বাবু লিখিয়াছেন আর্য্যভট্ট যুধিষ্ঠিরের ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কোলব্রুক সাহেব বলেন তিনি গ্রীসীয় বিজগণিতের আবিষ্কারক ডিওফানটুসের সমসাময়িক ছিলেন, ডিওফানটুস ৩১৯ খৃষ্টাব্দের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

সম্প্রতি পুনানগরের শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় 'Orion' (মৃগশিরা আদ্রা) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বেদের প্রমাণ প্রয়োগে প্রদর্শন করিয়াছেন যে অয়নের দোদুল্যমানাবস্থা গণিত মতে অশুদ্ধ; যেহেতু বেদের অনেকগুলি ঋক্ যখন রচিত হয় তখন ক্রান্তিপাতবিন্দু পুনর্ব্বসু ও আদ্রানক্ষত্রে ছিল। অতএব তাঁহার মতে ঋকৃগুলি খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৬০০০ হইতে ২৫০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। তিনি আরও বলেন আর্য্যজাতির অন্যতম শাখা পারসীকজাতি শেষোক্ত সময়ে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন। তিলক মহাশয়ের মত গ্রীসীয় দূত মেগাস্থীনিসও কতক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিতদিগের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে হিন্দুদিগের আদি রাজা তাঁহার সময়ের ৫০৪২ বৎসর ৩ মাস পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। মেগাস্থিনীস খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৩১৯ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সুতরাং তিনি হিন্দুদিগের বিষয় যে অধিক অবগত হইতে সক্ষম হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গর্গ সংহিতাখানিও একখানি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ। বরাহ তাঁহার সংহিতায় এই গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎ সংহিতার ইংরাজি অনুবাদক অধ্যাপক কার্ণ

গর্গসংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, যে গর্গসংহিতা গ্রন্থখানি খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৪৪ বৎসরে রচিত হয়। সে বচনটী এই—

ততঃ সাকেতমাক্রম্যপঞ্চালান মথুরাং তথা।
যবনাঃ দুষ্ট বিক্রান্তা প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজম্॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দমে প্রথিতে হিতে।
অকুলাঃ বিষয়া সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

দুষ্ট যবনগণ সাকেত পঞ্চাল ও মথুরা আক্রমণ করিয়া পাটলিপুত্রে গমন করিবেন, কুসুমপুরে গমন করিয়া তাঁহারা নগরখানি লুণ্ঠন করিয়া তছ্‌নছ্‌ করিবেন। কার্ণসাহেবের মতে ব্যাক্‌ট্রিয়ার রাজা মিনাণ্ডরের সময়ে খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১৪৪ বৎসরে সাকেত অবরুদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত ঘটনার পরে গর্গসংহিতা লেখক প্রাদুর্ভূত হয়েন। গর্গ অয়নগতির বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি পরাশরী হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়েন। যেহেতু অয়নের শুভাশুভ ফলের বিষয় লিখিতে গিয়া উভয়েই একমত প্রকাশ করিয়াছেন—যথা পরাশর লিখিয়াছেন—

যদাপ্রাপ্তো বৈষ্ণবান্তং উদঙ্মার্গে প্রপদ্যতে।
দক্ষিণেঽশ্লেষাং বা মহাভয়ায়।

গর্গ লিখিয়াছেন—

যদানিবর্ত্ততে প্রাপ্তঃ শ্রবিষ্ঠামুত্তরায়ণে।
অশ্লেষং দক্ষিণেঽপ্রাপ্ত স্তাবদ্‌ বিদ্যান্মহদ্ভয়ম্॥

উভয় শ্লোকের অর্থ এক—ধনিষ্ঠার শেষ পর্য্যন্ত না গমন করিয়া সূর্য্যের উত্তরায়ণ এবং অশ্লেষা অবধি গমন করিয়া দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইলে মহাভয়ের আশঙ্কা করিতে হয়। পরাশরের লেখায় যে প্রাচীনতা আছে তাহা তাঁহার ছন্দেই প্রকাশ রহিয়াছে। অয়নের পরিবর্ত্তন যে কোন শুভাশুভ ফলের উৎপাদক তাহা আমার বিশ্বাস হয় না যেহেতু পরবর্ত্তী বরাহ স্বীয় সময়ের অয়নের শুভফলদায়কতা প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী কালের অয়নের অশুভতা লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে বরাহের মতে আমরা অয়নের অশুভ সময়ে অবস্থান করিতেছি। সংহিতা লেখকগণ গণিত জ্যোতিষের বিষয় অল্প বিস্তর লিখিয়া ফলিতের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন। সংহিতাগুলিকে পুরাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংহিতায় জ্যোতিষের আধিক্য আছে পুরাণে বংশ মন্বন্তর ও বশংানুচরিতের আধিক্য দৃষ্ট হয়। সংহিতায় প্রত্যক্ষ ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় পুরাণে তাহাই গল্পাকারে বিস্তৃত ভাবে লিখিত। সুতরাং সংহিতাই আমাদের আদি ইতিহাস এবং পুরাণ পরবর্ত্তী কালের রচনা। সূর্য্য সিদ্ধান্ত যেমন স্বীয় প্রাচীনতা গাইয়া সকল সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন পুরাণের পক্ষেও সংহিতা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। পুরাণগুলি প্রায় ৫০০০ বৎসরের প্রাচীনতার দাওয়া করিয়াছেন

কিন্তু আমার বিবেচনায় সকল পুরাণগুলিই শকাব্দা প্রচলনের পরে লিখিত, তাহা প্রবন্ধের শেষে লিখিব।

ক্রান্তিপাতের পরিধিবৎ পরিভ্রমণ হিন্দুজ্যোতিষীগণের মধ্যে প্রথম বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত লেখক বিষ্ণুচন্দ্র প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ক্রান্তিপাত এক কল্পে ১৮৯৪১১ বার পরিভ্রমণ করে, অতএব জানা যাইতেছে যে তাঁহার মতে অয়ন প্রতি বৎসর ৬০.০৬ বিকলা করিয়া পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে। এই মতটী গ্রীসীয় জ্যোতিষীদ্বয় হিপার্কস ও টলেমীর পুস্তক হইতে গৃহীত অথবা স্বয়ং হিন্দু জ্যোতিষী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সে বিষয়ে আমি যথার্থরূপে নির্ণয় করিতে সক্ষম নহি। কিন্তু উভয় জ্যোতিষীর নিরূপিত অয়নের বাৎসরিক গতির প্রতি দৃষ্টি করিলে অবগত হওয়া যায় যে ইহা বিষ্ণুচন্দ্র কর্ত্তৃক নিরক্ষেপ ভাবে উদ্ভাবিত হয়। হিপার্কসের মতে ক্রান্তিপাত প্রায় ৮৫ বৎসরে এক অংশ এবং টলেমির মতে ১০০ বৎসরে এক অংশ অগ্রসর হয়।

ভাস্কর লিখিয়াছেন ঃ—শিরোমণি ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

> বিষুবৎক্রান্তি বলয়োসম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃস্যাৎ।
> তদ্ভগণা সৌরোক্তাব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥ ১৭
> অয়ন চলনং যদুক্তং মুঞ্জলাদ্যৈঃ স এবায়ং।
> তৎপক্ষে তদ্ভগণাকল্পে গোহঙ্গর্ত্তুনন্দগোচন্দ্রাঃ॥ ১৮

বিষুব ও ক্রান্তি মণ্ডলের মিলন ক্রান্তিপাত বলিয়া অভিহিত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে এক কল্পে তাহার ভগণ ৩০০০০ ত্রিশ সহস্র হয়। অয়নচলন ও ক্রান্তিপাত একই বস্তু। মুঞ্জলাদির মতে এক কল্পে অয়নের ১৯৯৬৬৯ ভগণ হইয়া থাকে। শিরোমণির ব্যাখ্যাকার মুনীশ্বর সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য করিবার জন্য "ব্যস্তার" অর্থ—বি = বিংশতি + অস্তা = গুণিতা অর্থাৎ (২০ + ৩০০০০) ৬০০০০০ ছয় লক্ষ করিয়াছেন। মুঞ্জলাদির মতে অয়নের বাৎসরিক গতি ৫৯°৯ বিকলা।

কোন কোন জ্যোতিষীর মতে ৪৪৪ শকাব্দায় অয়নাংশের আরম্ভ হয়। ইঁহাদের মতে অয়ন ৬০ বৎসরে এক অংশ অগ্রসর হয়। তাঁহাদের সঙ্কেত এই—

> শকো বেদাব্ধিবেদোনঃ ষষ্টিভক্তোঽয়নাংশকঃ
> দেয়াস্তেতু রবৌস্পষ্টে চরলগ্নাদি সিদ্ধয়ে॥

শকাব্দ হইতে ৪৪৪ বাদ দিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ দিলে অয়নাংশ প্রাপ্ত হইবে। নিরয়ণ রবিতে তাহা যোগ করিলে সায়ন রবির চরও লগ্ন প্রাপ্ত হইবে। আমি অনুমান করি ভাস্করাচার্য্যের কর্ণ কুতূহল হইতে পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ উপরি উক্ত ভ্রান্ত মত প্রাপ্ত হয়েন। কর্ণ কুতূহল ১১০৫ শকে লিখিত তাহাতে অয়নাংশ ১১ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ৬০ বৎসরে এক অংশ এই অনুপাত মতে ১১ অংশের ৬৬০ বৎসর হয়। পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ ১১০৫

শক হইতে ৬৬০ বাদ দিয়া অয়নের আরম্ভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভাস্করের যে ঐ মত ছিল তাহা আমার বোধ হয় না, তিনি লিখিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ স্বল্পান্তরত্বান্নকৃতঃস্ফুটঃ।
স্থিত্যর্দ্ধপরি লেখাদৌ গণিতাগত এবহি॥
নক্ষত্রানাংস্ফুটা এব স্থিরত্বাৎ পটিতাঃ শরাঃ।
দৃক্কর্ম্মনায়নেনৈষাং সংস্কৃতাশ্চতথাধ্রুবাঃ॥

অয়নাংশ অতি অল্প প্রযুক্ত ব্রহ্মগুপ্তাদি জ্যোতিষীগণ স্ফুট প্রস্তুত করেন নাই। রাশি-চক্রের আদি ও অর্দ্ধ স্থান হইতে গণনা করিয়া স্ফুট প্রাপ্ত হওয়া যায়। নক্ষত্রের স্ফুট স্থির কিন্তু শর পরিবর্ত্তিত হইতেছে সুতরাং দৃক্কর্ম্মায়ন (declination) দ্বারা নক্ষত্রের স্ফুট ও ধ্রুবক শুদ্ধ করা উচিত। অতএব বোধ হয় ভাস্করের দৃক্কর্ম্ম (observation) লব্ধ গণনায় ২।১ অংশের ভ্রম হইয়া থাকিবে। ভাস্বরের পূর্ব্বে অনেক জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হয়েন। হণ্টর সাহেব উজ্জয়নীর পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব কাল যে প্রকার অবগত হয়েন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বরাহ ১ম	১২২	শকাব্দ	
২য়	৪২১	„	
ব্রহ্মগুপ্ত	৫৫০	„	
ভট্টোৎপল	৮৯০	„	—(ইনি যে এই শকে প্রাদুর্ভূত হয়েন তাহা তাঁহার
শ্বেতোৎপল	৯৩৯	„	বৃহৎ সংহিতার বিবৃত্তি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়।
বরুণাভট্ট	৯৬২	„	ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষে দৃষ্ট হয়
ভোজরাজ	৯৬৪	„	ফাল্গুনস্য দ্বিতীয়ায়ামসিতায়াংগুরৌদিনে।
ভাস্কর	১০৭২	„	বস্বাষ্টাষ্টমিতেশাকে কৃতোঽয়ং বিবৃত্তির্ময়া॥)
কল্যাণ চন্দ্র	১১০১		

ভোজরাজের একটী শিলালিপিতে ৯১৯ সম্বৎ ও ৭৮৪ শকাব্দ লিখিত আছে ইহাতে বোধ হয় ভারতে অনেকগুলি ভোজরাজ প্রাদুর্ভূত হয়েন; সুতরাং স্থিরদৃষ্টি না রাখিলে একটির সময়ের সহিত অন্যের গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা।

শতানন্দ ১০২১ শকে তাঁহার ভাস্বতি প্রণয়ণ করেন। ইহা একখানি ক্ষুদ্র করণ গ্রন্থ ইহাতে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও বরাহের নিরূপিত গণিত চুম্বক ভাবে লিখিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন।—

নত্বা মুরারেশ্চরণারবিন্দং। শ্রীমান শতানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
তাংভাস্বতীং শিষ্যহিতার্থমাহ। শাকেবিহীনে শশিপক্ষখৈকে॥ ১
শাকোন বাদ্রীন্দু কৃশানুযুক্তঃ। কলের্ভবত্যব্দগণস্তবৃত্তঃ।
বিরম্নভো লোচন বেদহীনঃ। শাস্ত্রাব্দপিণ্ড কথিতঃ সএবঃ।

কৃতযুগাম্বর-বহ্নিভিরুজ্ঝিতো। গতকলিকিলবিক্রম বৎসরাঃ॥
শরহুতাশন চন্দ্র বিয়োজিতো। ভবতি শাক ইহ ক্ষিতিমণ্ডলে॥
অথ প্রবক্ষ্যে মিহিরোপদেশাৎ। তৎসূর্য্যসিদ্ধান্ত সমংসমাসাৎ।
শাস্ত্রাব্দপিণ্ড স্বরশূন্যদিঘ্ন। স্তানাগ্নিযুক্তোষ্টশতৈর্বিভক্তঃ॥

পুস্তকের শেষে লিখিত আছে ঃ—

যেথাশ্বিবেদাব্দ গতে যুগাব্দে। দিব্যোক্তিতঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য।
শ্রীমান শতানন্দ ইমাং চকার। সরস্বতী শঙ্করয়ো স্তনুজঃ॥

শতানন্দের লিখিত "মিহিরোপদেশাৎ" কথাটী দেখিয়া শ্রীযুক্ত বেণ্টলি সাহেব সিদ্ধান্ত করিলেন বরাহ মিহির শতানন্দের গুরু ছিলেন সুতরাং তিনি ১০৬০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন ; কিন্তু পাঠক মহাশয় বেশ দেখিতেছেন যে বেণ্টলি উহার অর্থ বুঝেন নাই।

কেশব সম্বৎসরের পুত্র গণেশ দৈবজ্ঞ ১৪৪২ শকে গ্রহলাঘব বা সিদ্ধান্ত • রহস্য রচনা করেন। ইহার লেখা যেমন খটমটে তেমনি জটিল।

হিন্দুগণ জ্যোতিষ অপেক্ষা গণিত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেব বলেন যে ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের নিয়ম দ্বারা এত সহজে বীজগণিতের অঙ্কের ফল নিরূপিত হয় যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে বীজগণিত শাস্ত্র ব্রহ্মগুপ্তের বহুকাল পূর্ব্বে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তিনি এবং অধ্যাপক প্লেফেয়ার ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের বীজগণিত হইতে দুইটী অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে উক্ত দুই অঙ্ক যাহা ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর কর্তৃক বহুকাল পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছিল, তাহারই ফল নিরূপণে ডিওফানটুস, .ফর্মা ইংরাজ অধ্যাপকগণ অকৃতকার্য্য হয়েন। ইউলর সাহেব ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এবং ডিলাগ্রাঞ্জ * ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুই অঙ্কের যথার্থ ফল নিরূপণে সক্ষম নহেন।

কর্ম্মনাবাধ্যাতে বুদ্ধি ঃ—এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে দূরবীক্ষণের অভাবে অয়ন-চলন অবগত হইবার জন্য বরাহ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত বৃহৎ বৃত্তের সাহায্য লইয়াছেন। পরবর্ত্তী সকল জ্যোতিষী এই প্রকার বৃত্তের পরিধিস্থ অংশ কলা দ্বারা সূর্য্যের গতি অবগত হইবার বিষয় লিখিয়াছেন। গ্রহলাঘবে লেখক ইহাতে 'নালিকা যন্ত্রের' সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু এ যন্ত্রটী দূরবীক্ষণ কি কি— তাহা কিছুই প্রকাশ নাই।

পরিধির সহিত ব্যাসের ত্রৈরাশিকী সম্বন্ধ কি, তাহা জ্যোতিষীগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে।

ভাস্কর লিখিয়াছেন সূক্ষ্মগণনায় ব্যাস ১২৫০ হইলে পরিধি ৩৯২৭ হইবে এবং স্থূল গণনার ব্যাস ও পরিধির সম্বন্ধ ৭ ও ২২ দ্বারা নিরূপিত হয়—

* Vide Edinburgh Review Vol. XXXI P 14. Bijganit of the Hindus by Mr Colebrook.

ব্যাসেভনন্দাগ্নিহতে বিভক্তে। খগণসূর্য্যেঃপরিধিঃ সসূক্ষ্মঃ।
দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথশৈলৈঃ। স্থূলোঽথবাস্যাদ্ব্যবহারযোগ্যঃ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে যে, ১০ দশের বর্গমূল দ্বারা ব্যাসকে গুণিত করিলে পরিধি হয়; সুতরাং ব্যাসঃপরিধি :: ১ : ৩.১৬২৭ হয়, কিন্তু জ্যোৎপত্তি (Canon of sines) অধ্যায় এসম্বন্ধটি প্রকৃত সম্বন্ধটির নিকটবর্ত্তী বোধ হয়, যেহেতু তাহা দ্বারা জানা যায় যে, ব্যাসদল ৩৪৩৮ কলা ও পরিধির চতুর্থাংশ ৫৪০০ কলা নিরূপিত হইয়াছে।

আর্য্যভট্ট কর্তৃক ব্যাস ও পরিধির সম্বন্ধ বিংশতি সহস্র ও ৬২৮৩২ স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভট্ট ও ভাস্করের নিরূপিত ব্যাস ও পরিধির সম্বন্ধ এক কিন্তু ইউরোপীয় গণিতবেত্তাগণ বৃত্তের অভ্যন্তরেও বহির্ভাগে বহুসমভুজ অঙ্কিত করিয়া (ইহাকে ইংরাজিতে Quadrature of a circle বলে) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্যাসকে ৩.১৪১৫৯২৬ দ্বারা গুণ করিলে পরিধির প্রায় সমান হয়।

নিম্নলিখিত তালিকায় জ্যোতিষীগণ কর্তৃক নিরূপিত পৃথিবীর ব্যাসও পরিধিপ্রদত্ত হইল।

জ্যোতিষীগণ	ব্যাস যোজনে	পরিধি যোজনে	সম্বন্ধ ব্যাসঃপরিধি
আর্য্যভট্ট	১০৫০	৩৩৯৩	১ : ৩.২৩১৪
ব্রহ্মগুপ্ত	১০৮০	৩৩৯৩	১ : ৩.১৪১৬৬
সূর্য্যসিদ্ধান্ত	১৬০০		
ভাস্কর	১৫৮১ $\frac{১}{২৪}$	৪৯৬৭	১ : ৩.১৪১৫৯৯

সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক জ্যা নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া কেমন সুন্দর ও সুগমরূপে পরিধির অংশ কলায় ব্যাসের পরিমাণটীও নিরূপণ করিয়াছেন; সুতরাং Unit of circular measureর জন্যতাঁহাকে পৃথক চেষ্টা করিতে হইল না। ৯০ অংশের জ্যা হইল ব্যাস; এই ব্যাসটী সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ৩৪৯৮ কলায় পরিপূর্ণ সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে Unit of circular measure সমান হয় ৫৭.৩ অংশের। ইউরোপীয় মতে উহা পরিধির ৫৭.২৯৫৭৭৯৫ অংশের সমান হয়, সুতরাং বেশ দৃষ্ট হইতেছে যে, হিন্দুগণনা প্রকৃতের প্রায় সমান। সূর্য্যসিদ্ধান্তে জ্যা নিরূপণ করিবার এই নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে :—

রাশিলিপ্তাষ্টমোভাগঃ প্রথমং জ্যার্দ্ধমুচ্যতে।
তৎতদ্‌বিভক্ত লব্ধোন মিশ্রিতং তদ্‌দ্বিতীয়কং॥ ১৫॥
আদ্যেনৈব ক্রমাৎ পিণ্ডান্‌ভক্ত্বা লব্ধোন সংযুতা।
খণ্ডকাঃ স্যুঃ চতুর্বিংশ জ্যার্দ্ধপিণ্ডাঃক্রমাদমী॥ ১৬॥

রাশিতে যতগুলি লিপ্ত (কলা) আছে, তাহার অষ্টম ভাগ প্রথম জ্যার্দ্ধ বলিয়া অভিহিত। তাহাকে তাহা দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা লব্ধ হইবে তাহা ন্যূন করিয়া প্রথমে যুক্ত করিলে দ্বিতীয়

জ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকারে আদি দ্বারা পিণ্ডগুলি ভাগ দিয়া লব্ধাংশ ন্যূন করিয়া যুক্ত করিলে চতুর্বিংশ জ্যার্দ্ধপিণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ইহাকে ক্রমজ্যাও কহে।

নিম্নতালিকায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় নিরূপিত জ্যাপিণ্ড প্রদত্ত হইল।

পৃথিবীর অংশ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত নিরূপিত জ্যা	ইউরোপীয় নিরূপিত জ্যা	পৃথিবীর অংশ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত নিরূপিত জ্যা	ইউরোপীয় নিরূপিত জ্যা
৩-৪৫′	২২৫	২২৪·৮৫	৪৮-৪৫′	২৫৮৫	২৫৮৪·৬৪
৭-৩০	৪৪৯	৪৪৮·৭৫	৫২-৩০	২৭২৮	২৭২৭·৩৫
১১-১৫	৬৭১	৬৭০·৭১	৫৬-১৫	২৮৫৯	২৮৫৮·৩৮
১৫-০	৮৯০	৮৮৯·৮১	৬০-০	২৯৭৮	২৯৭৭·১৮
১৮·৪৫	১১০৫	১১০৫·০২	৬৩-৪৫	৩০৮৪	৩০৮৩·২৮
২২·৩০	১৩১৫	১৩১৫·৫৭	৬৭-৩০	৩১৭৭	৩১৭৬·৫৬
২৬·১৫	১৫২০	১৫২০·৪৮	৭১-১৫	৩২৫৬	৩৩৫৫·৩১
৩০-০	১৭১৯	১৭১৮·৮৭	৭৫-০	৩৩২১	৩৩২০·৬৮
৩৩-৪৫	১৯১০	১৯০৯·৯১	৭৮-৪৫	৩৩৭২	৩৩৭১·৬৯
৩৭-৩০	২০৯৩	২০৯২·৭৭	৮২-৩০	৩৪০৯	৩৪০৮·৪৪
৪১-১৫	২২৬৭	২২৬৬·৬৬	৮৬-১৫	৩৪৩১	৩৪৩০·৩৮
৪৫·০	২৪৩১	২৪৩১·০৮	৯০-০	৩৪৩৮	৩৪৩৭·৭৫

ত্রিজ্যা বা ব্যাস হইতে ক্রমজ্যা বাদ দিলে ক্রমে উৎক্রমজ্যা (Versed sine) প্রাপ্ত হইবে যথা—

১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ঠ	৭ম	৮ম
৭	২৯	৬৬	১১৭	১৮২	২৬১	৩৫৪	৪৬০
৯ম	১০ম	১১শ	১২শ	১৩শ	১৪শ	১৫শ	১৬শ
৫৭৯	৭১০	৮৫৩	১০০৭	১১৭১	১৩৪৫	১৫২৮	১৭১৯
১৭শ	১৮শ	১৯শ	২০শ	২১ম	২২ম	২৩ম	২৪ম
২৯২৮	২১২৩	২২৩৩	২৫৪৮	২৭৬৭	২৯৮৯	৩২১৩	৩৪৩৮

আমাদের গণিতশাস্ত্রের একটি বড় অভাব এই যে, ইহাতে প্রামাণ উদ্‌ঘাটন প্রণালী (Demonstration) প্রদত্ত হয় নাই। ইহা নাই বলিয়া আমাদের গণিতাধ্যাপকগণের দোষ দিতে পারি না, যেহেতু গণিতশাস্ত্র যাহা সহজবোধ্যপ্রযুক্ত ছন্দে লিখিত, তাহাতে উক্ত প্রণালীর সম্ভাবনা নাই।

পুরাণাদির সময় নিরূপণ।

পুরাণসমূহের ভবিষ্যৎ পর্ব্বাধ্যায়ে কলির রাজাগণের বংশাবলী ও তাঁহাদের রাজ্যকাল প্রদত্ত হইয়াছে। এগুলি সকল পুরাণেই প্রায় একরূপই লিখিত আছে, কিন্তু পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত যে বৎসর দেওয়া আছে, তাহাতেই কিছু ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। ভাগবতে আছে ঃ—

আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

যাবন্নপরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

বায়ুপুরাণে আছে—

মহানন্দভিষেকাত্তু জন্মযাবৎপরীক্ষিতঃ।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥

এই পুরাণত্রয় প্রদত্ত রাজগণের রাজ্যকাল একত্রিত করিলে ৪১৪৪ বৎসর হয়। পুরাণগুলি কলির আরম্ভে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া কথিত আছে সুতরাং উক্ত বৎসর সংখ্যা দৃষ্টে অবগত হইতেছি যে উক্ত অব্দই পুরাণগুলির রচনার নিকটবর্ত্তী সময়। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে পুরাণলিখিত পরীক্ষিৎ ও নন্দের সময়ের অন্তর যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদত্ত হইয়াছে ইহার কারণ কি? আমার বিবেচনায় ইহার কারণ এই যে পুরাণগুলি একসহস্রের অতিরিক্ত বৎসরগুলি স্বীয় স্বীয় প্রক্ষেপরূপে ব্যবহার করিয়াছেন সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রক্ষেপ রাজ্য কালে যোগ করিলে পুরাণগুলির রচনা কাল পৃথক্ পৃথক প্রাপ্ত হইবে। অতএব আমার মতে উক্ত পুরাণত্রয়ের রচনা কাল এই—

বিষ্ণুপুরাণ ৪১৪৪ + ১৫ = ৪১৫৯ কলিঅব্দ = ৯৮০ শকাব্দ
বায়ুপুরাণ ৪১৪৪ + ৫০ = ৪১৯৪ „ = ১০১৫ „
শ্রীমদ্ভাগবৎ ৪১৪৪ + ১১৫ = ৪২৫৯ „ = ১০৮০ „

পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছে—যেহেতু ইহা বিষ্ণু অবতার শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় পরিপূর্ণ সুতরাং বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত পূজনীয় গ্রন্থ। ভক্তমালে এপ্রকার দৃষ্ট হয় যে বোপদেব ভাগবতের লুপ্তোদ্ধার করেন; অতএব বোধ হইতেছে তিনিই ইহার রচয়িতা। সুতরাং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ লেখক বোপদেব যে ১০৮০ শকে প্রাদুর্ভূত হয়েন, ইহা অবগত হইতেছি।

কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ জীব গোস্বামী কর্ত্তৃক ১৪৮০ শকে লিখিত হয়। এখন পুরাণগুলি সপ্তর্ষির মঘানক্ষত্রে অবস্থান বিষয়ক তত্ব যে বরাহের পুস্তক হইতে অবগত হয়েন ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। শাকল্যসংহিতা বা ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যে যুগের প্রারম্ভে ক্রতুবৈষ্ণব বা শ্রবণানক্ষত্রে অবস্থান করেন। ইহাতে লিখিত আছে যে ক্রতুর ৩ তিন অংশ পূর্ব্বে পুলহ, তাঁর ১০ অংশ পশ্চিমে পুলস্ত্য; পুলস্ত্যের ৩ তিন অংশ পূর্ব্বে অত্রি, অত্রির ৮ অংশ দক্ষিণ পশ্চিমে অঙ্গিরা অঙ্গিরার ৭ অংশ পূর্ব্বে বশিষ্ঠারুন্ধতী, তাঁর ১০ অংশ পূর্ব্বে মরীচি অবস্থান করিতেছেন।

শাকল্য সংহিতায় আর লিখিত আছে যে সপ্তর্ষিগণ ৮ লিপ্ত বা কলা করিয়া প্রতি বৎসর অগ্রসর হয়েন সুতরাং নক্ষত্রচক্র ভ্রমণ করিতে তাঁহাদের ২৭০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। অতএব শাকল্যসংহিতামতে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যখন প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন সপ্তর্ষিগণ

শ্রবণানক্ষত্রে ছিলেন কিন্তু বরাহের মতে জানা যাইতেছে যে যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং বরাহের নিরূপিত সপ্তর্ষির অবস্থানই যথার্থ বলিয়া পুরাণ লেখকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে সুতরাং পুরাণ লেখকগণ বরাহের পুস্তক হইতেই সপ্তর্ষির মঘানক্ষত্রে অবস্থান বিষয়ক তত্ব অবগত হইয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সপ্তর্ষিগণ প্রতিশতাব্দীতে যে এক এক নক্ষত্রে গমন করেন ইহা আমার বিশ্বাস হয় না; যেহেতু সপ্তর্ষির মধ্যে ক্রতু ও পুলহ বর্ত্তমান সময়েও মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন এবং পরেও যে ঐ নক্ষত্রে অবস্থান করিবেন তাহাও স্থির; সুতরাং তাঁহারা আমাদের বৎসর পরিবর্ত্তনে কেন বিচলিত হইবেন। যেমন সকল কল্পনারই (Theory) এক একটী অবলম্বন (Locus standi) আছে সেই প্রকার যুধিষ্ঠিরাদির সময় নিরূপণেও বরাহাদি একটী অবলম্বনের আশ্রয় লইয়াছেন। সুতরাং এই বচন দেখিতে পাই—

একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তেচরন্তি বর্ষানাং।
প্রাগুদয়তোহস্তবিবরাদৃদ্ধ্ দয়ং তত্রসযুক্তা॥

এক এক নক্ষত্রে তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) একশত বৎসর করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা নক্ষত্রযুক্ত হইয়া উদয় ও অস্ত হয়েন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সময়ে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। তিনি শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। বরাহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ছিল— যুধিষ্ঠির তাঁহার সময়ের ২৭০০ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন ইহা প্রকাশ করা। সহজ কথায় কেহ প্রত্যয় করে কিনা সেই জন্য উক্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল। সুতরাং বেশ প্রকাশ হইতেছে যে বরাহের সময়েও সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়া আসিয়াছি যে বরাহ ২০৬ শকে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এক্ষণে সপ্তর্ষির অবস্থান বিষয়ক গণনা দ্বারা দেখিতেছি তিনি ১৭৪ শকে (২৭০০-২৫২৬) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ইহা কিছু অসম্ভব নহে।

কাশ্মীরে ১০০ বৎসর পরিমিত একটী লৌকিকাব্দ প্রচলিত ছিল যেহেতু কল্হণ পণ্ডিত তাঁহার সময়ে তাহা চতুর্বিংশতি দিয়াছেন এবং আর একস্থানে ৭৪ লৌকিকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও সপ্তর্ষির প্রতিনক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থান বিষয়ক কল্পনার মূল কতক অবগত হওয়া যাইতেছে।

গোনর্দ্দবংশীয় রাজগণ ২২৬৮ বৎসর রাজ্য করিবার পর কাশ্মীর তুরস্ক জাতীয় রাজগণের হস্তগত হয়। কল্হণের মতে তাঁহারা অতি দয়ালু রাজা ছিলেন।

হুষ্কজুষ্ককনিষ্কাখ্যাস্ত্রয় স্তত্রৈব পার্থিবাঃ।
তেতুরষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়াঃ নৃপাঃ।

প্রাজ্যে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কাশ্মীর মণ্ডলং।
ভোজ্যমাস্তে চ বৌদ্ধানাং প্রব্রমোর্জিত তেজসাং॥

শেষ শ্লোকটী প্রকাশ করিতেছে তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কহ্লণের মতে শকের ২৫৮ বৎসর পূর্ব্বে (১৮০ খ্রীঃ পূঃ) কাশ্মীরে তুরষ্কাধিকার হয়। ইহাঁরা শকের প্রারম্ভে পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। জেনেরেল কানিংহমের মতে ইঁহারা সম্বতের প্রবর্ত্তক যেহেতু মথুরায় সম্বতাব্দ যুক্ত ইহাঁদের প্রদত্ত অনেক শিলালিপি দৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় যে লিখিয়াছেন যে কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন তাহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় তাঁহার History of India নামক গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণেও একটী মহা ভুল করিয়াছেন। তিনি রাজতরঙ্গিণীর নজীর প্রয়োগ করিয়া কোন্ প্রমাণ বলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে যুধিষ্ঠির খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১২৬৬ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হয়েন তাহা বলা যায় না? আমার বোধ হয় তাঁহার মনের উপযুক্ত হইবে বলিয়া তিনি নজীরের ২৩৩০ সংখ্যক বৎসরটী বাদ দিয়া তাহা খৃষ্টাব্দে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক সকলের নিকট আদৃত হইয়াছে অতএব পাঠক মহাশয়গণ উপরিলিখিত অংশে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীকানাইলাল ঘোষাল।

বাঁশী।

(১)

"ঠাকুরজামাই আমারা কোথায় যাচ্ছি? এ কি আমাদের গ্রামের পথ? না! এ যে রাজমহলের রাস্তা, ঐ সব পাহাড়, রাস্তার এক পাশে খদ,—এতদূরে কেন এসে পড়লুম?"

জীবন চুপ করিয়া রহিল। সুহাসিনী কুতুহলী নেত্রে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সেখানে গাঢ়বর্ণে কি লেখা লিখিত দেখিল, একটা ভয় ও সন্দেহে তাহার হৃদয় অকস্মাৎ আচ্ছন্ন হইল। ফাঁদে পড়া হরিণীর ন্যায় ত্রস্ত চঞ্চল লোচনে, কাতরস্বরে বলিল "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জীবন, বাড়ী কোথা?"

জীবন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওর তলায় গাড়ী থাম্‌বে, ঐ পাহাড়ের উপর যে ছোট্ট বাড়ীটি রয়েছে ঐ আমাদের বাড়ী।"

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "সে কি, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

"তবে শোন"—জীবনের স্বর আবেগের আধিক্যপ্রযুক্ত ঘনশ্বাসজড়িত,—"সুহাসিনি, তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, জীবনসর্ব্বস্ব, এতদিন অতি কষ্টে আমি নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছিলুম; আর না, দৈব এতদিনে আমার সহায় হয়েছে। তোমার যখন পিতৃগৃহ থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে এল, অথচ প্রভাষের হাতের কাজ ফুরোল না, তখন আমি গিয়ে তোমায় আন্‌বার প্রস্তাব কর্‌লেম। প্রভাষ অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্মতি দিলে। আমি সেখানে যাত্রা করার পূর্ব্বে এখানে এসে এই বাড়ী ঠিক করে গিয়েছি, এস্থান আমার পূর্ব্ব পরিচিত। প্রিয়তমে এই গৃহে তুমি আমার গৃহ লক্ষ্মী হয়ে অধিষ্ঠান করবে।"

প্রিয় সম্বোধনটি এমন ভাবে উচ্চারণ করিল যেন বহুদিনের অনশনপীড়িত ব্যক্তির রসনাগ্রে সহসা অতি সুস্বাদু বস্তুর আস্বাদন মিলিয়াছে।

সুহাসিনী স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিল "জীবন মুগ্ধ! তুমি কি বল্‌ছ! বাড়ী ফিরে চল, সেখানে শাস্তি তোমার পথ চেয়ে রয়েছে।"

"আর না সুহাসিনি, সে বাড়ী আর না, এখন হতে এই আমাদের বাড়ী।"

সুহাসিনী কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল 'ফিরে চল, ফিরে চল ভাই, আমি তোমার শরণাপন্ন বোন, আমাকে তাঁর কাছে দিয়ে এস, তিনি বিশ্বাস করে তোমাকে পাঠিয়েছেন, আমাদের পথ চেয়ে রয়েছেন, বিলম্ব দেখে কত চিন্তিত হচ্ছেন, তাঁর বিশ্বাস রাখো রাখো।"

জীবন মৌন, তাহার সংকল্প অবিচলিত। গাড়ী ক্রমেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর

হইতেছে। সুহাসিনী জীবনের পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল ;—গাড়ী খদের পাশ দিয়া চলিতেছে, একবার এক দৃষ্টিপাতে খদের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া লইল, তারপরে আর, ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। জীবন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া চকিতে তাহার সহিত মাটিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া খদে গড়াইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানের আহ্বানে গ্রামস্থ লোক জড় হইয়া তাহাদের উঠাইল, দুজনেই সংজ্ঞাহীন, আহত, রক্তাপ্লুতদেহ। দুই চারি দিন পরে সুহাসিনীর সংজ্ঞালাভ হইলে তাহার কথিত ঠিকানায় প্রভাষকে সংবাদ পাঠান হইল। জীবন বেশী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার তখনও ভালরূপ চেতনা সঞ্চার হয় নাই। প্রভাষ তাহাদের সন্তর্পণে পাল্কীতে উঠাইয়া বাড়ী লইয়া গেল। কিরূপে এই অস্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা তখন জানিতে পারিল না। বাড়ী গিয়া জীবনের জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র সে প্রভাষকে তাহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া পাঠাইয়া সব বলিল, কিছু গোপন করিল না।

বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি প্রভাষের মমতার উৎস রুদ্ধ হইল, সে শুষ্ক অন্তঃকরণে কঠিন হৃদয়ে সুহাসিনীর রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেল।

২

দীপালোকবর্জ্জিত অন্ধকার গৃহে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তি সুহাসিনীর শয্যার পাদতলে বসিয়া কাঁদিতেছে, শিয়রে প্রভাষ, স্থিরপুত্তলিকাপ্রতিম। তাহার চক্ষে অশ্রু নাই ; যাহার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব ধ্বংস হইতেছে তাহার প্রতি করুণার লেশহীন নীরস তীব্র ক্রোধে হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।—কিন্তু তাহার ক্রোধের পাত্রও তখন নিম্নগৃহে মৃত্যুশয্যায় শয়ান।

সুহাসিনী একবার চক্ষু মেলিল, জ্যোৎস্নার আলোকে প্রভাষের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল "জীবনকে ক্ষমা কোরো।"

শান্তি এই করুণাবাক্যে কৃতজ্ঞতাভরে শয্যাপ্রান্ত হইতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাষের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, শুধু সুহাসিনীর ক্লান্ত অধরের শেষ আহ্বান বুঝিল। তাহার অন্তিম চুম্বন লইয়া, দীর্ণহৃদয়ে তাহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে শান্তি প্রভাষকে সে গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিল।

গভীর রাত্রে, বহু কষ্টে আপনার অবশ দেহ ভার কোন মতে টানিয়া আনিয়া একজন হতভাগ্য চিরনিদ্রিতা সুহাসিনীর চরণকমল অশ্রুজলে ধৌত করিয়া, মনে মনে সেই দেবীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া, পুনর্ব্বার বহু আয়াসে ধীরে ধীরে আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল।

৩

জীবনের মৃত্যু শয্যা। শুধু শান্তি তারপাশে বসিয়া রহিয়াছে, সে গৃহে আর কেহ নাই। বিষণ্ন, ক্ষীণকণ্ঠে জীবন বলিল, "আর ত দেরী নেই শান্তি, একবার তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো।"

জীবনের আহ্বানে প্রভাষ আসিল, আসিয়া শয্যা হইতে কিছু তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বলিল "শেষ বার তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্ছি প্রভাষ, জন্মের মত বিদায়, এখনও কি একবার স্নেহালিঙ্গন দিবে না?"

প্রভাষ নিরুত্তর রহিল। জীবন ব্যথিত হৃদয়ে, শ্রান্তদেহ দেয়ালের দিকে ফিরাইয়া বলিল "আমি মার্জ্জনার যোগ্য নহি ঠিক; অতি সহনাতীত অন্যায় করিয়াছি; তাই হউক; এ শাস্তি আমার বহনীয়।"

আর এক মুহূর্ত্তেই সব ফুরাইল। একটা গভীর বেদনা জীবনের মৃতমুখে ছাপ রাখিয়া গেল।

৪

শুক্লপক্ষ; আকাশ মেঘলা; প্রবল ঝোড়ো বাতাস বহিতেছে। দুঃখী হউক, সুখী হউক, এত বাতাস সকলের মনকেই একটু বিক্ষিপ্ত করে, তাহাদের স্বস্ব চিন্তাভার হইতে ঈষৎ ইতস্ততঃ উড়াইয়া লইয়া যায়। আজ যদি প্রথম বসন্তের সুশোভন মধুরিমাময় জ্যোৎস্নারাত্রি হইত তাহা হইলে শান্তির হৃদয় এখনও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আজিকার ঝোড়ো প্রকৃতির সঙ্গলাভে তাহার মন ঈষৎ শিথিল হইয়াছে। পীড়িত নিরাবলম্বন হৃদয়ের প্রকৃতির দুরন্তপনা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কতকটা আশ্রয় সান্ত্বনা, অবলম্বন আছে। শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহ কোণ হইতে বহুদিনের অনাদৃত সেতারটা লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিল। তার তারের ঝঙ্কার উপরের গৃহে তাহার ভ্রাতার কাণে আসিয়া পঁহুছিল, এবং তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল।

বৃহৎ পুরীর দুই বিভিন্ন তলার দুটি কক্ষে দুই ভাই বোনের বাস। ইহাদের পৃথিবীতে আর কেহ নাই; অথচ দুঃখের দিন ইহাদের পরস্পরকে পরস্পরের হৃদয়ের আরও একটু কাছাকাছি টানে নাই—বিস্তর তফাৎ করিয়া দিয়াছে। হৃদয়ের ব্রণস্থানে পরস্পরের সহানুভূতির স্পর্শ হইতে উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। যে গৃহে আগে প্রেমের রাজত্ব ছিল, যেখানে হাসি, গান, প্রীতি কারণে অকারণে নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত আজ তাহা বিষণ্ণ, নিরানন্দ, চিরপ্রেমবিরহিত। ইহাদের অন্তরে অন্তরে মিল আছে দুজনের দুঃখে দুজনে মনে মনে ব্যথিত হয়, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই।

প্রভাষ এক একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাঁশী বাজায়, তার বাঁশীর বিলাপ শান্তির হৃদয় স্পর্শ করে, ভ্রাতার দুঃখে তাহার শিরায় শিরায় দুঃখপ্রবাহ সঞ্চরণ করিতে থাকে, কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথা কহিতে আসেনা, কোন স্নেহ বাক্য বলে না, শুধু বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া প্রভাষের জন্য কাঁদে, বাঁশীর বিরামের জন্য কান পাতিয়া থাকে।

যখন আর বাঁশীর শব্দ কানে আসে না, তখন জানে সে রাত্রির মত প্রভাষ শান্ত হইল, সুহাসিনীর আবাহন সমাপ্ত হইল, দুঃখের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হইল।—হায় কি ছিল আর কি হইয়াছে। তখনকার প্রত্যেক দিনটী কি মাধুরীপ্লুত, কি শোভাময়, কি মধুময়।

কি সহজ আনন্দে চারিটী তরুণ হৃদয়ের জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। মাঝে হইতে কুটিল লালসা কোথা হইতে আসিয়া সব ভণ্ডুল করিল, জীবনের মরণ কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? শান্তি কি বুঝে না প্রভাষের প্রতি জীবন কতদূর অপরাধী? স্বামীর অপরাধে ভ্রাতাকে দুঃখী জানিয়াই ত দ্বিগুণ দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তিমশয্যায় অনুতপ্ত, ক্ষমাভিখারী স্বামীর প্রতি ভ্রাতার কাঠিন্য যখন স্মরণ হয় সেই বেদনাক্লিষ্ট মৃতমুখখানি যখন মনে পড়ে তখন তাহারও হৃদয় বড় কাঠিন্যে পূর্ণ হয়, আর প্রভাষের নিকট স্বামীর অপরাধের জন্য, অতীত সুখদিবসের জন্য কাঁদা হয় না, নিজের দুঃখ সান্ত্বনা নিজের অন্তরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রভাষ শান্তির নিরানন্দ শূন্য হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়, কিন্তু তাহাকে জীবনের পক্ষপাতী জানে, মনে করে জীবনের যতখানি অপরাধ শান্তি তাহাকে তাহার অপেক্ষা অনেকটা কমাইয়া দেখে তাই প্রভাষের দুঃখের পরিমাণ সে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না। সে যে জীবনকে মার্জ্জনা করে নাই ইহাই শান্তি মনে রাখিয়াছে কত দুঃখে যে করিতে পারে নাই তাহা বুঝে নাই। তাই শান্তির কাছে আর হৃদয় খোলা হয় না। অভিমানে সঙ্কোচে দুজনে দূরে দূরে থাকে, কেহ কাহারো হৃদয়ের নাগাল পায়না।

কিন্তু প্রভাষেরই মনের আবেগ বাহিরে বাঁশীতে ছাড়া পায়, শান্তিরত কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়না, সব সময়ে তাহার নিঃসঙ্গ দুঃখবিলীন জীবনের কথা তাই মনেও হয় না। তাই আজ যখন প্রথম তার বীণার করুণ ঝঙ্কার প্রবল বায়ুপ্রবাহে প্রভাষের কানে ভাসিয়া আসিয়া শান্তিকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার চিত্ত বড় চঞ্চল হইল। সুরের পরতে পরতে প্রভাষের মানসচক্ষে বড় বেদনা বড় শূন্যতার স্তর একে একে উন্মুক্ত হইতে লাগিল। এই তরুণ বয়সে এই দুঃখভারে অবনমিত ভূমিসাৎ হৃদয়ের সমস্ত কারুণ্যটা তাহার রক্তে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তে যত দুঃখ শান্তির না ছিল তাহার অপেক্ষা বেশী দুঃখে তাহাকে দুঃখী অনুমান করিল। ঘনীভূত দুঃখ তরলায়মান হইলেই হৃদয়ভার অশ্রু হইয়া গলিয়া আসে, আজিকার প্রকৃতির প্রভাবে শান্তির মনভার কিঞ্চিৎ লঘু হইয়াছিল বলিয়াই সে বীণার নিকট অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু প্রভাষের উত্তেজিত কল্পনায় বোধ হইল শান্তির বীণাধারণ তাহার দুঃখের চূড়ান্ত অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। এই ম্লান চন্দ্র, এই প্রবল বাত্যা তারি মধ্যে নির্জ্জন গৃহে শান্তির দীনা ছবি প্রভাষের হৃদয়কে বড় নাড়া দিল। শান্তির নিকটে গিয়া একটি স্নেহ সম্ভাষণ তাহার ললাটে একটী সস্নেহ হস্তস্পর্শের জন্য হৃদয় বড় লোলুপ হইল—কিন্তু কিছুই করা হইলনা। চট্ করিয়া একটা চিন্তা মনে বাধিল,—শান্তি যদি তাহাকে ঠিক না বোঝে? সে যে ভাবে আর্দ্র হইয়া তাহার নিকট যাইবে তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু যদি শান্তি ধরিয়া লয়? যদি মনে করে জীবনের অপরাধের ন্যূনতা সম্বন্ধে সে এখন শান্তির সহিত একমত? তাহা নয়, তাহা নয়, জীবনের প্রতি সে কোমলতা দেখাইতে পারিবে না, জীবনকে সে মার্জ্জনা করিতে পারেনা।—তাই শান্তির নিকট যাওয়া হইল না, তাই আর তাহাকে দুটি মিষ্ট কথা বলা হইলনা।

তাহার পর এমন মাঝে মাঝে কোন কোন সন্ধ্যায় শান্তির সেতার বাজিতে লাগিল, প্রভাষের চিত্তও ক্রমেই বেশী অস্থির হইতে লাগিল, শান্তির প্রতি স্নেহ ব্যবহারের লালসায় হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু সে পীড়া শান্ত করিবার উপায় রুদ্ধ, দুজনের মধ্যে এমনি কঠিন সঙ্কোচের দেয়াল উঠিয়াছে। অবশেষে একদিন তাহার আবেগ আত্মশান্তির নূতন পথ খুঁজিয়া লইল। প্রভাষ কাগজ পাড়িয়া নামও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদের কাহিনী লিখিল, সহজ সুন্দর ভাষায় সমস্ত কারুণ্য ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিল, ক্রমে ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিল। শান্তির বীণার তান কানে আসিলেই সে যেন দশাপ্রাপ্ত হইয়া কলম ধরিত। তার পরদিন সকাল বেলায় পড়িলে সেটা দাঁড়াইত একটা সুললিত মর্ম্মহারী সাহিত্যপ্রসূন।

৫

শান্তি কখন প্রভাষের গৃহে আসেনা। একদিন দ্বিপ্রহরে প্রভাষ বাহিরে গিয়াছে; বহুকাল পরে শান্তির সেদিন তাহার গৃহে আসিতে সাধ হইল; সঙ্গীহীন, একক ভ্রাতার কি করিয়া সারাদিন কাটে, কত যে হৃদয় বেদনা গৃহতৈজসেরা তাহার যেন সাক্ষ্য দিবে, যে সকল অচেতন পদার্থ তাহার ভ্রাতাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে তাহাদের কাছে আসিয়া এক বার তাহার জন্য অশ্রুপাত করিতে সে প্রভাষের গৃহে আসিল। বহুদিন পরে সুহাসিনীর নিদর্শনপূর্ণ সে গৃহ দেখিয়া শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না, টেবিলের সম্মুখে চৌকির উপর উপবেশন করিল, টেবিলের উপর একখানা বাঙ্গালা কাগজ দেখিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহা হাতে লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। হঠাৎ একটা লেখায় তাহার মনোযোগ আবদ্ধ হইল, ক্রমে সে অবহিতচিত্তে, উত্তেজিত মস্তিষ্কে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। প্রভাষ গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল শান্তির হাতে কি কাগজ এবং তাহার মধ্যে কোন্ রচনায় সে নিবিষ্টচিত্ত। সে কিছু বলিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তি, পড়া শেষ হইলে উঠিয়া ক্লিষ্টমূর্ত্তিতে প্রভাষের দিকে চাহিয়া বলিল "দাদা একি তুমি আর আমি"? প্রভাষ বলিল "হ্যাঁ"।

শান্তি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। নিজের গৃহে গিয়া একবার ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিল, তাহার পর উঠিয়া চোখ মুছিয়া গৃহ কাজে গেল। প্রভাষের সহিত সম্পর্ক আরও বিরল হইয়া আসিল,—আর কখন তাহার গৃহে যায় না। প্রভাষের সঙ্গীতের ভাষা শান্তি বুঝে, চিরকাল তাহাতে অভ্যস্ত, কিন্তু আর কিছু শান্তির পক্ষে বিজাতীয়। তাহার লেখার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহা যে কতখানি দুঃখ, কতখানি সমবেদনার ফল তাহা বুঝিতে পারিল না, সে শুধু ভাবিল "দাদা হৃদয়হীন, আত্মীয় জনের মর্ম্মভেদী দুঃখকে যশের পণ্যদ্রব্য করিয়াছেন," শান্তির প্রতি ব্যবহারে যে স্নেহের ত্রুটী হইয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভাষ প্রতিনিয়ত এই সাহিত্যতীর্থে করিতেছে তাহা শান্তি বুঝিল না, তাহার প্রতিকারেচ্ছার ব্যাকুলতা কিছু ধরিতে পারিল না।

তাহার পর হইতে শান্তির সেতার একেবারে স্তব্ধ হইল; সজীবতার শেষ ছিদ্র টুকু পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল। সে নূতন করিয়া হৃদয়ের চারি পাশে কঠিনতার প্রাচীর গাঁথিল। তখন প্রভাষের বাঁশী প্রতি রাত্রি বড় ক্রন্দন কাঁদিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে প্রাচীর ভেদ করিয়া বহু বিলম্বে হৃততেজে শান্তির হৃদয়ে পঁহুছিত। আর তাহা শান্তিকে শীঘ্র উতলা করে না, আর শান্তি প্রভাষের ব্যথায় ব্যথিত হয় না। কিন্তু কতদিন এভাব টিঁকিবে? ক্রন্দনের আঘাতে আঘাতে প্রাচীর জীর্ণ হইয়া আসিল, অল্পে অল্পে বিলম্বে তাহা খসিল, একদিন শান্তির অনাবৃত বক্ষে বাঁশী আবার বিঁধিল। এ সুহাসিনীর আবাহন নহে, প্রভাষের আত্মকরুণা নহে, এবার বাঁশী বার বার কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্তির নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার রুদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ পায় নাই,—শান্তি সব বুঝিল। আজ প্রভাষের লেখার মর্ম্ম ও সে বুঝিল, তাহা যে স্নেহবিরহিত হৃদয়ের ব্যাকুল মিলনাকাঙ্খার ভাষা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। যে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিল।

প্রভাষ ছাদের উপর এক হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছে, বাঁশী তার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া তাহার অন্য হাতটী নিজের হাতে লইয়া বলিল "দাদা"।

প্রভাষ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল।

"আমায় মাপ কর ভাই।"

অশ্রুবিজড়িত স্বরে প্রভাষ বলিয়া উঠিল, "তুই আমায় মাপ কর্ শান্তি, তোর এত দুঃখেও আমি তোর প্রতি কঠিন ছিলুম, আমি বড় নিষ্ঠুর বড় নিষ্ঠুর জীবনকে ক্ষমা করিনি, তার অন্তিম ভিক্ষা অবহেলা করেছি, হায়, কে পাপী, জীবন না আমি?—ওহে জীবন, ভাই, একটিবার ফিরে এসো, এ হতভাগ্যকে তোমার শেষ আলিঙ্গন দিয়ে যাও।"

* * * * * * * * * * * *

তারপরে? তারপরে সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল, শুধু এই ক্লেশতাপিত ধরণীর দুটি প্রাণীর জীবনভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া আসিল।

শ্রীসরলা দেবী।

চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

কোন ক্রীড়ার বিষয় পত্রিকায় আলোচিত হইতে দেখিলে, হয়ত অনেক বিজ্ঞ পাঠক বিরক্ত হইবেন, কিন্তু যে ক্রীড়া আলোচিত হইতেছে, ইহা কেবল ক্রীড়া নহে, বিজ্ঞানের একটী সরস শাখাও বটে। ক্রীড়ক ও দর্শকের মনে যথেষ্ট মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া আমোদ প্রদান করে এই জন্য ক্রীড়া; এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, সাবধানতা, দক্ষতা, স্মারকতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের বৃদ্ধি করে এইজন্য বিজ্ঞান। বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহার স্বভাব পরীক্ষা করিয়া সামান্য ক্রীড়ার ন্যায় ইহাকে অগ্রাহ্য করিবেন না। ইহা সকল কালে সকল দেশে মহা সমাদরে ক্রীড়িত হইয়া আসিতেছে; এমন কি ইহা আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রে কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আলোচ্য বলিয়া বিধি আছে, এবং ইহার জয় পরাজয়ে সমস্ত বৎসরের ভাবী সুখ দুঃখের নির্ভর করে বলিয়া অনুশাসনও অছে।

চতুরঙ্গ আমাদের ভারতের সামগ্রী; যুদ্ধ পদ্ধতি অনুকরণে ইহার সৃষ্টি। গজসৈন্য, অশ্বসৈন্য, নৌসৈন্য, এবং পদাতিক সৈন্য, ভারতের সৈন্যের এই চারি বিভাগ বা অঙ্গ ছিল; উক্ত বিভাগ অনুসারেই, এই ক্রীড়ার সৈন্যের বিভাগ, সেই জন্যই ইহার নাম চতুরঙ্গ। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমুদয় সভ্য সমাজে মহা সমাদরে গৃহীত; ইহা আমাদের অত্যন্ত সুখের বিষয়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই ক্রীড়ার সৈন্যের গতি ও ক্রীড়ার পদ্ধতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি আদিম কালের মূল যুক্তি অবিকল একরূপই আছে; প্রথমে ইহার সৈন্যের গতি পাশা দ্বারা নিয়মিত হইত, এক্ষণের ন্যায় কেবল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিত না।

বর্ত্তমান সময়ে আঁদিম কালের চতুরঙ্গ ক্রীড়া আর্য্যঋষির প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি সকল অবিকল রাখিয়া আর ক্রীড়িত হয় না, এখন উহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা সামান্য ব্যতিক্রম করিয়া এবং চতুরঙ্গ নামের অপভ্রংশ সতরঞ্জ নাম রাখিয়া যে ক্রীড়া করিতেন, আমরা এখন তাহাই ক্রীড়া করিয়া থাকি। এই প্রচলিত সতরঞ্জ ক্রীড়া যাহাতে বিজ্ঞানের অনুমোদিত থাকিয়া সকলের তুষ্টির কারণ হয়, তাহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যে সকল নিয়ম পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত করিলে এই ক্রীড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুমোদিত হইবে, তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা লেখকের শক্তির সম্পূর্ণ অভাব, তবে যোগ্যতর ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ জন্য ইউরোপীয় ক্রীড়ার প্রথার সহিত ইহার তুলনার ছলে কয়েকটি দোষের উল্লেখ করিব এবং তৎসহ আমাদের অভিপ্রায়েরও আভাষ দিব।

ইউরোপীয়দের বলের গতি ও ক্রীড়ার পদ্ধতি প্রথমে এই সতরঞ্জের ন্যায় ছিল, কিন্তু অসুবিধা দেখিয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাহারা কয়েকটি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে; এই পরিবর্ত্তন দ্বারা যদিও এখনও উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু উহাদের যে প্রকার অধ্যবসায়, এই ক্রীড়ায় যেরূপ যত্ন, নিশ্চয় শীঘ্রই ইহাকে আরও উন্নত করিবে।

উহাদের পদাতিক প্রথমে একবার দুই ঘর এবং রাজা নিরাপদ স্থানে যাইবার সময়

(কোটে) নৌকার সহিত একবারে নির্দ্দিষ্ট ঘরে সরল গতিতে যাইতে পারে। বলের গতি সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম সমুদয় আমাদের নিয়মের সহিত এক ; এই দুই নিয়ম পরিবর্ত্তন করায় যে লাভ হইয়াছে, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক।

আমাদের পদাতিক সকল অবস্থাতেই এক ঘর যাইয়া থাকে ; কেবল প্রথম ক্রীড়া আরম্ভের সময় একবারে দুই ঘর যাইতে পারে। এই প্রকার মৃদুগতির জন্যই ক্রীড়ার অবস্থা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় উঠে। পদাতিকের মৃদু গতির দ্বারা প্রধান বল সকলের গমন পথ অবরুদ্ধ হওয়ায়, উহারা একবারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে না, পরস্পরের শক্তির অন্তরায় রূপে অবস্থিতি করে, সুতরাং অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় এবং ক্রীড়ার অবস্থাও উন্নত হয় না। আত্মরক্ষা ও বিপক্ষকে আক্রমণ করা সৈন্য সমাবেশের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু পদাতিকের দ্বারা গতিপথ অবরুদ্ধ থাকায় যথাস্থানে স্থাপিত হয় না। বোধ হয় পূর্ব্বে এই অসুবিধা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্যই পরীক্ষা স্বরূপ ক্রীড়ার আরম্ভের সময় একটী বার মাত্র কোন এক পদাতিককে দুই ঘর যাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে তাহা সম্যক সমাধা হইয়া উঠে নাই, যেমন তেমনি রহিয়া গিয়াছে।

রাজাকে দুর্গ মধ্যে (কোটে) লইবার প্রথা ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকার, অধিকাংশ স্থানেই সে অশ্বের গতি পাইয়া থাকে, কিন্তু এক বার আক্রমিত হইলে (কিস্তি পাইলে) আর সে অধিকার থাকে না। এই নিয়মে বাধ্য থাকিয়া দুর্গ রচনার সময় বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এইজন্য সৈন্য সকলকে এমন অন্যায় স্থানে স্থাপিত করিতে হয়, যে তদ্দ্বারা আক্রমণ করা দূরের কথা,—আত্মরক্ষা করাই দুষ্কর। সত্য বটে রাজাকে নিষ্কর্ম্মা না রাখিয়া, প্রথম অবধি যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে অনেক সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু রাজাকে মারিবার কৌশল অন্বেষণ করাই যখন সার উদ্দেশ্য, তখন তুমুল সংগ্রামের সময় দুর্গে লুকাইয়া রাখাই ভাল, নচেৎ সামান্য ত্রুটিতেই বিপদ ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াও থাকে। তাই দুর্গ রচনার একান্ত আবশ্যক।

সৈন্যের গতির উক্ত নিয়ম দুইটী পরিবর্ত্তন করায় ইউরোপীয়দের ক্রীড়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলি না, তবে আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। পদাতিক ও রাজার গতির উক্ত পরিবর্ত্তনে, বল সকলকে একবারেই আক্রমণ ও আত্মরক্ষণ উপযোগী স্থানে স্থাপন করিতে পারা যায়, কাহাকেও কাহারও শক্তির অবরোধক করিয়া বসাইতে হয় না। সৈন্য সকল যথাস্থানে স্থাপিত হইলে রঙ্গস্থল সুদৃশ্য হইয়া থাকে ; সেই জন্য ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ ক্রীড়কগণের ক্রীড়া দেখিতে বড়ই সুন্দর।

সৈন্যের গতি সম্বন্ধে এই দুই নিয়ম কেবল ভিন্ন, অন্য সমুদয় আমাদের সহিত এক। এই সামান্য নিয়ম পরিবর্ত্তনে ক্রীড়ার শক্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা উক্ত হইল, এক্ষণে যাহাতে ক্রীড়কের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাই দেখা যাইতেছে।

আমাদের রাজার কেহ সহায় না থাকিলে বা উভয় পক্ষের একজন করিয়া সহায় থাকিলে যথাক্রমে ফকির বা চতুর্ব্বলা হইয়া কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় হয় না, উভয় পক্ষে সমান হইল (চটিয়া গেল) বলিয়া সে বার ক্রীড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অভাব পক্ষে একটী পদাতিকের অষ্টম ঘরে যাইবার গমন পথ অবরোধ করিতে হইবে, নচেৎ একবার মাত্র অষ্টম ঘরে উপস্থিত হইলেই ষণ্ড বল (ষাঁড়া) হইবে, যতই উপদ্রব করুক বৃষোৎসর্গের ষণ্ডের ন্যায় সর্ব্বথাই ক্ষন্তব্য। বিপক্ষের ষণ্ড সৈন্য হইলে মহাবল সত্ত্বেও সমান হইল বলিয়া প্রায়ই সেবার খেলা বন্ধ করিতে হয়। কি ভয়ানক অবিচার? অসমান শক্তি ক্রীড়ক এমন কি ১৬ঃঃ ১২ হইলেও আমাদের নিয়মে সমান ক্রীড়ক হইতে পারে, ইউরোপীয়দের নিয়মে ক্রীড়কদিগের শক্তির সামান্য ইতর বিশেষ থাকিলেই জয় পরাজয় হইয়া থাকে। রাজা একক, চতুর্ব্বলা বা ষণ্ডবল হইলে উভয় পক্ষে সমান হইবে না, যতক্ষণ রাজাকে মাত (মৃত) করিবার উপায় থাকিবে, ততক্ষণ ক্রীড়া চলিবে, কোন আপত্তি শুনিবে না। এই হেতুই শক্তির বা মনোযোগের সামান্য অভাবেই পরাজিত হইতে হয়।

আমাদের পদাতিক যে বলের অষ্টম ঘরে উপস্থিত হইবে, সেই বল হইবে, যে কোন অন্য বল হইতে পারিবে না; বা যে বল জীবিত থাকিবে তাহার অষ্টম পদে যাইতে পারিবে না; সপ্তম পদে গিয়া অকর্ম্মা বসিয়া থাকিতে হইবে। যতক্ষণ তাহার উপরিতন সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ অন্য বলের গমন পথ ও শক্তি অবরোধ করিয়া বসিয়া ইহাতে যে প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, অভিজ্ঞ ক্রীড়ক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, এমন কি উহা না থাকিলে বা উঠাইয়া লইলে অনেক সময় সুবিধা হয়। ইউরোপীয় প্রথায় অষ্টম পদে পদাতিক উপস্থিত হইলে খেলকের ইচ্ছানুরূপ সৈন্য হইতে পারিবে, সে বল জীবিত থাকিলেও হইতে পারিবে; যে কোন উপায়ে একটি পদাতিক অষ্টম পদে লইয়া যাইতে পারিলেই জয়। আমাদের মন্ত্রীর পদাতিক অধিক হইলে বিপক্ষের যেরূপ ভয়ের কারণ হয়, উহাদের যে কোন পদাতিক সম্বন্ধেও তেমনি।

পরাজিত হইবার ভয় না থাকিলে জিগীষা জন্মে না, আমাদের ক্রীড়ার নিয়ম অনুসারে উভয় পক্ষে সমান হইবার অনেক সুবিধা; পরাজয়ের লজ্জা পাইবার স্থান অল্প; সেই জন্য ক্রীড়ায় দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে তত আগ্রহ জন্মে না। কিন্তু উহাদের দক্ষতার সামান্য অভাবে বা সামান্য অমনোযোগ ঘটিলে নিশ্চয়ই পরাজিত হইতে হয়। সুতরাং পরাজয়ের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে ক্রীড়া করিতে থাকে। ক্রীড়ার স্বভাবক্রমেই উহাদের ক্রীড়কের সাবধানতা, একাগ্রতা, ধীরতা, স্মারকতা, ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের স্বতঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়েরা এই ক্রীড়ার অনেক উন্নতি করিয়াছে, উহাদের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়কগণ আমাদের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়কগণ অপেক্ষা উন্নত, বোধ হয় কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কথায় অস্বীকার করিবেন না। বুদ্ধি বা ক্রীড়ার আলোচনায় উহারা কোন ক্রমেই শ্রেষ্ঠ

নহে, যোগ্যতার পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইতেছে; তবে কোন্ গুণে ইহারা শ্রেষ্ঠ হইল? ক্রীড়ার সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম কয়েকটি পরিবর্ত্তন করিয়াই উহারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তবে আমরাও উহাদের পরিবর্ত্তিত প্রথা অবলম্বন করি না কেন?

সত্য বটে আমাদের নিয়মে বিপক্ষকে নিরাপদ হইবার জন্য অনেক সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে, স্বীকার করি ইহা মহা উদারতা, প্রকৃত সাংসারিক কার্য্যে এই প্রকার উদারতা শোভা পায়, এবং তাহাতে সমাজের শান্তি বিধান হইয়া থাকে, কিন্তু আসল কাযে অগ্রাহ্য করিয়া এই সতরঞ্চ ক্রীড়ায় তাহা পরিচালিত করিলে কোন ফল হইবে না, প্রত্যুত ইহাতে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ কখনই হইতে পারিব না।

উহাদের পরিবর্ত্তিত নিয়ম ইউরোপের সমুদয় অংশে এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অবিরোধে চলিতেছে, আমরাও যদি ঐ নিয়ম অবলম্বন করি, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না; বরং নিম্নোক্ত কয়েকটি লভ্য হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ উহারা অধ্যবসায় গুণে আজ পর্য্যন্ত যে উন্নতি করিয়াছে, আমরা অনায়াসে তাহা পাইব; বহুকালের পরিশ্রমে বল চালনার ফলাফল যাহা লিপি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, শেষ ক্রীড়ার কৌশল সমুদয় যাহা সংগৃহীত করিয়াছে, সে সমুদয় অনায়াসে পাইব; আমাদের নিজের চেষ্টায় ঐ সকল করিতে হইলে, অনেক শত বৎসর বৃথা গত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিধিবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, এমন কি প্রতি পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় ক্রীড়া চলিয়া থাকে; এই জন্য ভিন্ন স্থানের ক্রীড়কের সহিত ক্রীড়ার সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিলে সে সকল অসুবিধার একবারে তিরোধান হইবে।

তৃতীয়তঃ ভারতের উন্নতির যত অন্তরায় আছে পরস্পরের মিলন না থাকাই সর্ব্ব প্রধান; ইংরাজি ভাষার গুণে ভারতে মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং তাহার ফল স্বরূপ জাতীয় সমিতি। কিন্তু পরস্পর ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা যে প্রকার মিলন হয়, অন্য কোন উপায়ে তদ্রূপ হইতে পারে না। চতুরঙ্গ ক্রীড়া সর্ব্ব দেশে আদৃত, ইউরোপীয় প্রথা অনেক দেশে এক নিয়মে প্রচলিত; যে স্থানে ঐ প্রথা প্রচলিত নহে, তথায় সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই এক হইয়া যাইবে। সুতরাং ভারতের সকল বিভাগের লোকের সহিত এমন কি পৃথিবীর সমুদয় লোকের সহ এই ক্রীড়া চলিতে পারিবে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই উপায়ে পরস্পরের বন্ধুতা জন্মিয়া হিতাকাঙ্ক্ষায় রত করিতে পারিবে।

ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিলে যদি এই সকল লভ্য হয়, তবে ঐ প্রথা অবলম্বন করিব না কেন? যখন চতুরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সতরঞ্চ গ্রহণ করিয়াছি, তখন সতরঞ্চের কয়েকটী নিয়ম ত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিলে কোন দোষ হইবে কেন?

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লীতে তিনদিন।

একবার ফেব্রুয়ারী মাসে নয়দিনের ছুটী অবলম্বন করিয়া পশ্চিম যাত্রা করা গেল। বাঙ্গালীর ছেলে, একবার ঘরের বাহির হইলে, একেবারে অনেকটা লম্বা পাড়ি দিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সময় সংক্ষেপ, তাই এবারে শুধু দিল্লী ও আগ্রাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার মনস্থ করা গেল। আমাদের দলটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, আমরা তিনটি ভ্রাতৃপ্রবর তিনটি সহযাত্রিক আত্মীয় এবং এতগুলি লোকের পরিমাণে চাকর ও ব্রাহ্মণ। যে রাত্রি কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম, তাহার দ্বিতীয় দিবসের প্রত্যূষেই দিল্লী পঁহুছান গেল। আমাদের বিপুল দলটির উপযোগী নয়দিনের খোরাক আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। দিল্লী ষ্টেসন হইতে বাহির হইতে না হইতে এক মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারী কেমন করিয়া সন্ধান পাইয়া আমাদের সঙ্গের ঘি ময়দার উপুর চুঙ্গী লইল। দিল্লীতে পদার্পণমাত্র এই ঘটনা, প্রথম পরিচয়েই ঘি ময়দার টেক্স। কোথায় প্রাচীন ভারতের অতীত কীর্ত্তিস্থানের গৌরবভারে হৃদয়াভিভূতি, আর কোথায় ঘি ময়দার টেক্স,—জীবনের অনেক প্রথম পরিচয়েই বোধকরি এইরূপ গম্ভরসের বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। ষ্টেসনে আমাদের জনৈক বন্ধুর প্রেরিত লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি আমাদের সমদারের সহিত নির্দ্দিষ্ট বাসায় লইয়া গেলেন।

দিল্লী যে প্রাচীন মুসলমান নগরী তাহা এক পা চলিতে ফিরিতেই উপলব্ধি হয়। প্রথমেই ষ্টেসন,—সে ষ্টেসন যেন ষ্টেসন নয়, আমাদের বাঙ্গলা দেশের ইংরাজী ফ্যাসানের দৈনন্দিন একঘেয়ে স্থাপত্যের হাত হইতে ষ্টেসনেই ছুটি আরম্ভ। ইংরাজের সুবিবেচনাকে শতবার ধন্যবাদ করিতে হয়। শুনিলাম আমরা যে অনুমান করিয়াছিলাম, কোন ভগ্নাবশেষ বাদসাহী অট্টালিকাকে ষ্টেসনে পরিণত করা হইয়াছে তাহা নহে, সমস্ত দিল্লী সহরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই মুসলমানী ধরণে ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, ষ্টেসনের বাড়ী আগাগোড়া নূতন। বাসায় আসিয়া খাওয়া দাওয়ার পর একজন গাইড সঙ্গে লইয়া প্রথমেই আমরা দিল্লীর প্রসিদ্ধ জুম্মা মস্‌জিদ্ দেখিতে যাইলাম। দুর হইতে জুম্মা মস্‌জিদের গগনস্পর্শী কাল পাথরের পলতোলা শ্বেত পাথরের গম্বুজ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। শুনিলাম জুম্মা মস্‌জিদ্‌টী নাকি একটী ছোট পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ইহার সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী প্রবেশ দ্বার। প্রধান দ্বারটী পূর্ব্বদিকে এবং অন্য দুইটী উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে। এই তিনটীর যে কোন একটী দিয়া প্রবেশ করিতে হইলেই, প্রথমতঃ অনেক গুলি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। ফটক তিনটী এবং প্রাচীর আগাগোড়া লাল পাথরের, কেবল চারিকোণে চারিটী শ্বেত প্রস্তরের ছোট ছোট গম্বুজ আছে। আমরা নিয়মানুসারে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ফটক পার হইয়া প্রথমে লাল পাথর দিয়া বাঁধান প্রকাণ্ড অঙ্গন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে নমাজ পড়িবার অগ্রে হাত মুখ ধুইবার নিমিত্ত একটি

ক্ষুদ্র জলাশয়। অঙ্গনের পশ্চিমে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের আসল মস্‌জিদ্। মস্‌জিদের গায়ে স্থানে স্থানে লাল এবং কাল পাথরের নানাবিধ কারুকার্য্য রহিয়াছে।

ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে বিচিত্র চিত্র রঞ্জিত একটি উচ্চদ্বার অতিক্রম করিতে হয়। ইহার শ্বেত পাথরের মেজের প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডের চতুঃপার্শ্বের কাল ডোরা থাকাতে দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। মধ্যের প্রকোষ্ঠের উত্তর পশ্চিম কোণে লম্বে ৬ ফুট প্রস্থে ২ ফুট এবং উচ্চে প্রায় ৪ ফুট একটী শ্বেত মর্ম্মর পাথরের বেদিকা আছে। শুনিলাম সমগ্র বেদিকাটী নাকি একখানি পাথর হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভিতরের দেয়াল লাল পাথরের কেবল কিয়দংশ শ্বেত পাথরের। সমগ্র মস্‌জিদ্ লম্বে ২০১ ফিট এবং প্রস্থে প্রায় ১২০ ফিট হইবে। উপরোক্ত গম্বুজ তিনটীর উপর উজ্জ্বল গিল্টিকরা চূড়া আছে। মাঝের গম্বুজটি অন্যদুটী অপেক্ষা বৃহৎ। মস্‌জিদের দুইপার্শ্বে দুইটী ১৩০ ফুট পরিমিত উচ্চ মিনার বা স্তম্ভ। ইহার গায়ে লম্বভাবে পর্য্যায় ক্রমে শ্বেত এবং লাল পাথর বসান রহিয়াছে। এবং ইহা বেষ্টন করিয়া (ঠিক মনুমেণ্টের ন্যায়) ৩ টি বারান্দা আছে। এবং সর্ব্বোচ্চে একটী ছোট গম্বুজ। এই স্তম্ভের উপরে উঠিলে সমস্ত দিল্লি দেখা যায়।

জুম্মা মস্‌জিদ্ দিল্লির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর মস্‌জিদ্, সেই জন্য ইহার বিষয় এতটা লিখিলাম। চারিটার সময় আমাদের জুম্মা মস্‌জিদ্ দেখা শেষ হইলে দিল্লির বাজার হইয়া ফতেগড় পাহাড়ে যাইলাম। বিদ্রোহের সময় ব্রিটিস্ সৈন্য এইখান হইতে দিল্লির উপর গোলা পরিচালন করে। যে সমস্ত বৃটিস সৈন্য এই যুদ্ধে হত হয়, তাহাদের নামে গভর্ণমেণ্ট এইখানে একটী লাল পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছেন। এই স্তম্ভের কিয়দ্দূরে রাজা অশোকের একটী প্রস্তর স্তম্ভ। ইহা দেখিয়া দিল্লিতে পুনঃ প্রবেশের সময় যে দ্বার দিয়া গাড়ি গেল দেখিলাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে কাশ্মীর গেট। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত হইলেও এত দৃঢ় যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিস্ সৈন্য ক্রমাগত ৪ মাস কাল গোলা বর্ষণ করিয়াও ইহা ভাঙ্গিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে গুটীকয়েক বৃটিস্ সৈন্য মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্রোহীদের গুলি বৃষ্টির মধ্যে দিয়া আসিয়া কাশ্মীর গেটের একপাশে বারুদ রাখিয়া খানিকটা প্রাচীর উড়াইয়া দিল, পরে সকলে সেই স্থান দিয়া বীরদর্পে প্রবেশ করিয়া দিল্লি দখল করিল। সেই ভগ্ন স্থান এবং গোলার চিহ্ন সকল এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রথম দিনকার দিল্লি দর্শন আমাদের এই পর্য্যন্ত।

তাহার পরদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করিয়া পুরাতন দিল্লি দেখিতে যাইলাম। পুরাতন দিল্লি বর্ত্তমান দিল্লি হইতে ১১ মাইল দূরে। বর্ত্তমান দিল্লির সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুদুর গিয়া রাস্তার বাম দিকে যন্তর মন্তর অথবা রাজা জয়সিংহের মান মন্দির। এখানে দেখিবার মধ্যে সূর্য্যঘড়ি (Sun dial) গোটাকতক থাম এবং ত্রিকোণাকৃতি দেয়াল হোমকুণ্ড ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। যন্তর মন্তরের পর কিছু দুর গিয়া রাস্তার দক্ষিণদিকে সফদর্ জঙ্গের সমাধি, এটী দেখিতে মন্দ নয়, এবং প্রকাণ্ডও

বটে তবে সাজাহনের সময়ের কোনও অট্টালিকার সহিত তুলনা হইতে পারে না। ইহার একটী বড় শ্বেত পাথরের গম্বুজ আছে কিন্তু স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। ইহার ভিতরের কাজ প্লাষ্টারের উপরে—পাথরের উপরে নয়। এখন হইতে পথের দুই ধারে কেবলই সমাধি এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। সেই বহুজন সমাকীর্ণ বহু প্রতাপশালী দিল্লীনগরী এখন কেবল সমাধিতে পরিপূর্ণ। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে—তাহাদের প্রতাপ, তাহাদের ঐশ্বর্য্যের, তাহাদের শিল্পরুচির চিহ্ন এখনও তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে আমরা কুতব মিনারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। যখন বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়া কুতবের গগনস্পর্শী চূড়া আমাদের দৃষ্টি গোচর হইল তখন আমাদের মন কি অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূর্ণ হইল। দিল্লী শুধু মুসলমানের স্মৃতি চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখে নাই; হিন্দুরাজার, হিন্দুদের শেষ রাজার স্মরণ চিহ্নও তাহার বক্ষে প্রোথিত রহিয়াছে। পৃথ্বিরাজের কন্যা প্রতিদিন যমুনা দর্শন করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। যমুনা তখন সাত মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতিদিন কন্যাকে এতটা পথ যাতায়াতের ক্লেশ সহিতে দেখিয়া স্নেহময় পিতা এই যমুনা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। স্তম্ভের উপর হইতে রাজদুহিতা যমুনা দর্শন করিতেন। সেই যমুনা স্তম্ভের দুটি তলা বাড়াইয়া দিয়া হিন্দুরকীর্ত্তি কুতব নিজ নামাঙ্কিত করিলেন, সেই যজুনা স্তম্ভই এখন কুতব মিনার। কুতব উচ্চে প্রায় ২৩৪ ফুট হইবে। গোড়ার নিকটে পরিধি প্রায় ৪৭ ফুট এবং ক্রমে সরু হইয়া সকলের উপরে প্রায় ৯ ফুট পরিমিত পরিধি হইয়াছে। সমগ্র স্তম্ভটী ৫ তলায় বিভক্ত। প্রথম তিনটী তলা লালপাথরের এবং শেষের দুটী শ্বেতপাথরের। ইহার গায়ে উঁচু অক্ষরে আরবী লেখা রহিয়াছে। নীচের তলায় দেয়ালের গায়ে লম্বভাবে পর্য্যায়ক্রমে একটী করিয়া অর্দ্ধ গোলাকৃতি এবং একটী করিয়া অর্দ্ধকোণাকৃতি খাঁজকাটা রহিয়াছে। দ্বিতীয় তলাতে সমস্তই অর্দ্ধ গোলাকৃতি খাঁজ কাটা। তৃতীয় তলাটি সমস্তই কোণাকৃতি খাঁজকাটা। চতুর্থ এবং পঞ্চম তলাতে কোন প্রকার খাঁজ নাই। প্রত্যেক তলার উপরিভাগ জুম্মামস্‌জিদের ন্যায় বারাণ্ডা দ্বারা বেষ্টিত। শুনিলাম আগে কুতবের উপরে একটী ছোট ঘর ছিল কিন্তু বাজ পড়িয়া সেটী ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই এখন উপরে ছাত নাই এবং পাছে লোক পড়িয়া যায় এই নিমিত্ত উপরটা রেলিং দিয়া ঘেরা। গভর্ণমেণ্ট উপরকার ঘরের নকলে একটী ঘর প্রস্তুত করাইয়া কুতবমিনারের কাছে এক স্থানে মাটীর উপরে রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা উপরে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে কেবলই সমাধি এবং ভগ্ন অট্টালিকা দেখিলাম। এই সময় আমাদের মনে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

উপর হইতে কিছু দূরে একটী ভগ্ন প্রায় মিনার দেখিয়া গাইডকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল উহার নাম আলাইমিনার, বাদ্‌সা আলাউদ্দিন কুতব মিনারের নকলে ঐটি নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়েন। আমরা আল্‌টামাসের সমাধি এবং অন্যান্য অনেক ভগ্ন অট্টালিকাদি দেখিয়া নীচে নাবিয়া আসিলাম। নীচে আসিয়া হিন্দু

রাজাদের নির্ম্মিত কতকগুলি থাম দেখিতে পাইলাম। এই থামগুলির সম্মুখের অঙ্গনে একটী লৌহদণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহাতে এখন ও মরিচা পড়ে নাই। শুনিলাম মাটীর মধ্যে উহার বনিয়াদ নাকি গাছের শিকড়ের ন্যায় রহিয়াছে। এই স্তম্ভ কোন হিন্দুরাজার দ্বারা প্রোথিত। ইহার নিকটে আল্‌টামাস্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড লালপাথরের তোরণ। এইরূপ আরও একটী তোরণ আছে কিন্তু তাহার অনেক স্থানই ভগ্ন হইয়াছে। ইহার পর "আলাইদরওয়াজা" অথবা আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ফটক দেখা-গেল। চারিদিকে উচ্চখিলান করা চারিটি দ্বারবিশিষ্ট লালপাথরের ঘর এবং উপরে একটী গম্বুজ। তার পর আদম খাঁর সমাধি, ইটিও দেখিতে মন্দ নয়। অবশেষে লালকোট, গড় পৃথোরা (এখন যোগমায়ার মন্দির) ইত্যাদি দেখিয়া প্রায় ৪০ ফুট গভীর প্রকাণ্ড কূপের নিকট উপস্থিত হইলাম। এটি আমাদের দেশের কূপের ন্যায় নহে। ইহা আগা গোড়া পাথর দিয়া বাঁধান এবং নীচে নামিবার সিঁড়ি আছে। কতকগুলি লোক কূপের নিকট ছিল, কিছু পয়সা দেওয়াতে তাহারা উপর হইতে ৩০ ফুট নীচে জলে লাফাইয়া পড়িল, আমরা স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। এই লোকগুলি নাকি এই প্রকারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কূপ দেখিয়া আমরা পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিলাম এবং এবার দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়া হুমায়ুন বাদ্‌সার সমাধি দেখিতে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া নিজাম উদ্দিনের সমাধির নিকট গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে অনেকগুলি অর্দ্ধ ভগ্ন অট্টালিকা আছে। ইহার মধ্যে একটী "চৌষট্ট থাম" অর্থাৎ চৌষট্টিটে খোদ-কারি করা থামের উপর একটী শ্বেতমর্ম্মর পাথরের অট্টালিকা দেখিবার জিনিষ। ইহার ভিতরে অনেকগুলি সমাধি আছে। নিজামুদ্দিনের অনেকগুলি শ্বেতমর্ম্মর পাথরের অট্টালিকা রহিয়াছে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে পারিলাম না। ইহার পর কিছু দূর গিয়া হুমায়ুন বাদ্‌সার প্রকাণ্ড সমাধি গৃহ। ইহা একটী বৃহৎ ব্যাপার। হুমায়ুনের পত্নী বেগমহাজী ইহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, এবং আকবর শেষ করেন। এই গৃহটী নির্ম্মাণ করিতে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং ২০০ লোক ক্রমাগত ১৬ বৎসর কাজ করে। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল ইহারি অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। গৃহের মধ্যস্থলে একটী অষ্টকোণ বিশিষ্ট ঘরে আসল সমাধি। এবং এই ঘরের উপরে বৃহৎশ্বেতমর্ম্মরপাথরের গম্বুজ। সমগ্র গৃহটী লালপাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার ভিতরে প্রথমে প্রবেশ করিয়াই দ্বিতীয় তলে উঠিতে হয়। দ্বিতলের চতুর্দ্দিকের বারাণ্ডা অত্যন্ত বৃহৎ। তৃতীয় তলটী গোলোকধাঁদা বিশেষ এবং যদি সঙ্গী গাইড না থাকিত তাহা হইলে আমাদের পথ ঠিক করা সুকঠিন হইত এবং সত্য সত্যই আমাদের তিনটী বন্ধু পথ হারাইয়াছিলেন। চতুর্থ তলে কতকগুলি ছোট ছোট গম্বুজ এবং নহবত খানা। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে যে আগে একটী সুন্দর উদ্যান ছিল তাহার কোনই সন্দেহ নাই এবং এখনও সম্মুখদিকে বাগানের কিয়দংশ রক্ষিত হইয়াছে।

হুমায়ুনের সমাধি দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরি। পথে আসিতে স্থানে স্থানে পথের ধারে গাছের ছায়াতে পথিকদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত কূপ সমেত এক একটী ছোট পাথরের গৃহ দেখিলাম। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় পঁহুছি।

তৃতীয় দিন পাশ লইয়া দিল্লীর দুর্গ দেখিতে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম যে তিনটার পরে প্রাসাদের প্রধান প্রধান অট্টালিকাগুলি দেখিতে পাইব। কাজেই সময় থাকাতে আমরা ইত্যবসরে অশোক রাজার নির্ম্মিত আর একটী স্তম্ভ দেখিয়া লইলাম। এই স্তম্ভটি আগে নাকি ১০৮ ফুট উচ্চ ছিল কিন্তু এখন উচ্চে ৫০-৬০ ফুটের বেশী হইবে না। ইহা যমুনার ধারে একটী জীর্ণ ত্রিতল গৃহের উপর প্রোথিত, দেখিলেই বোধ হয় যে গৃহটী অত্যন্ত পুরাতন।

৩টা বাজিলে আবার আমরা দুর্গে প্রবেশ করি। সুদৃঢ় প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ তোরণ দ্বারে এখন বৃটিস্ সৈন্য বন্দুক স্কন্ধে করিয়া পাহারা দিতেছে। তোরণের উপর নহবত খানা এবং নহবৎখানার উপর বৃটিস্ বৈজয়ন্তি বৃটিস্‌সিংহের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। সমগ্র দুর্গটি প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দুর্গের পূর্ব্বদিকে যমুনা এবং পশ্চিমে একটী ময়দান এবং উহার পর জুম্মামস্‌জিদ্। চারিদিকে রক্তবর্ণ উচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের গায়ে স্থানে স্থানে তোপ চালাইবার ছিদ্র। আমরা দুর্গে প্রবেশ করিয়া কিছু দূর গিয়াই প্রথমে দেওয়ান-ইআম দেখিতে পাই, এই গৃহে বাদ্‌সাহেরা সাধারণ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইহার তিনদিক খোলা এবং একদিক দেয়াল। দেয়ালের ঠিক মাঝ খানে নানাবর্ণ প্রস্তরখচিত শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের চতুর্দ্দোলাকৃতি উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনের সম্মুখে একটী ছোট শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের বেদিকা। সিংহাসন এবং তাহার পশ্চাতের দেয়ালে অন্তর্নিবিষ্ট বিবিধ প্রকার প্রস্তর দ্বারা নানাজাতীয় লতা পাতা ফুল ফল পক্ষী ইত্যাদির আলেখ্য লিখিত আছে। চিত্রগুলিতে যেখানে যে বর্ণ আবশ্যক সেখানে সেই বর্ণেরই পাথর বসান। দেওয়ান-ই-আম গৃহটী আগা গোড়া লালপাথরের, ইহার চতুষ্কোন স্তম্ভ সারি আশ্রিত সুন্দর খিলান গুলি দেখিতে অতি পরিপাটী। দেওয়ান-ই-আমের পরে দেওয়ান-ই-খাস অর্থাৎ এই বাদসাহের আমীর ওমরাহ নবাব রাজা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

এই গৃহটী আগা গোড়া সোনালী কাজ করা উজ্জ্বলশ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে রচিত হইয়াছে। ইহার ছাত আগে রূপার ছিল, কিন্তু এখন তাহা নাই, শুনিলাম নাদির সা লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এখন সেই স্থানে রূপার ন্যায় চিত্র করা কাঠের ছাত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার শ্বেত স্তম্ভ সারি আশ্রিত খিলানগুলি ঠিক দেওয়ান-ই-আমের ন্যায়, কিন্তু আগা গোড়া সোনালি কাজ করা। ইহারও তিন দিক খোলা এবং পূর্ব্বদিকে নানাজাতীয় লতা পাতা কাটা জাফ্রি আছে। গৃহের মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে প্রসিদ্ধ ময়ুর সিংহাসন ছিল। ময়ুর সিংহাসন নাদির সা লইয়া গিয়াছে, এখন সেখানে

শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের সুন্দর বেদিকাটিমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া দর্শকগণের মনে ময়ুর সিংহাসনের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। দেওয়ান-খাসের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইলে সাজাহান পারিষদাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ইহা দেখিতে যান। তিনি নির্ম্মাণ কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কেমন হইয়াছে", কবি তৎক্ষণাৎ পারসী কবিতাতে বলিল "যদি.পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ থাকে তবে তাহা এই, তাহা এই, তাহা এই।" বাদ্‌সাহ সন্তুষ্ট হইয়া এই কবিতাটী গৃহের গায়ে লিখিয়া রাখিলেন। বাস্তবিকই দেওয়ানই খাস দেখিতে অতি সুন্দর। ময়ূর সিংহাসন ৬ ফুট লম্বা এবং ৪ ফুট চৌড়া ছিল। ইহার পশ্চাতে পুচ্ছ বিস্তারিত দুইটী ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। এবং এই দুইটী ময়ূর যথোপযুক্ত বর্ণের মণি, হীরক, প্রবাল ইত্যাদি দ্বারা অন্তর্নিবিষ্ট থাকাতে দেখিতে জীবন্ত ময়ূরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এই সুবর্ণময় ষট্‌পদ সিংহাসনটী হীরকাদি দ্বারায় মণ্ডিত হওয়াতে ইহার শোভা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহার উপরে হীরকাদি খচিত সুবর্ণময় দ্বাদশটি দণ্ডে আশ্রিত মুক্তার ঝালর বিশিষ্ট জড়ির চন্দ্রাতপ ছিল। চন্দ্রাতপের নীচে আবার মুক্তারঝালর বিশিষ্ট রক্তবর্ণ মখমলের ছত্র ছিল। ছত্রের দুইটি সুবর্ণময় দণ্ডে হীরকাদি খচিত ছিল। দুইটি ময়ূরের মধ্যে আগাগোড়া নীলকান্ত মণিনির্ম্মিত একটি শুকপক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। ময়ূর সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতে ষাট কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল,—ইহা উপন্যাস নহে সত্য ঘটনা।

দেওয়ানিখাসের দক্ষিণে একটী ছোট অঙ্গনের পর শ্বেত পাথরের সমন বুরুজ, এইটি সাজাহানের বিশ্রাম গৃহ ছিল! এই গৃহের সম্মুখের দেওয়ালটিতেও যথোপযুক্ত বর্ণের প্রস্তর অন্তর্নিবিষ্ট থাকাতে লতাপাতাগুলির রং বেশ ফলিয়াছে। দেয়ালের মাঝ খানে অর্দ্ধ চন্দ্রের উপর তুলাদণ্ড অঙ্কিত রহিয়াছে। এই চিত্রটি মোগল বাদ্‌সাহদিগের রাজচিহ্ন ছিল। ভিতরে দেয়ালে এবং ছাতেও উপরোক্ত চিত্র সকল অঙ্কিত আছে। সমনবুরুজের উত্তরে আরও খাসমহল এবং রঙ্গ মহল নামক দুইটী অট্টালিকা আছে। কিন্তু এগুলি দেখিবার উপায় নাই, খাস মহলে আর্কিয়লজিকাল সোসাইটির মিউজিয়ম্‌ আছে এবং রঙ্গ মহল মেস্‌-হাউস্‌ হইয়াছে। দেওয়ান-ই-খাসের উত্তরে সিস্‌ মহল অথবা হামাম অর্থাৎ স্নান গৃহ। ইহাও আগাগোড়া শ্বেত পাথরের। প্রত্যেক কক্ষে একটী করিয়া চৌবাচ্চা আছে, ইচ্ছা অনুসারে ইহাতে জল আনিবার ও বাহির করিয়া দিবার প্রণালী আছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সহিত বেশবিন্যাস করিবার এক একটী ছোট কক্ষ সংলগ্ন আছে। সকলই সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট। ইহার পর মতিমস্‌জিদ, এই স্থানে বাদ্‌সা বেগমদিগের সহিত প্রাত্যহিক নমাজ পড়িতেন। ইহার গড়ন জুম্মামস্‌জিদের ন্যায় কিন্তু অতিশয় ক্ষুদ্র, এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে সৌন্দর্য্য কিঞ্চিৎ অধিক। বলা বাহুল্য যে ইহাও আগাগোড়া শ্বেত মর্ম্মর পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। তিনটী ছোট চূড়াবিশিষ্ট গম্বুজের কি সৌন্দর্য্য। পূর্ব্বে যখন মতির ঝালর দ্বারা সুসজ্জিত থাকিত তখন ইহার শোভা না জানি কতই মনোমুগ্ধকর ছিল।

এই কারুকার্য্যবিশিষ্ট মস্‌জিদের শ্বেত পাথরের অঙ্গনে একটী চৌবাচ্চা আছে। ইহাতে মতির ঝালর থাকাতে ও ইহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত ইহার নাম মতিমস্‌জিদ্ হইয়াছে। দুর্গে আরও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ছিল কিন্তু এখন সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে এবং সেই সমস্ত স্থানে বৃটিস্‌সেনানিবাস প্রস্তুত হইয়াছে। দুর্গে একটী সুগভীর কূপ আছে। এই কূপের মধ্যে টাকা আছে সন্দেহ করিয়া গভর্ণমেণ্ট "পাম্প্" দিয়া জল তুলিয়া ফেলিবার প্রয়াস পান কিন্তু শুনিলাম অকৃতকার্য্য হয়েন। পাম্প টী এখনও সেই স্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে

দুর্গ দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম! আমাদের দিল্লী দেখা হইল। দিল্লীর পূর্ব্বদিকে যমুনা নদী এবং অন্য তিন দিক প্রাকার ও পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। সহরে প্রবেশ করিবার দশটী দ্বার অথচ পথ ঘাট পরিষ্কার এবং জলের কল ইত্যাদিও আছে।

একালের সভ্যতার সরঞ্জাম সবই আছে, অথচ সেকালের ঐশ্বর্য্য, সেকালের সভ্যতার স্মৃতিতেও আচ্ছন্ন; আমাদের এই দীন বাঙ্গলা দেশে বসিয়া এরূপ একটা নগরীর কি ঠিক ধারণা হয়?

শ্রীশরৎকুমার রায়।

মিসর দেশীয় সংবাদপত্র।

পৃথিবীর মধ্যে মিসর রাজ্য সভ্যতায় অতি প্রাচীন; বর্ত্তমান কালের সুসভ্য ইউরোপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রখর জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত করিয়া কণককিরীটিনী মহিমাময়ী রাজ্যেশ্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, তাহার একদিকে যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও রাজনীতিজ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ তাহার ধন গৌরব, ও প্রবল ক্ষমতা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন সমগ্র ইউরোপ অসভ্যতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার গর্ভে সময় অতিবাহিত করিতেছিল, এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এসিয়া খণ্ডে যখন জ্ঞান ও ধর্ম্মের আভা উষার স্নিগ্ধ অরুণচ্ছটার ন্যায় নীবিড় অন্ধকার জাল ছিন্ন করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন মিসর রাজ্য উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় ছিল; কালচক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে সেই মিসরের অধঃপতন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব গৌরব আর নাই, কেবল সেই প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন ভগ্ন দুর্গ প্রাকারের ইষ্টক রাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মশীল প্রতীচ্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া

নিস্পন্দ প্রায় মিসরবাসীর হৃদয়ে ধীরে ধীরে জীবনশক্তির সঞ্চার হইতেছে, দীর্ঘকালব্যাপী জড়তার আবরণ ছিন্ন করিয়া জীবন্ত মানব মণ্ডলীর সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাহারাও বদ্ধ পরিকর হইয়াছে; তাহাদের এই মানবোচিত চেষ্টার সর্ব্বপ্রধান সহায় মিসরের সংবাদপত্র। যে সংবাদপত্র প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ইউরোপের এক প্রধান ক্ষমতা, শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত যাহার উন্নতি এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, বর্ত্তমান সময়ে মিসরে সেই সংবাদপত্রের অবস্থা কিরূপ এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে "মিসরের তদানীন্তন অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার তাহার কতদুর সম্ভাবনা" এই বিষয় অনুসন্ধানের জন্য সারজন বাউরিং মিসরে পদার্পণ করেন; মহম্মদ আলি পাশা তখন মিসরের শাসন কর্ত্তা; এই উদ্যমশীল পাশার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে তিনি তাঁহার স্বদেশে প্রতীচ্য ভূখণ্ড প্রচলিত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাকে স্থিতিশীল প্রাচ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিবেন; এবং এই অভিপ্রায়ে তিনি মিসরে অন্যান্য বিবিধ মঙ্গলসূচক বিধান প্রবর্ত্তনের সহিত ইউরোপীয় সংবাদপত্রসমূহের অনুরূপ সংবাদপত্র প্রচলন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

রাজ্যসংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য আরব্য ও তুর্কি ভাষায় লিখিত এক খানি সংবাদপত্র সর্ব্ব প্রথমে কাইরো হইতে প্রকাশিত হয়; তাহা প্রকাশিত করিবার সময় বা দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তাহার পর আলেকজান্দ্রা নগরে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে "মণিটার ইজিপ্সিয়ঁ" নামক একখানি ফরাসী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু পর বৎসর মার্চ্চ মাসেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রের গ্রাহক সংখ্যা অধিক ছিলনা।

এই সময়ের পর বর্ত্তমান মিসরের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলির শাসন কাল হইতে মিসরে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে মিসরে ৪৬ খানি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এবং ইহা নিশ্চয় যে মিসরবাসীগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা যদি কোন কারণে অপূর্ণ রহিয়া যায়, তবে সংবাদপত্রের অভাব তাহাদের উন্নতি পথের অন্তরায় একথা নিঃসন্দেহই কেহ বলিতে পারিবে না।

মিসরবাসীগণ পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠে অধিক সময় ব্যয় করেনা, আমাদের দেশের অধিবাসীবর্গের ন্যায় তাহাদের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী; কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে তাহারা প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে, এইরূপ লোকের সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীবর্গের দুই তৃতীয়াংশ। মিসরের নগর ও উপনগর সমূহের লোকেই সাময়িক ও মাসিক পত্রাদি নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকে।

স্থানীয় অধিবাসী ভিন্নও মিসরে সংবাদপত্র পাঠের অনেক লোক আছে; মিসরে ভিন্ন দেশীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, তাহাদের অধিকাংশই আলেকজান্দ্রা, মান্-

সোরা এবং কায়রো প্রভৃতি প্রধান নগরগুলিতে বাস করে; তাহাদের নিজ নিজ মাতৃ ভাষা অনুসারে গ্রীক, ইটালীয়, ফরাসী এবং ইংরেজি সংবাদপত্র আছে। শিক্ষিত মিসর-বাসীগণও ফরাসী, ইটালীয়, ইংরেজী এবং আরব্য ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

মিসর গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই। এখানে সংবাদ পত্র সম্বন্ধীয় একটি রাজকীয় কার্য্যালয় (Press Bureau) আছে, কোন নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে হইলে এই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তিনি আবশ্যক বিবেচনা করিলে কোন সংবাদ পত্রের পরিচালক-গণের প্রতি দণ্ড বিধানও করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে মুদ্রাযন্ত্র যেরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, মিসর গবর্ণমেণ্ট ও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি মিসরে ৪৬ খানি সংবাদপত্র প্রচলিত আছে, তাহাদের ২৮ খানি কায়রো হইতে, ১৪ খানি আলেকজান্দ্রা হইতে এবং ৪ খানি সৈয়দ বন্দর হইতে প্রকাশিত হয়; এই ৪৬ খানি পত্রিকার মধ্যে ২০ খানি আরব্য ভাষায়, ১২ খানি ফরাসী ভাষায়, ৮ খানি গ্রীক ভাষায়, ৫ খানি ইটালিয় ভাষায় এবং ১ খানি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত। ২১ খানি পত্রিকা "প্রেসবুরোর" অনুমোদনে সম্পাদিত হয়, এই ২১ খানির মধ্যে ১৫ খানি আরব্য ভাষায় লিখিত এবং তিন খানি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে ফরাসী ভাষায় লিখিত।

ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত, যে সমস্ত পত্রিকা মিসরে আছে, তাহাদের মধ্যে ফরাসি সংবাদপত্রগুলিই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এবং তাহাদের ক্ষমতাও অনেকটা প্রবল, তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক খানি সম্বন্ধে, দুই এক কথা বলা যাক্। "মন্দ্ এলেগাঁ" "আনসে কমারসিয়েল" এবং "পেটিট্ আফিশে" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি কোন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের নিকট আদৃত হয়, সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে তাহার কোন আদর দেখা যায় না; আলেকজান্দ্রা নগর হইতে প্রকাশিত, স্কারাবীর ন্যায় কয়েক খানি ফরাসী পত্রিকার বিশেষ কোন গুণ দেখা না যাইলেও তাহাতে পাঠক সাধারণের পাঠোপযোগী অনেক বিষয় মোটামুটি আলোচিত হয়।

"ফারডালেকজাঁন্দ্রী" নামক ফরাসী পত্রিকা খানি মিসর গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ক্রমে এলেকজান্দ্রা নগর হইতে প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকার প্রকাশকগণ ফরাসী নহেন, কিন্তু এই পত্র অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়, এবং ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্রগুলির ন্যায় ইহাতে অনেক গুরুতর বিষয় সুন্দর রূপে আলোচিত হইয়া থাকে; এই পত্রিকাখানি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, কিন্তু মিসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাসী পত্রিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কায়রো নগরে প্রকাশিত ফরাসী পত্রিকাগুলির মধ্যে "লা টিম্ব্রোলোজি ইজিপ্সিয়েন" "মনিটরডুকেয়ার" "লি বস্ফোর ইজিপ্সিয়েন" এবং লি "স্ফিনিক্স" এই কয়খানি সর্ব্বপ্রধান এবং ক্ষমতাশালী।

যাহারা পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের নিকট, লা টিম্ব্রলোজি ইজিপ্সিয়েন বিশেষ আদৃত হয়, কারণ ইহাতে সেই সকল লোকের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হয়, মনিটরডুকেয়ার মিসর গবর্ণমেণ্টের গেজেট, ইহাতে পাঠযোগ্য বিশেষ কিছু থাকে না, তবে পাঠকের মধ্যে গেজেটের যেরূপ আদর, আবশ্যকীয় সংবাদাদির জন্য ইহারো অবশ্য সেইরূপ আদর আছে, কিন্তু ফরাসী ভাষায় লিখিত হওয়ায় অধিকাংশ মিসরবাসীই ইহা পড়িতে পারেনা। মিসরের সাধারণ ভাষা আরব্য সুতরাং তত্রত্য রাজকীয় সংবাদাদিও সেই ভাষায় প্রকাশিত হওয়া উচিত, কিন্তু, তাহা না হইয়া মিসর গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত সংবাদপত্র ফরাসী ভাষায় ফরাসী সম্পাদক কর্তৃক কেন যে সম্পাদিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কোন মিসরীয় সংবাদ পত্রকেও ইহার প্রতিবাদ করিতে দেখা যায় না।

লি বস্ফোর ইজিপ্সিয়েন ও লি স্ফিনিক্স, এই পত্রিকা দুই খানি ফরাসী ঔপনিবেশিকদিগের মুখপত্র, এবং বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, বিদ্রূপাত্মক নানাবিধ প্রবন্ধে ইহাদের কলেবর প্রায়ই পূর্ণ থাকে; ফরাসী সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশেরই অল্পাধিক পরিমাণে ইংরেজাতঙ্করোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এই দুইখানি পত্রিকার এই রোগ কিছু প্রবল।

কোন মিসর ভ্রমণকারী ফরাসী গ্রন্থকার মিসরের ফরাসী সংবাদপত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, মিসরে এমন একখানি সম্বাদপত্র দেখি নাই, যাহা মিসরবাসীদিগের উন্নতির জন্য এবং মিসরে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। উন্নতি এবং ন্যায়পরতা ফ্রান্সের নামের সহিত চিরজড়িত, কিন্তু এখানে তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়না। কিছু দিন পূর্ব্বে ডাক্তার মিণ্টন নামক একজন ইংরাজ লি বস্ফোর, পরিচালকগণের নামে কায়রোর ইনটার ন্যাসনাল ট্রিবিউনালে, মানহানির দাবিতে নালিস করেন; ফরাসী কন্সল তাঁহাদিগকে বিনা দণ্ডে মুক্তি দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বস্ফোরের পরিচালকগণ ডাক্তার মিল্টনকে মকর্দ্দমা খরচ বাদে এক হাজার পাউণ্ড ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিসরে এক খানি মাত্র ইংরেজী সংবাদপত্র আছে; ইহার নাম ইজিপ্সিয়ান গেজেট, ইহা 'প্রেস্‌বুরোর' অনুমোদনানুসারে আলেকজান্দ্রা নগর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু, ইহার সকল প্রবন্ধ ইংরাজি ভাষায় লিখিত নহে, অনেক ফরাসী প্রবন্ধও এই পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

মিসরে যে গ্রীক ও ইটালীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলি আছে, তাহাদের অধিকাংশেই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় অতি অল্প পরিমাণেই আলোচিত হইয়া থাকে; এই সকলের মধ্যে প্রধান ইটালীয় সংবাদপত্র 'ইল্ মেসাগিয়ের ইজিপ্সিয়ানো' উল্লেখ

যোগ্য। এই সকল পত্রিকায় ইংরেজদিগের প্রতি অযথা আক্রমণ এবং বিদ্বেষ ভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং ইংরেজী ভাষার সহিত তাহাদের যথেষ্ট সাহানুভূতিই দেখা যায়।

ফরাসী ইটালীয় এবং গ্রীক ভাষায় প্রকাশিত, পত্রিকাগুলির উপর প্রেসবুরো কোন প্রকার ক্ষমতা পরিচালন করেনা, এই সমস্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পত্রিকা নামেমাত্র "প্রেসবুরোর" অনুমোদন ক্রমে প্রকাশিত হয়। নীল নদের অববাহিকা প্রদেশে যদিও খেদিব যথেচ্ছাচারী রাজা তথাপি সতেরোজন কন্সল অনেক বিষয়েই তাঁহার যথেচ্ছা· চারের অনুমোদন করিয়া চলেন না। মিসরস্থ ঔপনিবেশিকগণের মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষিত হয়, তাহারা মিথ্যা কথা লিখিয়া অবাধে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে পারে, এবং যে সকল কথা লিখিলে একজন মিসরবাসীকে রাজ দ্বারে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে দেখা যায়, একজন ঔপনিবেশিক অনায়াসেই সেই সকল কথা প্রকাশ করিতে পারেন তবে তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয় কন্সলের মন যোগাইয়া চলিতে হয়।

যাহা হউক মিসরের স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। এখানে তদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত বিশখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে, এই সকল সংবাদপত্রের কতকগুলির উপর প্রেসবুরোর কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু নামে না হইলেও তাহারা অন্যান্য পত্রিকার ন্যায় স্বাধীন। এই ভাষার তিনখানি পত্রিকা মিসরস্থ ফরাসীদিগের সাহায্যে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোন ফরাসীই তাহা পাঠ করেন না; এই তিন খানির মধ্যে, "আল্ মাহ্রুসা" এবং "সাদায়েলচর্ক" কায়রো হইতে এবং "আল্ আহরাম" আলেকজান্দ্রা হইতে প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত পত্রের পরিচালকগণ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ফরাসীপ্রিয়, তাঁহারা ইংরেজজাতিকে অতি মন্দপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন; এবং মিসরে ইংরেজদিগকে কোন সৎকার্য্য সাধনে যত্নবান দেখিলে এই পত্রিকা যৎপরোনাস্তি আয়াস সহকারে তাহার একটা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহা হউক আলেকজান্দ্রায় প্রকাশিত সমুদয় দেশীয় কাগজের মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কায়রোনগরে 'আল্মোকাত্তম' নামক একখানি দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে, দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এখানিকে সর্ব্বোত্তম বলা যাইতে পারে; এই অল্প সময়ের মধ্যেই এখানি সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে, এবং মিসরস্থ সকল প্রদেশেই ইহার প্রচুর গ্রাহক হইয়াছে। ইহার পরিচালকগণ সিরিয়া দেশ· বাসী, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং সুরুচিসম্পন্ন; গভর্ণমেণ্টের সদ্গুণই হউক আর রাজ্যের অভাবের কথাই হউক সমস্ত কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই পত্রিকাকে স্বাধীন ভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে দেখিয়া ফরাসী সংবাদপত্র পরিচালক-গণের সময়ে সময়ে ক্রোধের আর সীমা থাকে না।

'আল্মোকাত্তম' দৈনিকপত্রিকা, প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ টার সময় ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক "পিয়েষ্টার' অর্থাৎ প্রায় তিন আনা, বিক্রেতাবালকেরা

ইহার প্রতিখণ্ড অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিয়া কায়রো নগরের রাজপথে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এই পত্রিকা প্রত্যহ আড়াই হাজার সংখ্যা বিক্রীত হয়। নীলনদের অববাহিকা প্রদেশে ইহার ৪০ জন নিয়মিত সংবাদদাতা আছেন, এবং আরব্যভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে কেবল মাত্র ইহারই নিউইয়র্ক, লণ্ডন এবং প্যারীনগরীতে বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত আছেন, ইহার এবং অন্য দুই একখানি আরব্য পত্রিকার কনষ্টাণ্টিনোপলে, বেরায়ুট ও দামাস্কসেও সংবাদদাতা আছেন।

ইংরেজী দৈনিকপত্রগুলির ন্যায় আলমোকাত্তম একখানি কাগজের চারি পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়া বাহির হয়। ইহাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, স্থানীয় সংবাদ, এবং ইংরেজী, ফরাসী জর্ম্মান ও ইটালীয় সংবাদপত্রস্থ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আরব্য অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডস্থ বিখ্যাত পত্রিকা টাইম্‌সের অনেক প্রবন্ধ এইরূপ আরব্যভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া তদ্দেশীয় পাঠকগণের তৃপ্তি সাধন করে। এতদ্ভিন্ন রয়টারের টেলিগ্রাম এবং রাজ্য ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে বাহির হয়। ইহার চতুর্থ পৃষ্ঠায় নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন থাকে—তন্মধ্যে হারান গরুর পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সংবাদপত্র উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা রাজস্ব সচীবগণের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে মিসর দেশ কি প্রণালীতে শাসিত হইতেছে তদ্বিষয়ক যুক্তিযুক্ত মতামত প্রকাশ করে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে জনসাধারণের মত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের খামখেয়ালীর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

আলমোকাত্তমের আবার একটি মাসিক সংস্করণ আছে, তাহাও আরব্যভাষায় লিখিত, গত ১৬ বৎসর হইতে এই পত্রিকায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়া আসিতেছে, প্রস্তাবগুলি প্রায় সমস্তই সারগর্ভ। যখন এই মাসিক পত্রিকা প্রথম বাহির হয় তখন ইহার পাঁচশত মাত্র গ্রাহক ছিল, এখন ইহার গ্রাহক সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক, এবং প্রতি বৎসরই ইহার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই পত্রিকার লিখিত অধিকাংশ প্রবন্ধই ইউরোপীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ। এই প্রকার অনুবাদের বিশেষ উপকারিতা আছে; উন্নতিশীল ইউরোপের নবনব সত্য সকল মিসরবাসীগণের অধিগম্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সভ্যতা ও জ্ঞান উভয়েরই প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে।

আলেকজান্দ্রা সহরেও একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আছে, তাহার নাম "রিভিস্তা-কুইণ্ডিসিয়েল," ইহা প্রতিমাসের ১০ই ও ২৫এ প্রকাশিত হয়। ইহা 'এথিনিয়ম' সভার মুখপত্র এবং ইহাতে উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক গ্রাহকই ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, এবং প্রবন্ধ সকল ইংরাজী, ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় লিখিত হয়, সুতরাং এই পত্রিকায় এই বিভিন্নজাতীয় পাঠোপযোগী

কিছু না কিছু থাকে। গত তিন বৎসর হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; এবং বলাবাহুল্য ইহাদ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে।

তুরস্কের সুলতানের অধীনস্থ সমস্ত দেশের সহিত তুলনা করিলে মিসরের আয়তন অতি সামান্য, কিন্তু মিসরে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির সংখ্যা সমগ্র দেশের সম্বাদপত্রগুলির প্রায় দ্বিগুণ। নীলনদের অববাহিকা প্রদেশ ধন ধান্যেই যে প্রাচ্যভূখণ্ডে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে বিদ্যাবুদ্ধিও জ্ঞানোৎকর্ষ সাধনেও ইহা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্রের যেখানে উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় অজ্ঞানান্ধকার সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া মানবহৃদয়ে মনুষ্যত্বের আলোক বিকাশ করে। ইংরেজদিগের গতিবিধি আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মিসরে সংবাদপত্রের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। এই অধঃপতিত দুর্ব্বলজাতি আবার নিজের বলে বলীয়ান হইয়া সভ্যতা ও উন্নতিতে সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে, একদিন ইহারা সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না কে বলিতে পারে? অন্ততঃ আমাদের ইহাদের বিষয় আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা আছে; ভারত ও মিসর, প্রাচীন সভ্যতার দুই কেন্দ্রস্থল, এখন দুজনেই অধঃপতিত এবং দুজনেই পুনরুত্থানোন্মুখ, আমাদের পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যনয়নে দৃষ্টি রাখা বর্ত্তব্য।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি

দেশমিশ্র — একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কানন চারী।
মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবেল হরিবোল মন আমার॥
ব্রজকিশোর, কালীয় হর, কাতর ভয়ভঞ্জন।
নয়ন বাঁকা, বাঁকাশিখি পাখা, রাধিকা হৃদি রঞ্জন
গোবর্দ্ধন ধারণ,
বন কুসুম ভূষণ;
দামোদর; কংশ দর্প হারী।
শ্যাম রাস রস বিহারী।
হরিবোল, হরিবোল; হরিবোল, মন আমার॥

রূ২ রূ১ । রূ১ প১ প১ । ম১ গ১ ম১ । গমগ১ রূ১ স১ । স১ গম১ ম১ । ম১ ম১ গ১।
কে শ ব কু রু ক রু ণা — দী নে কু — ঞ্জ কা ন ন

রূ১ প১ প১। —৩॥ প১ ধ১ ধ১ । ধ১ ধ১ ধ১ । প১ ধনর্স১ ন১ । ধ১ প২ । প২ প১ ।
চা — রী — মা — ধ ব ম ন মো — হ ন — মো হ

শেষ।

প১ ধ১ প১ । ম১ গ১ ম১ । —১ রূ১স১ ॥ [র্স১ ন১ র্স১ । —২ —১। নো১ ধ১ ধনো১।
ন — মু র — লী — ধা রী [হ রি বো — . ল্ হ রি বো

—২ —১ । ধ১ প১ প১ । —১ ধ১ প১ । ম২ মপ১ । প৩ ॥ [প১ প১ প১ ।
— ল হ রি বো — — ল্ ম ন আ মার [ব্র জ কি

(আ — প্র)

মপম১ গ১ ম১ । প১ ন১ ন১ । র্স১ র্স২ । ধ১ র্স১ র্স১ । র্স১ র্স১ নর্সন১। ধ১ র্স১ ন১।
শো — র কা লী য় হ র . কা — ত র ভ য় ভ — ঞ্জ

ধন১ প২। নর্সর্র১ র্র১ র্র১। র্র১ র্গ২। র্র১ র্স১ র্স১। র্স১ নর্সর্র১ র্সন১। ধ১ ন১ ন১
ন — ন য় ন বাঁ কা বাঁ কা শি খি পা খা রা — ধি

ধ১ প১ প১ । প১ ধ১ ধ১ । ধ৩ ॥ ধ২ ধ১ । ধ১ ধ১ ধ১ । ধ২ ন১ । র্স৩ ।
কা হ্ন দি র — ঞ্জ ন গো ব — র্দ্ধ ন ধা র ণ

ন১ ন১ ন১ । ধ১ ন১ ধ১ । প২ প১ । প৩। [প২ প১ । —১ ধ১ প১ । ম২ গ১ । রূ২ স১ ।
ব ন কু সু — ম ভূ ষ ণ [দা মো — দ র কং শ দ র্প

স১ রূ১ রূ১ । —৩ ॥] ধ১ নো১ ধ১ । প১ ধ১ প১ । ম১ গ১ ম১ । গর১ প১ প১
হা — রী —] শ্যা — ম রা স র স বি হা — রী

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

জগতের রীতি এই, হোক্ তাই তবে,
তবুত দুদিন তরে বাঁচিব এ ভবে।
কি বলিছ দেবী মোরা ?—মোরা মহাশক্তি !
সংসারের মাঝে বসে শুধু লব ভক্তি !
তোমরা পাইবে বল,—আমাদের বরে,
সংসারে করিবে রণ আমাদের তরে ?
চাহি কি গো তোমাদের কাজে দিতে বাধা,
চাহিতেছি শুধু পেতে ভাগ তার আধা।
আছি পূজনীয়া দেবি ! দেবী-কি পাষাণী ?
রহিব পাষাণ দিয়ে বাঁধিয়ে পরাণী !
কর যুদ্ধ কর কাজ আছে যত বল,
আমাদের তরে শুধু থাক্ অশ্রুজল !
সংসারের রণে যত পরাজিত জনা,
মুছাতে তাদের অশ্রু দিয়ে অশ্রুকণা।
রেশমের-কীট মত নিজে রচি জালে,
থাকিতে পারিনা আর নিজ অন্তরালে।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অভিজ্ঞান শকুন্তল। মূল সংস্কৃতের অনুবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত।

অনুবাদক গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন, "অনুবাদ যতই সুসম্পাদিত হউক না কেন, তাহাতে মূলগ্রন্থের সৌন্দর্য্য থাকা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। শব্দ ও ভাষার অবতারণা বিষয়ে মূল গ্রন্থকারের যে স্বাধীনতা থাকে, অনুবাদকের তাহা থাকিতে পারে না। অনুবাদকের হস্তপদ শৃঙ্খলে বদ্ধ, ইচ্ছা করিয়া যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে তাহার এমন সাধ্য নাই। আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদের প্রয়াস পাইয়াছি। আত্মচিন্তা প্রসূত কোন ভাবও সন্নিবেশিত করি নাই।"

গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে। মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা যে কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে ইহা আমারা স্বীকার

করি না। কিছুদিন পূর্ব্বের ভারতীতে প্রকাশিত মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ আমাদের কথার সাক্ষী দিতে পারে। আসল কথা ভাল গ্রন্থ রচনার জন্যও যেমন প্রতিভা থাকা আবশ্যক, অনুবাদকেরও সেইরূপ অনুবাদের প্রতিভা থাকা আবশ্যক। এই প্রতিভার গুণেই অনুবাদক তাঁহার ভাষাকে জীবন্ত সুন্দর ভাব প্রদান করিয়া মূলগ্রন্থের ভাবও অবিকল রাখিতে পারেন। তবে অবিকল অনুবাদে যদি ভাষা দুর্ব্বোধ্য ও অসরস হইয়া উঠে তাহা হইলে সে অনুবাদ ভাল বলা যায় না। সমালোচ্য গ্রন্থখানি এই দোষপূর্ণ। মূল গ্রন্থের শব্দ, অনুবাদে এত অপরিবর্ত্তিতরূপে গৃহীত হইয়াছে যে তাহাতে অনুবাদ যে কেবল কঠোর হইয়াছে-এমন নহে—ভাষার প্রাণ ঠিক রক্ষিত না হওয়াতে অনুবাদ কেমন নির্জীব অসরস হইয়া পড়িয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নে সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে দু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

রথবেগ হেতু, সূক্ষ্ম প্রতিভাত,
বিপুলতা লাভ করে অকস্মাত,
মিলন তাদের হতেছে সঞ্জাত
যে সব প্রকৃত মিলিত নয় ;
অঋজু যে সব স্বভাবের কৃত,
সমরেখ তারা হতেছে প্রতীত,
সন্নিহিত যেই সুদূরে পতিত,
ক্ষণেকে কিছুই দূরে না রয়।

এ মৃদু মৃগ শরীরে করনা নিপাত
এ সায়ক, তুলারাশি পরে অগ্নিপ্রায় !
লোল অতিশয় মৃগ শিশুর জীবন,
তব শর নিশিত নিপাত বজ্রসার,

হরিণ নয়না যেই প'রেছে বল্কল,
কঠিন তথাপি কিবা চারুদরশন !
রুচির ব্যত্যয় তাহে না হয় কিঞ্চিৎ ;
কুসুমিত নলিনীর যথা বৃন্তজাল,
কণ্ঠ যার তোয় হ'তে উন্মুক্ত ঈষৎ,
রুচিভঙ্গ উৎপাদন না করে হৃদয়ে।

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া, অন্যকবিকৃত শকুন্তলার একটী শ্লোকের অনুবাদ সমালোচ্য গ্রন্থের একটি অনুবাদের সঙ্গে সংবদ্ধ করিয়া দিতেছি। পাঠক বিচার করিতে পারিবেন, শকুন্তলার অনুবাদ বাঙ্গলায় সম্ভবপর কি না।

মূল

ইদমনন্য পরায়ণমন্যথা
হৃদয় সন্নিহিতে হৃদয়ং মম
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে
মদন বাণ হতোঽস্মি হতঃপুনঃ।

সমালোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ।

হৃদয়ে নিহিত তোমা করেছি সুন্দরি ;
নাহি লবে অন্যাশ্রয় এ হৃদয় মম
অন্যথা ভাবিলে তারে, মদির-লোচনে
কামবাণ হ'ত এবে, হ'ব আশাহত পুনঃ

অন্য অনুবাদ।

হৃদয়ে রয়েছ ত, অবির ত, মদির আঁখি
হিয়া তোমারি কাছে, বাঁধা আছে, জাননা তাকি ?
যদি আরেক তর, মনে কর, বলিলো শুন
একে অতনুশরে, আছি মরে মরিব পুন।

যুগপূজা। বা ধর্ম্মভাব বিকাশ। শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার—বি এ প্রণীত।

পূজা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক। জ্ঞান বিকাশের সহিত শক্তি পূজা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়া মনুষ্যের ধর্ম্মভাব যেরূপ ধাপে ধাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে, লেখক তাহারি পরিস্ফুট ছবি এই পুস্তকের কবিতাগুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। যুগ পূজার প্রথম কবিতাটি আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রেতপূজা।

(উদ্বোধন)

লুকান মানুষ আছে মানুষের মাঝে
সদা সচেতন ;
বদ্ধ থাকে দেহে শুধু, যবে মোরা কাজে
থাকি নিমগন।

ভূমি পরশিয়ে সঙ্গে চলে অনুক্ষণ,
ভ্রমিলে আলোকে ;
দেখি তারে নদী জলে করে সন্তরণ
বড়ই পুলকে।
ঢেকে ফেলে মাঠ ঘাট গৃহ আর বন
যবে অন্ধকার,
নিদ্রায় কুটীরে আসি হই অচেতন,
দেখি চমৎকার !—
লুকান মানুষ সে যে, করে পলায়ন
পাইয়ে সুযোগ,
ভ্রমি ভ্রমি একা একা প্রান্তর কানন
করে খাদ্য ভোগ।
বড় লোভী, বড় ধূর্ত্ত, বধে কত প্রাণী
সেই অন্ধকারে ;
এড়াইয়ে শত্রুহাত ফিরে আসে জিনি
আবার আগারে।
কভু বনে কভু ঘরে দিনের বেলায়
করে পলায়ন ;
ছাড়া হলে তার সঙ্গ দেহ পড়ে যায়
হয়ে অচেতন।
অনেক ডাকিলে পর আসে অবশেষে
দেহে সংজ্ঞা হয়।
না জানি সে অবকাশে ভ্রমে কোন্ দেশে ;
মরিরে বিস্ময় !
এমন যে ধূর্ত্ত দুষ্ট, কেমনে তাহারে
বল দেখি ভাই,
ভুলাইয়ে বন্ধ রাখি দেহ কারাগারে,
সদা ভাবি তাই।
যদি গো পলায়ে যায়, নাই আসে আর ?
কি হবে তখন ?
তাই বলি সাবধানে তুষ্ট রেখো তার
করিয়ে যতন।

ছায়া স্বপ্ন প্রভৃতি হইতে মানুষের ভিতর মানুষ আছে বর্ব্বর মানুষের এইরূপ যে বিশ্বাস, ইহা ধর্ম্মভাব প্রণোদিত শৈশব যুগের বিশ্বাস। এইরূপে তিনি শৈশব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্য যুগ, কৈশোর যুগ ও যৌবন যুগের বিশ্বাস বর্ণনা করিয়া প্রবীণ যুগের ব্রহ্ম পূজায় আসিয়া থামিয়াছেন। কবিতাগুলির প্রসঙ্গ নূতন, লেখাও মনোরম। যুগ পূজা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম।

ব্রজলিপি। অর্থাৎ ভ্রমণ বিষয়ক বৃত্তান্ত। কাব্য। শ্রীব্রজলাল কুণ্ড প্রণীত। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি পুস্তক খানির আমরা বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

তটিনী। শ্রীপ্রমীলা-রচয়িত্রী প্রণীত। আমরা পূর্ব্বেই "প্রমীলা" নামক পুস্তক সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি লেখিকার কবিত্ব শক্তি আছে—এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমাদের সেই বিশ্বাস আরও বদ্ধ মূল হইল। তবে তিনি তাঁহার কবিতাগুলিকে এখনো তেমন একটা নূতন আকৃতি দিতে পারেন নাই; ইহা অনেকটা অনুকরণের ছাঁদে রচিত। তাহা ছাড়া কবিতার সেণ্টিমেণ্টগুলি অনেক স্থানে বিকার প্রাপ্ত হইয়া সেণ্টিমেণ্টালি- টিতে পরিণত হইয়াছে। তবে একটি কথা; নবীন কবিদিগের কবিতায় এরূপ দোষ ঘটা অস্বাভাবিক নহে;—তাই আমাদের বিশ্বাস, কালক্রমে লেখিকা সুকবি হইতে পারেন।

আমরা নিম্নে তাঁহার দুই চারিটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

বাঁশী।

পরাণ পাগল ক'রে
ও কে গো স্বজনি　　বাজায় বাঁশরী
অমন মধুর স্বরে?
সখি,　　পরাণ পাগল করে!
বিবশা ধরণী　　বিভলা রজনী,
ওই　　বাঁশীর মদির তানে
ওই　　জগত ভুলানো গানে!
আকুল চাঁদিমা,　　আকুল জ্যোছনা
চঞ্চল যমুনা জল!
প্রাণে　　পারিনে বাঁধিতে বল!
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল　　হরষে আকুল,
প্রকৃতি আপনা হারা,
সখি,　　পরাণ পাগল পারা!

রমণী ধরম যায় যে ভাসিয়া,
সই রহিতে পারিনে ঘরে,
ওই বাঁশরী পাগল করে!
শোন, মধুর মধুর উঠিছে তান
স্বধু "আয় আয় আয়"
সখি, ও কেন অমন গায়!
ঘরে মন যে গো পারিনে বাঁধিতে,
ওই বাঁশীর মোহন স্বরে
সই পরাণ কেমন করে।
ওই আহ্বান গান কেড়ে লয় প্রাণ,
স্বর লক্ষ্য করি হায়
চরণ ছুটিতে চায়!
ওকে বল বল সই নিবারিতে বাঁশী,
হায়, কুলমান ভেসে যায়!
ও কেন অমন গায়?

একে একে।

একে একে হায় যেতেছে ভাসিয়া
প্রাণের বাসনা যত,
জীবনের গ্রন্থি খুলিয়া পড়িছে
হইয়া তরঙ্গাহত!
ধীরে ধীরে ধীরে যায় দিন গুলি,
জীবন ফুরায়ে আসে,
সুখের শৈশব, সাধের স্বপন,
লুকায় অতীত পাশে!
আছিল সুদূরে সুখময় ছবি
আশার কিরণে আঁকা,
প্রভাত গগণে উঠেছিল ফুটে
তরুণ অরুণ রেখা!
দেখিতে দেখিতে বারিদের কোলে
যেতেছে ডুবিয়া রবি,

ধীরে ধীরে ধীরে নিরাশা আকাশে
মিশিছে সুখের ছবি!
বাসনার পথে চলিতেছি যত,
সব মরিচীকা ময়,
আকাঙ্ক্ষার স্বধু তীব্র রবিকর
কোমল পরাণ দয়,
সংসার সাগরে দাঁড়ায়ে সৈকতে
একাকী সহায় হীন,
কোন্ পথে যাব— কোন্ পথে আছে—
ভাবিয়া হৃদয় ক্ষীণ॥

মিছে।

মিছে জগতের স্নেহ ভালবাসা
মিছে হায় নয়নের জল!
এযে, সলিলের খেলা জীবনের পাতে
রেখা তার মুহূর্ত্ত কেবল।
ছায়াবাজী এ যে স্বধু রে জগত
জীবন যে নিশার স্বপন!
ভাঙ্গিলে সে স্বপ্ন, কেবা কার হায়!
কোথা তব সাধের ভবন?
কেন বল তবে 'আমার' 'আমার'
এ যে স্বধু হাটে বেচা কেনা!
ছু দিনের হেথা চোকের মিলন,
প্রাণে প্রাণে নাহি হয় চেনা!
মহাযাত্রা কালে মরণের পথে
কে তোমার হইবে সহায়!
এসেছিলে একা একা যাবে চলে
শূন্য প্রাণে লইয়া বিদায়!
এত যতনের দেহ খানি তব
ঘৃণিত হইয়া রবে পড়ি!
প্রিয় জন যারা একে একে তারা
ধীরে ধীরে সবে যাবে সরি'!

চিতায় হইবে জীবনের শেষ
ভস্ম শুধু রবে পড়ি তার,
হায়, ধূলি হ'তে ধূলি হইবে জগতে
কেহ তায় না স্মরিবে আর!
সে ধূলার শেষ কি যে রূপান্তর
হায় কেবা জানে তার নাম,
এত প্রেমময়— জীবনের কিরে—
অবশেষে এই পরিণাম!

মিটিলনা।

নয়নের শুকালনা জল,
পূরিল না জীবনের আশা!
ঘুচিল না প্রাণের আঁধার
গেল না সে স্নেহের পিপাসা!
নিভৃত এ হৃদয়-মন্দিরে
দেখিল না কেহ এই প্রাণ!
এ গভীর নয়নের জলে
কেহ, দুটী অশ্রু করিল না দান!
হৃদি-ফুল হরষে দলিয়া
চলে' গেল প্রফুল্ল অন্তরে!
দেখিল না বারেক ফিরিয়া
দ'লে গেল জনমের তরে!
হায় দুটী কথা স্নেহে কভু কেহ
রাখিবারে স্মৃতির জীবন
বলিলনা, দেখিল না চেয়ে
দুটী আঁখি করিতে স্মরণ!

দার্শনিক-মীমাংসা—প্রথম ভাগ। শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। লেখক মহাশয় এ ভাগে কেবল মাত্র শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় ভাগে আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

পুস্তকখানির উদ্দেশ্য মানবের প্রকৃত শিক্ষার বিষয় কি এবং তাহা কিরূপে লাভ হইতে পারে তাহার সবিস্তার আলোচনা করা। কিন্তু ১৯৪ পৃষ্ঠা সঙ্কলিত গ্রন্থখানি হইতে কতক-

গুলি অসম্বদ্ধ ও অসংলগ্ন সর্ব্বজনবিদিত কথা ব্যতীত প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই পাওয়া গেল না। "বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা পুস্তকে চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষাও আছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থ পাঠে তাহা সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নাই।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া, লেখক মহাশয় এক দিকে হিন্দুপূজিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বৌদ্ধপূজিত সপ্তরত্ন, এবং অপর দিকে Smiles' Character, Goldsmith's Citizen of the World, এবং Bulwer Lytton's Zanoni এবং Coming Race হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, এবং পোপের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের কবিতাটীও সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অভিমতের তুলনা করিতে গিয়া তৌলদণ্ডের একটী পাল্লায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও সপ্তরত্ন এবং অপর পাল্লায় ইংরাজি গ্রন্থাদি চড়াইয়া লেখক মহাশয় এ পুস্তকে অনেকটা হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু ইহাতে দার্শনিক মীমাংসার প্রতিবন্ধকতাই ঘটিয়াছে। ইহা অপেক্ষা, লেখক মহাশয় যদি দর্শনের মায়া কাটাইয়া তাহার গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া Smiles-এর অনুবর্ত্তী হইয়া স্বদেশীয় উন্নতচরিত্র ব্যক্তিগণের মহৎ কার্য্যগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন, তবে আমাদের বিবেচনায় দেশের অধিকতর উপকার হইত।

জাতীয় উন্নতির উপায়। শ্রীশ্যামলাল দত্ত বি, এ প্রণীত।

ইহা একখানি উপদেশ পুস্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না; উপদেশগুলি অধিকাংশই সদুপদেশ কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ, মানুষ জন্মিয়া অবধি নিম্নলিখিত উপদেশবাক্য সকল শুনিয়া আসিতেছে।

"প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তাঁহার নিজের শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা। এইটিই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেন না, প্রত্যেক মনুষ্য এখানে অল্প কাল ৬০, ৭০ বৎসর মাত্র জীবিত থাকেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি চিরকাল পৃথিবীতে থাকিবে। পিতা রুগ্ন কিম্বা দুর্ব্বল হইলে সন্তানও তদ্রূপ হয়; এবং রুগ্ন সন্তান রাখিয়া গেলে সমাজের অপকার করা হয় ও বংশ থাকেনা। রুগ্ন পুরুষ কি স্ত্রীর সন্তানোৎপাদন না করাই ভাল।

মনুষ্যের দ্বিতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম—পরিবার থাকিলে, নিজের পরিবারের ভরণ পোষণ করা।

তৃতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম—সমাজের উন্নতির জন্য কোন কাজ করা।" ইত্যাদি।

আমাদের বিশ্বাস লেখকের পুস্তকখানি প্রকাশ হইবার পূর্ব্ব হইতে লোকে স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে এই উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে, আর যে যে কারণের বশবর্ত্তী হইয়া মানব ইহার বিরোধী আচরণ করে, লেখকের এই পুস্তক প্রকাশ সত্ত্বেও এখনো তাহাই করিবে।

মহরমের ইতিবৃত্ত। শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ বি, এ, প্রণীত।

এই ইতিবৃত্ত শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত বিষাদসিন্ধুর সার সঙ্কলন। পুস্তক খানি ভালই হইয়াছে।

বিবিধ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু প্রণীত। লেখক নবজীবন ও ভারতীতে মাঝে মাঝে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন পুস্তক খানিতে তাহাই একত্রে সম্বদ্ধ। প্রবন্ধগুলি যে সুপাঠ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি। অর্থাৎ পুরাকালে যে সমস্ত ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ উচ্চ ধরণের কবিত্ব শক্তি লইয়া এতদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রথম ভাগ। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই পুস্তকে কবীর, নানক, তুলসীদাস ও তুকারামের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবীরের জীবনী সর্ব্বাপেক্ষা বড়; অন্যগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও বিষয়ের গুণে তাহা পড়িলে প্রীতি জন্মে। তবে আমাদের অনুরোধ পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ স্থলে, এবং ইহার দ্বিতীয় ভাগে আরো একটু অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া লেখক যেন জীবনীগুলির একটু বিস্তৃত বর্ণনা করেন। এইরূপ পুস্তক যে আমাদের দেশে কিরূপ আবশ্যকীয় তাহা বলা বাহুল্য। লেখক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন।

লেখক পুস্তকের ভূমিকায় তুকারাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"তুকারাম দাক্ষিণাত্যের লোক। বঙ্গদেশ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের অতীত-ভূমি। এ দেশের অনেক লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। এদিকে, মহারাষ্ট্রীয় ভিন্ন অন্য কোন দেশীয় ভাষায় বা ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার জীবনের কোন ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রত্যাগত কতিপয় বন্ধুর নিকট শ্রুত বিবরণ, তুকারামের কয়েকটি আভাঙ্গার আশয় ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দুই একটি বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। এই গুলির মধ্যে "ন্যাসানল ম্যাগাজিন" নামক পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত, ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত "বোম্বাই চিত্রে" তুকারামের জীবনী বিস্তৃতরূপে বিবরিত আছে; লেখক ইচ্ছা করিলে এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিতেন।

স্বামী স্ত্রীর পত্র। "ললনা সুহৃদ" ও "দম্পতি সুহৃদ" প্রণেতা শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই পুস্তকে স্বামী পত্রদ্বারা স্ত্রীকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছেন। পুস্তক খানি পড়িয়া পত্নীগণ আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হইয়া "ললনা সুহৃদ" প্রণেতার পরিশ্রম সার্থক করুন—ইহাই অনুরোধ।

বন্দে মাতরং।

রাগিণী দেশ—কাওয়ালী।

কথা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 　　　　 সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দে মাতরং

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

স্বরলিপি।

স́২ স́২ । —২ নস́১ র́স́১ । নোধ১ প১ প১ ধপ১ । মপ১ মগ১ র২ । —৪ । ম১ র১ ম২ ।
ব ন্দে — — — — — মা — — ত রম্ — মা — —

গম১ প১ মপ১ ধ১ । পধ১ নো১ ধনো১ স́১ । নোস́১ র́২ স́১ । স́র́স́১ নো১
— — — — — — — — — — ত র —

ধপম১ প১ । স́৪ । ন১ স́র́স́১ নো১ নোধ১ । প১ ধপ১ মপ১ মগ১ । র৪ ॥ র১
— ম্ বন্ দে — — — মা — — ত রম্ সু

ম১ ম২ । —১ গ১ র১ গ১ । রস১ ন্১ স২ । র১ র১ ম১ ম১ । প৩ প১ । প৪ । ম২
জ লা — ম্ সু ফ লা — ম্ ম ল য় জ শী ত লাম্ শ

প২ । ন১ ন১ স́২ । স́১ ন১ র́১ স́১ । স́র́স́১ নো১ ধপম১ প১ । স́৪ । স́র́১
স্য শ্যা ম লং মা — — ত র — — ম্ বন্ দে

স́নো১ ধ১ প১ । র১ গ১ ম১ গ১ । র৪ । ম২ প২ । ন২ ধন১ স́র́১ । র́১ স́১
— — — মা — — ত রম্ শু ভ্র জ্যোৎ স্না — পু ল

বিবিধ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু প্রণীত। লেখক নবজীবন ও ভারতীতে মাঝে মাঝে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন পুস্তক খানিতে তাহাই একত্রে সম্বদ্ধ। প্রবন্ধগুলি যে সুপাঠ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবি। অর্থাৎ পুরাকালে যে সমস্ত ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ উচ্চ ধরণের কবিত্ব শক্তি লইয়া এতদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রথম ভাগ। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই পুস্তকে কবীর,নানক, তুলসীদাস ও তুকারামের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবীরের জীবনী সর্ব্বাপেক্ষা বড়; অন্যগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও বিষয়ের গুণে তাহা পড়িলে প্রীতি জন্মে। তবে আমাদের অনুরোধ পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ স্থলে, এবং ইহার দ্বিতীয় ভাগে আরো একটু অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া লেখক যেন জীবনীগুলির একটু বিস্তৃত বর্ণনা করেন। এইরূপ পুস্তক যে আমাদের দেশে কিরূপ আবশ্যকীয় তাহা বলা বাহুল্য। লেখক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন।

লেখক পুস্তকের ভূমিকায় তুকারাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"তুকারাম দাক্ষিণাত্যের লোক। বঙ্গদেশ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের অতীত-ভূমি। এ দেশের অনেক লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। এদিকে, মহারাষ্ট্রীয় ভিন্ন অন্য কোন দেশীয় ভাষায় বা ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার জীবনের কোন ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রত্যাগত কতিপয় বন্ধুর নিকট শ্রুত বিবরণ, তুকারামের কয়েকটি আভাঙ্গার আশয় ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দুই [illegible] বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। এই গুলির মধ্যে "ন্যাসানল ম্যাগাজিন" নামক পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত, ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত "বোম্বাই চিত্রে" তুকারামের জীবনী বিস্তৃতরূপে বিবরিত আছে; লেখক ইচ্ছা করিলে এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিতেন।

স্বামী স্ত্রীর পত্র। "ললনা সুহৃদ" ও "দম্পতি সুহৃদ" প্রণেতা শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই পুস্তকে স্বামী পত্রদ্বারা স্ত্রীকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছেন। পুস্তক খানি পড়িয়া পত্নীগণ আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হইয়া "ললনা সুহৃদ" প্রণেতার পরিশ্রম সার্থক করুন—ইহাই অনুরোধ।

বন্দে মাতরং।

রাগিণী দেশ—কাওয়ালী।

কথা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্দে মাতরং

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

স্বরলিপি।

র্স২ র্স২ । —২ নর্স১ রর্স১ । নোধ১ প১ প১ ধপ১ । মপ১ মগ১ র২ । —৪ । ম১ র১ ম২ ।
ব ন্দে — — — — — মা — — ত রম্ — মা — —

গম১ প১ মপ১ ধ১ । পধ১ নো১ ধনো১ র্স১ । নোর্স১ র২ র্স১ । র্সর্স১ নো১
— — — — — — — — — — ত র —

ধপম১ প১ । র্স৪ । ন১ র্সর্স১ নো১ নোধ১ । প১ ধপ১ মপ১ মগ১ । র৪ ॥ র১
— ম্ বন্ দে — — — মা — — ত রম্ সু

ম১ ম২ । —১ গ১ র১ গ১ । রস১ ন্১ স২ । র১ র১ ম১ ম১ । প৩ প১ । প৪ । ম২
জ লা — ম্ সু ফ লা — ম্ ম ল য় জ শী ত লাম্ শ

প২ । ন১ ন১ র্স২ । র্স১ ন১ র১ র্স১ । র্সর্স১ নো১ ধপম১ প১ । র্স৪ । র্সর১
স্য শ্যা ম লং মা — — ত র — — ম্ বন্ দে

র্সনো১ ধ১ প১ । র১ গ১ ম১ গ১ । র৪ । ম২ প২ । ন২ ধন১ র্সর১ । র১ র্স১
— — — মা — — ত রম্ শু ভ্র জ্যোৎ স্না — পু ল

স´১ স´১। স´১ স´১ স´২। ন২ ন১ ন১ । স´১ স´১ স´২ । প১ ন১ স´১ স´১।
কি ত যা মি নীং ফু ল্ল কু সু মি ত দ্রু ত দ ল

প১
নস´র´১ স´১ র´২ [স´১ নো২ ধ১। নো২ ধ১ নো১। ধ১ নো১ স´ র´১। স´১
শো ভি নীং [সু হা সি নী — ম্ সু ম ধু র ভা

নোধ১ প১ ম১] প১ ন১ স´২। গ১ ম১ প১ স´১। স´১ ন১ র´১ স´১। স´র´স´১ নো১
ষি নীং —] সু খ দাং ব র দা ম্ মা — — ত র —

ধপম১ প১। স৪। নোস´১ র´স´১ নোধ১ প১। র১ গ১ ম১ গ১। র৪ ॥ ম১ র১
— ব ন্। দে — — — মা ত রম্ মা —

ম২। গম১ প১ মপ১ ধ১। পধ১ নো১ ধনো১ স´১। নোস´১ র´২ স´১। স´র´স´১
— — — — — — — — — — — ত র

নো১ ধপম১ প১। স´৪। ন১ স´র´স´১ নো১ নোধ১। প১ পধ১ মপ১ মগ১। র৪ ॥
— — ম্ বন্ দে — — — মা — — ত রম্।

শ্রীসরলা দেবী।

ফুলের মালা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তি কারাপ্রবেশ করিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। দ্বাররক্ষককে দীপ আনিতে আজ্ঞা দিয়া সেইখানেই মুদ্রিতনয়নে দাঁড়াইল। কিছু পরে নয়ন মেলিয়া আর তেমন অন্ধকার দেখিল না। গবাক্ষ পথ দিয়া কক্ষে যেটুক আলোক আসিতেছিল তাহাতেই দেখিতে পাইল গণেশদেব কোথায়, সরিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। গণেশদেব বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "শক্তি!"

শক্তি কঠোর তীব্রস্বরে উত্তর করিল, "শক্তি নহে, সুলতানা।"

কারাগৃহের পাষাণ দেয়ালের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যেন সেই রুদ্রবাক্যে আহত কম্পিত হইয়া উঠিল, গণেশদেব স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন, শক্তিও স্তব্ধ হইয়া রহিল—, কিন্তু কথা কহিবার অনিচ্ছাবশতঃ নহে— নিস্তব্ধে তীব্রদৃষ্টে অন্ধকার ভেদ করিয়া গণেশদেবের মুখ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিল, তাহার কথায় গণেশদেবের মনের ভাব কিরূপ হইল এইরূপে তাহা বুঝাই[illegible] অভিপ্রায়। কিন্তু তাহার প্রয়াস নিষ্ফল হইল, শক্তির ইচ্ছায় অন্ধকার দীপ্ত হইল না; রাজমূর্ত্তি যেমন অস্পষ্ট তেমনিই রহিল।

সহসা শক্তির উৎসুক দৃষ্টির সমক্ষে গণেশদেব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইলেন। দ্বাররক্ষক গৃহ দীপালোকিত করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। শক্তি তখন দেখিল এতদিন সে যে গণেশদেবকে চিনিত, ইনি সে গণেশদেব নহেন। এ মূর্ত্তি সেই রাজবেশী অনুপম কান্তিময় সুসজ্জিত সুমোহন মূর্ত্তি নহে। ছিন্ন, মলিনবস্ত্রধারী, রুক্ষ লম্বিতকেশ, ক্ষীণশুষ্ক বিবর্ণ মুখ, এক দীনহীন বন্দী তাহার সম্মুখে আসীন। বন্দীর কেশপাশে অর্দ্ধাচ্ছন্ন, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু হইতে যদি না তাহার পুর্ব্ব প্রভাব পুর্ব্ব জ্যোতি বিভাসিত হইত, তাহা হইলে ইহাকে গণেশদেব মনে করা শক্তির পক্ষেও কঠিন হইত।

শক্তি নিষ্পন্দনেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার মুখের মাংসপেশী এমন অটল অপরিবর্ত্তিত ভাব ধারণ করিল, এমন নিষ্কম্প নিস্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল যে রাজাকে দেখিয়া তখন তাহার মনে কিরূপ ভাবোদয় হইতেছে, রাজার দুর্দ্দশায় সে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে, তাঁহাকে দেখিয়া ইহা বুঝিয়া উঠা একজন পারদর্শী মনোভাববেত্তার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইত। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার

মূর্ত্তির নিস্পন্দভাব শিথিল হইয়া আসিল, মুখে বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল ; নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। সহসা জড় শক্তি জীবন্ত মানবীরূপ ধারণ করিল। তাহার এই নবপ্রাণিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে কি প্রতিশোধতৃপ্তিজনিত প্রফুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে ? এ অশ্রু কি তাহার ঈর্ষা বিগলিত আনন্দাশ্রু ? না তাহা নহে ; শক্তি আজ নিঃস্বার্থ করুণাময় প্রেমে আত্মহারা, পাষাণে আজ সহসা করুণাধারা বহিয়াছে। সম্পদশালী নিরভাব গণেশদেব এতদিন যাহা করিতে পারেন নাই ; আজ দীনহীন গণেশদেব তাহা করিয়াছেন। পূর্ব্বে গণেশদেবকে শক্তির দান করিবার কিছুই ছিল না, সে তখন ভিখারিণী তিনি রাজাধিরাজ—, তাই তাঁহাকে ভালবাসিয়াও শক্তির প্রেম পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠে নাই। আত্মদানেই প্রেমের সম্পূর্ণতা, যে প্রেমে তাহার অবসর পর্য্যন্ত ঘটে নাই, সে প্রেমের অপূর্ণতা, ক্ষুণ্ণতা কি রূপে পূরিবে ? তাই রাজাধিরাজ মহাপ্রতাপ গণেশদেব শক্তির হৃদয়ে প্রেমভাব উদ্রেক করিয়াও সে প্রেমের স্বার্থপূর্ণ মলিনতা দূর করিতে পারেন নাই। আজ বিপন্ন বন্দী গণেশদেব শক্তির অন্তরে নারীর মহাপ্রেম জাগরিত করিয়া তাহার জীবন, তাহার সুখ, তাহার মানবত্ব পূর্ণ করিয়াছেন। সে এখন ঈর্ষা প্রতিশোধের অতীত। সন্ন্যাসিনী বহু পূর্ব্বে তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থ প্রেমে মগ্ন হইয়া সে এখন সেই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছে।

শক্তি কিছু পরে বলিল—"রাজকুমার, ওঠ—।" এই স্বর আর ইহার কিছু পূর্ব্বের সেই স্বরে কি প্রভেদ! একই কণ্ঠ হইতে কি ইহা নির্গত হইয়াছে—সেই কঠোর রুদ্রধ্বনি আর এই কোমল করুণ বাণী ? রাজকুমারের নিকট ~~এতই~~ রহস্যময় প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইল, তিনি বিস্ময়ে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

গণেশদেব তুমি পুরুষ! নারীর প্রকৃতি কি বুঝিবে ? তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা পর্য্যন্ত যখন নারীহৃদয় তলাইতে না পারিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা" তখন শক্তি যে তোমার নিকট অবোধগম্য রহস্য স্বরূপ হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!

রাজাকে নিরুত্তর দেখিয়া শক্তি আবার বলিল "রাজকুমার, সময় বহিয়া যায়,—ওঠ ;—আমার এই অঙ্গাবরণে বেশ ভাল করিয়া আপনাকে আবরিত কর।"

রাজকুমার তাহার অভিপ্রায় বুঝিলেন, তাঁহার স্বপ্ন তবে সত্য! শক্তি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতে আসিয়াছে! আবার আপনাকে মুক্তক্ষেত্রে প্রশস্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান দেখিলেন, আত্মীয়স্বজনের আনন্দবিভাসিত মুখমণ্ডলী আপনার চারিদিকে দেখিতে পাইলেন, বন্ধনশূন্য স্বাধীনতার আনন্দে, প্রিয়মিলনজনিত অনুপম সুখে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি, আত্মহারা ভাবে কলের পুতুলের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কোথায় যাইব!"

শক্তি দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার বহুহস্তবিলম্বিত পরিধেয়ের কিয়দংশে স্বদেহ

আবরিত রাখিয়া অন্যাংশ ছিন্ন করিয়া তাহা এবং তাহার মস্তকাবরণ সুবর্ণখচিত শাল রাজহস্তে দিয়া বলিল, "এই লও, এই বস্ত্র ও শালে আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া দ্বারে আঘাত কর, প্রহরী দ্বার খুলিয়া দিলে নিস্তব্ধে তাহার সহিত চলিয়া যাইও, কারাগারের বাহিরে পৌঁছিয়া সেখানকার প্রহরীকে এই অঙ্গুরীটি দিও, আংটি লইয়া সে চলিয়া যাইবে, তুমি তখন যথা ইচ্ছা পলায়ন করিতে পারিবে।"

রাজা বলিলেন—"আর তুমি ?"

শক্তি। সে ভাবনা তোমার নাই। কথা আছে কিছু পরে কুতব আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।

রাজা। কিন্তু প্রহরী ভাবিবে তুমিই চলিয়া গিয়াছ, কুতব আসিলে সে তাহাই বলিবে।

শক্তি। যে প্রহরী তোমার সঙ্গে যাইতেছে, তখন তাহার পাহারা ফুরাইবে,—তাহার স্থলে যে নূতন প্রহরী আসিবে সে কি করিয়া জানিবে আমি আছি কি গিয়াছি।

রাজা। এ প্রহরীর নিকট সে সমস্ত শুনিবে।

শক্তি। না, তাহা বারণ। তুমি এই বেলা যাও, নহিলে সমস্ত গোল হইয়া যাইবে।"

শক্তি যে সমস্তই সত্য কথা বলিল তাহা যদিও নহে; রাজাকে মুক্তি দেওয়াই তখন তাহার অভিপ্রায়, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে মিথ্যা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিল না! শক্তি যে আদর্শ ন্যায়বাদী বা সত্যবাদী এমন কথা আমরা কখনও বলি নাই, দোষে গুণে সে মানুষ মাত্র। রাজা বুঝিলেন শক্তির জন্য ভাবনা নাই, তিনি এখন নির্ভাবনায় অসঙ্কোচে পলাইতে পারেন। গণেশদেব শক্তির দত্ত বস্ত্র ও ওড়না হাতে লইয়া আশাবলে বলী হইয়া উঠিলেন। কারানির্গত না হইয়াই স্বাধীনতা সুখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন তিনি আর বদ্ধ অসহায় বন্দী নহেন, তিনি অত্যাচার নিবারণে সপারগ পুরুষ গণেশদেব। আনন্দস্রোত তাঁহার হৃদয়ে বহিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, স্বপ্নের আনন্দ সহসা জাগ্রতে বিলীন হইল। তিনি মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, "না, শক্তি, আমি যাইব না—এই লও তোমার বস্ত্র।"

শক্তি আহত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন ?"

গণেশদেব বলিলেন, "তোমার হাত হইতে মুক্তি গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই; আমি পলায়ন করিব না।"

অটল দৃঢ়স্বরে গণেশদেব এই কথা বলিলেন, শক্তি বুঝিল ইহার অন্যথা করা তাহার অসাধ্য। শক্তির আশা প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল সহসা ভস্মের মত মলিন হইয়া পড়িল; ভূতলে পতন নিবারণের জন্য তাহাকে দেয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

———

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহ বলিলেন, "সত্য বলিতেছ? সত্য—সত্য!

কুতব বলিল, "অপ্রত্যয় জন্মে নিজে চলুন, আপনার চক্ষু আপনাকে মিথ্যা বলিবে না!"

বাদ। বুঝিয়াছি আর দেখিতে হইবে না! ঠিক, ঠিক! তুমি যাও, এখনি যাও, তাহার ছিন্নমুণ্ড আমাকে আনিয়া দেখাইতে বল, যাও, কুতব, এখনি যাও—।

কুতব। কাহার মুণ্ড?—

বাদ। কাহার মুণ্ড? সেই নরাধম গণেশদেবের!

কুতব। আর—আর—বেগমসাহেবকে কি বলিব?

বাদসাহ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বেগম সাহেবকে তোমার কিছুই বলিতে হইবে না—তাহার সহিত বোঝাপড়া আমার, অন্যের সে সম্বন্ধে কিছু করিতে হইবে না।"

কুতব ক্ষুণ্ণ হইল। সে মনে করিয়াছিল, সুলতানা গণেশদেবকে দেখিতে গিয়াছেন শুনিলে বাদসাহ তাহার যে শাস্তি বিধান করিবেন তাহাতে আর তাঁহার রাজবাটী মুখে ফিরিতে হইবে না। কুতব হতাশহৃদয়ে নতমুখে অভিবাদন করিয়া রাজাজ্ঞা পালনোদ্দেশে গমন করিল।

বাদসাহ আর একবার ডাকিয়া বলিলেন, "শোন, কুতব, বেগমসাহেব কারাগার হইতে চলিয়া না আসিলে যেন গণেশদেবকে হত্যা করা না হয়। বুঝিলেত?

কুতব বলিল, "যো হুকুম।"

সুরূপা ও কুরূপার খেদ।

সুরূপা।

দিতে পারিতাম, সখা, অমূল্য রতন,
তা'না নিয়ে নিলে শুধু একি ছারধন!
পূর্ণ সমুদ্রের বেলা, রাঙা পাথরের মেলা,
কুড়ায়ে তা' কেটে গেল সারা দিনক্ষণ!
হৃদয়ে আছিল তার, উজ্জল মুকুতা ভার
লুকান রহিল পড়ে, গভীর গমন!
এই আঁখি শতদল, কোমল কপোল তল,
রূপের মাধুরী সনে যৌবনের খেলা,
মৃণাল ভুজের পাশ, বিম্বাধরে মধু হাস,
তাই নিয়ে মত্ত হয়ে কাটি দিলে বেলা!
ছিল প্রেম হৃদে মম বিমল মুকুতা সম
দেখিলে না, সখা, তারে করি অবহেলা!

কুরূপা।

সখা গো, চাহনা এই হৃদি উপহার!
মাধুরী বিকাশ-শোভা, নাহি রূপ মনোলোভা,
তাই নাহি চাহ নিতে পূজা এ জনার?
অন্ধকার খনিমাঝে, উজ্জল রূপেতে রাজে
হীরক সুবর্ণমণি, অমূল্য রতন;
তাহার মহিমা আছে রাজরাজেশ্বর কাছে,
অবজ্ঞা সহিতে তারে হয় না কখন!
পারিতাম তব শিরে প্রেম দিয়ে দিতে ঘিরে,
ঢালিত গৌরবভাতি সে মুকুটখানি;
পারিতে মনুষ্য মাঝে, দাঁড়াতে দেবতা সাজে,
জগত অবাক হয়ে চাহিত বাথানি।
সে সৌন্দর্য্যে নাহি সীমা! বুঝিলে না সে মহিমা!
নারিলে দেখিতে জ্যোতি আঁধারের পার!
বিফল জীবন আর প্রণয় আমার!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

স্বায়ত্ত শিক্ষা।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে দুই একটী গুরুতর বিষয় বলিবার আছে। বিষয়ের গৌরবের জন্য "শিক্ষা-সঙ্কট" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে তাহার আলোচনা হয় নাই।

য়ুরোপীয় দেশে শিক্ষিত লোক বলিলে যাহা বুঝায় এদেশে তাহা বুঝায় না। য়ুরোপে যাঁহারা চরিত্র ও শিক্ষার গুণে মানবের উন্নতির স্রোতে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন; ও যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই স্রোতের গতি বুঝেন তাঁহারাই শিক্ষিত লোক। এদেশে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন তাঁহারাই স্থূলতঃ শিক্ষিত-শ্রেণীর অন্তর্গত। এরূপ হইবার কারণ কি? এদেশে "শিক্ষিত" হওয়া কি একটা

মানুষের মনগড়া বিষয় না ইহার ভিতরে কোন একটা বস্তু আছে, আর যদি কোন বস্তু থাকে তবে তাহা কি ?

মোটামুটি "শিক্ষিত" এই কথাটি তিনটি গুণ লক্ষ্য করে। সমসাময়িক লোকের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির যে দিকে গতি তাহা দেখিবার ক্ষমতা, সেই গতির প্রতিরোধনিবারক সহকারী কারণগুলি চিনিতে পারা, এবং পরোক্ষতঃ বা প্রত্যক্ষতঃ সেই গতি, শক্তি পরিবর্দ্ধনের ক্ষমতা ও চেষ্টা। যদি এই গুণগুলি এদেশে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ত্তাইতে দেখা যায় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে শিক্ষিত শব্দের যথার্থ ভাবে প্রয়োগ হইতেছে, নতুবা ইহার বর্ত্তমান প্রয়োগ উপচার মাত্র।

প্রস্তাবিত বিষয়টীর মীমাংসার জন্য প্রথমতঃ দেখা উচিত যে বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে যে সকল উন্নতিশীল জাতির বাস তাহারা কি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে পরিমাণে সেই লক্ষ্য আমাদেরও লক্ষ্য সেই পরিমাণে আমরাও উন্নতিশীল সেই পরিমাণে আমরাও গতিশীল। গতি শব্দ আপেক্ষিক। ঐকান্তিক গতি বা অগতি জগতে নাই। আমাদের গতি আছে কিনা জানিতে হইলে অন্য জাতির সঙ্গে তুলনা করিয়া জানিতে হইবে। যাহা লক্ষ্য তাহাকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিয়া অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের গতি নির্ণীত হইবে। লক্ষ্য যে দিকে তাহার বিপরীত দিকে গতি গতিই নহে, যেমন জীবনান্তের পর দেহের ক্রিয়া জীবন নহে।

ইতিহাস আলোচনার ফলস্বরূপ পাওয়া যায় যে, মানুষ যে মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যজাতির একত্ব অনুভব করা এবং সেই একত্বের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ, রাজনীতি ও উপাসনা-প্রণালী সংগঠন করিবার উদ্যম উন্নতিশীল মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিতেছে। যে সকল জাতি এই ভাবটিকে শ্রদ্ধা করিয়া আতিথ্য দিতেছেন এবং ইহার প্রেরণা অনুসারে কার্য্য করিতেছেন আজকাল তাঁহাদেরই অভ্যুদয় এবং ইহার বিপরীতভাবাপন্ন জাতিগণের মধ্যে বিপ্লবের অশান্তি ও অধঃপাত লক্ষিত হয়।

আমাদের যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে এ ভাবের আদর ও যাঁহারা ইহার অনুমত কার্য্য করিতে সক্ষম এবং সক্ষম না হইলেও এইরূপ কার্য্যের অনুমোদন করেন তাঁহারাই যথার্থতঃ শিক্ষিত।

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে সহজেই পাওয়া যাইবে যে ইংরেজি শিক্ষার রাজ্য মধ্যেই যথার্থতঃ শিক্ষিত লোকের বাস। এবং ইংরেজি শিক্ষার রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্য প্রায়শঃ একই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার বাহিরে যে সকল শিক্ষিত লোক আছেন তাঁহারা হয় ইংলণ্ডে শিক্ষিত না হয় ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংসর্গে শিক্ষিত। শেষোক্ত লোক সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও গুণে বিশেষরূপ গণ্য।

সকলেই জানেন যে সমগ্র দেশের তুলনায় কত অল্প লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার প্রভাবের অন্তর্গত। যে পরিমাণ লোক ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করে তাহার কত অল্প

পরিমাণ এণ্ট্রান্সে উপস্থিত হয়? আবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীর তুলনায় বি এ, এম এ পরীক্ষার্থী কত অল্প। ইহার কারণ যাহা হউক না কেন প্রকৃত অবস্থাটি এই। যখন দেখা যাইতেছে যে শিক্ষিত লোক দেশের উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তখন এই অবস্থাটী চিন্তা করিলে শিক্ষিত লোকমাত্রেই দুঃখ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই অভাব মোচনের কি কোন উপায় নাই, আর যদি থাকে তবে সে উপায় অবলম্বন না করিবার জন্য কি আমরা দোষী নহি? বি এ, এম এ, পাস না করিয়া শিক্ষার্থী লোকে যাহাতে শিক্ষিত হইতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া শিক্ষিত লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা যথার্থ শিক্ষিত তাঁহারা শিক্ষার দর বুঝেন ও সেই শিক্ষা যতদূর সম্ভব লোক সমাজে বিস্তারিত করিবার চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে আপনা হইতে উদিত হয় এবং শিক্ষার রাজ্য বৃদ্ধি হইলে তাঁহারা অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করেন। ইহার বিপরীত গুণ শিক্ষিত লোকের লক্ষণ নহে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীত ও বিদেশে অধীত-বিদ্য না হইয়াও সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তে একটী বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। "হিন্দু পেট্রিয়টে"র জন্মদাতা ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন—যাঁহারা এই মহোদয়ের জীবন বিবরণ জানেন না তাঁহারা অনায়াসেই উহা সংগ্রহ করিতে পারেন। এই মহৎ চরিত্র আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে অবসর পাইলে লোক (এমন কি আট টাকা মাহিয়ানার একজন সরকারও) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনা সাহায্যে ও বিদেশে শিক্ষালাভ না করিয়াও নিজের উদ্যমে সুশিক্ষিত হইতে পারে।

ঐ দৃষ্টান্তটি আমাদের উপস্থিত অবস্থাতে খাটান সহজ। যখন দেশে থাকিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনা সাহায্যে লোকে অবসর ও উদ্যম থাকিলে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে তখন বিশ্ববিদ্যালয় কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত রহিয়াছে বলিয়া আমাদের আলস্য উপভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।

যে পরিমাণ ছাত্র ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করে তাহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসে ইহার কারণ নির্ণয় করা বড় কঠিন নহে। দেশের দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ প্রথা প্রভৃতি সামাজিক কারণ এক শ্রেণীর; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিয়ম অপর এক শ্রেণীর কারণ। এই শ্রেণীর কারণই বিশেষ বলবৎ দেখা যায়। পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতকগুলি বিষয় কতক পরিমাণে শিখিতে হয়। যদ্যপি নিয়মিত বিষয়ের কোন একটীর শিক্ষার ত্রুটি হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় রুদ্ধদ্বার। এ নিয়মের অনেক গুণ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। কিন্তু এ নিয়মের একটী ফল এই যে অনেকে যাঁহারা বিষয়বিশেষে কৃতবিদ্য হইয়া সুশিক্ষিত শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপ হইতে পারিতেন তাঁহাদের শিক্ষালাভের সুযোগ মাত্র ঘটে না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত লোক অপেক্ষা সাধারণতঃ মানসিক শক্তিতে

কোন অংশে ন্যূন নহেন তাঁহারা ইতিহাস বা ব্যাকরণ মুখস্থ করিবার অনিচ্ছা বা অশক্তি বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্য হইতে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হন। এই শ্রেণীর একজন লোককে জানি যিনি এফ এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া এখন বাড়ীতে পড়াইয়া ছাত্রদিগকে বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। আর একজনকে জানি তিনি দুইবার এফ্ এ তে ফেল হইয়াছেন কিন্তু এখন ইংরেজি ফরাসী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং ইংরেজি ও বাঙ্গালায় সুলেখক। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি একবার এফ এ তে ফেল হওয়ায় আমার সহাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম এবং ভাবিতাম যে তিনি যেরূপ সুবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে অল্প পরিশ্রমেই তিনি অঙ্কশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু ঘটনা বশতঃ সে পরিশ্রমও করা হইল না এবং পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন না। অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক লোক পাওয়া যাইবে, এবং যাঁহারা ইহাঁদের ন্যায় সুযোগ পাইলে সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন তাঁহাদের সংখ্যা আরও অধিক।

এ সুযোগটি এখন দেয় কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এ সুযোগ পাইবার ত সম্ভাবনা নাই। তবে এই নগরীতে পাড়ায় পাড়ায় যেরূপ রীডিংরুম, লাইব্রেরী, ক্লব প্রভৃতি গঠিত হইতেছে, তাহাতে অনেকটা আশার সঞ্চার হয় যে ক্রমে ইহাদের দ্বারা কতক পরিমাণে প্রস্তাবিত অভাবের মোচন হইতে পারে। দেশীয় ভাষায় সম্বাদ-পত্র, বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকার দ্বারাও এই কার্য্য কতক পরিমাণে সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

এজন্য কয়েকটী কথা, উপস্থিত স্বায়ত্ত শিক্ষার যন্ত্রগুলির পরিচালকদিগের গোচর করা আবশ্যক বোধ হয়। ইহাঁদের নিকট প্রথম নিবেদন এই, যেন ইহাঁরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব এবং নিজের দায়িত্ব ভুলিয়া না যান। সর্ব্বদা যেন উহাঁদের মনে থাকে যে উহাঁরা যাহার কর্ত্তা তাহা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তা,—সাধারণের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত, বিস্তৃততর, উন্নততর বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞান বিস্তারের জন্য ঐগুলি যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষারূপ ভীতি বিনাশক, বিশ্ববিদ্যালয়-কাঁটাহীন গোলাপ। উহাঁদের কার্য্য যেমন গুরুতর তেমনই প্রীতিকর। ইহাঁদের প্রকৃত প্রস্তাবে apostles of light and sweetness হইবার অবসর আছে।

কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা মনের সামনে রাখিতে হয় যে কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কোন্ অভাব মোচনের জন্য ইহাঁরা ধৃতব্রত। যে কোন কার্য্য করুন্ না কেন যেন উদ্দেশ্য হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন। স্বায়ত্তশিক্ষার পরিচালকগণ যে এ বিষয়-গুলি বুঝেন না এরূপ ভ্রম আমার মনে উদয় হয় নাই তবে তাঁহাদের শিক্ষার জন্য না হউক স্মরণের জন্য কথাগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধ হয় না।

স্বায়ত্তশিক্ষার যন্ত্রগুলি যত বহুল পরিমাণে দেশে স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু ইহার ভিতর একটী কথা আছে। য়ুরোপে বিজ্ঞানানুমোদিত চিন্তার ফলস্বরূপ এই

একটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সমাজ ও সামাজিক যন্ত্রগুলি জীবের সমধর্ম্মী। যে নিয়মে জীবের স্থিতিগতি সমস্ত বৃদ্ধি হয় সমাজ ও সামাজিক যন্ত্রের পক্ষেও সেই নিয়মগুলি খাটে। জীবের জীবনরক্ষার জন্য আবশ্যক যে তাহার দৈহিক যন্ত্রগুলি এক উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে নিজের নিজের বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবে নতুবা স্বাস্থ্যের হানি ও মৃত্যু সন্নিকট হয়।

এইজন্য বোধ হয় যে সমবেত চেষ্টা ও শ্রমবিভাগ সমাজের জীবনের জন্য বিশেষ আবশ্যক। বর্ত্তমান স্বায়ত্তশিক্ষার যন্ত্রগুলির মধ্যে এই নিয়মের বশবর্ত্তিতা সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয় না। ইহাতে আশঙ্কা হয় যে, এই সকল বিচ্ছিন্ন যন্ত্রগুলির মধ্যে যে পরিমাণ উপকারিতা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না। যদি কলিকাতা নগরীর ভিন্ন ভিন্ন ক্লব, য়ুনিয়ন, সোসাইটি—যাহা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত নহে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ও তাহার সাধন উপায়গুলি সম্যক্ আলোচনা করেন ত' বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপ আলোচনা করিয়া সাধারণ উদ্দেশ্যের যে অংশ যাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা তাহা সেই অংশ হাসিল করিবার প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে পারে। কোন একটী ক্লবে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষরূপে আলোচনা হইবে অপর অপর বিষয় গৌণভাবে চলিবে। কোথাও ইংরেজি সাহিত্য, কোথাও অপরাপর বিদেশী সাহিত্য, কোথাও ইতিহাস, কোথাও সাধারণ বিজ্ঞান মুখ্যভাবে আলোচিত হইবে—এইরূপে সাধারণ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্লব নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিলে উদ্বোধিত শক্তিপুঞ্জের কার্য্য ঊর্দ্ধতম সীমায় পৌছিতে পারে। যে সকল ক্লব নিজে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অক্ষম তাহাদের যথার্থ কার্য্য অন্যের আলোচনার ফল প্রচার করা।

আরও বিশেষ করিয়া বলা উচিত। কলিকাতায় যত ক্লব আছে তাহারা প্রত্যেকে বৎসরের প্রারম্ভে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে। যত শীঘ্র হয় প্রতিনিধিগণ সভায় সমবেত হইয়া কর্ম্মচারীনিয়োগ ও সম্বৎসরের জন্য বা তিন মাসের জন্য কার্য্য স্থির করিবেন। বক্তা ও বক্তৃতার বিষয় স্থির করাও এই সঙ্গে উচিৎ। বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্ব হইতে প্রচার করা আবশ্যক, তাহা হইলে শ্রোতারা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে পারেন। এখন সাধারণতঃ বক্তৃতার সম্যক্ ভাব যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই গ্রহণ করিতে সমর্থ হন—এ বিষয়ে বোধ হয় কোন বিসম্বাদ নাই। প্রতিনিধি সভার প্রথম অধিবেশনে আরও স্থির করা উচিৎ যে কোন্ ক্লব কোন্ বিষয় বিশেষরূপ চর্চ্চা করিবার ভার লইবেন এবং কোন্ কোন্ ক্লব স্বাধীন কার্য্যের ভার লইতে অক্ষম তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক। যে ক্লব বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার ভার লইল তাহা পূর্ব্বাবধি স্থির করিল যে সে সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয়ে সেই ক্লবের অধিবেশনায় বক্তৃতা হইবে। কোন বক্তৃতা শুনিয়া উপযুক্ত বোধ হইলে অন্যান্য ক্লব হইতে

সেই বক্তা পুনরায় সেই বক্তৃতা দিবার জন্য আহুত হইতে পারেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এক বক্তৃতা একাধিক বার করিবার কোন প্রয়োজন নাই সেই বক্তৃতা ছাপা হইলেই যথেষ্ট হইবে, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতে পারে যে, আপনারা বিচার করুন যে, আদৌ বক্তৃতার কি প্রয়োজন? ছাপাইলেই ত হইতে পারে। বস্তুতঃ মানুষের নিকট মানুষের স্বরের ও জীবন্ত মানুষের উপস্থিতির একটা দর আছে।

প্রতিনিধি সভার কর্ত্তব্য, যে বক্তৃতা হইবে তাহার একটি চুম্বক প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য ক্লবের জ্ঞাপনার্থে প্রচার করা। এ বিষয়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ভরসা করা যায় যে এই সকল সম্বাদপত্রের নেতৃগণ এ সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হইবেন না কেন না তাঁহারাও স্বায়ত্ত শিক্ষার পরিচালক। উদ্দেশ্যের সাম্য দেখিয়া তাঁহাদের এই কার্য্যে আগ্রহ হইবার সম্ভাবনা।

যে সকল ক্লব স্বাধীন আলোচনায় অক্ষম প্রস্তাবিত চুম্বকগুলি তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। তাহারা চুম্বকগুলিকে ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিতে সক্ষম হইবে।

ইহাদের আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য দেখা যায়। যে সকল লোক অবস্থার দোষে বা অন্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের শিক্ষার জন্য স্থূলরূপ ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতা এই শ্রেণীর ক্লবের দ্বারা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

সাহিত্য, সামাজিক ও অপরাপর বিষয় যাহাতে স্বাধীন চিন্তার অবসর অধিক সে বিষয়ের বক্তৃতার সময় বক্তা ও প্রতিপক্ষ স্থির করা আবশ্যক এবং কাজে কাজেই বক্তৃতা প্রতিবাদ ও উত্তরের সময় বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতি বৃহৎ বক্তৃতা নিজের উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করে। বক্তার নিকট হইতে উপযুক্ত সময়ে প্রস্তাবিত বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া প্রতিপক্ষকে দিতে হইবে। বলা অনাবশ্যক যে বক্তৃতার ক্ষেত্রে বক্তা ও প্রতিপক্ষ উভয়েই বিশেষরূপ লক্ষ রাখিবেন যে কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত অসম্মান বা ক্ষোভ উত্তেজক কথা না উঠে।

নিউ ইয়র্কে "নাইণ্টিস্থ সেঞ্চুরী" ক্লবের প্রকাশ্য বক্তৃতা গুলি এই নিয়মের অধীন বলিয়া বিশেষ সন্তোষজনক হয়।

ক্লবসমূহের অনুষ্ঠিত বক্তৃতা ও প্রস্তাবগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য প্রতিনিধি সভা একখানি বাঙ্গালা ও ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত বিষয়-গুলির যাহাতে সম্যক আলোচনা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমুদয় ক্লবের নিকট চাঁদা সংগৃহীত হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিবার আছে। আমাদের যে Science Association আছে তাহা কাহাদিগের জন্য? বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ বিজ্ঞানশিক্ষা হইতেছে তাহাতে ত আর এখন উহাতে কালেজের ছাত্রদিগের বিশেষ প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কালেজের বাহির হইয়াছেন তাঁহাদের জন্যও যে উহা বিশেষ আবশ্যকীয় এমন নহে। উহা যদি আমাদের শিক্ষার্থী

সাধারণের হিতের জন্য হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় সরল বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি ওখানে শিক্ষা দিলে ক্ষতি কি? এমন বলিতেছি না ওখান হইতে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া একেবারে উঠাইয়া দাও। তবে বাঙ্গালাতেও শিক্ষা দিলে বিশেষ ফল হইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অনেক জিজ্ঞাসুহৃদয় ওখানে আশ্রয় পাইতে পারে। সকলে জানে সাধারণপ্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচার এদেশে এত কম যে সামান্য সামান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রচুর অবসর দেখা যায়। কলিকাতার জলের কলে সকলেই জল লইয়া ব্যবহার করে কিন্তু কি উপায়ে গঙ্গার ঘোলা জল পরিষ্কার হইতেছে এবং কিরূপ যান্ত্রিক কৌশলে রাস্তায়, বাজারে, বাড়ীর দেওয়ালে জল আসিতেছে এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত কয় জন জানে? গ্যাসের আলোকে কলিকাতার রাস্তায় দ্বিতীয় চন্দ্রালোকের সৃষ্টি হয় কিন্তু এই গ্যাস যে পাথুরিয়া কয়লা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলে এ কথা কয় জন বলিতে পারে? আজ কাল গঙ্গার ঘাট হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতালোকে সমুজ্জ্বল কিন্তু ইহার তথ্য কয় জন অবগত আছে? এইরূপ সহস্র বিষয় লইয়া অতি সুন্দর উপাদেয় বিজ্ঞান শিক্ষা মনে করিলেই Science Association এর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সাধারণে প্রচার করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ সে দিকে অল্প লোকেরই দৃষ্টি। Elliptical functions লইয়াই আমরা ব্যতিব্যস্ত! বড় বড় শূন্য বেঞ্চের সমক্ষে বড় বড় বিষয়ের যে চর্চ্চা করিবে না তাহা নহে, তবে ছোট বিষয় হাতের কাছে আছে বলিয়া না পায়ে ঠেলিয়া ফেলা হয়। আর বড় বিষয়ের মধ্যেও একটুকু ইতর বিশেষ আছে। এখনকার দিনে ইভোল্যুস্‌ন্ সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় না করিলে শিক্ষা সমাপন হয় না এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ে এখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের সুবিধা নাই। তাই মনে হয় যে বায়লোজি, ফিজিওলজি, আনাটমি প্রভৃতি বিদ্যা Science Associationএ শিখিবার সুযোগ দিলে ভাল হয়।*

প্রস্তাব শেষ করিবার পূর্ব্বে আমাদের ক্লবগুলির আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অদ্যাবধি আনুপূর্ব্বিক যথোপযুক্ত সমালোচনা হয় নাই। আমাদের পুরাণগুলি হইতে যে পরিমাণ দেশের ইতিহাস উদ্ধৃত হইতে পারে তাহা এখনও হয় নাই। আমাদের দেশীয় দর্শনগুলি এখনও বিদেশীয় দর্শন সমূহের সহিত একত্রে সমালোচিত হয় নাই।

উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে এই সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ভাবেন যে ইংরেজি শিক্ষা কোন কাজের নয়, তাঁহারা যদ্যপি সমবেত হইয়া যে শিক্ষা তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহাতে উদ্যম ও উৎসাহ যোগাইয়া উপযুক্ত ফল লাভ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকেই তাঁহাদের মতের পোষকতা করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* বাঙ্গালায় অল্প স্বল্প কেমিষ্ট্রীশিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া মূল কথাটা সঙ্কুচিত করিবার আবশ্যক নাই।

রুদ্রপ্রয়াগ।

১৫ই মে শুক্রবার। গেলবারে বলেছি আজ শ্রীনগরেই আছি। বিকেলে নদী পার হয়ে অপর পারে পাহাড় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরে আসা গেল। খানিক পরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চাঁদ উঠে সন্ধ্যার অন্ধকার দূর করে দিলে। তখনো আলো তত উজ্জ্বল হয়নি, সেই অস্পষ্ট আলোকে বহুদূরে সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি যেন আকাশের পটে আঁকা ছবির মত বোধ হতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ ঘু'রে বেড়াতে শরীর একটু পরিশ্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু সে জন্যে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকবার লোক আমি নই। খুব উৎসাহের সঙ্গে পণ্ডিতজীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ কল্লুম; এই নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে ব'সে আমাদের দেশের ও সমাজের কথা চল্‌তে লাগ্‌লো। জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যখন কথোপকথন হ'লো, তখন দেখি উৎসাহ ও আনন্দে সেই বৃদ্ধের গম্ভীর এবং অচঞ্চল মুখকান্তি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চে। আমরা জাতীয় মহাসমিতিতে একটা শুধু রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখি, এবং এই নিদ্রামগ্ন জাতি যে দীর্ঘকালের জড়তা ত্যাগ ক'রে নিজের একটা অধিকার লাভের চেষ্টা করচে এই ভেবে বিশেষ আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু স্বামীজী এর মধ্যে স্বধু প্রাণের নয়, প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখেচেন, সেই প্রেমের মূল্য সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারের মূল্যের চেয়ে বেশী। স্বামীজীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে—অচ্যুত বাবাজী এসে পাশে বস্‌লেন, এবং কি একটা সামান্য কথা ধরে বেদান্তের তর্ক পাড়লেন। তর্কে আমি পশ্চাৎপদ নই, আর ইংরেজী প'ড়ে অনধিকার চর্চ্চা করবার ঝোঁকটাও আমাদের ইয়ং বেঙ্গলদের খুব বেশী প্রবল; তার একটু কারণও আছে, ইস্কুলে কালেজে যে সব কেতাব পড়া হয়, তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিষই কিছু কিছু আছে; তার উপর আজ কাল স্বাধীন চিন্তার দিন, সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র মতকে তর্কজালে গগনস্পর্শী করে তা বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানসিদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির উপর বর্ষণ কর্ত্তে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। এ অবস্থায় যে বৈদান্তিকের সঙ্গে তর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব তার আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের তর্কের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে স্বামীজী কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন কল্লেন। তিনি তর্কসমুদ্র পার হয়ে এখন বিশ্বাসের তীরে এসে নেবেছেন। তাঁর এ সব ভাল লাগবে কেন? তাই যখন আমরা নিষ্কর্ম্মা দুটি লোক বাক্যের পর বাক্য বর্ষণ ক'রে পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্ত্তে প্রবৃত্ত হলুম, তখন তিনি নিদ্রা দেবার উদ্যোগ কল্লেন, কিন্তু কানের গোড়ায় এ রকম কলরব হ'লে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে বাধা জন্মে সুতরাং তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে বস্‌লেন এবং একটা গান জুড়ে দিলেন, তার সবটা মনে নেই, দুটো লাইন এই :—

"গোলমালে মাল মিশে আছে ;
ওরে, গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।"

আমাদের তর্ক বিতর্কের এর চাইতে আর কি ভাল মীমাংসা হবে? রাত্রি অধিক হ'লো দেখে সে দিনের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম দেওয়া গেল।

শ্রীনগরের সব ভাল ; মন্দের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জীব, নাম বৃশ্চিক। এখানে বৃশ্চিকের ভয় অত্যন্ত বেশী, বিশেষ তার দংশনজ্বালা আজও বেশ মনে আছে ; সুতরাং যখন শয়ন কল্লুম তখন মনে বড় ভয় হ'তে লাগলো, সমস্ত রাত্রি এই ভয়ে পাশ পর্য্যন্ত ফিরিনি। ঘুমও ভাল হয়নি ; স্বপ্নে সমস্ত রাত্রি বৃশ্চিক দেখেছি আর বৈদান্তিকের তর্ক শুনেছি।

১৬ মে, শনিবার। আজ প্রাতে শ্রীনগর ত্যাগ করে ৯ মাইল রাস্তা চলে 'ধাড়ী' চটিতে এলুম। চটিতে এসে দেখি জনমানবের সম্পর্কশূন্য অর্গলবদ্ধ দু তিন খানা পত্র কুটীর পড়ে আছে। এখানে খাওয়া দাওয়া হবার কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ক্ষুধারও কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই। গত দুদিন শ্রীনগরে যে সুখে ছিলুম আজ তার প্রতিশোধ হলো। নিকটে এমন কোন গ্রাম নেই যেখান হতে খাবার যোগাড় করে আনি, সুতরাং এ অবস্থায় সকলে যা করে আমরাও তাই কল্লুম, বেশ পরিপূর্ণ রকম উপবাস করা গেল। ঘরে বসে উপবাস করার মধ্যে গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই ; কিন্তু এই পাহাড়ের মধ্যে ন মাইল "চড়াই ও উৎরাই" শূন্যপাকস্থলীতে পার হ'লে শরীরের যে কি দুর্দ্দশা হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো অনুভব কর্‌বার শক্তি আছে ব'লে আমার বোধ হয় না। আমি যত না কাতর হই—আমার বোধ হ'ল আমার সঙ্গীদ্বয় একটু বেশী কাতর হয়েছেন। স্বামীজী বৃদ্ধ, তার উপর অল্পাহারী, দীর্ঘকাল অনাহারে তাঁর কাতর হওয়া অবশ্যই সম্ভব ; কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া আমা অপেক্ষাও জোয়ান, তবু তাঁর এ রকম কাতরতার কারণ বোঝা গেল না ; বোধ করি তাঁর পরিপাক শক্তি ভোজনশক্তিরই অনুরূপ। ধর্ম্মকর্ম্মের কোনই ধার ধারেন না, কেবল এক পেট আহার আর খানিকটে শুষ্ক, নীরস তর্ক পেলেই তিনি খুব পরিতৃপ্ত হন। আমাদের মত ডাল রুটি খাওয়ার পরিবর্ত্তে যদি তিনি যোগী ঋষির মত আমলা ও হর্ত্তুকী খাওয়া অভ্যাস কর্ত্তেন, তা হলে এক এক দিনে কটা গাছ ফলশূন্য কর্ত্তে পার্ত্তেন তা আমি অনুমান করে উঠ্‌তে পারিনে। অনাহারে ভায়ার মেজাজ বড়ই খিট্‌খিটে হয়ে উঠ্‌ল, আজ আমার উপর তাঁর রাগটা কিছু বেশী, অবশ্য তার কারণও ছিল। শ্রীনগর হতে বের হবার সময় ভায়া আমাকে পুনঃপুনঃ বলেছিলেন যে রাস্তায় আর এমন সহর নেই, এখান হতেই কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে যাওয়া উচিত, বিশেষ রাস্তায় আজও চটি বসেনি সুতরাং অনাহারে বড় কষ্ট পেতে হবে। সে সময় উদর পূর্ণ ছিল ব'লেই হোক—কি পুঁটলী বেঁধে খাবার ঘাড়ে ক'রে চলাটা ক্ষুধার সময় ছাড়া অন্য সময় প্রীতিকর নয় ব'লেই হোক—বৈদান্তিক ভায়ার সে প্রস্তাবে আমি কর্ণপাত করিনি। সেই জন্যে ভায়া আমার উপর গরম ; এই সময়ে এই ক্ষুৎপীড়িত বৈদান্তিক প্রবরের

জঠরানলে কিঞ্চিৎ তর্কাহুতি প্রদানের ইচ্ছা আমার মনে বিলক্ষণ প্রবল হয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু স্বামীজীর ইঙ্গিত অনুসারে আমি নিরস্ত হলুম। উপায়ান্তর না দেখে একটা গাছতলায় প’ড়ে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে সেই দুফুরের রৌদ্র ভোগ করা গেল।

বেলা ছুটো বাজতে না বাজ্‌তেই এখান হতে রওনা হবার জন্যে বৈদান্তিক ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে; এত রৌদ্রে বের হতে কারো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পাছে রাত্রেও অনাহারে আশ্রয়হীন হয়ে কাটাতে হয় এই ভয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু অদৃষ্টে কষ্ট থাক্‌লে কে খণ্ডাতে পারে? আজ কি শুভক্ষণেই পা বাড়ান গিয়েছিল তা বল্‌তে পারিনে; একটু যেতে না যেতেই এই বৈশাখ মাসের প্রবল রৌদ্র কোথায় চলে গেল এবং তার বদলে ভয়ানক ঝড় জল আরম্ভ হ’লো। কিন্তু এ রকম বিপদ আমাদের পক্ষে নূতন নয়, কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চার মাইল তফাতে একটা চটিতে উঠ্‌লুম, এ চটিটার নাম আমার ডাইরী থেকে মুছে গিয়েছে। এখানে একটা পাথরের কোঠা আছে; শুন্‌লুম এটা গবর্ণমেণ্টের ধরমশালা। ছোট একটা কোঠা আর একটা ছোট বারান্দা। সেখানেই আড্ডা নেওয়া গেল। এখন হ’তে রাস্তার মধ্যে মধ্যে এ রকম ধরমশালা নাকি অনেক আছে। যাহোক এখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন কল্লুম; ভিজে কাপড় এবং ভিজে কম্বলে কোন রকমে রাত্রিটা কেটে গেল।

১৭ মে, রবিবার। খুব ভোরে রওনা হয়ে ১১ মাইল পথ চলে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের দেশের লোক একটা প্রয়াগেরই নাম জানেন। এলাহাবাদকেই প্রয়াগ বলে, তা ছাড়া আরও যে প্রয়াগ আছে তা অনেকেই জানেন না, যাঁরা বদরিকাশ্রম কি কেদার দর্শন কর্ত্তে গিয়েছেন তাঁরা অবশ্য এ সকল দেখেছেন; কিন্তু সে সব কথা বড় একটা ছাপার কাগজে উঠে না; সে সব শুধু পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীর মনে তীর্থ স্থানের সুপবিত্র মহিমার সঙ্গে দীর্ঘপথের স্মৃতি জড়িয়ে ভক্তির একটা অটল সিংহাসন প্রস্তুত করে রাখে। সেই জন্যে সকল প্রয়াগের নাম সাধারণের জানার ততটা সম্ভাবনা নেই, কিন্তু কেদারখণ্ড নামক গ্রন্থে পাঁচটি প্রয়াগের উল্লেখ আছে। এলাহাবাদ বট প্রয়াগ, কারণ সেখানে অক্ষয় বট আজও সশরীরে বর্ত্তমান, তবে ক্রমাগত তেল সিঁদুরের বর্ষণে বট প্রবর এমন চেহারা বের করেছেন যে তিনি উদ্ভিদ কি আর কিছু তা সহজে ঠাহর করা যায় না, বোধ হয় পুনর্ব্বার প্রলয় কালে বিষ্ণু বিশ্রাম কামনায় পত্রের অনুসন্ধানে এসে গুঁড়ি পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারবেন না। বটপ্রয়াগের পর দেব-প্রয়াগ, সে কথা আগেই বলেছি; ক্রমে রুদ্রপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ এবং নন্দপ্রয়াগ। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি প্রয়াগই ছিল; কিন্তু সম্প্রতি আর একটি প্রয়াগের বৃদ্ধি হয়েছে, তার নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। ধীরে ধীরে সকল প্রয়াগের কথাই বলবার ইচ্ছা আছে। পুরাণাদি গ্রন্থে এই অঞ্চলের নাম “উত্তরাখণ্ড,” ঐ সকল গ্রন্থে “উত্তরাখণ্ডে”র মহিমা বাহুল্যরূপে কীর্ত্তন করা হয়েছে। “উত্তরাখণ্ডে” বাস ক’ল্লে মহা পুণ্য সঞ্চয় হয়।

রুদ্রপ্রয়াগে এসে আমরা বড়ই বিপদে পড়লুম। স্বামীজী জ্বরে পড়লেন্; তবে সৌভাগ্য এই যে গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় আমাদের মাথা রাখবার একটু যায়গা হো'ল। এ চটিতে দুটো ছোট ছোট কুঠুরী আর একটা বারান্দা। এখানে অলকনন্দার পাড় অত্যন্ত উঁচু, জলের ধারে যাওয়া অসম্ভব। এখান হ'তে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম অতি সুন্দর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানে একটা ছোট বাজার আছে, কিন্তু তা পাহাড়ের এমন যায়-গায়, যে যদি একদিন নদীতে ভাঙ্গন ধরে ত সব এ রকম ভাবে পড়বে, যে তার কিছু চিহ্ন মাত্রও থাক্‌বে না। আমার এ অনুমানটা হাতে হাতেই ফ'লে গিয়েছে। বদরিকাশ্রম হ'তে ফেরবার সময় দেখি সত্য সত্যই এখানকার বাজার নদীগর্ভে নেবে গিয়েছে। শুধু বাজার নয়, বাজার হ'তে দু তিন মাইল বদরীনারায়ণের রাস্তা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়েছে, সে কথা ফেরবার সময় বলবো। আমরা যে পারে ছিলুম সঙ্গম স্থল তার অপর পারে। পার হবার জন্যে দেবপ্রয়াগের মত এখানেও একটা টানা সাঁকো আছে, সেই সাঁকো পার হয়ে সঙ্গম স্থলে আস্‌তে হয়।

দেবপ্রয়াগে একটু সহরের গন্ধ আছে; এখানে তা কিছুই নেই। এমন কি পাণ্ডার গোলযোগ পর্য্যন্ত নেই। গ্রামে তিন চার ঘর গৃহস্থ, দোকানগুলি অতি যৎসামান্য; অনেক চেষ্টা ক'রেও একটু চিনি জোগাড় কর্ত্তে পাল্লুম না। স্বামীজীর জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌লো, এ দূরদেশে তাঁর সঙ্গেই এসেছি, তাঁকে এ রকম অসুস্থ দেখে মনটা ভারি দমে গেল। তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, সব ত্যাগ ক'রেছেন কিন্তু মায়া ত্যাগ কর্ত্তে পারেন নি, কম্বল ছাড়া সম্বল নেই, অথচ তার মধ্যে মায়া। এ মায়া মোহের নামান্তর নয়, এ আসক্তি-শূন্য, উদার, সর্ব্বত্রপ্রসারিত। কিন্তু তার মাত্রাটা আমারই উপর একটু বেশী হয়ে উঠেছে। এ কয়দিন বোধ হয় তিনি তাঁর ধ্যানধারণা হ'তে খানিকটে সময় বের ক'রে নিয়ে, এই জঙ্গলে, পর্ব্বতের মধ্যে আমার যতটুকু সুখ বা আরাম লাভ হ'তে পারে তারি জন্যে তা নিযুক্ত করেছেন। এ দিকে জ্বরে কাঁপচেন, শীতে দাঁতে দাঁতে বেধে যাচ্ছে, অথচ তারি মধ্যে বলা হচ্ছে "ওহে, কাল তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ; দেখ দেখি দোকানে দুটো চা'ল পাওয়া যায় কি না? একটু দুধ যোগাড় ক'রে খাও।" এই পর্ব্বতের মধ্যে রোগ শয্যাশায়ী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণের আগ্রহ দেখে হৃদয় বিগলিত হ'ল এবং বাল্যের পিতামাতার স্নেহ ও আদরের কথা মনে পড়লো। সমস্ত দিন স্বামীজীর রোগশয্যার পাশেই ব'সে থাকলুম; সন্ধ্যার খানিক আগে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে যখন সঙ্গমস্থল অনুপম শোভা ধারণ কল্লে তখন এক একবার ইচ্ছে হ'তে লাগলো ছুটে গিয়ে একবার প্রকৃতির সুন্দর শোভার মধ্যে এই চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মনটাকে খানিক প্রফুল্ল করে নিয়ে আসি। কিন্তু স্বামীজী অত্যন্ত কাতর, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে পাল্লুম না; তবু যে প্রাণপণে তাঁর সেবা কত্তে পাল্লুম এই একটা আনন্দের কারণ হলো। কোন রকমে ত সন্ধ্যাটা কেটে গেল, কিন্তু রাত্রে বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত; আমার অত্যন্ত জ্বর এবং রক্তা-

মাশয় হ'লো। রাত্রি যত শেষ হতে লাগলো, রোগও তত বাড়তে লাগলো;—ক্রমে আমি উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়লুম, সমস্ত পথশ্রমের কষ্ট আমার বলহীন, নির্জ্জীব দেহটা আক্রমণ কল্লে, হাত পা নাড়বারও ক্ষমতা রইল না! শরীরের অবস্থা এ রকম হলেও আমার চিন্তাশক্তি তখন বেশ তীব্র ছিল, আমার মনে হলো উষার আলোকে চরাচর সুরঞ্জিত হবার আগেই হয়তো হিমালয়ের এই নির্জ্জন উপত্যকায় আমার ইহজীবনের ভ্রমণ পর্য্যবসিত হবে। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে মনে বড় অহঙ্কার হয়েছিল যে যখন মায়াজাল ছিন্ন করা এত সহজ তখন লোকে তা পারে না কেন? এই ত আমি পেরেছি; কিন্তু মৃত্যু যখন জীবনের পাশে এসে দাঁড়াল, মৃত্যুর সেই উচ্চ, অনাবৃত তট-প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন আমি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই বিস্মৃতিপূর্ণ, গভীর অতলে পদস্খলিত হবার সম্ভাবনা দেখ্‌লুম, তখন সংসারের সমস্ত মায়া মোহ এ'সে আচ্ছন্ন কল্লে। মনে হলো যাদের ফেলে এসেছি, সন্ন্যাস নিয়েছি ব'লেই যে তাদের ছেড়ে আস্‌তে পেরেছি তো নয়, তাদের আর একবার দেখ্‌বার আশা আছে বলেই তাদের ফেলে আস্‌তে পেরেছিলুম, বাঁধন ছিঁড়তে পারিনি! যখন এই সকল গভীর চিন্তা আমার মনে উদয় হচ্ছিল তখন স্বামীজী তাঁর রোগশয্যা ছেড়ে বহুকষ্টে একবার উঠে আমার ম্লান মুখ ও ক্লান্ত চক্ষুরদিকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ করে যে সব অনিয়ম ও অত্যাচার করেছি তাতে করেই আজ এ বন্ধুহীন দেশে পর্ব্বতের মধ্যে এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি বলে স্বামীজী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর কাতরতা দেখে তাঁকে একবার বল্‌তে ইচ্ছে হ'লো "হে বৈরাগ্যাবলম্বী পুরুষপ্রবর, বৃথা তোমার বৈরাগ্য, এখনো তোমার মনে দুঃখ শোক স্থান পায় এখনও তুমি বন্ধনের দাস!" কিন্তু তখনই মনে হলো এ কাতরতা তাঁর নিজের জন্য নয়, পরের জন্য; তাঁর এ অশ্রু—নিজের দুঃখে নয়, পরের কষ্টে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেও যিনি সকলের প্রতি স্নেহবান, তাঁরই যথার্থ বৈরাগ্য; নতুবা জনমানবের সাড়াশব্দশূন্য জঙ্গলে ব'সে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অলীক ব'লে নাসাগ্রে দৃষ্টিবদ্ধ ক'রে কাল কাটানতে বিশেষ কিছু যে মহত্ব আছে তা আমার বোধ হয় না। বৈদান্তিক ভায়ার অবস্থা দেখে আমার একটু হাসি এল, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে কাত হ'য়ে ঘরের এক কোনে পড়েছিলেন এবং এক এক বার উদাস ও অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে আমার মুখপানে মিট্ মিট্ করে চাচ্ছিলেন, সেই ম্লান দীপালোকে তাঁর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে সেই মায়াবাদী বৈদান্তিক আমাদের এই বিপদ্‌কালে তাঁর theoryর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

১৮ মে, সোমবার। রাত্রি প্রভাত হোল, সকালের আলো ও বাতাসে আমার শরীর অনেকটা ভাল হতে লাগ্‌লো, পীড়ার বেগও অনেকটা কমে এল, স্বামীজীর অবস্থাও অনেকটা ভাল! দুই প্রহরের সময় স্বামীজী আমাকে একটু জল খেতে দিলেন; আশ্চ-

র্য্যের বিষয় স্বামীজীর এক আধটু বুজরুকী ছিল, তাঁর মত লোকের ওসবের কি আবশ্যক তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঠিক করে উঠ্‌তে পাত্তুম না; কিন্তু আজ দেখলুম তাঁর বুজরুকীর মধ্যেও খানিকটে সত্য আছে। তিনি তাঁর কমণ্ডলু হ'তে খানিক জল নিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টে একমনে চেয়ে থাকলেন, তার পর সেই জলের মধ্যে খুব জোরে একটা ফুঁ দিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমাদের দেশে শুনেছি সে কালে জল পড়া খেয়ে লোকের ব্যারাম সারতো, মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলদের আমোলে কিছু দিন সারতো না, এখন আবার সেই জলপড়া বিলাত হ'তে মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌ হয়ে এদেশে এসেছে, এখন আবার অসুখ সারছে! প্রাচীন যোগতত্ত্বের জায়গায় পাশ্চাত্য সাইকিক ফোর্স বাসা বেঁধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও ভবিষ্যতের খবর দিচ্ছে। শুনেছি এ সকল থিয়সফির কথা, এ জানিও নে, বুঝিও নে। তবে এইটুকু দেখ্‌লুম যে স্বামীজীর জল খেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার শরীর বিশেষ সুস্থ বোধ হ'লো; অসুখ একটু নরম পড়তেই আমার ভয়ানক খিদে পেলে, সে রকম খিদে বোধ হয় আমার জীবনে আর কখন পায়নি, একটা অসুখ কতকটা সেরেছে বটে কিন্তু জ্বর তখনও পূর্ণ মাত্রায়, খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট কল্লেও সে অবস্থায় কিছু খাওয়া উচিত নয় কিন্তু আমি আর থাকৃতে পাল্লুম না। সঙ্গে একজন লোক ছিল, সেই রান্নার যোগাড় করে দিলে, তার কৃপায় ডাল রুটি খাওয়া হো'ল। সে ডাল রুটির যে কি চেহারা! তা যদি আমাদের ডাক্তার মহাশয়েরা দেখতেন, বিশেষ, আমার একটী অতিসতর্ক, বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ডাক্তার বন্ধু আছেন,—আমার এই অপরূপ পথ্য তাঁদের কারো চোখে পড়্‌লে তাঁরা নিঃসন্দেহে আমার মৃত্যু নিশ্চয় বলে সিদ্ধান্ত কর্ত্তেন। স্বামীজীও আমার পথ্যের পোষকতা করেন নি; কিন্তু আহারের পর আমি অনেকটা বল পেলুম, জ্বরটা তখনও বেশ প্রবল, স্বামীজী বল্লেন রাত্রে ঘুমলেই জ্বরটা যাবে।

আজ বৈকালে বেড়াবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো, সঙ্গম স্থলের কাছে গিয়ে সেখানকার শোভা দেখ্‌বার জন্যে মনে অত্যন্ত আগ্রহ হতে লাগ্‌লো। কিন্তু এই অসুখের উপর ঘুরে বেড়ানতে স্বামীজী যদি অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলুম; পরে যেই দেখলুম স্বামীজী ধর্ম্মশালার ঘরে ঈষৎ তন্দ্রাভিভূত হয়েছেন অমনি আমি বেরিয়ে পড়লুম। বাজারের ভিতর দিয়ে টানা সাঁকো পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গমস্থলে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। একটু পথশ্রমেই শরীর বড় কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়লো, জলের ধারে বসে আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলুম। পিঠের দিকে সরল, সমুন্নত পর্ব্বত; সম্মুখে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর খর প্রবাহ পরস্পরে মিশে গিয়েছে; সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পর্ব্বতের কনক-কিরীট নদীজলে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং সুরঞ্জিত মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। জলের ধারে কত রকমের সুন্দর পাথর তা ব'লে শেষ করা যায় না; আমি ব'সে ব'সে সেই সমস্ত উপলখণ্ড সংগ্রহ কর্ত্তে লাগলুম! দেবপ্রয়াগে কতকগুলি সুন্দর পাথরের নুড়ি সঞ্চয় করেছিলুম, কিন্তু স্বামীজী তা ফেলে

দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে ভাল পাথর দেখ্‌লেই যদি কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় তা হলে আমাদের সঙ্গে দশ বিশটে হাতী আনা উচিত ছিল। দেবপ্রয়াগে সে গুলি ফেলে দিয়ে ছিলুম কিন্তু এখানকারগুলি সব ফেল্‌তে পাল্লুম না; এমন সুন্দর পাথর কি ফেলা যায়? কেমন উজ্জ্বল, মসৃণ বহুবিধ বর্ণ এবং আকার বিশিষ্ট! কোনটা ঘোর লাল, কোনটা দুগ্ধ-ফেনবৎ শ্বেত, কয়েকটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, আবলুস কাঠের মত; কতকগুলি নয়নস্নিগ্ধকর হরিৎ, দু পাঁচটা বা কমলা লেবুর রঙ্গ। কতকগুলির একদিক এক রকম বর্ণ, অন্যদিকে অন্য রকম; উভয় বর্ণ পরস্পরের মধ্য মিশে গিয়েছে অথচ সেই মিশ্রণের মধ্যে এমন একটা সুন্দর রেখা আছে যা মানবচিত্রকরের তুলিতে কিছুতেই অঙ্কিত হতে পারে না, কিন্তু অথচ তা' কত স্বাভাবিক সহজ দেখাচ্ছে, যেন তার মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণতা নেই। আবার সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড যে কত আকারের তা সংখ্যা করা যায় না। গোল, চেপটা, ত্রিকোন, চতুষ্কোন; আকার যত রকম হতে পারে বোধ হয় তার সকল রকমই আছে। নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে এত পাথর বিক্ষিপ্ত, বোধ হতে লাগলো এ যেন সুরনদী মন্দাকিনীর প্রবাল ফুল। আমি এক এক বার কতকগুলি সুন্দর নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খানিকটে উপরে পাথরের উপর বসি, বসে বসে তার মধ্যে হতে সব চেয়ে ভাল দু তিনটে বেছে রেখে বাকিগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিই, আবার কতকগুলি নিয়ে আসি, এবং তা হতে দু একটী বেছে নিই। এই রকম কর্ত্তে কর্ত্তে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, অথচ সে দিকে আমার খেয়াল নাই, হঠাৎ উপর হতে স্বামীজীর কণ্ঠ স্বর শুনে আমার চৈতন্য হোল। চেয়ে দেখি তিনি অপর পারে পাহাড় বেয়ে যেটুকু নীচে আসা যায়, ততটুকু এসে একখানা পাথরের উপর বসে আমায় ডাকচেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তা ঘুরে ধরমশালায় যেতে বেশ অন্ধকার হয়েএ'ল; স্বামীজী ততক্ষণ বাসায় পৌছেছিলেন, আমি বাসায় প্রবেশ করবামাত্র তিনি আমার উপর স্নেহপূর্ণ তিরস্কার বর্ষণ কর্ত্তে লাগলেন, তার মর্ম্ম এই যে যদি আমি পথে ঘাটে যেখানে সেখানে এ রকম নিবিষ্টচিত্ত হয়ে ব'সে থাকি ত আমাকে বাঘ ভালুকে ফলাহার কর্ত্তে পারে কিম্বা আমি পাথর চাপা পড়েও মরতে পারি; বিশেষতঃ আজ আমার রুগ্নদেহে এতটা উঠা নাবা করা ভাল হয়নি। বৈদান্তিক ভায়ার মুখে শুনলুম স্বামীজীতে আর তাঁতে আমায় বাসায় না দেখে এখানে এসে প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে ঐ পাথরের উপর ব'সে আমার ছেলেখেলা দেখ্‌ছিলেন, অচ্যুত বাবাজী আমাকে ডাক্‌তে চেয়েছিলেন কিন্তু স্বামীজী ডাক্‌তে দেননি; আমার রকম দেখে তাঁর মনে অন্য এ রকম ভাবের উদয় হয়েছিল তাই ভাবে গদ্গদ হয়ে বলেছিলেন "প্রকৃতি মায়ের কোলে ব'সলে এমনি ক'রে সকলেই বালক হ'য়ে যায়।" রাত্রিটা আমরা এক রকমে কাটিয়ে দিলুম কিন্তু আমাদের চাকরটার বড় জ্বর হ'লো।

১৯এ মে, মঙ্গলবার। আমাদের শরীর যদিচ অনেকটা দুর্ব্বল ছিল, তবুও আজই এখান হতে রওনা হব এ রকম সংকল্প করেছিলুম, কিন্তু চাকরটার জ্বর হওয়ায় আজও

এখানে থাকৃতে হোল, আরো মনে করা গেল আজকের দিনটাও বিশ্রাম ক'রে শরীর আর একটু সুস্থ করে নেওয়া যাক্। বৈদান্তিকের আর এক দণ্ড এখানে থাকৃতে ইচ্ছে নেই, তিনি বেরিয়ে পড়লেই বাঁচেন, কিন্তু কি ব'লে আমাদের ফেলে যান? কাজেই তাঁকেও চক্ষুলজ্জায় থাকৃতে হো'ল। এখান হ'তে ছুটো রাস্তা বের হয়েছে; যে টানা সাঁকো পার হ'য়ে আমি সঙ্গমস্থলে গিয়েছিলুম সেই সঙ্গমস্থানের উপর দিয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথ যাওয়া যায়; আর একটা রাস্তা—আমরা যে পারে আছি সেই পার দিয়ে বরাবর অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত গিয়েছে। অনেকেই এখান হতে অপর পারের পথ ধ'রে প্রথমে কেদার দর্শন ক'রে, পরে ঐ দিক দিয়েই যে একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তায় এসে, খানিক উপর দিয়ে বদরিকাশ্রমে যে রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তায় উপস্থিত হয়। আমরা প্রথমেই বদরিকাশ্রম যাব এই রকম স্থির ছিল। উপরেই বলেছি আমরা যে পারে আছি এই পার দিয়েই—অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রমের রাস্তা; কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপল চটি পর্য্যন্ত রাস্তাটা বড়ই ভয়ানক এবং দুর্গম। এখান হ'তে পাহাড় একেবারে সোজা, তারি গায়ে একটা সামান্য রাস্তা; পাহাড়ের যে অংশে রাস্তা, সে অংশটা মধ্যে মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে সুতরাং খানিকটে ঘুরে আবার একটা রাস্তা পড়ে। একবার একদিন এই রাস্তায় কতকগুলি যাত্রী যাচ্ছিল, তখন একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, ঝড়ও ছিল; সেই সময় তাদের মাথার উপর পাহাড়ী ধস নাবে, তারপর একটা যাত্রীরও চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট টানা সাঁকোর উপর দিয়ে পিপল চটি পর্য্যন্ত একটা রাস্তা তৈয়েরী করে দিয়েছেন, আবার পিপল চটিতে একটা টানা সাঁকো তৈয়েরী ক'রে এ পারের রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। রুদ্রপ্রয়াগ হতে পিপল চটি পনর মাইল। ও পারের নূতন রাস্তা ভাল বটে, কিন্তু এই পনর মাইলের মধ্যে কোন চটি নেই; একটানে এই পনর মাইল রাস্তা চলা কষ্টকর ব'লে সকলেই এ পারের সঙ্কীর্ণ পথে চলে, কারণ এখান হ'তে সাত মাইল তফাতে 'শিবানন্দী চটি'। সরকারী লোকজন ছু পথেই চলে। এক জায়গায় আজ তিন দিন ব'সে থেকে মনটা বড় ভাল নেই। বিকেলে পণ্ডিতজী ব'ল্লেন এখন হ'তে রাস্তা ক্রমেই খারাপ হবে, শুধু পায়ে তার উপর দিয়ে চল্‌তে গেলে পা ছুখানাকে কিছুতেই আস্ত রাখা যাবে না, বিশেষতঃ এই দুর্গম রাস্তার মধ্যে এক যাগয়ায় যদি পা জখম হ'য়ে পড়ে ত চক্ষু স্থির! সুতরাং এখান হ'তে এক এক জোড়া পাহাড়ী জুতো কিনে নেওয়া যাক্। আমিই বাজারে জুতো কিন্‌তে গেলুম, বাজারে জুতোর দোকান নেই, একজন মুচি একটা যায়গায় ব'সে জুতো মেরামত কচ্ছিল, আর তার পাশে একটি দেবকন্যার মত সুন্দরী মেয়ে ব'সেছিল; এমন সুন্দর চেহারা অতি কমই আমার নজরে পড়েছে; যেমন রঙ, তেমনি সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণ সৌষ্ঠব। মেয়েটির বয়স পনেরো ষোল বছর; সতেজ, উন্নত দেহ, তার উপর যৌবনের লাবণ্যে সে সে যায়গাটা আলো ক'রে ব'সেছিল। আমি বিহ্বলনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলুম; এ রকম যায়গায় আমি

এ রকম সুন্দরী দৃষ্টিগোচর করবার প্রত্যাশা করিনি বলেই আমার এ বিস্ময়, তারপর যখন শুনলুম মেয়েটি মুচীর কন্যা তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি ভাবলুম মুচীর মেয়ে যেখানে এমন, সেখানে ভদ্রলোকের মেয়েরা না জানি কত সুন্দরী!

যাহোক এই মুচীকে জুতোর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্লে জুতো তৈয়েরী নেই, তবে আমি যদি খানিক অপেক্ষা করি ত সে জুতো তৈয়েরী ক'রে দিতে পারে। খানিক ব'সে থাকলে তিন চার জোড়া জুতো তৈয়েরী হবে শুনে আমি আশ্চর্য্য হ'লুম, এবং একটা দোকানে ব'সে তার কাণ্ডকারখানা দেখ্‌তে লাগলুম। সে আর তার মেয়েতে জুতো তৈয়েরী কর্ত্তে লাগলো ;—সেই সুন্দরীর ফুলের মত সুন্দর, সুকোমল হাতে কঠিন চামড়া নাড়াচাড়া বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল।

শীঘ্রই জুতো তৈয়েরী হয়ে গেল ;—জুতো তো ভারি, পায়ের সমান ক'রে কাটা এক এক খানা মোটা চামড়া, তার উপর পায়ের এপাশ ওপাশ দিয়ে বাঁধবার জন্যে গোটাকত চামড়ার ফিতে। জুতো তৈয়েরী হ'লে মেয়েটি তা হাতে ক'রে আমার আগে আগে ধরমশালা পর্য্যন্ত পয়সা নিতে এল। যেন কোন বনদেবী ছল করে এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে আমার পথ প্রদর্শিকা!

আজ রাত্রে ভৃত্যটির অবস্থা অনেক ভাল। প্রত্যুষে রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ করবো—এই রকম স্থির করা গেল।

শ্রীজলধর সেন।

কলঙ্কিনীর আত্ম কাহিনী।

* * * *

আমি ঘোর কলঙ্কিনী, রূপব্যবসায়ী —
গৃহাশ্রমী ঋষি তুমি, ধর্ম্মনিষ্ঠাবান্‌!
আমি সমাজের গাত্রে ব্রণ বিস্ফোটক ;
সমাজের চারু কর্ণে বীরবৌলি তুমি!
সংসার অরণ্যে তুমি বৃক্ষপতি শাল ;
দীনহীন বৃক্ষরুহা আমি পরগাছা!
সমাজের নিয়ন্ত্রিত মণ্ডল মাঝারে
বিবর্ত্তিত, মনোহর চন্দ্রগ্রহ তুমি ;
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট, গতিহারা, আমি ধূমকেতু!
আমি নটী ; ছন্দোবন্ধে বিনায়ে বিনায়ে,
কথার বাগুরাজাল কৌতুকে বিস্তারি
ধরি পুরুষের চিত্ত! তুমি ত সরল ?
নহে তব আঁকা বাঁকা সর্পের চরিত্র ?
কি স্পর্দ্ধা! গণিকা আমি, ঘোর পাপিয়সী,
আমিষকিনা চাহি, এই পত্র পাঠাইয়া,
করিবারে কলঙ্কিত সুহস্ত তোমার!
ধর্ম্মের প্রভূত বলে তুমি বলীয়ান্‌,
তোমার কিসের শঙ্কা ? অচঞ্চল মনে
পাঠ করি পত্র খানি, গঙ্গাজল দিয়া,
দেহের কলঙ্ক তব ফেলিও প্রক্ষালি!
সমাজমুকুট তুমি, সমাজের নেতা,
সমাজের কিবা সাধ্য করিয়া ভ্রুকুটি,
চাহিয়া তোমার পানে, দেখায় আপন
দুর্ব্বল, রুধির হীন, ঘৃণার অঙ্গুলি!

* * * *

বহু, বহুকাল গত ; বৃথাকেন আর
রে চক্ষু স্পন্দিত হোস্‌? আমিও ছিলাম
হিন্দুপরিবারভুক্ত কুলীন-মহিলা।
নব বলয়িতা তরু ব্রততীর মত,
উঠিতাম শিহরিয়া সমীর পরশে!
হইতাম সলজ্জিত কথায় কথায়!
এবে মোর অন্তরাত্মা বিবস্ত্র হয়েছে ;
দর্পনের পারাটুকু গিয়াছে ঘুচিয়া!
কুলীনের বধূ আমি! বালিকাশৈশবে,
সেই কবে কোন্‌ কালে, হয়েছে বিবাহ—
মনে নাই পতিমুখ ; বিংশতি বরষ
হল ক্রমে বয়ঃক্রম ; আমি পিত্রালয়ে
গণিতেছি দিন মাস, কত সম্বৎসর ;
কোথায়, কোথায় পতি, হায়রে কোথায় ?
শয্যা পাতি শুইতাম নিশীথে যখন,
বিপুল বিশ্বেতে আছে রূপ রাশি যত,
বিপুল বিশ্বেতে আছে গুণ রাশি যত,
সমগ্রদ্রব্যের এক সমষ্টি করিয়া,
কত অনুরাগে আর কতই আহ্লাদে,
গড়িতাম কল্পনায় পতির মূরতি!
নহেন নিষ্ঠুর তিনি, মোর প্রতি বাম্‌;
অভাগীর পোড়া ভাগ্যে, অবস্থার দোষে,
করিতে নারেন তিনি আমার উদ্দেশ—
এই রূপে, শান্তিহারা অবোধ চিত্তের,
নিজেই দিতাম আমি প্রবোধ সান্ত্বনা!
দেবালয়ে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার কাছে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, কত শত বার,
করপুটে সাশ্রুনেত্রে মাগিয়াছি বর—
"বারেক দেখাও, দেবি, নাথেরে আমার!"
এক দিন সন্ধ্যাকালে, রথ যাত্রা দেখি,
ফিরিয়াছি গৃহে ; হর্ষে শুনিলাম আমি—
দেবতা প্রসন্ন আজি দুঃখিনীর প্রতি!

শ্বশ্রুগৃহে পদার্পণ করেছেন আজি
কুলীন জামাই বাবু! নীরবে, লজ্জায়,
পশিলাম অন্তঃপুরে! জননী আমার
মোর পানে, বাষ্পাকুল, উৎফুল্ল লোচনে
চাহিয়া, বসায়ে ধীরে আপনার কাছে,
বাঁধি বেণী, মাজি দেহ, দিলেন সাজায়ে!
রাত্রি কাল ; ক্রমে যবে হয়েছে নিশুতি,
অধৈর্য্য আশঙ্কা হর্ষে দুরু দুরু হিয়া,
পশিলাম ধীরে ধীরে শয়ন মন্দিরে!
আঁধার, আঁধার গৃহ! না জানি কি ভাবে
দিয়াছিল নাথ মোর প্রদীপ নিবায়ে!
আমি পালঙ্কের পাশে দাঁড়াইনু গিয়া—
চরণ চলেনা মোর প্রেমের আবেশে!
ভাবিলাম নাথ বুঝি, দুই ভুজ দিয়া
গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়া আমায়,
লবেন পালঙ্কে তুলি! সর্ব্বাঙ্গ শরীর
চরণ-নখর আর অলকের মাঝে
হেমন্ত লতিকা সম লাগিল কাঁপিতে!
আঁধারে পতির মুখ নারিনু দেখিতে—
শুনিলাম কথা তাঁর "বড় প্রয়োজন
"আছে মোর, এই দণ্ডে যাব ফিরে গৃহে ;
"অতএব বিধুমুখী, অনুগ্রহ করে,
"তোমার সুন্দর গাত্রে অলঙ্কারগুলি
"আছে যাহা, দাও তাহা ; ব্রাহ্মণের বরে,
"আবার হইবে তব কত অলঙ্কার"!
আমি কহিলাম ধীরে লাজভগ্নস্বরে—
"হে নাথ, দাসীর প্রতি দয়া হল যদি,
"আজিকার রাত্রি সুধু যাপিয়া হেথায়
"সেবিবারে পাদপদ্ম দাও এ দাসীরে!
"হইলে শর্ব্বরী শেষ, যথা ইচ্ছা তব
"যাইও ; লইও সঙ্গে, দিব খুলি আমি
"অধিনীর দেহে আছে যত অলঙ্কার—
"কি আছে অদেয়? তুমি সর্ব্বস্ব আমার"!
উত্তরিলা নাথ মোর "রঙ্গ রাখ্ তোর্"
সহসা সজোরে দুই কর বাড়াইয়া,
চাহিলা কাড়িয়া নিতে গাত্র অলঙ্কার—
রুদ্ধকণ্ঠে, ভগ্নবক্ষে মুমূর্ষুর স্বরে,
আমি তারে কত কষ্টে কথা যোগাইয়া,
কহিনু, "দিওনা হাত আমার এ দেহে—
"খুলিয়া দিতেছি আমি সব অলঙ্কার"।
এত বলি, মল্, বালা, হার, চন্দ্রহার,
জওসন্, প্রজাপতি, সিঁতি ও চৌদানি,
যাহা ছিল, সব আমি একে একে খুলি,
দিলাম তাহার করে ; কপাট খুলিয়া,
কুলীন বধূর স্বামী গেলেন চলিয়া!
আমি সে আঁধার গৃহে ঘৃণায় ও রোষে,
ভালের সিন্দুর বিন্দু ফেলিনু মুছিয়া!
এই পতি? হিন্দুগৃহে এরি নাম পতি?
করিয়া প্রতিমা পূজা দিবস শর্ব্বরী,
প্রাণের প্রতিষ্ঠা করি, উদ্বোধন কালে,
ডাকিলাম যেই আমি "কোথা, দেবি" বলি,
হায় কি দৈবের দোষে, কাঠামো হইতে,
নির্দ্দয় রাক্ষসমূর্ত্তি হইল বাহির!
এই পতি? হিন্দুগৃহে এরি নাম পতি?
ও নয় আমার স্বামী ; বালিকা শৈশবে,
কবে কোন্ কালে মোর হয়েছে বিবাহ ;
মনে নাই পতি মুখ ; আজি এ আঁধারে,
কত যুগ যুগান্তরে, এল যদি পতি,
নারিনু পতির মুখ ক্ষণেক দেখিতে!
এই পতি? হিন্দুগৃহে এই কি বিবাহ?
দেবের শপথ করি পারিগো বলিতে—
অদ্যাপি কুমারী আমি ; বিবাহের রাত্রে,
করি নাই, করি নাই, মন্ত্র উচ্চারণ!
লোক মুখে শুনে থাকি, কৌতুক উৎসব

হয়েছিল পিতৃগৃহে সে ঘোর রাত্রিতে!
নয়, নয়, নয় সেই বিবাহ উৎসব—
চিরবৈধব্যের মন্ত্র, করেছিল পাঠ
হিন্দুকুল পুরোহিত, হোমাগ্নি জ্বালিয়া!
এই পতি? হিন্দুগৃহে এরি নাম পতি?
আমি চির সতীলক্ষ্মী, লম্পট ব্রাহ্মণ
আজিকে চাহিয়াছিল, গাত্রে হাত দিয়া,
কাড়ি নিতে অলঙ্কার; কই দিনু তারে?
পরপুরুষের কর-কলঙ্ক-পরশ
করিবে আমারে স্পৃষ্ট? ধৃষ্ট দুরাচার
করিবে কলঙ্কদুষ্ট সুবপু আমার?
অমঙ্গল! অমঙ্গল! কার অমঙ্গল?
ভালের সিন্দুর আমি ফেলেছি মুছিয়া—
কার অমঙ্গল তাহে? আপাদ মস্তক
হয়ে অলঙ্কারশূন্যা, নেত্রজলে ভাসি,
হইনু অধীরা আজি! সেকি সুমঙ্গল?
হে হিন্দু, এ ধরা পৃষ্ঠে সকলই তোমার!
এক চক্ষু; দয়া, ধর্ম্ম, রীতি, ব্যবহার!

* * * * *

পোহাইল কালরাত্রি; মাতার সমীপে
গেলাম বিষণ্ণচিত্তে; শিরে কর হানি,
চিরদুঃখী মা আমার লাগিলা কাঁদিতে!

* * * * *

ক্রমে দিন, পক্ষ, মাস, দুইটি বৎসর
হইল বিগত; আমি ব্যস্ত গৃহ কাজে
ভুলিয়া গেলাম, মোর হয়েছিল কভু
বিবাহ; কাটিল কাল পরম আহ্লাদে!
আশা নাই যার, তার কিসের বিষাদ?
অকস্মাৎ হায় হায় নির্দ্দয় শমন
হরি নিল একদিন জননীর প্রাণ—
একমাত্র যে বন্ধন ছিল এ সংসারে
অভাগীর, ছিন্ন তাহা হল এতদিনে!

হে জননি, এ জগতে ঘোর অভাগিনী
কুলীনের ধর্ম্মপত্নী; একমাত্র বন্ধু
হে জননি, তুমি তার বিশ্ব কারাগারে!
হে জননি, তুমি তার একমাত্র পতি!
মণিবন্ধে বাঁধা ছিল যে রক্ষা কবচ,
গেল খসি, এস তবে ভয় ও বিষাদ!
উদঘাট হয়েছে দ্বার; আইস তোমরা—
অবাধে দৌরাত্ম্য কর মনের আহ্লাদে!
সংসার অরণ্য হল; জনক আমার
দারপরিগ্রহ করি, আনিলেন গৃহে
দুঃখী দুহিতার লাগি নবীন জননী!
সাঁজের প্রদীপ জ্বালি, আমিও আবার
করিতে নারিনু ঘর, বিমাতার সাথে!

* * * * *

তুমি কে? আঁধারচিত্তে মশাল জ্বালিয়ে,
কে তুমি খেদায়ে দিলে আঁধার দৈত্যেরে?
তুমি কে? অমৃত ঢালি শেফালির মূলে,
কে তুমি জাগায়ে দিলে নিদ্রিত সৌরভে?
তুমি কে? ডুবিয়াছিনু তরঙ্গ গহ্বরে,
টানিয়া আনিলে তুলি তরঙ্গিনী কূলে!
মাতুল শ্যালকপুত্র সম্পর্কে আমার
তুমি; কিন্তু যেইদণ্ডে হেরিনু তোমারে—
জ্ঞান হল, তুমি মোর পরম আত্মীয়!
জ্ঞান হল, তুমি মম চির পরিচিত!
সেই দিন হায়, সেই প্রথম দিবসে
হেরি তব দেবতুল্য মোহন আকৃতি,
করুণার রঙ্গভূমি, আকর্ণ বিস্তৃত
যুগ্মনেত্র, যুগ্মভ্রূ, কুঞ্চিত চিকুর,
সঞ্চরিল নব প্রাণ বিশুষ্ক জীবনে!
ধূলি তলে নিপতিত মৃতকল্প আশা
গাত্র ঝাড়ি, দাঁড়াইয়া লাগিল হাসিতে!
বিতৃষ্ণা বিমাতা প্রতি, জনকের প্রতি

ঘৃণা, উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল ত্রাসে!
অনুরাগ ভালবাসা জন্মিল আবার
এ অন্তরে, সমুদায় নরনারী পরে!
গৃহের জানেলাগুলি, প্রাঙ্গণ ও ছাদ,
সহসা আমার নেত্রে বিস্তৃত আকৃতি
ধরিল, যেনরে কোন্ মন্ত্রের প্রভাবে!
যেন কোন্ বিশ্বকর্ম্মা করিল প্রসার
গবাক্ষে; গড়িল মরি চক্ষুর নিমেষে,
অপরূপ সিংহদ্বার হৃদয় তোরণে!
বুঝিলাম এই প্রেম! এরি নাম প্রেম!
মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র এরি নাম প্রেম!
এই প্রেম প্রাণময় উষার তুষার!
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
অলক্ষিত ধীর মন্দ সমীর হিল্লোলে!
এই প্রেম বসন্তের কুসুম সম্ভার!
এই প্রেম দীপ্ত বহ্নি নিদারুণ শীতে!
এই প্রেম শরতের দিগন্তব্যাপিনী
বসুধার মর্ম্মস্পর্শী, আকুল চন্দ্রিকা!
আজিগো, আজিগো হল শুভ দরশন—
হাঁগো আজি, আজি মম দ্বাবিংশ বয়সে,
হল শুভ পরিণয় তোমার সহিত!
তুমিই আমার স্বামী; আমি গো তোমার
ধর্ম্মপত্নী; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে!
সুন্দর সুড়ঙ্গ রচি, হে সুন্দর বর,
এলে যদি অবিনীর হৃদয় মহলে,
এস এস, বস মম প্রাণ সিংহাসনে!
তুমিই আমার স্বামি; আমি গো তোমার
ধর্ম্মপত্নী; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে!

* * * * *

রোষ কষায়িত নেত্রে, কট মট করি,
রে হিন্দু সমাজ, তুই আমার দিকেতে
সঘনে তাকাস্ কেন? আমি কি কুলটা?
হিন্দুকুল লক্ষ্মী যারা, শুদ্ধ অন্তঃপুরে,
একদিন তরে যারা পতির বিচ্ছেদ
নাহি জানে, থাকে বদ্ধ সংসার পিঞ্জরে,
দুই চারি পুত্র কন্যা পতির ঔরসে
প্রসবিয়া যাহাদের সতীত্বের ভাণ,
তারা সবে সতী লক্ষ্মী! আমি কিন্তু, আমি,
আশৈশব তিল তিল পুড়ি তুষানলে,
এক হাতে স্বাদু ফল অন্ন ও ব্যঞ্জন,
অন্য করে স্বর্ণপাত্রে জাহ্নবীর বারি,
তবু হায় দুর্ভিক্ষের কাঙালীর মত,
নিয়ত শুখায় তালু দারুণ তৃষ্ণায়,
নিয়ত ক্ষুধায় হায় দীর্ণ হয় ছাতি,
আমি হায়, বিনা কোনও অনুযোগ-বাণী,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আছি, সহাস বদনে,
হস্তে ফল উপবাসী লক্ষ্মণের মত,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আমি, এই পিতৃগৃহে,
প্রায় উপবেশ-ব্রতে আমি মহাব্রতী,
আমি নহি জিতেন্দ্রিয়? আমি সুধু হায়
পুণ্যাবিঘ্ন, উলঙ্গিনী, কুলঘ্ন, কুলটা!
তোর এই রামরাজ্যে, রে হিন্দুসমাজ,
হয়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডে সীতার পরীক্ষা!
সে কি তোর নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতি?
সে নয় কি শৌনিকের শোণিত-পিপাসা?
আমি আজি বরমালা, ধর্ম্মে সাক্ষ্য করি,
উপযুক্ত পাত্রগলে দিলাম পরায়ে,
আমার হইল নাম দুষ্টা দ্বিচারিণী!
অবস্তু অলীক আর প্রপঞ্চের মাঝে,
একমাত্র সত্য যাহা আছে ভূমণ্ডলে,
ঘুচাইয়া দেয় যাহা নয়নের ধাঁধা,
মিটাইয়া দেয় যাহা আত্মপর ভেদ,
স্বার্থের অনর্থ ঘট পরশিলে যারে,
হৃদয়ের শূন্যকুঞ্জ যাহার আগমে—
ভরে যায় ফল ফুল পল্লব শ্যামলে,
দেবের প্রসাদ যেই অপার্থিব নিধি,
বিশ্বের পরশমণি হায় যেই প্রেম,
হায় হায় (মর্ম্মকথা কহিব কাহারে?)
তারি নাম অঘ, পাপ, পাতক, কলুষ,
প্রজ্ঞাময় সংসারের শব্দ অভিধানে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

চীনের গল্প। *

চীন পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন সুবৃহৎ সাম্রাজ্য। কালের পরিবর্ত্তনে এবং অভিনব সভ্যতার সংস্পর্শে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা এবং রীতি নীতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, কিন্তু চীন এই পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক আপনার বহু প্রাচীন ভাব এবং পুরাতন সামঞ্জস্য অবিচলিত রাখিয়াছে। চীনে সকলই অদ্ভুত, তাই একজন প্রাচীন লেখক বলিয়াছেন "চীন এমন একটি দেশ যেখানে গোলাপের সৌরভ নাই, শ্রমজীবীদিগের কোন বিশ্রামবার নাই এবং বিচারকগণের আত্মসম্মান জ্ঞান নাই; এখানকার রাস্তায় গাড়ী চলে না, এদেশের জাহাজগুলি কীল (Keel) † বিবর্জ্জিত এবং এখানকার দিক্‌শলাকা দক্ষিণাভিমুখী। দক্ষিণের পরিবর্ত্তে বাম পার্শ্বে উপবেশন করান এখানে সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন, চীনের পণ্ডিতগণের মতে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধারণাশক্তি মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে পাকযন্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে এখানে মস্তকাবরণ উন্মোচন করা অত্যন্ত অভদ্রতা, শ্বেতবস্ত্র পরিধান এখানে শোক প্রকাশের চিহ্ন। ভাষা বিষয়েও কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে, চীন ভাষায় বর্ণমালা কিম্বা ব্যাকরণ নাই।" আজকাল চীনেদের সম্বন্ধে একথাগুলি সম্পূর্ণ না খাটিলেও অনেক পরিমাণে খাটিয়া থাকে। এখনো দেখা যায় এখানকার লোক ঘোড়ার বামদিকে চড়ে; বৃদ্ধেরা ঘুড়ি উড়ায়, মার্ব্বেল খেলে, আর বালকেরা বিজ্ঞের ন্যায় অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে। কোন ভদ্রলোকের সহিত কাহারো সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর করমর্দ্দন না করিয়া ইহারা নিজ নিজ করমর্দ্দন করে। সকল দেশেই দেখা যায় নাম আগে লিখিয়া পরে পদবী লিখিবার নিয়ম কিন্তু এখানে আগে পদবী পরে নাম লেখা হয়। লোকে জুতায় কালি মাখায়, ইহারা প্রাণপণ শক্তিতে জুতা সাদা রাখে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তাঁহার সুস্থাবস্থায় উপহার দিতে হইলে শবাবরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার বলিয়া পরিগণিত হয়। সামাদানের ভিতর বাতি না বসাইয়া চীনের লোকে সামাদানের যে অংশে বাতি বসাইতে হয় সেই অংশটা খুব সরু করিয়া, তাহাই বাতির মধ্যে বিঁধাইয়া দেয়।

---

* নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পত্রিকাগুলির সহায়তায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

(১) Waifs and Strays from the Far East (Trubner and Co.)

(২) Journal of the N. E. Branch of the Royal Asiatic Society

(৩) The China Mail.

(৪) The North China Herald.

(৫) Translations from the Pekin Gazette.

† মানুষের যেমন মেরুদণ্ড, জাহাজের সেইরূপ Keel.

এইরূপ তাহাদের মধ্যে এমন সকল সৃষ্টিছাড়া নূতনত্ব দেখা যায়— যা কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য পৃথিবীর কোন অংশেই খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব।

চীন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে প্রথমে রাজপরিবার হইতেই আরম্ভ করা উচিত। এমন বৃহৎ এবং প্রাচীন রাজবংশ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ; প্রায় চল্লিশ সহস্র নরনারীর ধমনীতে এই রাজরক্ত প্রবাহিত। প্রত্যেক চীনসম্রাট যেরূপ বহু বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের যেরূপ অগণ্য পুত্রপৌত্রাদি জন্মে, তাহাতে রাজবংশের এরূপ বিস্তৃতিতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই চল্লিশ সহস্র জ্ঞাতির মধ্যে চল্লিশ জন মাত্র সম্রাটের বিশেষ বৃত্তিভোগী, অবশিষ্টের সঙ্গে রাজপরিবারের প্রায় কোন সম্বন্ধই নাই;— তাহারা রাজকোষ হইতে মাসিক তিন টাকা হিসাবে বৃত্তি পায় এবং যাহাদের সহিত সম্রাটের সম্বন্ধ বিশেষ নিকট, তাহারাই কেবল সেই সম্বন্ধের নিদর্শনস্বরূপ এক একটি পীতবর্ণ কোমরবন্ধ ব্যবহার করিতে সক্ষম; কিন্তু এজন্য ইহাদের স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের পথে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ১৮৬৩ সালে পিকিনে একজন সামান্য কুলিকে এইরূপ এক কোমরবন্ধ ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছিল। এই সুবিস্তীর্ণ রাজজ্ঞাতিমণ্ডলীর প্রতি এই প্রকার অতি সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাদের এক অসামান্য অধিকার এই যে সাধারণ বিচারকগণ তাহাদের বিচার করিতে পারেন না, তাহাদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু সাধারণ অপরাধী অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যেরূপভাবে দণ্ডিত হয়, ইহাদের প্রতিও সেই ব্যবস্থা।

চীনে নারীজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের কোন প্রথা নাই, কারণ ইহারা স্ত্রীলোককে পুরুষ অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে। ইহাদের আরো বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের আত্মা নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গত বিশ বৎসরেরও অধিককাল সুবিস্তীর্ণ চীনসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড দুইজন রমণীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম রাজনীতি জ্ঞানে ইঁহারা পৃথিবীর কোন পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন। তথাপি এ দৃষ্টান্তে তাহাদের চৈতন্য হয় না, তাহারা বলে সম্ভবতঃ এই দুই রমণী নারীজাতির মধ্যে অসাধারণ। স্ত্রীলোকের যে মস্তিষ্ক বা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকিতে পারে, চীনের লোক তাহা ভাবিতেই পারে না। চীনের ইতিবৃত্তে বীরমহিলার কাহিনীর অভাব নাই, রাজবংশের ইতিহাসে এমন অনেক রমণীর উল্লেখ দেখা যায় যাঁহারা দয়া ধর্ম্ম ও কার্য্যদক্ষতা গুণে বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু চীনবাসীর ভ্রান্ত মত বিচলিত হইবার নহে।

চীন সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন। এখানে এমন লোক অনেক আছেন যাঁহাদের বংশের প্রাচীনত্বের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উত্তর চীনে চেফু নামক একটি বন্দর আছে, সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ৫৪৯ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নির্ভুল পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম। তিনি প্রসিদ্ধ সংস্কারক কনফ্যুসিয়াসের একজন বংশধর এবং এক সুবিস্তীর্ণ জমীদারীর সত্বাধিকারী।

চীন সম্রাটের সম্মানজ্ঞান অত্যন্ত অদ্ভুত। একবার রাজপরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোক একখানি আবেদন পত্র লইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্রাট এই অপরাধে তাঁহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করেন! বিচারক তাঁহার কোন অপরাধ সাব্যস্থ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেন; সম্রাট এ সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া বিচারপতিকে অত্যন্ত অনুযোগ করেন। আর একবার, বর্ত্তমান সম্রাট তাঁহার বাল্যাবস্থার ধাত্রীর ক্রোড়ে স্বর্গীয় সম্রাটদিগের সমাধিক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার অনুচরবর্গ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে সম্রাটের গন্তব্য পথে গাড়ীর চাকার দাগ রহিয়াছে! বলা আবশ্যক এই গাড়ীতে সম্রাটেরই কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্য অন্যত্র নীত হইয়াছিল। তথাপি শকট-চালক অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইল। এই গাড়ী অন্য কোন ভদ্রলোকের হইলে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিত তাহা এই ঘটনা হইতেই বেশ অনুমান করা যায়। মানচু নামক কোন সীমান্ত প্রদেশীয় সেনাপতি সম্রাটের নিকট একবার একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে সামান্য কি একটি বর্ণাশুদ্ধি থাকায়, সম্রাটের আদেশে সেই সেনাপতির এক বৎসরের বেতন বাজেয়াপ্ত হয়। দোষ অবশ্য সেনাপতির অপেক্ষা তাঁহার কেরানীরই অধিক—কারণ পত্রখানি কেরানীরই লেখা, সেনাপতি নামসহি করিয়াছিলেন মাত্র, সুতরাং সেনাপতির এই গুরুতর দণ্ড হওয়ায় তাঁহার কেরানীর পৃষ্ঠে কতবার বেত্রাঘাত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

চীনসম্রাটের অন্তঃপুরে যেরূপ বহুসংখ্যক বস্ত্রাদির প্রয়োজন হয়, তাহা ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এক অক্টোবর মাসে সম্রাটের কেদারাবাহী ভৃত্যবর্গের জন্য ৭১৫ সুট, সম্রাটের মহিষীবর্গের পরিচারিকাদিগের জন্য ৪০০ সুট, সম্রাটের পরিচারকবৃন্দের জন্য ৬৩১ সুট পরিচ্ছদ এবং সম্রাটের নিজ ব্যবহারের জন্য বিশ থান গজ (Gauze), ১২৫ মন মখমল এবং ৫১৬ থান সাটীন প্রাসাদে প্রেরিত হয়।

কনফ্যুসিয়াসের বংশ ভিন্ন কেহই বংশপরম্পরায় জমীদারী ও উচ্চ পদবী ভোগ করিতে সক্ষম নহেন। শুদ্ধ এই বংশের উপাধির উপর সম্রাট হস্তার্পণ করিতে পারেন না; এতদ্ভিন্ন সম্রাটের অঙ্গুলি সঙ্কেতে শত শত ব্যক্তি উপাধি-ভূষিত হইতে পারে, এবং একটি মাত্র কথায় তাহা হইতে বিচ্যুত হয়।

চীনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি রাজদণ্ডাজ্ঞা অতি ভদ্রতার সহিত নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেক সময় বিনা অপরাধেও অনেককে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়; সম্রাট যদি বুঝিতে পারেন যে কোন লোক ক্রমে এমন ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন যে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে বিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সম্রাট তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয় না, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পার্শেল প্রেরিত হয়; ইহার ভিতর একগাছি রেশমের দড়ি এবং একখানি পত্র থাকে, পত্রে এইরূপ লেখা থাকে "আপনার বহুবিধ সদ্গুণের এবং কার্য্যদক্ষতার ফলস্বরূপ

সম্রাট অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার গলদেশে ঝুলাইয়া মৃত্যুলাভ করিবার জন্য এই উপহার প্রেরণ করিতেছেন।"—দণ্ডিত ব্যক্তিকে উত্তর দিতে হয় "এই অনুগ্রহের জন্য সম্রাটকে ধন্যবাদ, তাঁহার অভিপ্রায় শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে।" উপসংহার এমন সাংঘাতিক না হইলে এ প্রকার রহস্য যথেষ্ট কৌতুকজনক হইতে পারিত।

বর্ত্তমান সম্রাট জননী একবার সাংযু নামক একজন সেনাপতিকে কোন কারণে তিরস্কৃত করেন, সাংযু এজন্য রাজমাতার চরিত্র উল্লেখ করিয়া দুই একটি কথা বলেন; বলা বাহুল্য সাংযু অবিলম্বে কারারুদ্ধ হইলেন কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কারাগৃহেই বেশ সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিও ইচ্ছামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। কিছুকাল গত হইলে তিনি মনে করিলেন সম্রাট তাঁহার অপরাধের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মুক্তিলাভের আশায় সম্রাটের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল! আবেদন পত্রের উত্তরে তিনি একটি পার্শেলে একগাছি রেশমের দড়ি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অপমৃত্যুতে মরিতে সাংযুর যথেষ্ট আপত্তি হইল, সুতরাং তিনি রাজ আজ্ঞা পালন করিলেন না; তখন রাজদরবারে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জোর করিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে লটকাইয়া দেওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ, অথচ সম্রাটের ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকিবে না। অনেক বিচক্ষণ কর্ম্মচারী যুক্তি করিয়া অবশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন; এক খণ্ড সমান্তরাল কাঠে একগাছি শক্ত দড়ি ঝুলাইয়া সেই দড়িতে একটি বড় ফাঁস দিয়া রাখা হইল। অনন্তর কর্ম্মচারীগণ অনেক তর্কবিতর্ক করায়, এবং সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ না করা ভাল হইতেছে না ইত্যাকার যুক্তি দ্বারা বুঝানতে সাংযু অবশেষে গলায় ফাঁস দিতে কতক রাজী হইলেন; তখন তাঁহারা তাঁহাকে একটা টুলের উপর উঠাইয়া তাঁহার গলায় সেই ফাঁস প্রবেশ করাইলেন। এবং গলায় দড়িটা একটু আঁটিয়া লাগিলেই সমস্ত যুক্তিতর্কের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এই ভয়ে তাঁহারা সাংযুকে তাঁহার নিজের ইচ্ছায় পদাঘাতে টুল স্থানান্তরিত করিবার কিছুমাত্র অবসর না দিয়া নিজেরাই তাড়াতাড়ী টুলটা সরাইয়া লইলেন। অবলম্বনহীন দেহ হইতে শীঘ্রই প্রাণ বহির্গত হইয়া গেল।

প্রধান লোকের দণ্ডসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম হইলেও সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতি চীনের দণ্ডবিধি আইনের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চীহলি নগরে মেং নামক একজন লোক মদ্য খাইয়া বাড়ী আসে এবং মাতাল অবস্থায় একটা কাঠের মুগুর দিয়া তাহার পিতার পদদ্বয়ে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করে, এই আঘাতে পায়ের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায় এবং এই ঘটনার দশদিন পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। মেং পিতৃহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইল এবং বিচারে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইল।

পিকিন গেজেট চীনের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র। ইহার ন্যায় প্রাচীন সংবাদপত্র

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই; পিকিন গেজেটের প্রথম সংখ্যা ১১৭৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র, বর্ত্তমান কালের মুদ্রাযন্ত্রের এত বিস্তৃতি এবং অন্যান্য বিবিধ সুবিধা সত্বেও এরূপ সুলভ সংবাদ-পত্রের সর্ব্বত্রই প্রচুর অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সংখ্যা পিকিন গেজেটে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

কোন দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারে চারিজন লোক ছিল—উ-সাই নামক একজন অকর্ম্মণ্য, চরিত্রহীন যুবক, তাহার পিতা, স্ত্রী এবং পুত্র। উ-সাই টাকা কড়ির জন্য তাহার পিতা এবং স্ত্রীকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করিত। একদিন বৈকালে সে তাহাদের এক টুকরা জমী বিক্রয় করিবার জন্য স্ত্রীর সম্মতি চাহিল, কিন্তু তাহার স্ত্রী এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে প্রহার আরম্ভ করিল এবং তাহার নিকট হইতে একশত টাকা আদায় করিয়া তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। উ-সাই টাকা লইয়া চলিয়া গেলে তাহার স্ত্রী শ্বশুর ও পুত্রকে জানাইল যে এই হতভাগাকে না তাড়াইলে আর ঘর সংসার কিছু টিকিবে না। বৃদ্ধ উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, এবং পুত্রবধূ ও পৌত্রকে এ প্রস্তাবে সম্মত করিল। সন্ধ্যার সময় উ-সাইএর স্ত্রী একটি থ'লে চুনে বোঝাই করিয়া রাখিল। রাত্রে উ-সাই মাতাল অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে পুনর্ব্বার গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। তাহার স্ত্রী তখন শ্বশুর ও পুত্রকে ডাকিয়া আনিলে বৃদ্ধ উ-সাইএর মাথা চাপিয়া ধরিল—তাহার পুত্র সজোরে পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল; তাহার স্ত্রী তখন সেই চুন পূর্ণ থ'লে তাহার মাথার উপর তুলিয়া মাথায় হড় হড় করিয়া চুন ঢালিয়া দিতে লাগিল, হতভাগ্য মাতাল মুক্তি লাভের আশায় বিস্তর চেষ্টা করিল—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না—অল্পক্ষণ পরে তাহার প্রাণহীন দেহ ভূতলে পতিত হইল।

পরদিন তাহার পিতা তাহার মৃতদেহ সৎকারে সহায়তা করিবার জন্য একজন প্রতিবাসীকে আহ্বান করিতে গিয়া বলিল যে তাহার পুত্র গতরাত্রে অত্যন্ত অধিক মদ্য পান করায় হঠাৎ মারা পড়িয়াছে; কিন্তু এই হঠাৎ মৃত্যুতে মাজিষ্ট্রেটের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উ-সাইএর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন। অপরাধীগণ কারারুদ্ধ হইল, তদনন্তর তাহারা নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিলে উ সাইএর স্ত্রী পুত্রের দেহ প্রকাশ্যভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইল; উ-সাইএর পিতা সত্তরাধিক বৎসরের বৃদ্ধ, তাহার প্রতি একশত বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে সে বেত্রের হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি পাইতে পারিত।

আর একবার একটি বালক মাতৃহত্যা অপরাধে এইরূপ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। বালকটি পাগল, কালা এবং বোবা। কিন্তু চীনে মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত অপরাধীর পক্ষে দণ্ডবিধি আইনের স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা নাই; শুধু তাহাই নহে, উন্মত্ত অবস্থায় যদি কেহ কোন অপরাধ করে তবে অপরাধীর আত্মীয়গণকে পর্য্যন্ত সে জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয়,

কারণ আত্মীয়েরা যদি উন্মত্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হইতে পায় না। পাগলের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আত্মীয়ের একশত বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারে। এই বালকটির কয়েকজন আত্মীয়ও দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায় নাই তাহাদের প্রত্যেককে চল্লিশ ঘা করিয়া বেত খাইতে হইয়াছিল, তবে তাহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া যে লঘু দণ্ড বিধান করা হইয়াছিল তাহার কারণ, পাগল মাতৃহত্যা করিবার পূর্ব্বে একদিনও কাহারো অপকার করে নাই। ঘাতকগণ এই মূক ও বধির উন্মাদের দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহার যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করিল।

চীনের লোক পুলিশকে বেশী ভয় করে না। পুলিশের হস্ত হইতে কোন অপরাধী পলায়ন করিলে পুলিশের লোককে অত্যন্ত কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন হত্যাকারী বিচারালয় হইতে কারাগারে প্রেরিত হইবার সময় দুইজন কনেষ্টবলের হাত হইতে পলায়ন করে; ইহাতে কনেষ্টবলদ্বয়ের প্রত্যেকের একশত বেত্রাঘাত ও তিন বৎসর কাল দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা হয়।

অতি যৎসামান্য অপরাধে চীনে যেরূপ দণ্ডবিধান হইয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

চিহলী নগরে কোন রমণীর পিতামাতাকে কে হত্যা করিয়া যায়। একজন প্রতিবাসীকে সন্দেহ করিয়া স্ত্রীলোকটি স্থানীয় বিচারালয়ে তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল, কিন্তু মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস শুধু উৎকোচের বলেই অপরাধী অব্যাহতি পাইয়াছে, সুতরাং সে পিকিনের বিচারালয়ে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা জানাইল। এই কার্য্যে তাহার একটু ভুল হইয়াছিল, কারণ পিকিনের পরিবর্ত্তে প্রথমে 'প্রভিন্সিয়াল কোর্টে' পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করা উচিত ছিল। এই ভ্রমের জন্য তাহার আবেদন অগ্রাহ্য উপরন্তু তাহাকে পঞ্চাশ ঘা বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইল! কিছু দিন পূর্ব্বে একজন ইংরাজ কাষ্ঠব্যবসায়ী হংকংএ চীনসম্রাটের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট ৬৩০০০ টাকার কাষ্ঠ বিক্রয় করেন, কাষ্ঠ-বিক্রেতার দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রেতা ভ্রমক্রমে বিলে ৬৩০০০ টাকার পরিবর্ত্তে তিন লক্ষটাকা লিখিয়া ফেলেন, ক্রেতার এই ভ্রমের জন্য বিক্রেতাকে বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল।

নানকিন নগরে লিউ নামক একজন পুলিসের দারোগা ছিল। আসামীকে 'একরার' করাইতে তাহার মত উপযুক্ত দারোগা সে প্রদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। যখন লিউর প্রতিপত্তি খুব বেশী, সেই সময় নানকিন ও তাহার নিকটবর্ত্তী নগরগুলিতে অত্যন্ত দস্যুভয় হয়; সকলেই বুঝিতে পারিল এই সমস্ত কাণ্ড মেংরয়ের ভিন্ন আর কাহারো নহে। মেংর যেমন সাহসী তেমনি নিষ্ঠুর, কোন অপকর্ম্মই তাহার অসাধ্য ছিল না; কিন্তু তাহাকে ধৃত করা পুলিসের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। যাহা হউক অনেক চেষ্টার পর সে ধৃত হইল

এবং তাহার অপরাধ 'একরার' করাইবার জন্য তাহার প্রতি যথাসাধ্য উৎপীড়ন চলিতে লাগিল; কিন্তু মেংর স্থির নিশ্চল! পুলিশের সকল কর্ম্মচারী বিফল মনোরথ হওয়াতে অবশেষে তাহারা মেংরয়ের অপরাধ 'একরার' করাইবার ভার লিউর হস্তে সমর্পণ করিল। লিউ মেংরয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, খানিকটা তামা গলাইয়া সেই জ্বলন্ত দ্রব ধাতু তাহার গায়ে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সে অবিচলিত ভাবে বসিয়া আছে; দেখিয়া লিউ পরিহাসচ্ছলে মেংরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠাণ্ডা?" মেংর শান্ত ভাবে উত্তর করিল, "মন্দ নয়।"

লিউ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "মদ খাবে?"

মেংর বলিল "পাইলে খাই বৈ কি? খানিক হোসিউ মদ দিতে পার"—হোসিউ মদ্যের বর্ণ শ্বেত, এবং ইহা অত্যন্ত তীব্র। লিউর ইঙ্গিত অনুসারে মেংরকে প্রচুর পরিমাণে সেই মদ্য দেওয়া হইল। লিউর বোধ হয় অভিপ্রায় ছিল, তাহাকে মদ খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে সকল কথা বাহির করিয়া লইবে। মদ খাইয়া মেংর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বড় ঠাণ্ডা; মদ কি রকম ক'রে গরম করে তা দেখ।" তাহার পর যে উনানে তামা গলান হইতেছিল, সে সেই উনান হইতে দুইখানি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া, তাহার উভয় হাঁটুর উপর রাখিয়া তাহাতেই মদের বাটি গরম করিতে লাগিল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে হাঁটুর মাংস পুড়িয়া হাড় বাহির হইয়া পড়িল। তখন সে অবজ্ঞাভরে লিউর দিকে চাহিয়া বলিল "দেখ, ইহাতেও আমার যাতনা নাই, তামা গালাইয়া আমার গায়ে ঢালিয়া কি করিবে? নিশ্চয় জানিও ইহাতে কোন ফল হইবে না।" লিউ বেচারার ত একেবারে চক্ষুস্থির! তাহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই, খানিক অবাক্ হইয়া থাকিয়া তাহার পর সে এই অসাধারণ প্রাণীকে সবিনয়ে বলিল, "আমি তোমাকে 'একরার' করাইব এই রকম প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু 'একরার' করাইবার প্রধান যন্ত্র যে উৎপীড়ন, তাহার দ্বারা তোমার কিছু হইবে না; সুতরাং আমি হতাশ হইয়াছি। আমার সম্ভ্রম সমস্তই তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম, যদি তুমি রক্ষা কর তবেই তাহা রক্ষা হইবে, নতুবা নহে।" এই অভিনব উপায়ে আশাতীত ফল লাভ হইল। মেংর অল্প হাসিয়া উত্তর করিল "লিউ, তুমি লোক মন্দ নও, কিন্তু আজও তুমি দারোগা হইবার যোগ্য হও নাই।"

তাহার পর মেংর তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণের জন্য কিরূপে তের বার দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা করিয়াছে, তাহাই একে একে বিবৃত করিল, এবং উপসংহারে কহিল, যে অপরাধের 'একরার' করাইবার জন্য তাহার প্রতি উৎপীড়ন চলিতেছে, তাহা সে করে নাই। মেংরএর এই কথা সকলে বিশ্বাস করিলেও সে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইল না; লিউর নামে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল।

চীনে জাল জুয়াচুরীর সংখ্যাও বড় অল্প নহে। সময়ে সময়ে তত্রত্য সংবাদ-পত্রে যে সমস্ত আশ্চর্য্য জুয়াচুরীর গল্প প্রকাশিত হয়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এই ক্ষুদ্র চক্ষু, দীর্ঘ

শিখাধারী, ঢিলে পায়জামা পরিহিত মনুষ্য গুলিকে যতই শান্ত শিষ্ট দেখাক্, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা ধূর্ত্ততায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অতি বিখ্যাত জুয়াচোরদিগের সমকক্ষ। কিছু দিন পূর্ব্বে China Mail নামক সংবাদপত্রের পুলিশ রিপোর্ট স্তম্ভে এক আশ্চর্য্য জুয়াচুরীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। লু-এ-ন নামক একজন ফেরিওয়ালা ক্যাণ্টন নগরের বাজারে বাস করিত। একদিন রাত্রে তাহার ঘর হইতে বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা ও কাপড় চুরী যায়। সে হৃত সামগ্রী পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, এমন কি, পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না! অবশেষে কোন কাপ্তেনের মক-এ-চেউক নামক এক চাকর তাহাকে বলিল যে, সে তিন টাকা পাইলে ভেল্‌কী দ্বারা চোরের সন্ধান বলিতে পারে। চোর ধরিতে পারিলেই জিনিষ পাইবার আশায় লু-এ-ন তাহাকে আহ্লাদের সহিত তিন টাকা দিতে সম্মত হইল! অনন্তর সেই ভেল্কীওয়ালা এক বাটি জল এবং একখানা আরসী লইয়া আসিল এবং ঐ আরসী জলের মধ্যে ডুবাইয়া খানিক কাগজ পোড়ানর পর সেই আরসীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া এমন গম্ভীর ভাবে দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র সকল আওড়াইতে লাগিল যে সকলেরই অনুমান হইল এবার নিশ্চয়ই চোর ধরা পড়িবে। কিয়ৎকাল এইরূপ করিতে করিতে সে ল-এ-নু কে বলিল যে, সাদা পায়জামা ও কাল কোট পরা, আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়সের একজন লোকের চেহারা আরসীর ভিতর দেখা যাইতেছে; লু-এ-ন ব্যগ্রভাবে আরসীর দিকে চাহিল কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, তখন ধূর্ত্ত মক-এ- চেউক বলিল যে ছেলে মেয়েরা ভিন্ন অধিক বয়স্ক লোকে ইহা দেখিতে পাইবে না, তাই সে একটি বালিকাকে ডাকিয়া আনিল এবং মন্ত্রপূত জলে তাহার চক্ষু ধৌত করিয়া দিলে বালিকা আরসীর দিকে চাহিয়া পূর্ব্ববর্ণিত লোকটিকে দেখিতে পাইতেছে" এরূপ বলিল। তাহার পর মক-এ-চেউক তিনটাকা লইয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু ল-এ-নু কিছুতেই চোর কিম্বা অপহৃত দ্রব্য কিছুরই সন্ধান পাইল না, তখন সে মক্-এ-চেউকের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। যে বালিকা আরসীতে কাল কোট, সাদা পায়জামা পরা চোরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিল তাহারও সাক্ষী লওয়া হইল। এই বালিকার নাম আলুই, বয়স বার বৎসর। আলুই বলিল আরসীতে চোরকে চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল, তাহার হাতে একটা বাণ্ডিল ছিল, ছাতা কিম্বা পাখা ছিল না। ক্রমে প্রকাশ হইল যে এই বালিকা সেই ভেলকিওয়ালা মক-এ-চেউকের আত্মীয় কন্যা; সম্ভবতঃ সে বালিকাকে এইরূপে শিখাইয়াছিল। বিচারক মক-এ-চেউকের প্রতি দুই মাসের জন্য শ্রীঘরের ব্যবস্থা করিলেন।

চীনের লোক পিতামাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করে, পিতৃ মাতৃভক্তির দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ইহারা বিশ্বাস করে যে পিতামাতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে পুত্র কন্যা যদি নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া রুগ্ন পিতামাতার জন্য সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া দেয় তবে তাহারা নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে। শরীরের মাংস কাটিয়া সুরুয়া প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। পিকিন-গেজেটে মধ্যে মধ্যে পিতৃ মাতৃ-ভক্তির আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য

গল্প প্রকাশিত হইয়া থাকে। চীনে আর একটি বিশ্বাসও খুব প্রবল; পুত্র কন্যা আপ-নাদের পরমায়ুর অংশ দান করিয়া পিতামাতাকে দীর্ঘজীবী করিতে পারে চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। এ সম্বন্ধে এক সংখ্যা পিকিন গেজেটে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, এই গল্পটি পাঠ করিলে একদিকে যেমন চীনে কুসংস্কারের প্রবল আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে সেইরূপ অসাধারণ পিতৃ মাতৃ-ভক্তির নিদর্শন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

একটি রমণীর কঠিন পীড়া হইলে তাঁহার সো নামক অল্প বয়স্ক পুত্র আপনার পরমায়ু হ্রাস করিয়া মাতার আয়ু বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। সুখের বিষয় সে রমণী সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে সেই স্ত্রীলোকটির জীবন পুনর্ব্বার সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল, সো উপায়ান্তর না দেখিয়া মাতার আরোগ্য কামনায় নিজের বাহুমূল হইতে মাংস কাটিয়া মাতার জন্য ব্রথ প্রস্তুত করিল, কিন্তু এবার সে কিছুতেই মাতাকে রক্ষা করিতে পারিল না, রমণীর মৃত্যু হইল। এ দিকে যুবক তাহার হস্তের মাংস এত প্রচুর পরিমানে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, যে সে ক্ষত কোন প্রকারেই আরোগ্য হইল না; এক বৎসর কষ্টভোগের পর তাহারও মৃত্যু হইল। এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল, তিনি এই যুবকের অপূর্ব্ব মাতৃ-ভক্তির স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তাহার এক সুদৃশ্য সমাধিস্তম্ভ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

চীনের যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান চাকরী পাইবার উচ্চাভিলাষ রাখে তাহাদিগকে ত্রৈবার্ষিক প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, এই পরীক্ষা প্রতিবৎসরই গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু চীনের কোন কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইলে ছাত্রদিগকে যেরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়, তাহা শুনিলে মনে অবিশ্বাস জন্মে। কিছুদিন পূর্ব্বে হুনান প্রদেশে কয়েকজন পরীক্ষার্থী কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে চারিজনের বয়স ৯০ বৎসরেরও অধিক এবং ১৬ জন অশীতিপর। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কোয়াসিং প্রদেশের পরীক্ষার্থীগণ সে বৎসর বার্দ্ধক্যের সম্মানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের চারিজনের বয়স যথাক্রমে, ৯৮, ৯৭, ৯২ এবং ৯১। ৯৭ কি ৯৮ বৎসরের বৃদ্ধের যে 'একজামিন পাশ' করিবার সখ হয়, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রজীবী এবং সাংসারিক জ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তির নিকট এ সম্বাদ শুধু অবিশ্বাস্য নয় প্রচুর হাস্যজনক, ও এত বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐহিকের কোন কাজ হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত দীর্ঘ চেষ্টাসাধ্য পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাঁহাদের নামে তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও গৌরব লাভ করেন; বোধ হয় আমাদের দেশের বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি মহাশয়দিগের বংশধরেরা যেমন সেইরূপ। এতদ্ভিন্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ উচ্চ উপাধি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত রাজসম্মান লাভ করিয়া অন্তিমকালের কয়েকটি দিন সুখে অতিবাহিত করেন।

চীনের প্রণয় এবং বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি গল্প বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক প্রবেশ না করিলেও এখানে যুবক যুবতী-গণের মধ্যে স্বাধীন প্রণয় এবং পূর্ব্বরাগের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা স্বাধীনভাবে স্ত্রী বা স্বামী মনোনীত করিতে পারিলেও বিবাহে পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক। এমনও দেখা যায়, অনেক কুমারী কোন কারণে ইচ্ছানুরূপ বিবাহ করিতে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হোয়েনসাও নামক একজন ভদ্রলোক পিকিনে বাস করি-তেন, তাঁহার একটি বাক্‌দত্তা কন্যা ছিল; বিবাহের পূর্ব্বেই হঠাৎ তাহার ভাবী পতির মৃত্যু হইলে বালিকা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করে কিন্তু প্রিয়বিরহসন্তাপ দীর্ঘকাল সহ্য করিতে না পারায় কিছু পরে সে বিষপানে আত্মহত্যা করিল। সম্রাট তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শ-নের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে পুটংএর চাও নামক একটি যুবকের সহিত কোন ভদ্র পরিবারস্থ একটি বালিকার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। বাক্‌দানের অল্পকাল পরেই যুবক প্রাণত্যাগ করে; বালিকা এই সংবাদ শুনিয়া তাহার লোকান্তরিত প্রিয়তমের মৃতদেহ দর্শনের জন্য এত চঞ্চল হইয়া উঠিল যে সমস্ত বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক সে সেই যুবকের মৃতদেহ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া গভীর শোকভরে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াও সে আর পিতৃগৃহে পদার্পণ করে নাই, চাওর পিতামাতার সহিতই বাস করিতে লাগিল। পাঁচ বৎসর পরে সেই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মৃত্যু হইলে, তাহাদের মৃতদেহের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, সে একাকী তাহাদের গৃহের রক্ষক স্বরূপ হইয়া রহিল, কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় তাহাকে অধিক কাল কাটাইতে হয় নাই। এই সময় চীনে এক ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, বিদ্রোহী দল ক্রমে পুটংএ প্রবেশ করিলে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল; তখন এই বালিকা তাহার অরক্ষিত অবস্থায় বিদ্রোহীদলের হস্ত হইতে কিরূপে সম্মান রক্ষা করিবে ভাবিয়া বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সে তাহার সমস্ত অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, শরীরে স্থচ বিঁধাইয়া, সে সকল বেশভুষা সর্ব্ব শরীরের সহিত সুতারদ্বারা গাঁথিয়া ফেলিল এবং তাহার পর বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। পরদিন লুণ্ঠনপ্রিয় বিদ্রোহীদল উপস্থিত হইয়া এই সুন্দরী বালিকার কমনীয় দেহ ধূলিধূসরিত দেখিতে পাইল, তাহার ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করা দূরের কথা, তাহারা বালিকার অকলঙ্ক, পবিত্রদেহ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক সসম্মানে সমাহিত করিল।

চীনের আর একটা রহস্যপূর্ণ বিবাহের গল্প এই ঃ—

একটি প্রধান নগরে শ্রীমতী ওয়াং নামক এক বিধবা বাস করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। এই নগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে লিউ নামক একজন ভদ্র লোকের বাস ছিল, তাঁহারও এক পুত্র এবং এক কন্যা। এই দুই পরিবারে বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর করিবার জন্য লিউর পুত্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিধবার কন্যার

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। বাক্‌দান পর্য্যন্ত হইয়া গেল। বিবাহের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময় লিউর পুত্র হঠাৎ কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইল, এই পীড়া আরোগ্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং কন্যার মাতা এই সম্বন্ধভঙ্গের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু লিউ এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধ ভঙ্গের কথা দূরে থাক, শ্রীমতী ওয়াংকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার বাক্‌দত্তা কন্যাকে যেন একবার তাহার ভাবী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠান হয়। এ প্রস্তাবে শ্রীমতী ওয়াংএর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাবশতঃ তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটি পরিচারিকা ছিল, সে প্রস্তাব করিল, যখন লিউ কিম্বা তাঁহার পরিবারস্থ কেহই এই কন্যাকে দেখেন নাই, তখন তাহার পরিবর্ত্তে পুত্রকে স্ত্রীবেশে পাঠাইলেও চলিতে পারে। এই প্রস্তাবই গৃহীত হইল। শ্রীমতী ওয়াং তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে বস্ত্রালঙ্কারে রমণীর ন্যায় সজ্জিত করিয়া পরিচারিকার সহিত লিউর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। স্ত্রীবেশে তাহাকে এতই সুন্দর দেখাইতেছিল, যে সে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে বলিয়া কাহারো বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয় নাই; তবে সে পুরুষ, তাহার পদদ্বয় পুরুষোচিত বৃহৎ, সুতরাং চীন রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য যে পদদ্বয়ের অসাধারণ ক্ষুদ্রতা, কেবল তাহারই অভাব হইয়াছিল; কিন্তু সে জন্য কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। ছদ্মবেশী বালক লিউর গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহার পীড়িত পুত্রের রোগশয্যাপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক বিশেষ যত্নের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাহারা গৃহে আসিবার উপক্রম করায় লিউর পরিবারবর্গ বলিলেন যে অন্ততঃ তিনদিন তাহাদের সেখানে থাকিতে হইবে। কিন্তু লিউর কন্যা ছদ্মবেশী ওয়াং পুত্রের সরলতা ও সৎব্যবহারে এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে সে কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না; এদিকে ঝি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল, সুতরাং সে বলিল "আপাততঃ থাকিয়া কোন ফল নাই, বিশেষ বর এখন শয্যাগত।" এই কথা শুনিয়া লিউর কন্যা উত্তর করিল "আচ্ছা, দাদা যখন পীড়িত, তখন দাদার সঙ্গে এখন বিবাহ হইয়া কাজ নাই; দাদার হইয়া আমিই বিবাহ করিতেছি, কাজটা আগেই সারিয়া রাখা হউক।" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাহারো কোন প্রতিবাদ টিঁকিল না। লিউর কন্যা পুরুষোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইল, (কারণ সে তখন তাহার দাদার প্রতিনিধি) এবং তাহার সহিত কন্যাবেশী ওয়াং-পুত্রের সৌষ্ঠবসহকারে বিবাহ হইয়া গেল। অনেক দিন পর্য্যন্ত রহস্য ভেদ হইল না; পরে লিউর পীড়িত পুত্র আরোগ্য লাভ করিলে ওয়াং কন্যার সহিত যখন তাহার বিবাহ হইল তখন এই ছদ্মবেশের বৃত্তান্ত সকলে অবগত হইয়া বিশেষ আমোদ বোধ করিল, কিন্তু ইহাতে সেই কৌতুকজনক বিবাহে আবদ্ধ দম্পতিযুগলের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

আমাদের দেশের ন্যায় চীনেও ঘটক এবং ঘটকীর বিশেষ দৌরাত্ম্য আছে। এক

এক সময় তাহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে। এক বুদ্ধিমতী ঘটকী একটি 'কনের' সাহায্যে কিরূপে বিলক্ষণ দু টাকার সংস্থান করিয়া লইয়াছিল—তাহার গল্প নীচে প্রকাশ করা গেল।

সাংহাই প্রদেশে একটি কনে ছিল। চীনেদের রুচি অনুসারে শারীরিক গঠন যেরূপ হইলে সুন্দরী বলা যায়—সেই অতি ক্ষুদ্র দুখানি পা, ছোট ছোট মিট্‌মিটে দুটি চক্ষু প্রভৃতি কিছুরই তাহার অভাব ছিল না; কিন্তু তথাপি কোন বিশেষ কারণে তাহার বর না যুটায়, অবশেষে তাহার প্রতি এক ঘটকীর অনুগ্রহ হইল, এবং এই কনের সাহায্যে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় ঘটকী তাহাকে নিজের বাড়ী লইয়া গেল। তাহার পর তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া ঘটকী বর খুঁজিতে বাহির হইল এবং অল্প অনুসন্ধানেই একটি বর পাওয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বর কনে দেখিতে আসিলে সে এমন করিয়া কনের মুখ চিত্রিত করিল ও পরিচ্ছদাদিতে তাহাকে এত সুসজ্জিত করিল যে কনে দেখিয়া বর মোহিত হইয়া গেল। ঘটকীও সুবিধা বুঝিয়া দুই শত টাকা চাহিয়া বসিল। বরটি দোজ বরে, দুই শত টাকার জন্য এমন সুন্দরী কনে হাতছাড়া করা সে কিছুতেই বিহিত জ্ঞান করিল না; সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে ঘটকীর প্রার্থিত টাকা দান করিল। যথাসময়ে বিশেষ সমারোহে বিবাহ শেষ হইলে কনে বাড়ী লইয়া গিয়া বর বেচারীর হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। কনের এত সৌন্দর্য্য তাহার নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল; কারণ গৃহে ফিরিয়া সে নববিবাহিত পত্নীকে মনের আবেগে নানা প্রিয় সম্বোধনে ডাকিতে আরম্ভ করিলে, কনে প্রথমে অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তের ন্যায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিছুতেই সে হাসি নিবৃত্ত হয় না। কনে যে পাগল ইহা বুঝিতে বরের তিলমাত্র বিলম্ব হইল না, তাহার প্রেমের মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। সে বালিকাকে ঘটকীর নিকট ফেরত দিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে এই বালিকাও সেই দুই শত টাকা উভয়ই তাহাকে উপহার দেওয়া গেল।

ঘটকী পূর্ব্ব হইতেই এরূপ উপহারের প্রত্যাশা করিতেছিল। পরদিন সে অন্যত্র এই বালিকার সম্বন্ধ করিল। এই বরের বাড়ী ইয়ামেনে, কোন দূরবর্ত্তী নগরে সে একটি সামান্য চাকরী করিত; ঘটকীর সহিত তাহার ৫০ টাকা রফা হইল, এবং ঘটকী টাকাগুলি অগ্রেই হস্তগত করিল। এমন সময় এক নাপিত আসিয়া নগদ আড়াই শত টাকা গুনিয়া দিয়া বালিকাকে লইয়া প্রস্থান করিল। এই নাপিতের স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পুত্রাদি না হওয়ায় বংশরক্ষার্থ সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্যই এই বালিকাকে ক্রয় করিল। কনে এইরূপে হাতছাড়া হওয়ায় ইয়ামেনের সেই বর ক্রোধভরে ঘটকীকে তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং তাহার নামে নালিশ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল; ঘটকী তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি সেই হতাশ বরের বিষণ্ণ মুখমণ্ডলের উপর সংস্থাপিত করিয়া, অল্প হাসিয়া বলিল "বাইড-এ-উই" অর্থাৎ "দুই একদিন অপেক্ষা কর", তাহার পর সেই কনেই যে তাহাকে

দিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনাও জানাইল। ঘটিলও তাহাই। পরদিনই সেই নাপিত ক্রোধভরে কনেকে ঘটকীর নিকট ফেলিয়া বলিয়া গেল "আমার আড়াইশ টাকা যায় সেও স্বীকার, আমি এমন পাগলের মুখ দেখিতে চাহি না।" ধূর্ত্ত নাপিতের এমন পরাজয় আর কোন দেশের ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ। ইয়ামেনের সেই বর এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আর কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়াই সেখান হইতে চম্পট দিল। এমন সময় অন্য একটি ঘটনা ঘটিল। ইয়ামেনের আর একজন লোক এক পত্নীতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কনে খুজিতে ছিল। তাহার স্ত্রী বিবাহে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্যতার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ঘটকীকে অনেক টাকা দিয়া এই কনে লইয়া গেল। কনে দেখিয়া তাহার স্বামীর বেশ পছন্দ হইল এবং দুই একদিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু কনের গুণ প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না; বর বেচারা তাহার পাগলামীতে অস্থির হইয়া পড়িল এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কাতরহৃদয়ে তাহার প্রথমা স্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করিল, তাহার স্ত্রী কনেকে ঘটকীর হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া আসিল। ইহার দুই একদিন পরেই এক বিবাহাকাঙ্ক্ষী রূপমুগ্ধ পর্য্যটক ঘটকীকে অনেক টাকা দিয়া এই বালিকাকে বিবাহ করিয়া বহু দূরবর্ত্তী হুচাও নগরে লইয়া গেল, কিন্তু তাহাকেও শীঘ্র এ কনে ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল; এইরূপে ঘটকী অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া ফেলিল।

বিবাহ সম্বন্ধে চীনের আর একটি গল্পের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। এইটির উপসংহার ভাগ কিছু অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ, তথাপি ইহাতে চীনের পল্লীবাসী সামান্য লোকের হৃদয়ভাব বেশ চিত্রিত হইয়াছে।

কোন গ্রামে দুই ভাই বাস করিত, তাহারা বড় গরীব। ছোট ভাই বড় ভাইকে বলিল "দাদা, তোমার বয়স ত দুকুড়ি পার হো'ল, বিয়ে কর না কেন। বাপ, বড়বাপের নামটা রাখাত দরকার; আর যাই হোক ছেলে পিলে না থাকলে বুড় বয়সে পুষবে কে?" বড় ভাই সবিষাদে উত্তর করিল "আর ভাই বিয়ে, সাধে কি বিয়ে করিনে? বিয়ে হয় কি দিয়ে?"—ছোট ভাই বলিল "কেন? আমাকে বিক্রী ক'রে যে টাকা পাওয়া যায় তাতে কি তোমার বিয়ে হতে পারে না?" বড় ভাই গর্জ্জন করিয়া বলিল "কি? ভাই বিক্রী করে স্ত্রী কেনা, সে আমাকে দিয়ে কক্ষণো হবে না; টাকা হলেই স্ত্রী যুটবে কিন্তু ভাই আর মিলবে না।" একজন ধনবান প্রতিবাসী তাহাদের এই কথোপকথন শুনিতে পাইয়া একদিন তাহাদের দুই ভাইকে ডাকাইলেন এবং ছোট ভাইকে দাসরূপে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বড়র বিবাহের জন্য ত্রিশ টাকা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনেক আপত্তির পর বড় ভাই এ প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং টাকা লইয়া অপ্রসন্ন মনে বিবাহ করিতে গেল। ছোট ভাই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সেই ধনবান ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিল।

বড় ভাই বিবাহ করিয়া স্ত্রী ঘরে আনিল। কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল "শুনেছি তোমরা দুভাই, তোমাকে দেখ্‌চি, আর একজন কৈ?" চাষা প্রিয়তমার প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিল "প্রেয়সি, আমি তাকে বিক্রী করেছি, তাকে বিক্রী না ক'রলে কি তোমাকে ঘরে আনা আমার সাধ্যি ছিল?"—এই কথা শুনিয়া কৃষকপত্নী বিশেষ দুঃখিত হইল এবং একদিন পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া পিতার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া, তাহার দেবরকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যে পণ লাগিবে তাহাই চাহিল। সেই ব্যক্তির অবস্থা মন্দ ছিল না, কন্যার কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহাকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিল। তখন সেই রমণী সহর্ষ মনে স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিছানার নীচে একটি বাক্স টাকা রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিল। ইতিমধ্যে মুদ্রাসমেৎ সেই বাক্স অপহৃত হইল। কার্য্যকালে বাক্স না পাইয়া এবং টাকা পুনঃপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া স্ত্রীলোকটি মনোকষ্টে গলায় দড়ি দিল। অনন্তর তাহার মৃত্যু হইয়াছে বিবেচনা করিয়া আত্মীয়গণ তাহার দেহ সমাহিত করিতে লইয়া গেল; সেই স্ত্রীলোকটির এক বিধবা ননদও (সে তাহার ভ্রাতৃগৃহেই থাকিত) শোকচিহ্নসূচক শ্বেত বস্ত্রখণ্ড কপালে জড়াইয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবের সঙ্গে চলিল। কিয়ৎ-দূর যাওয়ার পর তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল; এবং ভয়ানক মেঘ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত ও ঘন ঘন বিদ্যুতালোকে গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সহসা সেই বিধবা ননদের মস্তকে বজ্রপাত হইল! বজ্রাঘাতে সে ভূপতিত হইবামাত্র তাহার বক্ষঃস্থলের বস্ত্রান্তরাল হইতে সেই টাকার বাক্স বাহির হইয়া পড়িল। এদিকে কঠোর বজ্রধ্বনিতে মৃতপ্রায় রমণীর প্রাণে লুপ্ত চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে গাত্রোত্থান করিয়াই পিতৃদত্ত টাকা দেখিতে পাইল এবং তাহা কুড়াইয়া লইয়া মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিল। যে শবাবরণে তাহাকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সঙ্গের লোকজন তাহাতেই তাহার বজ্রাহতা ননদকে পুরিয়া সমাহিত করিয়া আসিল। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত চাষা দুই ভাই বহুদিনের পর পুনর্ব্বার পরস্পর সম্মিলিত হইল এবং তাহাদের মিলনের আনন্দপ্রবাহে ভগিনীর মৃত্যুশোক ধৌত হইয়া গেল।

চীনেদের সম্বন্ধে এইরূপ শত শত গল্প, তদ্দেশীয় ইতিহাস এবং সাময়িক পত্রিকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে, অতএব আমরা এ প্রস্তাব এখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির।

(১)

প্রতিষ্ঠা।

ইংরাজী ভাষাতে যাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই গ্রীণ্‌-উইচ্‌ মানমন্দিরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। জ্যোতিষাম্বধ্যায়ীবর্গের পক্ষে এই মানমন্দির একটী মহাতীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে ; যতদূর পর্য্যন্ত ইংরাজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে তাহার সর্ব্বত্রই গ্রীণ্‌উইচ্‌ হইতে স্থান সমূহের 'দেশান্তরা' গণনা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতে উক্ত মানমন্দিরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জ্ঞাত থাকাতে, একদা সাতিশয় কৌতূহল-পরবশ হইয়া তদ্দর্শনে যাইবার মনস্থ করিলাম। কিন্তু স্বর্গধামের যাত্রীদিগকে যে প্রকার পুণ্যের আবরণে আত্মাকে সজ্জিত করিয়া যাইতে হয় ; গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দিরে প্রবেশার্থী-দিগকেও তদ্রূপ আবরণে শরীর ও মনকে সজ্জিত করিতে হয়। (গ্রীণ্‌উইচ্‌ ভারতবর্ষীয় তীর্থ-সমূহের ন্যায় নহে যে, কোন ব্যক্তি পাণ্ডাদিগকে অর্থ দান দ্বারা দেবদর্শন লাভ করিতে পারিবে, তথায় দর্শনার্থীদিগকে বিদ্যার্থ দ্বারা পাণ্ডা বিদায় করিতে হয়।) মানমন্দিরের নিয়মাবলীতে রহিয়াছে—

"(১) যাঁহারা British Royal Navyর অন্তর্ভূত, তাঁহারা ঐ মানমন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন।

"(২) যাঁহারা Board of Admiralty * কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ বা অনুমতি প্রাপ্ত, তাঁহারা ঐ মানমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন।"

"(৩) যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চাতে ও তদুৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত বলিয়া Board of Admiralty অথবা Royal Societyর কোন সভ্য কর্ত্তৃক Astronomer Royal-এর নিকটে পরিচিত হইয়া থাকেন, Astronomer Royal-এর উচিত বোধ হইলে, তাঁহারা ঐ মান-মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন।"

আমি হীনপ্রাণ অবৈজ্ঞানিক বাঙ্গালী ইহার মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইতে পারি কি না তাহা হৃদ্বোধ করিতে অক্ষম হইয়া আমার জনৈক বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণার্থ লণ্ডনে গমন করিলাম। এই বন্ধুটী Board of Admiraltyর জনৈক সভ্য, এবং বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ও আবিষ্ক্রিয়াতে ইঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন ইনি—Royal Societyর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য। অতএব সর্ব্বত্র তাঁহার হাত আছে জানিয়া আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন যে আমার পক্ষে প্রথম দুই সংখ্যক শ্রেণীতে

ভুক্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ Board of Admiraltyর আমাকে অনুমতি দেওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। তবে তিনি আমাকে তৃতীয় সংখ্যক শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু 'তদ্দ্বারা তিনি আমাকে যে পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছেন আমি যেন ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার অবমাননা না করি!' আমি তখন তীর্থযাত্রীসুলভ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলাম অতএব ঐ প্রতিশ্রুতি চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া বন্ধুবরের অনুরোধ-পত্র প্রাপ্ত্যর্থ প্রার্থনা করিলাম এবং তৎসাহায্যে অচিরে মানমন্দির দর্শনে যাইতে মনস্থ করিলাম। এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির একটী 'দৃশ্যমন্দির' নহে; ইহা এক বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, কার্য্যসাধন এবং তাহাতে সিদ্ধি লাভই ইহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংলণ্ডে ঐ মানমন্দিরই সর্ব্ববিষয়ে একমাত্র আদর্শমন্দির হওয়াতে জ্যোতিষীগণ প্রায়শঃই তাহা দেখিয়া স্ব স্ব কার্য্যবিষয়ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে অনেক ধনী কিম্বা বিদ্যার্থী লোক স্ব স্ব আবাসে মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, এবং প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই এক একটী মানমন্দির সংশ্লিষ্ট আছে। কেম্ব্রিজে তিনটী মানমন্দির আছে। এই সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর মানমন্দিরের অধিকারীগণ গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দিরকে আদর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় মানমন্দির রচনা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে উক্তবিধ বিদ্যোৎসাহীবর্গের সুবিধা ও সাহায্যার্থ, তাঁহারা যাহাতে গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির পরিদর্শন করিতে পারেন সেজন্য একটী সময় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য মানমন্দির খোলা থাকিলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে সেইরূপ অপর দিকে মানমন্দিরের কার্য্যেরও বহু প্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত হইয়া থাকে; এইহেতু পরিদর্শন প্রয়াসী দিগকে উপরোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যদি এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দ্বারাও কোন বিদ্যার্থী মানমন্দিরে প্রবেশ করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে তজ্জন্য আরও একটী বিশেষ বিধান এই রহিয়াছে যে, উক্ত প্রকারে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপন সমভিব্যাহারে তাঁহার দুইজন বন্ধুকে তথায় লইয়া যাইতে পারেন। সাধারণের পক্ষে এই নিয়ম কঠোর প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এতদুপলক্ষে আমার একটী গল্প মনে পড়িতেছে। আমি যখন কেম্ব্রিজে ছিলাম তখন একদা তত্রত্য মানমন্দিরের অধ্যক্ষ প্রোফেসর আডাম্‌স্‌ (ইনি 'বরুণ' গ্রহের অন্যতম আবিষ্কর্ত্তা) গল্পচ্ছলে আমাকে বলিয়াছিলেন যে একদিন কয়েকটী যুবতী ভদ্রমহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, ক্রমে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা মানমন্দির দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে Prof. Adams স্বয়ং তাঁহাদিগকে যন্ত্রাদি দেখাইতে লইয়া যান। যৌবনসুলভ কৌতূহল ও নির্ভীকতা বশতঃ যুবতীগণ ঐ মান-মন্দিরের সুবৃহৎ Equatorial যন্ত্র দ্বারা কি দেখা যায় তাহা দেখিতে চাহিলেন। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পশ্চিম গগনে শুক্রগ্রহ দীপ্তি পাইতেছিল, প্রোফেসর মনে করিলেন শুক্রগ্রহকে যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্রের ন্যায় বৃহদাকার ও কলাপরিবর্ত্তনশীল দেখিলে

তাঁহারা সন্তুষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন ; অতএব তাহার দিকে দূরবীক্ষণ ফিরাইয়া কুমারীদিগকে তাহাতে নেত্র সংলগ্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। কুমারীগণ তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি ?" প্রোফেসর উত্তর করিলেন—'Venus'. কুমারীগণ স্কুলে পড়িয়াছিলেন, 'Venus' অর্থাৎ 'রতিদেবী,' 'Adonis' নামক রাজকুমারের প্রেমে মোহিত হইয়া তাহাকে পুষ্পরূপে রূপান্তরিত করিয়া সর্ব্বক্ষণ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া রাখিতেন। এক্ষণে 'Venus' দেখিয়া অমনি সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ প্রোফেসরকে অনুরোধ করিলেন যে, "Venus ত দেখিলাম এক্ষণে 'Adonis' কোথায় আছে দেখাইয়া দিন্।" প্রোফেসর ইহার কোন উত্তর দিয়াছিলেন কি না তাহা আমাকে বলেন নাই কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আমাকে বলিয়াছিলেন যে প্রোফেসরের ইচ্ছা ছিল তিনি কুমারীদিগকে বলেন "হৃদয়ে হাত দিয়া দেখ !" যাহা হউক ইহা হইতে দেখা যাইবে যে সর্ব্বসাধারণকে মানমন্দিরে প্রবেশাধিকার দিলে অনেক উৎপাত সহ্য করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে কার্য্য বিষয়েও অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা কার্য্য "দেখান" হইতে "কার্য্যকরণ" বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল, তাঁহারা উহাকে কার্য্যের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকেন।

গ্রীণ্উইচ্ মানমন্দির দর্শনাভিলাষীদিগকে Board of Admiralty, অথবা তাহার কিম্বা Royal Societyর কোন সভ্যের নিকট হইতে অনুরোধ পত্র লইয়া তাহা Astronomer Royalএর নিকট প্রেরণ করিতে হয়। তিনি তদুত্তরে এক নিদর্শন পত্র প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে পরিদর্শনোপযোগী সময় এবং অপর যাবতীয় পূর্ব্ব জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত থাকে। তাহার নিম্নভাগে দুইটী নাম লিখিবার স্থান আছে, পরিদর্শনাশী যদি দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদের নাম ঐ দুই স্থানে লিখিয়া, উক্ত নিদর্শন পত্র সঙ্গে করিয়া মানমন্দিরে যাইতে হয়।

গ্রীণ্উইচ্ মানমন্দিরের আদি বৃত্তান্ত জানিতে হইলে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটী অতি মসীময় পত্র উদ্ঘাটন করিতে হয়। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে রাজা প্রথম চার্লসের উৎপাতে ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলে পর পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাঁহার যাবতীয় কুকার্য্যে বাধা দিতে কৃতসংকল্প হইল ; এবং অচিরে রাজা ও পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে আধিপত্য ও ক্ষমতার বিস্তৃতি লইয়া তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। ক্রমওয়েল পার্লিয়া-মেণ্টের পক্ষ হইতে সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন, এবং নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহের পর চার্লসকে ধৃত ও বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা বন্দী হইলে পর রাজ্ঞী হেন্‌রিয়েটা (ইনি ফরাসীরাজদুহিতা ছিলেন) তাঁহার দুই পুত্র, চার্লস্ ও জেমস্ সহ ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে যুবরাজ চার্লসের বয়স ১৮ বৎসর ছিল। এদিকে রাজা চার্লসের বিচারারম্ভ হইল, এবং ক্রমওয়েলপ্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হইয়া চার্লস্‌কে দেশের শান্তিভঙ্গ ও প্রজার অহিতচিন্তনাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের পত্রে সোজ্জ্বল মসীময়

অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে অতএব তাহার পুনরঙ্কনের দ্বারা লেখনী কলঙ্কিত করিবার আর বিশেষ আবশ্যক কি আছে? ইংরাজিতে ইহাকে Regicide বা 'রাজহত্যা' বলা হইয়া থাকে। ক্রমে এই হত্যাসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া ফ্রান্সে চার্লসের পত্নী ও পুত্রদিগের কর্ণ-গোচর হয়; তাঁহারা তচ্ছ্রবণে সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। হেন্‌রিয়েটা অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যা-বলম্বন পূর্ব্বক পুত্রদিগকে লোকের ঘৃণা ও নিন্দার হাত হইতে রক্ষা করিবার অভিলাষে পারি নগরস্থ এক 'ধর্ম্মাশ্রমে' (Monastery) প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ চার্লস্‌ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অতএব পিতার হত্যাসংবাদ তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিল। তিনি ধর্ম্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া মনের দুর্ব্বহনীয় শোকাবেগ বিস্মরণ জন্য বিশেষ তৎপর-তার সহিত নানাবিষয়ক জ্ঞানার্জ্জনে চিত্ত বিনিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে তিনি জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাতে ফরাসিজাতির প্রভূত প্রতিপত্তি দেখিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে অচিরে শোকাবেগ ভুলিয়া এই সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে বহুল যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রমওয়েলপ্রমুখ পার্লিয়ামেণ্ট সভা রাজা চার্লসের হত্যার পর নূতন রাজা নিয়োগে অনিচ্ছুক হইয়া প্রজাতন্ত্রশাসনের সূত্রপাত করিলেন, এবং ক্রমওয়েল্‌ তাহার অধ্যক্ষরূপে সমস্ত শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি অপরিসীম ক্ষমতাপ্রিয় লোক ছিলেন; তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগে যেখানে বিঘ্ন উৎপাদিত হইত সেইখানেই তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচনাশূন্য হইয়া অসহনীয় বেগে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নশীল হইতেন। তিনি যতই দেখিতে লাগিলেন যে পার্লিয়ামেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইলে স্বীয় ক্ষমতাকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত করিয়া দশজনের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে হয় ততই তাঁহার মনোভাব পার্লিয়ামেণ্টের বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইল; অবশেষে ঐ ভাব এমতাবস্থায় পরিণত হইল যে একবার তিনি উদ্ধত ঈর্ষাবেগ প্রশমিত করিতে না পারিয়া বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্ট রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং ইংলণ্ডের একাধিপত্য গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচার করিয়া স্বয়ং এক মুকুটশূন্য রাজা হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রজা-সাধারণ চার্লসের অত্যাচারের ভয়ে রাজতন্ত্রে অনাস্থাবান হইলেও পার্লিয়ামেণ্টের প্রতি তাহাদের আস্থার হ্রাস হয় নাই, অতএব ক্রমওয়েলের ক্ষমতাপ্রিয়তা তাহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিল; তাহারা দেখিতে পাইল যে প্রজাতন্ত্র শাসনের খোলস পরিয়া ক্রমওয়েল্‌ স্বয়ং সার্ব্বভৌমিক রাজস্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ক্রমওয়েলের ব্যব-হারে এই ভাব ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই বহুলোক পার্লিয়া-মেণ্টের সাহায্যে নূতন রাজা নিয়োগে যত্নশীল হইলেন। ক্রমওয়েলের আচরণে অসন্তোষ এবং তাঁহার শাসনে বিরক্তিবশতঃ ক্রমে লোকহৃদয়ে মৃত চার্লসের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইতে লাগিল। এই হেতু ক্রমওয়েলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজ্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ও বিষম কোলাহল উত্থিত হইল এবং যে পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্ট সভা যুবরাজ চার্লস্‌কে সিংহাসন

গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়া না পাঠাইল সেই পর্য্যন্ত এই বিশৃঙ্খলা ও কোলাহল কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে যুবরাজ চার্লস্ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাশ্রম ছাড়িয়া ফরাসি রাজান্তঃপুরে বাস করিতেছিলেন। তিনি ১১ বৎসর ঐ আশ্রমে অধ্যয়ন করেন এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করণোদ্দেশে লণ্ডনে পদার্পণ করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে যুবরাজ চার্লস্ আশ্রমে অধ্যয়নকালে ফরাসিজাতির জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চাতিশয্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজ্যভার গ্রহণের পর তাঁহার মনে প্রথমতঃ এই ভাবের উদ্রেক হইল যে তিনি তাঁহার রাজ্যকে জ্ঞানবিজ্ঞানে ফরাসি রাজ্যের সমকক্ষ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই ভাব ক্রমশঃ সঙ্কল্পে পরিণত হইল এবং অবশেষে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষরূপে উদ্যোগী হইলেন। পারি নগরে French Institute নামে একটী অতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা আছে; ইহা যাবতীয় আবিষ্ক্রিয়া বিধান পূর্ব্বক জগতের উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিতেছে। ঐ দেশের সম্রাট স্বয়ং এই সভার সভ্যদিগকে সমাদর ও সম্মান করিতেন এবং হিন্দু ঋষিদিগের ন্যায় ইঁহাদিগেরও রাজসকাশে অবারিত দ্বার ছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ ঐ সভার অনুকরণে লণ্ডনে Royal Society নামক বৈজ্ঞানিক সভার স্থাপনা করিলেন। ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে পরস্পর ভাববিনিময় দ্বারা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন জন্য এই প্রথম উদ্যম হইল। ইহা কালে এত ফলপ্রদ হইয়াছে যে এক্ষণে ইংলণ্ডের যাবতীয় অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এই সমিতিতে আলোচিত বা সমালোচিত হইয়া তৎপরে সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়; এবং ইংলণ্ডের যাবতীয় বিজ্ঞানানুশীলনকারীগণ যাঁহারা কোন না কোন প্রকার সত্যোদ্ভাবন দ্বারা বিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিতে সক্ষম হইতেছেন তাঁহারা এই সমিতির অঙ্গভুক্ত!

চার্লস্ এই সমিতি সংস্থাপনের পর এক বৎসর কাল সোৎসুকনেত্রে ইহার কার্য্যকলাপ অনুধাবন করিয়া এত আশান্বিত হইয়াছিলেন যে অচিরে আর একটী দেশহিতকর মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি পারিসে অবস্থানকালে অনেক সময় পারিস মানমন্দির দর্শন করিতে যাইতেন। তাহার কার্য্যকলাপ ও উদ্দেশ্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে Royal Societyতে সমস্ত ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ সমবেত হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ইংলণ্ডে একটী সুবৃহৎ মানমন্দির স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন; ইহার ফলে পর বৎসর অর্থাৎ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ নিজ ব্যয়ে গ্রীণ্‌উইচ্ মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংলণ্ডকে উপহার দিলেন। ইংরাজ রাজত্ব যতকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততকাল এই মানমন্দির দ্বিতীয় চার্লসের অমরকীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজ করিবে! তিনি ইংলণ্ডে আগমনকালে মাতার নিকট হইতে যে সকল ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ এই মানমন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়াছিলেন।

গ্রীণ্‌উইচ্ মানমন্দির লণ্ডনের দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তভাগে এক সুবিস্তৃত ময়দানের মধ্যস্থলে

একটী অনুচ্চ শৈলোপরি অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র শৈল বেষ্টন করিয়া কয়েকটী নাতিপ্রশস্ত পথ এবং উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী সারি শোভা পাইতেছে; ময়দানের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে; তাহাতে এই স্থানটী উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সায়ং সমীরণ সেবনের একটী অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন চার্লস্ এই ময়দানসহ শৈল ক্রয় করিয়া তাহা রাজকীয় গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করিলেন তখন সকলেই মনে করিতে লাগিল যে এস্থানে রাজার গুপ্ত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে; আবার যখন তিনি মাতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আদেশ করিলেন তখন আর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু যখন কালে তাহা মানমন্দিররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজ জাতির নামে উৎসর্গীকৃত হইল তখন আর প্রজাসাধারণের আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না। যদি চার্লস্ এই ভাবে স্বীয় অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেন তবে যে ইংলণ্ডের কি মহোপকার সাধিত হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিধাতার নিয়তি অন্যরূপে ভবিতব্য ব্যবস্থা করিল,—তাঁহার মন্ত্রীবর্গ এই সকল দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেও, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে এই সকল কার্য্য সাধিত হওয়াতে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে হয়ত রাজা মন্ত্রীদিগকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতেছেন, অতএব কালবশে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন। তাঁহারা এই মনোভাব প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত ও লোকসমাজে প্রচার করিতে ক্ষান্ত রহিলেন না! প্রজাবর্গ মন্ত্রীদিগের মুখে ইহাও জ্ঞাত হইল যে এই সকল বৈজ্ঞানিক কার্য্য রাজকীয় কার্য্যকলাপের অঙ্গভুক্ত নহে; ইহাদিগের অনুষ্ঠানে সময় ও অর্থব্যয় দ্বারা রাজকীয় শক্তির অপলাপ করা হইতেছে। মূর্খ সমরক্লিষ্ট শান্তিপ্রয়াসী প্রজাগণ তাহাই বুঝিল এবং তাহাতে সায় দিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত একমত হইল যে রাজা প্রজার সুখদুঃখে অমনোযোগী এবং স্বেচ্ছাচারী হইবার পূর্ব্বসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। চার্লস্ ইংলণ্ডের জন্য যে মহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাহার দীপ্তালোকে ইংলণ্ড এখন পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিকতর শোভা পাইতেছে, যাহার বলে বিজ্ঞানজগতে ইংলণ্ডের উচ্চ স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, Royal Societyর কয়েকজন সভ্য ব্যতীত আর কেহই তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হইল না, তাই ইতিহাসলেখক দ্বিতীয় চার্লসের সুকীর্ত্তিতে কিছুই উল্লেখ যোগ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই!

মানমন্দিরের বর্ণনা দ্বিতীয় প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ সম্বন্ধে দুই একটী কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব! ইতিহাস চার্লস্‌কে যে রঙ্গে চিত্রিত করিয়াছে আমি তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিলাম বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই ইংলণ্ডের তাৎকালিক ভীষণ ও শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাত আছেন; একে চার্লস্ অসম্ভাবিতরূপে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, তাহাতে মন্ত্রীবর্গের উপরোক্তরূপ অযথা নিন্দা প্রচারে তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়াছিলেন। ক্ষোভের কারণ এই, যে তিনি জানিতেন মন্ত্রীগণ

তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং বুঝিতে চেষ্টাও করেন না, তাঁহাদের কেবল এই ইচ্ছা যে রাজা অতর্কিত ভাবে তাঁহাদের মন্ত্রণাধীন হইয়া কার্য্য করেন। ভয়ের কারণ এই ছিল যে তিনি আজীবন পিতার হত্যাকাণ্ড বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, কখন মন্ত্রীবর্গের সহিত অমত হইলে তাঁহারা প্রজাবর্গকে ক্ষেপাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিবেন এই আশঙ্কাতে তিনি সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। অধিকন্তু এই সকল কারণে তিনি নিজে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না করিয়া সর্ব্বদা মন্ত্রীদিগকে আপন আপন পথাবলম্বনে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দিতেন; সময় সময় তাহা স্বীয় মতবিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন বাধা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেন না। চার্লসের দোষের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহার আসন্নকালীন একটী উক্তিই তাঁহার চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একদা তাঁহার কোন বন্ধু নিবেদন করিলেন যে এক ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "চার্লস্ স্বীয় জীবনে কোন নির্ব্বুদ্ধির কথা মুখ দিয়া বাহির করেন নাই এবং কোন সদ্বুদ্ধির কার্য্যও অনুষ্ঠান করেন নাই।" চার্লস্ এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য করতঃ বলিলেন যে "তাহার কারণ এই, আমি সর্ব্বাবস্থাতেই যত কথা বলিয়াছি সমস্তই আমার স্বকীয়, কিন্তু আমার কার্য্যানুষ্ঠান সর্ব্বত্রই আমার মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বিহিত ও কৃত হইয়াছে"।

ইতিহাস চার্লস্‌কে বিস্মৃতির সাগরে ডুবাইতে চাহিলেও তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বিশাল গগনভেদী চূড়া বিস্তার করিয়া তাঁহার যশঃ ঘোষণা করিতেছে; এই ঘোষণার রঙ্গস্থল (১) গ্রীণ্‌উইচ্ মানমন্দিরের প্রথম প্রাঙ্গণ যথায় চার্লসের নামে এক স্তম্ভ স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে; এবং (২) Piccadilly Burlington Houseএর এক প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ (যথায় চার্লসের মর্ম্মরমূর্ত্তি, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দর্শকদিগকে স্বীয় কার্য্য দেখাইতেছে, ইহাই Royal Societyর কার্য্যগৃহ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

দেহ ও মন।

"Every feeling has its characteristic Physical side. As regards the Senses, a distinct *origin* or agency can be assigned, as well as a *diffused* wave of effects, the expression or outward embodiment of the state."

"Positively, Feeling comprehends pleasures and pains, and states of excitement that are neither. Negatively, it is opposed to Volition and to Intellect." "Volition is action under Feeling ; its *differentia*, therefore, is active energy for an end, which is a distinctive and well-defined property." "Thus, any mental state not being Action for an End, and not regarded as Discrimination, Agreement, or Retentiveness, must be viewed as Feeling." "Every feeling, in proportion to its strength, is accompanied with movements, and with changes in the organic functions."— Prof. Bain.

মানসিক প্রক্রিয়া মাত্রেরই দৈহিক পরিবর্ত্তন বা লক্ষণ আছে, অনুভূতি ও ইচ্ছার তো কথাই নাই। প্রত্যেক চিন্তাতেও দৈহিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে তাহার ইতর বিশেষ আছে। সকল সময় সমান পরিস্ফুটও হয় না, এবং পরিস্ফুট হইলেও অনেক সময় ভাল রূপে বুঝা যায় না। আবার মানসিক প্রক্রিয়ার মাত্রায় দৈহিক পরিবর্ত্তনের মাত্রা নহে। কখন কখন অনুভূতির আতিশয্যে বরং দৈহিক অবসাদই লক্ষিত হয়। রোগবিশেষে (Catalepsy) কোন কোন সময় চৈতন্য প্রভৃতি সত্ত্বেও লোক মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়ে; যে অবস্থায় রোগ আক্রমণ করে অবিকল সেই অবস্থাতেই থাকে। যাহার তাহাতে চৈতন্য তিরোহিত হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। চৈতন্য থাকিলেও যথাকার হস্তপদ তথাই জড়প্রায় পড়িয়া থাকে। দেখিতেছে, শুনিতেছে, সম্মুখে যাহা হইতেছে সকলি বুঝিতে পারিতেছে, অথচ শরীরের একটী পেশীও স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারিতেছে না, যেন ইচ্ছার সহিত দৈহিক সংশ্রব একবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তবে কি এ অবস্থায় দেহের সহিত মনের কোন সম্পর্কই নাই? তাহা নহে। দেহের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আছেই আছে; তদ্ব্যতীত কোন মানসিক প্রক্রিয়া সম্ভাবিত নহে। মন দেহের সহিত সমবায় সম্বন্ধে গাঁথা—দৈহিক পরিবর্ত্তনে মানসিক পরিবর্ত্তন না থাকিতে পারে; কিন্তু মানসিক পরিবর্ত্তনে দৈহিক পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। যথায় দেহ তথায় মন না থাকিতে পারে; কিন্তু যথায় মন তথায় দেহের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। তবে কোন্ দেহে বা দেহের কোন অবস্থায় মন অনুমিত, তাহাই এক্ষণে আলোচ্য।

দৈহিক লক্ষণ বা পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। স্থূলতঃ, দুইটীই একাত্মিক। বাহ্যিক পরিবর্ত্তনে আভ্যন্তরিক এবং আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনে বাহ্যিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে সচরাচর জ্ঞানে বাহ্যিক লক্ষণই প্রবল। বাহ্যিক লক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয়। বিজ্ঞানে আমরা ভিতরকে বাহির করিয়া দেখিয়া থাকি। কিন্তু সতত তাহার সুবিধা নাই। আর সুবিধা থাকিলেও তাহাতে অনুমান বিস্তর ; সুতরাং ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনাও বহুল। অধিকন্তু সে আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন বাহ্যিক পরিবর্ত্তন দ্বারা ব্যাখ্যাত। তাপে অণুর পরিবর্ত্তন যে প্রকার আনুমানিক ব্যাপার, মানসিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ডিম্বিকার (Cell) পরিবর্ত্তনও তদধিক দুরূহ অনুমান মাত্র। ফলে সে অনুমানও বিজ্ঞান-সম্মত বটে।

দেহের বাহ্যিক লক্ষণ বা পরিবর্ত্তনই পর-মন জানিবার প্রধান উপায়। কারণ, আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন পরিশেষে বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। মস্তিষ্ক যে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র তাহাও দেহের বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশিত। এ বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই পরিণামে দেহের বাহ্যিক পরিবর্ত্তন বা লক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সাধারণ দৃষ্টির সঙ্গতি ও পরিধি বাড়িয়া থাকে। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিই বিজ্ঞানের ভিত্তি। বিশ্ব ব্যাপার উদ্ঘাটন করিয়া জটিল সমস্যা বিশ্লেষ পূর্ব্বক সাধারণ অভিজ্ঞতায় পর্য্যবসিত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তাই বলি পর-মন দেহের বাহ্য লক্ষণ বা পরিবর্ত্তনে অনুমিত। বাহ্য লক্ষণই প্রথম ও সাধারণ দৃষ্টি। তবে দৈহিক গঠনও অনেকটা মনোজ্ঞাপক বটে।

তবে শারীরিক কোন্ লক্ষণ বা পরিবর্ত্তন মনোজ্ঞাপক ? ডাক্তার রোমেনিসের মতে চেষ্টাই (Choice) পর-মনজ্ঞাপক দৈহিক লক্ষণ। পূর্ব্বেই আমরা এ কথার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। চেষ্টা মনোব্যঞ্জক বটে। ইহাতে মানসিক তিনটী প্রধান ধর্ম্মই বুঝা যায়। চেষ্টায় অনুভূতি, ইচ্ছা, ও চিন্তা—তিনই আছে। তবে আর মনোব্যঞ্জক না হইবে কেন ? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দৈহিক সকল লক্ষণ বা পরিবর্ত্তনই কি উদ্দেশ্যমূলক ?দেহের বাহ্য সকল লক্ষণই কি চেষ্টা ? তাহা নয়।

এক্ষণে জানা গেল যে দৈহিক সকল বাহ্যিক লক্ষণই চেষ্টা নহে। কিন্তু তাহাতে কি হইল ? দৈহিক সকল পরিবর্ত্তন বা লক্ষণও মনোজ্ঞাপক নহে। সুতরাং সকল লক্ষণ বা পরিবর্ত্তন চেষ্টা না হইলে ডাক্তার রোমেনিসের মতই প্রবল রহিল। তবে আপাততঃ দেখা উচিত যে, সকল মনোজ্ঞাপক পরিবর্ত্তন বা লক্ষণ চেষ্টা কি না। যদি চেষ্টা ব্যতীত মনোজ্ঞাপক কোনরূপ দৈহিক কার্য্য থাকে বা দৈহিক কোনরূপ কার্য্য না হইয়াও মনোজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে ডাক্তার রোমেনিসের মত সুপ্রশস্ত নহে।

চৈতন্য বা অনুভূতি সকল মানসিক প্রক্রিয়ার মূল। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভিত্তি বলিলাম না। মূল আর বৃক্ষ পদার্থ এক নয়। অথচ মূল ব্যতীত বৃক্ষের অস্তিত্ব নাই। আবার মূলে বৃক্ষের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। অথচ উভয়ের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ফলে, অনুভূতি

মাত্রেরই দৈহিক পরিবর্ত্তন বা লক্ষণ আছে। তবে সকলেই সমান প্রত্যক্ষের সামগ্রী নহে। অতি সামান্য পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর না হইতেই পারে। তবে বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন সমস্তই দৃষ্টির বিষয়; কিন্তু তন্মধ্যে অনেকগুলি উদ্দেশ্যব্যঞ্জক না হইতেও পারে। যাহা উদ্দেশ্যমূলক নহে, তাহা চেষ্টা অভিধেয় হইতে পারে না। অধিকন্তু চেষ্টার মূলে ইচ্ছা অপরিহার্য্য। আবার সকল অনুভূতিতে ইচ্ছাবৃত্তি উত্তেজিত না হইতেও পারে। আবার ইচ্ছার উদ্রেক হইলেই দৈহিক কার্য্যও নিশ্চয় নহে—তাহাও শক্তি সাপেক্ষ। পক্ষাঘাতে ইচ্ছা সত্বেও দৈহিক কার্য্য নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রোগবিশেষে (Catalepsy) দৈহিক কোন ইচ্ছামূলক কার্য্যই নাই। অথচ সময় সময় অনুভূতি বা চৈতন্য থাকে। তবে ইচ্ছা অনুভূতি সাপেক্ষ বটে। অনুভূতি ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে। যখন ইচ্ছা অনুদ্দীপক অনুভূতি থাকিতে পারে, এবং অনুভূতি মাত্রেরই দৈহিক লক্ষণ আছে, এবং তাহা চেষ্টা নহে; তখন চেষ্টা ব্যতীত অন্য দৈহিক লক্ষণ মনোজ্ঞাপক না হয় কেন? তবে এস্থলে দেখা উচিত, যে সকল দৈহিক পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তাহারাই কেবল ইচ্ছা অনুদ্দীপক অনুভূতির দৈহিক লক্ষণ কি না। অথবা যে সকল দৈহিক লক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয় তন্মধ্যে শুদ্ধ অনুভূতিব্যঞ্জক কেহ আছে কি না। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বা কষ্টসাধ্য জ্ঞান, সে সকল লক্ষণকে বিচারে পরিহার করাই কর্ত্তব্য; যে সকল পরিবর্ত্তন বা লক্ষণ অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে যদি তন্মধ্যে কেহ চেষ্টা না হইয়াও মনোজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে চেষ্টা ব্যতীত মনোজ্ঞাপক দৈহিক লক্ষণ বা পরিবর্ত্তন আছে বলিয়া প্রতীত হইবে। যদি চেষ্টাশূন্য দৈহিক লক্ষণ মনোজ্ঞাপক হয়, যদি ইচ্ছাশূন্য অনুভূতি থাকে, যদি অনুভূতি হইলেও বা অনুভূতির দৈহিক কার্য্য সত্বেও ইচ্ছামূলক কোন দৈহিক লক্ষণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চেষ্টা ভিন্ন অনুভূতির অপর দৈহিক লক্ষণ আছে বলাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে।

অনুভূতিতে সুখবোধ, দুঃখবোধ ব্যতীতও আর কিছু আছে। তাহাতে সুখ নাই দুঃখ নাই, অথচ শুদ্ধ সামান্য অনুভূতিচৈতন্য বা সংজ্ঞা মাত্র আছে। সামান্য ইন্দ্রিয়বোধে সুখদুঃখ পাই—শুদ্ধ অনুভূতি মাত্র আছে। প্রস্তরখণ্ড নেত্রগোচর হইল, কাষ্ঠফলক স্পর্শ করিলাম, ইহাতে সুখদুঃখ নাই, কিন্তু অনুভূতি বা চৈতন্য আছে। অনুভূতিতে ভাব (Emotion) ও ইন্দ্রিয়বোধ এতদুভয়ই বুঝিতে হইবে।

সার উইলিয়ম হামিলটনের মতে অনুভূতি মাত্রেই সুখ বা দুঃখজনক হইতে হইবে; অর্থাৎ সুখদুঃখ ছাড়া অনুভূতিই নাই। ফলে আমাদের সকল প্রকার অনুভূতি পর্য্যালোচনা করিলে এতদুভয়ের সম্পোষ্য হয় না। আমাদের চৈতন্যের অবস্থা বিশেষ এরূপ দেখা যায় যাহাতে সুখদুঃখের কোন আভাসই নাই। সুতরাং অনুভূতিকে সুখদুঃখে বিভাগ করায় অপ্রশস্তি দোষ জন্মিতেছে। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধ বা সংজ্ঞা তন্মধ্যে স্থান পাইতেছে না। সে যাহা হউক বরং সুখদুঃখবোধে চেষ্টা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য বা সংজ্ঞায় চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী নহে।

ইচ্ছাবৃত্তি অনুভূতিসাপেক্ষ। যে অনুভূতিতে ইচ্ছাবৃত্তি পরিচালিত হয়, তাহাতে সুখ দুঃখের আভাস থাকাই সম্ভব। যাহাতে সুখবোধ হয় জীবমাত্রেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে; যাহাতে দুঃখবোধ হয়, কাহার না চেষ্টা তাহা পরিহার করে। তবে চেষ্টা মাত্রেই সামর্থ্য সাপেক্ষ। অর্থাৎ দেহের কৌশলে চেষ্টার কৌশল। সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সে অনুভূতির দৈহিক চেষ্টার প্রত্যাশা কোথায়? ফলে, সে প্রকার অনুভূতির যদি কোন দৈহিক লক্ষণ থাকে, তাহা চেষ্টা নহে বলিতে হইবে; এবং সে প্রকার অনুভূতি বুঝিতে হইলে দৈহিক চেষ্টায় বুঝা যায় না বলিতে হইবে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে মনের তিনটী ধর্ম্ম আছে ঃ—অনুভূতি, ইচ্ছা এবং চিন্তা। সত্য। কিন্তু মন ইহার বিশুদ্ধ কোন একটীতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; সুতরাং সকল অনুভূতিতেই চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। "The Mind can seldom operate exclusively in any one of these three modes. A Feeling is apt to be accompanied more or less by Will and by Thought."—Prof. Bain. বস্তুতঃ কোন অনুভূতি হইবামাত্রই চিন্তা তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া যায়। বর্ত্তমান অনুভূতির সদৃশ অনুভূতি স্মৃতিপটে অনুসন্ধান করে এবং তাহার সহিত ঐক্য হইলে তাহার সহিত সমশ্রেণী ভুক্ত করিয়া ফেলে। সেই সাদৃশ্যেও তন্ন তন্ন করিয়া বিসদৃশ লক্ষণ স্বতন্ত্র গাঁথিয়া রাখে। এই তুলনায় কত কি তুমুল আন্দোলন হইয়া যায়। আবার যদি উক্ত অনুভূতি সুখজনক হয়, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা আসিয়া জুটে, এবং যাহাতে উক্ত অনুভূতি স্থায়ী হয় তাহার চেষ্টা পায়। এসকল কথাই সত্য। কিন্তু তত্রাপি অনুভূতি অগ্রবর্ত্তী, ইচ্ছা বা চিন্তা পরবর্ত্তী ব্যাপার। তবে কি পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভূতির কোন দৈহিক লক্ষণই নাই? তাহার কোন না কোন দৈহিক লক্ষণ থাকার আবশ্যক; নতুবা সকল মানসিক প্রক্রিয়ায় দৈহিক পরিবর্ত্তন কোথায়? তবে সে লক্ষণ সকল সময় সমান প্রস্ফুটিত না হইতে পারে। কিন্তু অনুভূতির মাত্রায় দৈহিক পরিবর্ত্তন বা লক্ষণের মাত্রা না হইলেও, তাহার কোন অবস্থায় দৈহিক কার্য্য সুস্পষ্ট দেখা যাইবারই সম্ভাবনা। তাহা হইলে আমরা দৈহিক সেই লক্ষণ দেখিয়া পর-মনের কোন না কোন অনুভূতি অনুমান করিলেও করিতে পারি। এ কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নহে। পুনশ্চ যেমন মন তিনটী প্রধান বৃত্তির মধ্যে কোন একটীতে বিশুদ্ধ ভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; দেহের লক্ষণ বা পরিবর্ত্তনেরও সেইরূপ সংশ্লিষ্ট ভাবই সম্ভব। সুতরাং যেমন মনকে অনুভূতি, ইচ্ছা ও চিন্তার কোন একটীতে কোন এক সময়ও আবদ্ধ দেখা যায় না; দেহেরও লক্ষণ সেইরূপ বিজড়িত ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। চিন্তার দৈহিক লক্ষণ সুস্পষ্ট না হইলেও মনের সহিত দেহের পরিবর্ত্তন স্থির সিদ্ধান্ত। যেমন তিনটী সংশ্লিষ্ট মূর্ত্তিতে মন পূর্ণ এবং তাহা যেমন বিশ্লিষ্ট না হইলেও আমাদের ধারণা সুলভের জন্য আমরা তাহার ঐ তিনটী ধর্ম্মে বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকি; অর্থাৎ পৃথক না হইলেও পৃথক ভাবে চিন্তনীয়; তেমনি দৈহিক সেই বিজড়িত লক্ষণ পৃথকভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া

আলোচিত বা চিন্তনীয় না হয় কেন। মনের তিনটী ধর্ম্মের যেমন আমাদের পৃথক ভোগ আছে, তেমনি তাহাদের পৃথক দৈহিক লক্ষণ জ্ঞান না থাকিবার কারণ কি? আর যদি চেষ্টাই মনোজ্ঞাপক দৈহিক লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে চেষ্টা ইচ্ছাজ্ঞাপক— অনুভূতিজ্ঞাপক নহে, এবং অনুভূতিজ্ঞাপক দৈহিক লক্ষণ নাই। তাহা হইলে এই অবধি বলা উচিত যে অনুভূতিজ্ঞাপক দৈহিক লক্ষণ নাই, আর যদি থাকে তাহাও ঐ চেষ্টা হইতে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে চেষ্টা হয় মনের ত্রিমূর্ত্তিরই প্রকাশক, অথবা শুদ্ধ ইচ্ছাজ্ঞাপক হইলেও উহা দ্বারায়ঐ তিনটী অবস্থারই ব্যাখ্যা হইতে পারে। মনের সহিত যদি দেহের কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা যে শুদ্ধ ইচ্ছাপক্ষে, এ কথায় ইচ্ছাই মনের প্রধান ধর্ম্ম বলা হইতেছে। কিন্তু প্রধান হইলেও সামান্য ধর্ম্মে কি দেহের কোন পরিবর্ত্তনই হইবে না? তাহা হইলে চেষ্টাই মনোজ্ঞাপক একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর যদি চেষ্টার মধ্যে কোন সূক্ষ্মরেখা শুদ্ধ অনুভূতিজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলেও অনুভূতির দৈহিক লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে।

অনুভূতি পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছা; চিন্তা পরবর্ত্তী ঘটনা। তবে কি দেহ অনুভূতির সময় অসাড় থাকিয়া ইচ্ছার উদ্রেকে সচেষ্ট হইয়া উঠে? অথবা সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তনে দেহের একজাতীয় পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ইচ্ছামূলকই হইয়া থাকে? যদি মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে উক্ত তিনটী ধর্ম্মের জড়িত লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বিভিন্ন রেখায় প্রতিফলিত হইবে সন্দেহ নাই। যেমন মনের তিনটী ধর্ম্ম বিজড়িত হইলেও আমরা অনায়াসে বিশ্লেষ করিয়া প্রকৃত পার্থক্য না হইলেও পৃথকভাবে আলোচনা করিতে পারি; তখন তৎপ্রতিফলিত দৈহিক লক্ষণ বিশ্লেষ করা না যাইবে কেন? বিশেষতঃ যখন সুখদুঃখবিবর্জ্জিত অনুভূতিতে ইচ্ছা প্রস্ফুট নহে; তখন তাহার দৈহিক লক্ষণে চেষ্টা না থাকিবারই সম্ভাবনা এবং সেই চেষ্টাশূন্য দৈহিক লক্ষণে পরের অনুভূতি অনুমিত না হয় কেন? সেই অনুভূতি ইচ্ছাশূন্য হইলেও সকল অনুভূতির ন্যায় দৈহিক লক্ষণ থাকারই সম্ভাবনা; নতুবা মনে ও দেহের সম্বন্ধ অস্থির ব্যাপার।

পুনশ্চ চেষ্টামাত্রেই ইচ্ছামূলক। কেহ কেহ চেষ্টা প্রকৃতিগতও বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ফল নহে; স্বতঃই হইয়া থাকে এবং বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। বস্তুতঃ চেষ্টা যদি তাহাই হয়, তবে উহা মনোজ্ঞাপক নহে; আর তাহা হইলে চেষ্টা যেন কলকৌশলের ফলস্বরূপ হইতেছে। তাহা যেন কতকটা প্রতিষেক কার্য্যমত বুঝাইতেছে। মনোজ্ঞাপক চেষ্টা হইলেই, তাহাতে ইচ্ছা ও বুদ্ধির বিশেষ উপদান আছে এবং তাহার পূর্ব্বেও অনুভূতি আছে। তবে উহা প্রত্যক্ষে ইচ্ছা ও পরোক্ষে অনুভূতি বুঝায়; এবং দূরতঃ বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু চেষ্টার দ্বারায় সকল সময় অনুভূতি বুঝা যায় না। কেহ ছুটিয়া যাইতেছে দেখিলে মনে নানা কথার আন্দোলন হইতে পারে। হয়ত সে ভয়ে পলাইতেছে; নতুবা অগ্রে কেহ গিয়াছে তাহার উদ্দেশে ছুটিতেছে; কাহাকে মারিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে; অথবা কোন ভয়ানক আবশ্যক বশতঃ সত্বর কার্য্যসিদ্ধির জন্যও

ছুটিতে পারে; ইত্যাদি নানা প্রকার অনুভূতি অনুমিত হয়। কিন্তু সেই সকল গুলিরই স্বতন্ত্র ভাবভঙ্গি আছে। সুতরাং চেষ্টার সহিত তাহার আভাস দেখিয়া আমরা তাহার অনুভূতির মীমাংসা করিয়া থাকি। যদি তাহার মুখের ভঙ্গি ভয়সূচক হয়; তাহা হইলে আমরা তাহাকে ভয়ে পলাইতেছে মনে করি; অর্থাৎ তাহার মুখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাব গতিকে, দৌড়াইবার বেগ, দেহের চাঞ্চল্য, প্রভৃতিতে, ভয় অনুমান করি; এবং দৌড়ানরূপ পলাইবার চেষ্টায় ইচ্ছা প্রভৃতির আভাস পাই। এস্থলে চেষ্টায় ইচ্ছা বুঝা গেল, অনুভূতি বুঝা গেল না।

অধিকন্তু যাহাকে ইন্দ্রিয়বোধ বলা যায় তাহার কতকটা বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধ, এবং কতকটা বুদ্ধিশ্চালনের ফল। যথা, নেত্রে শ্বেতবর্ণ অনুভূত হইল; কিন্তু শ্বেতপদ্মদর্শন জ্ঞান অনুমানসাক্ষেপ। সুতরাং ইন্দ্রিয়বোধে বুদ্ধির অংশ আছে। অনুভূতি মাত্রেই এই প্রকার। তাহারও অনেকগুলি বিশুদ্ধ ও অনেকগুলি মিশ্র মূর্ত্তি আছে। আদিম ইন্দ্রিয়-বোধ বা বিশুদ্ধ অনুভূতি—যথা, ক্ষুধা; এবং তাহাও বুদ্ধির অগ্রগামী। মিশ্র অনুভূতি বা ভাব—যথা, শোক ইহা আদিম নহে—অর্জ্জিত; ইহা বুদ্ধির অনুসার। ইচ্ছা সতত অনুভূতির মুখাপেক্ষ হইয়াও স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এস্থলে দেখা উচিত বিশুদ্ধ অনুভূতির নিজস্ব কোন লক্ষণ আছে কি না; তাহা ইচ্ছা প্রভৃতির সহিত জড়িত থাকিলেও বুঝিবার উপায় আছে কি না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মানসিক ব্যাপার দ্বিবিধ;—আপনার ও পরের। আপনার মন অনুভূতি; পরের মন অনুমিতি। অনুভূতি মৌলিক তত্ব; তাহার অন্তস্তলে যাইবার আমাদের শক্তি নাই। পরের দৈহিক লক্ষণে, অবস্থায়, ভাবে, বা পরিবর্ত্তনে পর-মন বুঝা যায়। এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু সেই লক্ষণ বা পরিবর্ত্তন প্রভৃতি চেষ্টা বিধায়ক কি না তাহারই মীমাংসা আবশ্যক। প্রত্যেক মানসিক পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ চৈতন্যাবস্থায় দৈহিক পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। তবে সকল প্রকার দৈহিক পরিবর্ত্তনে মানসিক পরিবর্ত্তন না থাকিতে পারে। মানসিক প্রক্রিয়ার সহিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সম্বন্ধ অতি গুরুতর। এমন কি অনেকে সেইজন্য মনকে উহাদের প্রক্রিয়াই বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মনের সহিত পেশী, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি, ফুস্ফুস, পাকস্থলী, অন্তঃকরণ, প্রভৃতিরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

মস্তিষ্কের সহিত যে মনের নিরতিশয় সংশ্রব আছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। এমন কি, অনেকে মস্তিষ্ককে মনের প্রধান যন্ত্র বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রক্রিয়াই মন। আমাদের এক্ষণে তত দূর সূক্ষ্ম বিচারের আবশ্যক নাই। তবে ইহা ব্যতীত যে মানসিক প্রক্রিয়া প্রধানতঃ ব্যক্ত হয় না, তাহা অনায়াসে ও নির্ব্বি-বাদে বলা যাইতে পারে। অপিচ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী মনের সহিত সমবায় সম্বন্ধে গাঁথা; অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিহীন কোনও প্রাণীতে মানসিক ব্যাপার দেখা যায় না। অত্যধিক

মানসিক উত্তেজনায় মস্তকে যাতনা হয়। মস্তিষ্ক আহত বা রোগগ্রস্ত হইলে মানসিক শক্তির হ্রাস হয়। মস্তকে প্রবল আঘাতে চৈতন্য লোপ পায়। স্নায়বীয় পদার্থের পরিবর্ত্তনে বাক্‌রোধ হয়, স্মরণশক্তি লোপ পায়, উন্মাদ প্রভৃতি হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের পরিমাণে মানসিক শক্তির ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। পশুদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পশুদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা মনুষ্যের মস্তিষ্ক পরিমাণে বড়। মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণে বুদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর উপর পরীক্ষায় বিশেষ প্রতীয়মান হইয়াছে যে মানসিক প্রক্রিয়ায় উহারা অত্যাবশ্যক। এ বিষয় অত্র বিশেষ আলোচনের আবশ্যক নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে উক্ত কয়েকটী দেহযন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়ার সহিত গূঢ়তমরূপে সম্বদ্ধ।

অরুন্ধতী।

(সত্যঘটনা)

সাত বৎসর বয়সের সময় হইতে অরুন্ধতীর বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। প্রথমে রাজা গজনারায়ণের পুত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় এবং চারি বৎসর কাল সমান উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাব চলিয়া আসে। অরুন্ধতীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণও এই চারি বৎসর ধরিয়া তাহাকে রাজপুত্রবধূ হইবার উপযোগী শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর বয়স এগার বৎসর হইলে রাজা খবর পাঠাইলেন যে কন্যা "নবমে রোহিণী" হয়, তদূর্দ্ধ বয়স্কা বধূ গৃহে আনয়ন করা তাঁহার কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধ, সুতরাং চারি বৎসরের পর এই প্রস্তাব স্থগিত হইল। অরুন্ধতীর মা মনে করিয়াছিলেন রাজপুত্র জামাতা পাইয়া তিনি ধন্যা হইবেন; এমন কি রাজার বেয়ান হইলে তাঁহার পদমর্য্যাদা কতদূর বাড়িবে এবং প্রতিবেশিনীমণ্ডলী কিরূপ ঈর্ষাকুলিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিবে তাহার একটা মোটামুটী ভাব তিনি অনেক পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সুতরাং সহসা সে সম্ভাবনা লুপ্ত হওয়ায় অরুন্ধতীর মা ভবতারিণী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং রাজপুত্রের সহিত যে কন্যার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল অন্য কাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণকে অগত্যা এতদিন পরে নূতন পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল; তুই বর্ষব্যাপী দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তিনি

বর্দ্ধমানে এক পাত্ররত্ন আবিষ্কার করিলেন। ইতিমধ্যে আর একটি সুপাত্র হস্তগত হওয়ায় তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা যোগমায়ার বিবাহও একবারেই সারিবেন স্থির করিলেন, এই পাত্রের পিতা মদনবাবু আলিপুরে চাকরী করিতেন।

ভবতারিণী যখন শুনিলেন যে যদিও রাজপুত্র জামাতা পাওয়া তাঁহার ভাগ্যে নাই তথাপি পাঁচ হাজার টাকা বার্ষিক আয়বিশিষ্ট একটী জমীদারজামাতা হস্তগত হইতেছে তথন তিনি কতক সুস্থ হইলেন, কারণ পাঁচ হাজার টাকা যাহার বার্ষিক আয় সে ব্যক্তি রাজা না হইলেও সামান্য লোক নহে। রাজা গজনারায়ণের পুত্রের সহিত বিবাহপ্রস্তাব স্থগিত হওয়ার পর ভবতারিণী আর অরুন্ধতীর বেশবাসের প্রতি তত লক্ষ্য রাখিতেন না, এই সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় তিনি "লক্ষ্মীবিলাস তৈল" ও সাবান লইয়া নূতন করিয়া কন্যাকে সুন্দর ও সজ্জিত করিতে বসিলেন।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার সম্বন্ধীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে তিনি বর্দ্ধমানে যে পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন সে অত্যন্ত অসচ্চরিত্র এবং জুয়াচোর, অনেক টাকা পাওয়ায় এ পর্য্যন্ত পাঁচ ছয়টি বিবাহ করিয়াছে, ইহাতেও তাহার রূপতৃষ্ণা প্রশমিত না হওয়ায় সে অরুন্ধতীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং কৌশল করিয়া তাহার সমস্ত দোষ লক্ষ্মীনারায়ণের অগোচর রাখিয়াছে; বরের বাজার চড়া হইলেও এরূপ বরে কন্যা সমর্পণ করা অপেক্ষা তাহার হাত দুটি ধরিয়া নদীর জলে বিসর্জ্জন দেওয়া অনেক ভাল। লক্ষ্মীনারায়ণ এই পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন, তিনি এইরূপ পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী ভবতারিণী তাঁহার প্রতি সাধ্বী সুলভ যে সকল সুমিষ্ট সম্বোধন প্রয়োগ করিলেন তাহাতে তাঁহার স্বামীর মুখও ললাট যে বহুপূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছিল এবং চক্ষু কর্ণের অস্তিত্ব কিছু মাত্রও ছিল না তাহাই প্রমাণ হয়।

অবশেষে নিরুপায় লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যাদ্বয়কে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, এবং তাঁহার ভাবী বৈবাহিক মদন বাবুকে সকল কথা বলিয়া অরুন্ধতীর জন্য একটি সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন। এই বৈবাহিকবর তাঁহার পুত্রের বিবাহের সমস্ত আয়োজনই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এমন কি আত্মীয় মহলে নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠাইয়াছিলেন, বিবাহের আর এক সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে; এমন সময় হঠাৎ অরুন্ধতীর বিবাহের পূর্ব্বসম্বন্ধ ভঙ্গের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ-চিন্তিত হইলেন এবং বৈবাহিকের ও নিজের বিপদ অভিন্ন ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন।

আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া বর খুঁজিতে খুঁজিতে দুই দিন কাটিয়া গেল, বর, আর মেলে না; শেষে তাঁহার মনে হইল তাঁহার এক জ্ঞাতিপুত্র শৈশবকাল হইতে কলিকাতায় মামার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহার নাম গিরীশ,—মদনবাবু শ্যামবাজারে গিরীশের সন্ধানে ছুটিলেন।

গিরীশ ফ্রিচর্চ্চে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাশে পড়ে, অবস্থা ভাল নহে, তাহার এক মামাতো

ভাই সরোজ বাবু পুলিসে চাকরী করেন, তিনিই গিরীশকে বাসায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইতেছেন; দেশে গিরীশের এক জ্যেঠা ভিন্ন অন্য অভিভাবক নাই।

সরোজবাবুকে মদনবাবু বিশেষ করিয়া ধরিলেন। গিরীশেরও বিবাহের সময় হইয়াছে, আজ না হউক দুদিন পরে বিবাহ দিতে হইবে ভাবিয়া সরোজবাবু কোন আপত্তি করিলেন না, টাকাকড়ির জন্যও তিনি বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না; কনে পছন্দ হইলেই বিবাহ হইবে আশা দিয়া কয়েক জন বন্ধুর সহিত সেই দিন সন্ধ্যাবেলা কনে দেখিতে লক্ষ্মীনারায়ণের বাসায় চলিলেন, গিরীশকে কনে দেখান উচিত মনে হওয়ায় তাহাকেও সঙ্গে লইলেন।

সন্ধ্যার পর সকলে লক্ষ্মীনারায়ণের বাসায় উপস্থিত হইলেন। গিরীশ গৌরবর্ণ, সুপুরুষ তাহাতে লেখাপড়া শিখিতেছে সুতরাং তাহাকে লক্ষ্মীনারায়ণের বেশ পছন্দ হইল; কপাটের আড়াল হইতে তাহাকে দেখিয়া ভবতারিণীরও পছন্দ হইয়াছিল কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন গিরীশের অবস্থা ভাল নয় তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে বলিলেন "মেয়ে আমার রাজরাণী হ'তো, সে কি না ভিখিরীর ঘরে পোড়বে।"

যাহা হউক গৃহিণীর এ আপত্তি টিকিল না, কনে দেখান হইল। চমৎকার রূপ; গৌরবর্ণ, নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল, কৃষ্ণতারশোভিত আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু এবং তদুপরি বিধাতার সযত্নাঙ্কিত সুললিত ভ্রূ; মুখে সরলতা ও প্রতিভা মূর্ত্তিমতী, তাহার উপর লজ্জার একটি কোমল ছায়া পড়িয়া সেই কমনীয় মুখকান্তি অনুপম সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বালিকা ধীরে ধীরে দর্শকদিগের সম্মুখে আসিয়া আসনে উপবেশন করিল। সরোজবাবুর এক রঙ্গপ্রিয় বন্ধু বলিলেন "গিরীশ, একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লও, পরে যে আমাদের দোষী করিবে তা হইবে না।" অরুন্ধতীর সঙ্গে এক রসিকা পরিচারিকা আসিয়াছিল সেই বা ছাড়িবে কেন? সেও অরুন্ধতীর কানে কানে অনুচ্চস্বরে বলিল, "আগে হতেই তোমার জিনিষ ভাল ক'রে দেখে শুনে লও, দিদি।"—উভয়েই বুঝি এক মুহূর্ত্তে আনতচক্ষু ঈষৎ উত্তোলিত করিয়াছিল; চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল কিন্তু সে একমুহূর্ত্তের জন্য। জানিনা তাহাদের তরুণ হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তল হইতে কোন চিন্তা কোন আশা এই মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া পরস্পরের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছিল কি না।

দেখাশুনা শেষ হইলে সকলে বাসায় ফিরিলেন। পরদিন পানপত্র হইবে ঠিক হইল। মদনবাবু গিরীশের জ্যেঠামহাশয়কে পত্র লিখিয়া তাহার সম্মতি আনাইবার ভার লইলেন; পরদিন রাত্রের ট্রেনে গিরীশ বাড়ী যাইবে তাহারো বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

বিবাহের আর চারিদিন মাত্র সময় আছে, সরোজবাবু সকালে উঠিয়া দুই একজন আত্মীয়ের কাছে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য ফরম্ পূরাইয়া রাখিলেন, পত্রাদিও দুই একখানি লেখা হইল; এই সমস্ত কাজ শেষ করিয়া তিনি স্নান করিতে যাইবেন এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন।

দশমিনিটের পর সরোজবাবু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন। তিনি বাহিরে আসিয়াই টেলিগ্রামের ফরম্‌গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন তাহার পর স্নানাহার করিয়া তাড়াতাড়ি আফিসে চলিয়া গেলেন,—কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পানপাত্র হইবার কথা। সরোজ বাবুর দল নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ী উপস্থিত না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়া দুই একজন বন্ধুবান্ধবের সহিত সরোজবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। সরোজ বাবু তাহার অল্প পূর্ব্বে আফিস হইতে ফিরিয়াছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখিয়াই তিনি কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিলেন "মহাশয়, এ প্রতারণা করিবার স্থল নহে, অন্যত্র চেষ্টা দেখুন; আপনি করণে বিবাহ করিয়াছেন। সেইজন্য বহু চেষ্টায় স্বদেশে কন্যার বিবাহ দিতে অক্ষম হইয়া জুয়াচুরী করিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

এই অবমাননায় বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণের চক্ষে জল আসিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "আমি করণে বিবাহ করিয়াছি এ কথা মহাশয়কে কে বলিল? জুয়াচুরী আমাদের বংশের রীতি নহে। মদনবাবু আপনাদের আত্মীয়, আমার কোন দোষ থাকিলে তিনি তাঁহার পুত্রের সহিত আমার দ্বিতীয় কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিতেন না।"

সরোজবাবু পুলিশের কর্ম্মচারী, তাঁহার সাহেব ভিন্ন অন্য কাহারো প্রতিবাদ অসহ্য। লক্ষ্মীনারায়ণের কথা শুনিয়া তিনি সক্রোধে বলিলেন "মদনবাবু তাঁহার ছাগল লেজের দিকে কাটিতে পারেন, হয়ত তিনি আপনার দোষ অবগত নহেন; আরো এক কথা, আপনি বারই বলুন আর তেরই বলুন আমি জানিয়াছি আপনার কন্যার বয়স সতেরো বৎসরের কম নহে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এতদিন তাহার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই।"

লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ব্ববৎ কাতরভাবে বলিলেন "ভগবান জানেন কি মহাপাপ করিয়াছি যে সে জন্য আপনার কাছে আজ মিথ্যাবাদী বলিয়াও গণ্য হইলাম, বিবাহ দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা কিন্তু যাঁহারা আমাকে বিশেষ জানেন এরূপ দুই একজন সম্ভ্রান্ত লোকের নাম বলিতেছি তাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার কুলশীল সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন।"

সরোজ বাবু সদর্পে উত্তর করিলেন "আমি বিশেষরূপ জানিয়াছি, অধিক জানিবার আবশ্যক নাই, আমি আরো জানিয়াছি আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র নহে, সেই কলঙ্ক গোপন করিয়া কোন প্রকারে বিবাহ দেওয়াও আপনার কলিকাতা আসিবার অন্যতর উদ্দেশ্য! কুলটার সহিত আমার ভ্রাতার বিবাহ দিতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে।"

বৃদ্ধের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য ব্রাহ্মণ মৃতবৎ হইয়া রহিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভ্রম দূর হইল; ক্রোধ

ও ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া তিনি বলিলেন "আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমাকে আর বেশী কি বলিব? কিন্তু যদি আমি ব্রাহ্মণ হই তবে তুমিও তোমার কন্যার জন্য আমার মত মর্ম্মপীড়া পাইবে, তখন তোমার এ কথা মনে পড়িবে।"

কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ব্রাহ্মণ উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান করিলেন। বাসায় আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ সম্মুখেই অরুন্ধতীকে দেখিতে পাইলেন। সক্রোধে তাহাকে বলিলেন "হত-ভাগিনী, তোর জন্যই আমি লোকের কাছে অপমানিত হতেছি, তোর জন্যই লোকে আমার সুপবিত্র বংশে কলঙ্ক আরোপ করেছে, যদি তোর মৃত্যু হত ত আমি নিশ্চিন্ত হইতাম।" তাহার পর তিনি গৃহিনীর নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন, অরুন্ধতী গৃহান্তরে থাকিয়া সমস্ত শুনিতে পাইল।

পরদিন সকালবেলা লক্ষ্মীনারায়ণের বাসায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অরুন্ধতী তাহার বাপের আফিংয়ের কৌটা হইতে আফিং লইয়া খাইয়াছে; যখন সে যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল তখনই তাহার পিতামাতা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। ডাক্তার ডাকান হইল, বাঁচাইবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটী হইল না—কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ভব-তারিণী পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন; ব্যগ্রভাবে কন্যার দেহ বক্ষে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন "মা, তুই রাজরাণী হইবি বড়ই আশা ছিল, তা না হইল, তোকে লইয়া বনবাসিনী হইলেও যে আমি তোর হাসিমাখা মুখ দেখে সুখে থাকিতাম, তাহাও হইতে দিলিনে, তোকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?" দুঃখে, শোকে, মনস্তাপে বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণের হতাশ হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল—তিনি মুদিত কমলের ন্যায় বালিকার ক্লিষ্ট ও বিবর্ণপ্রায় মুখখানি অশ্রু প্লাবিত করিয়া বলিলেন "মা, আমি বড় অপরাধী, তাই বলে এত কঠোর শাস্তি দিলি? বুড়োকে চির অপরাধী ক'রে ফেলে চলে গেলি?"

অরুন্ধতী চকিতের ন্যায় একবার চক্ষু খুলিল। তাহার হস্তপদ তখন অসাড়, জীবন গ্রন্থী শিথিল প্রায়। বালিকা তাহার জ্যোতিহীন চক্ষু ঈষৎ প্রসারিত করিয়া পিতার হাতে হাত রাখিয়া অস্তমিত তপনের শেষ রশ্মিচ্ছটার ন্যায় ঈষৎম্লান হাসি হাসিল। সে হাসি যেন বলিল "মা, বাবা, দুঃখ করিও না। অভাগিনী আমি চলিলাম, একদিনের জন্যও তোমাদের সুখী করা দূরে থাক, আমার জন্য তোমরা পদে পদে অপমান ও যাতনা সহ্য করিতেছ, অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তোমাদের স্নেহের ঋণ এ জীবনে শোধ হইল না, এ ব্যর্থ ক্ষুদ্র জীবন কোন কাজেই লাগিল না।"

বালিকা কোন কথা বলিতে পারিল না। পৃথিবীর আবিলতা এবং লোকনিন্দা যে পবিত্রভূমি কলঙ্কিত করিতে পারে না—সেখানে সে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল।

এখনো বসুন্ধরা সেইরূপ হাস্যময়ী, প্রকৃতি পরম শোভান্বিতা এবং মানবজীবন পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মশীল। ত্রয়োদশবৎসর পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র জনবিরল পল্লীতে যে বালিকা কুসুম

কোরক মাতৃঅঙ্ক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, আজ এই জনপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ রাজধানীর বক্ষে সেই অকলঙ্ক, শুভ্র, কোমল কুসুমকলিকা অকালে ঝরিয়া পড়িল। একটি অসংযত এবং নিদারুণ বাক্যের কঠিন আঘাতে একটি পবিত্র জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল ; তাহার পিতামাতার নিরুপায় চিত্তে এই কঠোর স্মৃতি চিরজীবনের জন্য বিষাক্ত জীবের ন্যায় আঁকড়াইয়া থাকিল।

হায় মিথ্যা! তুমি সত্যের চির দীপ্তিমান উজ্জ্বল মুখও ক্ষণকালের জন্য অন্ধকার করিয়া দিতে পার, কিন্তু সে অন্ধকার শীঘ্রই অপসারিত হইয়া যায় এবং সত্য আবার পবিত্র বেশে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; তথাপি তোমার ক্ষণিক প্রভাবে সময়ে সময়ে যে ক্ষতি হয় শীঘ্র তাহার পূরণ হয় না।

আলোচনা।

ভাদ্রমাসের ভারতীতে "ভাষাপুষ্টি" শীর্ষক প্রবন্ধের আমন্ত্রণে কোন কোন পাঠক পাঠিকা ভারতীতে আলোচনার্থ কতকগুলি কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত লিখিতেছেন ঃ—

যদিও "ভাষাপুষ্টি" লেখক কেবল মাত্র নূতন ভাবপ্রকাশের জন্য উপযোগী শব্দ বা পদ সংগ্রহ বিষয়ে আমাদের আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তথাপি আমার বোধ হয় চলিত ভাবের চলিত শব্দ সম্বন্ধীয় আলোচনাও নিরর্থক নহে। সেই সাহসে নিম্নলিখিত পদ ও শব্দগুলি উপস্থিত করিলাম।

১। "শাপাদেবী শারাদেবী" এ কথার মূল কি? বেশী জিদ বা পীড়াপীড়ি জ্ঞাপক ভাষায় আমরা সচরাচর কথাটী ব্যবহৃত হইতে দেখি। যেমন "কি করি বলুন শাপাদেবী শারাদেবী করে এসে ধরলে কাজেই করতে হ'ল।" অনেক সময় এমনও বলি, "আমি কি না সহজে ছাড়বো শাপাদেবী শরাদেবী করব।' অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে নাকাল করবো। এইটাই অনেকটা ঠিক কেননা কথাটা বোধ হয় 'শাপাদপি শরাদপি'র অপভ্রংশ।

রাম যখন হরধনু ভঙ্গ করিয়া জানকীর পানিগ্রহণপূর্ব্বক মিথিলা হইতে অযোধ্যায় ফিরিতে ছিলেন তখন গুরুর অপমানে কুপিত পরশুরাম আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন ও গুরুর ধনুর্ভঙ্গে যে অবমাননা হইয়াছে, দ্বাবিংশতি বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে রামকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে তৎপর দেখিয়া স্বীয় ব্রহ্মতেজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন "তুমি আমার সহিত যুদ্ধে কখনই জয়ী হইতে পারিবে না—শাপাদপি শরাদপি।" ভবভূতির বীরচরিত গ্রন্থে ছত্রটা পাওয়া যায়।

[প্রকাশ বাবু "শাপাদপি শরাদপি" এই সংস্কৃত বাক্যটী হইতে যে "শাপাদেবী শারাদেবী" এই চলিত বাঙ্গালা বাক্যটীর উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ ঠিক হইয়াছে, কিন্তু ঐ বাক্যের নির্দ্ধারণ তাঁহার ভ্রান্ত হইয়াছে, যেহেতু ভবভূতির বীরচরিত গ্রন্থে উহা পাওয়া যায় না। ভাং সং।]

২। অর গুণ নেই বর গুণ আছে।—কথাটা যখন একই লোকের সৎগুণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণ অধিক দেখি তখন তাহার প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু 'অর' শব্দের অর্থ কি? এবং 'বর' শব্দে শ্রেষ্ঠ অর্থ করিলে কোন অর্থই পাওয়া যায় না। প্রকাশিত সাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কেবল ভারতচন্দ্রের "অন্নদা মঙ্গল" গ্রন্থে উল্লেখ যোগ্য সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

মেনকা ভবনে শিবের বিবাহ হইতেছে। এই সুযোগে আনন্দপ্রিয় বিষ্ণু স্বীয় বাহন গরুড়কে আহ্বান করিলেন, গরুড়ের আগমনে মহাদেবের স্কন্ধ ও কোটিস্থিত সমস্ত সর্প পলায়নপর হইল ; তাঁহার বাঘছাল খসিয়া পড়িয়া গেল ; তিনি যে দিগম্বর সেই দিগম্বর ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া এয়োরা নিন্দা করিতে লাগিল ও মেনকা বিস্তর দুঃখ করিতে ও নারদকে গালি দিতে লাগিলেন। উমা এদিকে প্রমাদ গনিলেন ও পাছে এখানেও আবার দক্ষ ভবনের ব্যাপার হয় ভাবিয়া মেনকাকে দিব্যজ্ঞান দিলেন ; তাহার প্রসাদে মেনকার চক্ষে মহাদেবের ভুবনমোহন রূপ বিভাসিত হইল এবং তখন—

মুগ্ধ হইল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ॥
হর গুণ বর গুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥

তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় হরগুণ নেই বরগুণ আছে ; অর্থাৎ মহাদেবের যে যথার্থ গুণ তাহার কিছুই নাই কেবল বর সাজিবার সময়কার চাকচিক্য গুণটাই আছে। তাই কি ?

কেহ কেহ বলেন 'অ' শব্দে বিষ্ণু অর্থাৎ সত্ত্বগুণ 'ব' শব্দে শিব অর্থাৎ তমগুণ।

৩। "পিলসুজ" শব্দের শুদ্ধ কি ?—পিতলসাজ। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা পিলসুজের পরিবর্ত্তে পিতলসাজ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী সরলাদেবী লিখিতেছেন ঃ—

১। "পয়সা" শব্দ কোথা হইতে আসিল ? ইহা যেরূপ সর্ব্বসাধারণে চলিত কথা তাহাতে সহজেই অনুমান হয় বুঝি অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শব্দের ন্যায় ইহাও ফার্সি হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু সেদিন একখানা স্প্যানিশ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে তদ্দেশীয় ক্ষুদ্র মুদ্রার নাম "পেয়্সা" এই আকারে পাইলাম। ইহা হইতে অনুমান করিতেছি পর্টুগিজদের আমলে 'পয়সা' শব্দ আমাদের ভাষায় গৃহীত হইয়া থাকিবে।

২। ইংরাজী "পেটিকোট" কে বাঙ্গালায় "ঘাগরা" বা "সায়া" বলা হয়। "সায়া" কথাটাই বেশী গ্রাম্য, এবং হিন্দীতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহা হইতে অনুমান হইতে পারে ইহা উর্দ্দু শব্দ, কিন্তু তাহা নয় ইহাও সম্ভবতঃ পর্টুগীজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ইংরাজী "পেটিকোট"কে স্প্যানিশ ভাষায় "সায়া" নামে উল্লিখিত দেখিলাম।

৩। ইংরাজী Correspondence শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নাই ; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উহার একটী সুন্দর প্রতিশব্দ আছে—"পত্রব্যবহার"। এই শব্দটী আমাদের ভাষায় গ্রহণ করা উচিত। এস্থলে বক্তব্য ভারতীতে ইহা দুই একবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার নামকৌতুক নামক প্রবন্ধে একটি উড়িয়া শব্দের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্ত্রীবন্ধু অর্থে

সে দেশে বান্ধবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কথাটি মনে রাখিলে আবশ্যক স্থলে বিশেষ সুপ্রযুক্ত হইবে।

৫। Man proposes God disposes এই ইংরাজী প্রবচনটির সুন্দর বাঙ্গলা প্রতিরূপ হয়—"মানুষের আর্জ্জি ভগবানের মর্জি"। অনেকেই জানেন বোধ হয় আর্জ্জি এই উর্দ্দু শব্দের অর্থ আবেদন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন ঃ—

১। Assimilate শব্দের বাঙ্গালা কি হইতে পারে?—আত্মসাৎ। ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত সংস্কৃত "ব্রজবিহারে" পাওয়া যায়।

২। Manners—আদব।

৩। Etiquette—কায়দা।

৪। Good breeding—সহবৎ।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ। স্থর—শ্রীরামতারণ সান্ন্যাল।

স্থরট-মিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে নমঃ বামন-রূপধারী।
গোপীগণ মনমোহন মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান ভঙ্গ।
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী উন্মাদ তরঙ্গ॥
দৈত্যছলন নারায়ণ স্থরগণ-ভয়হারী।
ব্রজবিহারী গোপনারী মান ভিখারী॥
জয় রাধে শ্রীরাধে।

ধ১ র্স১ র্স । র্স১ র্স র্সন১ । ধ১ র্স১ ন১ । ধনধ১ প১ ধ১ । প২ ম১ । ম১ গ১
চ — ন্দ্র কি র ণ অ — ঙ্গে — ন ম বা—ম ন রূ

মগ১ । র১ প১ প১ ।—৩ ॥ প২ ধ১ ।—১ র্র১ র্র১ । র্স১ র্স১ ন১ । ধ১ ন১ ধ১ ।
প ধা — রী —॥ গো পী — গ ণ ম ন মো হ — ন
(শেষ)

প১ ধ১ প১ । ম২ গ১ । র১ ম১ গ১ । রগ১ স২ ॥ [ম১ প১ প১ । প২ প১ ।
ম — ঞ্জু কু ঞ্জ চা — রী — —॥ [জ য় রা ধে শ্রী

ধ১ র্স১ ন১ । ধনধ১ প১ ধ১ ॥]প১ ধ১ ধ১ ।—১ ধ১ ধ১ । প১ র্স১ ন১ । ধনধ১
রা — — ধে — —॥]ব্র জ বা — ল ক স — ঙ্গ —
(আ-প্র)

প১ ধ১ । ন১ ন১ ন১ । র্স২ র্রর্গ১ । র্র৩ । র্স৩ ॥ ধ১ র্স১ র্স১ ।—১ র্স ন১ । ধ১
— — ম দ ন মা ন ভ ঙ্গ॥ উ — ন্মা — দি নী ব্র

র্স১ ন১ । ধ১ ন১ ধ১ । প১ ধ১ প১ । ম২ গ১ । র১ ম১ গ১ । —৩॥ র্স১
জ কা মি — নী উ — ন্মা দ ত র — ঙ্গ —॥ দৈ

র্র১ র্র১ । র্র১ র্র১ র্গর্মর্গ১ । র্র২ র্স১ ।—১ র্স১ ন১ । ধ১ র্স১ ন১ । ধন১ প১
— ত্য ছ ল ন না—রা —য় ণ সু র গ ণ ভ

প১ । প১ ধ১ ধ১ ।—৩ ॥ ধ১ ধ১ ধ১ । ধ১ র্র১ র্র১ । র্স২ ন১ । ধ১ ন১ ধ১ ।
য় হা — রী —॥ ব্র জ বি হা — রী গো প না — রী

প১ ধ১ প১ । ম২ গ১ । র১ ম১ গ১ । রগর১ স২ ॥[ম১ প১ প১ । প১
মা — — ন ভি খা — রী — —॥[জ য় রা ধে

প১ । ধ১ র্স১ ন১ । ধনধ১ প২ ॥]
শ্রী রা — — ধে —]

(আ-প্র)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

একদিন।

একদিন নাহি মনে
লোক মাঝে কি বিজনে
কোথায় কবে কেমনে
হয়েছিল দেখা।
মাস বর্ষ গেল এল
দিন রাত্রি—আঁধা আলো
কত মন্দ, কত ভাল
নাহি তার লেখা।
তার সেই মৃদু হাসি—
মল্লিকা সুরভিরাশি
উড়িতেছে—বার মাস-ই
পরাণ ভরিয়া।
সেই সে চাহনি-ধারা
চাঁদ যেন ঠাঁই হারা
উঠিছে জীবনে সারা
আঁধার হরিয়া।
নীরবে পূজিনু তায়
সেই সুখ প্রতিমায়
নিবেদিয়ে আপনায়
আপনা ভুলিনু।
আর নাহি কাছে যাই
তার কথা শুনি নাই
প্রাণপদ্মে তার ঠাঁই
বিরহ মুলিনু।
তবু জানি ঘুমে ঘোরা রজনীর মাঝে,
বিস্মৃতি মাখানো ভোরে, ম্লানমুখী সাঁঝে,
সব ভুলি প্রাণ্ন যবে খেলে প্রাণ সনে,
সেই দেখা, সেই পূজা পড়ে তার মনে।

ধর্ম্ম ও বুদ্ধি।

(কেয়ার্ড।)

কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মজ্ঞান বুদ্ধির সীমার বহির্ভূত; যখন আমরা কোন সসীম বস্তুর চিন্তা করি, তখন বুদ্ধি দ্বারা ঐ চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পৃথক্ করিতে পারি, আর সেগুলি পরস্পরের সহিত সঙ্গত কি না, এবং প্রমাণসাধ্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ের আমরা মীমাংসা করিতে পারি। কিন্তু যখন আমরা সসীম বস্তুসমূহের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অসীম অনন্তে গিয়া উপনীত হই, তখন আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা উহা আয়ত্ত করা আমাদিগের সাধ্য নহে। সসীম বুদ্ধি দ্বারা অসীম ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা দূরে থাকুক, উহা কল্পিতও হইতে পারে না। তবে কি আমাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান, ধর্ম্ম জ্ঞান, কিছুই নাই? অবশ্য আছে; কিন্তু যাহা আছে, তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ হয় না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান, ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান আমাদিগের স্বতঃ লব্ধ; উহার জন্য বুদ্ধির আলোকের প্রয়োজন নাই, ন্যায়শাস্ত্রের তর্কের প্রয়োজন নাই। আমরা যখন বিশ্বাসের চক্ষু উত্তোলন করিয়া ঈশ্বরের দিকে চাহি, তখন তিনি আপনি আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দেন; সে সময় আমরা আমাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতদূর নিশ্চয় বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের অস্তিত্বেও ততদূর বিশ্বাস করি! ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রমাণ সাপেক্ষ নহে, উহা স্বভাবতঃই আমাদিগের মনে বিদ্যমান আছে এবং আমরা স্বভাবতঃই উহা বিশ্বাস করিয়া থাকি।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে এই বুঝায় যে ধর্ম্মতত্ত্ব আর বিজ্ঞান দুটী পৃথক্ বস্তু। বিজ্ঞানে বুদ্ধির চালনা ব্যতিরেকে কোন পথ নাই; আর ধর্ম্মতত্ত্বে কেবল বিশ্বাসের প্রয়োজন, বুদ্ধির যুক্তি প্রয়োগ করিতে যাইলেই যত প্রকার সন্দেহ, মনোমালিন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকার মত নূতন নহে; অনেক দার্শনিক ও অনেক প্রচারক উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকগণের মধ্যে এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; ইঁহারা বলেন যে আমরা এমন কতকগুলি বিষয় জানি যাহাদিগের কোন প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না অথচ সেগুলি আমরা স্বভাবতঃই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সকল মনুষ্যের মনেই বিদ্যমান আছে এবং সকলেই উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে ধর্ম্ম জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, উহা প্রমেয় নহে। ধর্ম্মপ্রচার করা যাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এই মতের পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখেন যে বিজ্ঞানে যাহা কিছু আলোচিত হয়, তাহাকে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করা হয়; পরে এই প্রত্যেক

নোট—এই প্রবন্ধটী কেয়ার্ডের ধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া লিখিত; যাঁহারা ইংরাজী পড়েন না তাঁহাদিগের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল।

অংশের মধ্যে কতটুকু সত্য আর কতটুকু কল্পিত তাহা বিচার করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান প্রত্যেক পদে প্রমাণ চাহে; প্রমাণ ব্যতীত উহা কিছুই বিশ্বাস করে না। অতএব যদি ধর্ম্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে একবার প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেখানেও উহা দ্বারা সন্দেহের পতাকা উত্থাপিত হইবে। লোকে এক্ষণে যাহা সহজেই বিশ্বাস করিতেছে, তাহা হয় ত বা আর বিশ্বাস করিবে না; লোকে এক্ষণে যাহার ভয়ে ধর্ম্মপথে রহিয়াছে, হয় ত বা আর তাহার ভয় করিবে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অনেক ধর্ম্মপ্রচারক প্রথমেই বলিয়া বসেন যে ধর্ম্মবিশ্বাস যুক্তিসাপেক্ষ নহে; ধর্ম্মজ্ঞান বিজ্ঞানের সীমার বাহিরে, উহা বিজ্ঞানের অনেক উপরে।

ধর্ম্মতত্ত্বে বুদ্ধির প্রয়োগ হইতে পারে না এরূপ মতের প্রকৃত মূল কি এবং এরূপ মত বাস্তবিক গ্রাহ্য কি না আমরা আপাততঃ এই দুই প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি। সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে বুদ্ধির উচ্চ ধাপে এক প্রকার জ্ঞান আছে আর ধর্ম্মজ্ঞান এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এরূপ বলিবার প্রধান কারণ এই যে আমরা যাহা কিছু বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করি তাহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং তাহা সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সহজ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করি, ততক্ষণ আমরা অসীম অনন্ত মূর্ত্তি আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই; উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের মনে কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয় না। আমরা জানি আমাদিগের যেরূপ অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরেরও সেইরূপ অস্তিত্ব আছে; আমাদিগের নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ কোন প্রমাণ আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন প্রমাণের প্রয়োজন মনে করি না। দুইটী অস্তিত্ব যেন একত্র গ্রথিত আছে; ভক্ত ঈশ্বরকে তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পান আর তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আমরা যখন এই সহজ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদিগের পথে অনেক বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এই বিঘ্ন যে বুদ্ধি দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না; ঈশ্বরের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আমরা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি কথা, প্রস্তাব ও তর্ক সংগ্রহ করি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ ভক্ত ঈশ্বরকে এক অসীম, সর্ব্বশক্তিময় মহাপুরুষ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন আর উহা হইতে তিনি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিয়াথাকেন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে এক এক করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে হয়। এক ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে এক্ষণে তাঁহাকে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণের আলোচনা করিতে হয় আর এরূপ করিতে হইলেই তাঁহাকে এক সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিতে হয়। কোথায় অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিময় পুরুষ, আর কোথায় তাঁহার গুণ সমূহ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক ঈশ্বরের চিন্তা করা যায়, ততক্ষণ আমরা অনন্তে নিমগ্ন থাকি! আর যখন আমরা ঈশ্বর ছাড়িয়া ঈশ্বরের গুণ ও তাহার ফলসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিচারে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা এক সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করি। আর এই সমুদয় গুণ ও ফল সমূহের আলোচনার পরে কি আবার সেই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে পাই? বুদ্ধি কোন বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু পরে কি আবার সেই খণ্ড সমূহ হইতে সমুদয় বস্তুটী গড়িয়া তুলিতে পারে? ইহার উত্তরে কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে বুদ্ধি দ্বারা কেবল কতকগুলি ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে; ঈশ্বরের এক একটী গুণের স্থলে আমাদিগের মনে এক একটী ভাব কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু এ সমুদয় ভাব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহারা যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হইত তাহা হইলে তাহারা এক একটী ভাব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না; সুতরাং আমরা বুদ্ধি হইতে সমুদয়ের পরিবর্ত্তে তাহার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি দেখি মাত্র। আবার ইহা ভিন্ন আরও দেখিতে হইবে যে মানবের বুদ্ধি ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ; সীমাবদ্ধ বুদ্ধি কি করিয়া অনন্ত পুরুষের অসংখ্য গুণ সমূহের ইয়ত্তা করিতে পারিবে? অতএব দেখা যাইতেছে যে যখনই আমরা বিশ্বাস ছাড়িয়া ধর্ম্মতত্ত্বে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে উদ্যত হই, তখনই অনাদিপুরুষের দিব্যমূর্ত্তি আমাদিগের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়; বিশাল সমুদ্রের উপলখণ্ডগুলি আমরা দেখিতে পাই মাত্র! অবশেষে আর একটী কথা এই যে কোন বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে তাহার অপেক্ষা উচ্চ বিষয়ের প্রয়োজন হয়; যাহা আমরা প্রমাণ করি তাহা প্রথমে নিশ্চয় বলিয়া জানি না, কিন্তু যাহা হইতে প্রমাণ করি তাহা নিশ্চয় বলিয়া জানা চাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যাহা সর্ব্বোচ্চ; যাহা সর্ব্বসত্যের মূল, তাহার অপেক্ষা উচ্চ আর তাহার অপেক্ষা অধিক সত্য আমরা কোথায় পাইব? সসীম মানববুদ্ধি হইতে অসীম প্রকৃতির প্রমাণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না লই, তাহা হইলে সসীম বিষয় হইতে আমরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিব সে ঈশ্বরও সসীম হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ধর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োগের বিরুদ্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কতদূর সত্য; ধর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রবেশ করিবার অধিকার আছে কি না। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করিবার বিপক্ষে লোকের প্রধান আপত্তি এই যে বিশ্বাসে ভক্তি ও হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি জন্মে, আর বুদ্ধিতে তাহার স্থলে তর্কশাস্ত্রের জটিলতা ও জঞ্জাল সংস্থাপন করে। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য লোককে ধার্ম্মিক করা নহে; লোকে কি কারণে ধার্ম্মিক হয়, লোকের কিরূপে ধর্ম্মবিশ্বাস জন্মে তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের কার্য্য। কোন ব্যক্তির মনে যদি ভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান তাহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে না। যেমন কেবল চিত্রবিদ্যার গ্রন্থ পড়িয়া কেহ উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতে পারে না, অথবা কেবল নীতিগ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ যেমন সুচরিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ কেহ কেবল ধর্ম্মতত্ত্বের সুযুক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে; কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ যুক্তিগুলির ফল কি দাঁড়াইবে তাহা সে ব্যক্তির প্রকৃতির উপর

নির্ভর করিবে। ভক্তি ও জ্ঞান দুটী স্বতন্ত্র বিষয়; ধর্ম্মবিজ্ঞান লোককে কেবল জ্ঞান দিতে প্রস্তুত, ভক্তি দিতে সে কখনও প্রতিশ্রুত হয় নাই। অতএব যদি আমরা বলি যে ধর্ম্মবিজ্ঞান হইতে ভক্তি জন্মে না; তাহা হইলে উহাতে কেবল আমাদিগের বুঝিবার ভ্রম প্রকাশ পায় মাত্র, ধর্ম্মবিজ্ঞানের কোন দোষ সাব্যস্ত হয় না। মানুষের যতগুলি কার্য্যক্ষেত্র আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষের বুদ্ধির প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে কার্য্য করিবার সময় আমরা চেষ্টা ও উদ্যম লইয়াই ব্যস্ত থাকি; ভিতরে ভিতরে বুদ্ধির ক্রিয়া দেখিতে পাই না। পরে যখন কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তখন স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহার উদ্দেশ্য, প্রণালী ও ফল বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারি। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে কার্য্য করিতে কিরূপ সুখ, কিরূপ আনন্দ; আর কার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাইলে সে সুখ ও আনন্দের পরিবর্ত্তে কেবল শিরঃপীড়া ও মস্তিষ্কঘূর্ণন জন্মে। কিন্তু তাঁহার কথায় ইহা সপ্রমাণ হয় না যে কার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের চিন্তা করা উচিত নহে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে কর্ম্ম ও চিন্তা দুটী পৃথক্ বিষয়; ধর্ম্মক্ষেত্রেও সেইরূপ। যখন কেহ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি কর্ম্মে ব্যাপৃত; এই কর্ম্মের পর আবার উহার সম্বন্ধে চিন্তা করা যাইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানতঃ ধর্ম্মরাজ্যের চিন্তা লইয়াই ব্যাপৃত; ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সংসারে যে সমুদয় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মতন্ত্র বর্ত্তমান আছে, লোককে ধার্ম্মিক করা তাহাদিগেরই কার্য্য; আর ধর্ম্মরাজ্যে যে সমুদয় সত্য নিহিত আছে, সেগুলি আবিষ্কার করা ধর্ম্মতত্ত্বের কার্য্য। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব লোককে ধার্ম্মিক করে না বলিয়া উহাকে দোষ দেওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটী আপত্তি এই উত্থাপিত হইয়া থাকে যে বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা আমরা ঈশ্বরের দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাই, আর তাহাতে আমাদিগের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়; কিন্তু বিশ্বাস ছাড়িয়া জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করিলে আমরা কেবল কতকগুলি বিশ্লিষ্ট চিন্তা প্রাপ্ত হই মাত্র, সেগুলি সাধারণ লোকের পক্ষে নীরস আর তাহাদিগকে একত্র করিলেও আমরা উক্ত দিব্য মূর্ত্তি পূর্ণ মাত্রায় গড়িয়া উঠিতে পারি না। ধর্ম্মতত্ত্ব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, কার্য্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল বিষয় জানিতে পাওয়া আর চক্ষুর সম্মুখে ঈশ্বরের কমনীয় মূর্ত্তি দর্শন করা এ দুয়ে কি স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ নহে? ইহার উত্তর এই যে ধর্ম্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে এস্থলে যে আপত্তি করা হইতেছে, অন্যান্য সমুদয় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও ঠিক ঐরূপ আপত্তি করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লোকে যদি এ সকল বিজ্ঞান উপকারী বলিয়া স্বীকার করে, তবে কেবল মাত্র ধর্ম্মবিজ্ঞান দোষের ভাগী হইবে কেন? আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা একরূপ একত্ব অনুভব করিয়া থাকি; যেমন রাম এক ব্যক্তি, শ্যাম এক ব্যক্তি ইত্যাদি; ইহাদিগের প্রত্যেকের একত্ব জ্ঞান ইন্দ্রিয় হইতে জন্মে। বিজ্ঞানেও একরূপ একত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে;

কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়জ একত্ব হইতে পৃথক, তাহা চিন্তারাজ্যের ফল। যখন আমরা বলি যে রাম শ্যাম প্রভৃতি মানবসমূহ অমর আত্মাবিশিষ্ট; তখন আমরা উহাদিগের মধ্যে একটী একত্ব দেখিতে পাই, কিন্তু চক্ষু দ্বারা নহে—চিন্তা দ্বারা। রাম শ্যাম প্রভৃতি চক্ষুর সম্মুখে পরস্পর হইতে বিভিন্ন, কিন্তু চিন্তার সমক্ষে তাহারা এক। অর্থাৎ তাহাদিগের সকলের মধ্যেই এই একটী গুণ বিদ্যমান আছে যে তাহারা অমর আত্মাবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হইয়া থাকে, তাহা এই চিন্তাজাত একত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে সমানত্ব; যেমন উত্তাপ দ্বারা পদার্থ দ্রব হয়, ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহার অর্থ অবশ্য এই যে লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থ সকলেই উত্তাপ সম্বন্ধে এক, সমান; ইহারা সকলেই উত্তাপে দ্রব হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে নীরস, এমন কি অপ্রীতিকর হইতে পারে। মনে কর লতা, পাতা, ফুল ও ফল বিশিষ্ট তরু তোমার সম্মুখে রহিয়াছে; উহা দেখিয়া তোমার আনন্দ জন্মিতেছে। এক্ষণে একজন বৈজ্ঞানিক আসিয়া উহার ফল, ফুল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল; গাছটী কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল; এবং পরে এই সকল অংশ তাহার যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। তোমার পক্ষে ইহাতে বিরক্তি জন্মিবার কথা; যাহা তোমার চক্ষুতে একটী পদার্থ ছিল; এক্ষণে বৈজ্ঞানিক তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিয়াছে। সে ইন্দ্রিয়জ একত্ব আর নাই। ইহা সত্য বটে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন এইরূপে অনেক গুলি তৃণ লতা বৃক্ষ পরীক্ষা করিয়া উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিল, উদ্ভিদরাজ্যের নিয়মগুলি প্রকটিত করিল; তখন কি তোমার তাহাতে বিস্ময় ও আনন্দ জন্মে না? অবশ্যই জন্মিয়া থাকে; নতুবা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এত প্রচার হইল কেন? আবার দেখ, উদ্ভিদবিজ্ঞান যতই কেন উন্নত হউক না কেন, উদ্ভিদরাজ্যের নিয়মসমূহ যতই কেন আবিষ্কৃত হউক না কেন, এই সকল নিয়ম অনুসরণ করিয়া কেহ কখনও একটী উদ্ভিদের সৃজন করিতে পারিবে না। উদ্ভিদের সৃজন অবশ্য কতকগুলি নিয়ম অনুসারে ঘটিয়াছে; আমরা এই সকল নিয়মের কেবল কয়েকটী জানি মাত্র, অপর কয়েকটী জানি না। সমুদয় নিয়মগুলি সৃষ্টিকর্ত্তা জানেন আর তিনিই সৃজন করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা কখনও বলি না যে বৈজ্ঞানিক যেখানে তাঁহার বিজ্ঞান দ্বারা উদ্ভিদ সৃজন করিতে পারেন না, অতএব তিনি কোন উদ্ভিদকে খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিয়া নষ্ট করিতেও পারিবেন না। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে একত্ব অনুভব করি, বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা সে একত্ব পুনরায় গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে সংসারের কোন বস্তুরই নিয়মগুলি আমরা অবগত নহি, আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে সমুদয় অবগত হইবারও সম্ভাবনা নাই; তথাপি আমরা বিজ্ঞানে যাহা জানিতে পাই, তাহার অনাদর করি না। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে সহজেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃতি বোধগম্য হইবে; ইন্দ্রিয়জ একত্ব ভিন্ন ভিন্ন অংশে

বিভক্ত হইয়া বিজ্ঞানে বহুত্বে পরিণত হয়। অতঃপর বিজ্ঞানে এই সকল অংশের পরীক্ষা ও বিচার হইয়া প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞান যতই কেন উন্নত হউক না, উহা হইতে ইন্দ্রিয়জ একত্ব সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্মতত্ত্ব একটী বিজ্ঞান, অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানেও যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় ইহাতেও তাহা হইয়া থাকে। অন্যান্য বিজ্ঞানের পক্ষে যাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না, ইহার পক্ষেও তাহা দূষণীয় নহে।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে উল্লিখিত শেষ আপত্তি এই যে উহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে, কিন্তু সসীম চিন্তা হইতে অসীমের প্রমাণ সম্ভব নহে। আপত্তিকারকগণ বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান একপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান; আমরা যেমন জানি আমাদিগের অস্তিত্ব আছে, সেইরূপ আমরা ইহাও জানি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। উভয় অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকি, উহাদিগের কোনটীই জানিবার নিমিত্ত প্রমাণের দরকার হয় না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয়, তবে উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতেও জন্মিতে পারে না; অর্থাৎ উভয় পক্ষেই একই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। জ্ঞান শব্দে দুইটী বস্তু বুঝায়, যে জানে ও যাহা জানা যায়। যদি বল যে তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হইতেছ; তাহা হইলে ইহা বুঝা যায় যে তুমি ও ঈশ্বর এই দুয়ের মধ্যে তোমার চিন্তা অবস্থিত আছে আর তাহাতেই তুমি ঈশ্বরকে জানিতে পারিতেছ। ঐ চিন্তা অবশ্য তোমার চিন্তা, নতুবা ইহা কখনই বলিতে পার না যে তুমি ঈশ্বরকে জানিতেছ; আর তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে যদি তোমার চিন্তা উপস্থিত না থাকিত তাহা হইলে অবশ্য তুমি ঈশ্বরকে জানিতে পারিতে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও চিন্তার প্রয়োজন; কিন্তু তুমি যেখানে সসীম, তোমার চিন্তাও সসীম আর সসীম চিন্তা দ্বারা অসীমের জ্ঞান কিরূপে জন্মিবে। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই পাইতেছি যে উল্লিখিত তৃতীয় আপত্তিতে যদি কোন সত্য থাকে, তবে উহা ধর্ম্মতত্ত্বের যুক্তির বিরুদ্ধে যেরূপ খাটিবে বলিয়া মনে হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদের পক্ষেও সেইরূপ খাটিবে। যাহা হউক ধর্ম্মতত্ত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে পদ্ধতিতে প্রমাণ করিতে চাহে লোকে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না বলিয়াই ঐরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে। সসীম বস্তুর প্রমাণ আর অসীম বস্তুর প্রমাণ দুটী ঠিক একরূপ নহে; আমরা বলি লৌহ একটী ধাতু অতএব উহা উত্তাপসঞ্চালক অর্থাৎ উহার এক প্রান্ত উত্তপ্ত করিলে অপর প্রান্তও উত্তপ্ত হইবে। এস্থলে আমরা লৌহের ধাতবত্ব গুণ হইতে উহার উত্তাপ সঞ্চালকত্ব গুণ প্রমাণ করি; ইহার কারণ আমাদিগের মনে ধাতবত্ব বলিতে যে সকল গুণ বুঝায়, সঞ্চালকত্ব তাহাদিগের অন্তর্গত; সসীম বস্তুর সম্বন্ধে প্রমাণ বলিতে কোন সাধারণ গুণ হইতে কোন বিশেষ গুণের নির্দ্ধারণ বুঝায়। ধর্ম্মতত্ত্ব যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইরূপে প্রমাণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে; কারণ ঈশ্বরত্ব বলিতে সকল প্রকার

সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা ও অপরিমেয় সমষ্টি বুঝায়, উহা অন্য কোন গুণের অন্তর্গত হইতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্যরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে; আমরা যদিচ সসীম, তথাপি আমাদিগের মনে অসীমের আভাষ বর্ত্তমান আছে। আমরা যদি অসীমের সম্বন্ধে কিছুই না জানিতাম, তবে আমরা যে সসীম তাহাও জানিতে পারিতাম না, কারণ অসীম ও সসীম দুটী পরস্পর সম্বন্ধভাব, একের অভাবে ইহাদিগের অন্যের চিন্তা হইতে পারে না। মানুষের মনে অসীমের যে আভাষ বর্ত্তমান আছে, ধর্ম্মতত্ত্ব তাহা রীতিমত যুক্তি অনুসারে চিন্তা করিয়া থাকে, আর সেই চিন্তা হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণসমূহ নির্দ্ধারণ করে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মতত্ত্ব এরূপ বলে না যে মানুষ আপনার বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে; মানুষ স্বয়ং ক্ষুদ্র, অতএব সে আপনা হইতে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি মানুষকে তাঁহার স্বকীয় প্রকৃতির কতকটা আভাষ দিয়াছেন; আর এই আভাষের সাহায্যেই সে ঈশ্বরের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদীরা বলেন যে ঈশ্বরকে জানিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই; ধর্ম্মতত্ত্ব বলে যে যুক্তির সাহায্য না লইলে পরিপক্ক জ্ঞানলাভ হইতে পারে না, আমরা কতদূর ঠিক জানি আর কতদূর জানি না তাহা নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারি না। সাধারণতঃ আমরা সসীম বস্তুর আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকি; আমাদিগের মনে অসীমের যে চিহ্ন আছে তাহা দেখিতে পাই না। ধর্ম্মতত্ত্ব বলে যে চিন্তা দ্বারা ও যুক্তির সাহায্যে আপনাকে সসীমের বন্ধন হইতে মুক্ত কর আর তাহা হইলে সসীম ও অসীমের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে; তখন আর তুমি অসীমের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবে না, অর্থাৎ অসীমের অস্তিত্ব তোমার নিকট সপ্রমাণ হইবে।

এক্ষণে আমাদিগের ইহা বিচার করিতে হইবে যে অপর পক্ষীয়েরা যাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলেন তাহার উপর আমরা কতদূর নির্ভর করিতে পারি; তাহা দ্বারা আমরা ধর্ম্ম-রাজ্যের সত্য নির্ণয় করিতে পারি কি না। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা আমরা সত্য যেরূপ নিশ্চয় জানিতে পারি, সেরূপ অন্য কিছু দ্বারাই পারি না। যেমন, আমরা প্রত্যক্ষ কোন ব্যক্তিকে দেখিলে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনরূপই সন্দেহ থাকে না আমাদিগের নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ কোন প্রকার সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মে না, উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধেও সেইরূপ জন্মে না। প্রমাণই বল আর যুক্তিই বল নিশ্চয় জ্ঞানলাভের পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহিত ইহাদিগের তুলনাই হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সহজ বিশ্বাসের চক্ষুতে প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেরূপ নিশ্চয় জানিতে পান তার্কিকেরা শত সহস্র যুক্তিদ্বারাও সেরূপ নিশ্চয় জানিতে পান না। এরূপ বাক্যের অর্থ যদি ইহা হয় যে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা আমাদিগের মন দ্বারা; আমাদিগের মনের নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে তাহাই সত্য, আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিষয় আমাদিগের মনে ঐরূপ প্রতীতি জন্মাইতে না পারে, ততক্ষণ প্রর্য্যন্ত তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না;

তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্বের এসম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্বও বলে যে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা আমাদিগের মন দ্বারা, আমাদিগের মনের সমক্ষে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত তাহাই সত্য।

ইহা ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব একথাও স্বীকার করে যে কোন কোন বিষয় আমাদিগের মনের নিকট প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব ইহা স্বীকার করে না যে ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা লব্ধ। ধর্ম্মতত্ত্ব বলে যে আমাদিগের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল অনুভূতি আছে, সেগুলি চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তবে আমরা ধর্ম্মরাজ্যের সত্য সমূহ আবিষ্কার করিতে পারি। প্রতিপক্ষ কহেন যে, প্রমাণ করিতে হইলে একবিষয় হইতে অন্য বিষয় প্রমাণ করা হয়; তুমি খ হইতে কয়ের প্রমাণ করিলে, পরে গ হইতে খয়ের তারপর ঘ হইতে গয়ের ইত্যাদি। কিন্তু তুমি ক্রমান্বয়ে আর কিছু এই রূপে প্রমাণ করিয়া যাইতে পার না, অবশেষে তোমার এমন কোন বিষয়ে পৌঁছাইতে হয় যাহার আর কোন প্রমাণ সম্ভবে না। যে সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ সম্ভব নহে তাহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ কহে। স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলি আমাদিগের সর্ব্বোচ্চ বিষয় আর ইহাদিগের হইতে আমরা অন্যান্য সমুদয় বিষয়ের প্রমাণ করিয়া থাকি। স্বতঃসিদ্ধের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা আমাদিগের মনে স্বভাবতঃই বর্ত্তমান আছে, ইহা আমাদিগের কষ্ট করিয়া শিখিতে হয় না, আর ইহা কেহ আমাদিগকে বলিবামাত্রই আমরা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া স্বীকার করি। আমরা যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মতত্ত্বে আমরা সকল পদার্থ, সকল সত্যের মূল ঈশ্বরের প্রকৃতি বিচার করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রকৃতি অপেক্ষা আমাদিগের পক্ষে আর কোন বিষয় উচ্চতর হইতে পারে হই ইহা আমাদিগের নিকট সর্ব্বোচ্চ, অতএব ইহার আমরা কোন প্রমাণ দিতে পারি না। ইহার সম্বন্ধীয় সত্য আমাদিগের নিকট স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে যে সকল কথা বলা হইল, সেগুলি প্রথমতঃ শুনিতে সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সবিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে আর তাহা হয় না। সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে রামের নিকট যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, শ্যামের নিকট তাহা সেরূপ না হইতে পারে; রাম বলিল "এই বিষয়টী আমার নিকট নিশ্চয় সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ"। ইহার উত্তরে শ্যাম বলিতে পারে "আমার নিকট উহা সেরূপ মনে হয় না, বরং উহার বিপরীতটী আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ।" তাহার পর মনে কর যদিই বা রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি কোন সমাজের লোক একটী বিষয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করে, তথাপি সে সমাজের বাহিরে অন্য সমাজের উহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। ফলতঃ ধর্ম্মবিষয়ে এমন কোন মতই নাই যাহা সকল সময় সকল সমাজের লোক স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা কাহার মত সত্য আর কাহার মত মিথ্যা বলিয়া ঠিক করিব? পৃথিবীতে যে সমুদয় জাতি আছে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি ঈশ্বরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া থাকে আর

সেই নিমিত্ত তাহারা নানাপ্রকার বস্তু তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কোপ হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আবার অন্য কোন কোন জাতি ঈশ্বরকে প্রেমের মূল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইতে কোন প্রকার অনিষ্ট সম্ভবে না ইহা বলিয়া থাকে। এস্থলে আমরা কোন্ জাতির মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব ? যদি বল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতিগণের মত গ্রাহ্য নহে; যে জাতি সভ্যতার সর্ব্বোচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছে তাহাদিগের মতই গ্রাহ্য; তাহা তাহা হইলে তুমি প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিলে যে সত্য নির্ণয় করিতে হইলে সভ্যতার আবশ্যক, উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক, জ্ঞানালোকের আবশ্যক। অর্থাৎ সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিয়া থাকেন, ধর্ম্মতত্ত্বেও আমাদিগের সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মবিষয়ক সত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হয় না, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা।

যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদের সমর্থন করেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ধর্ম্মবিষয়ক সত্যগুলি যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে যুক্তি ও তর্কপ্রয়োগ করার পর ফল এই দাঁড়াইবে যে আমাদিগের ধর্ম্মবিষয়ক মত সমূহ সংস্কার হইতে উৎপন্ন। আর তাহা হইলেই ধর্ম্মরাজ্যে সংশয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেওয়া হইবে; কারণ যাহা সংস্কারজাত তাহা অনেক সময় ভ্রমময় বলিয়া দেখা যায়। সত্য বটে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাসগুলি অভ্যাস ও সংস্কারের ফল বলিয়া গণ্য করেন; ইঁহাদিগের মতে ঈশ্বরে বিশ্বাসই বল, পরকালে বিশ্বাসই বল, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কারই বল—ধর্ম্মবিষয়ক সমুদয় বিশ্বাসগুলিই আমাদিগের শৈশবকালীন শিক্ষার ফল। আমাদিগের চিন্তাবৃত্তি যখনও সম্যক্‌স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, আমরা সত্যমিথ্যার প্রভেদ যখনও বুঝি নাই, তখন লোকে আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছে তাহাই—আমাদিগের মনে বসিয়া গিয়াছে, আমাদিগের মনে তাহারই অনুযায়ী সংস্কার দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদীরা বলেন যে ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান যদি স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে অবশ্য উহা সংস্কারজাত হইবে; কিন্তু একথা ঠিক নহে। ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান আর এক প্রকারে লব্ধ হইতে পারে; উহা চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে সপ্রমাণিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে আর আমাদের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সামান্য বিষয়গুলির প্রমাণ আর ধর্ম্মজগতের বিষয়গুলির প্রমাণ দুইটী স্বতন্ত্র প্রকৃতির; সামান্য বিষয়গুলি সসীমবস্তু লইয়া ব্যাপৃত আর ধর্ম্মজগতের বিষয়গুলি অসীমের সহিত জড়িত। ধর্ম্মবিষয়ক মতগুলির কিরূপ প্রমাণ সম্ভব তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণবাদ প্রচার করিয়া যান, তাহা হইতে জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্রগণের গতিবিধি প্রমাণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা হইতে গণনা দ্বারা কোন্ নক্ষত্রের কিরূপ গতি হইবে তাহা স্থির করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে কেহ

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে মাধ্যাকর্ষণে বিশ্বাস কর কেন, উহার প্রমাণ কি ? ইহার উত্তর এই যে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আমরা উহার অন্তর্গত সমুদয় বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা করিতে পারি, উহা দ্বারাই আমরা নক্ষত্রগণের গতিসমূহ বুঝিতে পারি ও গণনা করিতে পারি ; আর এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন প্রাকৃতিক ঘটনা দেখা যায় নাই যাহা হইতে মাধ্যাকর্ষণবাদে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যের সত্যগুলির প্রমাণও অনেকটা এইরূপ। আমরা এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি, এই জগতে আমাদিগের সমক্ষে যে সমুদয় ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, আমাদিগের প্রত্যেকের মনে যে সমুদয় ঘটনা হইতেছে—এই সমুদায় বিষয়ের মূল কি, ইহাদিগের উদ্দেশ্য কি, আর ইহাদিগের পরিণামই বা কি দাঁড়াইবে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দান করাই ধর্ম্মতত্ত্বের অভিপ্রায়। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বে যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া গণ্য করা হয়, সেগুলি এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহাদিগের হইতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা হইতে পারে। আর ইহা ভিন্ন এই সত্যগুলি পরস্পরের সহিত এরূপ সম্বদ্ধ হওয়া আবশ্যক যে ইহাদিগের মধ্যে একটীকে পরিত্যাগ করিলে অপরগুলি দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের প্রশ্নসমূহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে না। এরূপ স্থলে আর আমাদিগের এই সকল সত্য সম্বন্ধে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্যের সত্যগুলি পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ অর্থাৎ তাহাদিগের একটী হইতে অপরটী আবার তাহা হইতে আর একটী এইরূপ ক্রমে সকল গুলিই চিন্তাদ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে ; আর চিন্তাদ্বারা ইহাও দেখা যায় যে এই সত্যগুলি অন্যান্য সমুদয় সত্যের মূল। আমরা যদি যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের সত্যগুলির এই দুইটী লক্ষণ স্থাপন করিতে পারি অর্থাৎ যে মতগুলিকে আমরা সত্য বলিতেছি তাহাদিগের এই দুইটী লক্ষণ বিদ্যমান আছে এরূপ দেখাইতে পারি, তাহা হইলেই ঐ সত্যগুলির প্রমাণ করা হইবে, উহাদিগের অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সম্ভব নহে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ফুলের মালা।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তি চিরদিন আশায় নিরাশ হইয়াছে কখনও সুখ চাহিয়া পায় নাই। কিন্তু আজ অন্যকে সুখ শান্তি দান করিতে গিয়াও যখন সে ব্যর্থ-মনোরথ হইল, তাহার পূর্ণ উথলিত নিঃস্বার্থ সহানুভূতি পর্য্যন্ত যখন গণেশদেব অগ্রাহ্য অবহেলা করিলেন, তখন তাহার যে কষ্ট হইল. তাহা এই দুঃখপূর্ণ সংসারেও কদাচ ঘটে।

ইহা তাহার পূর্ব্বের প্রতিশোধ উত্তেজনামিশ্রিত, ক্রোধতরঙ্গসিক্ত, অপেক্ষাকৃত লঘু-ভার, মিশ্র নৈরাশ্য নহে,—প্রতিশোধহীন, উত্তেজনাহীন, অমিশ্রিত, অকল্পিত জমাট দুঃখের লৌহ-কবাট-নিষ্পেষিত হইয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন মুহূর্ত্তে প্রলয়ের ধূমকেতুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল, অপ্রকৃত, উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিশ্বজীবনের সহিত একসূত্রতা একাত্মানুভূতি হারাইল।

কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া শক্তি দেখিল, আকাশে একটিও তারকা নাই, রজনীর অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে ঘনীভূত। সে নিস্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিল। চারিদিকের অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না, নিজের অবস্থাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, আপনাকে একটা অস্তিত্বহীন, মহাশূন্য, অন্ধকার রাত্রি বলিয়া বিভ্রম জন্মিতে লাগিল। শক্তিকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রহরী ভাবিল বুঝি তিনি অন্ধকারে চলিতে ভয় পাইতেছেন। সে বলিল "আঁধারামে ডর মালুম দেতা, রোস্‌নাই লাওয়ে?"

শক্তির মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে বলিল—"না, চল যাইতেছি।"

কারাগারের বহির্সীমার দ্বারদেশে জমাদার গোলাম আলি খাঁ মুড়িসুড়ি দিয়া কাষ্ঠতক্তে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়িতেছিল, আর তাহার সম্মুখে ময়দানে দুই জন প্রহরী পদশ্চারণা করিয়া পাহারা দিতেছিল। প্রহরী রোমজান ভিতরের লৌহ অর্গল খুলিয়া দ্বারে করাঘাত করায় গোলাম আলি খাঁ বাহির হইতে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, শক্তি বহির্গত হইয়া আসিলেন। পদশ্চারণশীল প্রহরী দুইজন দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শুনিয়া একই সঙ্গে সুধীরে বলিয়া উঠিল, "কোন হ্যায়?" জমাদার দ্বার বন্ধ করিতে করিতে উত্তর করিল, "কুছ ফিকির নেই, আপনা কাম করকে চল ভাইয়া।" প্রহরী দুইজন আর কোন কথা না কহিয়া পুনরায় স্ব স্ব পথচারী হইল, জমাদার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেখিল, আউরৎ দ্বার-দেশ হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আঙ্গুঠি?

কুতব শক্তিকে গোলাম আলি খাঁর নিকট পঁহুছিয়া রাখিয়া একটি আংটি দিয়া যায় এই

আংটির বলেই তিনি গণেশদেবের প্রকোষ্ঠে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কথা ছিল, শক্তির অপেক্ষায় কুতব নিকটস্থ প্রহরীথানায় বসিয়া থাকিবে, তিনি কারা-বাহির হইবার পর এই আংটি গোলাম আলি খাঁর মারফৎ তাহাকে ফেরত পাঠাইলে সে আবার এখানে আসিয়া শক্তিকে সঙ্গে লইয়া নিরাপদে প্রাসাদ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিবে। কুতব যে প্রকৃতপক্ষে প্রহরীথানায় বসিয়া বেগম সাহেবের শুভাকাঙ্ক্ষায় মগ্ন ছিল না, তাহা পাঠক জানেন; তবে শক্তির কারানির্গমন সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে সে ক্রুটি করে নাই। এই জন্য গোলাম আলি খাঁর নিকট সে তাহার একজন অনুচরকে রাখিয়া যায়। তাহার অনুজ্ঞা ছিল, আউরৎ কারা-বাহির হইয়া আংটি দিলেই ইহার মারফৎ গোলাম আলি খাঁ অবিলম্বে তাহাকে প্রাসাদে পাঠাইবে; অবশ্য সে সময়ের মধ্যে যদি কুতব না ফিরে। কুতবের মনে ছিল সুলতানার কারাগার হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই সে এখানে ফিরিতে পারিবে, তবে কি জানি যদি আসিতে বিলম্বই হয়, বিশেষ রাজাকে শয়নাগার হইতে তুলিয়া সংবাদ দিতে হইবে; সেইজন্য সকলদিক ভাবিয়া চিন্তিয়াই কুতব এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল। আউরৎ যে সুলতানা ইহা কুতব গোপন রাখিয়াছিল। প্রহরী অঙ্গুরী চাহিলে শক্তি একবার দাঁড়াইয়া বলিল, "আংটি পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।"—আসল কথা শক্তির এখন প্রাসাদে যাইতে বা কুতবের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা ছিল না। এই বলিয়া শক্তি আবার চলিতে উদ্যত হইলে প্রহরী গতিরোধ করিয়া বলিল, "লেকেন কুতবসাহেবকা হুকুম য়্যাসা হ্যায়।" রাণী গম্ভীর অনুজ্ঞার স্বরে বলিলেন, "পথ ছাড়—ইহা সুলতানার হুকুম।" প্রহরী সভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, শক্তি অবাধে চলিয়া গেলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে বন-নিবিড়তায় তাঁহার ক্ষীণছায়া বিলীন হইয়া পড়িল। প্রহরী তখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া তক্তায় বসিয়া চকমকি ঠুকিয়া বলিল, "হুম! বেগম সাহেব! মাইনে আন্দাজ কিয়াথা গণেশদেবকা আউরৎ খসমকো ভেটনেকো আয়া; হামলোগকো বি আলবৎ কুচ ভেট মিল যাগা। খোদা সব খারাবি কর দিয়া, য্যায়সা নসীব! কুতবসাহেব তেরাকো সাবাস, সুলতান সুলতানা দোনোকোহী গোলাম বানায়া! আরে ভাইয়া ফতে খাঁ উঠগে কি নেই?

ফতে খাঁ প্রভুর আজ্ঞা এবং এই হিম-রাত্রি একই সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া কম্বলদোসর গাছতলায় পড়িয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছিল—প্রহরীর ডাকে সে ঘুমের ঘোরে বলিল, "আঙ্গুঠী মিলা?" প্রহরী বলিল, নেই ভাইয়া, মিলনেকো নেই; সুলতানা চলা গিয়া।" অনুচর বলিল, "যাতা-যাতা" বলিয়া আবার নীরব হইয়া পড়িল। প্রহরী ভাবিল, ফতেখাঁর হাতে কুতবকে আংটি পাঠাইবার কথা—সেই আংটিই যখন মিলিল না, তখন তাহাকে জাগাইয়া কুতবের নিকট এ সংবাদ পাঠানর পূর্ব্বে আর এক ছিলিম তামাক নিঃশেষ করিলে হুকুমের অমান্য হইবে না। এই ভাবিয়া সে সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যপালন রত নিশ্চিন্তভাবে তামাকু টানিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শক্তি চলিল; অন্ধকারে একাকী চলিল। অন্ধকারে চলিতে সে অনভ্যস্ত নহে, বনদেশও তাহার পরিচিত, বনস্থলীর প্রতি পথ, প্রত্যেক বৃক্ষটি পর্য্যন্ত যেন এই অন্ধকারের মধ্যেও তাহাকে ক্রোড় পাতিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছিল। শক্তি অতি সহজে বিনা কষ্টে সেই বনপথ লঙ্ঘন করিয়া নদীতীরে আসিয়া পড়িল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীতীরে যে বটবৃক্ষটি অর্দ্ধস্থল অর্দ্ধজল অধিকার করিয়া ভূশায়ী ছিল, আজ তাহার গুঁড়িমাত্র অবশিষ্ট। সেদিন যে দুইজন ইহার উপর বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিল তাহাদের জীবনেও আজ কি রূপান্তর! শক্তি সেই বটবৃক্ষের দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া আবার চলিল, এবার বনমধ্য দিয়া চলিল, চলিতে চলিতে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, যে বৃক্ষতলে তাহার বহু যত্নের শুষ্ক ফুলেরমালা পদদলিত করিয়াছিল সেইখানে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বৃক্ষতল হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা তুলিয়া আপম মণিময় অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া আবার চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পুরাতন কালিকামন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বে এই মন্দিরে অবস্থিতিকালে প্রতি সন্ধ্যায়, গৃহাভিমুখী হইবার সময় দূর হইতে দ্বারছিদ্রপথে যেরূপ আলোক দেখিতে পাইত আজও সেইরূপ দেখিল। মনশ্চক্ষে মন্দিরকক্ষে প্রতিমার সম্মুখে সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি কল্পনা করিতে করিতে দ্বারদেশে আসিয়া পড়িল। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল না—উঁকি মারিয়া দেখিল যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই ঠিক, প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির সম্মুখে সন্ন্যাসিনী মুদ্রিতনয়নে আসীনা। শক্তি এমন নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল যে সন্ন্যাসিনী তাহা জানিতেও পারিলেন না। তিনি স্বাহা মন্ত্র পড়িতে পড়িতে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন—অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সবলোত্থিত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত শিখারাশি গৃহছাদ স্পর্শ করিতে লাগিল,—শক্তির নয়নে যেন রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল, তাহা হইতে ছিন্ন মুণ্ডরাশি খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, শক্তি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সহসা ফোয়ারার উচ্ছ্বাস স্তম্ভিত হইল, ছিন্ন মুণ্ডরাশি শূন্যে চতুষ্কোণভাবে সজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ হইল, তাহার উপর আলোক সিংহাসন প্রত্যক্ষ হইল, সিংহাসনে এ কাহার মূর্ত্তি! শক্তি প্রখরদৃষ্টে তাহাকে চিনিবার প্রয়াস করিল; এই সময় সন্ন্যাসিনী আর একবার স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—'হে সর্ব্বশক্তিমতি, ভগবানের ব্যক্তরূপা প্রকৃতি, তুমি প্রসন্ন হও, তোমার করুণায় বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি স্থিতি, তোমার ক্রোধে ইহার প্রলয় বিনাশ! তুমি রুদ্রারূপে এদেশের এই দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছ, তোমার প্রসন্নকটাক্ষে ইহার দুঃখ দূর কর। তুমি করুণা করিয়া গণেশদেবকে মুক্তি প্রদান কর, এই অত্যাচারপীড়িত হতভাগ্যদেশে সৌভাগ্যের উদয় হউক।"

শক্তি সন্ন্যাসিনীর আরাধ্যদেবীর প্রতিনিধিস্বরূপে উত্তর করিল,—"তথাস্তু! মহাশক্তি আমাকেই সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।" সন্ন্যাসিনী চক্ষু

উন্মীলিত করিয়া শক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি শক্তি! সুলতানা! তুমি গণেশদেবকে মুক্তি দিবে?"

শক্তি বলিল, "ইতিপূর্ব্বেই দিতাম, কিন্তু তিনি আমার নিকট হইতে মুক্তি লইতে অস্বীকৃত হইলেন"—বলিয়া ইতিপূর্ব্বের বৃত্তান্ত শক্তি সন্ন্যাসিনীকে জানাইয়া বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন এই অঙ্গুরী দেখাইয়া আমরা এখনো কারাপ্রবেশ করিতে পারিব। তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আপনি পলায়ন করিতে পারিবেন।—"

সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শক্তি বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে এ বস্ত্র ছাড়িতে হইবে—অন্য কাপড় একখানি দিতে পারেন?" সন্ন্যাসিনী একখানি গেরুয়া বস্ত্র মন্দির কোণ হইতে লইয়া বলিলেন, "ইহাতে হইবে?"

শক্তি সেই গেরুয়া পরিয়া বস্ত্রাঞ্চলের ধূলিরাশি অঙ্গে মাখিয়া তাহার পর শালের জোড়া একখান খুলিয়া মাথার উপর দিয়া গাত্রে জড়াইল, এবং তাহার পরিত্যক্ত মণিময় বস্ত্র দুই খণ্ড ও বাকি একখানা শাল সন্ন্যাসিনীকে দিয়া বলিল, "ইহার একখানা পরুন, একখানা গায়ে জড়াইয়া নিন, আর শালখানা মাথায় দিন। তারপর কারাগৃহে গিয়া গায়ের খানা গণেশদেবকে পরাইবেন, আর আমার এই শাল খুলিয়া দিব, তাঁহার মস্তক মুখের বেশ আবরণ হইবে,—এইরূপে আপনারা দুজনে পলাইতে পারিবেন, প্রহরীরা ভাবিবে যে দুজন ঢুকিয়াছিল তাহারাই ফিরিতেছে!

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আর তুমি?"

শক্তি। গণেশদেবের পরিবর্ত্তে আমি কারাগারে থাকিব। আমার জন্য ভাবনা নাই, কুতুব আমার সহায় আছে।"

সন্ন্যাসিনী তাহার বিপদ বুঝিলেন; কিন্তু তাহাকে এ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন না। গণেশদেবকে উদ্ধার করিয়া, দেশের হিতসাধন করিয়া শক্তির যদি মৃত্যু হয় সে মৃত্যু ত সুখের। শক্তির সেই পরম সুখ অনুভব করিয়া সন্ন্যাসিনী সুখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

শক্তি বলিল, "দেবি, আর একটি কাজ আছে, আমার মাথার চুলগুলি কাটিয়া দিন।" শক্তি কালীর খড়্গ একখানি খুলিয়া সন্ন্যাসিনীর হাতে দিল, সুললিত সুদীর্ঘ ঘন কেশদাম সেই খড়্গে কাটিয়া সন্ন্যাসিনী তাহার হাতে দিলেন। শক্তি সেইগুলি একবার হাতে লইয়া আবার তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "গুলবাহার যদি মাতৃহীনা হয় ত তাহাকে এইগুলি দিবেন, আর মনে রাখিবেন এখন হইতে সে আপনারই কন্যা।"

সন্ন্যাসিনী নীরবে সেই চুলগুলি কালী পদতলে চাপা দিয়া মন্দির নিচে হইলেন। শক্তি আগেই মন্দির নির্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রহস্য।

আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, লোকের মুখে শুনিতাম যে মানুষ মরিয়া আবার মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আইসে। শোনা কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আমি ভাবিতাম আমি যদি মরি তবে আমিও আবার আমি হইব এবং এই পৃথিবীতে আসিব। কিন্তু মরার কথা মনে আসিতে দিতাম না, আমার অনেক গুলি ভাই বোন মরিয়া যাওয়ায় আমার মা বাপ সদাই কাঁদিতেন। আমি মরিলে তাঁহারা আরও কাঁদিবেন, আমিও মা বাপকে ছাড়িয়া কোথায় থাকিব, ভাবিয়া আমি মরিতে চাহিতাম না। এই সময়ে আমার সমবয়সী একটী বাড়ীর ছেলে মরিয়া গেল। ভাবিলাম আমিও ত তবে যখন তখন মরিতে পারি। তবে কি হইবে? কিন্তু আমি আবার আমি হইব মনে আসিল। ছেলে মানুষ, যতদূর অবধি দৌড়াইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম ততদূর অবধিই পৃথিবী মনে করিতাম। সুতরাং পাড়ার খান দশেক বাড়ী, গোটা কতক পুকুর কতকগুলা গাছপালা ও মন্দির তলার মাঠটাই আমার সমস্ত পৃথিবী বলিয়া বোধ হইত। এবং মরিলে এই কয়টা বাড়ীর একটাতে জন্মাইব বিশ্বাস ছিল। তবে কোন্ বাটীতে জন্মাইব? শিশু কাহাকেও চিনিতে পারিব না। যাহাদের বাড়ীতে জন্মাইব যাহারা মানুষ করিবে তাহারাই সব হইবে। তাদের মধ্যেই মা বাপ হইবে। কিন্তু সেত এ মা বাপ নয়। তবে কি হইবে? তাহাদের কেমন করিয়া পাইব? কিন্তু দ্বিতীয় জন্মে এই শরীরই পাইব, এই নামই থাকিবে, সবই এবার কার মত হইবে শিশুমনে এই রকম ধারণা ছিল। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম এই বাড়ীর দেয়ালে নামটী বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় জন্মে অন্য বাটিতে জন্মাইলেও এই বাটীতে কখন আসিয়া নামটী পড়িলেই মনে আসিবে এই প্রথম বাড়ী, আমি এই বাড়ীর ছেলে ছিলাম, অমনি এখানে আসিয়া এদের হইব। এই স্থির করিয়া বড় বড় অক্ষরে দেয়ালের উর্দ্ধভাগে আমার নামটী লিখিলাম। বিষম রহস্যের বীজ রোপিত হইল।

পাঁচ বৎসর, ক্রমে ক্রমে দশ, বিশ পঁচিশ ত্রিশ ও পঁইত্রিশ বৎসরে আসিয়া পড়িল। হাতে খড়ি, লেখা পড়া, বিবাহ, চাকরী, পিতৃত্ব এই সময়ের মধ্যে আমার সব হইয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটীর সঙ্গে কখনও সুখ, কখন দুঃখ, কখন হাসি ও কখনও কান্না আসিয়া জীবনকে নানা রঙ্গে নাচাইয়াছে। কত বিষয় ভাবিয়াছি, কত বিষয় দেখিয়াছি কিন্তু সেই পাঁচ বৎসর বয়সের মোটা মোটা এঁকা-ব্যাঁকা-লেখা নামটীর কথা এই ত্রিশ বৎসর মধ্যে একবারও মনে আইসে নাই। গৃহ সংস্করণে তাহা ঢাকা পড়িয়াছে।

যেমন বয়স বাড়িয়া জীবন কমিয়া আইসে মানুষের মনে আপনাপনি ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। ধর্ম্ম বলিতে আর কিছু মনে করিতেছি না,—কেমন লোকে একটু অপেক্ষাকৃত নম্র,

শান্ত ও সংপ্রকৃতি হইয়া পড়ে। আর উহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কার্য্যের উপর লক্ষ্য পড়ে কিসের জন্য এখানে আসিয়াছি, কি করিয়াছি, কি করিতে হইবে এই সব চিন্তা মনে আসিয়া পড়ে। মৃত্যুর কথা সদা সর্ব্বদা মনে আইসে। আর দিন কতক পরে এই আমি আর থাকিব না এই সব চিন্তা হয়। আমার এই অবস্থায় তাই হইয়াছে।

পাড়াগাঁ। চারিদিকেই গাছ পালা। আমাদের বাড়ী রাস্তার ধারে। একদিন বিকালে শোবার ঘরে রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি হরিবোলের শব্দ কানে আসিল। পরক্ষণে দেখিলাম কয়েক জন লোক শবদেহ লইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম অদূরস্থিত গ্রামের লোক। ঘরের বাহিরে যাহা শুনিলাম এবং পরক্ষণেই যাহা দেখিলাম তাহাতে জানিলাম শবটী আমারই বাল্যবন্ধু। মনে বড়ই কষ্ট হইল। শীঘ্রই যেন ঐরূপ হইতে হইবে মনে হইতে লাগিল। ঘরে আসিয়া এবার শুইলাম। ভাবিতে ভাবিতে এদিক ওদিক জানালা কড়িকাঠ ও বরগার পানে চাহিতে চাহিতে অবশেষে দেয়ালের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলাম! দেখিলাম সাদা দেয়ালে কি একটা কাল দাগ। চাহিয়া রহিলাম। অল্প ক্ষণ পরেই একটা দাগ দুইটা হইল। বড়ই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া টেবিলের উপর উঠিয়া দেখি একটা মরা টিকটিকির উপর আর একটা টিকটিকি বসিয়াছিল, সরিয়া গিয়াছে। প্রথমটা কোন রূপ আঘাত পাইয়া মৃতাবস্থায় দেয়ালের গায়ে লাগিয়াছিল। মৃত টিকটিকি উঠাইয়া দেয়াল পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা হইল। বুরুষ দিয়া ঝাড়িতে শুষ্ক চুণ ঝরিয়া পড়িল। তাহার পরে যাহাদেখিলাম তাহাতে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

কি দেখিলাম? চুন দেয়ালে এমন কি বস্তু নিহিত করিয়া রাখিয়াছিল যাহা দেখিলে হৃদয়ে অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। তাজ মহল, দেওয়ানি আম, মতি মসজীদ দেখিয়া যে ভাবের উদয় না হয় দেয়ালে এমন কি বস্তু দেখিলাম যাহা হৃদয়ে তদপেক্ষা উচ্চ ভাবের সঞ্চার করিল? যাহা অন্যের পক্ষে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য বস্তু, কিন্তু আমার হৃদয়ে আদরের সামগ্রী। দৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নহে আমার ৫ বৎসর বয়সের সেই মোটা মোটা এঁকা ব্যাঁকা নামটী

মানুষ মরিয়া ফিরিয়া আইসে এবং ফেরামানুষ চিনিয়া লইব বিশ্বাসে আমি পাঁচ বৎসর বয়সে দেয়ালে নামটী লিখিয়াছিলাম। তখন আমি বাড়ীতে বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের দুই তিন পাতা মাত্র পড়িয়াছি। পাড়ার ৪০।৫০ বিঘা জমিকে সমগ্র পৃথিবী বোধ করিতাম। এক্ষণে আমার বয়স ৩৫ বৎসর। লেখাটী আমায় জিজ্ঞাসা করিল "মানুষ মরিয়া কি ফিরিয়া আইসে"? আমি নিস্তব্ধ রহিলাম। এ বিষম রহস্যময় প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

অঘোরী বা অঘোরপন্থী।

ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে, শিক্ষা সভ্যতা ও লোকসংখ্যায় ভারত অপেক্ষা উচ্চতর জাতি পৃথিবীতে বড় দুর্লভ নয়—কিন্তু সাম্প্রদায়িকতায় ভারতবর্ষ শীর্ষস্থানীয়। একদেশে এবং একই জাতির মধ্যে এত শ্রেণীবিভাগ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে এই সাম্প্রদায়িকতা এত অধিক হইয়া দাঁড়ায়, যে ক্রমে ইহা পরিবারগত এবং ব্যক্তিগত বৈষম্য উপস্থিত করায়। পিতামহ তান্ত্রিক, পিতা শাক্ত, ভ্রাতা শৈব এবং স্বয়ং বৈষ্ণব এ প্রকার ঘটনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতির মধ্যে বহুশ্রেণীবিভাগ থাকাতে জাতীয় উন্নতির পক্ষে কতদূর সহায়তা হয়, তাহা বলিতে চাহি না; তবে সম্প্রদায়বিশেষের যে কতকগুলি ব্যবহার, সমাজের সমক্ষে কুৎসিত চিত্র ধ[illegible]ছে, এবং শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে গুলিকে আদর্শ বলিয়া [illegible] সমাজকে কুপথে প্রলুব্ধ করা হইতেছে, তাহাদের যত শীঘ্র নিরাকরণ হয় ততই স[illegible]ল।

অঘোরী বা অঘোরপান্থী বলিয়া একটী উপাসক সম্প্রদায় আছে, পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় ইহার নাম শুনিয়াথাকিবেন; গলিত নরমাংসাহার করিয়া জীবন ধারণ করা এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অঘোর পন্থীগণের পৈশাচিক ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে যেসকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাদের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে, এবং তাহাদিগকে "ভূত প্রেতের" ন্যায় এক কাল্পনিক জীব ব্যতীত অন্য কোনও উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুইএকটী প্রমাণ পাওয়াতে বোম্বাইয়ের "মানবতত্ত্ববিদ্ সভা" (Anthropological Society) হইতে লিথ সাহেব ইহাদের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহার্থে নিযুক্ত হইয়া, বহু অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী অঘোরীর সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিয়াছেন এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত বিষয় সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহারা যে একই মনুর হস্তপদবিশিষ্ট বংশধর এবং "জুজুর" ন্যায় এক অপার্থিব জীব নয় তাহা বেশ জানা গিয়াছে।

লিথ সাহেব বলেন এলাহাবাদ অঞ্চলে অনেক অঘোর পন্থী দেখিতে পাওয়া যায় এবং বোম্বাইয়ের পথে ঘাটে ও নাসিকের শবদাহ ক্ষেত্রে, মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; যমুনারাম নামক জনৈক অঘোরীর কয়েক খানি ফোটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলিয়া আনিয়া সাহেবটী উক্ত সভায় রাখিয়াছেন। লিথ সাহেব ইহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, অন্যতম সভ্য ব্যারো সাহেব বহু যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে অঘোরীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আরও অনেক অজ্ঞাত ও গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন।

অঘোর-পন্থীগণের অভ্যুদয়কাল নিরূপণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু ইহারা যে ভারতের

একটী প্রাচীন উপাসক সম্প্রদায় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পৌরাণিক সময়ই ইহাদের অভ্যুদয়ের কাল,* বৈদিক সময়ে ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মঁসিয়ে ডি আনভিল তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতের "নর-রাক্ষস" অঘোরীদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনি, আরিষ্টটল্ এবং টিসিয়স্ প্রমুখ গ্রীক ও রোমীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অমরগ্রন্থে ইহাদিগকে "নরমাংসাশী পিশাচ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বিজাতীয়েরাও অঘোরীদিগের ঘৃণ্য ব্যবহারের কথা কিছু কিছু অবগত ছিলেন। বিজাতীয় প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত "দেবীস্তান" নামক পারস্য সমাজনৈতিক গ্রন্থে ইহাদের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়; গ্রন্থকার বলেন গোরক্ষ-নাথ নামক স্থানই ইহাদের উৎপত্তি স্থল এবং ঐস্থানে জনৈক অঘোরীকে গলিত শবোপরি বসিয়া বিকট স্বরে চীৎকার করিতে এবং শবমাংস ভক্ষণ করিতে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ফরাসী পরিব্রাজক মঁসিয়ে থেভেনো ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তের" এক-স্থলে এই সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে বোম্বাইয়ের ব্রোচ জিলায় ইহাদের একটী প্রধান আশ্রম আছে; যদিও এখন ঐস্থলে উক্ত আশ্রমের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না কিন্তু আজ দুই শত বৎসর পরেও সেখানকার অধিবাসীগণের নিকট অঘোরীগণের বীভৎস আচা-রের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থগণ এই ভয়ানক সম্প্রদায়ের উপদ্রবে সর্ব্বদা কি প্রকার সশঙ্কিত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিত তাহা কর্ণেল টড তাঁহার প্রতীচ্য ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহারা তস্করের ন্যায় গৃহস্থের সম্পত্তি অপহরণ করিত না; কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে তাহারা এপ্রকার পৈশাচিক ব্যবহার করিত যে তাহাই সাধারণ শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট কারণ হইয়া দাঁড়াইত।

এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রবাদ আছে, যে অঘোর-পন্থীগণ আজও বালক বালিকা ধরিয়া তাহাদের দেবতার সম্মুখে বধ করিয়া থাকে। অঘোরপন্থী ব্রতে দীক্ষিত হইবার সময় দীক্ষা-র্থীকে ভয়ানক ভয়ানক পৈশাচিক ব্রত উদযাপন করিতে হয় এবং কতকগুলি কল্পনাতীত ভীষণ ও ন্যাক্কারজনক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দীক্ষাগুরুকে সন্তুষ্ট করিতে হয়।

অঘোরীদিগের লোমহর্ষণ ব্যবহারের কথা অন্যত্রও অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। বেনা-রসের অনেক সম্ভ্রান্তও বৃদ্ধ অধিবাসীগণ ব্যারো সাহেবকে বলিয়াছেন, যে তাঁহারা অঘোরী-দিগকে শ্মশানে শবমাংস ভক্ষণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। লিথ সাহেব যে কয়েকটী অঘোরীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নরমাংসাহার স্বীকার করিয়াছে এবং সাহে-বের সম্মুখে আহার করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিল। ১৮৮৪ সালে মুর্সিদাবাদে খাগড়ার শ্মশানের প্রকাশ্য স্থানে কৃষ্ণদাস বাবাজী নামক জনৈক অঘোরপন্থীকে শবমাংস ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছিল, সাধারণ ঘৃণা উত্তেজিত করা অপরাধে বাবাজী বহরমপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হইয়া পঞ্চদশ মুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* কালিকাপুরাণে রুধির অধ্যায় দেখ।

নরমাংস ভক্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অনেক অঘোরপন্থীরা বলিয়া থাকে, যে, এই মাংসের এক মহাগুণ আছে, যে ইহার স্বাদগ্রহণ মাত্র মায়া-বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়। কাথিয়ার এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব পলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল ওয়েষ্ট গল্প করিয়াছেন, যে কয়েক বৎসর হইল ভূগর্ভ-নিহিত গুপ্তরত্ন লাভের আশায় একটী বালক হত্যা করা অপরাধে একজন অঘোরী কোলাপুরে অভিযুক্ত হইয়াছিল এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। অপর আর একটী অঘোরীর আসুরিক নৃশংস ব্যবহার ও শোণিত-লিপ্সার কথা বোম্বাই হাইকোর্টের ১৮৭৮ সালের কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায়; দ্বাদশ বর্ষীয় একটী বালক অপর দুইটী বালকের সহিত, নেরিয়াদ নামক স্থানের সীতারামলাল দাসের মন্দিরপ্রাঙ্গনে খেলা করিতেছিল, রঙ্গদাস রামদাস নামক জনৈক ভিক্ষুক হঠাৎ বালকটীকে আক্রমণ ও তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিয়াছিল। অপরাধী রঙ্গ-দাস মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হইলে বিচারালয়ে স্বীকার করিয়াছিল, যে অঘোরবিদ্যা সাধনার্থে সে ঐ আনুষঙ্গিক আচরণ করিয়াছিল, এবং যদি অন্য লোক তাহার এই অদ্ভুত সাধনার পথে অন্তরায় না হইত তাহা হইলে বালকটীর সমস্ত দেহই উদ[illegible]াৎ হইত। মাজিষ্ট্রেট, এই আমমাংসভোজী পিশাচকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু হাইকোর্ট এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বিচারালয়সমূহের কার্য্যবিবরণী অনুসন্ধান করি[illegible] গলিত শব [illegible]ইয়া ইহাদের পাশব ব্যবহারের বিবরণ ভূরি ভূরি পা[illegible] [illegible] কি প্রকার নরাধম ও ভীষণ পশুপ্রকৃতির জীব তাহা দেখাইবার জন্য, [illegible] ব নিকট এই সকল অশ্রুত-পূর্ব্ব ও লোম-হর্ষ বিবরণ অপ্রীতিকর হইলেও আ[illegible] ব্যতীত [illegible] ঘটনা উল্লেখ করিব। ১৮৬২ সালে গাজিপুরের বিচারক ব্রডহর্ষ্ট সাহেব দুঃখীরাম-অ[illegible]য়র আ[illegible] নামক এক ব্যক্তিকে এক বৎসরের কারাবাস দণ্ড দিয়াছিলেন; এই নরপিশা[illegible] ক্ষুধার্থ [illegible]র [illegible]য়, একটী গলিত শব, সহরের প্রকাশ্য পথ দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, বা[illegible]জারের মধ্যে বসিয়া আহার করিয়াছিল। ১৮৮৪ সালে দেরাদুনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেভিস্ স[illegible]হেব হরিদ[illegible]ল অঘোর-পন্থী নামক জনৈক অঘোরীকে, কবরস্থ মৃতদেহ বাহির করিয়া আহা[illegible]র করা অপরাধে, দুই বৎসর কারাবাস দণ্ড দিয়াছিলেন; ভিক্ষাভাণ্ড হইতে দুইখানি শবক[illegible] [illegible] বাহির করিয়া দুর্বৃত্ত বিচারকের নিকট বলিয়াছিল, যে তাহার গুরু এক মহাযন্ত্রখিতে [illegible] [illegible]ং আমনর-নরকপাল ও শত শবহস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত ক[illegible]হাদিগের [illegible] আমনর-মাংসই তাহার প্রধান আহার সামগ্রী। ১৮৮৫ সালে রাজনৈ[illegible] [illegible] ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী কাপ্তেন মিড, ভোপালে একটী নদীর ধারে পদচারণ [illegible] জনৈক অঘোরপন্থীকে শবমাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছিলেন। [illegible] বিবরণ সংগ্রহে [illegible] অঘোরীদি[illegible]

অঘোরীগণের বর্ত্তমান প্রধান আশ্রম কোথায় তাহার কোন স্থিরতা [illegible]। অনেকে বলেন, আবু ও গারণার পর্ব্বতশিখরে তাহাদের এক পীঠস্থান আছে। ঐ [illegible]সকল স্থানে

এই নররাক্ষসদিগের এত উপদ্রব যে, কোন কার্য্যানুরোধে বাটীর বাহির হইতে হইলে, অধিবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া বাহির হয়। পিশাচেরা পথপার্শ্ববর্ত্তী বনে ও পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত থাকে, একাকী ও নিঃসহায় পথিক দেখিলেই, ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের ন্যায় আক্রমণ করিয়া শোণিত পান করে। সময়ে সময়ে ইহাদের অত্যাচার এত অধিক হইয়া দাঁড়ায় যে, কবর-নিহিত শব, ঐ রাক্ষসগণের গ্রাস হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য, কবরপার্শ্বে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হয়। এলাহাবাদের শ্মশানক্ষেত্রে অনেক অঘোরী দেখিতে পাওয়া যায়, আজকাল ইহাদের সংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে।

সাধারণ লোকের এক সংস্কার আছে, যে শ্মশানবিহারী অপদেবতাদিগের সহিত, অঘোরীদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং ইহাদিগকে সন্তুষ্ট না রাখিলে অপদেবতার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন; এই প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া শবদাহ করিতে গেলে, সমবেত অঘোরপন্থীদিগকে সকলেরই কিছু কিছু প্রণামী দিতে হয়। লক্ষ্মৌ অঞ্চলে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে একটী কুসংস্কার আছে যে, অঘোরীগণ কোন গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া ভিক্ষা না পাইলে, গৃহস্থের পরিবারমধ্যে মহা অনর্থপাতের সম্ভাবনা। আরও প্রবাদ আছে—যেমন লোকের অনিষ্ট করা অঘোরপন্থীদের সর্ব্বদা ইচ্ছাধীন, সেই প্রকার ইচ্ছানুসারে সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেও ইহারা সিদ্ধ-হস্ত। একটী গল্প আছে যে, জনৈক অঘোরী মজঃফর নগরের একজন জমিদারকে একখণ্ড নরমাংস ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করে, কিন্তু জমিদার সৌভাগ্যক্রমে মাংসভক্ষণে অস্বীকার করেন, অঘোরী, জমিদারের এই প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে না পারিয়া হস্তস্থিত মাংসখণ্ড তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করেন, সেই অবধি জমিদারের সংসারে কমলা অচলা হইয়া আছেন।

অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায়গণ অঘোরীদের সংসর্গে থাকে না, এমন কি কাপালিক, বামাচারী, কুলাচারী প্রভৃতি একই শ্রেণীর উপাসকগণ জঘন্য আচারের জন্য ইহাদিগকে ভয়ানক ঘৃণা করে। অঘোরপন্থীদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, যে কোন ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে এই আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন অঘোরপন্থীরা সাম্যবাদী—কিন্তু যাহারা স্বজাতির প্রতি পাশব অত্যাচার করিতে পরাঙ্মুখ নয় তাহারা কি প্রকার সাম্যবাদী তাহা স্থির করা কঠিন। বড়ই মঙ্গলের বিষয় যে এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইহাদের ভীষণ অত্যাচারকাহিনী আর প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয় না; ইহাতে আশা করা যায় যে এই পিশাচ সম্প্রদায় শীঘ্রই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। *

শ্রীজগদানন্দ রায়।

* Vide proceedings of the Anthropological Society Bo[illegible]y, of October 1893.

শেষ চিত্র।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়; ইহার অল্পদিন পরেই মান্দালয় নগর ইংরেজ হস্তে পতিত এবং ব্রহ্মের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। ব্রহ্মযুদ্ধের অনেক বিবরণ অনেকদিন ধরিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি এতৎ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীতে সুবৃহৎ ইতিহাস পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। সেই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে আমরা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মযুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি; কিন্তু কিরূপে ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষিত হইল, যুদ্ধের সময়ে রাজধানীতে কিরূপ আন্দোলন এবং আয়োজন চলিতেছিল তাহার বিশ্বাস্য সংবাদ এই সমস্ত ইতিহাস হইতে অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। ইংরেজ যাহা দেখিয়াছেন তাহা ব্রহ্মের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনের এক অংশমাত্র সুতরাং তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা আংশিকরূপে সত্য; আংশিক সত্য যখন ইতিহাসের পত্রে গ্রথিত হইয়া পূর্ণ সত্যের উচ্চ অধিকার হরণ করে, তখন ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাত পূর্ণ হয়; ব্রহ্মযুদ্ধের ইতিহাসের এই ব্যভিচারের ব্যতিক্রম হয় নাই, কারণ ইংরেজ বিজেতা এবং তাঁহারাই ইতিহাসলেখক, তাঁহাদের লিখিত ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া চিরকাল সাধারণ্যে গণিত হইবে; কিন্তু বিজীত ব্রহ্মবাসী যে অংশের অভিনেতা তাহা চিরকাল যবনিকান্তরালেই প্রচ্ছন্ন রহিবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন ব্রহ্মরাজ মদ্যপায়ী পিশাচ, রাজ্ঞী শোণিতলোলুপা রাক্ষসী, কেহ এ কথার প্রতিবাদ করে নাই, সুতরাং ইতিহাসে তাঁহাদের চরিত্র চিরকাল এইরূপ জঘন্য ভাবেই অঙ্কিত রহিবে; হতভাগ্য ব্রহ্মরাজ পরিবারের শোচনীয় পরাজয় কাহিনীর উপর এই আলোচ্য কলঙ্ক আরোপিত হইয়া তাঁহাদের চিত্র নিতান্ত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে।

এতদিন পরে ব্রহ্মের একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী গত মে মাসের "ব্লাক্‌উড্‌স্ ম্যাগাজিনে" ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণার কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজদম্পতির নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা অতি পরিস্ফুট রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাস হইলেও ঘটনাগুলি যেন একখানি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়োপকরণ। শুদ্ধ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ব্যাপার নয়, এ প্রবন্ধে ব্রহ্মরাজ-সভা, রাজদম্পতি এবং রাজকর্ম্মচারী সংক্রান্ত অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

একদিন ঘটনাক্রমে একটী ব্রহ্মরমণীর সহিত প্রবন্ধ লেখকের পরিচয় হয়। এই মহিলাটি ব্রহ্মরাজমহিষীর সহচরী ছিল; সে তাহার একাদশ বৎসর বয়সে, ব্রহ্মরাজের নির্ব্বাসনের চারিবৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্ঞীর সাহচর্য্য লাভ করে। ব্রহ্মবিজয়ের চারি বৎসর পরে প্রবন্ধ লেখকের সহিত তাহার আলাপ হয়। অন্যান্য কথার পর একদিন প্রবন্ধ লেখক তাহার নিকট ব্রহ্মরাজের কথা উত্থাপন করিলে, যুবতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "থাকিন*

* হিন্দী "সাহেব" এর ন্যায় সম্মানসূচক বর্ম্মিস সম্বোধন।

আপনি প্রাসাদের কথা কিছু শুনিতে চান? রাজা ও রাণীকে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ হইতে লইয়া যাইবার চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রাসাদে চাকরী পাই; আমাদের দেশের তখন ১২৪৭ সাল। আমি সব কথা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।" বালিকা বলিতে আরম্ভ করিল।

আমার পিতা চীন দেশীয় কণ্ট্রাক্টর ছিলেন; প্রাসাদের পূর্ব্বকোনে পাকান সিঁড়ির যে গোলাকার স্তম্ভ আছে, তিনিই তাহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমার একাদশ বৎসর বয়সের সময় আমি প্রাসাদে প্রবেশ করি এবং মহারাণীর সহচরী নিযুক্ত হই। ইহার দুই বৎসর পরে আমি তাঁহার তামাক ও সিগারেটের স্বর্ণবাক্স বহিবার এবং তাঁহার জন্য সিগারেট পাকাইবার ভার পাই। রাজ্ঞী আমাদের বড় বড় বর্ম্মাচুরুট খাইতেন না, সিগারেট খাওয়াই তাঁহার অভ্যাস ছিল। তাঁহার অনেক কুমারী সহচরী ছিল; কেহ সর্দ্দারগণের কন্যা বা ভগিনী কেহ কেহ মন্ত্রী ও প্রাদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের আত্মীয়া। সর্দ্দার বা শাসনকর্ত্তাগণ বিদ্রোহী না হইতে পারে এইজন্য তাহাদিগের কন্যা, ভগিনী বা আত্মীয়াগণকে এইরূপে করতলগত করিয়া রাখা হইত। প্রাসাদে আমাদের কত আমোদ ছিল! রাজ্ঞীর অন্য একজন সহচরীর সহিত আমি একগৃহে থাকিতাম। প্রথমে মা-ই-মায়া আমার সঙ্গে থাকিত, কিন্তু কিছুদিন পরে বেচারীর বড়ই বিপদ ঘটিয়াছিল; একজন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। সে চলিয়া গেলে মা-গো-মা আমার সঙ্গিনী হইয়াছিল।

প্রাসাদে বড়ই সুখ ছিল। রাজ্ঞীর বেশী কিছু কাজ করিতে হইত না, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের সুন্দর স্বর্ণরৌপ্যের কাজ করা পরিচ্ছদ উপহার দিতেন, আমোদ করিবার জন্য আমাদের প্রমোদ উদ্যান ছিল, সেখানে নানাপ্রকার নাচতামাসা দেখান হইত কিন্তু যুবকগণের সহিত আমাদের কথা কহা নিষেধ ছিল তবে আমি নিতান্ত বালিকা ছিলাম সেইজন্য সে নিয়মে বড় ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না।

প্রাসাদে অনেক লোক হত হইত, কোন দেশেই বা না হয়? রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে ষড়যন্ত্রকারী সকল দেশেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাসাদের মধ্যেই অনেক সময় ষড়যন্ত্র চলিত। মহিষী আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন; যাহাকে তাঁহার মনে লাগিত তাহাকেই তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি বড় ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন, রাজার হাত দিয়া তিনি নিজেই রাজ্যশাসনের ইচ্ছা করিতেন, যদি কেহ রাজাকে তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে কোন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি দিত তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা থাকিত না। রাজ্ঞী অতি সুন্দরী ছিলেন, মহারাজকে নিরাপদ এবং রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন।

রাজ্ঞীর হৃদয় কঠিন ছিল না কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে তিনি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। মহারাজ সিংহাসনারোহণ করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে নিহত করা হইয়াছিল,—কিন্তু সেকি অকারণে? যদি এই ভ্রাতৃহত্যা না ঘটিত তাহা হইলে যুদ্ধ ও বিদ্রোহে সমস্ত দেশ নষ্ট হইয়া যাইত; রাজ্ঞী এ সকল কথা অনেকবার বলিয়াছেন। মিঙ্গুন সর্দ্দার

যখন মৃত মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তখন যদি তাহাকে বিনাশ করা যাইত তাহা হইলে শত শত ব্যক্তির অনর্থক রক্তপাত ঘটিতে পাইত না।

মহিষী মহারাজকে অন্যস্ত্রী গ্রহণ করিতে দিতেন না। রাজার অন্য রাণীও ছিল, মহারাণী মেবিয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিতেন না, নিজের ক্ষমতা যাহাতে অপ্রতিহত থাকে সে দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজা রাজ্ঞীর কোন সহচরীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলে রাণী তাহাতে বাধা দিতেন না কিন্তু ছয়মাস কি এক বৎসর পরে সেই বালিকা সহসা দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইত। আমার বোধ হয় তাহাকে হত্যা করিতেন, তাঁহারও রাজসিংহাসনের মধ্যে যে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ইহা রাজ্ঞীর সহ্য হইত না। থাকিন! ইহা অন্যায় বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু রাজার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি হইয়া ভবিষ্যৎ সিংহাসন লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিবে ইহা কি ভাল? ইংলণ্ডের কোন রাজ্ঞী কি কখন তাঁহার প্রতিযোগিনীকে বধ করেন নাই? কিম্বা কোন ইংরেজরাজ এইরূপ স্ত্রীবধ কি অনুমোদন করেন নাই? যাহাই হউক কিন্তু এরূপ দণ্ড অতি ভয়ানক। রাজ্ঞী মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড দিতে পারিতেন না; কারাদণ্ড সেও প্রাণদণ্ডের নামান্তর মাত্র, তাহাতে শুধু মৃত্যুকে অধিককাল স্থায়ী ও কঠোরতর করিয়া তোলা হয় মাত্র, কারণ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কারাগারের ন্যায় ব্রহ্মের কারাগার সমুচ্চ ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত নহে; ব্রহ্মের কারাগার কাষ্ঠ নির্ম্মিত কুটীর মাত্র, কয়েদীদিগকে কাঠের গুঁড়ি দ্বারা বদ্ধ একটি স্থানে রাখিয়া দেয় মাত্র। বহুসংখ্যক কয়েদীপূর্ণ ছোট ছোট কুটীরগুলি রৌদ্রে অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এরূপ কারাগারে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে।

আমরা সর্ব্বদা প্রাসাদের বাহিরে যাইতাম না; কখন কখন আমি মার নিকট গিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিতাম মাত্র, মহিষী কখনো প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতেন না।

কিরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা আমি যেরূপ জানি বলিতেছি। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই 'কাঠওয়ালা কোম্পানীর' ও ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা শুনা যাইত, আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম না, সুতরাং এখন সে সম্বন্ধে কিছুই মনে নাই। যাহা হউক কিছুকাল পরে—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে একখানা পত্র আসিল, তাহাতে লেখা ছিল যে আমাদের রাজা যদি তাহাদের নির্দ্দেশ মত কোন কোন নিয়মে না চলেন তবে তাহারা ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিবে। এই পত্রের কি উত্তর দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা বসিল, আমি সে সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। রাজা ও রাজমহিষী রাজপরিচ্ছদে বেদীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন, কিনউন ও তয়িন্দা মন্ত্রী এবং অন্যান্য সভাসদবর্গ দরবারোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া নতজানুভাবে পদদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন।

মহারাজ ইংরেজরাজের এই পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজাকে

অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা বলিলেন সভাস্থলে মন্ত্রণা দ্বারা এ সম্বন্ধে মতামত স্থির করা হইবে। একজন কর্ম্মচারী সভাস্থলে উচ্চৈঃস্বরে সেই পত্র পাঠ করিলেন, রাজা মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তয়িন্দা মন্ত্রী বলিলেন "এই সকল বিদেশী দস্যুর বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং তাহাদিগকে সমুদ্র পারে বিতাড়িত করা আবশ্যক। ইহাদিগকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিতে কি ব্রহ্মরাজের সহস্র সহস্র সাহসী সৈন্য নাই? এই ইংরেজগণ কি ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে আরাকান ও পেগুপ্রদেশ আত্মসাৎ করে নাই? আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত প্রভু, হস্তীর অধিপতি, রাজ-রাজেশ্বর কি ঐ সকল রাজ্য পুনরধিকার করিতে অসমর্থ? ব্রহ্মরাজের সৈন্যগণ কি বৈদে-শীক সেনানায়ক দ্বারা সুশিক্ষিত হয় নাই? প্রাসাদে কি যথেষ্ট বন্দুক এবং গোলাগুলি নাই? ইংরেজেরা যে মহারাজের ক্ষমতার উপর হস্তার্পণ করিবে ইহা কখনই হইবে না। মহারাজ অনুমতি করুন ইংরেজ দস্যুগণ সমূলে বিনষ্ট হইবে।"

তয়িন্দা সর্দ্দার এইরূপ ভাবে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলে মহিষী বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন; তয়িন্দা সর্দ্দার ও রাজ্ঞী উভয়ের মত সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। রাজ্ঞী সকল কথা শুনিয়া রাজার দিকে চাহিয়া একবার হাস্য করিলেন। অনন্তর রাজা কিন্‌উন্‌ মন্ত্রীর মতামত জানিতে চাহিলেন। কিন্‌উন নতজানু হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"আমার প্রভু মহারাজ অবগত আছেন যে তাঁহার ভৃত্য আমি বহুদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং ভারতবর্ষ ফ্রান্স ও ইংরেজরাজ্য সন্দর্শন করিয়াছি। রাজভৃত্য আমি ইংরেজদিগের সৈন্যদেখিয়াছি, প্রভুর সৈন্যগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব মহারাজ অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করুন, ইতিমধ্যে আমাদের সৈন্যগণ সুশিক্ষিত হউক, অধিক সংখ্যক কামান সংগ্রহ করা যাক্‌ এবং পশ্চিমপ্রান্তবাসী জাতিগণের সখ্যতা লাভ করা যাউক। আপাততঃ যদি মহারাজ ইংরেজদিগকে লিখিতেন যেতাহাদের অনুরোধ পূর্ণ করা হইবে তাহা হইলে ভাল হইত, আবশ্যক হইলে তাহাদের অনুরোধ ধীরে ধীরে পূর্ণ করিলেও চলিতে পারিত; ইত্যবসরে আমাদের যুদ্ধের আয়োজন চলিলে কয়েক বৎসর পরে আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু এক্ষণে নহে।"

কিন্‌উন মন্ত্রীর এই উপদেশে রাজ্ঞী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কিন্‌উনকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; ভূতপূর্ব্ব রাজার আদেশ ছিল ব্রহ্মে মৃত্যুদণ্ডের যে নিরেনব্বুইটি ধারা প্রচলিত আছে কিন্‌উন মন্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার কোন ধারাই কার্য্যকরী হইবে না, এরূপ আদেশ না থাকিলে বোধ হয় রাজ্ঞী বহুপূর্ব্বে তাঁহাকে ঘাতক হস্তে সমর্পণ করিতেন। যাহা হউক কিনউনের কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন এবং এত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন যে চুরট টানা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, চুরটের আগুণ নিভিয়া গেল, এবং আর একটি চুরটের জন্য তিনি আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন। রাজা স্তব্ধভাবে শুধু মন্ত্রীর কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর লেতিন-আটুইউন প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গ রাজাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন যে ব্রহ্মরাজের সৈন্যগণ মন্ত্রবলে গোলাগুলি ও তরবারির ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া অমর হইয়াছে, তাহারা অনায়াসেই ইংরেজবাহিনী ধ্বংশ করিতে পারিবে। তাঁহারা আরো বলিলেন যে চীনেরা একবার এমন এক দর্পণের আবিষ্কার করিয়াছিল যাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া সেই নিক্ষিপ্ত সূর্য্যকিরণে সমগ্র শত্রু-সৈন্য দগ্ধ হইয়াছিল, অতএব রাজার যুদ্ধ করাই উচিত। মহারাজ স্থিরভাবে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন, মধ্যাহ্নসূর্য্য ধীরে ধীরে গগণের পশ্চিমপ্রান্তে উপনীত হইলেন, তথনো আন্দোলন চলিতে লাগিল। এক এক জন মন্ত্রী মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক আপনার বক্তব্য নিবেদন করিয়া মাথা নোয়াইয়া নীরব হইতে লাগিলেন; অনন্তর কিন্‌উন মন্ত্রী রাজাকে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ দিয়া বলিলেন ঃ—

"মহারাজের একজন স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষ কি ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আরাকান হইতে বঞ্চিত হন নাই? মহারাজের আর একজন পিতৃপুরুষও ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পেগু হারাইয়াছেন; প্রভু এ দাসের নিবেদন শ্রবণ করুন—ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আভা হারাইবেন না।"

কিন্‌উন মন্ত্রীর পরামর্শ মহারাজের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। কারণ কিন্‌উন একজন বহুদর্শী বৃদ্ধ অমাত্য। রাজ্ঞী রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন তিনি কিন্‌উনের পরামর্শ সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন, ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে রাজার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন "আমিও রাজার মহিষী, মহারাজকে, আমার প্রভুকে আমারো কিছু বলিবারআছে; মহারাজ কি সেই বৈদেশিকদিগের দাস যে তিনি তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইবেন?"— রাজ্ঞীর সুস্পষ্ট এবং উচ্চ কণ্ঠধ্বনি সেই বৃহৎ প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

মুহূর্ত্তের জন্য মহিষী নীরব হইলেন, তাহার প'র অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষণের পর বৃক্ষপত্র হইতে বারিবিন্দু যেমন ধীরে ধীরে ভূপতিত হয় তেমনি ধীরে ধীরে তিনি বলিতে লাগিলেন "ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞা পালন অপেক্ষা সুবর্ণ সিংহাসন বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয়। আমার প্রভু কি তাঁহার রাজ্যে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মাত্র যে তাঁহার নিয়ামকের অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিবেন? আমার প্রভু এক সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহার তরবারী তীক্ষ্ণ, যাঁহারা তাঁহার অপমান করিতে সাহসী হইবে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার তরবারী তাহাদের অবমাননার প্রতিশোধ প্রদান করিবে। পরের আদেশ শৃঙ্খল আমাদের কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বেই আমরা সসৈন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চাহি। কিন্তু ভীত হইবারও কোন কারণ নাই; আমাদের সাহসী, মৃত্যুঞ্জয়ী সৈন্যগণ শীঘ্রই শত্রুসৈন্য পরাস্ত করিয়া যে কৃষ্ণসাগরের পরপার হইতে তাহারা আসিয়াছে সেইখানে বিদূরীত করিবে। তৈয়িন্দা মন্ত্রীর প্রতি সৈন্য-ভার অর্পিত হউক, তিনিই যুদ্ধ জয় করিবেন।"

তাহার পর রাজ্ঞী কিন্‌উন মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঘৃণাপূর্ণ স্বরে অবজ্ঞাভারে

বলিতে লাগিলেন "কিন্‌উন মন্ত্রী বৃদ্ধ এবং ভীরু, মন্ত্রী বলা দূরের কথা তাহাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেই বৃদ্ধে এবং একজন বৃদ্ধা রমণীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, আমার পরিচারিকা রমণীর পরিচ্ছদ লইয়া আসুক, তাহা পরিধান করিলে তাহার কথার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। এবং যখন সে রাজার সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন জগৎ দেখিবে তাহার কতটুকু মূল্য!"

রাজ্ঞী আবার নীরব হইলেন, এবং হস্তের উপর অবনত মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া অশ্রুধারা অঙ্গুরী বহিয়া বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আমি তাঁহার মৃদু ক্রন্দনোচ্ছ্বাস শুনিতে পাইলাম; আমাদের বড়ই ভয় হইয়াছিল, আমরা আর কখন তাঁহাকে রোদন করিতে দেখি নাই, রাজদরবারে বসিয়া রাজ্ঞী রোদন করিতেছেন এ দৃশ্য ভয়ানক! মন্ত্রীগণ সকলে করজোড়ে অবনত মস্তকে সভাতলে উপবিষ্ট ছিল। সেই সুবিস্তীর্ণ গৃহে সমস্ত নীরব, কেবল রাজ্ঞীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি এবং বাহিরে জলাশয়ে জলের সুমন্দ কলোচ্ছ্বাস। রাজা তখনো চিন্তামগ্ন। তিনি একবার মহিষীর দিকে চাহিলেন, তাহার পর উজ্জ্বলবেশধারী মন্ত্রীবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিজ্ঞ, বৃদ্ধ কিনাউন মন্ত্রীর দিকে তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইল; অনন্তর সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত শুভ্র প্রাসাদ প্রাঙ্গণের স্বর্ণখচিত স্তম্ভশ্রেণী এবং উদ্যানস্থ সুশ্যামল বৃক্ষরাজি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাজ্ঞী তাঁহার অনুচ্চ ক্রন্দন হইতে বিরত হইয়া রাজার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন "আমি মহারাজের আদেশ গ্রহণ করিয়া এক্ষণে এই রাজসভা ত্যাগ করিব।" কিন্তু মহারাজ তাঁহার প্রিয়তমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন "মহিষি, আর একটু অপেক্ষা কর।" অনন্তর মন্ত্রীবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যুদ্ধ করাই স্থির। অবিলম্বে এই সভাস্থলে ঘোষিত করা হউক এবং ইংরেজদিগকে এই উত্তর লেখা হউক যে রাজরাজেশ্বর, শ্বেত হস্তীর অধিনায়ক, আভার অধিপতি বৈদেশিকের অনুজ্ঞা পালন করেন না, তাহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করা হইল।"

মহারাজ সভাস্থল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, মহিষী তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে সময় দেখিলাম তাঁহার মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষুদ্বয় আরক্তিম এবং তাঁহার লোহিত পরিচ্ছদ স্থানে স্থানে অশ্রুসিক্ত। তাঁহাকে আহ্লাদিত দেখাইলেও বোধ হইল সে আহ্লাদের সহিত বিষাদ সংমিশ্রিত আছে। পশ্চাতে চাহিয়া কিন্‌উন মন্ত্রীকে সভা ত্যাগকরিয়া যাইতে দেখিলাম, তাঁহার মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ, বোধহইল তিনি লজ্জিত হইয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীবর্গকে অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ দেখিলাম, তাঁহারা কিন্‌উন মন্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

থাকিন, সে সভার কথা চিরদিন আমার মনে থাকিবেক; কিন্তু সকল কথা পর পর আপনাকে বলিতে পারিতেছি না, আমি তখন বালিকা মাত্র, সকল কথা কিরূপে মনে রাখিব?

আমি যাহা যাহা বলিলাম সকলই সত্য, কিন্তু ভাল করিয়া বলিতে পারিলাম না।

শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। মহিষী মহারাজের সহিত সর্ব্বদাই রাজসভায় গমন করিতেন। মান্দালয় হইতে সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য প্রেরিত হইতে লাগিল কিন্তু এসম্বন্ধে আপনি বোধ হয় আমার অপেক্ষা অনেক অধিক জানেন; প্রাসাদে যাহা শুনিতাম আমি তাহাই শুদ্ধ জানি। তাহারো অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কতক·বা হয়ত সত্য নহে। সে সময় প্রাসাদে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, অনেক মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তয়িন্দা মন্ত্রী কোথাও যান নাই।

তাহার পর যুদ্ধের সংবাদ আসিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাকালে মিনহলা নগর হইতে প্রাসাদে সংবাদ আসিল যে মিন্‌হলা নগর প্রান্তে ইংরেজ সৈন্যের সহিত এক প্রবল জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজ সৈন্য পরাস্ত এবং তাহাদের দুই খানি রণতরী ব্রহ্ম সৈন্যের করায়ত্ত হইয়াছে—বলা বাহুল্য এসংবাদ সত্য নহে; কিন্তু রাজধানীর সকলেই ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল, এবং মহিষী ইহা আমাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

বিজয় সংবাদে প্রাসাদে মহাধূমধামে নৃত্যগীত হইবার অনেক আদেশ প্রদত্ত হইল। রাজা মহিষী রাজকুমারগণ এবং মন্ত্রীবর্গ পুষ্প সমাচ্ছন্ন স্ফটিক দ্বারশোভিত এক সুবিস্তীর্ণ কক্ষের বহিঃপ্রদেশে উপবেশন করিলেন। নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। নটগণ রাজা রাজমহিষী এবং ব্রহ্মসৈন্যের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বিস্তর বক্তৃতা করিল, এবং বলিল ইংরেজগণ শীঘ্রই বিতাড়িত হইবে। মহিষীপ্রদত্ত স্বর্ণরৌপ্যখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া নর্ত্তকগণের প্রমোদনৃত্য এবং প্রাঙ্গনে অভিনেতাবর্গকে বেষ্টনপূর্ব্বক সঙ্গীতযুদ্ধ ও প্রাসাদ পরিচারকগণের একত্র সমাবেশের দৃশ্য অতীব সুন্দর হইয়াছিল। তাহার পর মশাল এবং অন্যান্য নানাপ্রকার সুসজ্জিত উজ্জ্বল আলোকমালা; কিন্তু যেখানে রাজা ও রাজমহিষী উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে আলোকসংখ্যা অধিক ছিল না; সেই ক্ষীণালোকে মহিষীর হীরকখণ্ডগুলি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং তাঁহার স্বর্ণ ভূষণের আভা বিকীরিত হইতেছিল।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রথমে নৃত্য করিয়া পরে গান গাহিতে লাগিল। সেই মনোহর সঙ্গীতে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহারাজ এবং তৎপার্শ্বস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম শোভান্বিতা মহারাণীর মাহাত্ম্য ও গুণগ্রাম কীর্ত্তিত হইতেছিল। সে যখন গাহিতে লাগিল প্রজাবর্গ মহিষীকে কিরূপ গভীরভাবে ভয় ও ভক্তি করে, এবং বৈদেশীকগণ অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কিরূপে ব্রহ্মরাজ্য সমাচ্ছন্ন করিতে চাহে, তখন সেই অভিনেত্রী মহিষীর সমুচ্চ আসনের পাদদেশে আহুত হইল। মহারাণী আমার দ্বারা তাহাকে একখানি স্বর্ণাভরণ ও সে যে উত্তম গাহিয়াছে সেই বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বৃটিশরণতরীদ্বয়ের পরাজয় গীতি গাহিতে হইবে ইহাও জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। আমি সেই উচ্চ মণ্ডপ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যখন তাহাকে সেই অলঙ্কার প্রদান

করিলাম এবং দর্শকবর্গ শুনিতে পায় এরূপ স্বরে মহিষীর আদেশ জ্ঞাপন করিলাম তখন সেই বিপুল জনস্রোতের মধ্যে একটি অস্ফুট কলধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজও প্রধান অভিনেতাকে উপহার প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য অভিনেতাবর্গও অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত হইল না। প্রাসাদে সমস্ত রাত্রি সঙ্গীত তরঙ্গ প্রবাহিত হইল; মশালের আলোকে সে রাত্রি এতই উজ্জ্বল হইয়াছিল, যে জগতের কেন্দ্রস্থিত সপ্তচূড়স্তম্ভের সুবর্ণময় শিরোদেশ নয়ন গোচর হইতে লাগিল।

তাহার পর দুই তিন দিন আরো সংবাদ দাতা আসিয়াছিল। কখন তাহারা জয় ঘোষণা করিত, কখন বলিত যে বৈদেশিকগণকে নদীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছে, কারণ এই উপায়ে তাহাদের পশ্চাতে নদীপথ অবরোধ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিপন্ন ও সম্পূর্ণ-রূপে বিদ্ধস্ত করা যাইবে। প্রাসাদে সকল প্রকার জনরবই শুনিতে পাওয়া যাইত। কখন কখন পরাজয় ও ক্ষতি সম্বন্ধে জনরব উঠিত যে আমাদের দুর্গ বিজীত ও অনেক লোক নিহত হইয়াছে; কিন্তু কেহই সাহস পূর্ব্বক এ সকল জনরব মহিষীকে জ্ঞাপন করিতে পারিত না। মহিষীও সর্ব্বদাই জয়ের কথা উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন যে বৈদেশীকগণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে ও সৈন্যগণের গৌরবে আনন্দিত হইতে বলিতেন এমন কি এই উপলক্ষে তিনি আমাদিগকে পরিধানের জন্য নূতন নূতন পরিচ্ছদও প্রদান করিতেন। কিন্তু যখন তিনি একাকী থাকিতেন তখন তাঁহার হাসি কোথায় মিলাইয়া যাইত, তাঁহাকে বিমর্ষ ও চিন্তাক্লিষ্ট বোধ হইত। কখন কখন তিনি আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, আবার তখনই সে ভাব বিদূরীত হইত এবং তাঁহাকে হাসিতে দেখা যাইত। যখন তিনি মহারাজের নিকটে থাকিতেন তখন তাঁহাকে প্রফুল্ল ও বিশ্বস্তচিত্ত বলিয়া বোধ হইত এবং তাঁহারা কতদিনে রেঙ্গুন জয় করিয়া রাজার ন্যায় সেখানে প্রবেশপূর্ব্বক মহাসমুদ্র, ও সাগরস্থিত জলযান সমূহ নিরীক্ষণ করিবেন সেই সম্বন্ধে মহারাজকে আদরের সহিত কত কথাই বলিতেন।

একদিন প্রত্যূষে মহারাণী প্রাসাদের উত্তরস্থ উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার সহচরীবর্গের মধ্যে আমাকে আহ্বান করায় আমি তামাকের স্বর্ণ বাক্স লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলাম। এই উদ্যানে অনেকগুলি সুদৃশ্য খাল ও সরোবর আছে, তাহাদের উপর স্থানে স্থানে সাঁকো এবং বিভিন্ন রাস্তার দুই ধারে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তূপ, নানাবিধ মনোহর লতা ও গুল্মে সে গুলি সমাচ্ছন্ন। নভেম্বরের সেই অত্যন্ত শীতল প্রভাতে স্বচ্ছ সরোবরজলে কুয়াশা একখানি কোমল আবরণের ন্যায় বিস্তৃত ছিল এবং শিশিরার্দ্র প্রস্ফুটিত কুসুমগুলি তাহাদের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল। মহারাণী সেখানে খালের ধারে বেড়াইতে এবং সরোবর জলে সঞ্চরণশীল মৎস্যের খেলা দেখিতে ভাল বাসিতেন। এই উদ্যান হইতে প্রাসাদের লোহিত ও স্বর্ণময় প্রাচীরশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রভাত সূর্য্যের কণক কিরণে বহির্মণ্ডপ-

গুলির ত্রিকোণ চূড়া ও সমুচ্চ স্তম্ভের অগ্রভাগ সুরঞ্জিত হইয়া উঠে। এই উদ্যানের এক প্রান্তে একটি শুভ্র বেদীমঞ্চ আছে, তাহার অনতিদূরে এক মুক্ত প্রান্তরে রাজকর্ম্মচারীবর্গের সন্তানসন্ততিরা খেলা করিয়া থাকে।

মহারাণী বেড়াইতে বেড়াইতে এইস্থানে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া আমাকে তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্য সঙ্কেত করিলেন; অনতিদূরে জলের ধারে তখনো অনেক বালকবালিকা খেলা করিতেছিল, কতকগুলি ছোট বালক ফুটবল লইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল এবং তাহাদের উচ্চ হাস্য এবং দ্রুত পদধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ক্রীড়াশীল বালকবালিকাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে অশ্বত্থ মূলে মহিষীর নিকট ডাকিয়া আনিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হইল।

আমি একটি আট বৎসর বয়স্কা বালিকাকে ডাকিলাম, সে একজন প্রধান কর্ম্মচারীর কন্যা; মহারাণী ডাকিতেছেন তাহাকে অবশ্য এ কথা বলি নাই এবং ইহা বলিতে মহিষীর নিষেধও ছিল। যাহা হউক আমি তাহাকে ডাকিতেই সে কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া আমার হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

হঠাৎ অশ্বত্থ ছায়ায় রাজ্ঞীকে দেখিয়া বালিকা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, এবং পলায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু আমি তাহাকে সাহস দিয়া বলিলাম মহারাণী তোমাকে একটা জিনিষ দিবেন, বালিকা আমার সঙ্গে মহিষীর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল।

বালিকা তাহার পিতামাতাকে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি সম্বন্ধে গল্প করিতে শুনিয়াছে রাজ্ঞী মেবিয়া তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিলেন। আমি তাহাকে আদর করিয়া একথা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল যে তাহার পিতামাতা সে সময় যুদ্ধ সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলেন; কিরূপে আমাদের সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে, বৈদেশীকগণ কিরূপে মিনহলা নগর অধিকার পূর্ব্বক অনেক নাগরিককে বিনাশ করিয়াছে এবং তাহারা ক্রমেই মান্দালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বালিকা এই সমস্ত বিষয় তাহার পিতামাতার নিকট যেমন যেমন শুনিয়াছিল তাহাই বলিতে লাগিল। সে আরো বলিল যে তাহার পিতামাতা গত রাত্রে তাঁহাদের সমস্ত স্বর্ণরৌপ্যাদি ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছেন এমন কি তাহার মাতা তাহাকে বলিয়াছেন যে, তাহার সোণার বালা দুগাছিও মাটীতে পুঁতিয়া রাখিবার জন্য খুলিয়া দিতে হইবে, নতুবা দুর্দ্দান্ত বৈদেশীকগণ শীঘ্রই মান্দালয়ে আসিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে। বালিকা ধীরে ধীরে এই সকল কথা বলিতে লাগিল। দুই একবার বা তাহাকে আদর দিয়া কিম্বা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দুটি একটি কথা বাহির করিয়া লইতে হইল। সকল কথা বলা হইলে বালিকা কাঁদিতে লাগিল কারণ সে কিছুতেই তাহার বালা ছাড়িতে চাহেনা। বালিকা মা-থাম যখন এই সকল কথা বলিল তখন রাজ্ঞী নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন; শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও চক্ষু প্রসারিত হইয়া উঠিল। বালিকার সকল কথা বলা হইলে রাজ্ঞী তাহাকে

একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রত্ন উপহার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন এবং বলিলেন যেন তাঁহার সহিত এই কথোপকথনের কথা সে কাহারো নিকট প্রকাশ না করে, সে শুধু বলিবে যে মহিষী তাহাকে ডাকিয়া এই অলঙ্কার খানি দিয়াছেন। বালিকা তাহার সঙ্গী সঙ্গিনীদের নিকট ফিরিয়া গেল; আমি ক্রমে আরো তিনজনকে ডাকিয়া আনিলাম, তাহারা সকলে সেই একই প্রকার কথা বলিতে লাগিল,—তাহাদের পিতামাতা পরাজয় ও ক্ষতির আশঙ্কায় ভীত হইয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন; এমন কি দুই জনের পিতামাতা রাজধানীতে শীঘ্রই ইংরেজ প্রবেশ করিবে এই ভয়ে মান্দালয় পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

রাজ্ঞী সমস্ত কথা শুনিয়া ধীর পদক্ষেপে স্থানান্তরে চলিলেন; আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন "বালিকাদের কথা শুনিয়াছ, এত অল্প বয়সে তাহারা মিথ্যা বলিতে শেখে নাই তাহাদের সমস্ত কথা নিশ্চয়ই সত্য। আমাদের মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ আমার কাছে সত্য কথা বলিতে সাহস করে নাই কিন্তু তুমি মেয়েদের নিকট যে সকল কথা শুনিলে তাহা ভুলিয়া যাও, সাবধান, ইহার একটি কথাও যেন কাহারো নিকট প্রকাশ না হয়।"

অনন্তর মহিষী উদ্যানের অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ হইল। শত্রুসৈন্য একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য ধ্বংশ করিতে অগ্রসর হইতেছে অথচ এই বিপদ সংবাদ ছোট ছোট বালকবালিকা ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট পাইবেন সে সম্ভাবনা নাই, ইহা বড়ই ভয়ানক কথা। যে সকল লোককে তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতির উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছেন, তাঁহার সহস্র সহস্র পরিচারক ও পরিচারিকা, যাহাদের অদৃষ্ট সূত্র তাঁহার করধৃত, তাহাদের মধ্যে এমন একটী লোকও ছিল না যে জলপথে শত্রুসৈন্যের আগমন কথা তাঁহার নিকট যথাযথ বলিতে পারে। যাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রহ্মরাজ ব্রহ্মদেশ শাসন ও সান সর্দ্দারবর্গের উপর ক্ষমতা পরিচালন করিতেন, যিনি ইচ্ছামাত্রে শত শত ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছেন কিম্বা শত শত ব্যক্তিকে প্রবল ক্ষমতাপন্ন ও ধনবান করিয়াছেন যাঁহার ধনাগার স্বর্ণরৌপ্য এবং মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ ছিল, এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবার একটি লোকও দেখা গেলনা। আমি তখন ক্ষুদ্র বালিকামাত্র, এখনকার মত তখন আমি এ সকল কথা ভাল বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু মহারাণীর জন্য আমি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মহিষী শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ পরিশোভিত পথ দিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পশ্চিম ফাটকে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন মহারাজ উদ্যান গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, মহিষী দ্রুতপদে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আর কোন নূতন যুদ্ধ জয়ের সংবাদ আছে কি না? তাঁহার স্বর হর্ষযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বিষণ্ণ ভাব দূর হইয়া—তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আমার জ্বর হওয়ায় সেই দিন ও তৎপর দিন আর মহিষীর নিকট উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। তৃতীয় দিন প্রভাতে আমি আমার উত্তপ্ত কক্ষে রোগশয্যায় শুইয়া ছিলাম আমার অসুখের সংবাদ পাইয়া আমার মা প্রাসাদে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই প্রভাতে তিনি যখন আমার কপালে জলসেক করিতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ প্রাসাদে ভয়ানক গোলযোগ শুনিতে পাইলাম, বোধ হইল অনেক লোক কলরব করিতে করিতে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। কি ঘটিল জানিতে না পারিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম; আমার বোধ হইল, হয় বিদ্রোহ হইয়াছে কিম্বা বহির্দ্দেশে কেহ নিহত হইয়াছে। আমি অতি কষ্টে জানালার নিকট আসিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম; সেখানে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মনোনিবেশপূর্ব্বক লক্ষ্য করাতে শুনিতে পাইলাম যেন বহুদূরবর্ত্তী শালপর্ব্বত মালা হইতে ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় অস্পষ্ট শব্দ বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং সেই জানালা বাগানের দিকে থাকায় আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; আমি শুইয়া পড়িলাম, তাহার পর মা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে এ সকল কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বলিলাম জানালার দিকে তাকাইয়া আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই, শুনিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছি কিনা। আমি বলিলাম অনেক দূরে মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শুনিয়াছি, তখন তিনি উত্তর করিলেন ইংরেজ রণতরী হইতে আভার দিকে কামান ছুড়িতেছে, এ তাহারই শব্দ। মহারাজা এবং মহিষী এই কামানের শব্দ শুনিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে ইংরেজ সৈন্য এত নিকটে আসিয়াছে। এই জন্যই প্রাসাদে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে।

সেদিন সমস্ত রাত্রি প্রাসাদে গোলমাল চলিয়াছিল। যখনই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে আমি তখনই পাহারাওয়ালাদের চীৎকার ও পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। আমার সঙ্গিনী একবার মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমার কক্ষে আসিয়াছিল; সে বলিল রাজা, রাণী এবং মন্ত্রীবর্গ অনেকক্ষণ হইতে দরবার করিতেছেন। তয়িন্দামন্ত্রী রাজা ও রানীকে সুইবো নগরে পলায়নের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু কিনউন মন্ত্রী বলিয়াছেন ইংরাজ সৈন্যের মান্দালয়ে প্রবেশকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজধানী ত্যাগ করা উচিত নহে।

আমি আমার সঙ্গিনী মা-সো-থা-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইংরেজ আসিলে সে কি করিবে? প্রত্যুত্তরে মহিষীর কাছেই থাকিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মা-সো-থা পুনর্ব্বার আমার নিকট উপস্থিত হইল; সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল তাহার একটু ঘুমাইবার প্রয়োজন হওয়ায় সে আমাকে তাহার পরিবর্ত্তে মহিষীর নিকট যাইতে বলিল। আমার জ্বর সারিয়া ছিল, সুতরাং আমি রাণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখনো বেশ অন্ধকার ছিল, দেখিলাম মহারাণী একটি কক্ষে বসিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট দুই একজন মাত্র সহচরী উপস্থিত ছিল,

আমি ভাবিলাম অন্যান্য সকলে বুঝি ঘুমাইতে গিয়াছে কিন্তু একজনের নিকট শুনিলাম রাত্রে গোলোযোগের মধ্যে তাহারা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

মহারাণীর পশ্চাতে আমি অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, তিনি কোন কথা বলিলেন না! তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিতে পাইলাম; সেই প্রভাত সূর্য্য মধ্যাকাশে উঠিতে না উঠিতে ইংরেজ সৈন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিবে, তখন কি ভয়ানক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে মহিষী বোধ হয় তাহাই ভাবিতে ছিলেন। আমরা তখন ইংরেজদিগকে জানিতাম না সুতরাং ইংরেজগণ যে দয়ালু এবং তাহাদের সৈন্যগণ যে আজ্ঞাবহ আমাদের তখন সে ধারণা ছিল না। বোধ হয় মহিষী মনে করিয়াছিলেন সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই রাজারাণী এবং প্রাসাদস্থ সকলেরই জীবন লীলা অবসান হইবে।

একবার তিনি তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে একখানি স্বর্ণ খচিত গজদন্তের বাঁট বিশিষ্ট তরবারী গ্রহণ করিলেন, এবং অনেক ক্ষণ পরে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বড়ই ভীত হইলাম, অন্য একজন সহচরীকে চুপে চুপে বলিলাম মহিষী হয়ত আত্মহত্যা করিবেন; কিন্তু সে উত্তর করিল "ভয় নাই মহিষী তাহা করিতে পারিবেন না।" তখন আমি বুঝিতে পারি নাই মহিষী আত্মহত্যা করিতে কেন অসমর্থ হইবেন, কিন্তু এখন তাহা বুঝিয়াছি। যতক্ষণ মহারাজ জীবিত থাকেন, ততক্ষণ মহিষী আত্মহত্যা করিতে পারেন না, কারণ মহিষীর আত্মহত্যা করার পর যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, ততক্ষণ তবে তিনি হয় ত মহিষীর অভাবে আর একজন রমণীকে ভাল বাসিবেন, এরূপ কল্পনাও মহিষীর অসহ্য। যতদিন মহারাজ জীবিত থাকিবেন, তাঁহার প্রেমে একাধিপত্য করিবার জন্য মহিষীও জীবিত থাকিবেন; জীবিত কি মৃত সকল অবস্থাতেই তিনি মহারাজের অদ্বিতীয় প্রণয় পাত্রী থাকিবেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। রাজ্ঞী অত্যন্ত গর্ব্বিতা, এই গর্ব্বের জন্য তিনি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন কিন্তু তাঁহার প্রেম অপেক্ষা তিনি আর কিছু মূল্যবান বলিয়া জানিতেন না, এবং এই প্রেমের জন্যই তিনি প্রাণ রক্ষা করিলেন।

মেবিয়া ধীরে ধীরে তরবারি রাখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং সিগারেটের জন্য মুখ ফিরাইলেন, আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অবিলম্বে একটি সিগারেট তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে দিলাম। আমাকে সিগারেট দিতে দেখিয়া মহিষী বলিলেন "কেও, তুমি, মা-থিন-মি? তাহ'লে তুমি পালাওনি? আমি শুনেছি আমার ছোট সহচরীটির অসুখ হয়েছিল, জ্বর সেরেছেত?" আমি বলিলাম আমি সুস্থ হইয়াছি, মহারাণী যদি আমাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে আমি কখনই সঙ্গ ত্যাগ করিবনা। এই কথায় মহিষী মস্তক নাড়িয়া বলিলেন বৈদেশিক সৈন্যগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই আমার এবং অন্যান্য অল্প বয়স্কা কুমারীগণের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তিনি আরো বলিলেন "কি ঘটে কে বল্‌তে পারে; আমার সঙ্গিনী কুমারীগণের কারো যদি কোন বিপদ হয় ত আমি বড়ই দুঃখিত হব। আমি রাজমহিষী, আমাকে অবশ্য রাজার সঙ্গেই থাকৃতে হবে।"

মহিষী কোন আদেশ প্রদান করিলে কাহারো সাধ্য নাই যে তাহার উপর কোন কথা বলে কিম্বা সেই আদেশ অগ্রাহ্য করে; সুতরাং আমি নিরুত্তর রহিলাম কিন্তু দুঃখে আমার কণ্ঠরোধ হইল। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিলাম, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশের অনেক উপরে উঠিল, এবং সমস্ত উদ্যান আলোকে পূর্ণ হইল।

অবশেষে মহারাণী গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিভিন্ন গৃহের ভিতর দিয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গনে আমার পিতার নির্ম্মিত গোলাকার স্তম্ভের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলে তাঁহার অনুগমন করিলাম। স্তম্ভের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি স্তম্ভ শিখরস্থ শান্ত্রীকে ডাকিবার জন্য মা-সো-নিনকে আদেশ করিলেন। শান্ত্রী উত্তর দিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল নদীতে কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কিনা; শান্ত্রী উত্তর করিল অনেকগুলি ষ্টীমার নদীতীরে আসিয়া লাগিয়াছে দেখা যাইতেছে। সেই স্তম্ভের উপর হইতে সমস্ত মান্দালয় নগর দৃষ্টিগোচর হয়, এমন কি নগরপ্রান্তস্থ প্রকাণ্ড ইষ্টকপ্রাচীর, নদীতীরে তিন মাইল পর্য্যন্ত ঘরবাড়ী এবং মান্দালয় ও ধূসর সাগাহিংগিরিরাজির মধ্যে দুই মাইল কি তাহারো অধিক বিস্তৃত ইরাবতী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে সুবিশাল শান পর্ব্বত মালা একটি প্রাচীরের ন্যায় বোধ হয় এবং তাহার পাদ দেশে যে শ্যামল প্রান্তর তাহাও নয়ন পথে পতিত হয়। শান্ত্রী এ সময় স্তম্ভের উপর হইতে পশ্চিমদিকই লক্ষ্য করিতে ছিল।

রাজ্ঞী সেখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া শান্ত্রীকে আদেশ করিলেন সে যাহা দেখিবে মধ্যে মধ্যে তাহা যেন নীচে জানাইয়া যায়; তদনুসারে শান্ত্রী সংবাদ দিল যে রণতরী গুলি তীর সংলগ্ন হইতেছে এবং নাগরিকবর্গ দলে দলে সেখানে উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছে। রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন গোলা গুলি বর্ষণ হইতেছে কিনা তদুত্তরে শান্ত্রী সেরূপ কিছু দেখিতে পাইতেছে না বলিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ প্রাসাদের সর্ব্বত্র নীত হইল। কর্ম্মচারীবর্গ এবং অন্যান্য লোক দলে দলে সৌধ প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল কিন্তু রাজ্ঞীর নিকট আমরা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। মহারাজ তখন কোথায় ছিলেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই, সেদিন সকালে আমি তাঁহাকে দেখি নাই। মহিষী সেই স্তম্ভমূলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, অনন্তর আর কিছু দেখা যাইতেছে কিনা শান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে শান্ত্রী বলিল সৈন্যগণ রণতরী হইতে অবতরণ করিতেছে, অশ্ব কামান সমস্ত নামান হইলে শুনিতে পাওয়া গেল তাহারা নগর তোরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মহিষী যখন শুনিলেন যে বৈদেশিকগণ অবশেষে রাজধানীর পথে আসিয়া পড়িয়াছে তখন তিনি বুঝিলেন সর্ব্বস্বান্ত হইতে আর বিলম্ব নাই। বোধ হয় ইহার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ও তাঁহার কিঞ্চিৎ আশা ছিল, কিন্তু এইবার সকল আশার অবসান হইল। সোণার আভা, রাজা, রাজ মহিষী সমস্ত বুঝি আজ বিনষ্ট হয়, সাংগাই পর্ব্বত মালার অন্তরালে তপনদেব বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বেই কি সর্ব্বনাশ না সাধিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

সহসা মহিষী সেই মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত শ্বেত সৌধ প্রাঙ্গনে আপনার দেহ ভার নিক্ষেপ পূর্ব্বক অধোমুখে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলের চারিদিকে কেশদাম বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। নিকটে যে সমস্ত লোক দণ্ডায়মান ছিল এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তাহারা অন্যত্র প্রস্থান করিল; রাজ্ঞী ও তাঁহার কতিপয় সহচরী ভিন্ন সেখানে আর কাহাকেও দেখা গেল না। মহিষী অবনতজানু হইয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "আমি, ব্রহ্মরাজমহিষী আমিই আমার প্রিয়তমের, আমার স্বামী ব্রহ্মরাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইলাম, ইহা শুদ্ধ আমা হইতেই হইল।" পুনর্ব্বার তিনি ভূমিতলে দেহ লুণ্ঠিত করিতে করিতে মৃত্তিকায় করাঘাত করিতে লাগিলেন। রুদ্ধ অশ্রুচ্ছ্বাসে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

আমরা কি করিব কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। মহিষীর এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু আমরা কি করিতে পারি? অর্দ্ধ ঘণ্টারও অল্পকাল মহিষী সেই সৌধ প্রাঙ্গনে স্তম্ভের ছায়ায় পতিত ছিলেন, কিন্তু তাহা একবৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল!

অবশেষে মহারাণী গাত্রোত্থান করিলেন। একজন সহচরী তাঁহার কেশ পাশ বাঁধিয়া এবং তাঁহার বিশৃঙ্খল বেশ বাস সজ্জিত করিয়া দিল। তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চিম পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্নানান্তে তাঁহাকে রৌপ্য খচিত লোহিত এবং শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতে আমাদিগকে আদেশ করিলেন; তাঁহার কবরী প্রস্ফুটিত গোলাপে এবং গলদেশ হীরকের কণ্ঠাভরণে বেষ্টিত হইল। তিনি হস্তে মণি খচিত স্বর্ণ বলয় পরিধান করিলেন এবং কপোল ও কণ্ঠ দেশ সুগন্ধিচূর্ণে রঞ্জিত করিলেন। এতক্ষণ পরে তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করিল। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি সৌধ প্রাঙ্গনতলে বিলাপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুজল বর্ষিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু তাঁহাকে পরিচ্ছদে সজ্জিত করিবার সময় দেখিয়াছিলাম যে তাঁহার শুভ্র, সুকোমল বক্ষঃস্থল তাঁহার নিরাশ করতাড়নায় তখনো রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর রাজ্ঞী কিঞ্চিৎ আহার করিয়া মহারাজের নিকট যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এবং কয়েক জন কুমারী সহচরীকে তদ্দণ্ডেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার আদেশ করিয়া বলিলেন কেবল বয়োবৃদ্ধা ও রাজকুমারীগণই প্রাসাদে থাকিবেন। আমাকে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে বলায় আমি তাঁহার সহিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। আমাকে লোহিত মণিখচিত একটি অঙ্গুরীয় উপহার প্রদান করিলেন, এবং অন্যান্য সহচরীবর্গকে বিবিধ উপহার দিয়া মহারাজের নিকট প্রস্থান করিলেন। আমি সেখান হইতে আমার কক্ষে আসিয়া দেখিলাম মা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত গৃহে চলিলাম। নগর তোরণ অতিক্রম করিয়াই আমরা

রাজপথে এক আশ্চর্য্য শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা একজনের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বারান্দা হইতে দেখিলাম ইংরেজ সৈন্যগণ তালে তালে পা ফেলিয়া রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পদধ্বনি আমার কর্ণে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কারণ আমি ইতি পূর্ব্বে আর সৈন্যগণকে কাওয়াজ করিতে দেখি নাই। সৈন্যদল সাঁকো পার হইয়া নগর তোরণে প্রবেশ করিল। মহারাজ ও রাজ মহিষী প্রমোদ উদ্যানে বন্দী হইলেন। কিন্তু আমি তখন সেখানে ছিলাম না।

তাহার পর আর একবার মহিষীকে দেখিয়াছিলাম। রাজ মহিষী যখন ইংরেজ রাজের বন্দী হইয়া সমুদ্র পারে প্রেরিত হইলেন, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

তাঁহারা ষ্টীমার যোগে রেঙ্গুনে প্রেরিত হইবেন শুনিয়া আমি মার সঙ্গে ষ্টীমার ঘাটে তাঁহাদের দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সময় ইংরেজ সৈন্যের ভয়ে কেহ ভীত হয় নাই। কারণ যাহারা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করে নাই তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, সুতরাং পথগুলি লোকাকীর্ণ হইয়াছিল।

ইংরেজেরা আসিয়া মান্দালয়ে ঘোড়ার গাঁড়ি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; সে সময় মান্দালয়ে ঘোড়ার গাড়ী হয় নাই। রাজ দম্পতি একখানি গোশকটে উঠিলেন। এই শকট গুলি উচ্চে চারিফিট। প্রথমেই রাজাও রাজমহিষীর শকট, সম্মুখে ও পার্শ্বে অশ্বারোহী সৈন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, তাহার পর রাজকুমারী ও পরিচারিকাবর্গেরশকট এবং সর্ব্ব পশ্চাতে সৈন্যশ্রেণী। রাস্তা মন্দ বলিয়া সকলে অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, তথাপি ধূলিরাশি উড়িয়া শকটগুলি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নাগরিকবর্গ পথে সমবেত হইয়া নীরবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। কেবল মধ্যে মধ্যে সেই জনতা হইতে সৈন্য গণের প্রতি কটূক্তি বর্ষন শুনা যাইতেছিল!

সকলেই বিষণ্ণ। রাজা হয় ত ভাল লোক ছিলেন না, তথাপি তিনি আমাদের রাজা; আমরা তাঁহার আচার ব্যবহার জানিতাম, কিন্তু ইংরেজাদগের রীতিনীতি দেবতার রীতি-নীতির ন্যায় অজ্ঞাত। কেহই জানিত না অতঃপর ইংরেজগণ কি জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে।

শকট ষ্টীমারঘাটে আসিয়া লাগিলে রাজদম্পতি ষ্টীমারের সিঁড়ির নিকট অবতরণ করিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারীবর্গ মহারাজকে জাহাজের মাদুর বিস্তৃত আরোহনীয় স্থানে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু মহারাজ নিশ্চলভাবে চতুর্দ্দিকের জনতার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সেই শেষ মুহূর্ত্তে কোনপ্রকার সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, হয়ত চিরজীবনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতে তাঁহার পা সরিতে ছিল না।

ইংরেজ কর্ম্মচারী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করি-লেন। মহিষী তখন অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহারাজের হস্তধারণ পূর্ব্বক, মাতা যেমন করিয়া বিপন্ন ও ভীতসন্তানকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, তেমনি করিয়া ষ্টীমারের উপর তুলিয়া লইলেন।

অনন্তর তাঁহারা ষ্টীমারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমার রাজ্ঞী চিরকালের জন্য আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। আমি ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, ক্রমে অনুকূল স্রোতে ষ্টীমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল; আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হয় ত মহারাণীর অনেক দোষ ছিল। কিন্তু আমি তাঁহার দোষের বিচার করিতে পারি না, তিনি আমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; আমিও তাঁহাকে ভাল বাসিতাম।

সাত বৎসর অতীত হইয়াছে এখন পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না যে রাজদম্পতি চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সান পর্ব্বতে আছেন কি না এবং পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন কি না একথা গতকল্যও একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। আমার রাণী আর দেশে প্রত্যাগমন করিবেন না, আর কখনই তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া এবং প্রজাবর্গের হাস্য বিকশিত মুখ দেখিতে হইবে না। তাঁহার সম্মুখের সুবিস্তীর্ণ বারিধি এবং এক কঠোর স্মৃতি চিরদিন তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিবে।”

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মুসলমানের আচার।

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকায় আমরা তাঁহাদের আচার ব্যবহার ভাল করিয়া জানি না। এখানে (হায়দ্রাবাদে) রাজা ও মন্ত্রী হইতে চাপরাসি পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই মুসলমান, সুতরাং এমন দিন নাই যে উহাঁদের সহিত দুই দণ্ড বসিতে না হয়। তাই মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহারও সহজে অবগত হওয়া যায়।

দেশাচারের সহিত ধর্ম্মের যে আসলে বিশেষ কোন সংস্রব নাই তাহা সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজে অন্যরূপ হইবার কোন কারণ নাই। এখানকার দুই একটি দেশাচারের কথা উল্লেখ করিব। শিশুর জন্মপূর্ব্বের অবস্থা হইতে বর্ণনা করা যাউক। বঙ্গদেশে হিন্দুদের মধ্যে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সাধ দেওয়ার প্রথা আছে ইহা সকলেই জানেন। বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাহা এ দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে আছে। ইহারা উহাকে "সাতওয়াসা" কহে। সপ্তম মাসে সাধ দেওয়া হয় বলিয়া সাতওয়াসা নাম হইয়া থাকিবে। কথাটি বোধ হয় সাতমাসার অপভ্রংশ। কোন ফার্সী অথবা আর্ব্বী ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। যদিও কেহ কেহ বলেন যে আর্ব্বী শব্দ "সেহেত" অর্থাৎ সুস্থতা হইতে "সাতওয়াসা" হইয়াছে; কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

সাতওয়াসার সময়ে কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আতর গোলাপ মাখে ও গানবাজনা শুনিয়া আহ্লাদে দিনরাত্রি কাটায়। পাড়ার বৃদ্ধারা আসিয়া গর্ভবতীর স্তন্যদুগ্ধ বাহির করিয়া রেসমি কাপড়ে মাখায়। শুষ্ক হইলে যদি সাদা হয় ত বলে কন্যা হইবে, সাদা না হইলে পুত্র হইবে বলিয়া ধুমধাম করে।

সাধের পর দুইমাস গর্ভবতীকে উত্তম বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিতে দেওয়া হয় না। নয় মাস গর্ভ হইলে এক পূজা হয়, তাহাকে "সহনক ফাতিহা" কহে। সহনক একটী আর্ব্বী শব্দ, ইহার অপভ্রংশ সানুক। মুসলমানদিগের অন্নব্যঞ্জন রাখিবার পাত্রকে সানুক বলে ইহা সকলেই অবগত আছেন। সানুহক ফাতিহা পূজার আয়োজন এইপ্রকারে করা হয়।

সাতখানি সরাতে গরম ভাত রাখিয়া তাহার উপর দধি ঘি মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওয়া হয়। তারপর সরাগুলি মহম্মদের কন্যা বিবি ফাতিমার নামে উৎসর্গ করা হয়। তাহার পর সাতজন ভদ্র মহিলাকে ঐ সাতখানি সরা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে আমাদের দেশের সিন্নির মত ঐ সরার দ্রব্যাদি মহা আদরে সকলে উদরস্থ করে।

ফাতিহা অনেক প্রকার আছে। কথায় কথায় ফাতিহা দেওয়া হয়। আমাদের দেশের কালিঘাটের পূজা ও সিন্নি দেওয়ার মত।

মুসলমানের "আঁতুর" চল্লিশ দিন। তবে আমাদের আঁতুরের মত কঠিন নিয়ম নাই। ভূত তাড়াইবার জন্য আঁতুরঘরে নিমপাতা, ছুরি ইত্যাদি রাখা হয়। আঁতুর শেষ হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক চুল আঁচড়াইতে অথবা তৈল মাখিতে পায় না। মাথায় একটী রুমাল জড়াইয়া রাখে ও স্নান করিতে পায়। যদি কেহ আঁতুরঘরে আইসে তাহা হইলে অনেক তুকতাক করা হয়। কুক্কুর কি বিড়াল কোন প্রকারে আঁতুরঘরের নিকট আসিতে দেওয়া হয় না। বিড়ালের উপর রাগ কিছু বেশী, আঁতুরঘরে বিড়ালের নাম পর্য্যন্ত করিতে নাই!

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে ধোয়াইয়া কাপড় জড়াইয়া পুরুষদের নিকট আনা হয়। সেই সময়ে একজন মৌলবি যাঁহাকে "খতিব" কহে শিশুর দক্ষিণ কর্ণে "আজান" ও বাম কর্ণে "তকবির" শুনাইয়া দেন। "আজান" ও "তকবির" উভয়ের অর্থ প্রায়ই এক। অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মের সার মর্ম্ম, যথা "আল্লা হো আকবর" অর্থাৎ ঈশ্বর মহৎ "লা ইলাহা ইল্লিলা ওয়া মহম্মদুর রসুল আল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

বড় লোকের বাটীতে "মশায়েখ" ও "মুরসিদ্" অর্থাৎ গুরু আসিয়া এক ফোঁটা মধু অথবা একটু আঙ্গুরের রস মুখে করিয়া শিশুর মুখে দেন। শিশুর পিতামাতার বিশ্বাস যে ঐ এক ফোঁটা মধুর সহিত গুরুর বিদ্যাবুদ্ধি শিশু পাইবে! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কথায় কথায় "ফাতিহা" পড়া হয়, সুতরাং মধু চাটাইয়া যে ফাতিহা পড়া হয় ইহা বলা বাহুল্য।

যেদিন জন্ম হয় প্রায় সেইদিনই শিশুর নাম রাখা হয়। যদি কোন কারণে সেদিন না হইয়া উঠে তাহা হইলে ঠিক এক সপ্তাহ পরে নামকরণ হয়, যতক্ষণ না শিশুর নাম রাখা হয় তাহার মা জল খাইতে পায় না, পান সুপারির ত কথাই নাই।

মুসলমানদিগের নামকরণের বিশেষ নিয়ম আছে। হিন্দুর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নামের যেমন একটি একটি অর্থ আছে, মুসলমানেরও তদ্রূপ। ইংরাজী নামের মত যেখানে সেখানেঅক্ষর বাড়াইতে কিম্বা কমাইতে পারা যায় না। মুসলমান নাম শতকরা ৯৯টি আর্ব্বী শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং প্রত্যেক নামেরই প্রায় ঈশ্বর অথবা মহম্মদের সহিত কোন না কোন সংস্রব আছে। অধিকাংশ নামের অর্থ প্রায়ই "ঈশ্বরের দাস" "(গোলাম)" অথবা "মহম্মদের দাস", যথা আবদুল হক, আবদুল গনি, আবদুল রব, গোলাম রসুল, আবদুর রসুল, গোলাম মহম্মদ ইত্যাদি।

সৈয়দ বংশে জন্ম হইলে, শিশুর নামের পূর্ব্বে সৈয়দ শব্দ যোগ করা হয়, যথা সৈয়দ আলি, সৈয়দ হোসেন ইত্যাদি।

কখন কখন "সৈয়দ" এর স্থানে "মির" শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা মির আলতাফ হোসেন, মির রজব আলি ইত্যাদি।

সৈয়দকে ডাকিতে হইলে প্রায়ই "মির সাহেব" বলিয়া ডাকা হয়, আমাদের দেশে যেমন "চাটুর্য্যে মহাশয়"।

এই ত গেল পুরুষের নাম। সৈয়দ স্ত্রীলোকের নামে প্রায়ই "নিসা", "বিবি" অথবা "বি" থাকে, যথা খইরুন্নিসা, নিয়াজবি ইত্যাদি।

সেখদিগের মধ্যে প্রত্যেক নামেই প্রায় "গোলাম", দিন, সেখ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, যথা গোলাম রসুল ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও (সেখ ব্যতীত) এ সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নাম করিলে ইহঠাৎ কে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, যদিও নাম হইতে কতক আভাস পাওয়া যায় বটে।

নামের পূর্ব্বে "খাজা" থাকিলে প্রায়ই সেখ বুঝিতে হইবে, যথা খাজা হসন ইত্যাদি।

সেখ স্ত্রীলোকের নামে প্রায়ই "মা" শব্দ থাকে, যথা সরিফা মা ইত্যাদি। সেখদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের নামে "বিবি" ও "বি"ও ব্যবহৃত হয়, যথা জামিলা বিবি, জমিলাবি ইত্যাদি।

সৈয়দ ও সেখ বড়লোকের ঘরে বিবি এবং বি না হইয়া "বেগম" হয়, যথা কুলসুম-বেগম ইত্যাদি।

মোগলদের মধ্যে নামের পূর্ব্বে "মির্জা", "বেগ", "আঘা" ইত্যাদি প্রায়ই থাকে, যথা মির্জা বাকির, আঘা নমাজী ইত্যাদি। "মির্জা" শব্দ "মিরজাদা"র অপভ্রংশ। মিরজাতা অর্থে সৈয়দ সন্তান। কথিত আছে যে, আমাদের দেশের বৈদ্যের মত, প্রথম মোগলের মাতা সৈয়দ এবং পিতা অন্য বংশের ছিল।

মোগল স্ত্রীলোকের নামের বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে কখন কখন "খানুম" যোগ করা হয়, যথা ইজ্জত খানুম ইত্যাদি।

পাঠানের নামে খাঁ প্রায়ই থাকে, যথা কাদির খাঁ ইত্যাদি। এবং স্ত্রীলোক হইলে খাঁ না বলিয়া "খাতুন" বলে, যথা ইজ্জত খাতুন ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এগুলি অকাট্য নিয়ম নহে। ইহা হইতে কেবলমাত্র একটা আভাস পাওয়া হায়।

মুসলমানের নামের পশ্চাৎ প্রায়ই "সাহেব", "মিয়া" এবং "যান" ব্যবহৃত হয়, যথা সৈয়দ আলি সাহেব, তফজ্জুল মিয়াঁ ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানের নামে জন্মস্থান অথবা নিবাস প্রকাশ পায় না। কিন্তু পারস্য দেশের লোকের নামের সহিত জন্মস্থানের উল্লেখ থাকে, যথা মির্জা কাজিম নমাজী, অর্থাৎ নমাজ গ্রামের মির্জা কাজিম, সাকির তেহরাণী, অর্থাৎ তেহরান সহরের সাকির ইত্যাদি। ভারতবর্ষের মুসলমানেরাও এখন ক্রমে ক্রমে ঐ প্রথা অবলম্বন করিতেছেন, যথা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী অর্থাৎ বিলগ্রাম নিবাসী সৈয়দ আলি ইত্যাদি।

মুসলমান বালকের নামকরণ প্রায় এই নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে হইয়া থাকে।

১মঃ—পিতামহের অথবা প্রপিতামহের নাম শিশুকে দেওয়া হয়; অথবা বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত "সেখ" বা পুরোহিতের নামে শিশুর নামকরণ হয়।

২য়ঃ—কতকগুলি মৌলবি একত্রিত হইয়া কোরাণ খোলেন। হঠাৎ যে পাতা খুলিয়া যায় সেই পাতার প্রথম অক্ষর অনুসারে শিশুর নামকরণ হয়। যদি প্রথম অক্ষর "আলিফ অর্থাৎ "অ" হয় ত শিশুর নামেও প্রথম অক্ষর "আলিফ" অথবা "অ" হইবে, যথা অহম্মদ্ ইত্যাদি।

৩য়ঃ—কতকগুলি নাম ছোট ছোট কাগজে লিখিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং একটি বালককে উহার মধ্য হইতে একটি কুড়াইতে বলা হয়। যে নামটি বালক কুড়াইয়া লয় শিশুর তাহাই নাম রাখা হয়।

৪র্থঃ—মুসলমানেরা ও বিশ্বাস করেন যে, কোন সময় ভাল এবং কোন সময় মন্দ, এবং এক সময়ে শনির দশা এবং অন্য সময়ে মঙ্গলের দশা ইত্যাদি। শিশুর যে গ্রহের দশাতে জন্ম হয়, সেই গ্রহের নামের প্রথম বর্ণ অথবা শেষ বর্ণানুসারে শিশুর নামকরণ হয়; রবিকে "শম্স্" কহে, এবং যদি রবির দশায় জন্ম হয় ত তাহার নামের পূর্ব্ব অক্ষর "শ" হইবে, যথা শুজাত বেগ ইত্যাদি। "তালব্য শ" হইবে বলিতেছি এই জন্য যে আর্ব্বী অক্ষর "শীন্," যাহার উচ্চারণ ইংরাজি এস্, ও এচ্ এর সম্মিলনের ন্যায় তাহা উচ্চারণে সংস্কৃত তালব্য-শয়ের অনুরূপ—এবং তাহাই প্রথম অক্ষর হইবে।

কোন দিন কোন সময়ে কোন্ গ্রহের কি দশা তাহা নিম্নলিখিত টেবল (table) অনুসারে জানা যায়।

শনিবার দিবা এবং বুধবার রাত্রি	শুক্রবার দিবা এবং মঙ্গলবার রাত্রি	বৃহস্পতিবার দিবা এবং সোমবার রাত্রি	বুধবার দিবা এবং রবিবার রাত্রি	মঙ্গলবার দিবা এবং শনিবার রাত্রি	সোমবার দিবা এবং শুক্রবার রাত্রি	রবিবার দিবা এবং বৃহস্পতিবার রাত্রি
প্রাতে শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি
৬—৭	৬—৭	৬—৭	৬—৭	৬—৭	৬—৮	৬—৭
বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি	শুক্র
৭—৮	৭—৮	৭—৮	৭—৮	৭—৮	৭—৮	৭—৮
মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ
৮—৯	৮—৯	৮—৯	৮—৯	৮—৯	৮—৯	৮—৯
রবি	শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র
৯—১০	৯—১০	৯—১০	৯—১০	৯—১০	৯—১০	৯—১০
শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি
১০—১১	১০—১১	১০—১১	১০—১১	১০—১১	১০—১১	১০—১১
বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি	শুক্র	বৃহস্পতি
১১—১২	১১—১২	১১—১২	১১—১২	১১—১২	১১—১২	১১—১২

অপরাহ্নে চন্দ্র	রবি	শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল
১২—১	১২—১	১২—১	১২—১	১২—১	১২—১	১২—১
শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি
১—২	১—২	১—২	১—২	১—২	১—২	১—২
বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি	শুক্র
২—৩	২—৩	২—৩	২—৩	২—৩	২—৩	২—৩
মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ
৩—৪	৩—৪	৩—৪	৩—৪	৩—৪	৩—৪	৩—৪
রবি	শনি	শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র
৪—৫	৪—৫	৪—৫	৪—৫	৪—৫	৪—৫	৪—৫
শুক্র	বৃহস্পতি	বুধ	মঙ্গল	চন্দ্র	রবি	শনি
৫—৬	৫—৬	৫—৬	৫—৬	৫—৬	৫—৬	৫—৬

এই টেবলের দ্বারা তিনটী কার্য্য সাধিত হয়।

১মঃ—উপরোল্লিখিত রূপে নামকরণ হয়।

২য়ঃ—কোন্ সময় ভাল কোন্ সময় মন্দ জানা যায়। শনির উপর হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও অত্যন্ত রাগ। শনি এবং মঙ্গলের দশা মন্দ; বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র ভাল; রবি এবং চন্দ্র ভালও নহে মন্দও নহে।

৩য়ঃ—এই টেবলে বালকের ভবিষ্যৎ জানা যায়।

শিশুর নামকরণের ৫ম উপায়ঃ—যদি রবিবারে জন্ম হয় ত বালকের নাম প্রায়ই ইব্রাহিম্, দাউদ্, হাশিম, অয়ুব, সুলেমান, মুসা ও ইব্রান হয়,

এবং বালিকার নাম, জইনব্, খুদেজা, হবিবা ও হলিমা রাখা হয়।

যদি সোমবারে জন্ম হয় ত বালকের নাম হয় মহম্মদ্, অহ্মদ্, কাসিম্, কাদির্ ও মহমুদ্; এবং বালিকার নাম ফাতিমা, হমিদা, রফিয়া, অমিনা, রবিয়া, রুকিয়া ও জবিরা রাখা হয়।

যদি মঙ্গলবারে জন্ম হয়, বালকের নাম হয় ইস্হাক্, আবুবকর, ইস্মাইল্, ঈলিয়াস্ ও য়াসিন্;

এবং বালিকার নাম কুলসুম্, শরিফা, সুকিনা, আয়েসা ও হনিফা।

বুধবারে জন্ম হইলে বালকের নাম উস্মান্, আলি, সালেহ্, উমর্, হসন্ ও হোসেন;

এবং বালিকার নাম রাখা হয় খুরসেদ্, নুজুম্, সিতারা, ফজিলা, জমিলা, অজিজা ও রসিল্লা।

বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে ইউসুফ্, হমিদ্, মুর্তজা, মুস্তফা, অস্করি, বাকির্, সজ্জাদ্, জাফল্ ও ঘৌস্ বালকের নাম রাখা হয়, এবং বালিকার জুলেখা, সফুরা, হজিরা, মরিয়াম্, ওয়াজিদা ইত্যাদি নাম হয়।

শুক্রবারে জন্ম হইলে বালকের নাম হয় নুর্, অনোয়র্, অক্রম্, আদম্, সুল্তান্, করিমুল্লা, রহমতুল্লা, আবদুল্লা ইত্যাদি এবং বালিকার মহবুবা, অরিমা অরিফা ইত্যাদি।

শনিবারে জন্ম হইলে আবদুল্ রহিম্, আবদুল করিম্, আব্দুল্ লতিফ্, শম্সুদ্দিন্ নিজামুদ্দিন ইত্যাদি বালকের নাম হয়; এবং বালিকার মামুলা, লতিফা ইত্যাদি নাম রাখা হইয়া থাকে।

এই সকল নাম রাখিবার নিয়ম, বলা বাহুল্য যে, সকলে মানে না। আমাদের দেশে যেমন কোন পরিবারে সকল পুত্রের নামেই "চন্দ্র" অথবা "নাথ" পাওয়া যায়; মুসলমানের সেইরূপ অনেক সময়ে সকল ভ্রাতার নামের পূর্ব্বে "আবদুল" অথবা "গোলাম" ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সৈয়দ নাম প্রায়ই বড় হয় না, কারণ বড় নাম হইলে, লোকের মুখে প্রায়ই সৈয়দ কথাটি লোপ পাইয়া যায়, যথা (বড় নাম) সৈয়দ বদরুদ্দিনকে প্রায়ই লোকে কেবল "বদরুদ্দিন" বলিয়া ডাকে, কিন্তু নাম ছোট হইলে সকলে নামের পূর্ব্বে সর্ব্বদা সৈয়দ শব্দ ব্যবহার করে, যথা সৈয়দ আলি, সৈয়দ হোসেন ইত্যাদি।

মুসলমানের জন্ম সম্পর্কীয় কতকগুলি আচার লিখিলাম। বিবাহ ও মৃত্যুর কথাও লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্র।

কর্ণপ্রয়াগের পথে।

২০এ মে বুধবার। আজ খুব সকালে রুদ্র প্রয়াগ ছেড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। আমরা যে কয়জন এক সঙ্গে যাচ্ছি এক বৈদান্তিক বাদে তাদের আর সকলেরই শরীর অসুস্থ, স্বামীজী ও ভৃত্যটি অত্যন্ত কাতর। আমার শরীর ও বড় ভাল ছিলনা কিন্তু সে ভাব গোপন ক'রে বিশেষ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম। আমার একটা অভ্যাস আছে কোন স্থানে চল্‌তে হ'লে গন্তব্য যায়গায় পৌছবার পূর্ব্বে আমি কিছুতেই পথের মধ্যে বিশ্রাম করিনে, একবার বিশ্রাম করতে বস্‌লে, আমি বড় অবসন্ন হ'য়ে পড়ি, আর পথ চলা হয় না, এইজন্যে আমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গীদের আগে আগে চল্‌তুম, কথন কথন আমার সঙ্গীরা আমার অনেক পিছনে প'ড়ে থাক্‌তেন। আজ শরীর খুব দুর্ব্বল থা'ক্‌লেও সকলের আগে আগে হেঁটে বেলা আটটার সময় ৭মাইল দূরে 'শিবানন্দী' চটিতে পৌছলুম। এইটুকু পথ চ'লে এত সকালে এখানে এসে আজ সমস্তদিন এখানে অপেক্ষা করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর কোন চটি নেই আর এই পার্ব্বত্য পথ ভেঙ্গে সাত মাইল আস্‌তেও পরিশ্রম কিছু কম হয় নি, বিশেষ আমার পীড়িত সঙ্গীগণ এখন পর্য্যন্ত এ চটিতে এসে পৌছতে পারেন নি, হয় ত তাঁদের আরো দু তিন ঘণ্টা দেরী হবে মনে করে শিবানন্দী চটিতেই আশ্রয় নিলুম। বেলা বেশী হয় নি কিন্তু রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর, পর্ব্বতের ধূসর দেহ উদ্ভাসিত ক'রে সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগণের অনেক উপরে উঠেছেন এবং তাঁর উজ্জ্বল প্রভায় সমুচ্চ বৃক্ষরাজি হ'তে পথ প্রান্তস্থ নিতান্ত ক্ষুদ্র গুল্ম পর্য্যন্ত যেন খুব একটা সজীবতা অনুভব কচ্চে। আমি পথে একটা গাছের ছায়ায় ব'সে চারিদিক চেয়ে দেখ্‌তে লাগলুম। আমি যেন এ রাজ্যে একটি মাত্র প্রাণী, আর কোথাও জীব জন্তুর সম্পর্ক নেই। যেন এই নির্জ্জন প্রদেশে দিনের পর দিন গুলি অলস ভাবে নিতান্ত বৈচিত্র্য হীন অবস্থায় কেটে যাচ্ছে। এখানে এসে মনে হয় এ যায়গা গুলি পৃথিবীর নিতান্তই বিজন নেপথ্য, মনুষ্য জীবনের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা এবং বিপুল চেষ্টার সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে কেউ যে এখানকার পথপ্রান্তে আপনার অবসন্ন জীবনের শেষ সীমায় পৌছিয়েছে, কি প্রবল বিক্রমে এই দুর্ভেদ্য শীলাতলে আপনার গৌরব পতাকা প্রোথিত ক'রেছে এখানে ব'সে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না ; তবু শিবানন্দী চটিতে মানুষের ক্ষুদ্র হস্তের অনেক কাজ এখনো দৃষ্টিগোচর হয়, আর এই জন্যেই বোধ হয় অন্যান্য সকল চটি অপেক্ষা শিবানন্দী চটি বেশী মনোরম বোধ হয়েছিল। যে সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যা বাই হরিদ্বার হ'তে বদরিকাশ্রমের এই রাস্তা অনেক অর্থব্যয়ে তৈয়েরী করিয়ে দেন, সেই সময় তিনি এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হ'য়ে এখানে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন

এবং অনেকগুলি কোঠাঘর প্রস্তুত করিয়ে এই দুর্গম স্থানটিকে পথশ্রান্ত পথিকের যথেষ্ট বাসোপযোগী করে দেন। সেই হতে এখানকার নাম শিবানন্দী হয়েছে। এখনো অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু যাত্রী এই পথে যেতে যেতে রাণী অহল্যা বাইএর পবিত্র নামে জয়ধ্বনি করে, তাঁর আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করে। তিনি কতদিন স্বর্গে চলে গিয়েছেন, কিন্তু এমন দিন নেই যে দিন এখানে তাঁর নাম ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত না হয়।

সে অনেক কালের কথা—যথন এই শিবানন্দী চটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনশূন্য পর্ব্বতের একটি জনশূন্য সংকীর্ণ উপত্যকায় একটি পবিত্র তুষার ধবল দেব মন্দির, আর আশে পাশে ভক্ত যাত্রীদের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রাম কক্ষ। কত দীর্ঘ কাল ধরে কত পর্য্যটক এই পান্থ নিবাসে আপনাদের পথশ্রম অপনীত করেছে, তাদের সুখ দুঃখময়, সন্দেহ ও ভক্তি মিশ্রিত ক্ষুদ্রজীবনের অতীত কাহিনী এই সমস্ত অট্টালিকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তারা এই দুর্গম পর্ব্বতে সুদূর তীর্থ যাত্রায় অগ্রসর হয়েছিল জানি না তাতে তাদের মনে কত থানি শান্তি প্রদান করেছিল।

সেই প্রাচীন শিবানন্দী চটি এখনো আছে, কিন্তু পূর্ব্বের সেই গৌরব এবং শোভা সমৃদ্ধি আর নেই। অট্টালিকার অনেক গুলিই ভেঙ্গে গিয়েছে, যে গুলি এখনো একটু ভাল আছে তাও বাসোপযোগী নয়; তবে নিরুপায় যাত্রীর দল কোন রকমে এখানে একরাত্রি কি দুইরাত্রি বাস করে, এবং রাঁধা বাড়া করে খায় কিন্তু চটি ত্যাগ করবার সময় আর তা পরিষ্কার করে যাওয়া দরকার মনে করে না। এই জন্যে সংকীর্ণ ঘরগুলি ক্রমেই বেশী অপরিষ্কার হচ্ছে; এই অপরিষ্কার ঘরে আর একদল যাত্রী এসে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর্ত্তে গেলে তারা যে কতখানি বিরক্তি বোধ করে তা বলাই বাহুল্য, তারাও উপায়ান্তর না দেখে একটুখানি যায়গা পরিষ্কার করে নেয় এবং খাওয়া দাওয়ার পর তা পরিষ্কার না করেই চলে যায় সুতরাং আবর্জ্জনার উপর আবর্জ্জনা স্তূপাকার হয়ে উঠে।

শিবানন্দী চটির সম্মুখে পাথরে বাঁধান বটগাছের তলে বসে এই সকল কথা ভাবচি, পায়ের কাছ দিয়ে অলকনন্দা ললিত তরল গতিতে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে এবং নদীজলে উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হয়ে পাষাণময় উচ্চ উপকূলকে মনোরম করে তুলেছে। এমন সময় শিবানন্দীর শিবের পূজারী ঠাকুর আমার কাছে উপস্থিত হলেন। শিব এবং পূজারী উভয়ের দুরাবস্থাই সমান। শিবের এখন প্রত্যহ দুই বেলা দূরের কথা একবেলা পূজা যোটে কিনা সন্দেহ; আমাদের দেশে দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণেরা যদি চণ্ডী পাঠ কর্ত্তে কর্ত্তে একেবারে দুতিন পৃষ্ঠা উল্‌টোতে পারে তবে এ নির্জ্জন প্রদেশে শিব যে সপ্তাহান্তে একবার পূজা পাবেন তার আর আশ্চার্য্য কি? পূজারীর সঙ্গে আলাপ করে জানলুম এখানে সপরিবারেই আছে, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে এবং সংসার একরকম অচল; তাই তাকে পৌরহিত্য ছাড়াও নানা রকমে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কর্ত্তে হয়। মন্দিরের কাছে যে অল্প জমী আছে তাতে মোটেই কিছু জন্মায় না, অন্য যে একটু আধটু জমী আছে তাতে অল্প

কয়েক কাঠা গম হয় কিন্তু তাতে সংসার চালান দুষ্কর তাই সে অনেক গুলি ব্যবসা অবলম্বন করেছে; শিবানন্দীতে দোকান খুলেছে যে কয়মাস যাত্রী চলে সে কয়মাস কিছু কিছু উপায় হয়। দূরবর্ত্তী গ্রাম হতে গম এনে ময়দা ও আটা প্রস্তুত করে রুদ্র প্রয়াগ কি কর্ণ প্রয়াগে বেচে আসে, ছাগল পুষে তাও বিক্রী করে কিন্তু কিছুতেই বেচারীর কুলিয়ে উঠে না। এতগুলি কাজ যার হাতে তাকে দিয়ে নিত্য নিয়মিত শিবপূজার আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশে অনেক ঠাকুর বাড়ীর পূজকই রাঁধুনী বামুন, তারা তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করেই রাঁধতে যায়, সুতরাং পূজা করবার সময় পূজার মন্ত্রের কথা তাদের মনে হয় কি তরকারীর কথা মনে হয় তা অনুমান সাধ্য। সুতরাং পর্ব্বতবাসী এই দরিদ্র পুরোহিত যদি পূজার্চ্চনায় অবহেলা প্রকাশ করে তা যথেষ্ট মার্জ্জনীয়।

প্রায় দুঘণ্টা পরে সঙ্গীরা এসে জুটলেন। কোন্ ঘরে চাটি খাওয়া দাওয়া করা এবং একটু মাথা রাখবার যায়গা হতে পারে তাই অনুসন্ধান কর্ত্তে লাগলুম। বহু অনুসন্ধানে ঠিক নদীর উপরে একটা দ্বিতল কোঠা আবিষ্কার করা গেল, অন্যান্য ঘর গুলি অপেক্ষা এইটি একটু প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। আমরা সেখানে থাক্‌লুম। আজ সকালে সঙ্গী ভৃত্যটিকে বলে ছিলুম যে যদি তার শরীর অসুস্থ বোধ হয় ত আজও আমরা রুদ্র প্রয়াগে থাকি কিন্তু সে বোধ হয় আমাদের অসুবিধা ভেবে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে চল্‌তে চেয়েছিল। এই সাত মাইল রাস্তা এসে সে একেবারে হাঁফিয়ে পোড়লো, না পারে উঠতে না পারে বস্‌তে। রুদ্রপ্রয়াগে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল, এখানেও ভৃত্যটির এই রকম অবস্থা, এখানেই বা আর কয় দিন বিলম্ব হয় ভেবে বৈদান্তিক ভায়া বড়ই বিরক্ত হলেন। তিনি তর্কের দ্বার খুলে বস্‌লেন, সে নিজ দোষে পীড়া ভোগ করচে তার জন্যে আমরা কষ্ট ভোগ করি কেন, ইত্যাদি অশ্রদ্ধেয় কথার তিনি অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ কর্ত্তে লাগলেন। সে সকল কথার প্রত্যুত্তর কর্ত্তে আমার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি হ'ল না সুতরাং আমি নিরুত্তর থাকলুম। কিন্তু তাতেও এক বিপদ হলো। আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি প্রাচীন প্রবচন 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং,' ভেবে খুব উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা কর্ত্তে লাগলেন, তাঁর বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে "এই ভৃত্যকে আমাদের এখানেই ফেলে যাওয়া উচিত, হয় সে এখানেই ম'রে থাকুক না হয় তার অদৃষ্টে যা থাকে হোক, সকলেই নিজ নিজ অদৃষ্টের স্রোতে ভেসে চল্‌বে, আমরা যদি তাদের টেনে তুল্‌তে যাই তবে তাদের ত সে স্রোত হতে তুল্‌তে পারবোই না, মধ্যে হতে আমরা অনর্থক বিপদে পড়বো। আর যদি বিপদগ্রস্ত লোককে আমরা সাহায্য না-ই করি তাতেই বা আমাদের পাপ কি। অর্জ্জুন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এত গুলি জ্ঞাতি ও আত্মীয় বধ কল্লেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন তাতে অর্জ্জুনের কিছুমাত্র পাপ হয় নি, তারা ত মরেই ছিল অর্জ্জুন উপলক্ষ্য মাত্র; আমাদের এই ভৃত্যও যদি আমাদের সঙ্গে এসে পথ প্রান্তে ম'রে থাকে তবে আমরা কখনই পাপের ভাগী হব না। রাস্তায় ত প্রতি পদেই অসহায় পীড়িত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যদি প্রত্যেকের জন্যেই রাস্তায় এরকম বসে

থাকতে হয় তবে জীবনে তিন ক্রোশ পথও চলা যায় কিনা সন্দেহ।” হায় মায়াবাদী বৈদান্তিক! তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র! তুমি দুঃখ দারিদ্র্য পদদলিত করে তীর্থ স্থানে যেতে চাও, দরিদ্র প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে চাও, ভগবানের অজস্র করুণা ও চিরন্তনের মঙ্গলেচ্ছাকে ত্যাগ করে বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতাকেই সার পদার্থ বলে মনে কর, সকলে তোমার মত হলে পৃথিবী এত দিন শ্মশান হতো। অথবা তোমারই বা দোষ কি, আমাদের দেশের অনেক সাধু পুরুষের বৈরাগ্যই তোমার মত। তোমরা পিতা মাতার গভীর স্নেহ উপেক্ষা কর, পত্নীর ব্যাকুল প্রেম বন্ধন ছিন্ন কর, সে অতি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই কিন্তু তোমাদের এই ব্রত সার্থক হত যদি তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম বহির্জগতের বৃহৎ প্রেমে প্রসারিত কর্ত্তে পারতে, পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র ছেড়ে যদি পৃথিবীর লোককে আপনার করতে পারতে। কিন্তু তাও পারলে না এবং যা অল্প প্রেম তোমাদের ঐ রুদ্ধ নয়ন আলো করে ছিল তা চির দিনের জন্য নিবিয়ে ফেল্লে।—আমার মনের কথা মনেই রাখ্‌লুম, বৈদান্তিককে বলা আর আবশ্যক বোধ কর্‌লুম না সুধু বল্লুম বদরিনারায়ণ যাওয়া হোক্ আর নাই হোক্, এই রোগীর পাশে অনাহারে মরি তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু এরকম হৃদয়হীনতা দেখিয়ে চলে যেতে পারবোনা। স্বামীজীও অবশ্য আমার মতেই মত দিলেন।

বৈদান্তিক ভায়া অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে যাবার উদ্যোগ কল্লেন। আমি তাঁকে পথ খরচের জন্যে চার পাঁচ টাকা দিতে চাইলুম কিন্তু তিনি তা নিলেন না, আমি তাঁকে অনেক বুঝালুম, বল্লুম এ ভয়ানক পথে বিনা সম্বলে চল্‌তে নেই; চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। এদিকে আস্‌তে প্রায় সকলেই সঙ্গে কিছু অর্থ নিয়ে আসে, যারা বিনা সম্বলে আসে তারা হরিদ্বারে কি হৃষিকেশে ব'সে থাকে, কোন ধনী শ্রেষ্ঠী বদরিনারায়ণ দর্শন কর্ত্তে এলে তিনি এই রকম সম্বলহীন একশ, দুইশ—এমন কি তিনশ পর্য্যন্ত সাধুকে নিজ ব্যয়ে দর্শন করান, প্রতি বৎসরই পশ্চিম দেশ হ'তে দশ পনের জন শ্রেষ্ঠী এই রকম তীর্থযাত্রা করেন। বৈদান্তিক আমাদের উপর বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন, যাওয়ার সময় সঙ্গে নিলেন একটা কল্‌কে; কিন্তু শুধু কল্‌কে ত আর কারো কাজে লাগে না, কাজেই তাঁর কিছু তামাকের দরকার; তাঁর কাছেও তামাক ছিল না, লজ্জায় আমাকেও সে কথা বল্‌তে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁর বিপদ বুঝে একটা দোকান হ'তে এক সের মাখা তামাক কিনে দিলুম। যাওয়ার সময় বোধ হয় আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ব'লে তাঁর একটু লজ্জা হয়েছিল, তাই বেশী কিছু বল্‌তে পাল্লেন না। লোকটা নিতান্ত যখন চলে যাচ্ছে আমার তার প্রতি একটু মায়া হল—এতদিন এক সঙ্গে থাকা গিয়েছিল;—আমি তাঁর হাত ধরে বল্লুম "কত সময় কত অন্যায় কথা বলেছি, আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য করেছেন, সে জন্যে কিছু মনে করবেন না, আবার কতকালে দেখা হবে, কখন দেখা হবে কি না কে জানে?" তিনি চ'লে যাওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হ'তে লাগলো, কয়দিন এক সঙ্গে দুজনে বেশ সুখে ছিলুম। পথশ্রমের পর

অনেকে হাত পা ছড়িয়ে নিদ্রা দিয়ে সুখ ও আরাম পান কিন্তু আমি এই বৈদান্তিকের সঙ্গে আজগুবি তর্ক ক'রে পথশ্রম দূর কর্ত্তুম।

বৈদান্তিক চ'লে গেলে আমরা সেখানেই থাকলুম। সন্ধ্যার সময় আমাদের চাকরটির জ্বর ছাড়লো এবং বেশ স্বচ্ছন্দভাবে উঠে বেড়াতে লাগলো, আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝতে পাল্লুম যে পর্ব্বতবাসীরা রোগে বিশেষ কাতর হয় না, তবে তাদের জ্বর যে রকম ভয়ানক হয় তাতে তারা কাতর না হ'লেও আমরা কাতর হই। রাত্রে সে খুব আহার ক'রলো।

২১এ মে, বৃহস্পতিবার—সকাল উঠে দেখি চাকরটি যাত্রার জন্যে তৈয়েরী হ'য়ে ব'সে আছে, আমি তাকে বল্লুম তার অসুখ একটু ভাল ক'রে না সারলে পথশ্রমে সে মারা পড়বে; কিন্তু বোধ হয় তার মনে হয়েছিল তারই জন্যে বৈদান্তিক আমাদের ছেড়ে গেলেন, তাই সে যাওয়ার জন্যে কৃতসংকল্প হ'লো। অনেক খানি বেলা হ'লে আমরা সেখান হ'তে রওনা হলুম। রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর চটি নেই, কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি ক'রে চল্‌তে লাগলুম, এবং দুফরের সময় পিপল চটিতে উপস্থিত হলুম। একটা বটগাছ আছে তারই নাম অনুসারে চটির নাম 'পিপল চটি।'

এখানে একটা গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু পিপল চটির মত কদর্য্য স্থান আর দেখিনি। আমরা এখানে এসে দেখ্‌লুম এখানে অনেক যাত্রী জড় হয়েছে, আমরাও কয়টি প্রাণী তাদের সঙ্গে মিশে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি কল্লুম।

একটা কথা বল্‌তে ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন পিপল চটির কাছাকাছি এসেছি সেই সময় দেখি বৈদান্তিক ভায়া শিবানন্দীর দিকে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে আমার এমনি আনন্দ হ'লো, আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধল্লুম; তিনি বল্লেন "ভাই, তোমাদের ছেড়ে গিয়ে আমি কাজ ভাল করিনি—তোমাদের মনে ত কষ্ট দিয়েছিই তা ছাড়া নিজে যে কষ্ট ভোগ করেছি তার আর কি বোলবো, শুন্‌লে তোমাদের ছেড়ে যাওয়ার জন্যে আমার অপরাধ মাপ করবে।" আমরা পিপল চটিতে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর কথা শুন্‌তে লাগলুম। তিনি বল্লেন যে রাত্রে তাঁর কিছু খাওয়া হয় নি; চার পাঁচ দল যাত্রী পিপল চটিতে রাত্রি বাস করেছিল বটে কিন্তু কেউ তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেনি, সমস্ত রাত্রি অনাহার, তার পর রাত্রে মাছির উৎপাতে অনিদ্রা। রাত্রে নাকি দশবারো হাজার মাছি তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। সকালে উঠে ক্ষুধার প্রকোপটা আরো খানিক বৃদ্ধি হয়েছিল এবং উপায়ান্তর না দেখে তিনি দুই একজনের কাছে ভিক্ষেও চেয়েছিলেন, কিন্তু এ বড় কঠিন পথ, সকলেই প্রায় ভিক্ষুক তাঁকে কে ভিক্ষা দেবে? তখন অনন্যগতি হয়ে তাঁর সঙ্গে যে তামাক ছিল তাই একটা দোকানে দিয়ে তার বদলে অল্প চেনা ভাজা ও একটা পাকা 'কাঁচকলা' নিয়ে জঠরানল যৎকিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে যতই বেলা বাড়তে লাগলো, ততই তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমা-

দের কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা তাঁর প্রবল হয়ে উঠ্‌লো এবং আমরা হয়তো আজ শিবানন্দী চটিতেই থাকবো মনে করে তিনি আমাদের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন পথে আমাদের সঙ্গে দেখা। তাঁর দুঃখের কষ্টের কথা শুনে আমার বড়ই দুঃখ হ'লো।

বৈদান্তিক বলেছিলেন রাত্রে দশবারো হাজার মাছি তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল; পিপল চটিতে এসে মাছির আতিশয্য ও উৎপাত দেখে আমার এ কথাটা অসম্ভব ব'লে মনে হ'লোনা। এত মাছি আমি আর কোথাও দেখিনি; উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক যায়-গায় মাছির বংশবৃদ্ধির খুব পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু এত বেশী নয়। এরা মানুষকে একেবারে পাগল ক'রে তোলে, মাছির জ্বালায় আমাদের ধর্ম্মশালায় বসা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো। কোন রকমে এখানে দু তিন ঘণ্টা কাটান গেল।

রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে অলকনন্দার অপর পার দিয়ে যে নূতন রাস্তা বের হয়েছে তা এখানে শেষ হ'লো। এখানে একটা টানা সাঁকো দিয়ে রাস্তাটাকে এ পারের রাস্তার সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধ স্বামীজী খানিক বিশ্রাম করবার আশায় আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে-ছিলেন, কিন্তু তাতেও মাছির হাত হতে পরিত্রাণ নেই, কম্বলের যে এক আধটু ফাঁক ছিল তারই মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারা তাঁকে আক্রমণ কর্ত্তে লাগলো। এই দারুণ পথশ্রমের পর কোথায় একটু আরাম ক'রবো না মাছির জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লুম, শেষে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় বেলা তিনটে না বাজতেই পিপল চটি হ'তে বের হওয়া গেল।

কিছু দূর যেতে না যেতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা গেল, আমরা প্রথমে সেদিকে বড় লক্ষ্য কল্লুম না কিন্তু মেঘ ক্রমে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেল্লে' চারদিক খুব অন্ধকার হয়ে এলো এবং পরেই বেশ বাতাস উঠ্‌লো। ঝড় জলে রাস্তায় বিপদে পড়া অসম্ভব নয় ভেবে স্বামীজী নিকটস্থ একটা গহ্বরে আশ্রয় নিতে বোল্লেন, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া আমাদের শনি, যা কিছু ভাল যুক্তি তিনি তার মধ্যে নেই, তাঁর পন্থা সকল কালেই স্বতন্ত্র এমন কি বিপদের সময়ও। তিনি বল্লেন যখন বাতাস উঠেছে তখন মেঘ এখনি উড়ে যাবে, এমন সামান্য সামান্য কারণে পথ চলা বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়।

কাজেই আমরা অগ্রসর হলুম। রাস্তায় জনমানবের সাড়া শব্দ নেই; আকাশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো কিন্তু নিকটে আর আশ্রয় মিলবার উপায় নেই, যে দুই একটা গুহায় আশ্রয় নেওয়া যেতে পারতো তা পিছনে ফেলে এসেছি। বড় গাছও নেই; আমরা যে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি তার গাছগুলি ছোট ছোট, কোন দিকে একটাও বড় গাছ নজরে পড়ে না।

ক্রমেই বাতাস বেশী হ'তে লাগলো, শেষে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হলো প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয় পর্ব্বতশৃঙ্গ বুঝি মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। অন্ধকার আকাশ, আর সন্ সন্ শব্দ; আমরা চারিটি প্রাণী সেই প্রলয় কাণ্ডের ভিতর দিয়ে চল্‌চি, পদস্খলিত হ'য়ে নীচে প'ড়বার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। খানিক পরেই অল্প বৃষ্টি পড়তে লাগলো আমরাও প্রাণের দায়ে যতদূর সাধ্য দ্রুতপদে আশ্রয়ের সন্ধানে চল্‌তে লাগলুম। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি

বন্ধ হ'য়ে মুষলধারে শিলাপাত আরম্ভ হ'লো; তখন আমরা হতাশ হ'য়ে পড়লুম। এই পার্ব্বত্যদেশে যে রকম বড় বড় শিলা বর্ষণ হয় তা আমাদের সমতল প্রদেশের অনভিজ্ঞ লোকদের বুঝিয়ে উঠা যায় না। এক একটা শিলা এক একটা বেলের মত, সুতরাং তা মাথায় পড়া দূরের কথা শরীরে পড়্‌লে শরীরের কি রকম দুর্দ্দশা হ'তে পারে তা কল্পনায় উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। আমরা আর উপায়ান্তর না দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে আড়াগোড়া কম্বল মুড়ি দিলুম, কিন্তু তাতে মাথা বাঁচান কঠিন দেখে কম্বলখানায় কয়েক ভাঁজ দিয়ে পুরু ক'রে তা দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রাখ্‌লুম। গায়ের উপর দুই একটা শিল পড়তে লাগলো, এবং তাতে আমাদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে কিন্তু উপায়ান্তর নেই, তবু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মাথাটা কোন রকমে রক্ষে হ'লো, কিন্তু বোধ হ'তে লাগলো শীতে বুঝি বুকের রক্ত জ'মে যায়।

শিলাবৃষ্টি ছেড়ে গে'লে আমরা আবার উঠ্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, এমন কি শেষে রোদ'ও উঠ্‌লো। সেই সান্ধ্যতপনের কণককিরণসিক্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করেছিল। ছোট ছোট গাছ্‌গুলি হ'তে টোপে টোপে বৃষ্টি পড়চে, পাহাড়ের গা ব'য়ে নানা যায়গা হ'তে নালা বের হ'য়ে হু হু শব্দে নীচের দিকে যাচ্ছে আর আকাশ পরিষ্কার দেখে পাখীর দল আনন্দের সঙ্গে কলরব কোরচে এবং ভিজে পাখা ঝেড়ে ফেলছে—এ দৃশ্য অতি সুন্দর; কিন্তু ভিজে কম্বল সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে এক গা বেদনা নিয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার অবসর হয়নি। পাহাড়ে চল্‌তে চল্‌তে আমরা এই পাহাড়ী প্রদেশের একটা বৈচিত্র্য বেশ লক্ষ্য করচি; কোথাও কিছু নেই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, চারিদিক অন্ধকার ক'রে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো, তার পরেই দশ মিনিটের মধ্যে সব পরিষ্কার। এই বৃষ্টি! এই রোদ; আমাদের দেশের প্রকৃতির এমনতর চাঞ্চল্য প্রায়ই দেখা যায় না!

পিপল চটি হ'তে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত রাস্তা সবে তিন মাইল মাত্র, কিন্তু এই তিন মাইল আস্‌তেই একেবারে আমাদের প্রাণান্ত হয়েছিল। একে ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত, তার উপর রাস্তা আগাগোড়া চড়াই; সে চড়াইও এক এক যায়গায় ঠিক সোজা। একেত সহজ অবস্থাতেই তা ব'য়ে উপরে উঠা কঠিন, তারপর বৃষ্টি হ'য়ে পাথর ভিজে গিয়েছে; অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলে আমাদের চল্‌তে হ'লো। বেলা প্রায় তিনটের সময় পিপল চটি হ'তে বের হয়ে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন কর্ণপ্রয়াগে উপস্থিত হলুম তখন বেলা বোধ হয় ৬টা। একটা মাটীর কোঠার দ্বিতলে বাসা নেওয়া গেল। বৃষ্টিতে ভিজে, শিলার আঘাতে, পথশ্রমে শরীর একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল, কোন দিকে আর চেয়ে দেখ্‌বারও ইচ্ছে হলো না; একদিন এখানে বিশ্রাম করা যাবে স্থির ক'রে ভিজে কম্বল গায়ে জড়িয়ে শু'য়ে পড়লুম। রাত্রে আমরা একটুও চেতনা পাইনি।

শ্রীজলধর সেন।

সহবৎ-শিক্ষা।

প্রবন্ধের নামকরণে ফার্সী শব্দ ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ "সহবৎ" এই শব্দ ফার্সী হইলেও চলিত বাঙ্গালা। তাহা ছাড়া উহার ঠিক সমান অর্থবাচক শব্দ বাঙ্গালায় নাই। সহসা মনে হয় যে, 'শিষ্টাচার" 'সদাচার' 'ভদ্রতা' 'সভ্যতা' 'সদ্ব্যবহার' 'সামাজিকতা' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটা বাছিয়া লইলেই কাজ চলিতে পারে। কাজ যে চলে না এরূপ বলা যায় না; তবে একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহাদের কোনটীর দ্বারাই সমান ওজনে কাজ চলে না। কথার আঁটসাঁট না করিলে ভাবের এমন একটা তরলতা থাকিয়া যায় যে মনের ভিতর কিছুই জমাট হইয়া বসে না,—মানসিক দৃষ্টিতে ছানি পড়িয়া থাকে।

'শিষ্টাচার' কথাটার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ছাড়িয়া এখন উহা ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু উহার প্রয়োগে বিশেষ একটা নিয়ম বন্ধন নাই। এখন 'শিষ্ট' শব্দ 'উদ্ধত' শব্দের অনুবাক্য এবং 'শান্ত' শব্দের প্রতিবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকটি বেশ শান্তশিষ্ট এইরূপ প্রয়োগই এখন প্রচলিত। 'আচার' শব্দের সংযোগে শিষ্ট শব্দের কিছু অর্থান্তর হয় সত্য—কিন্তু তাহা কতটা? যেরূপ আচরণে কাহারও প্রত্যাশা ভঙ্গ না হয়—কাহারও কোন বলিবার কথা না জন্মায় তাহাই 'শিষ্টাচার'। প্রচলিত পদ্ধতিক্রমে লৌকিক ব্যবহারের নাম 'শিষ্টাচার'। 'সহবৎ' শব্দের অর্থটী এইভাবের দ্বারা একদিকে অব্যাপ্ত থাকে। 'সহবৎ' শব্দ যে ব্যবহারের মাধুর্য্য সূচনা করে 'শিষ্টাচারে' তাহা নাই। শিষ্টাচার অনেকটা গতানুগতিক। বৃদ্ধব্যবহারের যে অংশ সমাজ-তন্ত্রের পরিবর্ত্তনে দোষাশ্রিত হইয়াছে তাহার পরিহার ও নূতন তন্ত্র অনুসারে ব্যবহারের মধুরভাবে বিনমন শিষ্টাচার শব্দে নাই। আমরা এই শব্দের ইতিহাস যতই চক্ষের আড়াল করি না কেন ইহাকে কতকটা আকরে টানিবেই। সংস্কৃত ভাষায় ইহার একটা চাঁচাছোলা চোস্ত প্রয়োগ আছে। কোন কোন পুরাণে প্রধানতঃ বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে—উল্লিখিত আছে যে, খণ্ডপ্রলয়ের কালে যে সকল লোক পরবর্ত্তী সৃষ্টিকল্পের বীজ স্বরূপ সংরক্ষিত হন তাঁহারাই পূর্ব্বে কল্পের শিষ্ট বা অবশিষ্ট বলিয়া লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা শিষ্ট শব্দে অভিহিত হন। শিষ্টের আচারই শিষ্টাচার। শিষ্টগণ সাধু আচারের জন্যই পরবর্ত্তী কল্পের বীজত্ব লাভ করেন এজন্য শিষ্টাচারে সাধুত্বের স্পষ্ট ছায়া পড়িয়া। কবিতার মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষতঃ উপদেশাত্মিকা কবিতা সহবতের মধ্যে তেমনি শিষ্টাচার। ইহা নীতিময় কিন্তু মাধুর্য্যময় নহে। শিষ্টাচারের সহিত সহবতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে সময়ে জাতিভেদের বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং আমাদের প্রাচীন সমাজ অন্যবিধ সমাজের সহিত নিঃসম্পর্ক ছিল তখন বোধ হয় শিষ্টাচারের অর্থ সহবৎ ছিল। কিন্তু এখন শিষ্টাচার ও

সহবতের মধ্যে ছায়াতপ সম্বন্ধ। পূর্ব্ব নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যদ্যপি রামচন্দ্র শর্ম্মা সর্ রমেশচন্দ্র মিত্রকে বাড়ী আসিলে স্বতন্ত্র আসন দেন তাহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের হিসাবে শিষ্টাচার রক্ষিত হইবে সত্য কিন্তু বে-সহবতের কার্য্য হইবে।

মনুসংহিতা অনুসারে আর্য্যাবর্ত্তের আচারের নাম 'সদাচার'। এখানেও সহবতের বুদ্ধি-গত মানদণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নাই ইহার মধুর শোভনভাবের উপর লক্ষ্য নাই—না বুঝিয়া, হৃদয়ে অনুভব না করিয়া, কেবল একটা বাহ্যিক নিয়মে আচরণকে আবদ্ধ করিবার ভাবই এখানে লক্ষিত হয়। আর একটা কথা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ব্যবহার যাহার তত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণারও সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে তাহা কি প্রকারে জীবিত রক্তমাংসের মানুষের আচরণের আদর্শ হইতে পারে?

'ভদ্রতা' শব্দের অধিকার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রচলিত ভাষায় ইহার ধাতুগত অর্থের সহিত বিশেষ সম্পর্ক নাই। ভদ্র লোক বলিলে আমরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বড় জাতির লোক বুঝি। ইহা ইংরেজি "Gentleman" শব্দের প্রতিবাক্য নহে। সচরাচর ইস্কুল কালেজে প্রস্তাবিত ইংরেজি ও বাঙ্গালা শব্দের প্রভেদ গ্রাহ্য না হওয়ায় 'ভদ্র' শব্দের কতক পরিমাণে অর্থবিস্তৃতি হইয়াছে কিন্তু Gentelman শব্দের সম্যক অর্থ গ্রহণের পক্ষেও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে একজন ইংলণ্ডে সুশিক্ষিত গুণবান কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক এই বাঙ্গালা ও ইংরেজি শব্দ একার্থবাচক বলিয়া তর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সিভি-লিয়ানগণ উত্তমরূপ বাঙ্গালা শিখিলে এ ভুলটি করেন না। তাঁহারা প্রয়োজন স্থলে ইংরেজিতেও ভদ্রলোক শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করেন ' ব্রাহ্মণ সন্তান মূর্খ ও পাচক ব্যবসায়ী হইলেও ভদ্রলোক কিন্তু Gentleman নহে। ভদ্র ও অভদ্র শব্দে প্রত্যক্ষতঃ আচারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে না, কেবল জাতিগত প্রভেদ সূচনা করে। 'ভদ্রতা' শব্দে আমরা এখন কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির ব্যবহার বুঝি কোন সম্মার্জ্জিতরুচি শ্রেণীবিশেষের আচরণের ছায়ামাত্র ইহাতে নাই।

'সভ্যতা' শব্দের যথার্থ অর্থ নির্দ্দেশের জন্য সংস্কৃত ভাষা হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। সচরাচর বাঙ্গালায় 'সভ্যতা' civilisation এর প্রতি বাক্য বলিয়া গৃহীত। কিন্তু এ প্রয়োগ সংস্কৃতসম্মত বলিয়া বোধ হয় না। উল্লিখিত ইংরেজি শব্দে নগরস্থাপনা সভ্যও সভ্যেতর লোকের বিশেষ—এই সূচনা আছে। কিন্তু সভা ত অসভ্যদিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থে সভ্যলোক বা সভ্যজাতির এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। সে যাহা হউক সভ্যতা শব্দ এখনও সহবৎ শব্দের ভার বহন করিতে পারে না।

'সদ্ব্যবহার' যে সহবতের নামান্তর নহে একথা বুঝাইবার জন্য আড়ম্বর করিবার আবশ্যক নাই। সদ্ব্যবহার স্থির দৃষ্টিতে নীতির উপর চাহিয়া আছে, উহার অন্য কোন দিকে চোখ নাই। যদ্যপি অনল্পদূরস্থ প্রতিবাক্য-কল্প শব্দশৃঙ্খলায় এখানে উহাকে সহবৎ শব্দের সহিত আবদ্ধ করা না হইত তাহা হইলে এ কথাটী উপস্থিত প্রসঙ্গে মনে আসিত কি না সন্দেহ।

'সামাজিকতা' আর সহবৎ এক বস্তু নহে। সমাজস্থ লোকদিগকে যে যথার্থ স্নেহ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া বাহ্যিক ব্যবহারে স্নেহের অভাব অনুভব করিতে না দেওয়া তাহাই সামাজিকতা। সত্য বটে যে কতক পরিমাণে সামাজিকতা না থাকিলে সহবৎ দাঁড়াইতে পারেনা কিন্তু তাহা বলিয়া সামাজিকতা ও সহবৎ এক নহে। ফলতঃ যে গুলিকে এইমাত্র সহবৎ নহে বলা হইল ইহারা কোন না কোন ভাবে সহবতের অন্তর্গত।

সহবৎ যে কি তাহা উপরে সহবৎ কি নহে এ কথার আলোচনা ক্ষেত্রে কতক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। এক কথায় সহবৎ আচরণের কবিতা। কবিতার মূল উপাধিহীন সত্য, সহবতের মূল মানুষের সঙ্গলিপ্সারূপ আভ্যন্তরিক সত্য। কবিতা যেমন রসাত্মিকা বাক্য সহবৎ তেমনই রসাত্মিকা ব্যবহার। কবিতার দুই পক্ষ সরলতা ও সংযম, সহবতের ও তাহাই। যেমন সত্যের অনুরূপ মিথ্যাই কবিতার আধার হইতে পারে তেমনই সত্যের অনুরূপ মিথ্যা ব্যবহারই সহবতের উপাদান হইতে সক্ষম। সুন্দর শোভন ইন্দ্রিয়মনের অনুকূল আচরণই সহবৎ। দেশকালে পাত্রভেদে ইহার বাহ্যরূপের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু সৌন্দর্য্য শোভা ও এক কথায় মাধুর্য্য ইহার নিত্যভাব।

মানুষে মানুষে যেরূপ ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিলে বাক্য স্বর ও শরীরের গতিভঙ্গীর দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৃপ্ত হয় তাহাই সহবৎ। এই ফলটি পাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়। কেন না সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছাবান মনুষ্য একত্রে বাস করিতে পারে না। সমাজ গঠন হইলেই বিনা নিয়মে চলে না। তবে নিয়মের মধ্যে একটু ইতর বিশেষ আছে। যে নিয়ম অবলম্বন করিতে ব্যক্তি-গত স্বতন্ত্র ইচ্ছা যত অল্প পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় সে নিয়মই সেই পরিমাণে ভাল অর্থাৎ উপযোগী। সামাজিক নিয়ম স্থাপনার দোষগুণ আলোচনা করিলে নিষ্কৃষ্ট ফলস্বরূপ ইহাই পাওয়া যায় যে, সামাজিক নিয়ম সাধারণের সুবিধা জনক হইলেই তাহা প্রকৃত পক্ষে প্রশস্ত। কেননা সামাজিক জীবনে নিজ নিজ ইচ্ছার যতদূর সম্ভব অল্প প্রতিবন্ধক ঘটে ইহা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইষ্ট। নিয়মের বশবর্ত্তী হইলে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীন প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে হয় সামাজিক জীবন পাইবার তাহাই দাম। এই দাম যত অল্প হয় অর্থাৎ যত সস্তায় সামাজিক জীবন পাওয়া যায় ইহা সকলেই স্বভাবতঃ ইচ্ছা করে।

সহবৎ যখন সামাজিক জীবন রক্ষার ও উন্নতি সাধন বিষয়ে একটী অনুকূল শক্তি তখন ইহাও সাধারণ সামাজিক নিয়মের অধিকারভুক্ত। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি যথেচ্ছাক্রমে অপর ব্যক্তি দিগের সহিত ব্যবহার করে তাহা হইলে সেই ব্যবহার ন্যায়গর্হিত না হইলে ও এত শুষ্ক ও নীরস হয় যে সকল সময় সমাজের বহু হিতকারিতা সত্ত্বেও ব্যক্তি গণের পক্ষে সমাজের ভার দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। সত্য যুগে যাহা হউক না কেন বর্ত্তমান প্রকৃতির মানুষ যে সারা জীবন একটা নীরস বিষম কর্ত্তব্যের ভার বহন করিবে এরূপ সম্ভাবনা বড় বিরল। ইহাতেই সহবতের সমাজ রক্ষার জন্য উপযোগিতা এবং সামাজিক বস্তু বলিয়াই সহবৎ নিয়মের অধীন। যে নিয়ম গুলি

সহবৎকে পালন করিতে হয় তাহার সমষ্টিকে কায়দা বলা যায়। এই কায়দার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নিজ নিজ আচরণকে মাধুর্য্যময় করিবার জন্য যে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও স্ফূর্ত্তি তাহাই আদব।

ইতি পূর্ব্বে সহবৎকে কবিতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন যথেচ্ছাভাব প্রকাশে কাব্যরসের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না তেমনি অসংযত বে-কায়দা আচরণ অন্য বহুগুণ-বিশিষ্ট হইলেও পূর্ণমাত্রায় প্রীতিকর হয় না। আর হৃদয় হইতে উত্তপ্ত শোণিতের ন্যায় বহমান ভাব সরলতা গুণে চিত্ত আকর্ষণ করে। আদব সেই হৃদয় হইতে স্বাভাবিক সরল-ভাবে বাহিরে প্রকাশিত হইলে সকলের মনস্তুষ্টির হেতু হয়। আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে কথাটি আরও ফুটিয়া উঠিবে।

সহবৎ যেন ভাষা। তাহা হইলে কায়দা ব্যাকরণ ও আদব রচনানৈপুণ্য। ব্যাকরণ সবাই শিখিতে পারে এবং শিখিলে রচনা নিতান্ত অশুদ্ধ হয় না, এক রকমে চলিয়া যায়। রচনা-নৈপুণ্য ব্যক্তিগত এবং ইহার সত্তায় রচনার মনোহারিত্ব। কায়দা শিখিলে লোক সমাজের হেয় হয় না কিন্তু যাহার আদব কায়দা উভয়ই অধিকৃত তিনি সমাজের সমাদৃত নেতা। যেমন রচনানৈপুণ্য আয়ত্ত করিতে শিক্ষকের সাহায্য অপেক্ষা নিজের সাহায্যই অধিক প্রয়োজনীয় এখানেও সেইরূপ। এবং এখানেও উচ্চ আদর্শের একটা দাম আছে।

অনেক ইংরেজি শিক্ষিত লোকের মুখে শুনা যায় যে সহবতের আদর ইংরেজি রীতির অন্ধ অনুকরণের ফল। তাঁহারা সহবৎকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান যে সদ্বংশসম্ভূত প্রাচীন ব্যক্তিগণ সদাসর্ব্বদা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বে-সহবৎ বলিয়া নিন্দা করেন। এবং প্রাচীন ইংরেজি রাজ-পুরুষেরাও এইরূপ সহবৎ-অবনতির সাপক্ষে সাক্ষ্য দেন। আরও দেখা যায় যে পূর্ব্বে বিদেশীয়দিগের গ্রন্থে Oriental courtesyর যে প্রশংসা দেখা যাইত এখন তাহাও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া সহবৎ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে সমাদৃত তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করা বিশেষ আয়াস সাধ্য নহে। কিন্তু একথা পরে বিবেচিত হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছামত বেশ বিন্যাস ও আচরণ সম্বন্ধে কতকগুলি ইংরেজি আদব কায়দা গ্রহণ করিয়া দেশীয় সহবৎ ও ইংরেজি সহবতের যে অংশ তাঁহারা গ্রহণ না করেন তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া য়ুরোপে শিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁরা সহবৎ নিরাবশ্যক, একথা বলেন না। তবে সহবৎ সম্বন্ধে ইহাঁরা নিজ নিজ খুসীকে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। "তোমরা আমাকে প্রশংসা কর, আমার আদব কায়দা সম্বন্ধে তোমার একটা মতামত থাকা সম্ভব নহে, তুমি ত বিলাত যাও নাই, ইহার মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে? তোমাদের রাজা যে ইংরেজ আমি তাহার সমকক্ষ আমার আচার ব্যবহার তোমার আদর্শ—এই আদর্শ অনুসারে তুমি নিজের ও অন্যের সম্বন্ধে বিচার কর—ইহার ভিতর তোমার প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই।"—

উল্লিখিত শ্রেণীর লোকের ভাবভঙ্গীতে যেন এই কথাগুলি মুদ্রিত রহিয়াছে। যদি বল, আমাদের পিতা, পিতামহের আদর্শ অনুসারে ইহাঁদের আচরণ দোষাশ্রিত এবং প্রাচীন-দিগের নিন্দার আস্পদ, তাহাতে ইহাঁরা উত্তর করিবেন যে প্রাচীন লোকের কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা এইরূপ নিন্দার হেতু। প্রাচীন সহবৎ অনুসারে প্রাচীনের নবীনের নিকট সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু এখনকার নিয়ম অনুসারে ঐ সম্মান স্বাধীন চিত্ততার বিরোধী বলিয়া বে-সহবৎ। এজন্য চির অভ্যস্ত সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়া মনোক্ষোভে এইরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন। আর ইংরেজরা যে তাঁহাদের মনগড়া সহবতের পক্ষপাতী নহেন তাহার কারণ ঈর্ষা—ইহাদের কর্তৃক জীবন সংগ্রামে উৎপীড়িত হইয়া ইংরেজরা অপ্রশংসার বাণ বর্ষণ করেন।

এরূপ আচার ব্যবহারের অন্য যে কোন উৎকর্ষ থাকুক না কেন যথার্থ সহবতের একটী গুণ ইহাতে লক্ষিত হয় না। আপনার সম্ভ্রম ও অপরের সম্মান রক্ষা করা ভিন্ন সহবৎ তিষ্ঠাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে এইটি নাই। অপরের সম্মান রক্ষা না করা এ আচরণের প্রধান অঙ্গ কিন্তু এই সম্মান লোপ করিতে গিয়া নিজের সম্ভ্রমও বিলুপ্ত হইয়া যায়। "আমাকে মান্য কর কেননা আমি এত ইংরেজ অর্থাৎ উঁচু হইয়াছি যে তোমাকে মান্য করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। যদি বল আমাকে ইংরেজে মান্য করে না কেন, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ঈর্ষা।" উত্তরে যদি বলা যায় যে, "ইংরেজ আমার রাজা সেইজন্য তাহাকে মান্য করি। তুমি ইংরেজের যতই সমকক্ষ হও না কেন তুমি ত আর আমার রাজা নহ। তবে তোমাকে মান্য করিব কেন? ইংরেজ তোমারও রাজা আমারও রাজা তুমি যদি সেই রাজাকে মান্যের উপযুক্ত মনে না কর তবে সেই ইংরেজের সমতুল্য বলিয়া—ইংরেজের নকল বলিয়া—তোমাকে মান্য করিব কেন?"—এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া ভরসা হয় নাই।

সহবতে যেরূপ করিয়া আত্ম-সম্ভ্রম ও পরের সম্মান রক্ষা করে তাহা বিভিন্ন প্রকার। আমি তোমার সদ্‌গুণগুলিকে আদর করিতেছি আমি তোমার ভাল মন্দ বলার উপর অনেকটা আস্থা করি এ অবস্থায় কি তুমি আমাকে অসম্মান করিতে পার। তোমাকে আমি ধনী, ক্ষমতাশালী বা বিদ্বান বলিয়াই যে সম্মান করিতেছি তাহা নহে—মানুষ বলিয়া সম্মান করিতেছি। তুমি যদি আমাকে অপমান কর তাহা হইলে জানিও যে, আমিও মানুষ, আমার অসম্মানে তোমারও অসম্মান! আমি মানুষকে সম্মান করি বলিয়া নিজেকেও সম্মান করি এবং মানুষকে সম্মানার্হ বলিয়াই সম্মান করি—এজন্য আমার অসম্মান করিলে মানুষের অসম্মান বলিয়া আমার তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।"—সহবতের কথা এইরূপ। সহবৎ মনুষ্যত্বের উপর মানুষের সম্মানের প্রতিষ্ঠা করে। একজন ইংরেজ কবি সহবতের প্রধান অঙ্গীভূত Honour সম্বন্ধে (বোধ হয় বাঙ্গালায় মনুষ্যত্ব বলা যাইতে পারে) যাহা বলিয়াছেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনি সত্য :—

Say what is Honour But the nicest sense
Of justice the human heart can frame,
Intent each lurking frailty to disclaim.
And guard the ways of life' gainst all offence
Suffered or done ?*

—Wordsworth.

যাঁহারা সমাজে সম্মান ও ক্ষমতা খোঁজেন তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্মান তাহাই মনুষ্যের যথার্থ সম্মান। এই প্রসঙ্গে টেনিসনের কএকটা কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্ফল বোধ হয় না ;—

Self reverence self-knowledge, self-control
These three alone lead life to sovereign Power
Yet not for Power (Power of herself
would come uncall'd for) but to live by law
Acting the law we live by without fear
And because right is right to follow right
Were wisdom in scorn of consequence.

—AEnone.

যেমন কবিতার তুলনায় কবি বড় তেমনি মানুষ মানুষের কার্য্যকলাপের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এইটি বুঝিয়া আপনার উপর সমীহা, নীচ কার্য্য হইতে আপনাকে রক্ষা করা—ইহাই যথার্থ প্রভুত্বের দ্বার। কিন্তু তবুও প্রভুত্বলাভ জীবনের উদ্দেশ্য নহে—প্রভাব স্বভাবতঃ ন্যায়াচারীর অনুচর। ন্যায় প্রতিপালনই জীবনের উদ্দেশ্য, মনে যাহাকে ন্যায় বলিয়া ধারণা হয় নির্ভয়ে কার্য্যে তাহার প্রকাশ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। ফলাভিসন্ধি ছাড়িয়া প্রীতিপূর্ব্বক ন্যায় প্রতিপালনই যথার্থ জ্ঞান।

যাঁহারা মনে করেন সহবৎ অস্বাভাবিক ও ইংরেজি বা মুসলমানি অনুকরণের ফল ও যাঁহারা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোন সহবৎ নাই, বা থাকিলেও তাহা হেয় এই ভাবেন ইংরাজি সহবতের অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন এ দুই শ্রেণীর লোকের দেখা উচিৎ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে সহবতের উপর কতদূর দৃষ্টি ছিল এবং আমাদের প্রকৃতির কত গভীর স্থল ইহা অধিকার করিয়া আছে। কেননা যদি এরূপ দাঁড়ায় যে এই একটী বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা ঠিক নহে তাহা হইলে তাঁহারা দেশের কিরূপ অনিষ্ট করিতেছেন সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

* মনুষ্য প্রকৃতির পক্ষে যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম দৃষ্টি—যাহার দ্বারা চরিত্রের গুপ্ত দুর্ব্বলতার প্রত্যাখ্যান ঘটে,—এবং যাহা অত্যাচার করাও অত্যাচার সহা হইতে জীবনের পথ রক্ষা করে—ইহা ছাড়া মনুষ্যত্ব আর নাই।

যাঁহারা মনুসংহিতা ও মহাভারত পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সেকালে সহবতের উপর কত লক্ষ্য ছিল—সহবৎ ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বেশ-বিন্যাস, অভিবন্দন, গাত্রকণ্ডুয়ণ, নিষ্ঠীবন ত্যাগ প্রভৃতির উপরও সেই প্রাচীনকালেও দৃষ্টি ছিল। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এখন এত সহজে পাওয়া যায় যে বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রস্তাব ফাঁপাইয়া তোলা বৃথা আড়ম্বর মাত্র।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে 'নাগরিক' ও 'গ্রাম্য' এই দুইটির ভিতর যেরূপ সম্মান আদরের প্রভেদ তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। সহবতের দর যে তখন কিরূপ ছিল তাহার ইহাতেই প্রমাণ। তারপর যদি স্মরণ করা যায় যে হিন্দি 'গাঁওয়ার' ও আমাদের 'গোঁয়ার' এই 'গ্রাম্য' শব্দের অপভ্রংশ তাহা হইলে কথাটা আরও ফুটিয়া উঠে।* নবাবী আমলে সহবতের যে কি দর ছিল সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই—এখনও "বে-সহবৎ" বলিয়া গালি দিবার প্রথায় তাহার উজ্জ্বল চিত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের ঠিক আগেকার কালেও বিদ্যাশিক্ষার অপেক্ষা সহবৎশিক্ষা কম দরের ছিল না। এখনও বৎসর পঞ্চাশ বয়সের কর্ত্তা গৃহিণীদিগের মুখে শুনা যায় :—

"যদি পড়া না শিখে পো
তবে সহবতে থো।"

যে কয়েকটী কথা এখানে বলা হইল তাহা শুনিতে ছোট কিন্তু আলোচনা করিলে ইহা হইতে ফল বড় ছোট উৎপন্ন হইবে না। যে এক মুষ্টি প্রমাণ এখানে যথেচ্ছাক্রমে তাড়াতাড়ি ধরা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যাঁহারা সহবৎকে একেবারে অশ্রদ্ধা করেন ও যাঁহারা মনমাফিক বিলাতী সহবৎ লইয়া সমাজের মাথায় উঠিতে চাহেন তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের ব্যবহার আমাদের ধাতুর কত বিরোধী। আজকাল দু'দিন তাঁহারা বুদ্ধির বলে, বিদ্যার বলে কাটাইয়া দিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের নিজের অস্ত্রে নিজের শাস্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাই তাঁহাদের দণ্ডকর্ত্তা হইবে না কে বলিতে পারে?

যাঁহারা সহবতের আদর জানেন তাঁহারা ভাবিয়া দুঃখিত হইবেন যে গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের কতদূর অবনতি হইয়াছে। অনায়াসে না ভাবিয়া চিন্তিয়া পঞ্চাশ হইতে আশী বৎসরের এমন তিন চারিজনের নাম করা যাইতে পারে যে তাঁহাদের তুলনায় ইতিমধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠলোক আমাদের মধ্যে অনেক উদিত হইয়াছেন সত্য কিন্তু আচরণের গৌরব সৌকুমার্য্যে তাঁহাদের দুই এক ক্রোশের মধ্যে আসিতে পারেন এমন একজন ব্যক্তির নাম করিতে মাথার ঘাম পায়ে পড়িবে।

আমাদের মধ্যে এইরূপ সহবতের বিপ্লব ঘটিবার অনেকগুলি কারণ আছে। একটী

* এই যুক্তির সম্পূর্ণ বল অনুভব করিতে হইলে একথা মনে রাখা উচিৎ যে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের সহিত তুলনায় 'গ্রাম্য' শব্দের অর্থ একেবারে অন্য প্রকার—তাহাতে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের লেশ নাই।

প্রধান কারণ রাজা প্রজায় বিচ্ছেদ। যদিও নবাবী আমলের অপেক্ষা রাজ্যতন্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ নামমাত্র অশরীরী ব্যবস্থামাত্র অবশেষে রাজা হইয়া দেশে উঁচু নীচু পদবীস্তবকের বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। মুসলমানদিগের সময় সামান্য ব্যক্তি হইতে আর নবাব বাদসাহ পর্য্যন্ত একটা শৃঙ্খলা ছিল তাহাতে একপ্রকার সহবতের সৃষ্টি হয় যাহাকে দরবারী সহবৎ বলা যাইতে পারে। অন্যদিকে, মুসলমানগণ দেশের আভ্যন্তরিক তন্ত্রে হাত দেন নাই সেজন্য জাতি বিভাগের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাই ভদ্রলোকের ভদ্র ব্যবহারও অক্ষুণ্ণ ছিল। আর একটী কারণ, ইংরেজি শিক্ষা ও জমির পত্তনি দরপত্তনি ব্যবস্থা হেতু জাতিগত শৃঙ্খলা ও রাজন্য ও আশ্রিত ভাবের বিলোপ। তখনকার দিনে জমীদারগণ কার্য্যতঃ রাজা ছিলেন এবং যথাযোগ্য ভাবে নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে কায়দা সহবৎ রক্ষা করিতেন। এখন অর্দ্ধ শতাব্দী হইল ইংরেজের অধীনে জমীদারীর আইন যেরূপ্ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে পূর্ব্বেকার আশ্রিত আশ্রয় ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে নীচু জাতীয় হাকিমের নিকট উঁচু জাতির লোকদিগকে বিচার প্রার্থনা করিতে হইতেছে, নীচুজাতির শিক্ষকের নিকট উঁচুজাতীয় বালকগণ বিদ্যা লাভ করিতেছে—এক কথায় জাতির উপর জাতির প্রত্যয় একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। এ প্রকারে প্রাচীন সীমানা চিহ্ন মুছিয়া যাওয়ায় লোকে এখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছে না, তাই কি সহবতে চলিবে ঠিক নজর হইতেছে না। প্রথম প্রথম যাঁহারা ইংরেজি শিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন তাঁহারা মোটামুটি ধরিলে সকলেই ভদ্রবংশে উৎপন্ন, সহবৎ তাঁহাদের একরকম স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহাদের উপর ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব সঞ্চারিত হওয়ায় সহবৎ ক্ষুণ্ণ না হইয়া আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখন অন্যরূপ ঘটিতেছে। যাঁহাদের ভিতর সহবৎ অর্থে কেবল অধীনতা স্বীকার—দাসত্ব দৈন্যমাত্র বুঝাইত তাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সেই ঝুটো সহবতের ঘৃণ্যতা বুঝিয়াছেন কিন্তু যথার্থ সহবৎ পূর্ব্বে জানিতেন না বলিয়া সহবতের ভাবই বুঝিতে পারেন না কাজে কাজেই কাঁথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেশুদ্ধ ফেলিয়া দিতেছেন। এবং জীবন-সংগ্রামে অন্যবিধ লোকের ইহাঁদের সহিত যোঝাযুঝি করিতে হয় আর সে যুদ্ধে সহবতের জোর নাই বলিয়া ক্রমে সর্ব্বত্রই বে-সহবতের রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে।

তবে সহবৎ মানুষের প্রকৃতিগত একটা ভাব এজন্য একেবারে ইহার উচ্ছেদ সম্ভাবনা নাই। যেমন একদিকে চন্দ্রাস্ত হইতেছে তেমনি অন্যদিকে ঊষার অরুণাভা দেখা দিতেছে—প্রাচীন সহবতের মৃত্যুতে নূতন এক সহবতের আবির্ভাব সূচনা করিতেছে।

সমাজে প্রকাশ্যভাবে মহিলাদের উদয়, শিক্ষিত লোকের ভিতর অর্থসঞ্চয় ও অর্থবান লোকের ভিতর শিক্ষার সমুত্থান, সারবান প্রকৃতির লোকের ভদ্র ইংরেজের সহিত মিলামেশা—এই সব সামাজিক শক্তির কার্য্য দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য আশা হয়।

নিজের মা, ভগিনী স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষা করিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সমাজে সহবতের প্রচার না থাকিলে সে সম্মান রক্ষা হইবে না। কাজে কাজেই যদি লোক একেলা থাকিতে না পারে, অনুপ্রকৃতির লোকের সহিত মিশিতে হয় তাহা হইলে দায়ে পড়িয়া সহবতের আধিপত্য স্বীকার করিতে হইবে। ধনবান লোককেও এই একই কারণে স্বাধীন বৃত্তির অল্পধন লোকের সহিত মিশিতে হইবে, জটিল আইনের গোলকধাঁধার ভিতর শিক্ষিত আইন ব্যবসায়ীর সাহায্য লইতে হইবে। সহবতের উন্নতির এই আর একটী অনুকূল শক্তি। তাই প্রস্তাবের এ অংশে উপসংহার কালে মহাকবিদিগের দুই একটী কথা মনে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে ঃ—

The old order changeth yielding place to new.
And God fulfils Himself in many ways.
Lest one good custom should corrupt the world.

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গলা রঙ্গভুমি।

'সরলা'—সিটি থিয়েটার।

বছর পাঁচছয় ধরিয়া স্বর্ণলতার প্রথম অর্দ্ধাংশ 'সরলা' নাম দিয়া ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল হইতে সিটি থিয়েটারেও ইহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের আলোচ্যবিষয় প্রধানতঃ সিটি থিয়েটারের অভিনয়।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা", তাই সিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ ষ্টার থিয়েটারের পদক্রম সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, অতএব সেখানকার 'সরলা' পছন্দ হয় ত এখানকার ও হইবে, সেখানে কিছু নিন্দনীয় থাকে ত এখানেও থাকিবে। বাস্তবিক দুই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়প্রণালী এরূপ হুবহু এক যে প্রথমটা বিস্ময় উপস্থিত হয়; তৎপরে অনুশোচনা হয় যে একের ত্রুটী অন্যত্রে সংশোধিত হইল না কেন? "প্রমদার অভিনয় ভাল হইয়াছিল" বলিলে বিশেষ কিছু বলা হইল না, যেহেতু প্রমদার ভূমিকা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। কুঁদুলে, ঈর্ষাপরায়ণ স্ত্রীচরিত্র বিরল নহে, এবং সেই চরিত্রানুরূপ অভিনয়ও আদৌ কঠিন নহে। যাহা কিছু অসাধারণ নয়, তাহা সহজে, স্বাভাবিক ভাবভঙ্গীতেই দর্শকের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অসাধারণকে স্বাভাবিক ভাবে সম্যক পরিস্ফুট করাই শক্ত; তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক। একটা চলনসই দেখিতে স্ত্রীলোকের মুখে গ্রন্থকারের কথা বসাইয়া দিলেই প্রমদা সম্বন্ধে নির্ভাবনা হওয়া যায়। কিন্তু সরলার চরিত্রের অসাধারণ মাধুর্য্য শুধু কথায় আঁটিবেনা, রঙ্গমঞ্চে চরিত্রের মাধুর্য্যকে আকৃতিগত মাধুর্য্য স্বরের মাধুর্য্য প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরের দ্বারা জড়িত করিতে না পারিলে মোহন প্রয়াস বিফল হইবার সম্ভাবনা। যখন আগ্রহের সহিত নায়িকার অপেক্ষা করিতেছি, তখন একটা কর্কশকণ্ঠা রমণীর কেকাস্বরে অর্দ্ধেক কাজ ভ্রষ্ট হয়, তাহার প্রতি সহানুভূতি তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ অনেকখানি ঝরিয়া পড়ে। থিয়েটাররের ম্যানেজারগণ নায়িকা নির্ব্বাচনের সময় তাহাদের কণ্ঠস্বরের প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগী হন। গৃহস্থঘরের দৃশ্যে বরঞ্চ অপূর্ব্ব সুন্দরী না হইলেও চলে কিন্তু সুকণ্ঠা না হইলে একেবারে অচল। সিটি ও ষ্টার উভয়ত্রই সরলার এই বিশেষ গলদ রহিয়াছে। যাহা হউক সরলার অভিনয় ক্রমশঃ ক্রমশঃ চিত্ত আকর্ষণ করে, ভূমিকোৎকর্ষে ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয় যে তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ উপযুক্ত গোপাল যোগাড় করিতে পারেন নাই। ষ্টারের যে সুদর্শন বালকের সুন্দর অভিনয়ে নাটকের কারুণ্য শতগুণ বাড়াইয়া তোলে, যাহার আবদার যাহার সারল্যে গৃহ শুদ্ধ লোকের নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হয় এখানে তাহার অভাব, —অন্য গোপালের চেষ্টা দেখা উচিত।

শশীভূষণের অভিনয় সবিশেষ ভাল হইয়াছে। তাঁহার প্রধান গুণ স্বরসংযম। গলার চোটে বাড়ী না ফাটাইয়া গলার রাশ বাগাইতে পারা বিশেষ গুণপনা, এবং বাঙ্গালা থিয়েটারে তাহা বিরল। কোনরূপ উত্তেজিতাবস্থায় কণ্ঠস্বর কি চড়ে না,—তাহা নহে। চড়িবে; তথাপি তাহাকে এমন আলগোছে আলগোছে মুদারা গ্রামের সীমানা স্পর্শ করাইতে হইবে যাহাতে হৃদয়ের উত্তেজনার ভাব ব্যক্ত হয় অথচ কর্ণজ্বর উপস্থিত না হয়, সেই রুদ্ধ উচ্চস্বরই অধিক হৃদয়াবেগব্যঞ্জক।

এখানকার বিধুভূষণ মোটের উপর ষ্টার থিয়েটারের বিধুভূষণ অপেক্ষা আমাদের ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু নীলকমলের অভিনয়ে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না! প্রথমতঃ তাহার চেহারায় সে বোকামির ভাবটাই নাই। তাহাও যেন মার্জ্জনা করা গেল কিন্তু তাহার গানে কৌশলের অভাব আমরা কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারি না। নীলকমলের এমন ভাব করিতে হইবে যেন ভালরূপ গান গাহিবার চেষ্টা করিতেছে, কৃতকার্য্য হইতেছে না; তাহার সেই নিষ্ফল প্রয়াস যেন শ্রুতিমধুর ভাবে শ্রোতার কর্ণে আসিয়া পঁহুছে এবং তদ্দ্বারা হাস্যরসের সৃজন করে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এখানে কর্কশ বৃষভনিন্দিতস্বরে চীৎকার করাই অভিনয় কৌশল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সে কৌশল কৌশলের অভাব। একটা সুর বজায় রাখিয়া এরূপ ভাঁড়ামির সহিত গাহিবার চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তির জন্য শ্রোতার কান আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর না ঠেকে। কিন্তু এস্থলে হইয়াছে এইরূপ যে নীলকমল গান গাহিবার উদ্যম করিলেই তাহাকে ধরিয়া পিটাইতে ইচ্ছা যায়, বিধুভূষণ যখন বলেন "রাতটা যখন জাগ্‌তেই হবে তখন এই পাগলের গান শুনেই কাটান যাক" তখন শ্রোতার মনে ঠিক তদ্বিপরীত ভাবোদয় হয়, এবং বিধুভূণের ভীত্যুৎপাদক বাক্য ফলিবার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া নানা প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি মনে জাগিয়া উঠে।

শ্যামার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

হাঁসখালীর পথে রাখালবালকদের গান শুনিতে ভাল লাগিলেও কতদূর স্বাভাবিক বিশেষ সন্দেহ। ইহা অপেরা নহে যে একটা আধটা অমনতর বেমক্কাদৃশ্য ঢুকাইয়া দেওয়া যায়, বড় জোর এইরূপ হইতে পারে যে সে পথে একটী দুটী রাখালবালক খেলা করিতে করিতে বা গরু চরাইতে চরাইতে গান গাহিতেছিল, বিধুভূষণদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া চলিয়া গেল; তাই বলিয়া পাঁচ সাতটী বালক দর্শকের সম্মুখে গোল হইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গান গাওয়ার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আর একটী কথা, বাঙ্গালা থিয়েটারে কোন গান "আঙ্কোর্‌ড্" হইলে তাহার শেষ চরণ তড়বড় করিয়া যত শীঘ্র পারা যায় পুনর্ব্বার গাওয়া দস্তুর। এমন কুদস্তুর যত শীঘ্র হয় উঠাইয়া দেওয়া উচিত। যে গান যেরূপ ভাবে গাওয়াতে শুনিতে ভাল লাগিয়াছিল পুনর্ব্বার তদ্রূপ ভাবে শুনিয়া প্রীত হইবার প্রত্যাশাতেই লোকে "আঙ্কোর" করিয়া থাকে। তড়বড় করিয়া কোনমতে কথা গুলির

পুনরুচ্চারণ শ্রবণে সে প্রীতিলাভ কিরূপে সম্ভবে? শুধু শেষ চরণটাই যদি গাওয়া হয় তাহা ধীরে সুস্থে গাহিলে তাহাতে খুব বেশী সময়ক্ষেপ যে হয় তাহা বোধ হয় না।

এক্ষণে আমাদের 'সরলা' অভিনয়ের একাংশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সেই অংশটী উক্ত নাটকের কলঙ্ক। পারিবারিক দুঃখের করুণ অভিব্যক্তি চলিতেছিল, মাঝে হইতে পরধর্ম্মের প্রতি কুৎসিৎ বিদ্রূপ, স্বধর্ম্মের প্রতি বীভৎস অবমাননা কেন? কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের বাহ্যিক ভড়ং বাড়াবাড়ি প্রভৃতি বিদ্রূপের বিষয় হইতে পারে। ব্রাহ্মেরা কিরূপে হস্তোত্তলনপূর্ব্বক বক্তৃতা দেন, কোন্ ব্রাহ্ম কিরূপ লম্বা মোটা উত্তরীয় পরিধান করেন, কে সখ করিয়া নাকে চস্‌মা দেন তাহা পরিহাসের বিষয় হইতে পারে। পরিহাসের পাত্রগণ তাহাতে যতই ক্ষুণ্ণ হউন, মানবহৃদয়ের একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা মনে করিয়া পরিহাস কর্ত্তাদের সে বিষয়ে কতকটা মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিহাস লোক ছাড়িয়া যখন ধর্ম্মে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, তখন সে নিজের সীমা অতিক্রম করে, তখন আর তাহাকে কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না। ব্রাহ্মদের বিদ্রূপ করিতে দিয়া যখন অভিনেতারা পরমদয়ালু পরমেশ্বরকে তাঁহাদের চিবুকে দাড়ি গজানর নিমিত্ত এবং শীতকালে সাঁকালু প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রকাশ্যে উচ্চ কণ্ঠে ধন্যবাদ করিয়াছেন, বিদ্রূপ জানিয়াওযখন তাহাতে স্পষ্ট ঈশ্বরের নাম যোজনা করিয়াছেন; প্রতিরাত্রি দর্শকবর্গের আমোদের জন্য এই হীন উপায় অবলম্বন করিতেছেন তখন তাঁহারা নিজের ধর্ম্মমুখে নিজে পদাঘাত করিতেছেন। যখন বারাঙ্গনালয়ে হিন্দুনন্দনেরা অবিশ্বাসীহৃদয়ে বিদ্রূপাত্মকহৃদয়ে 'ওঁ তৎসৎ' শব্দ উচ্চারণ করেন তখন কি একবারও তাঁহাদের আজন্মের ধর্ম্মপ্রাণে. বাজে না? শত শত হিন্দু সন্তান অম্লান বদনে বসিয়া ইহা শুনিয়া যান একদিনের জন্যও কি কাহারো প্রাণে বাজে নাই? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অনন্ত পুরুষের আরাধনায় সুমহান্ সুগম্ভীর, রহস্যপূর্ণ 'ওম্' শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, তাহাকে আজ এই পাপপঙ্কে লুণ্ঠিত দেখিয়া, তাহার মাহাত্ম্য হৃত দেখিয়া কাহারো প্রাণ দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে না? ব্রাহ্মেরা ভাল মন্দ যাহাই হউক, হিন্দুসন্তানেরা যে প্রতিরাত্রে পরিহাসচ্ছলে, অবিশ্বাসচ্ছলে অকম্পিতহৃদয়ে, অপাণ্ডু ওষ্ঠে "ওম্ তৎসৎ" শব্দ উচ্চারণ করে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছু নাই। গল্প শোনা যায় যেমন প্রভুর আজ্ঞায় কোন আত্যন্তিক নৃশংসকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত লাখের মধ্যে একটী লোক পাওয়া যায়, অনুমান হয় এ স্থলেও এরূপ আত্মধর্ম্মদ্রোহী কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না, প্রভু ম্যানেজারের আজ্ঞায় বিশটা অভিনেতৃবর্গের মধ্যে একটা লোক অগ্রসর হয়,—ইহা যদি মিথ্যা হয় তবে এ ধর্ম্মহীন দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

"সপ্তমীতে বিসর্জ্জন"—মিনার্ভা থিয়েটার।

বিজ্ঞাপনে পড়া গেল "হাসির হর্‌রা গানের গর্‌রা ও নাচের নায়েগ্রা" এবং কোন কোন কাগজে সমালোচনায় দেখা গেল এতদিন পরে সম্প্রদায় কিম্বা ব্যক্তিগতদ্বেষবর্জ্জিত শুদ্ধ আমোদজনক এক নিরীহ প্রহসনের অবতারণা করিয়া শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ কৌতুহলান্বিত ও আমোদাশান্বিত হৃদয়ে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে এই প্রহসন দেখিতে যাওয়া গেল। পাঠকগণ বিচার করুন সংবাদপত্রের সমালোচকগণ আমাদের যে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা কতদূর সমূলক।

প্রহসনের নায়িকা বেশ্যা, নায়ক বেশ্যানুরক্ত যুবক, প্রতিনায়ক বেশ্যা ও মদ্যানুরক্ত প্রৌঢ় ভট্টাচার্য্য। প্রহসনের বিষয় বেশ্যাবাড়ী পূজা, পূজাবাড়ী চালচিত্রাভ্যন্তরবর্ত্তী ঠাকুর প্রতিমা নহে—বেশ্যাপ্রণয়াভিলাষী কার্ত্তিকবেশী নৃত্যপরায়ণ অশীতিপর বৃদ্ধ। নিরীহ আমোদজনক প্রহসন যদি এই হয় তবে কুৎসিৎ আমোদজনক প্রহসন যে কি তাহা আমাদের বোধাতীত। বেশ্যাবাড়ী নানা ঘটনা ঘটিতে পারে, তাই বলিয়া পূজার সময় হিন্দু সমাজকে এই প্রকাশ্য পূজাবমাননা ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করা সমস্ত হিন্দুসমাজের প্রতি অবমাননা। যে গৃহে অধিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত হিন্দুর শোণিতে একটা তপ্ত দেবতাসঙ্গ লাভের ভাব সঞ্চরণ করিতে থাকে, সেই গৃহের অধিবাসীগণ সেই উন্নত পবিত্রভাবের এরূপ বিকৃত কলুষিত কুৎসিৎ চিত্র কিরূপে অপ্রতিবাদে সহ্য করিয়া থাকেন কিছু বোঝা যায় না। বলিতে হইবে তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, মুখে যতই হিন্দুয়ানীর বড়াই করুন, বছরে বছরে যতই "ভোলানাথের মাতৃদর্শন" ছাপান, বাস্তবিক সে সকলই ছলনা, ধর্ম্মপণ্যজীবীর দোকানের ভড়ং মাত্র—তাহা যদি না হইত, যদি সত্যই তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্ হইতেন তাহা হইলে আজ আমাদের তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে হইত না, বহুপূর্ব্বেই বিশটা শশধরচূড়ামণি হাজারটা হিন্দুধর্ম্মপ্রহরী হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী থিয়েটার সমূহের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইতেন, ম্যানেজারগণ পলাইতে পথ পাইতেন না। থিয়েটারযাত্রী হিন্দুরা যদি ধর্ম্মঘট করেন, এরূপ অভিনয় আমরা দেখিতে যাইব না, তাহা হইলে এক রাতারাতিই ইহা বন্ধ হইয়া যায়, আর এরূপ প্রকৃতির প্রহসন কখন মাথা তুলিতে সাহস করে না। প্রথমোক্ত নাটকের নিকৃষ্ট অংশ সম্বন্ধেও সেই এক কথা খাটে।

ধর্ম্মের দিক ছাড়িয়া দিয়া সহজ রুচির দিক হইতে দেখিলেও এরূপ প্রহসনের ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত বিস্ময়কর। যে ইংরেজী থিয়েটারের অনুকরণে বাঙ্গালা থিয়েটরসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সুরুচির আইনগুলি কি বাঙ্গালী বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে? বিদেশে যেখানে ভদ্র স্ত্রী পুরুষের সমাগম হয় সেখানে "Music Hall" এর কুরুচিপূর্ণ নৃত্যগীত স্থান

[illegible] মেয়েরাই কি ভদ্রাভদ্রের প্রভেদ রাখিবে না? ভদ্রলোকেরাও কতদূর [illegible] নাচার লেহলুণ্ঠন করিয়া পুরুষের ন্যায় আমোদাহরণে রত থাকিবে?

[illegible] আর সকল বিষয়েই বজায় রাখিতে হইবে, শুধু যে জাতিভেদে মনুষ্যের [illegible], যাহা ভদ্রাভদ্রের বিশেষ, সেই রুচিগত জাতিভেদকেই আমাদের সমাজে স্থান [illegible] হইবে না? হায় অন্তঃপুরবাসিনি বঙ্গরমণি, যে নিরীহ শুভ্র অজ্ঞতার আবরণ তোমাদের সস্নেহে ঘিরিয়াছিল, আজ তাহা রূঢ়ভাবে অপসারিত হইতেছে, তোমাদের স্বদেশের অন্তঃপুরবাস আর থাকেনা। তোমাদের স্বামীরা যবে বারাঙ্গনানুরক্ত হইয়া তোমাদের প্রতি অবহেলা করিয়াছেন, দিনের পর দিন গিয়াছে সারাদিবসের মধ্যে একটীবার তাঁহাদের দর্শন পাও নাই, প্রতিনিশি ব্যাকুল দুঃখে শূন্যগৃহে যাপন করিয়াছে, তখনও তোমাদের এই টুকু অজ্ঞতার সুখ ছিল, তোমাদের স্বামীরা বারাঙ্গনালয়ে নিজেদের কতদূর ঘৃণ্য করিতেছেন তাহা জানিতে পার নাই। কিন্তু আজ থিয়েটারের প্রসাদাৎ তোমাদের সম্মুখে সে দৃশ্য উন্মুক্ত, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অভিনেতৃ স্বামীবর্গের কল্যাণে 'ফ্রিটিকিট' লইয়া তাহাদের বেশ্যাবাড়ীর আচরণ দেখিয়া আসিতে পারিতেছ, সেখানকার কলুষতা সেখানকার কদর্য্যতা, তোমাদের আর তিলমাত্র অগোচর নহে। ক্রমে ক্রমে তোমরাও সে সব দৃশ্যে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছ, এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ যথেষ্ট পরিমাণে আমোদও অনুভব করিতে পারিতেছ। বাঙ্গালা থিয়েটার বাঙ্গালী রমণীর মনের সৌকুমার্য্য দূর করিবার খুব সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকে এরূপ ব্যবহার আর কতদিন প্রশ্রয় দিবেন?

থিয়েটারের ম্যানেজারগণ কুরুচি বাদ দিয়াও যে বাঙ্গালীকে আমোদ দিতে পারেন তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিনার্ভা থিয়েটরের "আবুহোসেন"। তাঁহারা যদি বরাবর এইরূপ প্রকৃতির নাটক বা প্রহসনের অবতারণা করেন তাহা হইলে তাঁহারা বাস্তবিক সকলের ধন্যবাদের পাত্র হন, যেহেতু তাহাতে দর্শকগণকে পরিপূর্ণ আমোদ দান করা হয় অথচ তাঁহাদের রুচির প্রতি অবমাননা করা হয় না। আগামীবারে আমাদের আবুহোসেনের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির।

(২)

মেরু-চক্র।

গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দিরে প্রবেশ করিবার দুইটী নির্দ্দিষ্ট সময় রহিয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে ১০ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত, অথবা অপরাহ্নে ২ঘটিকা হইতে ৩॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত; ইহার মধ্যে যে কোন সময় তথায় গমন করা যাইতে পারে; কিন্তু কাহাকেও ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ক্ষণ মানমন্দিরে থাকিতে দেওয়া হয় না, এবং একমাত্র Board of Admiraltyর অনুমতি ভিন্ন কেহ একাধিকবার তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। মানমন্দিরে প্রবেশার্থ অনুমতি-প্রার্থী ব্যক্তিগণ Astronomer Royal হইতে যে মুদ্রিত নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা এইরূপঃ—

"The Royal Observatory Greenwich, London, S. E.

"Sir

I am requested by the Astronomer Royal to inform you that you will be permitted to inspect the instruments of the Royal Observatory on presentation of this letter, between the hours of 10 a. m. and noon on any weekday or between the hours of 2 and 3. 30 p. m. on any weekday except Saturday. You will be at liberty to be accompanied by two gentlemen whose names must be inserted below.

I am Sir your &c."

উপরোক্তরূপ নিদর্শন পত্রানুসারে আমি আমার জনৈক বন্ধুসহ ১৮৯২ খৃঃ অঃ ৬ই এপ্রিলে গ্রীণ্‌উইচ্‌ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে আমি যে স্থানে বাস করিতেছিলাম তাহার নাম "কিউ;" ইহা লণ্ডনের দক্ষিন পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। কিউ হইতে লণ্ডন হইয়া রেল পথে গ্রীণ্‌উইচ্‌ যাইতে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিক সময় লাগে; অতএব প্রাতঃকালে স্নানাহার সমাপনপূর্ব্বক কিউ হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দশঘটিকার পূর্ব্বে গ্রীণ্‌উইচ্‌ পঁহুছিতে পারা অসম্ভব বোধ হওয়াতে, আমরা অপরাহ্নে মানমন্দির-দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিলাম।

আমার সমভিব্যাহারে একজন ভারতবাসী বন্ধু ও আমার সহপাঠী একজন ইংরেজ বন্ধুর যাইবার কথা ছিল, কিন্তু ইংরেজ বন্ধুটী লণ্ডন আসিয়া বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমার সহিত দেখা করিতে পারিলেন না, অতএব আমার স্বদেশীয় বন্ধুটীই আমার একমাত্র সঙ্গী হইয়াছিলেন।

আমরা যখন গ্রীণ্‌উইচ্‌ ময়দানে উপস্থিত হইলাম তখন একটা বাজিয়া গিয়াছিল; দুইটা পর্য্যন্ত দ্বারোদ্‌ঘাটনার্থ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে বলিয়া আমরা ঐ সুযোগে মানমন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট উদ্যানাদি দর্শন করিয়া সময়াতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মানমন্দিরের বহির্দ্বারের এক পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড ঘড়ীর "মুখ" (Dial face) দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার যন্ত্রাদি সমস্তই প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে রহিয়াছে, কেবলমাত্র মুখটী প্রাচীরেরগায়ে চিত্রিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই ঘড়ীদৃষ্টে সমস্ত ইংলণ্ডের সময় নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ইহার সহিত তাড়িৎযোগে সুবিখ্যাত "Westminister clock"* এর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ ঘড়ী সর্ব্বদা নিয়মিত ও বিশোধিত হইয়া থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ "আদর্শ ঘড়ী" (Standard clock) বলা হয়।

উক্ত "আদর্শঘড়ী" সম্বন্ধে এরূপ একটী গল্প আছে যে একদা দুইজন স্কট্‌লণ্ডবাসী গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন জ্যোতিষানুধ্যায়ী. এবং অপর ব্যক্তি এই প্রথম পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া একেবারে রাজধানীতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা মানমন্দিরের প্রবেশদ্বারে সমাগত হইলে জ্যোতিষী-বন্ধু তাঁহার গ্রাম্যবন্ধুকে উপরোক্ত ঘড়ী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে "ইহাদ্বারা সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে "বিশুদ্ধ সময়" বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।" গ্রাম্যবন্ধু তৎক্ষণাৎ স্বীয় জেবঘড়ী বাহির করিয়া সময় মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি দেখিতে পাইলেন যে "আদর্শ ঘড়ী" তাঁহার ঘড়ী হইতে ৫ মিনিট্‌ কাল "অগ্রে" চলিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় ঘড়ীটী তাঁহার জ্যোতিষী-বন্ধুর নেত্রাগ্রে ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "কোথায় তোমার বিশুদ্ধ সময়? এই দেখ মানমন্দিরের ঘড়ী ৫ মিনিট্‌ অগ্রে চলিতেছে। আমি পূর্ব্বহইতেই জানি জ্যোতির্ব্বিদ্যা সমস্তই ফাঁকি! তোমাদের মতন বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে নাই।" এই বলিয়া তিনি মানমন্দির দর্শনে বিরত হইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। জ্যোতিষী-বন্ধু জেবঘড়ীর অভ্যন্তরস্থ সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতরে তাঁহার গ্রাম্য-বন্ধুর বিশুদ্ধ সময় জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে জ্যোতিষী-বন্ধু গৃহে গিয়া তাঁহার গ্রাম্য-বন্ধুকে "বিশুদ্ধ সময়ের" প্রকৃষ্ট জ্ঞান দান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রাম্যবন্ধু তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া এই উত্তর দিয়াছিলেন যে "তাঁহার ঘডীতে যে সময় থাকে তাহাই তাঁহার বিশুদ্ধ সময়; নতুবা তিনি ঐ ঘড়ীর সময়ানুসারে কার্য্য করিবেন কেন?" †

মানমন্দিরের বহির্দ্বারের বামপার্শ্বে প্রাচীরের গায়ে একটী গজপরিমিত কাষ্ঠদণ্ড সমতলভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ইহার নাম 'The Imperial Yard'। প্রাচীরাভ্য-

* Westminister clock বিশুদ্ধ সময় জ্ঞাপনের জন্য বিখ্যাত; লণ্ডনের যাবতীয় ঘড়ী ইহারদ্বারা নিয়মিত ও বিশোধিত হইয়া পরিচালিত হয়।

† এই উক্তিটী একান্ত রহস্য জনক হইলেও, ইহার ভিতরে "সময়ের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ জ্ঞানের পরিচয়দ্বারা গ্রাম্য-বন্ধুর যেটুকু মহত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা অনেক শিক্ষাভিমানীরও দৃষ্ট হয় না।

স্তর হইতে উত্তাপাদি সংযোগ দ্বারা ইহাকে নিরত এক নির্দ্দিষ্ট পরিমিত দৈর্ঘ্যে স্থাপিত রাখা হইতেছে। সাধারণ ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ ব্যবসায়ীগণ, এই দণ্ড হইতে গজের পরিমাপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

দুইটা বাজিবামাত্র মানমন্দিরের বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে পর আমি আমার বন্ধুসহ তাহাতে প্রবেশ করিলাম। তখন একটী লোক আসিয়া আমার নিদর্শন পত্র চাহিয়া লইল ও পুনরায় ফিরিয়া আমাদিগকে 'আগন্তুকদিগের গৃহে' প্রবিষ্ট করাইল। তথায় একটা টেবিলের উপর লিখিবার সরঞ্জাম ও একটী ভিজিটার্স বুক থাকে; আমাকে তাহাতে নামধামাদি স্বাক্ষর করিতে হইল। তৎপরে একটী অজাতশ্মশ্রু 'বালক' আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া মানমন্দিরের যন্ত্রাদি পরিদর্শন করাইতে লইয়া চলিল। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত বোধ করিতেছি।

যন্ত্রাদির বর্ণনাতে কেবলমাত্র ব্যবহারের অংশটুকু ভিন্ন অপর যাহা কিছু কথিত হইবে তাহা সমস্তই আমার স্বকীয়; অতএব তজ্জন্য কেহ যেন ঐ বালককে দায়ী না করেন। বালক কেবল কেমন করিয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয় তাহা ভিন্ন আমাদিগকে আর কিছুই বলিতে পারে নাই।

আমরা প্রথমতঃ প্রাঙ্গণে বহির্গত হইয়াই 'আদর্শ ঘড়ীর' আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি পরিদর্শন করিলাম। ঐ ঘড়ী একটী প্রকাণ্ড গ্যালভানোমিটার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে; এই যন্ত্রের 'মোড়ক' (Coil) দ্বয় লম্বভাবে স্থাপিত হইয়াছে এবং তদুপরি একখণ্ড লৌহফলক তাহাদের সহিত অসংলগ্ন অবস্থায় চুম্বকশলাকার মত সমান্তরালভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। যখন 'মোড়ক'দ্বয়কে তাড়িতযন্ত্রের (Battery) কেন্দ্রদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহাদের ক্রমানুসারী আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা উপরোক্ত লৌহফলক প্রতিনিয়ত সমভাবে পরিদোলিত হইতে থাকে। লৌহফলকের এই অনাহত পরিদোলন সাধারণ ঘড়ীর 'দোলক' (pendulum) অথবা স্প্রিং ব্যালান্সের কার্য্য করে, অতএব ঘড়ীর চক্রাদি তাহার সহিত সংবদ্ধ হইয়া পরিচালিত হয়। এই যন্ত্রের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা কদাচ কালবশে কিম্বা ঋতুভেদে পরিদোলনের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না, পরন্তু ইহাতে চাবি লাগাইবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব ঐ ঘড়ী নিয়ত সমান ভাবে চলিতেছে; এবং একবার সময় ও চক্রাবর্ত্তনাদি নির্দ্ধারিত করিয়া চালাইয়া দেওয়াতে আর তাহার অগ্র পশ্চাৎ চলনেরও কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না।

ঘড়ী দেখা শেষ করিয়া আমরা প্রথম যে গৃহে প্রবেশ করিলাম তথায় একটী প্রকাণ্ড 'মেরু-চক্র' * নামক যন্ত্র রহিয়াছে। যে সকল নক্ষত্র প্রতিদিন গ্রীণ্‌ উইচের 'যাম্যোত্তর

---

* ইহাকে ইংরেজিতে (Meridian Circle) বলে। এই যন্ত্র সর্ব্বাবস্থাতে 'যাম্যোত্তর-বৃত্তসম'-তলে অবস্থিতি করে এবং শীর্ষ ও মেরু ভেদ করিয়া উক্ত বৃত্তপথে ঘূর্ণিত হয়।

বৃত্ত' (Meridian) অতিক্রমণ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে * যাতায়াত করে, তাহাদের অতিক্রমণ কাল এবং তাৎকালিক অবস্থিতি নির্দ্দেশ করণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 'মেরু-চক্রের' মধ্যভাগে ১৫ ফিট দীর্ঘ এবং এক ফুট ব্যাসযুক্ত একটী প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ রহিয়াছে, ইহার চোঙ্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাস ৯ ইঞ্চ। দূরবীক্ষণের উভয় পার্শ্বে দুইটী সুবৃহৎ চক্র ক্ষিতিজের (Horizon) উপর লম্বভাবে স্থাপিত হইয়া, তাহার সহিত দৃঢ়সংবদ্ধ রহিয়াছে; অতএব দূরবীক্ষণকে 'যাম্যোত্তর বৃত্ত'-সমতলে ঘূর্ণিত করিলে ঐ চক্রদ্বয়ও তাহার সহিত ঘূর্ণিত হয়। চক্রদ্বয়ের পার্শ্বদেশে অংশ, কলা ইত্যাদি বিভাগ পরিজ্ঞাপক রেখাসমূহ রহিয়াছে, তদ্দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থিতি হইতে দূরবীক্ষণের ঊর্দ্ধাধোগমন পরিমাপ করা যাইতে পারে; দূরবীক্ষণের ক্ষিতিজ-সমান্তরাল অবস্থিতি হইতেই সাধারণতঃ তাহার ঊর্দ্ধাধোগতি গণনা করা হয়, অতএব ঐ পরিমাপ দ্বারা তাহার 'উত্থান' (altitude) বা 'পতন' (depression) জ্ঞাত হওয়া যায়। চক্রদ্বয়ের কেন্দ্র ভেদ করিয়া উভয় পার্শ্বে ক্ষিতিজ-সমান্তরাল ভাবে দুইটী দণ্ড প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, ইহারা যন্ত্রের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাহাদের একত্র সমন্বয়কে 'মধ্যদণ্ড' (axis) বলা যায়। চক্রদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে দুইটী বিশাল প্রস্তর স্তম্ভ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া 'মধ্যদণ্ডের' উভয় প্রান্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে; দেখিলে ঠিক মনে হয় যেন ধরিত্রী দুইটী ভীম বাহু প্রসারণ করিয়া 'মেরু-চক্রকে' শূন্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন! স্তম্ভদ্বয়ের মূলদেশে ধরাতল হইতে ৭ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গাঁথিয়া তাহাদিগকে ধরাতলের সহিত অসংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে পর্য্যবেক্ষণকালে কোন কারণে গৃহভিত্তি কম্পিত হইলেও তদ্দ্বারা উক্ত যন্ত্র কম্পিত হইতে পারে না, অতএব তাহা সহজে 'যাম্যোত্তর বৃত্ত'-সমতল হইতে পারে না। এই স্তম্ভদ্বয়োপরি 'মধ্যদণ্ড' এরূপভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে অতি অল্পায়াসেই সর্ব্বাবয়ব সম্বলিত যন্ত্রটা তাহার উপর ঘূর্ণিত হইতে পারে; অতএব ক্ষিতিজের উপরিভাগে যে কোন যাম্যোত্তর বৃত্তাতিক্রমণ কালে তদ্দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। 'মধ্যদণ্ডের' অভ্যন্তর ভাগ শূন্যগর্ভ; এইহেতু তাহার প্রান্তদেশে স্তম্ভের শিরোভাগে আলোক প্রদান করিলে তাহা 'মধ্যদণ্ডের' ভিতর দিয়া দূরবীক্ষণাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং তাহাতে চোঙ্গের অভ্যন্তব আলোকিত হয়।

এবম্বিধ আলোক প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, 'মেরুচক্র' দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ কালে নক্ষত্রকে চোঙ্গের 'কেন্দ্ররেখাতে' ('central' বা optical axis') সংবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু 'কেন্দ্র রেখা' কেবল একটী কল্পিত রেখামাত্র, তাহাকে নেত্র দ্বারা দর্শন করা যাইতে পারে না; পরন্তু ঐ রেখা সর্ব্বতোভাবে দূরবীক্ষণাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় কাচখণ্ডের কেন্দ্র ভেদ করিয়া থাকে; অতএব তাহাদের কেন্দ্র নিরাকরণ করিতে পারিলেই নক্ষত্রকে তৎসংলগ্ন করা

* পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে 'ধ্রুবতারা'র দক্ষিণাংশে 'যাম্যোত্তর বৃত্ত'-সংলগ্ন নক্ষত্রগণ সর্ব্বদা পশ্চিমবাহী এবং তাহার উত্তরাংশে বা অধোভাগে সংলগ্ন নক্ষত্রগণ পূর্ব্ববাহী হইয়া থাকে।

যাইতে পারে। এই কেন্দ্র নিরূপণার্থ চোঙ্গের ভিতরে কয়েক খণ্ড সূত্র পরস্পর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের কোন দুইটী সূত্রের সংযোগ স্থল এমতভাবে নিবদ্ধ করা হয় যেন কাচখণ্ডসমূহের 'কেন্দ্ররেখাতে' নিপতিত হয়। নক্ষত্র যখন 'দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে' আবির্ভূত হয় তখন তাহাকে এই বিন্দুতে সংলগ্ন করিতে হয়। এই সকল সূত্র অন্ধকারে কিম্বা নক্ষত্রালোকে দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়াই উপরোক্ত প্রকারে আলোক প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে প্রতিভাত করা যায়।

'মেরুচক্রের' স্তম্ভদ্বয় ভিত্তির উপর ৫ ফিট উচ্চ; অতএব দূরবীক্ষণকে ইহার উপর সর্ব্বতোভাবে আবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না, কারণ দূরবীক্ষণ ১৫ ফিট দীর্ঘ হওয়াতে 'মধ্যদণ্ডের' উভয় পার্শ্বে তাহা ৭॥ ফিট করিয়া লম্বিত হইয়া থাকে। এই কার্য্যসৌকর্য্যার্থ এবং সময়বিশেষে যন্ত্রকে ঠিক ঊর্দ্ধাধোভাবে স্থাপনার্থ (শীর্ষসন্নিহিত নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণার্থ ইহা অত্যাবশ্যক) স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যভাগে একটী ৪ ফিট গভীর অর্দ্ধচন্দ্রাকার গহ্বর খোদিত হইয়াছে। ইহার নিম্নপ্রদেশে অবতরণ জন্য উভয় পার্শ্বে সোপানশ্রেণী রহিয়াছে; পর্য্যবেক্ষণকালে এই সকল সোপান পর্য্যবেক্ষণকারীর উপবেশনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন শীর্ষস্থ বা তৎসন্নিহিত কোন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয় তখন পর্য্যবেক্ষণকারীকে গহ্বরতলে অবতরণ করিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় উপবেশন করিয়া থাকিতে হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে যন্ত্রটী গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত; অতএব সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা আবর্ত্তিত করিলেও, একমাত্র গৃহদ্বার এবং গবাক্ষ ভিন্ন অন্য কোন পথে কোন নক্ষত্র তদ্দ্বারা অবলোকন করিতে পারা সম্পূর্ণই অসম্ভব। আবার ইহাও ধারণা করা যায় যে গৃহের ঠিক উত্তর ও দক্ষিণভাগে যন্ত্রের সম্মুখে কোন দ্বার কিম্বা গবাক্ষ না থাকিলে ঐ যন্ত্রদ্বারা গগনের কোন নক্ষত্রই দর্শন করা কিছুতেই সম্ভব নহে। অন্যদিকে দৃষ্ট হইবে যে 'মেরুচক্রকে' স্থান বিশেষে চিরস্থায়ীরূপে ও অবিচলিত ভাবে স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক; অতএব তাহার অবস্থিতির ও ভৌতিক উৎপাতাদি নিবৃত্তির জন্য একটী গৃহ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই উভয় সমস্যার যুগপৎ সম্পূরণার্থ উক্ত যন্ত্রগৃহটীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীর এবং ছাদের যে অংশ যন্ত্রমুখে নিপতিত হয় তাহা সমস্ত উন্মোচিত করিয়া গৃহটীকে "আপাদ মস্তক" পূর্ব্বপশ্চিম দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বক্ষণ ঐরূপ উন্মোচিত রাখিলে বায়বীয় উৎপাতে গৃহতল ও তত্রস্থিত যন্ত্রাদির অনিষ্টপাত ঘটিবে বলিয়া তন্নিবারণার্থ উক্ত উন্মুক্তাংশোপরি, প্রাচীর ও ছাদের সহিত সমতল ভাবে, ক্যান্‌ভাস্‌মণ্ডিত কাষ্ঠাবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

যখন পর্য্যবেক্ষণের সময় উপস্থিত হয় তখন যন্ত্রসাহায্যে * ঐ সকল আবরণ অপসৃত করিয়া ক্ষিতিজের উপরিভাগস্থ যাম্যোত্তর বৃত্তার্দ্ধকে দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রগোচর করা হইয়া থাকে।

* এইরূপ আবরণোন্মোচন জন্য যন্ত্রব্যবহার গ্রীণ্‌উইচ্‌ ও কেম্ব্রিজ ভিন্ন ইংলণ্ডে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু শুনা গিয়াছে ফ্রান্স ও জার্ম্মানিতে ইহা সচরাচর দেখা যায়।

'মেরুচক্রের' উভয় পার্শ্বে গৃহভিত্তির যে দুই প্রান্তে প্রাচীর উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের ঠিক সম্মুখ ভাগে দুইটী প্রস্তরস্তম্ভের উপর দুইটী ক্ষুদ্রাকার দূরবীক্ষণ স্থাপিত রহিয়াছে। তাহারা এমত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে 'মেরুচক্রের' দূরবীক্ষণকে ক্ষিতিজের সহিত সমান্তরালভাবে স্থাপন করিলে তাহার 'কেন্দ্ররেখা' উক্ত দূরবীক্ষণদ্বয়ের 'কেন্দ্ররেখার' সহিত একত্র মিলিত হইয়া যায়; অতএব উক্তাবস্থায় তাহাদের মধ্যে কোন একটীর ভিতর দিয়া অবলোকন করিলে মেরুচক্রের অভ্যন্তর দিয়া অপর পার্শ্বস্থ দূরবীক্ষণের 'কেন্দ্ররেখা' সংবদ্ধ যাবতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় নেত্রগোচর করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে 'মেরুচক্রের' দূরবীক্ষণের কেন্দ্র নির্দ্দেশার্থ সূত্রগ্রন্থি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ দ্বয়ের কেন্দ্রতেও ঐরূপ গ্রন্থি নিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। যখন তাহাদের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিলে গ্রন্থিত্রয়কে একত্র সন্নিবিষ্ট নয়ন গোচর করা যায় তখন জানা যায় যে 'মেরুচক্রের' দূরবীক্ষণের গ্রন্থি ঠিক কেন্দ্রস্থ হইয়াছে। প্রতিদিবস পর্য্যবেক্ষণের প্রারম্ভে ও অবসানে ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বয় ব্যবহার পূর্ব্বক উপরোক্ত গ্রন্থির স্থিতি পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। *

এতদ্ভিন্ন ঐ যন্ত্রগৃহে একটী ঘড়ী রহিয়াছে; তাহাতে নিয়ত প্রতি সেকেণ্ডের অর্দ্ধমিত কাল শব্দিত হইতেছে। ইহার সময় জ্ঞাপন এত বিশুদ্ধ যে এক বৎসরান্তেও প্রকৃত কালের সহিত ইহা কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত কালের কয়েক সেকেণ্ডেরও অন্তর ঘটিতে দেখা যায় না। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে গণনারম্ভ করিলে, অতঃপর নেত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মাত্র কর্ণদ্বারা অর্দ্ধসেকেণ্ডের ধ্বনি গণনা করিয়াই সহজে সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। অতএব কোন সময় পর্য্যবেক্ষণকারী একাকী ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও নেত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও কর্ণদ্বারা তাহার সময় নিরূপণ করিতে সমর্থ হন।

'মেরুচক্রের' প্রধান কার্য্য গণিতফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের ঐক্যসাধন করা; গণনাদ্বারা কোন নক্ষত্রের 'যাম্যোত্তরবৃত্তাতিক্রমণ' কাল নির্দ্ধারিত হইলে ও তাহার তাৎকালিক স্থিতি বিজ্ঞাপিত হইলে পর, ঐ যন্ত্রকে উক্ত স্থান নির্দ্দেশে স্থাপন করিয়া, ঐ নির্দ্দিষ্টকালে উক্ত নক্ষত্র যন্ত্রক্ষেত্রের কেন্দ্রে সমাগত হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা; এবং তাহা স্থিরনিশ্চিত না হইলে প্রত্যক্ষতঃ তাহার অতিক্রমণকাল ও স্থিতি নির্ব্বাচণ করতঃ গণিত সহিত তাহার অন্তর সাধন করা ও তাহার কারণ নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহা গণনপ্রণালীতে প্রয়োগ করা, এই সমস্তই মেরুচক্রের কার্য্য এবংতদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য! এতদ্ভিন্ন কোন অপূর্ব্বজ্ঞাত নক্ষত্র সহসা দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলে বহুকালব্যাপী দৈনন্দিন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহার কাল ও স্থিতি নির্দ্ধারণ কার্য্যও 'মেরুচক্র' দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

এস্থলে পাঠকবর্গকে একটীমাত্র কল্পনা উপহার দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব;—এই

---

* সকল মানমন্দিরে 'গ্রন্থিস্থ' স্থিতি নিরূপণজন্য এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করা হয় না। কেম্ব্রিজ মানমন্দিরে দূরবীক্ষণের ঠিক অধোভাগে একটী পারদের 'কূপ' প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

প্রকার এক একটী যন্ত্রের বর্ণনা লইয়া একএকটী প্রবন্ধ ব্যাপৃত থাকিবে—কল্পনাটী এই ;—

পাঠক মনে করুন যেন একটী নক্ষত্র শীর্ষব্যপদেশে যাম্যোত্তরবৃত্ত অতিক্রমণ করিতেছে, এবং তিনি স্বয়ং তাহা পর্য্যবেক্ষণার্থ 'মেরুচক্রের' তলদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গহ্বরে অর্দ্ধশয়নে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার বক্ষোপরিভাগে ১৫ ফিট দীর্ঘ ও ১ ফুট ব্যাসযুক্ত একটী গলিত লৌহমুদ্গররূপী ভীষণ দূরবীক্ষণ লম্বিত ভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে, ইহা যে কোন মুহূর্ত্তে পর্য্যবেক্ষণকারীর হস্তচালনার সামান্য অসতর্কতাতে স্থানচ্যুত হইতে পারে, এবং উত্থিত যমদণ্ডের ন্যায় বক্ষে নিপতিত হইয়া তাঁহার অস্থি মাংসাদি সমন্বিত দেহটীকে নিষ্পেষিত ও কর্দ্দমে পর্য্যবসিত করিতে পারে! কিন্তু তাঁহার সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহা ধারণা করিবারও অবসর নাই; তাঁহাকে যন্ত্রাভ্যন্তরে নেত্রসংযোগ করিয়া রাখিতে হইতেছে, যন্ত্রটীকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া রাখিতে হইতেছে, এবং সমস্ত মনঃসংযোগপূর্ব্বক দ্রষ্টব্য বস্তুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে! মনে করুণ অভিলষিত বস্তুর সমাগম হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে পর্য্যবেক্ষণকারীর মানসিক অবস্থার যুগপৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল, (কিন্তু শারীরিক ও বাহ্যিক অবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সাধ্য নাই; কারণ তাহা হইলে সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়, সমস্ত আশা সমূলে নির্ম্মূলিত হয়, যাহার প্রতীক্ষায় এত আয়োজন কেবল যে তাহাকেই হারাইতে হইবে এমত নহে, সম্ভবতঃ দেহকেও নির্ম্মূলিত করিতে হইবে!!!) এই দৈব মুহূর্ত্তে পর্য্যবেক্ষণকারীকে কেবলমাত্র শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় লইয়া সজীব থাকিতে হইবে, একই সমকালে তাঁহাকে একদিকে কর্ণসংযোগদ্বারা ঘড়ীর টিক্‌টিক্‌ধ্বনি শ্রবণ করতঃ পর্য্যবেক্ষণের কাল নিরূপণ করিতে হইবে অপরদিকে যন্ত্রে নেত্রসংযোগদ্বারা নক্ষত্রের স্থিতি অবলোকন করিতে হইবে! অদূরে একটী টেবিলের পার্শ্বে জনৈক মসীপুচ্ছধারী বসিয়া রহিয়াছেন, পর্য্যবেক্ষণকারী এক নিশ্বাসে তিনটী শব্দ উচ্চারণ করিবেন, এবং উক্ত উপবিষ্ট ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তে তাহা নক্ষত্রের কাল ও স্থিতিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া লইবেন।

এইরূপে একাদিক্রমে কত নক্ষত্র প্রতিরজনীতে পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে, এবং রজনীর পর রজনী এইভাবে যাপিত হইতেছে! রজনীতে পর্য্যবেক্ষণ ও দিবসে তাহার ফল গণনাতে নিবিষ্ট করিয়া তাহা হইতে নক্ষত্রের স্বরূপ নির্দ্দেশ, ইহাই জ্যোতিষীর জীবনের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য!! এই ভাবে জীবন যাপন করিয়া এবং এইরূপ অবধানতার সহিত কার্য্য করিয়া জ্যোতিষী যে কাম্যফল লাভ করেন তাহাই ভাষার সুললিত গ্রন্থিতে সন্নিবিষ্ট হইয়া জগতে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহাই আলোচনা সমালোচনা ও পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার অন্তর্বিশ্লেষণপূর্ব্বক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া থাকি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

কর্ণপ্রয়াগ।

২২ মে, শুক্রবার—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হ'লে প্রয়াগ হয় না; কর্ণপ্রয়াগেও দুই নদী সঙ্গম হয়েছে, একটি অলকনন্দা অপরটি কর্ণ-গঙ্গা। কর্ণগঙ্গাকে ঠিক নদী বলা যায় না, একটা বড়রকমের বেগবতী ঝরণামাত্র। এখানে নদীর মত স্রোত ব'য়ে জল আসে না; নদী পরিসর দেড়শ হাত কি কিছু বেশী হবে, কিন্তু তার অনেক যায়গাই শুকিয়ে গিয়েছে, যেখানে সাঁকো তৈয়েরী হয়েছে তারই নীচে ছটা বড় বড় জলধারা। পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হ'লে হু হু শব্দে জল নেমে সমস্তটা ডুবে যায়। এই নদীর নাম কর্ণগঙ্গা কেন হ'লো তার একট সন্তোষজনক' কৈফিয়ৎ এখানকার পাণ্ডাদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়। মহাবীর কর্ণ কিছুকাল এখানে তপস্যা করেন; মধ্যে একদিন তাঁর প্রয়াগে অবগাহনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং কিরূপে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় সেই চিন্তাতেই তিনি কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু তপোবলে তিনি দেবতাদের এতই সন্তুষ্ট করে রেখেছিলেন যে প্রয়াগে স্নান করবার জন্যে তাঁকে আর কোথাও যেতে হলো না। পতিতপাবনী গঙ্গা সেখানেই এসে অলকনন্দার সঙ্গে মিশ্‌লেন, কর্ণের ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে প্রয়াগ হলো; কর্ণজী সেই সঙ্গমস্থলে স্নান করে দেহ শীতল ও পবিত্র কল্লেন। সেই হতে এ নদীর নাম কর্ণগঙ্গা হয়েছে। পর্ব্বত বাসী সরলচেতা বিশ্বস্তহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন এই পুরাণ কাহিনী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাছে বিবৃত কল্লে তখন এমন একটা ভক্তি ও নির্ভরের ভাবে তার উদার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল যে তাতে আমার মনেও খুব আনন্দ হলো। শেষে গল্পের উপসংহার কালে যখন বল্লে "বাবুজি, এই সা কাম ভগবান ভকত্ কি ওয়াস্তে হরওয়াকৎ ভি করতেহেঁ" এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কল্লে, তখন বোধহল বুঝি ব্রাহ্মণ একালের অভক্তি ও বিশ্বাসহীনতা মনে করেই খানিকটে হতাশ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই "এই সা কাম ভগবান ভকৃত কি ওয়াস্তে হরওয়াকৎ ভি করতে হেঁ"—এটা তার প্রাণের কথা; যুক্তি ও তর্কের জঞ্জাল হ'তে অনেক দূরে থেকে, এইরকম এক একটা কথার উপর নির্ভর ক'রে এরা মনে কত শান্তি উপভোগ করে! আমাদের সরল বিশ্বাস টুকু অন্তর্হিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনের শান্তি টুকুও হারিয়েছি।

আজ কর্ণপ্রয়াগে অবস্থান করা যাবে স্থির করা গেল। বাজারের মধ্যে একটা দোকান ঘরের উপর তালায় আমরা বাসা নিলুম। বাজারে দোকান খুব বেশী নয়, তবে মোটামুটি জিনিষ এখানে প্রায় সকল রকমই পাওয়া যায়, এমনকি একখানা দোকানে ছানার মুড়কিও পাওয়া গেল। দোকানগুলি সমস্তই পাহাড়ের গায়ে, আমরা যে দোকানে বাসা নিয়ে ছিলুম তার ভিতরের দিক হতে মাথার উপর পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর কোঠাবাড়ী

দেখ্‌লেম, বাড়ীটি বেশ প‘রিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল এবুঝি কোন ইংরেজের বাসস্থান, কিন্তু পরে জান্‌তে পাল্লুম এটা "দাতব্য চিকিৎসালয়"। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তার খানা তৈয়েরী ক'রে দিয়েছেন, এতে যে কত যাত্রীর কত উপকার হয় তার সংখ্যা নেই। ডাক্তারখানা বার মাসই খোলা থাকে, কিন্তু বছরের সকল সময় এখানে রোগী দেখা যায় না, তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এই সময়ই কিছু বেশী রোগীর আমদানী হয়। একবার ডাক্তার খানা দেখ্‌তে যাব ইচ্ছে কল্লুম কিন্তু সকালে আর ঘটে উঠ্‌ল না; চাকরটাকে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম, খানিক পরে সে কয়েকটা কুইনাইনের বড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

আমাদের দেশ হ'তে বদরিকাশ্রম যেতে হ'লে হরিদ্বারের পথে কেঁউ চলে না। বাঙ্গালা-বিহার কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার লোক এখন অন্য একটা ভাল রাস্তা পেয়েছে। হাওড়া হতে যে গাড়ী দিল্লী যায় সেই গাড়ীতে চ'ড়ে কাশীর যাত্রীদের আগে মোগল সরাই নামতে হ'তো, সেখান হ'তে গঙ্গাপার হলেই কাশী। এখন আর মোগল সরাই নেমে নৌকায় গঙ্গা পার হ'য়ে কাশী দর্শন কর্ত্তে হয় না; অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলোয়ে মোগলসরাই হ'তে বের হয়েছে, এবং কাশীর নীচে প্রকাণ্ড পুল হয়েছে তাই পার হয়ে রাজঘাট ষ্টেসনে নেমে গাড়ী বা নৌকায় লোকে কাশী যায়, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেখান হতে প্রায় এক মাইল হবে। তার পরেই "বেনারস সিটী ষ্টেসন," আফিস আদালত সাহেব পাড়া সমস্তই সিকরোলের কাছে; এই সিকরোলের ভিতর দিয়ে অযোধ্যা রোহিল খণ্ড রেলোয়ে বরাবর চলে গিয়েছে এবং অযোধ্যাপার হ'য়ে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একেবারে সাহারাণপুরে গিয়ে উত্তর পশ্চিম রেলোয়ের সঙ্গে মিশেছে। এই অযোধ্যা রোহিল খণ্ড রেলোয়েতে বেরেলী একটা বড় ষ্টেসন; বেরেলী হতে কাটগুদাম পর্য্যন্ত সোজা উত্তরে একটা শাখা রেলোয়ে আছে। কাটগুদামে নেবে আল্‌মোড়ার মধ্যে দিয়ে একটা হাঁটা পথ পাওয়া যায়, এ পথটাও মন্দ নয়। এই পথ দিয়ে চ'লে এসে কর্ণপ্রয়াগে বদরিনারায়ণের রাস্তায় পড়তে হয়। এখান হতে যারা পরিভ্রমণ করবে অর্থাৎ প্রথমে কেদার নাথ দর্শন ক'রে তার পর বদরিকাশ্রমে যাবে তারা কর্ণপ্রয়াগ হ'তে নীচে নেবে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যায় এবং সেখান হতে কেদারের পথে চ'লে যায়; কেদার দর্শন ক'র আর সে পথে ফেরে না। সেই জায়গা হ'তে আর একটা পথ এ'সে লালসাঙ্গা নামক একটা যায়গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। যারা এ পথ ধ'রে যায় তাদের শ্রীনগর কি দেবপ্রয়াগ দেখা হয় না।

আমরা কর্ণপ্রয়াগের সাঁকো পার হয়ে অপর পারে সঙ্গমস্থানে স্নান কল্লুম। শীতের ভয়ে রাস্তায় আমি স্নানকে যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করেছিলুম, কিন্তু এখানে এসে যদি নিদেন একটা ডুবও না দিয়ে এ যায়গাটা ছেড়ে যাই তা হ'লে কাজটা বড়ই খারাপ দেখাবে, আর যাই হোক যমের কাছে ন্যায়সঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবোনা, অত-

কর্ণপ্রয়াগ।

২২ মে, শুক্রবার—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হ'লে প্রয়াগ হয় না; কর্ণপ্রয়াগেও দুই নদীর সঙ্গম হয়েছে, একটি অলকনন্দা অপরটি কর্ণ-গঙ্গা। কর্ণগঙ্গাকে ঠিক নদী বলা যায় না, এ একটা বড়রকমের বেগবতী ঝরণামাত্র। এখানে নদীর মত স্রোত ব'য়ে জল আসে না; নদীর পরিসর দেড়শ হাত কি কিছু বেশী হবে, কিন্তু তার অনেক যায়গাই শুকিয়ে গিয়েছে, যেখানে সাঁকো তৈয়েরী হয়েছে তারই নীচে ছটা বড় বড় জলধারা। পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হ'লে হু হু শব্দে জল নেমে সমস্তটা ডুবে যায়। এই নদীর নাম কর্ণগঙ্গা কেন হ'লো তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এখানকার পাণ্ডাদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়। মহাবীর কর্ণ কিছুকাল এখানে তপস্তা করেন; মধ্যে একদিন তাঁর প্রয়াগে অবগাহনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং কিরূপে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় সেই চিন্তাতেই তিনি কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু তপোবলে তিনি দেবতাদের এতই সন্তুষ্ট করে রেখেছিলেন যে প্রয়াগে স্নান করবার জন্যে তাঁকে আর কোথাও যেতে হলো না। পতিতপাবনী গঙ্গা সেখানেই এসে অলকনন্দার সঙ্গে মিশ্‌লেন, কর্ণের ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে প্রয়াগ হলো; কর্ণজী সেই সঙ্গমস্থলে স্নান করে দেহ শীতল ও পবিত্র কল্লেন। সেই হতে এ নদীর নাম কর্ণগঙ্গা হয়েছে। পর্ব্বত বাসী সরলচেতা বিশ্বস্তহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন এই পুরাণ কাহিনী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাছে বিবৃত কল্লে তখন এমন একটা ভক্তি ও নির্ভরের ভাবে তার উদার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল যে তাতে আমার মনেও খুব আনন্দ হলো। শেষে গল্পের উপসংহার কালে যখন বল্লে "বাবুজি, এই সা কাম ভগবান ভকত্ কি ওয়াস্তে হরওয়াকৎ ভি করতেহেঁ" এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কল্লে, তখন বোধহল বুঝি ব্রাহ্মণ একালের অভক্তি ও বিশ্বাসহীনতা মনে করেই খানিকটে হতাশ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই "এই সা কাম ভগবান ভক্‌ত কি ওয়াস্তে হরওয়াকৎ ভি করতে হেঁ"—এটা তার প্রাণের কথা; যুক্তি ও তর্কের জঞ্জাল হ'তে অনেক দূরে থেকে, এইরকম এক একটা কথার উপর নির্ভর ক'রে এরা মনে কত শান্তি উপভোগ করে! আমাদের সরল বিশ্বাস টুকু অন্তর্হিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনের শান্তি টুকুও হারিয়েছি।

আজ কর্ণপ্রয়াগে অবস্থান করা যাবে স্থির করা গেল। বাজারের মধ্যে একটা দোকান ঘরের উপর তালায় আমরা বাসা নিলুম। বাজারে দোকান খুব বেশী নয়, তবে মোটামুটি জিনিষ এখানে প্রায় সকল রকমই পাওয়া যায়, এমনকি একখানা দোকানে ছানার মুড়কিও পাওয়া গেল। দোকানগুলি সমস্তই পাহাড়ের গায়ে, আমরা যে দোকানে বাসা নিয়ে ছিলুম তার ভিতরের দিক হতে মাথার উপর পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর কোঠাবাড়ী

দেখ্‌লেম, বাড়ীটি বেশ প’রিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল এবুঝি কোন ইংরেজের বাসস্থান, কিন্তু পরে জান্‌তে পাল্লুম এটা “দাতব্য চিকিৎসালয়”। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তার খানা তৈয়েরী ক’রে দিয়েছেন, এতে যে কত যাত্রীর কত উপকার হয় তার সংখ্যা নেই। ডাক্তারখানা বার মাসই খোলা থাকে, কিন্তু বছরের সকল সময় এখানে রোগী দেখা যায় না, তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এই সময়ই কিছু বেশী রোগীর আমদানী হয়। একবার ডাক্তার খানা দেখ্‌তে যাব ইচ্ছে কল্লুম কিন্তু সকালে আর ঘটে উঠ্‌ল না; চাকরটাকে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম, খানিক পরে সে কয়েকটা কুইনাইনের বড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

আমাদের দেশ হ’তে বদরিকাশ্রম যেতে হ’লে হরিদ্বারের পথে কেঁউ চলে না। বাঙ্গালা-বিহার কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার লোক এখন অন্য একটা ভাল রাস্তা পেয়েছে। হাওড়া হতে যে গাড়ী দিল্লী যায় সেই গাড়ীতে চ’ড়ে কাশীর যাত্রীদের আগে মোগল সরাই নামতে হ’তো, সেখান হ’তে গঙ্গাপার হলেই কাশী। এখন আর মোগল সরাই নেমে নৌকায় গঙ্গা পার হ’য়ে কাশী দর্শন কর্ত্তে হয় না; অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলোয়ে মোগলসরাই হ’তে বের হয়েছে, এবং কাশীর নীচে প্রকাণ্ড পুল হয়েছে তাই পার হয়ে রাজঘাট ষ্টেসনে নেমে গাড়ী বা নৌকায় লোকে কাশী যায়, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেখান হতে প্রায় এক মাইল হবে। তার পরেই “বেনারস সিটী ষ্টেসন,” আফিস আদালত সাহেব পাড়া সমস্তই সিকরোলের কাছে; এই সিকরোলের ভিতর দিয়ে অযোধ্যা রোহিল খণ্ড রেলোয়ে বরাবর চলে গিয়েছে এবং অযোধ্যাপার হ’য়ে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একেবারে সাহারাণপুরে গিয়ে উত্তর পশ্চিম রেলোয়ের সঙ্গে মিশেছে। এই অযোধ্যা রোহিল খণ্ড রেলোয়েতে বেরেলী একটা বড় ষ্টেসন; বেরেলী হতে কাটগুদাম পর্য্যন্ত সোজা উত্তরে একটা শাখা রেলোয়ে আছে। কাটগুদামে নেবে আল্‌মোড়ার মধ্যে দিয়ে একটা হাঁটা পথ পাওয়া যায়, এ পথটাও মন্দ নয়। এই পথ দিয়ে চ’লে এসে কর্ণপ্রয়াগে বদরিনারায়ণের রাস্তায় পড়তে হয়। এখান হতে যারা পরিভ্রমণ করবে অর্থাৎ প্রথমে কেদার নাথ দর্শন ক’রে তার পর বদরিকাশ্রমে যাবে তারা কর্ণপ্রয়াগ হ’তে নীচে নেবে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যায় এবং সেখান হতে কেদারের পথে চ’লে যায়; কেদার দর্শন ক’র আর সে পথে ফেরে না। সেই জায়গা হ’তে আর একটা পথ এ’সে লালসাঙ্গা নামক একটা যায়গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। যারা এ পথ ধ’রে যায় তাদের শ্রীনগর কি দেবপ্রয়াগ দেখা হয় না।

আমরা কর্ণপ্রয়াগের সাঁকো পার হয়ে অপর পারে সঙ্গমস্থানে স্নান কল্লুম। শীতের ভয়ে রাস্তায় আমি স্নানকে যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করেছিলুম, কিন্তু এখানে এসে যদি নিদেন একটা ডুবও না দিয়ে ঐ যায়গাটা ছেড়ে যাই তা হ’লে কাজটা বড়ই খারাপ দেখাবে, আর যাই হোক যমের কাছে ন্যায়সঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবোনা, অত-

এব অনেক আয়োজনের পর স্নান করা গেল। জল বিশ্রী ঠাণ্ডা, তবু এখন জ্যৈষ্ঠমাস শীত কালে কি অবস্থা হয় তা কল্পনাতেও ঠাহর হয় না।

সঙ্গমস্থলের উপরেই কর্ণবীরের এক প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির। মহাবীর কর্ণ দ্বাপরের লোক, অন্ততঃতাঁর ক্রিয়া কাণ্ড দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলেই ঘটে ছিল, কিন্তু তাঁর এই মন্দিরটি সত্যযুগের চেয়ে আধুনিক ব'লে বোধ হ'লো না। এপর্য্যন্ত যে সমস্ত পতনোন্মুখ জীর্ণ মন্দির দেখিছি তার কোনটার যে কেউ সংস্কার করাবে সে আশা কিছুমাত্র নেই, সুতরাং সেই সমস্ত মন্দিরের অধিকাংশই দু পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূমিসাৎ হবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায়; এই কর্ণের মন্দিরেও সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিন্তু এর স্থায়িত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাস; তিনি বল্লেন যে তাঁর বাল্যকাল হ'তে মন্দিরের এই অবস্থা দেখে আস্‌চেন, কিন্তু যেখানে যতটুকু ফাটা ছিল এই দীর্ঘকালে তার আধইঞ্চিও বেশী :বাড়ে নি। মন্দিরটি পাথরের, চৌকাটও পাথরের কিন্তু দ্বার লোহার। মন্দিরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা ঝুলান আছে, সেই ঘণ্টা নেড়ে যাত্রীদের ভিতরে যেতে হয়। ভিতরে যেতে হ'লে ঘণ্টা নাড়া যদি অবশ্যকর্ত্তব্য হয়, তাহলে আমি আমার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত যকৃৎ প্লীহাধারী বঙ্গীয় ভ্রাতাদের সাবধান কচ্ছি তাঁরা যেন এখানে এই মন্দিরে প্রবেশ করবার দুঃসাহস প্রকাশ না করেন। যাহোক আমি বহুকষ্টে মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তে সক্ষম হয়েছিলুম; মন্দিরের মধ্যে মহাবীর কর্ণ ও তাঁর মহিষীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। মূর্ত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত খুব পুরাণ এবং তাতে কারিকরের ভাস্করবিদ্যার দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বহুমূল্য অলঙ্কারাদি কিছুই নেই, শুনাগেল পূর্ব্বে ছিল, নেপাল যুদ্ধের সময় তা অপহৃত হয়েছে। বীরবরের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়; যাত্রীদের কাছ হতে যা কিছু পাওয়া যায় তারই উপর তাঁকে এবং তাঁর পুরোহিতকে নির্ভর কর্ত্তে হয়। যাত্রীরা অনেকে সঙ্গম স্থলে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে, তাতে পুরোহিত ঠাকুরের অল্প কিঞ্চিৎ লাভ হয়।

কর্ণপ্রয়াগে অধিবাসীর সংখ্যা বেশী নয়। সকলেই বড় গরীব, অতি কষ্টে দিনপাত করে। আমাদের দেশের আউট পোষ্টের মত এখানে একটা ছোট থানা আছে, থানায় একজন হেড কনষ্টেবল ও চার পাঁচ জন কনষ্টেবল আছে, কনষ্টেবলেরা রাত্রে চৌকী দেয়। আমাদের দেশের কনেষ্টবল ও এখানকার কনষ্টেবলে কিছু তফাৎ দেখলুম না; আমাদের দেশের প্রভুদের মত এরাও শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন ক'রে থাকে, এবং দু পয়সা লাভের আশায় একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ কর্ত্তে কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করে না। এখানকার কনষ্টেবলদের যেরকম মেজাজ দেখা গেল তাতে তারা যে কষ্টস্বীকার ক'রে প্রতি রাত্রে চৌকী দেয় এমন বোধ হলো না, তবে আমরা এখানে যে দুরাত্রি ছিলুম সে দুরাত্রেই এদের হাঁক দুতিন বার করে শুনেছিলুম। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করে মনে করবেন না যে তারা আমাদের চোর বিবেচনা করে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, তারা যদি সেই সিদ্ধান্ত করে এরকম সতর্ক হত ত তাদের প্রশংসা করবার কারণ ছিল, কিন্তু তারা এতখানি

সতর্ক হয়েছিল তার কারণ সেদিন ঐ বিভাগের পুলিশ ইনস্‌পেক্টর পরিদর্শন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে একটু কার্য্যপটুতা দেখান এরা অনাবশ্যক বলে মনে করে নি।

অপরাহ্নে একাকীই ডাক্তারখানা দেখ্‌তে গেলুম। ডাক্তারটি নূতন লোক, সবে তিন দিন হলো সেখানে এসেছেন, এই অশিক্ষিত লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাঁর দিন যে কেমন করে কাটবে তা আমি ঠিক করে উঠ্‌তে পাল্লুম না, এই তিনদিন একা থেকে বোধ হল তিনিও খানিকটা দমে গিয়েছেন; তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাকে মহাসমাদরে গ্রহণ কল্লেন। দুই একটা কথাতেই বুঝলুম লোকটি বড় বিনয়ী। ডাক্তার বাবুর বয়স ত্রিশবৎসরের ও কম বলে বোধ হলো, এঁর বাড়ী মুরাদাবাদের কাছে একটি গ্রামে, লাহোর মেডিকেল স্কুল হতে ডাক্তারী পাশ করেছেন, আজ ছয় সাত বছর গবর্ণমেণ্টের চাকরী ক'চ্ছেন। ইংরেজী বেশ ভাল না জান্‌লেও কথাবার্ত্তা চলন সই রকম বল্‌তে পারেন, আমার সঙ্গে অনেক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজীতেই আলাপ কল্লেন, শেষে যখন আমার মুখে শুনলেন যে আমি অনেকদিন হতে পশ্চিমাঞ্চলে আছি তখন ইংরেজী ছেড়ে হিন্দুস্থানীতে কথা বলা আরম্ভ কল্লেন।

খানিক পরে তাঁর সঙ্গে হাঁসপাতাল দেখ্‌তে গেলুম, সেদিন সেখানে দশবারোজন রোগী ছিল, তার মধ্যে একজনও বাঙ্গালী দেখা গেল না। রোগীদের উপর ডাক্তার বাবুর বেশ যত্ন, শুধু কর্ত্তব্য বলে তাঁর যত্ন বোধ হলো না, বাস্তবিকই তাদের জন্যে তাঁর একটু প্রাণের আগ্রহ দেখা গেল। হাঁসপাতাল দেখা হলে পুনর্ব্বার তাঁর বিশ্রাম কক্ষে এসে বসলুম। তাঁর টেবিলের উপর তিন চারখানা খবরের কাগজ দেখ্‌লুম, তার মধ্যে লাহোরের Tribune এবং কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল; অনেকদিন পরে অমৃতবাজার হাতে পড়ায় মনে বড় আনন্দো হলো, এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যেও অমৃতবাজার আসে, আমাদের দেশের কাগজের এরকম বিস্তৃতি লক্ষ্য করে মনের মধ্যে একটু অহঙ্কারও জন্মালো। অমৃতবাজার সম্পাদক মহাশয়ের উপর ডাক্তার বাবুর গভীর ভক্তি, তিনি তাঁকে এতদূর উচ্চ মনে করেন যে অনায়াসে আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "Is there any like of him in Bengal"? আমি উত্তরে তাঁকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বল্লুম। সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তিনি লাহোরে একবার শুনেছিলেন, তাঁকে "Prophet of India" বলে উল্লেখ কল্লেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন আমি যে সুরেন্দ্র বাবুর নাম কল্লুম তিনি সেই বক্তা সুরেন্দ্রবাবু কি না। আমি উত্তর দিলে তিনি বল্লেন সুরেন্দ্রবাবু যে সম্বাদপত্রের সম্পাদক তা তিনি ইতিপূর্ব্বে জান্‌তেন না। যাহোক আমার কাছ হতে তিনি বেঙ্গলী ও মিররের ঠিকানা লিখে নিলেন এবং বল্লেন তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে বদলী হবেন, সেখানে গিয়েই এই পত্রিকা দুখানা নেবেন।

আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় আর একটি ভদ্রযুবক এখানে উপস্থিত হ'লেন, ডাক্তার বাবু তাঁকে সমাদরে গ্রহণ ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনিই

পূর্ব্ব কথিত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। এঁর বাড়ী অম্বালায়, লাহোর কালেজে বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছিলেন; কথাবার্ত্তায় যতদূর বুঝলুম, দেখলুম লোকটার বেশ পড়াশুনা আছে। আমার মত একজন ইংরেজী জানা 'ইয়ংম্যান' তীর্থভ্রমণে এসেছে শুনে তিনি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। 'সন্ন্যাসী চোর নয় বোঁচকায় ঘটায়'—এ প্রবচনটা আমার পক্ষে বেশ খেটে গেল। তিনি পুলিশের লোক সুতরাং যে কথাটার সহজ অর্থ হয় তিনি তার কূটার্থ টেনে আনবেন এ আর আশ্চর্য্য কি?—তিনি সিদ্ধান্ত কল্লেন যে আমি নিশ্চয়ই কোন "পোলিটিক্যাল অবজেকট" নিয়ে বের হয়েছি, এমন কি আমার "অবজেকট"টা কি তাও জানবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু বলা বাহুল্য কৃতকার্য্য হতে পাল্লেন না, তবে সে আমার দোষে কি তাঁর দোষে তা নিশ্চয় বলা যায় না। আমি কিন্তু তাঁকে যৎপরোনাস্তি আয়াসের সঙ্গে বুঝাতে চেষ্টা কল্লুম যে সেই জনহীন পাহাড়ের মধ্যে আমার মত একজন দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দ্বারা কোন 'পলিটীক্যাল অবজেক্ট'ই সাধিত হতে পারে না। অবশেষে তিনি বল্লেন "I can not bring myself to belive that a man of culture like you has been taking so much trouble to go to see a shrine." আমি কি শুধু ভাঙ্গা মন্দিরে কতকগুলি বহু পুরাতন, জীর্ণ দেবমূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যে, অনাহারে, অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?—এরা কি আমার কঙ্কালসার হৃদয়ের গভীর বেদনা নিবারণ কর্ত্তে পারে? পার্ব্বত্য প্রদেশের এই নগ্ন সৌন্দর্য্য, মুক্ত প্রকৃতির এই বিচিত্র দৃশ্য, খরতোয়া, বঙ্কিম গিরিনদীর রজত প্রবাহ এবং সুশীতল সমীরণের অবারিত হিল্লোল, এরাই যে আমার জীবনের উপাস্যদেবতা ইনস্পেক্টর তা বুঝতেই পাল্লেন না।

যাহোক ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও অনেক কথা হো'ল; ক্রমে বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্ট, আইরিশ হোমরুল এবং জাতীয় মহাসমিতি হ'তে আরম্ভ ক'রে আমাদের প্লীহা বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সাহেবদের ঘুঁসির নৈকট্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আলোচনা করা গেল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু সেই দিনই চ'লে যাবেন, তিনি তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে গেলেন এবং বল্লেন যদি রাস্তায় কোথাও কোন অসুবিধা হয় এবং কোনখানে থানাওয়ালারা কোন যাত্রীর উপর অত্যাচার করে তা হ'লে আমি যেন অবিলম্বে তাঁকে সে কথা জানাই। তাঁকে এ সমস্ত কথা জানালে তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন এবং প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা করবেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবুর ভদ্রতায় আমি খুব আনন্দ-বোধ কল্লুম।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু চ'লে গেলে আমিও উঠ্‌বার যোগাড় কল্লুম, কিন্তু ডাক্তার বাবু আমার জন্যে প্রচুর জলযোগের আয়োজন করেছিলেন; সুতরাং তাঁকে একটু বাধিত করা দরকার হলো। তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি আমার সঙ্গে কতকগুলি কুইনাইনের বড়ী, আমাশয়ের বড়ী প্রভৃতি তিন চার রকম দরকারী ঔষধ দিলেন। আমার নিজের কিছুই দরকার ছিল না, সে কথা তাঁকে ব'ল্লে তিনি উত্তর দিলেন যে সেগুলি সঙ্গে থাক্‌লে অন্ততঃ রাস্তাতেও কোন কোন পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা হবে। এর পর আর কোন

কথা নেই। আমি তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে ঔষধগুলি নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম, তখন অপরাহ্ণ ৫টা।

বাসায় এসে দেখি সকলেই যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। আজই আমাদের নন্দপ্রয়াগের পথে খানিকটে অগ্রসর হয়ে থাকা দরকার কারণ আগামী কাল চন্দ্র গ্রহণ, গ্রহণের ন্যায় শুভদিনে রাস্তায় কোন চটিতে না পড়ে থেকে একেবারে নন্দপ্রয়াগে পৌঁছতে সকলেই ব্যস্ত। সঙ্গীদ্বয় যদি এ অভিপ্রায় কিছুক্ষণ আগে ব্যক্ত কত্তেন তা হলে অনায়াসে আরো দুঘণ্টা আগে বের হওয়া যেত। যাহোক সেই অপরাহ্নেই কর্ণপ্রয়াগ ছেড়ে চল্‌তে আরম্ভ কল্লুম। বৈকালে বেশী পথ চলা যায় না, তার উপর পথ খুব খারাপ, পর পর শুধু চড়াই আর উতরাই। কাজেই সন্ধ্যা লাগ্‌তে লাগ্‌তে কর্ণপ্রয়াগ হতে তিন মাইলের বেশী যেতে পারিনি; যেখানে এসে সন্ধ্যা লাগলো সে যায়গাটার নাম কাল্‌কা চটি।

আমরা কাল্‌কা চটীতেই রাত্রি কাটাব স্থির কল্লুম। এই চটীতে একখান মাত্র ঘর, তবে ঘরখানা একটু বড় এই যা কথা। ঘর পাতাদিয়ে ছাওয়া, চারিদিকে কোন বেড়া নেই। চটিওয়ালা বড় ভাল মানুষ, দোকানদার হলেও তার ব্যবহার বেশ সুন্দর। এদেশের চটীওয়ালারা ঘর ভাড়া নেয়না, অধিকন্তু যাত্রীদের থালা, ঘটি, কড়াই প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে। প্রত্যেক চটিওয়ালার দোকানেই এ রকম সাত আট প্রস্থ জিনিষ থাকে। রাস্তা যে রকম দুর্গম, তাতে নিজের শরীরকেই সময় সময় নিয়ে যাওয়া কঠিন, তার উপর যদি ঘটি বাটীপ্রভৃতি সংসারের জিনিষ বয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে শুধু আমাদের মত দুর্ব্বল বাঙ্গালী কেন অনেক কষ্টসহ হিন্দুস্থানীকেও এই পথে যাওয়ার অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর্ত্তে হয়। তবু হিন্দুস্থানীরা কখন কখন দুই একটা অবশ্য ব্যবহার্য্য জিনিষ সঙ্গে নিয়ে আসে। চটীওয়ালাদের একটা নিয়ম আছে তাদের দোকান হতে আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যাদি না কিনে, রাস্তার যেখানে সস্তা পাওয়া যায় এমন কোন যায়গা হতে যদি কিনে নিয়ে আশা যায়, তাহলে চটীওয়ালা "থালি বর্ত্তন" (থালা বাটী ইত্যাদি বাসন) দেওয়াত দূরের কথা সে যাত্রীকে তাদের ঘরেই বস্‌তে দেবে না। ঘর ভাড়াদিয়ে থাক্‌তে চাইলেও আশ্রয় দেবেনা; কারণ নারায়ণযাত্রীদের কাছ হতে আশ্রয় স্থানের ভাড়া নেওয়া তাদের মতে মহাপাপ অথচ নারায়ণযাত্রী যে তাদের আশ্রয় অভাবে গাছের তলায় পড়ে শীতে মারা যাবে তাতে তাদের অপরাধ হবে না। চটীওয়ালারা বলে যে তাদের দোকান হতে জিনিষ কিন্‌লে যে লাভ হয় তাতেই তাদের দোকান ভাড়া ইত্যাদি পুষিয়ে যায়, সেত আর ঘরের পয়সা ব্যয় করে সদাব্রত খোলেনি। একথার কোন বৈষয়িক উত্তর দেওয়া শক্ত। চটিতে কোন বিছানা পাবার যো নেই, নিজের কম্বলই একমাত্র সম্বল।

তবু আমরা এখানে বেশ সুখে ছিলুম; চটীওয়ালা সকাল সকাল আমাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিলে, এবং পুদিনা ও তেঁতুল দিয়ে সে নিজে এমন এক সুস্বাদু চাটনি তৈয়েরী করলে যার কথা বহুদিন আমাদের মনে থাক্‌বে।

আমরা পথশ্রমে কাতর হয়েছিলুম, আহারাদির পর শয়ন করা গেল; কিন্তু আর সকলগুণ থাক্‌লেও চটিওয়ালার এক মহদ্দোষ ছিল, সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্ম্মালাপী। সে আমাদের পাশে বসে ধর্ম্মালাপ আরম্ভ কল্লে, এবং হনুমানজীর লেজের দৈর্ঘ্য, ভরতের বাঁটুলের গুরুত্ব ও ভীমসেনের আহারের পরিমাণ প্রভৃতি অসাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন কর্ত্তে লাগলো। বলাবাহুল্য আমাদের দ্বারা তার কৌতুহল নিবৃত্তির বড় সুবিধে হয় নি। বিশেষ সে কানের গোড়ায় বক্ বক্ করাতে বৈদান্তিক ভায়া যে রকম অশান্তভাবে 'উঃ আঃ কর্ত্তে লাগলেন তাতে আমার ভয় হলো হয়তো বা নিদ্রাকাতর অসহিষ্ণু, বৈদান্তিক কিছু গোলযোগ বাধাবে। যাহোক ক্রমে আমাদের সকলকে নিদ্রামগ্ন দেখে চটিওয়ালা বোধকরি ভগ্নোৎসাহে শুতে গিয়েছিল। শেষরাত্রে জেগে দেখি, আকাশ ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছে। মেঘের গতিক দেখে সঙ্গীগণ বের হবেন কিনা তাই ইতস্ততঃ কর্ত্তে লাগলেন। আমি কথাবার্ত্তা না কয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাস্তায় নেবে পড়বার উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলুম।

শ্রীজলধর সেন।

কে ?

অনিমিখ দুনয়ানে　　চাহিয়া মুখের পানে
কি তুমি গো দেখিছ, পথিক ?
মনে কি হইছে তব,　　পরিচিত, নহে নব ;
নারিতেছ করিবারে ঠিক ?
দেখে এসেছিলে কারে　　সুদূর ভবন ধারে,
তার পরে দেখ নাই আর ?
একটু তাহার ছায়া,　　একটু তাহার মায়া,
দেখিছ কি নয়ন মাঝার ?
ভ্রান্ত তুমি অতি ভ্রান্ত, যাহারে ভাবিছ, পান্থ,
চিনিতাম আমিও তাহায় ;
প্রভাত অরুণ-জ্যোতি,　　স্নিগ্ধ সুমধুর অতি,
জ্বলিত সে নয়ন-তারায়।
কণ্ঠেতে ফুটিত তার　　শৈশবসঙ্গীত ধার,
বনে বনে বেড়াত ছুটিয়া,
থাকিত আপন মনে　　কভু বসি নিরজনে,
পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া।
প্রকৃতি আদর ক'রে　　বুকে রেখেছিল ধ'রে,
স্নেহময়ী মাতার মতন ;
মধুর চন্দ্রমা রবি,　　মধুর এ বিশ্ব ছবি,
আনন্দে হেরিত সর্ব্বক্ষণ।
শ্যামল শৈশব তীরে　　যৌবন ফুটিল ধীরে,
জাগিয়া উঠিল নবপ্রাণ !

বিজনতা হোল দূর, নব ভাবে ভরপূর,
শুনিল সে মানবের গান!

এখন এ বিশ্ব নয় শুধু আর ছবিময়,
খুলে গেল দৃষ্টি সুমহান!

দেখিল জগৎ-মাঝে, ব্যস্ত সবে মহা-কাজে,
আত্ম ভুলে করে আত্মদান!

চঞ্চল শোণিতধারা, বহিল উন্মত্ত পারা
নাচে হৃদি মহত্ত্ব-স্বপনে!

ক্ষুদ্র তার প্রাণমন করিল সে সমর্পণ,
ঘুচাইতে দুঃখীর বেদনে।

যে দিকে নেহারে ভবে, আপনার জনা সবে;
সরলতা-ভরা হৃদিখানি!

কত আশা ইচ্ছা জাগি উঠিত তাদের লাগি,
কাজে রত, বাধা নাহি মানি।

বল, পান্থ, বল বল, কেন উপহাস ছল,
তার মত আমি কোন খানে?

কুঞ্চিত কপালপরে, হিংসাময় এ অধরে,
রেখাময় বিকৃত বয়ানে?

সহিতে পারে না আলো, যেনরে পেচক কালো,
কোটরেতে ঢুকেছে নয়ন!

পঙ্কিল মলিন দীন, এ হৃদয় অতি হীন,
কি জানে সে মহত্ত্ব বচন!

ত্যজিয়া নিজের স্বার্থ করিব জীবন ব্যর্থ,
ক'রে শুধু অপরের কাজ।

এমন নির্ব্বোধ মোরে　ভাবিছ কেমন ক'রে,
ছি ছি শুনে পাই যে গো লাজ !

যাও, পান্থ, ফিরে যাও, সে নহে এ যারে চাও,
তবু তুমি শুনিবে না কথা ?

আকুল ও আঁখিপুটে　নীরবে রয়েছে ফুটে,
যেন শুধু একটি বারতা !

"সখি গো, তুমি কি সেই? কেন সে কিছুই নেই?
কোথায় সে মোহন মুরতি ?

অথবা সে যদি নও, কও গো, মায়াবি, কও,
তব মাঝে কেন তার স্মৃতি ?"

উত্তর কি দিব এর ?—　স্বপ্ন হবে মুহূর্ত্তের !
অথবা সত্যই বুঝি আজ—

তোমাকে সে দেখা দিতে, আপন আলয় হতে
এসেছিল মোর হৃদি মাঝ !

এক(ই) ছিল জন্মভূমি, ছিলে তার সঙ্গী তুমি,
একদিন জানিতে তাহায় ;

ভাল বুঝি বেসেছিল,　তাই বুঝি এসেছিল,
ক্ষণ তরে হেরিতে তোমায় !

আর সে হেথায় নাহি, কেন মিছে আছ চাহি,
ক্ষণের সে স্বপ্নাবির্ভাব !

ক্ষণেকে পেয়েছে লয়, যা ভাবিছ এ তা নয়,
প্রতিমাতে আত্মার অভাব !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ।

ফুলের মালা।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী ডাকিলেন "রাজকুমার!" নিদ্রিত গণেশদেব চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না শক্তি আমি যাইব না, আমাকে আর প্রলোভিত করিও না।"

"সন্ন্যাসিনী বলিলেন "বৎস, আমি শক্তি নহি, তুমি উঠ, তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

"গণেশদেব সন্ন্যাসিনীর স্বর চিনিতে পারিলেন, হৃৎপিণ্ডে রক্তধারা শতোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিল। সত্যই তবে এবার তিনি স্বাধীনতা লাভ করিবেন! পুলকে বিস্ময়ে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

"ভগবতি সন্ন্যাসিনি এখানে?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "হ্যাঁ শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লও, এই বস্ত্রে স্ত্রীবেশ ধারণ করি' বেশ শালখানিতে চক্ষু ব্যতীত সমস্ত মুখ ঢাকিয়া আমার অনুবর্ত্তী হও।" গণেশদেব যথাশী রাঘাত সমাধা করিয়া বলিলেন "দেবি, আমি প্রস্তুত।" সন্ন্যাসিনী তখন সুধীরে দ্বারে ক: শক্তি করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইলে তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তে লৌহকবাট এবং একই সঙ্গে আবার রুদ্ধ হইল। রিয়

শক্তি এতক্ষণ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের এক কোণে কম্পিতহৃদয়ে চুপ লায়ে বসিয়াছিল, তাহার ভয় হইতেছিল পাছে গণেশদেব তাহাকে দেখিতে পাইয়া আবার কোন আপত্তি করেন।—যদিও তাহার এ উদ্বেগ নিতান্ত অমূলক, কেননা এ গৃহ অন্ধকার, তাহাতে পলায়নতৎপর, উদ্বিগ্নচিত্ত গণেশদেবের অন্য কোন দিকে লক্ষ্য দিবার ইহা সময় নহে। সুতরাং শক্তির ভয়, উদ্বেগ ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর সহিত চলিয়া গেলেন, শক্তি রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিল। এতদিনে তাহার একটি বাসনা পূর্ণ হইল। একটি বাসনা, কিন্তু আজীবনের আবেগ কেন্দ্রীভূত শেষ বাসনা, ইহার সিদ্ধিতে সে পরম সিদ্ধি লাভ করিল, ইহার সফলতায় তাহার চির-নৈরাশ্য কষ্ট মুহূর্ত্তে অসীম আনন্দ সমুদ্রে যেন লুপ্ত হইয়া পড়িল। শক্তি তখন গৃহকোণ ছাড়িয়া গণেশদেবের পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া শয়ন করিল। এই কঠোর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া সে যে অতুল সুখ অনুভব করিল, কোমল রাজশয্যায় শুইয়া তাহা কখনো করে নাই। আনন্দ-উথলিত কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে সে ঈশ্বরাহ্বান করিয়া কহিল "হে করুণাময়, ভক্তবৎসল, এতদিন তোমার অকারণ নিন্দা করিয়াছি—সে জন্য আমাকে ক্ষমা কর। তুমি এতদিন আমায় যে দুঃখ কষ্ট দিয়াছ—তাহা এই আনন্দ-সমুদ্রে বারিকণামাত্র, এই সমুদ্র সৃজনের জন্যই তাহা সঞ্চিত হইতেছিল। আমি অতি মূঢ়, অবোধ অজ্ঞান, কেমন করিয়া বুঝিব, সেই

বিন্দুরূপী দুঃখ কষ্টের পরিণাম, উদ্দেশ্য এই মহানন্দ, পরম সুখ! অযোগ্যাকে এত করুণা, এত সুখ দান করিলে, তাহার আর একটি প্র. এ সুখ হইতে তাহাকে আর বিচ্ছিন্ন করিও না, এই আনন্দের মধ্যে -শন। কুতবের জীবনেরও শেষ হয়। -ণ্ড হইল,

গণেশদেব চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার একমাত্র দখলীসম্পত্তি একখানি ছিন্ন -দগণ এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, শক্তি তাহাতে আপাদমস্তক আবরিত করিয়া এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রানুভব করিল।—তন্দ্রাযোগে তাহার কর্ণে দুর বাঁশরী সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, বাঁশরী গাহিতে লাগিল,—

আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!
আনন্দ-সাগর খেলে পদতলে,
কোটি চন্দ্রতারা শিরোপরি জ্বলে,
বিশ্ব ভুবনের রূপ-রত্ন-মণি
অন্তরে বিরাজে, সে মোর তরণী,
আমি তাহারে বাহি!—আর কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!

দূরে থেকে দেখে ভাবে লোকে সবে,
দীনহীন নেয়ে আমি এই ভবে।
তরী বাহি আর হাসি মনে মনে,
তাহারা এ সুখ বুঝিবে কেমনে!
জগতে সবাই দুখের প্রবাসী,
আমি শুধু সুখে দিবানিশি ভাসি;
কালাকাল হেথা নাহি!—আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!

আমার মতন ধনী কেহ নাই,
অনন্ত উল্লাস বাঁধা মোর ঠাঁই।
রূপের তরণী প্রেমেতে চালাই,
আনন্দ সঙ্গীত গাহি!—আর কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!

..সিল। রাজকুমার শক্তির কণ্ঠে ফুলমালা পরাইয়া তাহাকে লইয়া দাঁড় বাহিতে লাগিল। রাজকুমার বাঁশি বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

আমি কি চাহি!
আমি তার—সে আমার—আমার কি নাহি!—

..লই সে দিনের মত। সুন্দর জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, কোকিল পাপিয়ার ..র-সঙ্গীত, আর তাহার মধ্যে রাজকুমারের সেই বাঁশরীর প্রাণমনহারী আনন্দ তান,—সবই সেই। কেবল সেদিনের মত অন্য বালিকারা নাই, নিরুপমার সেই করুণ মুখ স্মৃতি উভয়ের মাঝখানে উদ্দিত হইয়া তাহাদের পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে না। এই আনন্দ রজনীতে তাহারা কেবল দুইটি প্রাণী এক আত্মা হইয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন মুক্ত দেহের বন্ধন মুক্ত হইয়া অসীম আনন্দ-রাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে!

ক্রমে শক্তির দ্বিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইল, তাহাদের দুই আত্মা এক হইয়া বিশ্বের সমগ্র আত্মায় বিলীন হইয়া পড়িল, ক্ষুদ্র প্রেম মহান প্রেমে মগ্ন হইয়া গেল, এক আনন্দময় মহাচৈতন্যের মধ্যে সে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

* * * * * *

একজন অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বন্দী গভীর নিদ্রিত।"

অন্যজন কহিল, "ভালই, সহজে কার্য্য নিঃশেষ করিতে পারিবে।"

উভয়ের মৃদুকণ্ঠ কথোপকথনে স্তব্ধগৃহ কম্পিত শিহরিত হইয়া উঠিল—কিন্তু তাহাতে বন্দীর সুখ নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাৎ ঘটিল না। প্রথম ব্যক্তি কহিল, "আপনি আলোক লইয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়ান,—তাহার পর আমি বন্দীর মুখাবরণ খুলিয়া অন্ধকারে কাজ শেষ করিব, আলোকে বন্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে"—

কুতব বাহিরে আসিয়া মশাল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া সবেমাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রায় তৎক্ষণাৎ সুলতান গায়সুদ্দিন দ্রুতপদে উন্মত্তের ন্যায় কারাদ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি কুতবকে বিদায় করিয়া কম্পিত উৎকণ্ঠায় তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ এ উৎকণ্ঠা তিনি স্থিরভাবে সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতানের পদমর্য্যাদা, মান অপমান জলাঞ্জলি দিয়া নিজে কারাদ্বারে আগমন করিলেন, দ্বারে কুতবকে দেখিয়া বলিলেন—"কুতব, আজ্ঞা পালিত হইয়াছে?—গণেশদেবের মুণ্ড কই?—সুলতানা কোথায়?"

হত্যাকারী এই সময় বস্ত্রমণ্ডিত কোন বস্তু লইয়া নীরবে তাহা কুতবকে দিল। কুতব তাহা বস্ত্রশূন্য করিয়া মহারাজকে দেখাইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! এই লউন নরাধম গণেশদেবের মুণ্ড।" ভূমি-নিক্ষিপ্ত মশাল তখনও নিভে নাই, তাহার আলোকরশ্মি মৃত মুখ উদ্দীপ্ত করিল। সুলতান বলিলেন, "এ কাহার মুণ্ড! মশাল উঠাইয়া ধর?"

প্রহরী মশাল উঠাইয়া ধরিল। 'সয়তান—একি করিয়াছিস'— বলিয়া সুলতান ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

উপসংহার।

শক্তিকে নিহত দেখিয়া গায়সুদ্দিন উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। কুতবের প্রাণদণ্ড হইল, সাহেবুদ্দিনের প্রাণদণ্ড হইল, কারাগৃহের প্রহরীদিগের প্রাণদণ্ড হইল, অপরাধী নিরপরাধীভেদে কেবল তিনি প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে লাগিলেন। সভাসদগণ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল, প্রজাগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, কোন ছুতায় না জানি কখন তাহাদের মধ্যে কাহাকে ফাঁসি যাইতে হয়। তাহারা অনেকেই গোপনে, এবং কেহ কেহ প্রকাশ্যে গণেশদেবের পক্ষাবলম্বন করিল। গণেশদেবের সহিত সুলতানের যুদ্ধ বাধিল, সুলতান পরাজিত নিহত হইলেন, মুসলমান হিন্দু সকলে মিলিয়া গণেশদেবকে বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিল,—বঙ্গের ভাগ্যে সহসা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল, যবন-সিংহাসনে হিন্দু রাজা অধিষ্ঠিত হইলেন।

শক্তির সহিত নিরুপমার অদৃষ্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, শক্তির ধনে নিরুপমা চিরদিন ধনী। শক্তির মৃত্যুতেও ভবিতব্য এখানে স্থির নিশ্চল, অকাট্য, অপরিবর্ত্তনীয়।—শক্তির রাজ্যে শক্তি আর নাই, নিরুপমা এখন বঙ্গেশ্বরী। শক্তির উদ্যানে সেই ফুলের শোভা, সেই রমণীয় সজ্জা, কেবল শক্তির পরিবর্ত্তে তাহার অধিনায়িকা এখন নিরুপমা। রাজরাণী নিরুপমা গণেশদেবের সহিত উদ্যানে বসিয়া প্রদোষ সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন, রাজকুমার যাদবদেব এই সময় একটি রোরুদ্যমানা বালিকার হস্ত ধরিয়া নিকটে আসিয়া বলিল—

"মা—মা সাহাজাদিকে আমি বিয়ে করব—"বলিয়া বালিকাকে সাদরে বলিল—"কেঁদনা,—তুমি আমার রাণী, আমি তোমার জন্যে ফুল নিয়ে আসি"—

নিরুপমা পুত্রের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া ঘৃণার স্বরে বলিলেন—"ছি ছি যাদব, ও যে মুসলমানী—উহাকে ছাড়িয়া দাও—" তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনীও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিই বালিকাকে লইয়া গণেশদেবের নিকট আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে রাজপুত্র বালিকাকে লুট করিয়া লয়। নিরুপমার কথায় সন্ন্যাসিনী বলিলেন "বৎসে বিজাতীয় বলিয়া ইহাকে ঘৃণা করিও না, ইহার মাতা তোমাদের সকলের জন্য প্রাণ দিয়াছে—তাহা মনে রাখিও—" গণেশদেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুলবাহারকে কোলে তুলিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন, নিরুপমা ভীত-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালক যাদব ইতিমধ্যে ছুটিয়া সুন্দরলালের নিকট হইতে একগাছি ফুলের মালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বালিকাকে পরাইয়া বলিল, "সাহাজাদি তুমি আমার রাণী, আমি তোমাকে বিয়ে করব।"

নিরুপমার ভয় সত্য হইল, বালক যাদবের বাল্যকথা সত্য হইল, শক্তির অভিশাপ ফলিল; বালক যাদবদেব যৌবনে মুসলমান হইয়া এই বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন।—এই যাদবদেবই ভবিষ্যতে বঙ্গরাজ জেলালুদ্দিন নামে খ্যাত।

সমাপ্ত।

কপোত বংশের অভ্যুত্থান।

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বিভিন্ন কপোতবংশের অভ্যুত্থান আলোচনা করিয়া জাতি-বৈচিত্র্যের একটি অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদিগের পাঠকবর্গের সমক্ষে স্থাপন করিবার অভিলাষ করিয়াছি। অন্য সহস্রবিধ পশুপক্ষীর মধ্যে কপোত বংশকেই আমাদের উদাহরণ স্থলীয় করিবার তাৎপর্য্য এই যে—১, গৃহপালিত অন্যান্য পশুপক্ষী মধ্যে কপোত বংশ সম্বন্ধেই বিস্তারিত চেষ্টা ও গবেষণা হইয়াছে; ২, অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই কপোত মনুষ্যসমাজে নীত হইয়া অতি যত্নে প্রতিপালিত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া ইহার বিবিধ বংশের বিকাশ-পর্য্যায়-ইতিহাস আমাদিগের অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য; ৩, আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রকাশিত বার্ত্তাবহ-কপোত সম্বন্ধীয় প্রস্তাবদ্বয় হইতে পাঠকগণ ইহার সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত এরূপ আশাও করা যাইতে পারে। এক্ষণে আলোচ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বর্ত্তমানে সার্দ্ধ শতাধিক প্রকারের বিভিন্ন কপোত বংশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নাম আছে এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ অবিকল পিতামাতার অনুরূপ হয়, ক্বচিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই দেড়শত বিভিন্ন কপোতবংশ এক আদিম বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই এক জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বংশ মাত্র। গোলা, মুক্ষি, লক্কা, লোটন, পরপাঁও, বার্ত্তাবাহী, গলাফোলা জাকবিন (ঘোমটাওলা এক রকম পায়রা) প্রভৃতি কপোতগণ বর্ণ ও পালকবিন্যাসে উড্ডয়নপটুতায় এবং চক্ষু, চঞ্চু, নখর, পাকস্থলী প্রভৃতি আবয়বিক বিশেষত্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও ইহারা সকলেই আদৌ ঘুঘু শ্রেণীর একটি মাত্র জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল একটি জাতিই বর্ত্তমানের এতগুলি বিভিন্ন বংশীয় পারাবতের আদিম জনয়িতা, আর সেই জাতি বৈজ্ঞানিক ভাষায় কলম্বা লিভিয়া নামে আখ্যাত। (Columba Liviaর কলম্বা শব্দ genus বা family পরিচায়ক; ইহার অর্থ ঘুঘু, ইংরাজী dove) পাঠক! আমাদের অদূরদর্শী দৃষ্টি সমীপে এতগুলি বিভিন্ন বংশীয় কপোতের মূলতঃ এক আদিমবংশ হইতে উদ্ভব নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও অসঙ্গত বলিয়া স্বতঃ প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাহা বহু কালসম্পাতের ঘনতম আবরণ ভেদ করিয়াও তত্ত্বরাজি প্রত্যক্ষবৎ পরিদর্শন করিতে পারে, সেই বিজ্ঞানের চক্ষে, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচারে ইহা অতি বিশদরূপে সত্যের অভ্রমাত্মক উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্ত হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে এতৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত ও যুক্তি বিবৃত করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ ডারউইন কপোত বংশোদ্ভাবন সমস্যা মীমাংসা করিবার

নিমিত্ত নানা কপোতপালন সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং কপোত পুষিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেন। তিনি সার্দ্ধ শতাধিক বিভিন্নবংশীয় কপোতকে তাহাদিগের বাহ্য আবয়বিক বিশেষত্ব অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণের অল্পাধিক সৌসাদৃশ্যানুসারে একাদশ প্রধান বংশ মধ্যে নির্দ্দেশ করেন। এই একাদশ প্রকারের বিশেষ পরিস্ফুট স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন বংশমধ্যে দেড়শত প্রকারের সমুদয় বংশ নিহিত। সাধারণ কপোতপালকদিগের মতে অন্ততঃ এইরূপ একাদশ কি দ্বাদশ প্রকারের বিভিন্ন আদিম বন্য কপোত বংশ হইতে বর্ত্তমানের বহুবিধ গৃহপালিত কপোত সমুত্থিত হইয়াছে। কপোত-পালকগণের মতে গলাফোলা কপোতের আদি পুরুষ কোন আরণ্য গলাফোলা কপোত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; বার্ত্তাবাহী, কি লক্কা, কি লোটন কি জাকবিন ইহারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই স্ব স্ব বিশেষত্বসম্পন্ন কোন আরণ্য কপোতবংশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অন্যথা, আদিম কলম্বা লিভিয়া হইতে এবম্বিধ বিভিন্ন আবয়বিক বিকাশ ও বিশেষত্বের উদ্ভব অসম্ভব।

বাস্তবিক যদি আমরা প্রধান প্রধান বংশীয় কপোতগুলিকে পরস্পরেব সহিত, কিম্বা আদিম পার্ব্বত্য কপোতের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে এতই অসামঞ্জস্য ও অসাদৃশ্য লক্ষিত হইবে যে, আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিবার নহে। আদিম পার্ব্বত্য-কপোত (Columba Livia) দেখিতে স্লেটের রংয়ের ন্যায় ঈষৎ নীলাভ। ইহার পুচ্ছ বারটি এবং পক্ষে নয় কিম্বা দশটি পালক থাকে। প্রত্যেক পক্ষের উপরিভাগে দুটি করিয়া কৃষ্ণবর্ণের মোটা রেখা এবং পুচ্ছ-পালকের প্রান্তদেশে ঘন কাল দাগ, এবং বহিস্থ পুচ্ছ-পালকের গোড়ার শুভ্রতা ইহার বিশেষ লক্ষণ, ইহা ব্যতীত ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ ইহার ক্রুপের (croup) বর্ণ। মূল শরীর ও পুচ্ছের সম্মিলন স্থলে সূক্ষ্ম সুকোমল পালকপুঞ্জকে ক্রুপ বলে। এই ক্রুপ কলম্বা লিভিয়ায় তুষার-শুভ্রবর্ণের হইয়া থাকে। বহু শতাব্দীর প্রাচীন হইলেও পার্ব্বত্য-কপোত আপনাদিগের এই বিশেষত্বগুলি সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর যে যে স্থানে আজও ইহাদিগের মূল আদিম বংশ দেখা যায়, সকলেতেই উক্ত মৌলিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ অধিকৃতরূপে রক্ষিতদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল শীতোষ্ণের ভিন্নতা বশতঃ ক্রুপের বর্ণ কোথাও বা হিম-শুভ্র কোথাও বা নীলবর্ণের হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আকারগত বা অন্য কোনরূপ পার্থক্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে, এই আদিম পার্ব্বত্য-কপোত, আর বর্ত্তমানের নানা বিচিত্র বর্ণের ও আকারের কপোতদিগের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য যেমন পায়রার প্রশস্ত আয়তনের পাকস্থলী (oesophagus) বার্ত্তাবাহীর নাসিক কুক্কুটফুল (coruncles) ও চতুষ্পার্শ্বস্থ মণ্ডলাকার মাংস পটির আবেষ্টন (wattles) লক্কার চাইনিজ পাখার ন্যায় প্রশস্ত ও বিস্তারিত এবং স্বাভাবিক সংখ্যার প্রায় চতুর্গুণ পক্ষসংযুক্ত পুচ্ছ, লোটন কিম্বা গিরেবাজের ভূমিতে কিম্বা শূন্যে ডিগবাজী করিবার ক্ষমতা, জাকবিনের মস্তকের ঘোমটা, পরপাঁওর অসম্ভবরূপে

পরিবর্দ্ধিত পালকযুক্ত পদ, এবং অন্য এক প্রকার কপোতের* ভেরীর ন্যায় উচ্চ রবে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন করিবার শক্তি, অন্য এক প্রকার কপোতের (Langhers) হাস্যের ন্যায় শব্দ করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি দর্শন করিলে, কখনই কাহারো সহজে বিশ্বাস হইবেক না যে, ইহারা সকলেই এক আদি কলম্বা লিভিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তথাপি কঠোর বিজ্ঞান এই মানব সহজ-প্রতীতির সম্পূর্ণ বিপরীত মতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্ ডারউইন এতৎসম্বন্ধে প্রথমতঃ অপরোক্ষ যুক্তি দেখাইয়া এই বলেন যে, আদিম পার্ব্বত্য বন্য-কপোত অন্যবিধ পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই বৃক্ষোপরি নীড় বাঁধিয়া বাস করিত এবং শাখার উপর বসিত। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে কোন দেশে কখনও কোন কপোতকে সেরূপ করিতে দেখি নাই। ইহার কারণ কি? বিশেষতঃ আমরা জানি যে পশুপক্ষীগণ গৃহপালিত হইলেও আদিম অসভ্য ও বন্যাবস্থার রীতি নীতি অনেককাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া থাকে, কখনই তাহা শীঘ্র পরিত্যাগ করেনা। এই হেতু ডারউইন এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, বর্ত্তমান কপোত-বংশের আদি পুরুষ তরুবাসী বন্যপক্ষী নহে; সভ্য ও মানব-সমাজ প্রিয় এবং গৃহবাসী কপোত। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় মানিতে হইবেক যে এ পর্য্যন্ত কোন কপোতপালক বর্ত্তমানের কোন কপোতকে আদিম অভ্যাসানুসারে কখনও তরুশাখে বসিতে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না। অন্য পক্ষে আজও পর্য্যন্ত আমাদিগের অন্যান্য গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে আদিম আরণ্য স্বভাবের বিদ্যমানতার আমরা অনেক পরিচয় পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, কুকুর, বিড়াল, ছাগ, মেষ ইত্যাদি। উষ্ট্র ও গর্দ্দভ উভয়েই আদৌ মরুভূমি-নিবাসী। যদিও ইহারা অনেককাল লোকালয়ে আনীত ও পালিত হইয়াছে, তথাপি আজও আমরা দেখিতে পাই উষ্ট্র কিম্বা গর্দ্দভ সহজে নদী কিম্বা জলস্রোত পার হইতে চাহে না। ইহার কারণ এই যে মরুভূমির মধ্যে জলাশয় বা জলস্রোত নিতান্ত বিরল। সুতরাং আদিম বন্য উষ্ট্র বা গর্দ্দভের পূর্ব্বপুরুষকে কখন জলস্রোত অতিক্রম করিতে হইত না; বালুকার উপর চারণ করিতেই তাহারা অভ্যস্ত ছিল। সেই অভ্যাস এখনও গৃহপালিত উষ্ট্র বা গর্দ্দভকে নদী পার হইতে যেন সহসা নিরস্ত করে। গর্দ্দভ বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে আজও কত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। কুকুরকে যত ভাল করিয়া আহার করান হউক না, তাহারা উদরপূর্ণ হইলে আজও শৃগালের ন্যায় অতিরিক্ত খাদ্য লুকাইয়া রাখিয়া থাকে। কার্পেটে শুইবার পূর্ব্বে ইহার আজও অনেকবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৎপরে শয়ন করে, ঠিক যেন অরণ্য মধ্যে তৃণদলকে মাড়াইয়া শয্যা প্রস্তুত করিতেছে। ছাগ ও মেষগণ যে আদৌ পর্ব্বতবাসী ছিল, এখনও ইহাদিগের শাবকদিগকে পর্ব্বত-গাত্রে সানন্দে ক্রীড়াপরায়ণ হইতে দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গৃহপালিত

---

* ইহাদিগকে চলিত ভাষায় ইয়াহু বলে।

কপোত-নিচয়ের মধ্যে কোন আরণ্য আদিম স্বভাবের লেশমাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, ইহারা তরু-শাখাবাসী কোন বন্য-কপোত বংশ লইতে উদ্ভূত হয় নাই, অথবা ইহারা এরূপ এক কিম্বা কতকগুলি বন্য-কপোত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যাহারা বৃক্ষোপরি নীড় বাঁধিয়া বাস করিত, এবং মানবসমাজপ্রিয়ও ছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে, প্রকৃতিতত্ত্ববেত্তারা, এইরূপ উভয়বিধ স্বভাবসম্পন্ন কেবল পাঁচটি বা ছয়টি মাত্র আরণ্যজাতির বিষয় অবগত আছেন, যাহারা কতক অংশে গৃহপালিত সার্দ্ধ দেড় শত কপোত বংশের আকার, গঠন ও স্বভাবগত সাদৃশ্যের উদাহরণস্থলীয় হইতে পারে।

উক্ত ছয় জাতি আরণ্য-কপোতের মধ্যে এক জাতীয় কপোত ভারতবর্ষে হিমালয় পর্ব্বতের চিরহিমানীরেখার সান্নিধ্যে বাস করে। অপর এক জাতীয় কপোত মধ্য আসিয়ায়, তৃতীয় জাতি মালয় দ্বীপপুঞ্জে, চতুর্থ আফ্রিকার গিনি উপকূল হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ য়ুরোপে দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ বা কলম্বা লিভিয়া জাতিই য়ুরোপের সমুদয় কপোত-বংশের আদি জনয়িতা। ইহারাই সাধারণতঃ Rock pigeon বা পার্ব্বত্য-কপোত বলিয়া আখ্যাত হয়। ইহারা আজও পর্য্যন্ত আপনাদিগের আকার গঠন ও স্বভাবগত বিশেষত্ব অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষীয় পার্ব্বত্য-কপোত য়ুরোপখণ্ডের পার্ব্বত্য-কপোতেরই অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে এইমাত্র পার্থক্য যে, প্রথমোক্তদিগের ক্রুপ শুভ্র না হইয়া নীলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কপোতের পক্ষ, চঞ্চু, নাসা, চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় ক্রুপের বর্ণও বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং ভারতীয় পার্ব্বত্য-কপোত আর য়ুরোপীয় পার্ব্বত্য-কপোতকে দুই স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। য়ুরোপীয় পার্ব্বত্য-কপোত গৃহপালিত অবস্থায় যেরূপ বিবিধ বর্ণের শাবক উৎপন্ন করে, ভারতীয় পার্ব্বত্য-কপোতও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। য়ুরোপীয় পার্ব্বত্য-কপোত সহজেই পোষ মানে এবং বাসা বাঁধিয়া দিলে তথায় শাবক উৎপন্ন করে। ভারতীয় পার্ব্বত্য-কপোত গৃহপালিত কপোতের সহিত সহজেই সঙ্গম ও সন্তানোৎপাদন করে।

পার্ব্বত্য-কপোত ব্যতীত আর এক প্রকার কপোত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ঠিক গৃহপালিত কপোত নহে। ইহাদিগকে Dovecot কপোত বা 'জঙ্গলি' কপোত বলে। জঙ্গলি কপোত কেহ যত্ন করিয়া পোষে না, এবং কেহ ইহাদের আহার পানীয়ও প্রদান করে না। ইহারা লোকালয়ের প্রাচীন গৃহ-ভিত্তির গহ্বরে, করণিসের উপরে বা নিম্নে, কিম্বা অন্য কোন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বাস করে ও আপনি চরিয়া আহার ও পানীয় সংগ্রহ করে। ইহারা নানা বর্ণের হয়; কেহ কেহ বা আদিম পার্ব্বত্য কপোতের বর্ণই অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষা করে। বিশেষতঃ ক্রুপ সম্বন্ধে ইহারা সর্ব্বত্রেই আদিম পার্ব্বত্য-কপোতের অনুরূপ। অর্থাৎ য়ুরোপ অঞ্চলে ইহাদের ক্রুপ হিমশুভ্র এবং ভারতবর্ষে নীলাভ। কলুম্বা লিভিয়ার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বত্রের 'জঙ্গলি' কপোতের সামঞ্জস্য দেখিয়া প্রকৃতিতত্ত্ববেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে, উহা কলম্বা লিভিয়া হইতেই

উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন ইহা প্রসিদ্ধ যে পার্ব্বত্য-কপোত সহজে পোষ মানে, 'জঙ্গলি' কপোত-বংশ যে ইহাদের হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় জাতি পার্ব্বত্য-কপোত হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বর্ত্তমানের সমুদয় কপোত-বংশের উদ্ভব, কখনই সম্ভবপর নহে। ডারউইন দেড় শতাধিক কপোত-বংশকে যে একাদশ প্রধান বংশে বিভক্ত করিয়াছেন অন্ততঃ সেই একাদশ প্রকারের বিভিন্ন জাতি না হইলে শুদ্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা একশত বা দেড়শত স্বতন্ত্র প্রকারের কপোত-বংশ বিকাশ অসম্ভব। ডারউইন সমুদয় কপোত-বংশের এক আদিম-বংশ হইতেই উৎপন্ন হইবার মত পোষণ করেন, এবং তৎসম্বন্ধে ছয়টি অব্যর্থ পরোক্ষ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সেগুলি প্রণিধান করিলে, কাহারো আর মুহূর্ত্তেরও সন্দেহ থাকিতে পারিবে না।

প্রথম যুক্তি ঃ—যদি ভিন্ন দেশব্যাপ্ত একই আদিম জাতি বা উপজাতি হইতে একাদশটি প্রধান বংশ পরিবর্ত্তন দ্বারা উদ্ভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই অনেকগুলি এরূপ আদিম জাতি হইতে জন্মিয়াছে, যাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কারণ, কেবল পাঁচটি বা সাতটি বন্য আদিম-বংশ হইতে ক্রমাগত অসবর্ণ সঙ্গম দ্বারাও (crossing) বর্ত্তমানের বিশেষ প্রভেদাত্মক বংশ সকল কখনই জন্মিতে পারে না। যেমন গলাফোলা, কি লক্কা, কি লোটন, ইহারা কোন মতেই এমন পাঁচ সাতটি আদিম বংশের সম্মিলনে উৎপন্ন হইতে পারে না যাহাদের মধ্যে ইহাদের বিশেষত্ব অল্লাধিক স্ফুট ছিল না। অর্থাৎ গলাফোলা পায়রার ন্যায় বিস্তৃত পাকস্থালী, লক্কার মত অনেকগুলি পালক-সংযুক্ত, পাখার মত প্রসারিত ও উত্তোলিত পুচ্ছ, লোটনের ন্যায় আপনার সাম্য রক্ষা করিতে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ডিগবাজী খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি বিশেষত্বগুলি আদিম জাতির মধ্যেও থাকা আবশ্যক। নতুবা শুদ্ধ অসবর্ণ সঙ্গমে অজাতপূর্ব্ব বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মের বিকাশ সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এই একাদশ প্রকারের প্রধান কপোত বংশগুলি অন্ততঃ দশ বার প্রকারের স্বতন্ত্র জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই গাছে বসা, পাহাড়ে বাস ও বংশ বিস্তার করা, আবার জনসমাজের মধ্যে বাস ও বংশবৃদ্ধি করারও রীতি ছিল। এই আদিম জাতিগুলি হয় পৃথিবীর কোন-স্থলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, নতুবা তাহাদের লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি ইহারা আজও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাদৃশ দশ বারটি জাতি, যাহারা একদা প্রাচীনকালে গৃহপালিত হইয়াছিল, প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগরীতে বাস করিত, তাহারা আজও বন্যভাবে অবস্থান করিবে অথচ কোন পক্ষীতত্ত্ববিদ সে বিষয় অবগত হইবেন না। অন্য পক্ষে যদি মনে করা যায় যে, তাহাদের বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে এ কথা সহজেই মনে উদয় হয় যে মানব-ইতিহাসের সমকালে আট দশটি প্রসিদ্ধ

কপোতজাতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল, অথচ কোনকালে কোন ইতিহাসকার ইহাদিগের বিষয় কিছুই জানিলেন না, আরো, সেই অতি প্রাচীন পার্ব্বত্য-কলম্বা লিভিয়া আজও পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিতভাবে আপন বংশকে বিদ্যমান রাখিয়াছে। ইহা কি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! যদি মানুষের হস্তে ঘুঘু শ্রেণীর আট দশটি জাতি নিঃশেষিত হইল, কলম্বা লিভিয়া বিনষ্ট হইল না কেন?

দ্বিতীয় যুক্তি;—যদি বর্ত্তমানের কপোত বংশ সকল কতকগুলি আদিম জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা মানিতে হইবে যে, এই আদিম জাতিগুলি এতই সম্পূর্ণরূপে পোষ মানিয়াছিল যে, আবদ্ধাবস্থায় থাকিয়াও ইহারা বংশবিস্তার করিতে পারিত কিন্তু প্রাণীরাজ্যে ইহা একটি বিশেষ নিয়ম যে, বন্য পশুপক্ষী যখন অরণ্য হইতে ধৃত হইয়া জনসমাজে অবরোধে বাস করে, স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ইহাদিগের জননশক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে! এই নিমিত্ত পশুশালায় আবদ্ধ পশুপক্ষীগণ প্রায়ই সন্তানোৎপাদন করে না। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী গণ্ডার, ভল্লূক, বনের ময়ূর প্রভৃতি পশুপক্ষীর মধ্যে আমরা সহস্র সহস্র নিদর্শন দেখিতে পাই। আমাদের গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ টিয়া, ময়না, সালিক, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষীগণও কখন আবদ্ধাবস্থায় শাবক উৎপন্ন করেনা। দুই তিন শত বৎসর হইতে কত প্রকার বন্যপক্ষী ধৃত হইয়া লোকালয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত শোনা গেলনা একটিও আবদ্ধাবস্থায় শাবক উৎপন্ন করিয়াছে। কেননা, স্বাধীন অবস্থায় স্বাভাবিক জলবায়ু ও আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, পশুপক্ষীদিগের আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জননশক্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই নিমিত্ত সন্তান হয় না। অথচ, যদি আমরা স্বীকার করি যে শতাধিক কপোত বংশ দশ বার প্রকার ভিন্ন জাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে দশ বার প্রকারের বিভিন্ন কপোতজাতি সম্পূর্ণরূপে গৃহপালিত হইয়া ও পোষ মানিয়া লোকালয়ে বংশবিস্তার করিত। কিন্তু অদ্যাপি তাহাদের একটিও বন্যাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় না।

তৃতীয় যুক্তি;—প্রাণীরাজ্যের আর একটি নিয়ম এই যে, গৃহপালিত পশুপক্ষীগণ পৃথিবীর নানাস্থলে নীত হইয়া কোথাও আদিম অবস্থায় জলবায়ুর অনুকূলতা পাইলে পুনরায় আরণ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ইংরাজিতে feral বলে। অনেক গৃহপালিত পশুপক্ষীই কোন কোন স্থানে এইরূপে পুনরায় আরণ্য-স্বভাব অবলম্বন করিয়া অরণ্যে গিয়া বন্যভাবে বংশবিস্তার করিয়াছে, এ সংবাদ জানা গিয়াছে। সাধারণ কুক্কুট, টার্কি, গিনি-কুক্কুট, পাতি-হংস প্রভৃতি জীব আমেরিকার স্থানে স্থানে বন্যভাবে আপনাদিগের বংশবিস্তার করিয়া থাকে। কুকুর অনেক স্থলে আরণ্য হয়। সম্প্রতি খরগস অষ্ট্রেলিয়ায় নীত হইয়াছিল; পূর্ব্বে তথায় খরগস ছিল না। কিন্তু পোষা, গৃহপালিত খরগস অষ্ট্রেলিয়ার জলবায়ুর মধ্যে আদিম অবস্থার অনুকূল জলবায়ু পাইয়া, নিতান্তই বন্য প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া বংশ বিস্তারে এতই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে যে, এক্ষণে ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য প্রকৃতি-তত্ত্ববিদগণ

উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন ইহা প্রসিদ্ধ যে পার্ব্বত্য-কপোত সহজে পোষ মানে, 'জঙ্গলি' কপোত-বংশ যে ইহাদের হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় জাতি পার্ব্বত্য-কপোত হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বর্ত্তমানের সমুদয় কপোত-বংশের উদ্ভব, কখনই সম্ভবপর নহে। ডারউইন দেড় শতাধিক কপোত বংশকে যে একাদশ প্রধান বংশে বিভক্ত করিয়াছেন অন্ততঃ সেই একাদশ প্রকারের বিভিন্ন জাতি না হইলে শুদ্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা একশত বা দেড়শত স্বতন্ত্র প্রকারের কপোত-বংশ বিকাশ অসম্ভব। ডারউইন সমুদয় কপোত-বংশের এক আদিম-বংশ হইতেই উৎপন্ন হইবার মত পোষণ করেন, এবং তৎসম্বন্ধে ছয়টি অব্যর্থ পরোক্ষ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সেগুলি প্রণিধান করিলে, কাহারো আর মুহূর্ত্তেরও সন্দেহ থাকিতে পারিবে না।

প্রথম যুক্তি ঃ—যদি ভিন্ন দেশব্যাপ্ত একই আদিম জাতি বা উপজাতি হইতে একাদশটি প্রধান বংশ পরিবর্ত্তন দ্বারা উদ্ভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই অনেকগুলি এরূপ আদিম জাতি হইতে জন্মিয়াছে, যাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কারণ, কেবল পাঁচটি বা সাতটি বন্য আদিম-বংশ হইতে ক্রমাগত অসবর্ণ সঙ্গম দ্বারাও (crossing) বর্ত্তমানের বিশেষ প্রভেদাত্মক বংশ সকল কখনই জন্মিতে পারে না। যেমন গলাফোলা, কি লক্কা, কি লোটন, ইহারা কোন মতেই এমন পাঁচ সাতটি আদিম বংশের সম্মিলনে উৎপন্ন হইতে পারে না যাহাদের মধ্যে ইহাদের বিশেষত্ব অল্লাধিক স্ফুট ছিল না। অর্থাৎ গলাফোলা পায়রার ন্যায় বিস্তৃত পাকস্থালী, লক্কার মত অনেকগুলি পালক-সংযুক্ত, পাখার মত প্রসারিত ও উত্তোলিত পুচ্ছ, লোটনের ন্যায় আপনার সাম্য রক্ষা করিতে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ডিগবাজী খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি বিশেষত্বগুলি আদিম জাতির মধ্যেও থাকা আবশ্যক। নতুবা শুদ্ধ অসবর্ণ সঙ্গমে অজাতপূর্ব্ব বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মের বিকাশ সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এই একাদশ প্রকারের প্রধান কপোত বংশগুলি অন্ততঃ দশ বার প্রকারের স্বতন্ত্র জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই গাছে বসা, পাহাড়ে বাস ও বংশ বিস্তার করা, আবার জনসমাজের মধ্যে বাস ও বংশবৃদ্ধি করারও রীতি ছিল। এই আদিম জাতিগুলি হয় পৃথিবীর কোনস্থলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, নতুবা তাহাদের লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি ইহারা আজও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাদৃশ দশ বারটি জাতি, যাহারা একদা প্রাচীনকালে গৃহপালিত হইয়াছিল, প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগরীতে বাস করিত, তাহারা আজও বন্যভাবে অবস্থান করিবে অথচ কোন পক্ষীতত্ত্ববিদ সে বিষয় অবগত হইবেন না। অন্য পক্ষে যদি মনে করা যায় যে, তাহাদের বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে এ কথা সহজেই মনে উদয় হয় যে মানব-ইতিহাসের সমকালে আট দশটি প্রসিদ্ধ

কপোতজাতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল, অথচ কোনকালে কোন ইতিহাসকার ইহাদিগের বিষয় কিছুই জানিলেন না, আরো, সেই অতি প্রাচীন পার্ব্বত্য-কলম্বা লিভিয়া আজও পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিতভাবে আপন বংশকে বিদ্যমান রাখিয়াছে। ইহা কি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! যদি মানুষের হস্তে ঘুঘু শ্রেণীর আট দশটি জাতি নিঃশেষিত হইল, কলম্বা লিভিয়া বিনষ্ট হইল না কেন?

দ্বিতীয় যুক্তি;—যদি বর্ত্তমানের কপোত বংশ সকল কতকগুলি আদিম জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা মানিতে হইবে যে, এই আদিম জাতিগুলি এতই সম্পূর্ণরূপে পোষ মানিয়াছিল যে, আবদ্ধাবস্থায় থাকিয়াও ইহারা বংশবিস্তার করিতে পারিত কিন্তু প্রাণীরাজ্যে ইহা একটি বিশেষ নিয়ম যে, বন্য পশুপক্ষী যখন অরণ্য হইতে ধৃত হইয়া জনসমাজে অবরোধে বাস করে, স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ইহাদিগের জননশক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে! এই নিমিত্ত পশুশালায় আবদ্ধ পশুপক্ষীগণ প্রায়ই সন্তানোৎপাদন করে না। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী গণ্ডার, ভল্লুক, বনের ময়ূর প্রভৃতি পশুপক্ষীর মধ্যে আমরা সহস্র সহস্র নিদর্শন দেখিতে পাই। আমাদের গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ টিয়া, ময়না, সালিক, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষীগণও কখন আবদ্ধাবস্থায় শাবক উৎপন্ন করেনা। দুই তিন শত বৎসর হইতে কত প্রকার বন্যপক্ষী ধৃত হইয়া লোকালয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত শোনা গেলনা একটিও আবদ্ধাবস্থায় শাবক উৎপন্ন করিয়াছে। কেননা, স্বাধীন অবস্থায় স্বাভাবিক জলবায়ু ও আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, পশুপক্ষীদিগের আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জননশক্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই নিমিত্ত সন্তান হয় না। অথচ, যদি আমরা স্বীকার করি যে শতাধিক কপোত বংশ দশ বার প্রকার ভিন্ন জাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে দশ বার প্রকারের বিভিন্ন কপোতজাতি সম্পূর্ণরূপে গৃহপালিত হইয়া ও পোষ মানিয়া লোকালয়ে বংশবিস্তার করিত। কিন্তু অদ্যাপি তাহাদের একটিও বন্যাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় না।

তৃতীয় যুক্তি;—প্রাণীরাজ্যের আর একটি নিয়ম এই যে, গৃহপালিত পশুপক্ষীগণ পৃথিবীর নানাস্থলে নীত হইয়া কোথাও আদিম অবস্থায় জলবায়ুর অনুকূলতা পাইলে পুনরায় আরণ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ইংরাজিতে feral বলে। অনেক গৃহপালিত পশুপক্ষীই কোন কোন স্থানে এইরূপে পুনরায় আরণ্য-স্বভাব অবলম্বন করিয়া অরণ্যে গিয়া বন্যভাবে বংশবিস্তার করিয়াছে, এ সংবাদ জানা গিয়াছে। সাধারণ কুক্কুট, টার্কি, গিনি-কুক্কুট, পাতি-হংস প্রভৃতি জীব আমেরিকার স্থানে স্থানে বন্যভাবে আপনাদিগের বংশবিস্তার করিয়া থাকে। কুকুর অনেক স্থলে আরণ্য হয়। সম্প্রতি খরগস অষ্ট্রেলিয়ায় নীত হইয়াছিল; পূর্ব্বে তথায় খরগস ছিল না। কিন্তু পোষা, গৃহপালিত খরগস অষ্ট্রেলিয়ার জলবায়ুর মধ্যে আদিম অবস্থার অনুকূল জলবায়ু পাইয়া, নিতান্তই বন্য প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া বংশ বিস্তারে এতই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে যে, এক্ষণে ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য প্রকৃতি-তত্ত্ববিদগণ

উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন। অপরন্তু সাধারণ জঙ্গলি কপোত স্থানে স্থানে আরণ্য (feral) হইয়াছে এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই প্রধান একাদশ প্রকারের কপোতবংশ কোথাও 'ফেরাল' হইয়াছে এ সংবাদ আজও পাওয়া যায় নাই। অথচ পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে কপোতবংশ নীত হয় নাই, অতি আদিমকাল হইতেই সর্ব্বত্রের মনুষ্যসমাজে আদৃত হইয়া কপোতবংশ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিশ্চয়ই অনেকেই তাহাদের আদিম বাসস্থানে তদনুকূল জলবায়ুর মধ্যে নীত হইয়া থাকিবেক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত লক্কা কি লোটন, গলাফোলা কি জেকবিনকে কুত্রাপি 'ফেরাল' হইতে শোনা গেল না। অন্য সকলবিধ গৃহপালিত পশুপক্ষী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আরণ্য স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে কিন্তু একাদশটি বিভিন্ন বংশের কোন একটি বংশীয় কপোতও কোথাও আরণ্যস্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। কেন করিল না, অর্থাৎ কপোত 'ফেরাল' কেন হইল না অন্য মতাবলম্বীগণ তাহার কোন সদুত্তর দানে নিতান্তই অপারগ কিন্তু প্রকৃতি তত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে, কপোতের স্বতন্ত্র বংশ সকল কেবল পরিবর্ত্তনের ফলমাত্র। অনেকদিন হইতে এবং অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া, ইহাদিগের মধ্যে পরিবর্ত্তিত অংশগুলি এইরূপ স্থায়ী ও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে পুনঃ আরণ্য স্বভাবে পরিবর্ত্তন ইহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব।

চতুর্থ যুক্তি ;—ইহা অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে বহুবিধ গৃহপালিত কপোতবংশ মধ্যে যে বিশেষ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহা আদৌ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত আদিম জাতিগুলি হইতে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, মনুষ্য জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, পুষিবার জন্য প্রথমতঃ অস্বাভাবিক ধরণের (abnormal) কপোত নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। কারণ, নিশ্চয়ই লক্কা, লোটন, গলাফোলা, বার্ত্তাবাহী, জেকবিন প্রভৃতি কপোতগণ অপর সাধারণ কপোতের সহিত উপমিত হইলে অস্বাভাবিক বলিয়াই অবধারিত হইবে। তাহা হইলেই আমাদের অগত্যা বিশ্বাস করিতে হয় যে, অনেক প্রাচীনকালে কেবলি যে কতকগুলি নিতান্তই অস্বাভাবিক আকার গঠন ও প্রকৃতিবিশিষ্ট কপোতই পোষ মানিয়াছিল তাহা নহে ; সেই অস্বাভাবিক ধরণের কপোতজাতিগুলি এক্ষণে নির্ব্বংশ ও নির্মূল হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ ইহাদের সম্বন্ধে এক্ষণে কেহ কিছুই জানে না, ইহাও বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ।

পক্ষান্তরে, যদি সমুদয় বিভিন্ন বংশীয় কপোতগুলি কেবল একটি জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি কিরূপে একটু সামান্য বিশেষত্ব বা পরিবর্ত্তন মানবের সাহায্যে, কপোতপালকের খামখেয়াল অনুসারে, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ঈদৃশ অস্বাভাবিকত্বে পরিণত হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে, কপোতবংশের বিশেষ পার্থক্যগুলি যেমন লক্কার পুচ্ছ, গলাফোলার পাকস্থলী,

বার্ত্তাবহীর নাসিকফুল ও চক্ষু-পটি, লোটনের অতি ক্ষুদ্র চঞ্চু, পরপাঁওর পায়ের পালক, ইত্যাদি অঙ্গগুলি কপোতের অন্যান্য অবয়বের মধ্যে অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। যদি মানবের কৌশলে উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তনগুলি ক্রমাগতঃ সমষ্টিকৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াই এবম্বিধ অস্বাভাবিক বিকাশরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে আজও পর্য্যন্ত কপোতের ঐ ঐ অবয়বগুলি অর্থাৎ পুচ্ছ, নাসা, পাকস্থলী, চঞ্চু, চক্ষুপটি প্রভৃতি কেন এত পরিবর্ত্তন প্রবল। কপোত লোকালয়ে নীত ও পালিত হইবার সময় হইতেই উল্লিখিত বিশেষ অঙ্গগুলির পরিবর্ত্তন-প্রবণতা প্রদর্শন করাইয়াছে এবং আজও করিতেছে। সুতরাং ঐ পরিবর্ত্তিত অংশগুলি আজও স্থায়ী না হইয়া কেবলি পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

পঞ্চম যুক্তি ;—এ যুক্তিটি অতি অকাট্য। আমাদের পাঠকেরা জানেন (বার্ত্তাবাহী-কপোত দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখুন) দুই স্বতন্ত্র জাতির (species) সঙ্গমে যে সন্তান হয়, তাহা-দিগকে দ্বিজাতীয় (hybrid) বলে ; আর দুই স্বতন্ত্র বর্ণের (variety) সঙ্গমে যে সন্তান হয়, তাহাকে অসবর্ণজ (mongrel) বলে। দ্বিজাতীয় ও অসবর্ণজ এতদুভয়ের মধ্যে শরীর-গত প্রধান প্রভেদ এই যে, দ্বিজাতীয় প্রায়ই সন্তান-জননশক্তি বিহীন হয়, কিন্তু অসবর্ণজ-দিগের সন্তান-জননশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। এক্ষণে, যদি পূর্ব্বোল্লিখিত একাদশ প্রধান কপোত বংশগুলি স্বতন্ত্র জাতিমূলীয় হয়, তাহা হইলে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অসবর্ণ-সঙ্গম হইলে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহা hybrid বা দ্বিজাতীয় হইবে। সুতরাং তাহা সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি বিহীন হইবে। কিন্তু আমার প্রকৃততঃ যাহা দেখি, তাহা ঠিক ইহার বিপরীত। কোন দুই বিভিন্ন বংশের অসবর্ণ-সঙ্গম প্রসূত সন্তান প্রকৃততঃ হাইব্রিডের ন্যায় উৎপাদিকা শক্তিবিহীন না হইয়া মংগ্রেলের ন্যায় সম্পূর্ণরূপেই উর্ব্বর হয়।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ যুক্তিটিকে আরো একটু বিশদ করি। যদি মনে করা যায় যে, লক্কা আর লোটন, কি বার্ত্তাবাহী আর মুক্ষি, কি পরপাঁও আর জেকবিন ইহারা সকলেই এক আদিম বংশ হইতে উৎপন্ন না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি (species) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, শারীরতত্ত্বের একটি নিয়মানুসারে লক্কা ও লোটনের 'যোড়' হইতে যে শাবক জন্মিবে সেই শাবকের সন্তান-জনন ক্ষমতা থাকিবেক না। কেননা সন্তান বিভিন্ন জাতীয় পিতামাতার সম্মিলনে উৎপন্ন হইল বলিয়া, ইহার আভ্যন্তরীণ জনন-শক্তি বা ইন্দ্রিয়ের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে ইহা সম্পূর্ণরূপেই অনুর্ব্বর হয়। অর্থাৎ ঐরূপ দুটি হাইব্রিডের 'যোড়' বাঁধিলে আর নূতন শাবক জন্মিবে না ইহা জীবোৎপত্তির একটি বিশেষ নিয়ম্। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখি লক্কা ও লোটনের যোড়ে যে সন্তান হয়, তাহা অনায়াসেই বংশবিস্তার করিতে পারে, উহাদিগের জননশক্তির কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। সুতরাং লক্কা ও লোটনের সন্তান হাইব্রিড-ধর্ম্মী না হইয়া মংগ্রেল ধর্ম্মী হইল মানিতে হইবেক। তাহা হইলে লক্কা ও লোটন দুই স্বতন্ত্র জাতি (species) না হইয়া, দুই স্বতন্ত্র বর্ণ বা বংশ (variety বা race) ইহাই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। সেই-

রূপ মুক্ষি ও বার্ত্তাবাহী জেকবিন ও পরপাঁও ইত্যাদি কপোত সকল কেবল বিভিন্ন বংশজ কেহ বিভিন্ন জাতিমূলক নহে, ইহাই অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য।

ডারউইন স্বয়ং বহুল পরীক্ষা করিয়া এই যুক্তির অখণ্ডনীয়তা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কলম্বিডি ফ্যামিলি অর্থাৎ ঘুঘু শ্রেণীর (কপোত ও ঘুঘু শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত জাতি) যাবতীয় জাতির পরস্পরের সহিত অসবর্ণ-সঙ্গম (Cross) করাইয়াছিলেন। ইহাদিগের শাবকসকল প্রকৃত হাইব্রিড্ ধর্ম্মী অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপেই অনুর্ব্বর হইয়াছিল। কিন্তু গৃহপালিত তাবৎ বিভিন্ন বংশের মধ্যে অসবর্ণ সঙ্গমোৎপন্ন শাবকসকল সম্পূর্ণরূপেই উর্ব্বর হইয়া থাকে! যাবতীয় কপোত-পালকগণও ডারউইনের পরীক্ষার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় গৃহপালিত কপোতবংশ যে একই আদিম বংশ হইতে উৎপন্ন, সকলেই যে একটি জাতির অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বংশমাত্র, তাহা আর অধিকতর স্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে প্রমাণীকৃত হইবার আবশ্যক করে না।

ষষ্ঠ যুক্তি ;—Reversion বা প্রতিগমন। জীবজগতে Reversion একটি অতীব আশ্চর্য্য কিন্তু অব্যাখ্যেয় তথ্য। মনুষ্য-সমাজে প্রতিগমনের নিদর্শন আমরা আশে-পাশে দেখিতে পাই। আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি অমুকের ছেলে তার পিতার মতও নয়, মাতার মতও নয়, কিন্তু তার মাতুলের মত, কি তার মাতামহের মত ; অমুকের মেয়ে তার মাতামহীর মত হইয়াছে, বাপ-মার মত হয় নাই ইত্যাদি। মহিলাগণ প্রায়ই কারো ছেলে-মেয়ে দেখিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে, ঈদৃশ মন্তব্য করিয়া তাঁহারা বস্তুতঃ এক গভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যেরই আবৃত্তি করিতেছেন। জীবজন্তুদিগের মধ্যেও এইরূপ নিদর্শন বিরল নহে। একটী মুক্ষি-কপোত ও একটি সাদা গোলা কপোতীর সঙ্গমে যে শাবক জন্মিয়াছিল, তাহা মুক্ষি-পিতার ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণেরও নহে, মাতার ন্যায় শুভ্রবর্ণেরও নহে। শাবকের বর্ণ ধূসর বা পাংশুবর্ণের হইল। আর, তার মাতার বা পিতার পক্ষোপরি কোন দাগ ছিল না ; কিন্তু শাবকের পৃষ্ঠে পক্ষদ্বয়ের উপর দুটি কাল বর্ণের রেখা দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে এই কাল রেখা-চিহ্ন কোথা হইতে আসিল, যখন পিতামাতার কাহারো পক্ষে কোন চিহ্ন ছিল না। পাঠক! আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত পার্ব্বত্য-কপোতের পক্ষদ্বয়োপরি ঠিক এইরূপ দুটি করিয়া কৃষ্ণরেখা-চিহ্ন থাকে। সুতরাং এই মুক্ষি ও গোলার শাবকটি পিতামাতার অনুরূপ হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, কেবল মুক্ষি ও গোলার শাবক নহে, অপর কোনরূপ দুটি বিভিন্ন বংশের কপোত-কপোতীর সঙ্গমোৎপন্ন শাবক প্রায়ই আদি পুরুষের (অর্থাৎ পার্ব্বত্য-কপোত) বর্ণ ও বিশেষত্ব লইয়া আবির্ভূত হয়। বর্ত্তমান গৃহপালিত তাবৎ কপোত-বংশের মধ্যেই আদিম পার্ব্বত্য-কপোতের বর্ণ ও অন্যান্য বিশেষত্বের পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা বিশিষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে। যে কোন কপোতপালক ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু এইরূপ প্রবণতা, এবং সকল কপোত-বংশের মধ্যে এই প্রবণতার সামঞ্জস্য, বিবিধ কপোত-

বংশের এক স্থান হইতে, এক মূল বংশ হইতে উৎপন্ন হইবার অন্যতম প্রমাণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

উপর্য্যুক্ত ছয়টি অখণ্ডনীয় যুক্তি ব্যতীত, আমরা আরো দেখি যে, কতিপয় বিশেষ বিশেষ প্রভেদ বাদ দিলে, প্রধান কপোত বংশগুলি পরস্পরের সহিত এবং কলম্বা লিভিয়া পার্ব্বত্য-কপোতের সহিত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের সম্যক্ সাদৃশ্য আছে। সকল কপোত-বংশই সভ্য ও মানব-সমাজ-প্রিয়, সকলেই সমান রূপে বৃক্ষ-শাখে বসিতে অনিচ্ছুক ; কেহই তরূপরি নীড় বাঁধিতে চাহে না ও বাঁধে না। সকল বংশীয় কপোতই দুইটি করিয়া অণ্ড প্রসব করে। (কিন্তু এ নিয়ম ঘুঘু শ্রেণীর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক নহে।) ডিম্ব ফুটাইতে সকলেরই প্রায় সমান সময় লাগে। সকলেই নানা প্রকার জলবায়ুর আতিশয্য সহ্য করিতে পারে। সকলেই একপ্রকার খাদ্যপ্রিয়। সকলেই সমানভাবে লবণের বিশেষ ভক্ত। সকলেই কপোতীর প্রতি প্রণয়-সম্ভাষণ কালে একইরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে। দুই একটির ব্যতীত সমুদয় বংশেরই কূজন একই প্রকার। (কিন্তু অন্য বন্য-কপোতের সদৃশ নহে।) রঞ্জিত কপোতের সকলেরই বক্ষদেশের পালকে এক বিশেষ প্রকারের ধাতব ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য লক্ষিত হয়। বর্ণ-বৈচিত্র্যে সকল বংশীয় কপোতই প্রায় সমানরূপে পরিবর্ত্তনের বিস্তারিত সীমা প্রকাশ করে। সকলেরই চঞ্চু বা পদাঙ্গুলির দৈর্ঘ্য একই রূপ। লক্কা ব্যতীত, অন্য সকলেরই পুচ্ছ ও পক্ষের পালক-সংখ্যা প্রায়ই সমান! সংক্ষেপতঃ, সমুদয় কপোত-বংশের মধ্যে, গলাফোলার পাকস্থালী, লক্কার পুচ্ছ, বার্ত্তাবাহীর চঞ্চু ব্যতীত, অন্য সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায়ই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রকৃতিতত্ত্ববিদ জানেন যে একটি শ্রেণীর (Family) মধ্যে দশটি কি বারটি এরূপ জাতি (Species) পাওয়া দুর্ঘট, যাহারা সাধারণ গঠন ও স্বভাবে পরস্পরের সহিত, অধিকাংশ স্থলে, এত ঘনিষ্ঠ ও নিকট সাদৃশ্য প্রদর্শন করিবে এবং কেবল কতিপয় অংশে এত অধিক পরিমাণে পার্থক্য দেখাইবে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কোন জাতির মধ্যে গঠনগত ও স্বভাবগত যে সমুদয় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তৎসমুদয়ই সেই জাতির পরিবর্দ্ধন ও সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু প্রধান একাদশটি কপোত-বংশের মধ্যে যে সমুদয় বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়, তাহার একটিও যে কাহারো কোন উপকারে আসে, তাহা কেহই জানে না। বরং পরিবর্ত্তনগুলি যে অনেক স্থলে সেই সেই বংশের পক্ষে সমুহ অসুবিধাকর ও বিপজ্জনক, এমন কি তজ্জন্য কাহারো কাহারো প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যেমন, লোটনের ভূমির উপর ডিগবাজী করিবার বিশেষ শক্তি। একবার লুটীতে আরম্ভ করিলে, যতক্ষণ না কেহ ধরিয়া ফেলে, ইহা ক্রমাগতই লুটিতে থাকে। এমন কি মরিয়া যায়, তবুও আপনার থামিতে পারে না। পরপাঁওর পায়ের পর এত অদ্ভুত রকমে পরিবর্দ্ধিত হয়, যে ধীরে ধীরে চলিবার পক্ষে পর্য্যন্ত ব্যাঘাতজনক হইয়া উঠে, উড়িবার কথা ত ঢের দূরের। লক্কার ? ও বিস্তারিত পুচ্ছ, উহার নিজের কোন উপকারেই ত আসে না ; তাহা ছাড়া ঐরূপ

পুচ্ছ যে উহার পক্ষে অসুবিধাকর ক্ষণকাল কোন লক্কা-দম্পতীকে দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। তবে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ কেবল কপোত-পালকদিগের খামখেয়ালি মতলব ও সখ। কপোত-পালকগণ শুদ্ধ আপনাদিগের সখ বা মতলবের বশবর্ত্তী হইয়া এবং আপনাদিগের ইষ্টচিন্তা দ্বারা চালিত হইয়া, কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা অস্বভাবাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ আনয়ন করিয়াছে। পরিবর্ত্তিত অঙ্গগুলি কপোতের কোন উপকার সাধন করে না, কপোত-পালকই বরং ইহা দ্বারা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়। বস্তুতঃ প্রধান প্রধান কপোত-বংশের বিশেষ পরিবর্ত্তনগুলি, মনুষ্য কর্তৃক আনীত বলিয়াই সংখ্যায় এত অল্প; এবং উহা দ্বারা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা স্বভাব ও ধরণ, (যাহা মানুষের খামখেয়ালির মধ্যে আসে নাই) এত অধিক সংখ্যায় ও সম্পূর্ণরূপে আজও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

প্রকৃতিতত্ত্ববিদগণ কপোত-বংশ মধ্যে উল্লিখিত কয়েকটি বিশেষত্বকে কৃত্রিম নির্ব্বাচনমূলীয় বলিয়া ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন না, এবং সেইজন্য বিশেষত্বসম্পন্ন কপোত-বংশকে ভিন্ন জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়াও বিবেচনা করেন না। যখন উক্ত পরিবর্ত্তনগুলি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনমূলীয় নহে, তখন সমুদয় কপোত যে কেবল এক আদিম-বংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখাবংশমাত্র, এক মূল জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণ মাত্র, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার নাই।

এক্ষণে, যদি প্রস্তাবোল্লিখিত যুক্তিগুলি উপেক্ষা না করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমুদয় কপোত-বংশ এক আদিম জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়া মানব কর্তৃক কৃত্রিম নির্ব্বাচনে পরিবর্ত্তিত হইয়া এত বিভিন্ন বংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইবার দেখা যাউক সেই আদিম জাতি কি। আমরা প্রস্তাবের প্রথমেই বলিয়াছি কলম্বাশ্রেণীর সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি বিভিন্ন জাতি বর্ত্তমানে সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। ডারউইন বলেন এই ছয় জাতির মধ্যে কলম্বা লিভিয়া জাতিই বর্ত্তমান গৃহপালিত বহুবিধ কপোত বংশের আদি পুরুষ। অন্য গুলি কেন পরিত্যক্ত হইল, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রের জঙ্গলি কপোত সর্ব্বাংশে কলম্বা লিভিয়ার অনুরূপ, এই জঙ্গলি কপোতগণ গৃহপালিত কপোতের সহিত সহজেই মিলিত হয়; এবং এই মিলন-জাত অণ্ড হইতে উর্ব্বর শাবক জন্মে। অন্য কোন জাতীয় কলাম্বার সহিত গৃহপালিত কপোতের সহজে সঙ্গম হয় না এবং মানবের সাহায্যে সঙ্গম হইলেও প্রসূত অণ্ড হইতে শাবক উৎপন্ন হয় না। সুতরাং কলাম্বা লিভিয়া ব্যতীত ঘুঘু বংশীয় অন্য কোন জাতিই বর্ত্তমান কপোতের আদি জনয়িতা হইতে পারে না।

প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্ব্বে আমরা আর একটি কথা বলিতে চাহি। কপোত বংশের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যাহা সত্য অন্যান্য গৃহপালিত পশুপক্ষীর অভ্যুত্থানপক্ষেও তাহা সত্য একথাও আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে। সমুদয় জাতি-বৈচিত্র্যের রহস্যের মধ্যেও ঐ এক গভীর প্রাকৃতিক সত্য নিহিত। বাহ্যিক আকার প্রকার ভাবভঙ্গী স্বভাবও ধরণ অনেক অসদৃশ হইলেও, সহিষ্ণুতা সহকারে সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায় অনেকেরই আদি একই। রহস্যপূর্ণ প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়মাধীন হইয়া জীব জন্তু উদ্ভিদ নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন চক্রে

বিঘূর্ণিত হইতে হইতে এক আদিম জাতি নানা বর্ণে পরিণত হইয়াছে। বর্ণগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনারা আবার কত নূতন বংশের উদ্ভাবক হইতেছে। এই নূতন বংশ হইতে আবার কত উপবংশের উদ্ভব হইতেছে। এইরূপে বংশবিস্তার করিয়া একটি বর্ণ কালে জাতি, পরে Genus, পরে শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইতেছে। আমাদের কোন ভবিষ্য প্রবন্ধে 'জাতি' সম্বন্ধে অলোচনা করিবার আশা রহিল।

শ্রীশ্রীপতি চরণ রায়।

স্বপ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রি। উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত। আমি আমার শয়ন কক্ষের সমুদয় জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া সেই হাস্যময়ী প্রকৃতির শোভা দেখিতে ছিলাম; মৃদু নৈশ সমীরণ আম্র মুকুলের সৌরভে আমায় ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, এবং আমার ইচ্ছা করিতেছিল এমনি রাতে—কি ইচ্ছা করিতেছিল তা আর বলিয়া কাজ নাই। আমি পড়িয়া পড়িয়া কেবলই ইচ্ছা করিতেছিলাম, কে যেন সহসা সেই কোমল সুগন্ধি বায়ুস্তর কম্পিত ও নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল।

"সে দিনও ত মধু নিশি
প্রাণে গিয়াছিল মিশি
মুকুলিত দশ দিশি
কুসুম দলে,
ছিল তিথি অনুকূল
শুধু নিমেষের ভুল
চিরদিন তৃষাকুল
পরাণ জ্বলে।"

সঙ্গীতের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইল, ভাবিলাম এ হৃদয় চিরদিন তৃষাকুল বটে, কিন্তু অনুকূল তিথিতে কেহ ত আমার প্রেমের আতিথ্য স্বীকার করে নাই, তবে কাহাকে কিসের ছলে ফিরাইব? যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ সঙ্গীত, না জানি তার হৃদয়ে কত ব্যথা; সুগভীর প্রেমের

সন্ধান পাইয়াও হয় ত না বুঝিয়া সে নয়নের জলে তাহাকে বিদায় করিয়াছে, এখন ছল করিয়া ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা! তখনি আবার নিজের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিলাম, দেখিলাম তাহা চিররুদ্ধ, প্রেম জ্যোতিহীন, অন্ধকার-ময় এবং শান্তি শূন্য। আমি চক্ষু মুদিলাম, কতক্ষণ চিন্তা করিলাম, কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম কিছু মনে নাই।

স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নই বটে, কিন্তু আজ তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; চন্দ্র-কিরণবিধৌত, সেই পরম শোভাময়ী বাসন্তী রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মধুর স্বপ্নের কথা চিরদিন আমার মনে অঙ্কিত থাকিবে; স্বপ্নে যে আমি সুন্দর মুখ দেখিয়াছি তাহা কখন ভুলিব না, সেই উজ্জ্বল প্রশান্ত, প্রেমপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ধ্রুবতারার ন্যায় আমার জীবনসমুদ্রে শুভ্রজ্যোতি বিকীর্ণ করিবে।

আমি দেখিলাম একটি সুদীর্ঘ সরোবর, নীল জল তাহার কূলে কূলে ভরিয়া রহিয়াছে; বায়ুপ্রবাহশূন্য নীল আকাশের নীচে তাহা এক খানি দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ ও অচঞ্চল। সরোবরের চতুর্দ্দিকে পুষ্প-কানন, গোলাপ, যুঁই, চামেলী, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ, প্রভৃতি কত রকমের ফুলের গাছ তাহার সংখ্যা নাই, এই সমস্ত ফুলের গাছ বেষ্টন করিয়া শত প্রকার বিভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পত্রবিশিষ্ট ক্রোটনের গাছ; অশোক, চম্পক, বকুল, দেবদারু, এবং ঝাউ বৃক্ষে এই উপবন শোভিত, তাহাদের সুদীর্ঘ উন্নত শির আকাশপটে চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। সরোবরের একদিকে একটি বিস্তৃত বাঁধাঘাট, তাহার অদূরে এক সুদৃশ্য শুভ্র অট্টালিকা। শুক্ল যামিনীর পূর্ণ চন্দ্র পূর্ব্বাকাশ হইতে তাহার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিতেছিল এবং তাহাতে সেই মনোহর প্রমোদ অট্টালিকা সরোবর জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। জ্যোৎস্নাস্নাত পুষ্প-কানন ও সুবৃহৎ উদ্যান একখানি রহস্যময় আলেখ্যবৎ আমার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইল।

আমার বোধ হইল এই সরোবরের নীলজলে একখানি ক্ষুদ্র তরণীর উপর বসিয়াছিলাম, আমার চারিদিকে শত শত প্রস্ফুটিত কুসুম ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল কিরণে আকাশ এবং উন্মুক্ত পৃথিবী বিধৌত হইতেছিল। আমার পার্শ্বদেশে একটি কিশোরী; তাহার সুন্দর, সরল সুকোমল মুখশ্রীতে প্রতিভা ও স্নেহ সুব্যক্ত; এবং তাহার চঞ্চল, উজ্জ্বল চক্ষে লজ্জা ও কৌতুহল তরঙ্গায়িত হইতেছিল। আমি বিস্ময়ের সহিত সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম, সহসা বালিকা তাহার শান্ত চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া স্নেহ-কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখিতেছ?" আমি তাহার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের স্তবকে হস্তার্পণ করিয়া হাসিয়া বলিলাম "রূপ,"—"ছাই রূপ,—আমার বড় লজ্জা করে," বলিয়া বালিকা আমার বক্ষে সুকোমল পুষ্পদলের ন্যায় মুখখানি ধীরে ধীরে নত করিল; হর্ষে আমার চক্ষু মুদিত হইল। যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়াছে এবং উষার লোহিত কিরণ বাতায়ন পথে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সুবিস্তীর্ণ সরোবর, রম্য পুষ্পকানন এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার নয়ন

পথ হইতে সহসা অপসারিত হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু সে মুখখানি আর ভুলিলাম না; এই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার মোহিনীমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য জীবনে সময়ে সময়ে এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যাহা ভাবিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু যাহার কোন কারণ কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি সেই রাত্রে স্বপ্নে যে কিশোরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার পর হইতে প্রায় প্রতি রাত্রেই তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম; প্রত্যহই তাহার ব্যাকুল কিন্তু কোমল দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত দেখিতাম, বোধ হইত তাহার যেন বিশেষ কিছু বলিবার আছে—কিন্তু তাহার মুখে কিছুই শুনিতে পাইতাম না। তাহার আয়ত্ত চক্ষু ও স্থির মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া এক এক সময় মনে হইত এ বুঝি কোন বিখ্যাত শিল্পীবিরচিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই বিধাতা বুঝি তাহাতে এ কোমলতা, লাবণ্য এবং জীবন্তভাব ঢালিয়া দিয়াছেন।

আমি ক্রমে এই বালিকার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম, বুঝিলাম তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিতে না পারিলে আমার জীবন বৃথা। কিন্তু সেই স্বপ্নরাজ্যের কুসুম, তাহাকে আমি এ পৃথিবীতে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? বাল্যকালে ঠাকুরমার কাছে গল্পে শুনিয়াছিলাম এক রাজপুত্র এইরূপ এক স্বপ্নদৃষ্টা নারীর সন্ধানে জাহাজে চড়িয়া এক বহুদূরবর্ত্তী দ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই নির্জ্জন দ্বীপে এক উন্নত প্রাসাদের উপর রাজকন্যাকে মরণকাটী ছোঁয়াইয়া কে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল, জীবনকাটী না ছোঁয়াইলে তাহাকে জাগ্রত করা যাইত না। ঠাকুরমার রাজপুত্র বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে জীবনকাটী আবিষ্কার পূর্ব্বক সেই রাজকন্যাকে জাগাইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হায়, আমি ক্ষুদ্র একালের মনুষ্য, এমন মন্ত্র কোথায় পাইবে যাহার বলে স্বপ্নের সেই ছায়াময়ী প্রতিমাকে মানবীরূপে আমার ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে সংস্থাপিত করিতে পারিব, বুঝিলাম আমার আশা সম্পূর্ণ বৃথা। সময়ে সময়ে আমার মনে হইত আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি, হৃদয় সংযত করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বপ্নে আবার সেই মোহিনী মূর্ত্তি অবিকৃত ভাবে আমার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা জলপ্রবাহে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইত। আমি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম; কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বলিতাম না, এই মানসিক অশান্তির উপর আর হাস্যাস্পদ হইতে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু কাহাকে কিছু না বলিলেও আমার আকার প্রকারে এত পরিবর্ত্তন দেখা গেল যে

পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন আমার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুই একজন বন্ধু স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দেশভ্রমণেরও ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় সে সময় বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত হইলাম না। এদিকে বাবা বহরমপুরে কাজ করিতেন, তিনি আমাকে সেখানে যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন; আমি বহরমপুরে পৌঁছিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে সেখানকার একজন প্রধান চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, জানিতাম চিকিৎসকের সাধ্য নাই আমার ব্যাধি আরোগ্য করে, কিন্তু পিতার অনুরোধ উপেক্ষণীয় নহে।

ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ করিবার পূর্ব্বে আমি একবারও ভাবি নাই যে আমার মনের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিব, কিম্বা ব্যক্ত করিয়া কোন লাভ আছে। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম প্রাণান্তেও এ স্বপ্ন বিবরণ কাহারো নিকট প্রকাশ করা হইবে না। কিন্তু তখন কে জানিত যে ডাক্তার বাবু একজন ঘোর থিয়জফিষ্ট? ডাক্তার বাবু আমার পীড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, আমি বলিলাম "আমি একটু দুর্ব্বল হইয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন পীড়া বুঝিতে পারি না, আপনার নিকট আসিবারও কোন আবশ্যক ছিল না, শুধু বাবার অনুমতিক্রমে আসিয়াছি।

ডাক্তার বাবু একবার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন, আমার বুক, পিঠ, চোখ, সর্ব্ব শরীর অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন "লংস্ কিম্বা অন্য কোথাও কিছু ব্যতিক্রম দেখিতেছি না, তুমি কোন রকম অসুখ বুঝিতে পার না?"

আমি উত্তর করিলাম "না, আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন "শরীর ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্ক নামক একটা যন্ত্রের কথা বোধ হয় তুমি অজ্ঞাত নহ?

আমি একবার শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি কি তবে মনে করিতেছেন আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? অধিক ইতস্ততঃ না করিয়া আমি বলিলাম "আজ্ঞে, হ্যাঁ, মস্তিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে।"

ডাক্তার বাবু। "সেই মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া অসম্ভব নয়।"

"না হইতে পারে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে সেজন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।" ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে আমি এই কথা বলিলাম।

ডাক্তার বাবু বোধ হয় তাহা বুঝিলেন, গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "কিন্তু তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ কি কখন তোমার মনে উদয় হয় নাই?"

অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু কি উত্তর দিব? আশ্চর্য্য হইয়া ডাক্তারের দিকে চাহিলাম।

ডাক্তার বাবু সহজ ভাবে বলিলেন "বোধ হয় তোমার নিদ্রা গভীর হয় না, হয় ত তুমি নিদ্রাবস্থায় অধিকাংশ সময়ই স্বপ্ন দেখ।"

বুঝিলাম আমার ধরা পড়িতে বিলম্ব নাই। চেয়ারে বসিয়াছিলাম, কিছু বেগের সহিত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম, সংক্ষেপে বলিলাম, "আপনার অনুমান যথার্থ।"

ডাক্তার বাবু আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ধীরে ধীরে বলিলেন "স্থির হও, আমার অনুমান সত্য হইবে তাহা জানি, ডাক্তারী করিতে করিতে বৃথাই কি এতকাল চুল পাকাইলাম? কিন্তু সে যাহা হউক, তোমার সমস্ত কথা যতই গোপনীয় হউক আমাকে অবাধে বলিতে পার। কোন কথা লুকাইবার কিছু আবশ্যক নাই, যদি কোন অংশ গোপন কর, সম্ভবতঃ তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না অথচ আমার চেষ্টা বৃথা হইবে।"

দুই মিনিট অগেও ভাবি নাই যে কথা আমার অন্তস্তলে লুক্কায়িত অছে তাহা ডাক্তার বাবুর কাছে এখনই প্রকাশ করিতে হইবে, ডাক্তারেরা শরীরের উপর অত্যাচার করেন সে সহে কিন্তু মনের উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। তথাপি এই ডাক্তারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার উপর আমার অনেকটা ভক্তি হইয়াছিল, আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় কোন আপত্তিও দেখিতে পাইলাম না সুতরাং তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বিবৃত করিলাম।

আশ্চর্য্য! ডাক্তার বাবু কিছু মাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; স্থির ভাবে আমার গল্প শুনিয়া গেলেন, যেন ইহা পূর্ব্বে আর একবার শুনিয়াছেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমাকে বলিলেন "যদি তুমি একান্ত আগ্রহের সহিত চেষ্টা কর তবে জাগ্রত অবস্থায় সেই স্বপ্নদৃষ্টা-সুন্দরীকে ভুলিয়া থাকিতে পারনা কি?"

আমি নত মস্তকে উত্তর করিলাম "চেষ্টা করি নাই, সম্ভবতঃ পারি।"

"তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ, এক মাস পরে আমার সঙ্গে আবার দেখা করিও, কেমন থাক শুনিব।"

বাসায় ফিরিলাম। নানা কার্য্যে, পাঠে, বৈষয়িক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সেই মুখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে গেলাম, কৃতকার্য্যও হইলাম; কিন্তু প্রত্যহ রাত্রে, নিদ্রাবস্থায় সেই চির পরিচিত মুখ আমার মানস পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল।

এক মাস পরে ডাক্তারকে একথা জানাইলাম। ডাক্তার বাবু শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নতমুখে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন "এই বালিকার মূর্ত্তি তোমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে, দেখ যদি তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাও।"

খুঁজিয়া পাইব! ডাক্তার বাবু কি আমাকে উপহাস করিলেন? স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়াছি, জীব-রাজ্যে যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই বিপুল পৃথিবীতে কোথায় তাহাকে খুঁজিয়া পাইব? ইহা কি সম্ভব?—না হউক, তথাপি একবার তাহার অনুসন্ধান করিব, চেষ্টা করিয়া দেখিব তাহাকে কোথাও পাওয়া যায় কি না? আমি ডাক্তার বাবুকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "অপনি কি সত্যই তাহার অনুসন্ধানের পরামর্শ দিতেছেন, না উপহাস করিয়া এরূপ বলিলেন?"

"এ সমস্ত গুরুতর বিষয় লইয়া আমি কখন উপহাস করি না।" গম্ভীর ভাবে ডাক্তার বাবু এই উত্তর দিলেন।

"আমি কোথায় তাহাকে খুঁজিয়া পাইব? বসুন্ধরা বিস্তৃর্ণ, জনসংখ্যা বিপুল, বিশেষ হিন্দু পরিবারে অবরোধ প্রথা প্রচলিত।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "সে সম্বন্ধে আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। চেষ্টা কর, স্বপ্নে যে স্থানের চিত্র দেখিতে পাও সেই স্থান অনুসন্ধান কর।"

"তাহা হইলে কি তাহাকে দেখিতে পাইব?"

"অসম্ভব কি? কোন কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে যে সকল আত্মার সহিত স্বপ্না-বস্থায় আমাদের সাক্ষাৎ হয়, হইতে পারে তাহারা তখন দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় আমরা কেহ কাহারো পরিচয় জানি না।"

আমি উদ্বেগের সহিত বলিলাম "তবে আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি।"

"হ্যাঁ, চেষ্টা কর।" ডাক্তার বাবু আর অধিক কিছু বলিলেন না, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বাবা ও মা শীঘ্রই আমার এই পাগলামির কথা শুনিতে পাইলেন। প্রথমে যখন আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেশ ভ্রমণে যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলাম, তখন তাঁহারা সে প্রস্তাবে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু এখন আমি মরীচিকার উদ্দেশ্যে সংসার মরুভূমে ছুটিতে চাই শুনিয়া তাঁহারা আমার উপর বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক লেখা পড়া শিখিয়া আমার মস্তিষ্ক যে সম্পূর্ণ বিগড়াইয়া গিয়াছে মা বাবার কাছে একথাও বলিলেন এবং পরিশেষে ঔষধ স্বরূপ একটি সুন্দরী কন্যার সন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু আমার এই পাগলামীর পোষকতা করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার উপরও কিছু তীব্র গালা-গালি বর্ষিত হইল; কিন্তু আমার সংকল্প বিচ্যুত হইল না। সেই দিন আমি গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগকরিলাম; পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে বটে কিন্তু যাহাতে তাঁহারা কিছু চিন্তিত না হন তাহারও উপায় করিয়া রাখিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু কোথায় যাইব? সম্মুখে সহস্র পথ বিদ্যমান, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? ডাক্তার বাবুর কথা গুলি পুনঃ পুনঃ আমার মনে আসিতে লাগিল। তিনি আমাকে উপহাস করেন নাই, তবে আমাকে এমন এক অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে, আকাশ কুসুম চয়ন করিতে প্রবৃত্তি দিলেন কেন? আমাকে

কি অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত? তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? যাহাহউক তাঁহার কথাগুলি আমার হৃদয়ে এক অভিনব বিশ্বাসের রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন "চেষ্টা কর স্বপ্নে যে স্থানের চিত্র দেখিতে পাও সেই স্থানে অনুসন্ধান কর।" কিন্তু তাহাও সহজ কাজ নহে; তবে স্বপ্নের সেই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিয়াছি যেখানেই হউক নিতান্ত পল্লীগ্রামের দৃশ্য সে নহে। অতএব প্রথমে কতক গুলি প্রধান প্রধান নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখা যাউক।

গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সেদিন সে মুখচ্ছবি বিষণ্ণ, আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন বোধ হইল; কিন্তু ইহা আমার কল্পনা অথবা যথার্থ এইরূপ হইয়াছিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এসম্বন্ধে আর অধিক চিন্তা না করিয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম এবং ধর্ম্মতলায় এক বন্ধুর বাসায় আড্ডা লইলাম; ইচ্ছা দেশ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় কি[illegible]ল থাকিয়া সন্ধান করি।

কলিকাতায় অসিয়া আমার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিলাম। কলিকাতায় পদার্পণ করার পর আমি এক দিন রাত্রেও সে বালিকাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই নাই। এরূপ হওয়ার কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার বাবুর পরামর্শে যে এক মাস কাল তাহাকে ভুলিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছি তখন সে স্বপ্নে প্রতি রাত্রে নিয়মিত রূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত, কিন্তু এখন আমি সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তির অনুসরণ করিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছি—আর সে স্বপ্নেও দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল! হায়, রমণীর হৃদয় কি এমনি চঞ্চল? যতক্ষণ তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবে ততক্ষণ সে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিবে, কিন্তু তাহার অনুসরণ করিবা মাত্র সে সরিয়া দাঁড়াইবে?

রাত্রির পর রাত্রি কাটিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। যখন স্বপ্নে সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত তখন মনে হইত নয়ন সমক্ষে এ মরীচিকার উদয় না হওয়াই ভাল, কিন্তু এখন দেখিতেছি রোগের অপেক্ষা ঔষধ সাংঘাতিক। এ কয় দিন আমি এই উন্মাদকরী স্বপ্ন হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছি, সেই যত্ন এত দিন পরে সফল হইয়াছে তথাপি আমার অশান্তি হ্রাস হইল না। যাহা হউক পরিশেষে আমার বাতিক সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ভাবিয়া দেশ ভ্রমণে না গিয়া বহরমপুরে ফিরিয়া আসাই উচিৎ মনে করিলাম।

আমি অরোগ্য লাভ করিলাম বটে, কিন্তু আরো অধিক চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। এই সময় আমার মনের অবস্থা এমন হইল যে আমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতাম না। আমার মনে হইত যেখানে সামান্য একটি চিন্তা, ক্ষীণ একটি ছায়া হৃদয়কে এত ব্যাকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে জীবনের পরপারে এমন কি বিভীষিকা আছে যে তাহারই ভয়ে মানুষ অতি দুঃখকষ্টেও জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে না?

কলিকাতায় দুই মাস বাস করিয়া বহরমপুরে ফিরিয়া আসিলাম। এবং সেই দিনই বৈকালে ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাসাতেই ছিলেন, আমাকে সাদরে

আহ্বান করিলেন, আমি অভিবাদন পূর্ব্বক হাসিয়া বলিলাম "ডাক্তার বাবু সুখবর আছে, আমার বাতিক আরাম হইয়াছে।"

"আরাম হইয়াছে!" তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, অবশেষে বলিলেন "তোমাকে দেখিয়া ত তাহা বোধ হয় না, কিরূপে আরোগ্য লাভ করিলে?„

"আমি আর স্বপ্ন দেখি না। এখান হইতে যাওয়ার পর আমি এক দিনও স্বপ্ন দেখি নাই।"

"এত দিন কোথায় ছিলে?"

আমি বলিলাম "কলিকাতায়।"

ডাক্তার বাবু প্রশ্ন করিলেন "এই দুই মাস, বরাবর?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"কলিকাতায় যত দিন ছিলে স্বপ্নে [illegible] দিনও সেই বালিকাকে দেখিতে পাও নাই?"

"না।"

ডাক্তার—"এখানে ফিরিয়া?"

আমি বলিলাম "আজ সকালে এখানে আসিয়াছি।"

ডাক্তার বাবু অনেক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন। তাহার পর আমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া একটা বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ঔষধের প্রতি আমার কিছু মাত্র আস্থা ছিল না, ঔষধে এ মানসিক বিকারের কি উপায় হইবে? কিন্তু ডাক্তার বাবুর অনুরোধে ঔষধের শিশিটা পকেটে পূরিয়া লইয়া বাসায় ফিরিলাম। পথশ্রমে বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া ছিলাম, সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। তিন দিন হইল বাবা বাড়ী গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না।

অতি প্রত্যুষে উঠিলাম। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, দীর্ঘ কালের পর স্বপ্ন অতি উজ্জ্বল ও মধুর বোধ হইল। বালিকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও প্রীতি আমার নিদ্রিত চেতনাকে মোহিত করিবার জন্য আমার মানস নয়ন সমক্ষে সমুদিত হইয়াছিল। স্বপ্নে তাহাকে যত বার দেখিয়াছি এমন সুস্পষ্ট রূপে আর কখন দেখি নাই; যদি চিত্রকর হইতাম তাহা হইলে বুঝি এই ছবি দেখিয়া তাহার নিখুঁত চিত্র আঁকিতে পারিতাম এবং সেই চিত্রের সাহায্যে হয়ত তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাও সম্ভব হইত।

সকালে উঠিয়া অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম; কিন্তু আমার মনে একটি চিন্তা প্রবল হইল, কলিকাতায় যতদিন ছিলাম একদিনও তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম না, আজ বহরমপুরে আসিয়াছি আর তাহাকে দেখিলাম ইহার অর্থ কি? তাহা হইলে সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা কি বহরমপুরেই কোথাও আছে? তাহা কে বলিবে? যে সমস্ত রহস্যময় ইঙ্গিত আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে তাহাদের অর্থ বুঝিয়া একটি নির্দ্দিষ্টপথ আবিষ্কার করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য; সুতরাং কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

বাবা পরদিন বাড়ী হইতে বহরমপুর আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা

মোটামুটি বলিলাম, শুনিয়া তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তোমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দিন দিন খারাপই দাঁড়াইয়াছে, তোমার বাতিকও দিন দিন বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া আমি তোমার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি এবং অনেক সন্ধানে একটি বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা বালিকাকে মনোনীত করিয়াছি।"

আমি বলিলাম "আপাততঃ এ সম্বন্ধে আপনি অধিক কিছু না বলিলেই ভাল হয়; বিবাহটা নিতান্ত ঔষধির মত গিলাইয়া দিলে বিশেষ শুভফল লাভ করা যায় আমার এমন বিশ্বাস নয়। আমাকে আরো কিছু সময় দেন, আমি আপনার ইচ্ছামত কাজ করিতে স্বীকৃত হইলাম।"

বাবা বোধ হয় আমার কথায় অনেকটা ভরসা পাইলেন, এবং আর অধিক জেদ করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া বলিলেন "তাহাই হউক, আরো পাঁচ ছয় মাস দেখ; কিন্তু যদি ইতিমধ্যে তুমি যাহার সন্ধানে ফিরিতেছ তাহাকে না পাও—পাইবে না তাহা বিলক্ষণ জানি—তাহা হইলে আমি যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি সেখানেই বিবাহ করিতে হইবে। কনের মাতামহকে বলিয়া আরো ছয় মাস বিবাহ বন্ধ রাখিব।"

আমি বলিলাম "এজন্য তাঁদের সাধ্য সাধনার এত আবশ্যক কি? মেয়ের বাজারে ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই যে একটি হাতছাড়া হইলে আর একটি পাওয়া দুষ্কর হইবে।"

বাবা বলিলেন "সে কথা আমি বুঝিব। বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ঠিক করিয়া না রাখিলে এই ছ মাস পরে তুমি আবার এক বৎসরের কিস্তীবন্দী করিতে চাহিবে সে হইবে না।"

বাবার সঙ্গে আর অধিক কথা হইল না। পুনর্ব্বার কনে খুঁজিতে বাহির হইলাম। হায়! কখন কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বহরমপুর ছাড়িবার আগে আর একবার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে, তাঁহার সহিত দেখা করিবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম; আমি যে পুনর্ব্বার সেই ছায়াময়ীর সন্ধানে যাইতেছি তাহাও জানাইলাম। আমি বহরমপুরে আসার পর আমার স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি হইতেছে শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইলেন না, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন "তোমাকে সেই স্বপ্নময়ী মূর্ত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি দিয়া ভাল করিয়াছি কি না বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু তুমি যে আমার পরামর্শ মত কাজ করিতেছ এজন্য আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি, হয় ত তোমার দ্বারা

আধ্যাত্মিক জগতের একটি সত্য পরীক্ষিত হইবে, কিন্তু তোমাকে আমি আর একটি পরামর্শ দিতে চাই।"

আমি বলিলাম "বলুন, আমাকে কি এই অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন ?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "না, আমি তোমাকে নিবৃত্ত হইতে বলি না। কিন্তু তুমি তোমার ভ্রমণের একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া লও; তুমি একবার প্রয়াগ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ঘুরিয়া আইস, বঙ্গদেশ হইতে অনেক ভদ্রলোক এ সময় ঐ সকল স্থানে তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে গিয়াছেন, সেই সকল তীর্থবাসীর মধ্যে হঠাৎ তুমি তোমার স্বপ্নদৃষ্ট কামিনীকে দেখিলেও দেখিতে পার। তাহা না হইলেও তীর্থ ভ্রমণের আর একটি সুফল এই যে, তাহাতে তোমার মন সংযত ও স্থির হইতে পারে। তাহার পর তোমার পিতা তোমার নিকট যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করাই উচিত হইবে। বিবাহ করিয়া সাংসারিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।"

আমি কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া তাঁহাকে বলিলাম "আমার কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে, আমি যে উদ্দেশ্যে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইব, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি? আপনার কিরূপ অনুমান হয় ?"

ডাক্তার বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন "বাপু, এ প্রশ্নটি অতি সহজ বটে কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। তুমি ইতিপূর্ব্বেও একবার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তখন তোমাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম, এখন যে তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিব তাহা বোধ হয় না; তবে তাহার পর এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে, এই বোধ হয় যে তোমার স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা পৃথিবীতে জীবিত আছে এবং তোমার ইচ্ছাশক্তি তোমার অজ্ঞাতসারেই তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তির এরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্লভ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। যাহার প্রতি এই শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তুমি তাহাকে জাগ্রত অবস্থায় চিনিতে পার বটে কিন্তু সে তোমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিলে চিনিতে পারিবে কি না তাহা বলিতে পারি না, চিনিতে পারাও যেমন সম্ভব না পারাও সেইরূপ সম্ভব, তবে নিদ্রিত অবস্থাতে সে যে তোমার অনুরাগিণী তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিও এ সমস্তই অনুমান, কোন অনুমানই অভ্রান্ত নহে। হয়ত স্বপ্ন ভিন্ন বাস্তবিকই অন্যত্র এ বালিকার অস্তিত্ব নাই; এরূপ অবস্থায় তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, তবে যে তুমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে দেখিতে পাও সে হয়ত তুমি সর্ব্বদা অনন্যমনে তাহার কথা চিন্তা কর বলিয়া।"

আবার আমি সন্দেহের গভীর জলে পড়িলাম; মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম তখন ত সর্ব্বদাই তাহার কথা চিন্তা করিতাম, তথাপি সে সময় একদিনও ত স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে পাই নাই।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "এ কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মনুষ্যের জ্ঞান

অল্প এবং সীমাবদ্ধ, 'There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

ডাক্তার বাবু রোগী দেখিতে বাহির হইলেন ; আমি বহরমপুর ত্যাগ করিলাম।

*　　*　　*　　*　　*

অনেক তীর্থস্থানে বেড়াইলাম, কোথাও অভীষ্ট দ্রব্যের সন্ধান পাইলাম না। ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ মাস এইরূপ পথে পথে বৃথা কাটিয়া গেল। বাবাকে বলিয়া আসিয়াছি ছয়মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিব। তিনি আমার জন্য কনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা করিব ; আর এ অনর্থক দীর্ঘ পর্য্যটন, এ দারুণ উদ্বেগ, এ শান্তিহীন মরুজীবনের মর্ম্ম-যন্ত্রণা অসহ্য। এখন বিস্মৃতিতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার শান্তি।

কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিব যদি তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশ দিতে না পারি ; আমাকে বিবাহ করিয়া বালিকা যদি চিরজীবনের জন্য অশান্তিভোগ করে, এবং ম্লানমুখে, কাতর ভাবে তাহা সহ্য করে তবে আমি তাহা কিরূপে সহ্য করিব ? নিজের বেদনা সহা যায়, কিন্তু আমার জন্য যে আর একজন বেদনা পাইতেছে তাহা অসহ্য।

তাহার পর আরো একটা ভয়ানক সম্ভাবনা ছিল, যে ছায়াময়ী মূর্ত্তির সন্ধানে আমি এতদিন অতিবাহিত করিলাম, একদিন হঠাৎ যদি সে আমার সম্মুখে পড়িয়া যায়, আমি যেমন অতৃপ্ত-হৃদয়ে তাহাকে খুঁজিতেছি, সেও যদি সেইরূপ অতৃপ্তির সহিত আমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, এবং দেখিতে পায় যে আমি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আর একজনকে বিবাহ করিয়াছি তাহা হইলে কি তাহার কোমলহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে না ?

আর বিশ দিন মাত্র সময় আছে। কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুর বাসায় আশ্রয় লইলাম। দুই একদিন পরে অন্য একটি বন্ধু আসিয়া তাঁহার ভ্রাতার বিবাহে বরযাত্রী হইবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, আমার মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে কোন আমোদ-উৎসবে যোগ দেওয়ার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু বন্ধুবান্ধববর্গের নিদারুণ বিদ্রূপবাহুল্যভয়ে বরযাত্রীদলের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

সন্ধ্যার পর বরযাত্রীদল কন্যাকর্ত্তার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কনের পিতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল। তাঁহার বাড়ী গঙ্গার ধারে, বিচিত্র বাতায়নশ্রেণী শোভিত, শুভ্র, উচ্চ, ত্রিতল সৌধের সুদৃশ্য কক্ষগুলি ভাগীরথীবক্ষ হইতে এক সুন্দর দৃশ্যপটের ন্যায় লক্ষিত হয়।

আজ এক বৎসর হইল, এক ফাল্গুনের রাত্রে একটি মোহকর স্বপ্নে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আজ এতদিন পরেও তাহার উত্তেজনায় আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ! বসন্তের ঈষৎ শীতল নৈশ বায়ু হিল্লোল তেমনি সুখকর এবং জীবজগতের শোকহর্ষ কোলাহল পূর্ব্ববৎ বিচিত্র, কেবল একটি বৎসরের স্মৃতি ও চিন্তা আমার হৃদয়ে

এক যুগব্যাপী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। আমি বরযাত্রীদলের সহিত মঙ্গলোচ্ছ্বাস পূর্ণ গৃহে উৎফুল্ল জনতার ভিতর প্রবেশ করি নাই, নদীতীরে এক আলোক স্তম্ভের নিকট বসিয়া নিজের এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। পরিষ্কার আকাশে অনন্ত নক্ষত্রের উজ্জ্বল প্রকাশ, এবং অদূরে ভাগীরথীবক্ষে শত শত নৌকায় ম্লান দীপরশ্মি জ্বলিতেছে।

আমি ভাবিতেছি; এক একবার অন্ধকারময় ভাগীরথীজলে, একবার বা পরপারের তিমিরাবৃত অট্টালিকা ও বৃক্ষাবলীর দিকে চাহিতেছি, এমন সময় বিজনতর 'ষ্ট্রাণ্ড রোড' প্রতিধ্বনিত করিয়া দুইটি কৃষ্ণবর্ণ বৃহদাশ্ব সংযোজিত একখানি সুদৃশ্য গাড়ী দক্ষিণদিক হইতে আসিয়া সেই উৎসব ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ভিতরে কেহ পুরুষ নাই, আরোহী তিনজন, দুইটি মহিলা এবং তাঁহাদের পরিচারিকা।

প্রথমে পরিচারিকাটি নামিয়া আসিল, তাহার পর একটি বর্ষীয়সী রমণী, পরিচ্ছদ দেখিয়া সধবা বলিয়া বোধ হইল, অনুমান করিলাম ইনি কোন ধনবান বৃদ্ধের স্ত্রী। অবশেষে একটি বালিকা অথবা যুবতী, বাল্য ও যৌবন উভয়ে আসিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, কোন অবগুণ্ঠন ছিল না, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে দেখিলাম সরল, অপূর্ব্ব সুন্দর, মহিমান্বিত মুখশ্রী। বালিকা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিল, অমনি আমার সহিত দৃষ্টির বিনিময় হইল। আশ্চর্য্য! এ সেই মুখ এবং সেই দৃষ্টি, আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। শুনিয়াছি মানবমন কখনও চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এই মুহূর্ত্তে আমি চিন্তার অতীত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

যখন পুনর্ব্বার চাহিলাম, দেখিলাম গাড়ী কিম্বা আরোহী কেহ নাই। তবে একি স্বপ্ন? চিরদিনই স্বপ্ন দেখিব? এতদিন নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি, এখন হইতে কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে হইবে? তাহাই হউক, মরীচিকা যাহার জীবনের সম্বল, স্বপ্নই তাহার অবলম্বন। কিন্তু এ স্বপ্নও এত শীঘ্র বিদূরীত হয় কেন? বিধাতার এ রহস্যের অর্থ কি? হায়, ভ্রান্ত মানবের নিকট তাঁহার কয়টা রহস্যের দ্বারই বা এ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হইয়াছে?

যাহাহউক সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। আমি যাহাকে খুঁজিতেছি সে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে; একটা সংশয় হইতে বাঁচিলাম, কিন্তু কতকগুলি নূতন সন্দেহ বর্দ্ধিত আকারে আমাকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিল। এ বালিকা কে, কোথায় পরিচয় পাইব? অনুমানে বোধ হইল কোন ধনাঢ্যের কন্যা, তাহার সহিত আমার বিবাহের সম্ভাবনা কত-টুকু? তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিবে? আমার স্বজাতীয়া না হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। এতগুলি কথা পূর্ব্বে আমার মনে উদয় হয় নাই, হইলে হয়ত জীবনের গতি অন্যদিকে পরিচালিত করিলাম। স্বপ্নের মোহে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হিন্দুসমাজে প্রেমের স্বাধীনতা নাই।

বালিকার পরিচয় লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। দুইদিন পরে বহরমপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে ফিরিতে দেখিয়া বাবার মনে আনন্দ হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। স্বপ্নসম্বন্ধে সাফল্য বা নিষ্ফলতা বিষয়ে তিনি কোন প্রশ্নই করিলেন না। দুই চারি দিনের মধ্যেই বিবাহের কথা উঠিল; প্রস্তাব পূর্ব্ব হইতেই এক রকম স্থির ছিল, ইতিমধ্যে যা কিছু হইয়াছিল সমস্তই আমার ভগিনী লীলার মুখে শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম পূর্ব্ব সম্বন্ধই পাকা হইয়া রহিয়াছে, কনের নাম শোভা, শোভার পিতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিজে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল।

শোভা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তাহার ও তাহার পৈত্রিক বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাহার মাতামহ বৃদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রই গ্রহণ করেন। শোভা কখন তাহার পিত্রালয়ে কখনও বা মাতামহালয়ে বাস করিত। গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে বাবার অনেকদিনের পরিচয়, যাহাতে এই আত্মীয়তা স্থায়ী এবং বর্দ্ধিত হয় এই অভিপ্রায়ে বাবা গোবিন্দবাবুর দৌহিত্রীর সহিত আমার বিবাহবন্ধনের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। লীলাকে বলিলাম "বাবাকে বলিস আমি কখন গোবিন্দবাবুর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিব না। আমি স্বপ্নের মেয়েকে জাগ্রতে দেখেছি কোনদিন তার সন্ধান পাব।"

বাবা আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, দুই একদিন পরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, সুতরাং আমার বিশ্বাস ছিল আমার মানসম্ভ্রম তোমার দ্বারা রক্ষা হইবে, কিন্তু আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম; এত কাল ধরিয়া কথা দিয়া আসিয়াছি আজ কি করিয়া গোবিন্দবাবুকে বলি তুমি তাঁহার দৌহিত্রীকে বিবাহ করিতে চাহ না, তিনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই, কিন্তু পিতামাতা যাহাতে অপ্রতিভ হন এমন কাজ কখন করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"—বাবার স্নেহপূর্ণ মুখে বিষাদ ও কাতরতার চিহ্ন দেখিয়া আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

রাত্রে খাইতে বসিয়াছি, মা গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "বাবা, এত লোকে বিয়ে ক'রে কত সুখে ঘরকন্না কচ্ছে আর তোর বিয়ে কত্তে এত অসাধ কেন? স্বপ্নে যাকে দেখেছিস্ তাকে কি পাবি—বাবা? কর্ত্তা সম্বন্ধ ঠিক করেছেন বেশ টুকটুকে মেয়েটি, ঘরও ভাল দেবে গোবেও বেশ, বড় সাধ ছিল তোর বিয়ে দিয়ে বৌমাকে ঘরে তুলি, তা তুই আমার সে আশা পুরাতে দিলিনে; একশ বছর হয়ে তুই বেঁচে থাক কিন্তু বৌ নিয়ে

ঘরকন্না করা আর আমার অদেষ্টে নেই।" মার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, পাছে আমার কোন অমঙ্গল হয় ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মোচন করিলেন।

আমি বড় ব্যথা পাইলাম। বাবা ম্লানমুখে কাতরভাবে বসিয়া, মার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমার স্বপ্নই কি বড় হইল? কে জানে তাহা সত্য? কে জানে জাগ্রতেও তাহাকে দেখিয়াছি; সেও স্বপ্ন না কেমন করিয়া বলিব? স্থির করিলাম পিতামাতার প্রীতির জন্য এ হৃদয় সমর্পণ করিব। প্রকাশ্যে বলিলাম "মা, গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিলেই যদি তোমরা সুখী হও তবে আমি আর এ বিবাহে আপত্তি করিব না, দিন স্থির কর।"

গোবিন্দ বাবুর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বাবা দুইদিন পরে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তিনি আমাকেও সঙ্গে লইলেন, বলিলেন "কলিকাতায় কতকগুলি জিনিষপত্র কিনিতে হইবে, তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে চলিবে না।" বাবার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলাম।

বাবার এক বাল্যবন্ধু ভবানীপুরে ডাক্তারী করেন, বাবার সঙ্গে আমি সেখানেই উঠিলাম, আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁহারা বহির্বাটীর একটি কক্ষ একেবারে ছাড়িয়া দিলেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বাবা গোবিন্দ বাবুর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। আমার একটি বন্ধু সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি বালিগঞ্জে আছেন, তাঁহার বাসার নম্বরও জানিতাম; সুতরাং বালিগঞ্জে তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।

আমি এ পর্য্যন্ত কোন দিন বালিগঞ্জের ভিতর যাই নাই, একবার দায়মণ্ডহারবারে গিয়াছিলাম রেলের গাড়ী বালিগঞ্জ ষ্টেসনে দাঁড়াইয়াছিল, সেই গাড়ী হইতে যতটুকু দেখা যায় বালিগঞ্জ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ততটুকু; রাস্তার ধারে ঝাউ ও দেবদারু গাছের সারী, জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি অট্টালিকা।

অপরিচিত স্থান হইলেও বালিগঞ্জে বন্ধুর বাসা খুঁজিয়া লইতে কোন অসুবিধা হইল না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার পর সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই সেখান হইতে বিদায় হইলাম।

রাস্তাগুলি অতি সুন্দর। চারিদিকে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে সুসজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান। অট্টালিকাগুলি কলিকাতার সুবৃহৎ হর্ম্ম্যরাজীর ন্যায় আপনাদের শ্বেত ও লোহিত পঞ্জর বাহির করিয়া চক্ষুর অতৃপ্তি উৎপাদন করে না। এই সকল সুদৃশ্য অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে প্রচুর শ্যামল লতাপল্লব ও বৃক্ষাদি থাকায় সেগুলি অত্যন্ত মনোরম ও প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

পৃথিবীতে এখনো সান্ধ্য অন্ধকারের ছায়া পড়ে নাই, সমস্ত দিনের রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণী যেন এখন অনেকটা সুস্থির, এবং প্রাণীজগতের বিপুল কলরব এখন অনেক পরিমাণে মন্দীভূত।

জনবিরল পথ দিয়া ঘর্ঘর শব্দে দুই একখানি সুন্দর গাড়ী গড়ের মাঠের দিকে চলিয়াছে, অধিকাংশ গাড়ীতেই শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী বিদ্যমান। স্থানে স্থানে তিন চারিজন যুবক দল বাঁধিয়া আপনাদের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আমি একদিক হইতে ঘুরিয়া আর এক দিকের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ একটি বাগানের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম এ উদ্যান আমার অপরিচিত নহে; কিন্তু পরিচিতই বা কিরূপে হইবে? এদিকে আমি এই প্রথম আসিতেছি। আমার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল,—এ সেই স্বপ্নদৃষ্ট উপবন। আমি চলিতেছিলাম, মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইলাম, আমার মধ্যে এক অদ্ভুত পূর্ব্বক্রিয়া চলিতে লাগিল। মুগ্ধের ন্যায় আমি উদ্যানে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সেই অট্টালিকা, পুষ্পকানন, এবং আতট জলপূর্ণ দীর্ঘিকা; বাঁধাঘাটের নিকট একখানি কাষ্ঠাসনে আমি বসিয়া পড়িলাম। উদ্যানাধিকারীর সম্মতি না লইয়া তাঁহার উদ্যানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া যে গুরুতর অন্যায় করিতেছি, আমার সে জ্ঞানটুকু পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরে দেখিলাম একটি রমণী, যেন প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি, কতকগুলি প্রস্ফুটিত কুসুম চয়ন করিয়া অট্টালিকার দিকে আসিতেছেন, আমি প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, অদূরে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি একবার আমার দিকে চাহিলেন, বোধ হইল তাঁহার মুখ হইতে বিস্ময়ব্যঞ্জক কোন শব্দ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শুনিবার আমার কিছুমাত্র অবসর ছিল না, আমার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিতেছিল; ইনি সেই স্বপ্নদৃষ্টা রমণী। সেই বিবাহোৎসবের রাত্রে তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছিলাম, সেদিন আমার মনে হইয়াছিল হয় ত আমার কল্পনা আমাকে ছলনা করিতেছে, কিন্তু আজ আমি চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি বিকল হৃদয়ে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে যখন আমি মাথা তুলিলাম দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম; একবার ভাবিলাম এ বাড়ী কাহার জিজ্ঞাসা করি, আবার মনে হইল আগামী কল্য আনুপূর্ব্বিক সকল সন্ধান লইব। গ্যাস জ্বালিয়া দিয়াছে এবং সেই আলোকে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ-শোভিত পথগুলি বেশ স্নিগ্ধবেশ ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যার অল্প পরে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, পথে ঠিক করিয়া লইলাম এ প্রকার অবস্থায় গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীকে কিছুতেই বিবাহ করা যাইতে পারে না।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম বাবা গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন, মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন, তাঁহার এ রকম অপ্রসন্ন ভাব পূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; ভাবিলাম আমার মনের কথা এখনো ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করি নাই, তবে এমন বিরক্তির লক্ষণ দেখিতেছি কেন? যাহাই হউক আজ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অন্য দিন হইলে হয় ত এ সময় বাবার সঙ্গে কথা কহিতে ভয় হইত, কিন্তু আজ এখনি তাঁহাকে আমার

অভিপ্রায় বলা প্রয়োজন, বিলম্ব হইলে তিনি বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিবেন ; ইহারই মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়াছেন কি না কে জানে ?

ধীরে ধীরে আমার বক্তব্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম, বলিলাম "এতদিন পরে যখন আমি সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকার সন্ধান পাইয়াছি তখন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে আমি আপাততঃ অসমর্থ ;—অন্য কাহাকেও বিবাহ করি ইহা হয় ত বিধাতারও অভিপ্রায় নহে, নতুবা এতদিন তাহাকে কোথাও সন্ধান করিয়া খুঁজিয়া পাইলাম না, আপনি বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছেন আর হঠাৎ আজ তাহার সন্ধান পাইলাম !"

নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মানব কত সময় বিধাতাকে পর্য্যন্ত তাঁহার উচ্চ সিংহাসন হইতে পৃথিবীর ধূলিময় স্বার্থের মধ্যে টানিয়া আনে !

বাবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "তোরা কি সকলেই পাগল হয়েছিস ? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। গোবিন্দ বাবু বোল্লেন তাঁর দৌহিত্রী কিছুতেই বে কর্ত্তে রাজী নয়, তার কাছে পুনর্ব্বার বের প্রস্তাব কল্লে সে একটা অনর্থ ঘটাবে, এদিকে তোর এই দশা ; এ হো'ল কি ?"

শুনিয়া আমার একটু আহ্লাদ হইল। আমি বলিলাম "গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রী শুনিয়াছি শিক্ষিতা, তিনি উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন ; এ বিবাহে আপত্তি থাকিলে তিনি কেন ইহাতে মত দিবেন ?"

বাবা আমার এই উত্তর শুনিয়া আরো চটিয়া গেলেন, সক্রোধে বলিলেন "এরকম পাগলামী তোর মত পাগলের মুখেই শোভা পায়,—" তিনি বোধ হয় আরও দুই একটা দুর্বাক্য বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক অনাহুত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন ; আমি রক্ষা পাইলাম।

বাবা সেই ভদ্র লোকটিকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইলেন, আমাকে বলিলেন "গোবিন্দ বাবুকে প্রণাম কর।"

ইনিই গোবিন্দ বাবু? আমি তাঁহাকে এই প্রথম দেখিতেছি, আমি প্রণাম করিলে তিনি আমাকে সময়োচিত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে দুই একবার চাহিয়া দেখিলাম।

গোবিন্দ বাবু তাঁহার বাড়ীতে রাত্রে আহারের জন্য বাবার ও আমার নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৌহিত্রী বিবাহে অনিচ্ছুক শুনিয়া বাবা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, পাছে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না যাই ভাবিয়া নিজেই ডাকিতে আসিয়াছেন।

নীচে গোবিন্দ বাবুর গাড়ী প্রস্তুত ছিল, আমরা গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে খিদিরপুরে চলিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ বাবুর বর্হিবাটীতে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা নামিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম, বাবা গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে নানা বৈষয়িক আলোচনা করিতে লাগিলেন, সে সমস্ত কথা আমার কিছু মাত্র ভাল লাগিতেছিল না; আমি উঠিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সেখান হইতে গোবিন্দ বাবুর বাড়ীর যত খানি অংশ দেখা যায় দেখিতে লাগিলাম। বাড়ীটি অতি সুন্দর, সাহেবদের বাড়ীর মত। সে দিন শুক্লময়ী রাত্রি। চন্দ্রালোক ঈষৎ মলিন হইলেও বেশ মধুর; সেই অস্পষ্ট চন্দ্রকিরণ গোবিন্দ বাবুর তুষার ধবল অট্টালিকায় আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং অদূরবর্ত্তী উদ্যানে স্থিরবৃক্ষগুলি স্নিগ্ধ ছায়া কোলে লইয়া সেই সুধাময় কিরণে নিদ্রা যাইতেছিল।

এমন সময় রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বর অতি মৃদু, যেন আপনার মনে বসিয়া কে গাহিতেছে। যৎপরোনাস্তি কৌতূহল বোধ করিলাম। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম গোবিন্দ বাবুর অন্তঃপুরের সম্মুখবর্ত্তী গৃহ হইতেই এ স্বর আসিতেছে। দক্ষিণের বারান্দা হইতে অন্তঃপুরের দিকে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারা যায় অগ্রসর হইয়া রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া গান শুনিতে লাগিলাম; এবার স্বর অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট বোধ হইল, আমি শুনিতে পাইলাম,—

“আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশি দিন হেথা ব’সে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া,
র’ব বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখ পানে চেয়ে হাসিয়ো!
তুমি চিরদিন মধু পবনে
চির বিকশিত বন ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ স্রোতে ভাসিয়ো!
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো!”

আমি স্থান কাল ভুলিয়া বিহ্বল চিত্তে এই সঙ্গীতে মগ্ন হইয়াছি; এ সঙ্গীত কি গায়িকার মর্ম্মোচ্ছাস ? বাস্তবিকই কি তাহার প্রাণের ভাষা ?—আমার প্রাণের সমস্ত সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই সঙ্গীতের প্রতিবর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন গীত-ধ্বনি থামিয়া গেল, দেখিলাম চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। বাবা ও গোবিন্দবাবুকে বারান্দায় দাঁড়াইতে দেখিয়া আমি একটু লজ্জিত হইলাম।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিলে আমরা বাড়ীর ভিতর আহার করিতে চলিলাম। একটি সুসজ্জিত, উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষে আমাদের আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

আমি গোবিন্দ বাবুর পশ্চাতে ছিলাম, গৃহকক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম সেই গৃহের অন্য একটি দ্বারের নিকটে একটি প্রস্ফুটিত কুসুম স্বরূপিণী লাবণ্যবতী কিশোরী,—ইনি কে ? উদ্বেলিত হৃদয়ে এক বার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার দৃষ্টিপাতমাত্রে রমণী ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় চকিতে আমার দিকে চাহিয়া সত্বর পদে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আমার চক্ষু প্রতারিত হয় নাই, এ সেই মূর্ত্তিই বটে। ইহার সঙ্গীতেই কি আমি মুগ্ধ হইয়া ছিলাম ? তবে কি সে স্বপ্ন বালিকার জীবনও ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে ? এতদিন ধরিয়া নিশি নিশি যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, দিবসে সহস্র কাজের মধ্যেও যাহার চিন্তা আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, আজ এই এক বৎসর ধরিয়া দেশে দেশে যাহার বৃথা অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি, আজ সেই স্বপ্নের রত্ন এখানে ?—না জানি গোবিন্দ বাবুর ইনি কে ! আমি আড়ষ্ট ভাবে আসনের উপর গিয়া বসিলাম এবং অতি কষ্টে মনোভাব সংগোপন করিতে হইল, কিন্তু বাবা আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে ?"

আমি বলিলাম "হঠাৎ বড় অসুখ বোধ করিতেছি।"

আহারাদির পর বাসায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু হিম লাগিয়া অসুখ বাড়িতে পারে ভাবিয়া গোবিন্দ বাবু সে রাত্রে আর আমাদের বাসায় আসিতে দিলেন না।

* * * * * *

এক বৎসর পরে আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি ফিরিয়া আসিয়াছে। বালিগঞ্জের সেই উপবনস্থ দীর্ঘিকার স্থির স্বচ্ছ সলিলে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকার উপর বসিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভে আচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রকৃতির নীরব মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছি; এবং একবার আকাশের চন্দ্রের দিকে ও একবার আমার পার্শ্ববর্ত্তী আর এক খানি মুখ-চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিতেছি কোন খানি অধিক সুন্দর। এমন সময় শোভা ধীরে ধীরে তাহার ললাট হইতে কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশস্তবক সরাইয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখিতেছ ?"—আমি বলিলাম "শোভা, এতদিনে আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে; আমি প্রথমে যে দিন তোমাকে স্বপ্নে দেখি সেই স্বপ্নদৃশ্য ও আজিকার এই

প্রকৃত দৃশ্য অভিন্ন, তাই সেই স্বপ্নের ছবি ও আজিকার সত্যের ছবি মিলাইয়া দেখিতেছি।” তাহার পর একটু থামিয়া বলিলাম “এই সারা বৎসর তোমাকে আমি কোথায় না খুঁজিয়াছি?” শোভা হাসিয়া আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া উত্তর করিল “আমিও ত তোমারই পথ চাহিয়া ছিলাম।”

ফাল্গুন মাসের শেষে আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যাকালে বালিগঞ্জের সুবিস্তীর্ণ উদ্যানে তস্করের ন্যায় যখন অনধিকার প্রবেশ করি, তখন কি স্বপ্নেও এক বার ভাবিয়া ছিলাম যে এই প্রশস্ত অট্টালিকাই আমার প্রিয়তমার পিতৃগৃহ এবং এক দিন ইহার প্রত্যেক কক্ষে আমার ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তির পদধূলি অঙ্কিত হইবে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

আমাদের চালচলন।

কলিকাতা সহরের রাস্তায় বোধ হয় অনেকেই এমন দুই একজন পাড়াগেঁয়ে যুবককে দেখিয়াছেন যাহাদের পায়ে সুতার কোর মোজার উপর হণ্টিং বুটজুতা, পরণে চওড়া পাড়ের ধুতি যাহার সহিত রজকের এখনও পরিচয় হয় নাই, গায়ে হোয়াইটওয়ে লেডলর বাড়ীর কলার দেওয়া কামিজ, তাহার উপর লম্বা করিয়া ভাঁজা চাদর গলা ও বক্ষ বেষ্টন করিয়া সম্মুখে উভয় প্রান্তে দোদুল্যমান। আর অনেকেই এইরূপ পোষাক-শাস্ত্রের জীবন্ত সংক্ষিপ্ত-সার দেখিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হাসিবার সময় আমাদের ভোলা উচিত নয় যে আমাদের চালচলন আগাগোড়াই এই রকম বেমক্কা।

যিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের হাস্যোদ্রেকের হেতু তাঁহাকে এ বিষয়ে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও ঈষৎ কুপিত হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিবেন যে “মহাশয় এর মধ্যে কোনটা বাদ দিব; জুতা, মোজা, চাদর, কামিজ না ধুতি?” অবশ্য বাদ ইহার কিছুই দিতে হইবে না, যাহাতে সুমানান হয় তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

আমাদের এখনকার চালচলন যে যত্রতত্র এই রূপ বেমানান, অশোভন বেমক্কা, এ কথা চোখ থাকিলে আর কেহ অস্বীকার করিবেন না। এবং ইহা যে অনেক রকম অদ্ভুত, হাস্যকর, মনঃক্ষোভজনক ফলোৎপত্তি স্থান তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক নাই।

মাদুরে শুইয়া মাটির দেরুকায় রেড়ির তৈলের একটি সলিতার মিট্‌মিটে আলোকে হতকচ্ছ ধুতি পরিয়া সেক্‌সপিয়ার-পড়িতে ইচ্ছা হয় পড়, তাহতে তোমার চক্ষুর পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সমাজের ইহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। তোমার মন নানা আভরণে

সজ্জিত করিয়া বাহিরের চালচলনে তাহা প্রকাশ না কর তবে কেবল তোমারই তেজোহীনতার অপৌরসের পরিচয় হইবে এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু যদি তুমি পূলের বাড়ীর ইংরেজি পোষাক পরিয়া জ্যাকেট বোম্বাই সাড়ী ও টুপিতে সুশোভিতা লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহলক্ষ্মীকে দক্ষিণে বসাইয়া খোলা গাড়ীতে রেড় রোডে হাওয়া খাইতে যাও তাহাতে দেশের ও সমাজের হানি আছে কি না ভাবিবার বিষয় হইবারই সম্ভাবনা। যদি তুমি সুবিধার জন্যই হউক আর দেশের উপর ঘৃণা করিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক ইংরেজের দলে মিশিয়া ইংরেজ হইয়া যাও তাহাতে অন্ত কাহারও কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যদি অৰ্দ্ধ-অঙ্গ ইংরেজ আর বামার্দ্ধ (ইংরেজী মতে উত্তম অৰ্দ্ধ) দেশী হও তাহাতে তোমার গৃহলক্ষ্মী ও তাঁহার স্বদেশীয় আমাদের অপমান হয় ভিন্ন মান বাড়ে কি না? বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, কেন যুগল মূৰ্ত্তিই ইংরেজি পোষাকে রচিত না হও। আমার বোধ হয় বুদ্ধি ব্যামোহকর কুতর্ক স্ত্রীহৃদয়ের বৈশুদ্ধি কলঙ্কিত করিতে পারে না এজন্যই এই রূপ ঘটিয়া থাকে।

আমাদের দেশে এখন নানা রূপ বিশৃঙ্খলতার দ্বারা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ। পূর্ব্বে আমাদের আশা ভরযা উত্তম যে রূপ ছিল চালচলনও সেই অনুরূপ ছিল। এখন শরীর বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া পুরাতন চালচলন আর গায়ে লাগেনা। এখন জীবন সংগ্রাম অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমনি ঘোর রূপ ধারণ করিয়াছে যে তাড়া তাড়ি সজ্জিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তাই নানা রূপ বিভ্রম উপস্থিত হইতেছে, সজ্জার বিপরীত-ন্যাস পদে পদে ঘটিতেছে।

সর্ব্ব অবস্থাতেই লোককে স্থির বুদ্ধিতে কাজ করিতে হয় নতুবা যে পরিমাণ তাড়াতাড়ি করিবে সেই পরিমাণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিলম্ব হইবে। More haste less speed—এই ইংরেজি প্রবাদটি সকল বিষয়েই খাটে। আমারও নিবেদন এই যে কিসে আমাদের চালচলন ঠিক আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী হয় তাহা স্থির করিয়া তবে হাত পা বাড়ান উচিত। যদি ইংরেজের সমুদয় চালচলন লইলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তবে তাহাই লইব প্রয়োজন না হইলে কিছুই লইব না। ইংরেজের চালচলন বলিয়াই তাহা হেয়ও নহে উপাদেয়ও নহে। আগে প্রয়োজন বুঝিয়া পরে উদ্যম। নিষ্প্রয়োজনে যাহা কিছু লও বা পাও তাহাই দাসত্বের বেড়ী—বেড়ী সোনার হইলেও ত বেড়ী বটে।

আমাদের চালচলনের কোন অংশ ছাঁটিয়া কোন অংশ বাড়াইবার সময় বা নুতন কোন চালচলন পুরাতনের উপর জোড়া দিবার সময় ইতিপূর্ব্বে যে কথাগুলি বলা হইল তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক। আমাদের সমাজের অল্পদিনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে কোন অভিনব আচার স্বগত নির্দ্দোষ বা গুণপূর্ণ হইলেও সমাজের কোন অভাবের অপেক্ষা না করিলে কখনও জীবন্তভাবে গজাইতে পারে না।

চৈতন্য মহাপ্রভু বাঙ্গালায় জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের মধ্যে গোস্বামী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ

কায়স্থগণ ব্যবহারে জাতি বিভাগ মানিয়া উপাসনা প্রভৃতি পারমার্থিক বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের অনুগত রহিয়াছেন ও বৈষ্ণব নামে একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। রামানন্দ যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন তাহাতেও "রামায়ৎ" বৈষ্ণব নামক একটী নূতন জাতি সংগঠিত হইয়াছে দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে এইরূপে জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টায় নূতন জাতি গঠন যত্রতত্র দেখা যাইবে। আমাদের সমসাময়িক ব্রাহ্মদিগের অভ্যুদয়েও পূর্ব্বের অনুরূপ ফলই উৎপন্ন হইতেছে, দেখা যায়। আমি অনেক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত দলিলে দেখিয়াছি যে দলিলকর্ত্তার জাতি ব্রাহ্ম বলিয়া উল্লেখ আছে।

আসল কথা হইতেছে যে এদেশের লোক এখনও সমগ্র দেশের মধ্যে বর্ণৈকত্বের প্রয়োজন অনুভব করে নাই। এ নিমিত্ত এখন যাঁহারা জাতিবিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা দেশের লোকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু দেশের লোক তাঁহাদের নিষ্প্রয়জনীয় নহে। দেশের লোক তাঁহাদিগকে ভিন্ন জাতি বলিয়া স্থান দিতে পারে কিন্তু তাঁহারা দেশের লোককে বসাইবার জন্য স্বতন্ত্র আসন দিতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে পাকে প্রকারে নিজেকে একটি ভিন্ন জাতি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

যেমন দেশের অর্থ সমষ্টি বাড়াইবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির আরামের মাত্রা বাড়াইতে হয় তেমনি মনুষ্যের সম্বন্ধে মনুষ্যের অভাব না বাড়াইলে জাতির গণ্ডী পার হইবার উপায় নাই। আর এই অভাব বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞান ও বুদ্ধি চর্চ্চার উন্নতি সাধন। যদি জ্ঞানবুদ্ধি বাড়িলেও এক জাতি অন্য জাতির অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া যায় তাহা হইলে জাতিভেদ একটা নৈসর্গিক সত্য তাহার প্রতিবিধান করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি জাতিবিভেদ কাল্পনিক হয় তাহা হইলে কখনও এরূপ অগ্রপশ্চাৎবর্ত্তিতা থাকিবে না।

শেষ ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, কোন একটী চালচলন ভাল কি মন্দ তাহার একমাত্র কষ্টি পাথর প্রয়োজন জ্ঞান। আমাদের অভিনব দুই একটী চালচলন একটুকু বিশেষরূপে এই কষ্টি পাথর দিয়া পরীক্ষা করিলে সকলেই নিজ নিজ ঘরে বসিয়া পরীক্ষক হইতে পারিবেন—এরূপ আশা করা যায়।

এখন নানা শক্তির সংঘাতে অন্তঃপুরের পর্দ্দা অনেক পাতলা হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া লোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহাদের গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাতায়াতের সংস্থান নাই তাঁহাদিগকেও রেলে মেয়েছেলে লইয়া যাতায়াত করিতে হয়। নীতির উন্নতির সহিত স্ত্রী এখন আমাদের সহচরী হইয়াছেন। কলিকাতায় বহু বিদেশীয় সমাগমে ও মফঃস্বলে এক মেজাজের লোকের অসদ্ভাবে লোককে অনেকটা বাড়ীর লোকের সহিত একেলা থাকিতে হয়। এইরূপ নানা কারণে স্ত্রীলোকের অবস্থা অনেকটা য়ূরোপীয় আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই গতির মূলে প্রয়োজন দেখিয়া মনে হয় ইহার প্রতিরোধ হওয়া সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে এই অনুমানটি আরও দৃঢ়ভূমি প্রাপ্ত হয়। কলিকাতা-সহরে ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কীযে নিতান্ত দুর্লভ

দর্শন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীচড়া রেওয়াজ অনেক বাড়িয়াছে এবং টেক্স আফিসে খবর পাওয়া যায় যে কলিকাতায় পাল্কীর সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।

মানুষ ও পশুপক্ষী সকলের মধ্যেই দেখা যায় যে চালচলনের শোভনতা স্ত্রীলোক লইয়াই অধিক। তা'ই আমাদের স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্যবহারঘটিত চালচলন লইয়া পূর্ব্বোক্ত কষ্টি পাথর লাগাইলে দোষগুণ সহজে ধরা পড়িতে পারে।

আমার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু সম্বন্ধে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে উপস্থিত কথার একটী উপাদেয় উদাহরণ পাওয়া যায়। বন্ধু কয়েক বৎসর য়ুরোপ ও মার্কিনদেশে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন। আসিবার দুই এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে ইভনিং পার্টিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। উপস্থিত হইবার পরে কোন আত্মীয়া তাঁহাকে একজন খ্যাতনামা মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দেন। মহিলা মহোদয়ার পাশ্চাত্য জাতি অনুযায়ী মিষ্টালাপে তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হ'ন। এবং যথাসাধ্য তাঁহার মনস্তুষ্টি করিবার যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। এই ঘটনার অনতিপরে উপাধি বিতরণ উপলক্ষে আমার বন্ধু সেনেট হাউসে গিয়া সেখানে সেই মহিলাকে দেখিতে পান। সভাভঙ্গের পর বারান্দায় মহিলাটির সহিত দেখা হইলে পুনর্ব্বার আলাপ করিবেন এই আশায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। মহিলাটি ঠিক তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন এবং পূর্ব্ব পরিচয়ের চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া বরাবর নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমার বন্ধু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐরূপ রূঢ়ভাবে পূর্ব্ব পরিচয় অস্বীকারের হেতু বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। বন্ধুর তখনও ইংরেজি বিশেষ অভ্যস্ত ছিল তাই মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—By Jove ! a dead cut. What's that for ? পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মহিলাটির নিকট নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার কোনরূপ গুরুতর কুৎসা করিয়াছে।

কয়েক দিন পরে অন্য কোন বন্ধুর বাড়ীতে আমার হতভাগ্য বন্ধু দেখিলেন যে, সে মহিলাটি উপস্থিতা ও অপর একজন মহিলার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। শেষোক্ত মহিলাটি আমার বন্ধুর একজন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিণী বান্ধবী। বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়া পিছাইবার জোগাড় করিতেছেন এমন সময় তাঁহার সেই বান্ধবী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া অন্য মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সহিত কি মিষ্টার (আমার বন্ধুর নাম করিয়া) অমুকের সহিত পরিচয় নাই ?"

তিনি বলিলেন, "আছে বই কি ? বিশেষ পরিচয় আছে। অমুক জায়গায় উনি আমায় বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। উনি একজন বড় Traveller। ওঁর গল্প সব খুব interesting !

বন্ধু (স্বগত)—"তবে সেদিন আমাকে Dead cut কর'বার অভিপ্রায়টা কি ?"

সেদিন ত এক রকম করিয়া কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন আমার বন্ধু সেই বান্ধবীকে বলিলেন,—"দেখুন আমি অনেক দেশ ঘুরিয়াছি কিন্তু এখনও এদেশের চালচলন বুঝিতে পারিলাম না।" পরে জিজ্ঞাসিত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন।

বান্ধবী হাসিয়া বলিলেন, "তুমিত বেশ মজার লোক দেখ্‌ছি। তুমি নিজে দোষ করে পরের নামে নালিশ কর'ছ। উনি স্ত্রীলোক তোমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন তুমি Bow পর্য্যন্ত কর'লে না। এক জন মহিলার এই রকম অপমান করে তুমি আমাদের মমতা পাওয়ার জন্য মিছে দাবী কর'ছ?"

আমার বন্ধুটি একটুকু অপ্রতিভ হইয়া নানাপ্রকার সাফাই করিলেন। বলিলেন, "আমি কি করে bow করি? তিনি ত আমায় nod করেন নাই।"

শুনিয়া আরও হাসির ঘটা বাড়িল। দুই একজন ঠাট্টার সম্পর্কের তরুণী উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "নানা দেশ ঘুরে ঘুরে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তোমার পাগলা গারদে গিয়া দু'চার দিন হাওয়া বদল করা উচিত। মেয়ে মানুষ তোমায় আগে bow করবে। বলনা কেন 'আমার পায়ে না ধরলে আমি কথা কব না'।"

বন্ধু বলিলেন "বিলাতের দস্তুর এই যে যদি কোন পরিচিতা মহিলা প্রথমে nod ক'রে বা কথা কয়ে বা অন্য কোন প্রকারে তোমার পূর্ব্ব পরিচয় স্বীকার না করেন তাহলে তোমার পরিচিত বলিয়া দাওয়া করিবার অধিকার নাই।"

তখন ঠাট্টার সম্পর্কের দুই একজন বাঁশরীবিনিন্দিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এ ত আর বিলাত নয়। আমরা বিলাত যাইনি ব'লে এত জারিজুরি কেন?" বলিয়া গরবের সহিত একটুকু মুখনাড়া দিলেন।

বন্ধুটি বড় ভাল মানুষ গো-বেচারা। মুখতাড়া খাইয়া অভিমান ভঙ্গের চোটে খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যাবেলা আমাকে ইণ্ডিয়াক্লবে গিয়া ধরে মনের দুঃখের বাঁধ ভেঙ্গে দিলেন। অনেক সান্ত্বনা করে আমি বল্লেম, "ভাই, নববধূকে কথা কওয়ান আমাদের দেশের চির প্রচলিত রীতি। তোমার বিলাতী পদ্ধতির অনুরোধে সেটা উঠিয়ে দিলে আমাদের ছেলে পিলেদের জীবনটা অঙ্গহীন হয়ে পড়বে।"

আমিত আর মেয়েমানুষ নই তিনি আমাকে ছাড়বেন কেন? কটিদেশ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া অগ্নিমূর্ত্তিতে তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

আমি বলিলাম, "ভাই পুরুষ হ'ল তমাল স্ত্রীলোক মাধবীলতা পুরুষকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। পুরুষকে অনেক সহ্য করতে হয়।"

বন্ধু বলিলেন, "তোমার ও সব Sentimental rubbish রেখে দাও। এখন ন্যায়সঙ্গত যা বিচার হয় তাই কর।"

আমি উত্তর করিলাম, "আচ্ছা-তুমিই বল আমি শুনছি। তার পর আমার যা বিবেচনা হয় বলছি।"

বন্ধু বলিলেন, "দেখ, স্ত্রীলোকের অধিকার বৃদ্ধি এখন রেলের গাড়ীর মত চল'বে। কিন্তু গতির লাইন যাতে ঠিক থাকে আর সুবুদ্ধি ড্রাইভার হয় সেটাত দেখতে হবেই হবে। নইলে সমস্তই ভণ্ডুল,—ভণ্ডুল কেন? তার চাইতেও বেশী—একটা ভয়ানক আগ্নেয় রাক্ষসের সৃষ্টি হবে। তার সামনে কিছুই তিষ্ঠিতে পারবে না—সব চুরমার হয়ে যাবে। যখন আমাদের মেয়েদের পূর্ব্বের অবস্থা ছিল তখন মানভঞ্জন, সাধাসাধি, বউ কথা ক'ও প্রভৃতি Sentimentalityর রামরাজ্য ছিল। এখন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে—এখন দেখতে হ'বে কিসে নিঃশব্দে গাড়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে—কিসে সুব্যবহারের রাস্তা পরিষ্কার থাকে, যা'তে কোন রকম গোলমাল না হয়।

যা'হ'ক যখন স্ত্রীলোকের অধিকার বিস্তৃতি অনিবার্য্য তখন সেই অধিকার কিসে সুরক্ষিত হয় তার উপর দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এখন যে কথা উপস্থিত তাই নাও। বিলেতের ব্যবস্থা এই যে তোমার পরিচিতা কোন মহিলা যদি প্রথমে সেই পরিচয় স্বীকার না করেন তাহা হইলে পরিচয় দাওয়া করিবার অধিকার তোমার নাই। এ দেশে উন্নতিশীল মহিলাদিগের মধ্যে যে প্রথার চলন রয়েছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন দেখতে হবে যে কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ। ভালমন্দ মানে আর কিছুই নয় কেবল এই যে, কোনটা অবলম্বন করে চল্লে ব্যবহার বিনা খিরকিচে নিষ্কণ্টকে চলে আর তার উল্টাই মন্দ। যদি ভিতরকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতেই শক্তির ভাণ্ডার খালি হইয়া যায় তাহলে আর কি নিয়ে উন্নতি কর'বে? মানুষের শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিচ্ছিন্ন। এরকম অপব্যয় কর'লে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও শেষ হ'য়ে পড়'বে। তাই দেখবে, কোন প্রথাটিতে সমাজের অধিক পরিমাণ অভাব অল্প পরিমাণ শক্তি ব্যয়ে পূর্ণ হ'তে পারে। একজন মহিলার সঙ্গে আজ আমি পরিচিত হ'লেম। তিনি আমার বিষয়ে কিছুই জানেন না। তার পর আমার দুশ্চরিত্রতার বিষয়ে এমন অকাট্য প্রমাণ পেলেন যে আমার সঙ্গে আলাপ রাখা তাঁর পক্ষে বিশেষ বিতৃষ্ণার বিষয় হয়ে পড়ল। তখন করবেন কি? এদেশের রীতি অনুসারে পূর্ব্ব-পরিচিতা ব'লে দেখা হ'লেই আমি অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে তাঁ'র সঙ্গে কথা কইতে যাব। তা'তে হয় তাঁকে স্পষ্ট করে খুলে বলতে হবে যে, আমার সঙ্গে আলাপ রাখতে তাঁর ইচ্ছা নাই আর না হয় নীরবে আমার সঙ্গ ও আলাপ তাঁকে সইতে হবে। দুদিকেই মুস্কিল। আমার সঙ্গে আলাপ রাখবার ইচ্ছা নাই একথা স্পষ্ট ক'রে বল্লে তার হেতু জিজ্ঞাসা করবার অধিকার ন্যায় অনুসারে আমাকে দিতে হবেই। তা দিতে হ'লে তাজান, ভজান নালিশ সালিশের আর শেষ থাকবে না। পরিশেষে থানা পুলিশ লাইবেল ডিফ্যামেশন, উকীল আদালতের হুলস্থুল পড়বারও বিশেষ সম্ভাবনা। এজন্য এক দাসত্ব ঘুচাইয়া গুরুতর দাসত্বের হাতে মহিলাগণকে সঁপিবার ইচ্ছা না থাকিলে এরূপ প্রথা অবলম্বন করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত হয় না।

এই রকম ন্যায়ানুগত বিচার কর'লে ফলস্বরূপ এইই দাঁড়ায় যে প্রাচীন প্রথা যার

স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তার সঙ্গে অভিনব শোভন স্বাধীন স্ফূর্ত্তিমান ব্যবহারের বিবাহ দিয়া এক নূতন কৌলিন্য নৃশংসতার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এ বিষয়ে তোমার কি মত?

আমি চুরোটিকার গোল ধূমকুণ্ডলীতে দৃষ্টিসংলগ্ন রাখিয়া ধীরে ধীরে শ্লথ বিলম্বিত বাক্যে বলিলাম "আমার আর মত কি? এত ছোট একটা কথার ভিতর যে এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত ছিল তা আগে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আচ্ছা, দেখ আমি একটা ফন্দী বাহির করিয়াছি। যাতে তুমি আমার মতের অপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক পরীক্ষার অবসর পাবে। যাঁদের এ বিষয়ের মতামতের উপর ব্যবহারিক ফল নির্ভর করে আমি তোমার কথাগুলি তাঁদের গোচর করিব। তাঁরা কি বলেন দেখো।"

আজ এ কথাগুলি পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য অনেকটা এই প্রতিজ্ঞাপূরণ করা। সকলে কথাগুলি বিবেচনা করিয়া সুবিচার করিলে বোধ হয় অনেকেই কৃতার্থ হইবেন।

এই প্রসঙ্গে বন্ধুর সঙ্গে আরও দুই চারিটি কথা হইয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অনাবশ্যক—কেবল তাহার সারমর্ম্ম প্রকটিত হইলেই যথেষ্ট হইবে।

আমার বন্ধু বলিলেন যে, আজকাল অনেক সুশিক্ষিতা তরুণী সমাজে প্রকাশ্য ভাবে মিশিতেছেন দেখা যায়। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যে তাঁহাদের গুরুজনের সংস্কার বশতঃই হউক আর যে কোন কারণেই হউক তাঁহাদের অসবর্ণে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। অথচ তাঁহারা সমাজে বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গেই আলাপ ও সামাজিক ব্যবহার করেন তাহাতে ইহাদের গুরুজনের কোন বাধা বা আপত্তি লক্ষিত হয় না। কিন্তু য়ুরোপের ব্যবস্থা অন্যরূপ। সেখানে বিবাহের পূর্ব্বে তরুণীদিগের আলাপ পরিচয় প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে একটী বিশেষ নিয়ম বন্ধন আছে—জ্ঞাতসারে তাহার অন্যথা বা অতিক্রম করিলে মেয়ে ও মেয়ের পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়। অবিবাহিতা তরুণীরা কখনও এরূপ দলে মিশেন না যেখানে কোন অবিবাহিত পুরুষের সহিত তাহাদের বিবাহ ঘটিলে কোনরূপ সামাজিক বিধানের ব্যভিচার হইতে পারে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এ দুইটির মধ্যে কোনটি সুপ্রথা?

আমাদের চাল চলন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে একটা বড় আশার বিদ্বেষী ভাব মনে উদিত হয়। যদিই বা কোন গতিকে আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া এ বিষয়ে একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি তাহাতে ফল কি? ঠিকটা যেন বাহির করিলে কিন্তু তাহাকে চালাইবে কে? অন্যান্য দেশের উদাহরণে দেখা যায় যে রাজা ও রাজপরিবারের দৃষ্টান্তে অনেক পরিমাণে চালচলনের উন্নতি বৃদ্ধি পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেদিক একেবারে অন্ধকার তাহার মধ্যদিয়া আশার রেখামাত্র আসিবার সম্ভাবনা নাই।

তবে এরূপও দেখা গিয়াছে যে রাজমুকুটহীন সমাজের রাণীরাও এ বিষয়ে একাধিপত্য

বিস্তার করিয়াছেন। Madame Recamier, Countess of Blessington, Lady Palmerston, Lady Granville প্রভৃতির নাম ও কীর্ত্তি কাহারও অবিদিত নাই।

কিন্তু এদিকেও কি আমাদের ভাগ্যে কেবল নিরাশার নিষ্ফল মাত্র ঘটিবে ?

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মন্তব্য।

পূর্ব্বগত প্রবন্ধটির মতামতের সঙ্গে আমাদের মতামতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে আমাদের চালচলনের অকপট সমালোচনা আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় কোন রকমেই অবাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবিকই "আমাদের দেশে এখন নানারূপ বিশৃঙ্খলতার দ্বারা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ"। এ অবস্থায় যে কেহ বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলতা আনিবার অভিপ্রায়ে সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হন তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং উপদেশগুলি সহানুভূতির সহিত আলোচনার উপযোগী।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে উপদেশদাতাগণ কখন কখন ভুলিয়া যান যে মানুষের ক্ষমতার সীমা আছে, সে ঈশ্বরের ন্যায় অসীম শক্তির আধার নহে— তাহার বলামাত্র কিছু আর তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হয় না,—বিশৃঙ্খলতা শৃঙ্খলতায় পরিণত হয় না ; এবং সর্ব্বতোভাবে কার্য্যের উপযোগী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইলেও সকল সময়ে তাহার কার্য্য করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে না।

আমাদের আশঙ্কা হয় যে লেখকমহাশয়ও সকল সময়ে এ দুটি কথা স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন, "কিসে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী হয় তাহা স্থির করিয়া তবে হাত পা বাড়ান উচিৎ।" কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাহা হইলে চিরকালই আমাদিগকে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। শিশুকে যদি প্রয়োজনের উপযোগী যথাযথ ভাবে কিরূপে পা ফেলিতে হয় তাহা স্থির করিয়া তবে তাহার পা বাড়াইতে হয় তাহা হইলে কি কোন কালেই তাহার হাঁটিবার অবসর ঘটে ? আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এমন নহে যে পরের সাহায্য বা উপদেশের কোনই শুভ ফল নাই। অবশ্য আছে। প্রুসিক অ্যাসিড খাইলে যে কি ফল হয় তাহা অপরের মুখে শুনিয়া শিক্ষা করাই ভাল। কিন্তু নববধূর মনস্তুষ্টি ও মানভঞ্জন কি উপায়ে করিতে হয় তাহা বোধ করি পৃথিবীর সমস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের স্তুপাকার গ্রন্থ ঘাঁটিয়াও পাওয়া যায় না, হাতে কলমে শিখিতে হয়।

লেখক মহাশয়ের সাধারণ মন্তব্যগুলি—General principles—অকাট্য ;—theoreti-

cally একেবারে perfect—যত গোলযোগ ঘটিয়াছে কেবল তাহাদের কার্য্যত প্রয়োগে। তিনি বলিতেছেন, "যদি তুমি পূলের বাড়ীর ইংরেজি পোষাক পরিয়া জ্যাকেট বোম্বাই সাড়ী ও টুপিতে সুশোভিতা লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহলক্ষ্মীকে দক্ষিণে বসাইয়া খোলা গাড়ীতে রেড রোডে হাওয়া খাইতে যাও তাহাতে দেশের ও সমাজের বিশেষ হানি হইবারই সম্ভাবনা"—যদিও হানি যে কিসে হইবে তাহা প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও সুস্পষ্ট করিয়া বলা নাই, কাজেই সে কথার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবে দেশীয় পুরুষদের পক্ষে ইংরেজি পোষাক পরিধান যে তাঁহার অভিমত নহে তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না বিশেষতঃ গৃহলক্ষ্মী যখন দক্ষিণ পার্শ্বে বোম্বাই সাড়ী প্রভৃতিতে সুশোভিতা। কেন না এ সংমিশ্রণ বেমানান, অশোভন, বে-মক্কা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লেখকমহাশয় কোথাও বলিয়া দেন নাই যে ইঁহাদের কি পোষাক পরিলে তাহা মানানসই, শোভন হইত। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে ধুতি চাদর অথবা চাপকান চোগা পরিয়া, বোম্বাই সাড়ি জ্যাকেট ও পাগড়ী শোভিতা গৃহলক্ষ্মীকে বামপার্শ্বে বসাইয়া খোলা গাড়ীতে বাহির হইলেই কি লেখকমহাশয়ের সর্ব্বতোভাবে মনস্তুষ্টি হইত? অথবা সাধারণের পক্ষে ইহা কম হাস্যকর, অদ্ভুত ঠেকিত? আমাদের ত বিপরীতই মনে হয়। লোকের চোখে যাহা নূতন, তাহাই অধিক হাস্যকর, অশোভন। প্রথমতঃ, ইংরেজি-পোষাকধারী পুরুষের পাশে আজকাল উক্তরূপ নববেশী রমণীকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উহা সাধারণের চক্ষে ততটা অদ্ভূত লাগিবার কথা নয়, যতটা ধুতি উড়ানীর পার্শ্বে অর্দ্ধ ইংরাজবেশী রমণীকে দেখিলে হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের নিকট এ দৃশ্য নূতন তাহারা এই নবসংস্কৃত বেশধারী রমণীকে হিন্দুরমণী মনে না করিয়া একেবারে বিদেশীয় বলিয়া মনে করে, সুতরাং তাহাতেও তাহাদের হাস্যরসের আবির্ভাব হয় না।

এখন কথা এই যে, যাহা কিছু হাস্যের উদ্রেক করে তাহাই কি সমাজের পক্ষে ক্ষতিজনক? অবশ্যই নহে। সমস্ত উন্নতির আরম্ভেই লোকে হাসি তামাসা করিয়া থাকে। সুতরাং হাস্যজনকতাই নূতন প্রবর্ত্তিত চালচলনের বিশুদ্ধতা বা শ্যামিকতার কষ্টিপাথর নহে। লেখক স্বয়ংই বলিয়াছেন—প্রয়োজনীয়তাই ইহার একমাত্র কষ্টিপাথর। বেশ তাঁহার কথাই মানিয়া লওয়া গেল। তাহা হইলে এখন দেখা যাউক, এদেশীয় পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি পোষাক পরেন তাঁহাদের পক্ষে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে পড়িয়া আমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পরিচ্ছদের যে কিছু কিছু বদল সদল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই নূতন পরিচ্ছদের প্রচলনই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। তবে কথা হইতেছে এই যে, পরিবর্ত্তনের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইবে কিসে? ইংরাজি অনুকরণে অথবা অপর কোন উপায়ে?

এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমত দেখা আবশ্যক যে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি পরিচ্ছদের প্রচলন হইল কেন? বিলেতফেরত দেশীয় ব্যক্তিগণই ইহার

প্রচলনকর্ত্তা এবং ইহার প্রচলন প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিধিসঙ্গত। অনুকরণের প্রবৃত্তি মানুষে নিতান্ত অপ্রবল নহে—প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বিশেষ প্রবল কোনরূপ কারণাভাবে উহা স্বতঃই কার্য্যকারী। ইতিহাসের পক্ষ হইতেও দেখা যায় যে অসভ্য অর্দ্ধ-সভ্য বা অল্প-সভ্য জাতি সুসভ্য বা অধিক সভ্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিলে তাহাদের চালচলন ধরণধারণ অনুকরণ করিয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে জেতৃ বিজেতৃ সম্বন্ধ থাকিলেত আর কথাই নাই। রোমানদের অধিকারের আমলে আদিম ব্রীটনবাসীদের মধ্যে যাহারা রোমানদের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিয়াছিল তাহারা রোমানদের পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নীয়াপোলিটানেরা স্পেনের অধীনে আসার কিছুদিন পরেই স্প্যানীয়ার্ডদের অনুকরণে আপনাদিগকে "ডন" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি বিজেতা অসভ্য গথ ভাণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা রোম অধিকার করিয়া রোমানদের চালচলন ধরিল। উদাহরণের জন্য অতদূর যাইবারও আবশ্যক দেখা যায় না—ঘরেও তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপুতগণ—যাঁহাদের শৌর্য্যে বীর্য্যে ভারত চির গৌরবান্বিত—মুসলমান চালচলন তাঁহাদেরও অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। পর্দ্দা-নসীনতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় চালচলনের কথা বলিতেছি না, আদবকায়দা, সাজ সজ্জা, বেশবিন্যাস, প্রভৃতি বিষয়েও রাজরাণীগণ বেগমদিগের অনুরূপই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অম্বরের রাজ-প্রাসাদ, রাজান্তঃপুর, দিল্লিরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সত্য সামান্য ফুৎকারে উড়ান সহজ নহে।

এখন দেখা যাউক বিদেশীয় পরিচ্ছদের প্রচলনকর্ত্তারা উহা নিষ্প্রয়োজনে গ্রহণ করিয়াছেন কি উঁহাদের অনুকরণের মূলে প্রয়োজনের আভাষ পাওয়া যায়। এই দল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—সরকারের বিত্তভোগী; ২য়ঃ—বেসরকারী। বিলাতি সিভিলিয়ান ডাক্তার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত; আর স্বাধীন ব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই উভয় শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ইংরেজি পোযাক পরিয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক, বিলেতফেরত সরকারী বিত্তভোগী দলের পক্ষে ইংরেজি পরিচ্ছদের আবশ্যক আছে কি না? ইঁহারা ইংরেজদের সঙ্গে সমভাবে পরীক্ষা দিয়া কাজ পাইয়াছেন তাই অনুগ্রহ অথবা কৃপা-প্রার্থনা না করিয়া "ব্রীটিশ-বরণ্" ভ্রাতৃবর্গের সহিত একই মাপদণ্ডের দ্বারা পরিমাপিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে সমভাবে তাহাদের সহিত যুঝিতে চান। ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং সাধারণ্যেও ইহাঁদের কতকটা এই দণ্ডের দ্বারাই মাপ করিয়া থাকে। এ পোযাক তাই ইঁহাদের দলের ছাপ, জাতি বিজ্ঞাপক নহে। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, এই পোযাক পরা অতি গৌরবের বিষয়—এই অধীনতার ছাপ নানা রূপ কারণে আবশ্যক হইয়াছে মাত্র।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে তাঁহাদের ব্রীটিশবরণ্ ভ্রাতৃবর্গের সহিত সমভাবেমেলা-মেশা, মান-মর্য্যাদা সম্ভ্রম-রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এবং মানবপ্রকৃতি এমনই যে আপন

দলের মধ্যে বিশিষ্ট কারণাভাবে সহসা কেহ peculiar হইতে চাহে না। তাই স্বতঃই ইঁহারা এই পোষাক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই পোষাকের দরুন সাধারণ্যের নিকট হইতে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার অনুরূপ যথাযোগ্য সম্মান পাইয়া থাকেন।

এখন তাঁহাদের এ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে বলিতে গেলে প্রথমতঃ দেখাইতে হইবে যে ইহাতে তাঁহাদের আপনাদের আত্ম-মর্য্যাদা অথবা সমাজের অবমাননা ঘটে। আর শুধু ইহাতেই চলিবে না—যখন আমরা সকলেই বিদেশীয় জাতির অধীন এবং ইঁহারা তাহার বিত্তভোগী—ইঁহাদের মানমর্য্যাদা সম্ভ্রম সমস্তই তৎপ্রদত্ত, তখন ইঁহাদের বিদেশী পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য শুদ্ধ এই কারণই যথেষ্ট হইবে না।—যাহার স্কন্ধে ইংরেজি হল তাহার গলদেশে ইংরেজি ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে আর এমন মারাত্মক ব্যাপারটা কি হইল! আর যদি সমাজের অবমাননার কথা বলেন তবে স্পষ্টই বলিতে হয় যে আমাদের বিবেচনায় উহা তেমন বলবৎ কারণ নহে। একে আমরা অধীন জাতি—আমাদের তো সমাজের মর্য্যাদা সেইখানেই জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে! তাহাতে আবার এই ঘটনা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে ঘটিয়াছে; তখন আর আমাদের সে কথা বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা সাজে না।

দ্বিতীয়তঃ বেসরকারী দেশীয় বিলাতফেরতগণ কার্য্যত পক্ষে কোন না কোন দলভুক্ত—যেমন ব্যারিষ্টার প্রভৃতি। ইঁহাদেরও সিভিলিয়ানদের ন্যায় কতকটা ব্রিটিশবর্ণ্ ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে হয়; এবং ইতিপূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গেরসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এস্থলেও কতক পরিমাণে প্রযুজ্য। একজন বিলেতফেরত ইঙ্গ-বঙ্গ কার্য্য-উপলক্ষে আদালত ব্যতীত অপর সর্ব্বস্থলে চাপকান চোগা পরিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক কাল তাহা চলিল না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে চাপকান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া ইংরেজি পোষাক ধরিতে হইল। কিন্তু কি কারণে তাহা অবশ্য আমরা জ্ঞাত নহি। আমাদের আশঙ্কা হয় অবস্থা বুঝি বা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই গুরুপাক হইয়া উঠিয়াছিল। তবে কোন উপায়ে যদি জাতীয় পরিচ্ছদ করিতে পার তাহাতে ক্ষতি নাই বরং মঙ্গলেরি সম্ভাবনা। এরূপ অনুকরণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সোপান মাত্র। চাপকান চোগা ইঁহাদের পক্ষে তেমন সুবিধা জনকও নহে—ছাঁটা ছোটা পরিচ্ছদের আবশ্যক। সুতরাং লেখক ইহা যেরূপ হাসিজনক ভাবে দেখিয়াছেন, আমরা তাহা দেখি না।

আমাদের মহিলাদের এখন যেরূপ প্রথায় বোম্বাই সাড়ি প্রভৃতি পরিতে দেখা যায় তাহা কতদিনের কথা? ২০ বৎসর পূর্ব্বে লেখকমহাশয় কতজন গৃহলক্ষ্মীকে এইরূপ বেশ পরিধান করিতে দেখিয়াছিলেন? প্রথম প্রথম যে সকল মহিলারা সমাজে বাহির হইতেন তাঁহারা গাউনই পরিতেন। তাহার পর যে পরিবর্ত্তন ঘটিল সে কেবল সুযোগ সুবিধার দরুণ। লেখক মহাশয়ের গ্যালাণ্টি্, আমাদের বিশ্বাস তাঁহাকে এসম্বন্ধে বিপথে লইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় বুদ্ধি ব্যামোহকর কুতর্ক স্ত্রী হৃদয়ের বৈশুদ্ধি কলঙ্কিত করিতে

পারে না, এই জন্যই উন্নতিশীল রমণীগণ ইংরাজি পোষাক না পরিয়া বোম্বাই সাড়ি প্রভৃতি পরেন। আমাদের বিশ্বাস স্ত্রী পুরুষের ইংরেজি পোষাক একই কারণে চলিয়াছিল আর যদি কখনও পুরুষের পক্ষ হইতে ইহার অপ্রচলন হয় তবে একই জাতীয় কারণ হইতে হইবে। তাই বলিতেছি যাঁহারা ইংরাজি পোষাক পরেন তাঁহাদের সমস্ত আবশ্যক পূর্ণ হয় এবং সর্ব্ব-কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতে পারে অথচ ব্যক্তিগণের ও সমাজের আত্মমর্য্যাদা এবং জাতীয়তা রক্ষা পায় এমন পোষাক আবিষ্কৃত হইলেও যদি তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করেন তবেই লেখকমহাশয়ের অবজ্ঞা তাঁহাদের উপর সুপ্রযুক্ত হইবে, নচেৎ নহে। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা এইরূপ পোষাক পরেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিলে, বা হীনদৃষ্টিতে দেখিলে উন্টা সমাজের পক্ষেই হানি হয়।

কেবল বিলাতফেরত ইংরাজি পোষাকেই যেন ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলায় প্রকৃত পক্ষে পোষাকের শোভনতা, একতা কোথায়? একটা নিমন্ত্রণ সভায় অথবা প্রকাশ্য স্থলে কত রকম বেশ দেখিতে পাওয়া যায়! রক্ষণশীলদিগের মধ্যেও ধুতিচাদর আর কোট ওয়েষ্টকোটের সমাবেশে কি হাস্যজনকতার, অদ্ভুতত্বের কিছুমাত্র কমতি আছে? তাই বলি, আমাদের আধুনিক অবস্থায় বিলাতি পোষাক পরার উপর অতটা বিজাতীয় আক্রমণ করিলে চলিবে না, ইহতে কেবল একটা সামান্য বিষয়কে লইয়া তিলকে তাল করিয়া পরস্পরের মনান্তরের একটি কারণ বাড়ান হয় মাত্র। যদি ইংরাজি বুট পরিলে দোষ না হয়, যদি ইংরাজি রকমে মহিলাদিগকে বাহির করিলে দোষ না হয়, যদি ইংরাজি আদব কায়দায় দোষ না হয়, তবে ইংরাজি হ্যাটকোটেই যে মহাপাপ হইল, এমন কি কথা!

আসল কথাটা এই, যতক্ষণ কোন লোক আপনাকে দেশের অঙ্গভুক্ত ভাবিয়া নিজের উন্নতিতে দেশোন্নতি বিবেচনা করিয়া কোনরূপ উন্নতির চেষ্টা করেন—তাহা যদিও প্রথম নম্বরের উন্নতি না হয়—অশোভনতা অদ্ভুতত্ব সবই তাহাতে থাকে, তথাপি তাহাতে সমাজের ক্ষতি হয় না। কেননা, হৃদয় যেখানে ঠিক, সেখানে কালে সমস্তই ঠিক হইয়া আসিবে, তবে যাঁহারা দেশছাড়া ভাবে ইংরাজ হইবার জন্যই ইংরাজি অনুকরণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ দেশের ক্ষতি করেন। কিন্তু আশা করি, লেখকমহাশয় তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না, আর আমিও তাহার প্রতিবাদ করিতেছি না। কেননা তাঁহাদের লইয়া নাড়াচাড়া করাই নিষ্প্রয়োজন—তাঁহারা আমাদের **বড়লোক।**

লেখক মহাশয়ের দ্বিতীয় কথাটির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাঁহার বন্ধুর তরফ হইতে তিনি বলিতেছেন যে, মহিলারা অগ্রে পুরুষের পরিচয় স্বীকার না করিলে সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে সমাজ-যন্ত্রের স্বকার্য্য সাধনের পক্ষে প্রতিবন্ধক ঘটিবার সম্ভাবনা। কথাটি সম্পূর্ণ সঙ্গত। তবে তিনি বন্ধুর সহানুভূতির প্রচণ্ড স্রোতের টানে পড়িয়া আঘাটায় গিয়া পড়িয়াছেন—এই যা। অবশ্য মহিলাটির তাঁহাকে “নড” করিলেই ভাল হইত। কিন্তু

আমাদের বিশ্বাস, এই প্রথাটি না জানার দরুণ নহে, বঙ্গললনার স্বভাবগত লজ্জা ও সঙ্কোচের ভাব হইতেই উক্ত মহিলা জনসাধারণ্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন নাই। আমি আমার এক-জন পর্দ্দাপরিত্যক্তা বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "একদিনের পরিচিত কেন এরূপ অসংখ্য লোকের মাঝে নিতান্ত আত্মীয়কেও তিনি সম্ভাষণ করিতে পারিতেন না।" তাই আমরা বলি লেখকের বন্ধুবর দুদিন বিলাত গিয়া ইংলণ্ড ও দেশকে একেবারে এক করিয়া এই সামান্য ত্রুটি হইতে দারুণ মনঃক্ষোভজনক মহামারী ঘূর্ণাপাকের মধ্যে যে পড়িয়া গিয়াছিলেন ইহার জন্য বঙ্গমহিলাই অধিক পরিমাণে দায়ী কিম্বা তাঁহার শীতদেশে বাস-জনিত গ্রীষ্মাসহিষ্ণু বিঘূর্ণিত স্নায়ুমণ্ডলী—তাহা বলা কঠিন।

অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বঙ্গমহিলা পরদার অন্তরাল হইতে বাহিরের সূর্য্যালোকে নীত হইবা মাত্রই যে য়ুরোপীয় আদর্শানুসারে আজন্ম সংস্কার গঠিত সঙ্কোচ লজ্জা সম্পূর্ণরূপে পরিহার পূর্ব্বক পাশ্চাত্য মহিলাদের আত্মস্বভাব সম্যক রূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহা মনে করা তাঁহাদের পক্ষে Complimentary হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহার আহেলবেলাত বন্ধুটির পক্ষেও এরূপ আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। এখানেও লেখকমহাশয় হয়ত বলিবেন কিসে মহিলাদের চালচলন ঠিক তাঁহাদের প্রয়ো-জনের উপযোগী হয় তাহা স্থির করিয়া তবে তাঁহাদের বাহিরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু ইহার উত্তরে আমরাও আবার বলি ইহা ঘোড়ার আগে গাড়ী দিয়া টানাইবার বন্দবস্তের মত দাঁড়ায়। আমাদের বিশ্বাস কাল সহকারে এ সমস্ত ঝড়তি পড়তি বাদ পড়িয়া যাইবে। সেনেট হাউসের বারান্দায় একদিনের পরিচিত পুরুষকে সম্ভাষণ কবিবার উপযুক্ত আত্মস্বভাব সংগ্রহ করিতে শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণেরও কিছু বিলম্ব লাগিবে। তাহার জন্য এতদূর অধৈর্য্য বা উষ্মান্বিত হইবার কারণ নাই। যাহা হউক লেখক মহাশয়ের বন্ধুটির প্রতি আমাদেরও সম্পূর্ণ সহানুভূতি, ভদ্রলোকটি নিতান্ত সহানুভূতির পাত্রই বটে, বেচারা একে ভারতবর্ষকে প্রকৃত বিলেত ভাবিয়া নিরাশ; তাহার উপর আবার একদিকে dead cut, আর অন্যদিকে তরুণী বান্ধবীদের মুখনাড়া খাওয়া। তবে ভরষা করি সব দুঃখ তাঁহার লেখকমহাশয়ের ন্যায় বন্ধুর সহানুভূতিতে দূরীভূত হইয়াছে।

লেখকমহাশয়ের তৃতীয় কথা এই যে, অসবর্ণ বিবাহে যাঁহাদের আপত্তি তাঁহাদের পক্ষে কুমারী কন্যাদের বর্ণ ও জাতি নির্ব্বিভেদে পুরুষমণ্ডলীতে প্রকাশ্যভাবে মিশিতে দেওয়া রেওয়াজ করা সুপ্রথা কি না? এরূপ প্রথার প্রচলনে যে সমাজের বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি হইতে পারে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের সম্মুখে এ প্রশ্নটি মুখ্যভাবে উত্থাপিত হওয়ার বিশেষ শুভফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তবে আমরা যতদূর জানি—এখনও পর্য্যন্ত সমাজে উক্তরূপ কার্য্য জনিত কুফল ঘটিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। কেননা, যাঁহারা কন্যাদিগকে ইংরাজি প্রথায় বাহিরে লইয়া যান তাঁহাদের মধ্যে নিতান্ত দুএকটি পরিবার ব্যতীত আর কাহারোই

অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি আছে বলিয়া আমরা জানিনা। তাঁহারা ব্রাহ্মণ পরিবার। ব্রাহ্মণদের পুরুষ পরম্পরাগত একটা উন্নত মহৎগুণের ধারা-বাহিকতায় বিশ্বাস তাঁহাদের একটা সংস্কারের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর যদিই বা ইহা কেবল foolish sentiment মাত্রই হয় ত ইহা সম্প্রদায়গত নহে, সুতরাং ইহাতে ভুগিতে হয় ব্যক্তিরাই ভুগিবেন। এই সংস্কার বাল্যাবধি কন্যাদের মনে বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের ও আপনাদের ঐরূপ সংস্কার সত্বেও যদি কোন কুমারী আপনাকে অসবর্ণে বিকাইয়া বসেন, তবে আত্মীয়বর্গকে এরূপ দৈব ঘটনা মস্তক পাতিয়া সহ্য করিতেই হইবে। Accidents তো best-regulated familiesতেও ঘটিতে দেখা যায়—তাহার জন্য আর চারা কি আছে! অসৎচরিত্র পাষণ্ডের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে কাহার ইচ্ছা। কিন্তু ঘটনাবশতঃ কি সর্ব্বসমাজেই এরূপ হয় না?—এরূপ ঘটনা অসবর্ণ বিবাহ অপেক্ষা কি অধিক গুরুতর নহে? তাহার জন্য সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়—না ফলাফল ব্যক্তি-বিশেষের স্কন্ধেই পড়ে?

য়ুরোপেও যাঁহারা blue bloodএর বিশেষ পক্ষপাতী—এই শ্রেণীর বাহিরে কন্যাদের যাঁহারা বিবাহ দিতে বিশেষ নারাজ, কার্য্যতঃ তাঁহাদেরও কত সময়ে এ পণ ভঙ্গ করিতে হয়। ইহা সত্বেও ইংরেজি সমাজে ইহার শুভফল দেখা যায়। আমাদের সমাজেই তাহার বিপরীত ফল ঘটিবে এমন তো আমাদের মনে হয় না। কথাটি শুদ্ধ কন্যাদের সম্বন্ধে কেন পুত্রদের সম্বন্ধেও খাটে না কি?

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখকমহাশয় যত জলদি ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত পদ্ধতিতে ছাঁটাছোটা নির্দ্দোষ সমাজ গঠিত করিতে চান তাহা ঠিক বলিবামাত্রেই হয় না; তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই—যাঁহাদের নিয়ম লেখকের মতে সুনিয়ম—তাঁহারাই বলেন, "আস্তে আস্তে অগ্রসর হও—"।

স্বরলিপি।

প্রাচীন গান* ।

কথা—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী। সুর—ঐ †

ভৈঁরো—একতালা।

জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ুর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন কখন ধানুকী হয়।
যে ভাবে যেজন করেরে সাধন সেই ভাবে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদিসরোবরে কমলে কামিনী হয় উদয়।

গগ১ —১ রো১ । স১ সস১ —১ । সস১ রো১ স১ । নো১ ধ্ধ্১
জান — না রে মন — পর — ম কা রণ

নো১ । স১ ম১ ম১ । —১ ম১ ম১ । গ১ গ১ রো১ । গ১ রোগম১—১ ॥
— শ্যা — মা — শু ধু মে য়ে — ন — য়॥
(শেষ)

মম১ পধো১ ধো১ । ধো১ পধোনধো১ ধো১ । পপ১ ধো১ প১ । প১
মেঘে — র ব র ণ করি — য়ে ধা

পপ১ ম১ । গগ১—১ প১ । ম১ ম১ ম১ । গগ১—১ রো১ । গ১ রোগম১—১॥
রণ — কখ — ন ক খ ন পুরু — ষ হ — য়
(আ-প্র)

নো১ —১ নো১ । স১ সস১ —১ । সরো১ —১ রোগম১ । গরো১
কভু — বাঁ ধে ধড়া — কভু — বাঁ ধে

সস১ —১ । রোরো১ গম১ ম১ । ম২ ম১ । গগ১ —১ র১ । গম৩ ॥
চূড়া — ময়ু — র পু চ্ছ শোভি — ত তায়

* শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র আমাদের অনুরোধে প্রাচীন গানগুলির স্বরলিপি লিখিয়া তাহাদের বিলোপ নিবারণে ব্রতী হইয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভারতীর আর কোন পাঠকও যদি প্রাচীন গীতকারের কোন গান স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দেন আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব। ভাং সাং

† তখনকার যেরূপ নিয়ম ছিল তাহাতে বোধ হয় কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নিজেই ইহার সুর রচনা করিয়াছেন। শ্রীহে—

মম১ পধো১ ধো১ । ধো১ ধোধো১ —১ । পপ১ ধো১ প১ । প১ পপ১
কথ — ন পা র্ব্বতী — কথ — ন শ্রী মতী
কম — লা কা ন্তে র হৃদি — স রো বরে

ম১ । গগ১—১ প১ । ম১ ম১ ম১ । গগ১—১ রো১ । গ১ রোগম১ ॥ মম১—১
— কথ — ন ক থ ন ধানু — কী হ — য় যেভা—
— কম — লে কা মি নী হয় — উ দ — য়
(আ-প্র)

ম১ । প১ প১ প১ । পধো১—১ নো১ । ধো১ প২ । প১ র্স১ র্স১ ।
বে যে জ ন করে — রে সা ধন সে ই ভা

র্স১ র্রো১ র্স১ । নোনো১ —১ ধো । প২ পম ॥
বে তা র মান — সে র য় ॥

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

নূতন গান।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর—ঐ

মিশ্র—কাওয়ালী।

(ওগো তোরা) কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।
ওপারেতে উপবনে, কত খেলা কতজনে,
এপারেতে ধূধূ মরু বারি বিনারে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি,
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি,
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে।

—২* প৪ ।*
— কে

প২ মীপ১ ধপ১ । গ১ মগ১ র১ গ১ । ম১ ধ১ প১ গ১ । প৩ পপ১ ।
কে যা — — বি পা রে ও গো তো রা কে আমি

[ধ১ ন১ র্স১ নর্সর্র১ । নর্স১ ধনো১ ধ১ পমী১ । প১ পর্স১
[ত রী নি য়ে ব সে আ ছি ন দী

* পুনরাবৃত্তির কালে উপরের সুর গাহিতে হইবে।

র্সনো১ ধ১ । { প৩ পপ১ । }] পমী১ প২ ॥ [প১ র্স১ ন১
কি না { রে আমি }] রে কে [ও পা রে
(আ-প্র)

ধনধ১ । প১ ধ১ ধ১ ন১ । —৪ । পর্স১ র্স১ র্স১ র্স১ । র্স১ নর্সর্র১ র্সর্র১
তে উ প ব নে — ক ত খে লা ক ত জ

নধ১
র্সন১ । —৩ ধনধ১ ।] [প১ ধ১ নো১ নোধ১ । পধ১ নো১ ধ১
নে — —] [এ পা রে তে ধূ ধূ ম

প১ । { —৪ । }] স১ র১ গ১ পম১ । গ২ প২ । [স২ র১ র১ । গ১
রু { — }] বা রি বি না রে কে [এই বে লা বে
(আ-প্র)

পম১ গ১ গ১ । প১ পমী১ প১ মীপধ১ । প৪ ।] প১ পন১ ধ১ পধ১ । মপ১
লা আ ছে আ—য় কে যা বি] মি ছে কে ন কা

ম১ গ১ মগ১ । রগ১ র১ গ১ পম১ । গ৪ । [প১ পন১ ন১ ন১ । র্স১ র্র১ র্সন১ র্স১ ।
টে কা ল ক ত কি ভা বি [সূ—র্য্য পা টে যা বে নে মে

ধ১ র্সনো১ ধ১ পমী১ । পধ১ নোর্স১ নোধ১ প১ ।] [স১ স১ র১ রর১ । গ১
সু বা তা স যা বে থে মে] [খে য়া ব—ন্ধ হ

পম১ গ১ গ১ । প১ পমী১ প১ মীপধ১ । { প৩ সন্১ । }] প২ প২ ।
য়ে যা বে সন্—ধ্যা আঁ ধা { রে — }] রে কে
(আ-প্র)

শ্রীসরলা দেবী ।

বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি।*

ইহা এক অভিনব সাহিত্য সভা। আমরা এই সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সভার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারো মনে সন্দেহ হইবে না। পত্রিকায় প্রকাশ বহুপূর্ব্বে, ১৮৭২ সালে, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জন্ বিম্‌স্ বাঙ্গলায় এরূপ সভার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথম এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি নির্দ্দেশ করেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বঙ্গবাসীরাই ভাষায় ও সাহিত্যে অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছে; এবং তাঁহার মতে বঙ্গদেশে একটী সুবৃহৎ সাহিত্যসভা গঠনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই;—"সাহিত্য ও সভ্যতায় বাঙ্গলা-দেশ ভারতবর্ষে অগ্রণী হইয়াছে, তাহার সাহিত্য অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া ইয়ুরোপীয় আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। এখন বাঙ্গলা ভাষাকে নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ফেলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন দেওয়ার কাল সমাগত। এরূপ কার্য্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কেহ প্রশ্ন করিবেন না। একদিকে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত আমদানী রোধ করা কর্ত্তব্য, অপরদিকে ইতর গ্রাম্য শব্দ পরিহার্য্য। সেই জন্য বাঙ্গালীদের একটী অ্যাকাডেমি স্থাপনা বিষয়ে আমি একান্ত পরামর্শ দিই, যৎকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষা সুগঠিত হইতে পারিবে। যদি অ্যাকাডেমি তাহার প্রযত্নে সফল হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষা যে বিশেষ উপকৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা ভাষার সম্মুখে একটি আদর্শ খাড়া করিয়া রাখা হইবে, এবং অতঃপর ভদ্রসমাজে ও গুণী লেখকের রচনায় বাঙ্গলা অ্যাকাডেমির অভিধান, বর্হিভূত শব্দ স্থান পাইবে না।

এই সভার প্রধান কার্য্যস্থল রাজধানীতেই হওয়া কর্ত্তব্য, এবং অন্ততঃ চল্লিশজন সভ্য উহার বাসেন্দা হওয়া আবশ্যক, অবশিষ্ট যাটজন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের সুধীমণ্ডলীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইবে। রাজধানীর সভ্যেরা সপ্তাহে এক কিম্বা ততোধিকবার সম্মিলিত হইবেন। আবশ্যক হইলে সভার অধিবেশনের জন্য কোন গৃহ ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে প্রাচীন ফ্লরেণ্টাইনগণের আচার অনুকরণ করিয়া, সভ্যগণের মধ্যে কাহারো কাহারো উদ্যান বাটিকায় সম্মিলন স্থির করিলে অধিক প্রীতিকর হইবে।"

মিঃ বিমসের এই প্রবন্ধের বহুলপাঠ ও বহুপ্রশংসাবাদ সত্ত্বেও ইহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে কেহ অগ্রসর হয়েন নাই। দশ বার বৎসর পরে একবার একটা ক্ষীণ উদ্যম ইহাতে ব্রতী হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহার পর, আজ একুশ বৎসর পরে এতৎসম্বন্ধে পুনরুদ্যম।

কিন্তু আজকালকার দিনে ফরাসী অ্যাকাডেমির কঠোর শাসনের দৃষ্টান্ত যখন

---

* এই প্রবন্ধ অগ্রহায়ণমাসের ভারতীতে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে উক্ত সংখ্যায় সন্নিবেশিত হয় নাই।

সম্মুখে বর্ত্তমান তখন সাহিত্য অ্যাকাডেমির নামেই লোকে ডরাইয়া উঠিবে, বুঝি বা পূর্ব্বোক্ত অ্যাকাডেমির অনুকরণে ইহাও কোন প্রভুত্বগিরির ফন্দি! তাই অ্যাকাডেমির নিজেকে লোকের গ্রাহ্য করিতে হইলে আগে হইতে নিজের নিষ্কণ্টকতার বিজ্ঞাপন দিয়া সর্ব্বসাধারণকে অভয় প্রদান করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এবং বাঙ্গালীদের সৌভাগ্য-বশতঃ এই নূতন সাহিত্য সভা তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছেন।

মহারাজা কুমার বিনয়কৃষ্ণের শোভাবাজারস্থ ভবনে গত ২৩ শে জুলাই ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। যে সকল সভ্য লইয়া এই সাহিত্যসভা গঠিত হইয়াছে তাঁহারা কেহই সাহিত্যজগতে সুপরিচিত নহেন। তাহাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না তাহা স্থানান্তরে বিচার করিব, আপাততঃ ইহা দেখিতেছি তাঁহারা প্রসিদ্ধ সাহিত্যকার না হইলেও তাঁহারা সাহিত্যানুরাগী বটে। ইঁহাদের মধ্যে একজন সভ্য আছেন তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য— মিঃ লিওটার্ড। যতদূর দেখা যাইতেছে এই বিদেশীয় সভ্য উক্ত সভার মস্তিষ্ক, দেশীয়েরা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মিঃ লিওটার্ড সম্ভবতঃ বাঙ্গলা জানেন না, কিন্তু বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি কিরূপে ফলোপধারী হইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহার ইয়ুরোপীয় সহজ সাহিত্যবুদ্ধি তাঁহাকে ঠিক উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তিনি যে কয়েকটি প্র্যাক্‌টিক্যাল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা শুধু বাঙ্গলা অ্যাকাডেমির সভ্যগণের নহে, সাহিত্যজীবী বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রণিধান যোগ্য।

প্রথম অধিবেশনে এই সভার কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহার মধ্যে যেগুলি উহার উদ্দেশ্যের সহিত সংযুক্ত আমরা সেইগুলির উল্লেখ করিব ;—

(১) সভার অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক সভ্যগণের মধ্যে সাময়িক সাহিত্য (নূতন গ্রন্থ পত্রিকাদি) বিতরিত হইবে, সভ্যেরা তন্মধ্য হইতে নিজ নিজ রুচি ও ক্ষমতানুযায়ী বিষয় বাছিয়া লইয়া সুবিধামত সমালোচনা করিবেন।

(২) প্রাচীন হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তথ্যাবিষ্কারোদ্দেশ্যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিও সমা-লোচনার জন্য গৃহীত হইবে।

(৩) উক্ত সমালোচনা সমূহ সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত হইয়া উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সভার নামে নামাঙ্কিত ও তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(৪) উপরোক্ত সমালোচনা ব্যতীত সভ্যগণের নিজ নিজ অধ্যয়নের ফলস্বরূপ অন্যান্য প্রবন্ধও সভায় গৃহীত, শ্রুত—এবং মনোনীত হইলে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

এই শেষ নিয়মটার উপর ভিত্তি করিয়া মিঃ লিওটার্ড কতকগুলি সঙ্গত প্রস্তাব করিয়া-ছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন, এক একজন কিম্বা দুই তিন জন সভ্য মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির এক একটা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়া তৎবিষয়ে সভা সমীপে প্রবন্ধ উপস্থিত করুন।

(১) বাঙ্গলা কাব্য।

(২) হিন্দুনামের কবিত্ব, অর্থাৎ যে মৌলিকভাব হইতে নামগুলির উৎপত্তি।

(৩) বাঙ্গলা উপন্যাস।

(৪) বাঙ্গলা নাটক।

(৫) হিন্দুসাহিত্যে বাঙ্গালীর সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা যতদূর চিত্রিত হইয়াছে।

(৬) বাঙ্গলা দার্শনিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্য।

(৭) বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য (জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি।)

(৯) সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনার প্রযুজ্যতা।

(১০) কবিতা ও গদ্যের বস্তু নির্ব্বাচন।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের আলোচনাক্রমে কৃতী লেখকগণের বিবরণ আসিয়া পড়িবে। তাহার পরের কাজ, প্রত্যেক লোককে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা—তাঁহার লেখার এবারৎ, গঠন প্রভৃতির অধ্যয়ন।

মিঃ লিওটার্ডের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে আর একটী কাজ এই সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিতে পারে—মিঃ বিম্‌সের পরামর্শানুযায়ী আদর্শ বাঙ্গলা শব্দসংগ্রহ। এই অভিধানপ্রণয়ন কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে হইতে পারে তাহাও মিঃ লিওটার্ড দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক সভ্যকে বাঙ্গলা বর্ণমালার একটী অক্ষরের ভার দেওয়া হউক। সেই অক্ষরের যত কথা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন—ভাল, মন্দ, মাঝারী,—সব একত্র করিয়া অর্থ সমন্বিত করিয়া তিন চার মাসের মধ্যে অ্যাকাডেমির হস্তে অর্পণ করিবেন। তখন অ্যাকাডেমি প্রত্যেক কথাটিকে ভালরূপে বিচার করিয়া তাহার অর্থের সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচ নির্দ্ধারিত করিবেন। তাহার পর কথাগুলির তালিকা মুদ্রিত করিয়া অ্যাকাডেমির সভ্যেতর প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সুধীবর্গের নিকট তাঁহাদের মতামতের নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। প্রত্যেক অক্ষর সম্বন্ধে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অবশেষে একখানি আদর্শ অভিধানের সৃষ্টি হইবে।

মিঃ লিওটার্ডের এই দুইটী প্রস্তাবের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আরো বিশেষতঃ এইজন্য যে আমরাও কিছুকাল হইতে এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আসিতেছি ; প্রথমটীর ফল আগামী বৈশাখ মাসের ভারতীতে দৃষ্টিগোচর হইবে। দ্বিতীয়টীর কার্য্য এখনই আরম্ভিত হইয়াছে। আমরা বিচার করিয়াছিলাম একখানিও ভাল বাঙ্গলা অভিধান নাই, যাহা আছে তাহা বাঙ্গলা নহে, বলিতে গেলে একপ্রকার সংস্কৃত, তাহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দেরই বাহুল্য, অন্য বাঙ্গলা শব্দ প্রায়ই স্থান পায় না। কিন্তু যে সকল বিদেশীয় যাবনিক শব্দ বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে তাহারা সংস্কৃত নয় বলিয়া বাঙ্গলা অভিধান হইতে তাহাদের বিদূরিত করা নিতান্ত অসঙ্গত ; তাহারা সংস্কৃত না হইলেও বাঙ্গালা বটে সুতরাং বাঙ্গলা অভিধানের তাহারা ত্যাজ্য

হইতে পারে না। কিন্তু অভিধান প্রণয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল বাঙ্গলা শব্দের মূল আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা ভারতীয় পৃষ্ঠায় আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়াছি। কিন্তু তাহা অল্পপরিসরপ্রযুক্ত আমাদের গতি মন্দ হওয়া যেরূপ অবশ্যম্ভাবী তাহাতে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহার অপেক্ষা মিঃ লিওটার্ডের প্রস্তাবিত প্রণালীতে অ্যাকাডেমির এক একজন সভ্য এক একটী অক্ষরের ভার লইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এখন দেখা যাউক এ পর্য্যন্ত অ্যাকাডেমির সভ্যগণকর্ত্তৃক সাহিত্যবিষয়ক কি কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এ সভা অলস নহে, মিঃ লিওটার্ডের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য এখনই আরম্ভিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দে নামক জনৈক সভ্য "বাঙ্গালা সাহিত্যকারের জীবনী" এই শীর্ষের অন্তর্গত করিয়া কবি ভারতচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে মোটামুটী সে সকল ঘটনাই তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় ইংরাজাধিকারে বাঙ্গলা কাব্য-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, ও শ্রীযুক্ত কে (?) চক্রবর্ত্তী Dramas Among The Bengalies নামক ইংরেজী প্রবন্ধে আমাদের দেশে থিয়েটর প্রবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। সভার প্রত্যেক অধিবেশনেই কোন না কোন সভ্য এইরূপে এক একটী বিষয় মনোনীত করিয়া তাহার উপর প্রবন্ধ রচনা করিয়া আনিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ; প্রবন্ধগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনার মধ্যে পরিগণ্য না হইলেও লেখকগণের মনোযোগ ও অধ্যবসায় আশাপ্রদ। এই সভা আপাততঃ যে যে সভ্য লইয়া গঠিত তাঁহারা প্রসিদ্ধ সাহিত্যকার না হওয়ার প্রধান উপকারিতা এই যে অনেকটা ক্ষেত্র লইয়া সাহিত্যানুরাগের বীজ বপন করিবার সুবিধা হইয়াছে। যাঁহারা অল্প ক্ষমতা, স্বল্প প্রতিভা বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে জানিয়া আদৌ তদভিমুখে অগ্রসর হয়েন না, এবং এইরূপে অল্প পরিমাণ শক্তিকেও একেবারে অব্যবহারে বিলুপ্ত করেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; তাঁহারা একটা দল পাইলে, সহৃদয় শ্রোতা পাইলে অগ্রসর হইবেন, এবং এরূপ বহুলোকের সমষ্টিকৃত শক্তিপুঞ্জে দেশে অনেক সুফল ফলিবে। আমাদের দেশের আপাততঃ প্রধান অভাব বহুলোকের মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যবোধ। বিশেষতঃ এই সাহিত্যবোধ জিনিষটী বড়ই দুর্লভ, যেমন কোন কোন কীটের একটী অতি সূক্ষ্ম স্পর্শেন্দ্রিয় থাকে, তেমনি কোন কোন মানুষেরও একটি অতি সূক্ষ্ম সাহিত্যেন্দ্রিয় জন্মায়, তদ্দ্বারা স্পর্শ করিয়া করিয়া সাহিত্যপ্রসূনবিশেষের ঔৎকৃষ্ট্যাপকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়,—তাহাই সাহিত্য বোধ। সাহিত্যের চর্চ্চাক্রমে এই বোধের উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু সকলে তাহা বর্ত্তায় না, তাই শুধু সাধারণ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি লইয়া এরূপ একটা বৃহৎ সাহিত্যসভা গঠনের একটি অপকারিতা এই যে সাহিত্যবোধশূন্য অনেক সভ্যের অনেক

ভ্রান্ত কথা খাঁটি বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে, যদি যাচাই করিবার কেহ না থাকে তবে সে মিথ্যার প্রচার কখন রোধ হইবে না। এখানে আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিব। এই সভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কে, চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে জানাইতেছেন বাঙ্গলা সাহিত্যের অবস্থা এখন বিলক্ষণ সন্তোষজনক। অকিঞ্চিৎকর ক্ষণজীবী গ্রন্থসমূহ বাদ দিয়া আপাততঃ আমাদের সাহিত্যের সংখ্যা ২০০ নাটক, ৫০টি জীবনচরিত, ২৫০ উপন্যাস, ৫০টি গদ্যরচনা, ১২০টি কবিতাপুস্তক, ২০ খানি ভ্রমণবৃত্তান্ত, ২০খানি ইতিহাস, ১৫ খানি সমালোচনাগ্রন্থ, ও ৫০টি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

"অকিঞ্চিৎকর ক্ষণজীবী গ্রন্থসমূহ বাদ দিয়াও" বাঙ্গলা সাহিত্যের তালিকা এতদূর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে? অ্যাকাডেমিতে এই আত্মপ্রসাদপূর্ণ তালিকার প্রতিবাদ কি কেহ করেন নাই? এরূপ তালিকায় সত্যের অপলাপ করা হয়, নয়ত তালিকাকারের সাহিত্যের কিঞ্চিৎকরত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্বের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্ধারণের অক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হয়। আমরা বাঙ্গলা অ্যাকাডেমির নিকট হইতে ইহার অপেক্ষা সঠিক বিবরণ প্রত্যাশা করি।

সাহিত্যবোধের চর্চ্চার জন্য আমাদের আপাততঃ আবশ্যক যত না উৎকৃষ্ট ইয়ুরোপীয় নিজ সাহিত্যচর্চ্চা তদপেক্ষা তদ্দেশীয় সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনগ্রন্থের চর্চ্চা। বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিতে পারেন;— যে কোন সভ্য সভায় প্রবন্ধ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রথমে সভাকে জানান উচিত কি বিষয়ে তিনি লিখিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন উক্ত বিষয়ে লিখিবার যোগ্য হইবার নিমিত্ত তাঁহার কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত এ বিষয়ে সভা হইতে পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তদনুসারে কার্য্য করিলে তাঁহার প্রবন্ধ সারবান্ হইবার সম্ভাবনা। এবারে স্থানাভাব প্রযুক্ত আমাদের এইখানে শেষ করিতে হইল। বারান্তরে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

টীণ্ডাল।

বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকগণের নিকট অধ্যাপক টীণ্ডালের নাম অপরিচিত নহে। যাঁহারা এই মহাত্মা বিরচিত একখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও টীণ্ডালের অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। অধ্যাপকের এক একখানি গ্রন্থ, তাঁহার অমর কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। এই মহাত্মার মৃত্যুতে ব্রিটিশ জাতি একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন, এবং সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মৃত্যুর গ্রাস হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই জানিয়াও মৃতব্যক্তির অভাবে শোকাতুর হওয়া দুর্ব্বল মনুষ্যের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু এই দুর্ব্বলতার মধ্যেও মানুষ অনেক সময় বল পায়, জীবনের শেষ অঙ্ক এবং মৃত্যুর পবিত্র ও প্রশান্ত দৃশ্য অনেক সময় মহাব্যসনেও শান্তি আনয়ন করে। কিন্তু টীণ্ডালের আকস্মিক শোচনীয় পরিণামে সে সান্ত্বনা নাই ; এই কারণেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ অধ্যাপকের মৃত্যুতে জগতে অধিকতর হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে এবং তাঁহার অভাব অধিকতর তীব্ররূপে অনুভূত হইতেছে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের কার্লো নগরের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্রগ্রামে টীণ্ডাল জন্মগ্রহণ করেন। টীণ্ডালের পিতামাতা অতি দরিদ্র ছিলেন, দারিদ্র্য নিবন্ধন আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রদানে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তাঁহারা পুত্রকে কেবল মাত্র ইংরাজি সাহিত্যে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া তাহার শিক্ষা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিলাসের সুকোমল অঙ্কে প্রতিভা বর্দ্ধিত হয় না, সংসারের কঠোরতার ভীষণ সংঘর্ষণে প্রতিভা পরিমার্জ্জিত হয় ও মানসিকবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন হয়, পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্যতার মধ্যেই প্রতিভা স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন হয়। টীণ্ডালের জীবনে এই সত্যের ব্যতিক্রম হয় নাই ; তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে, নানা বাধা-বিঘ্ন অযাচিত-ভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উন্নতি-পথের অন্তরায় হইয়াছিল। গার্হস্থ্য অবস্থা অতীব শোচনীয় দেখিয়া পিতামাতার দারিদ্র্য দূরীকরণ মানসে, অতি অল্প বয়সেই টীণ্ডাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্প বেতনে সৈনিক-বিভাগে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

যিনি জড়-বিজ্ঞানের অতি গুহ্য তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিতে নিয়মিত হইয়াছেন তাঁহার, অনিত্য দৈহিক বলের ব্যবহার শিক্ষা বা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কূট-নীতির কল্পনায় মনোনিবেশ করা ভাল লাগিবে কেন ! অতি অল্পকাল মধ্যেই এই পদ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারের একটী কারখানায় কার্য্য গ্রহণ করেন এবং এই স্থানে থাকিয়া যন্ত্রাদির কার্য্য শিক্ষা করেন। এই অবস্থায় অধিক দিন তাঁহার থাকিতে হয় নাই, কিছুদিনের মধ্যেই কলকারখানার কার্য্যে

বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই ম্যাঞ্চেষ্টার রেলওয়ে কোম্পানীর মধ্যে একটী ইঞ্জিনিয়ারীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টীণ্ডাল বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত তিন বৎসর এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এই তিন বৎসর তাঁহার কার্য্যকুশলতাগুণে কোম্পানীর বিশেষ লাভ হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে হ্যাম্পসায়ারে কুইনস্-উড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ টীণ্ডালের অতুলনীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া, তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। কুইনস্উড কলেজই টীণ্ডালের প্রথম উল্লেখযোগ্য কার্য্যক্ষেত্র, এখানেই বিখ্যাত রাসায়ণবিৎ ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের সহিত টীণ্ডালের সখ্যতা সংস্থাপন হয় এবং এইখানে থাকিয়াই তিনি বহু পরিশ্রমে পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক নানা অজ্ঞাত সত্য আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।

বৎসরাধিক অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া, আরও বিজ্ঞানানুশীলন মানসে, টীণ্ডাল জর্ম্মাণি যাত্রা করেন, প্রিয়বন্ধু ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডও টীণ্ডালের অনুগমন করিয়াছিলেন। বন্ধুদ্বয় মারবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকগণের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান ও চিন্তা করিবার মানস করেন। বুনসেন প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকগণ বৈদেশিক ছাত্রযুগলের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, অল্পায়াসে ও অল্পকালে দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় সকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করা, কেবলমাত্র আইরিস যুবক টীণ্ডালের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া, বার্লিনস্থ সুপ্রসিদ্ধ ম্যাগনস্ পরীক্ষাগারে তিনি স্বাধীনভাবে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হন। তাঁহার এই সময়ের অনুসন্ধান ও চিন্তার ফল সকল, তাঁহার জীবনের মহতীকীর্ত্তি। তদাবিষ্কৃত চুম্বক ও আলোক বিজ্ঞানের সত্য সকল যে আধুনিক বিজ্ঞানের অতুলনীয় সম্পত্তি, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? টীণ্ডালের অনুসন্ধানের সকল ফলই সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার বিষয়ে কেহই সন্দিহান হইতে পারেন না। নিউটন-প্রচারিত আলোকসিদ্ধান্ত, বহুকাল হইতে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া, যদিও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ভ্রমসংকুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তথাপি তদ্দ্বারা আমরা নিউটনের চিন্তাশীলতার ও পাণ্ডিত্যের অপকর্ষতা কোনক্রমেই প্রতিপন্ন করিতে পারি না। প্রকৃতির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একটী সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই নিয়মের সঙ্গতকারণ নির্দ্দেশ করা এবং প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্য সেই নিয়মের অংশীভূত করা প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। প্রকৃতির আদিরহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটন করা, মনুষ্যায়ত্ত সীমার বহির্ভূত। কোন বৈজ্ঞানিক সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারেন যে, আধুনিক মাধ্যাকর্ষণ সিদ্ধান্ত চিরকাল অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে?

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে টীণ্ডাল জর্ম্মাণি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্রা করেন। স্বদেশের বিজ্ঞান-মণ্ডলীতে অতুল যশাস্পদ টীণ্ডাল বিশেষ সমাদরের সহিত সম্মানিত হইয়াছিলেন, এবং নানা বৈজ্ঞানিক সমাজের বিবিধ সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশ গমনের

অল্পকাল পরেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ "রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনের" জড়-বিজ্ঞানের আচার্য্য-পদে নিযুক্ত হইলেন এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের পদত্যাগের পর তাঁহার স্থানে পরীক্ষা-সমূহের তত্ত্বাবধায়কতার কার্য্য করিতে লাগিলেন।

চারি বৎসর ইংলণ্ডে ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে টীণ্ডাল সুইজরলণ্ড যাত্রা করেন। সুইজারলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ বরফরাশির গতি নির্ণয় করা ও কঠিন তুষার রাশির তরল পদার্থবৎ প্রবাহিত হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা, তাঁহার প্রধান বাসনা ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হক্সলি টীণ্ডালের সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং ভীষণ জনহীন পার্ব্বত্যপ্রদেশে বৈজ্ঞানিক বন্ধুর পরিদর্শন কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেন। কিছুদিন পরিদর্শনাদি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া টীণ্ডাল তুষাররাশির গতি সম্বন্ধে একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে গতি সম্বন্ধে যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আজকাল তাহা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে টীণ্ডাল আমেরিকা যাত্রা করেন। বিজ্ঞানানুরাগী মার্কীনগণ প্রতি নগরেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, যুক্ত রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে পঁইত্রিশটী লিপিবদ্ধ আছে। ইহার প্রতেকটিই এমন সুন্দর উপায়ে ও সরলভাষায় লিখিত যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের কিছুই অবগত নহেন, তাঁহাদের নিকটেও কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয় সকল সহজবোধ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। টীণ্ডাল কেবল স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; যাহাতে বিজ্ঞানানুরাগী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে পারেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেন ও দরিদ্র বৈজ্ঞানিকদিগকে সর্ব্ববিষয়েই উৎসাহ প্রদান করিতেন। আমেরিকায় অবস্থানকালীন, বক্তৃতাদি দ্বারা প্রায় ষষ্ঠি সহস্রাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বীয় আহারাদির জন্য কিঞ্চিৎমাত্র অর্থ রাখিয়া, অবশিষ্ট সমগ্র অর্থদ্বারা আমেরিকার কলোম্বিয়া কলেজে একটী বৃত্তির স্থাপনা করেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিবার জন্য উপযুক্ত ছাত্রগণকে আজও এই বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া অধ্যাপক টীণ্ডাল তাপ নিবারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং অল্পকাল মধ্যেই এই প্রসঙ্গে স্বীয় স্বাধীন মত প্রচার করেন, ইহাদ্বারা অধ্যাপকের খ্যাতি আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, ৫৬ বৎসর বয়সে টীণ্ডাল লর্ড ক্লড হামিলটনের প্রথমা দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিণীত জীবন অতি সুখের ছিল। অধিক বয়সে বিবাহ দ্বারা প্রায়ই গার্হস্থ্য শান্তিভঙ্গ হইতে দেখা গিয়া থাকে, বার্দ্ধক্যে বিবাহিত হইয়া অনেকেই স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি-তার উপর গালিবর্ষণ করিয়াছেন এবং অতীত কৌমার জীবনের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি নিরাশ

দৃষ্টে চাহিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ অধ্যাপকের শেষ জীবনটী বিনা গোলযোগে বেশ শান্তভাবে কাটিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ টীণ্ডাল প্রায় কুড়িখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহার প্রত্যেকখানিই সুন্দর ও সরল; ইহাতে জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া গিয়াছেন। সরল ভাষা তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের একটী সর্ব্বপ্রধান গুণ এবং এই গুণের জন্যই সাধারণ পাঠকগণের নিকট টীণ্ডালের গ্রন্থের এত আদর।

জরাগ্রস্ত হইয়া টীণ্ডাল শেষ জীবনে কিছু শারীরিক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুবর্গ ও চিকিৎসকগণ ভাবিয়াছিলেন এই পীড়া হইতে অধ্যাপকের আর নিস্তার নাই। কিন্তু নিয়তির লিপি অখণ্ডনীয়, পীড়া দ্বারা না হইয়া একটী আকস্মিক কারণে টীণ্ডালের মৃত্যু হইল। কিছুদিন হইতে তিনি নানাপ্রকার পীড়ায় জড়িত হইয়া বিশেষ অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকদিগের পরামর্শে শারীরিক যন্ত্রণাদি নিবারণ করিবার জন্য নিয়মিতরূপে "সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেশিয়ম্" ব্যবহার করিতেন এবং অনিদ্রা দূরীকরণাভিলাষে কখন কখন দুই এক বিন্দু "ক্লোরাল সিরাপ" পান করিতেন। অধ্যাপকের শয্যাপার্শ্বে মেজের উপর এক শিশি "ক্লোরাল" এবং অপর এক শিশি "ম্যাগ্‌নেশিয়ম্" ব্যবহারার্থে প্রস্তুত থাকিত, প্রতিপ্রাণা পত্নী স্বামীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া পরিচর্য্যা করিতেন এবং ঔষধাদি স্বহস্তে স্বামীকে সেবন করাইতেন। গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে, অধ্যাপকের ম্যাগ্‌নেশিয়ম সেবন আবশ্যক হওয়ায় মিসেস টীণ্ডাল ম্যাগ্‌নেশিয়ম্ লইবার জন্য, ভুলিয়া "ক্লোরাল" বিষের শিশি তুলিলেন। শিশির গাত্রে "ক্লোরাল" লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, প্রথম শিশিটী যথাস্থানে রাখিয়া, দ্বিতীয় শিশিটীতে নিশ্চয়ই "ম্যাগ্‌নেশিয়ম" আছে ভাবিয়া, তাহা হইতে ঔষধ ঢালিয়া পীড়িত স্বামীকে সেবন করাইলেন। হতভাগিনী তখনও জানিতে পারেন নাই যে কি বিষ পতির কণ্ঠে ঢালিয়াছেন, তিনি জানিতেন না যে সেই দিবস দুই শিশি "ক্লোরাল" টেবিলের উপর ছিল, এবং আবশ্যকীয় "ম্যাগ্‌নেশিয়মের" পাত্র একটু দৃষ্টির অন্তরালে ছিল; "ম্যাগ্‌নেশিয়ম্" ভ্রমে বিষ "ক্লোরাল সিরাপ" পতিকে সেবন করাইলেন। ঔষধের বিকৃতস্বাদে বৃদ্ধ অধ্যাপক বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সমপ্রাণা অর্দ্ধাঙ্গিনীর একটী ক্ষুদ্র প্রমাদে কি ভীষণ বিপদ সংঘটিত হইতে চলিল। হতভাগিনী টীণ্ডালপত্নী স্বীয় ভ্রম জানিতে পারিয়া পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন; টীণ্ডাল ক্রমে নিদ্রাতুর হইতে লাগিলেন, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জাগরিত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চিকিৎসকের কৌশল ব্যর্থ হইল, টীণ্ডাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন এবং সেই নিদ্রা ক্রমে চিরনিদ্রায় পরিণত হইল।

অনেকে বলেন টীণ্ডাল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। এবং খ্রীষ্টানধর্ম্মেও তাঁহার বড় শ্রদ্ধা ছিল না। বাইবেল লিখিত "মিরাকল্" ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করায়, পাদরীগণ তাঁহাকে ঘোর অখ্রীষ্টান বলিয়াই জানিতেন। অক্সফোর্ডের ডি, সি, এল উপাধিগ্রহণ সময়ে টীণ্ডালের আস্তিকতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। নাস্তিকতার

জন্য টীণ্ডাল উক্ত প্রধান উপাধিগ্রহণে অনুপযুক্ত বলিয়া, অক্সফোর্ডের কোন এক প্রধান পাদরি ডাক্তার একটী আপত্তি উত্থাপন করেন। বলা বাহুল্য উক্ত আপত্তির কোন ফলই হয় নাই। টীণ্ডাল বলিতেন উশৃঙ্খল ইচ্ছা সকলকে নৈতিক বন্ধন দ্বারা দমন করা মানুষের প্রধান কার্য্য এবং পাশবপ্রবৃত্তিগণকে যিনি যত দমন করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি ততই আদর্শ মানবচরিত্রের নিকটস্থ হইবেন। টীণ্ডালের দার্শনিক মত সম্বন্ধে নানা কথা বলিবার আছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কেবলমাত্র আভাষ দিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। টীণ্ডাল ইংলণ্ডের রক্ষণশীলদলের একজন গোঁড়া ছিলেন, স্বয়ং আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী হইয়াও, প্রসিদ্ধ হোমরুলের অতিশয় বিপক্ষপাতী ছিলেন। বৃদ্ধমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন, টীণ্ডালের একজন প্রিয়বন্ধু ছিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাজনৈতিক মতদ্বৈধ, আন্তরিক বন্ধুতা রক্ষণ পক্ষে কোনও বাধা জন্মায় নাই।

অধ্যাপক টীণ্ডালের সহৃদয়তা, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে একটী পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শৈশবে যখন টীণ্ডাল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, তখন বিদ্যালয়স্থ জনৈক শিক্ষক যত্নসহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন, শিক্ষকের এই সহৃদয়তার কথা তিনি আজীবন বিস্মৃত হন নাই। যখন বৃদ্ধ শিক্ষক জরাগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে টীণ্ডাল একদিন বৃদ্ধের কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাদ্বারা তাঁহার শিক্ষকের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন। সেই দিন হইতে আমরণ বৃদ্ধকে ত্রিশ পেনি করিয়া বার্ষিকবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ছায়া।

১

মধ্যাহ্ন। ভাদ্রমাসের শেষে মেঘমুক্ত আকাশের নীলিমা প্রখর রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল। যে দিকে চাহিয়া দেখ আকাশ-সীমাস্পর্শী প্রান্তর, বৃক্ষ বিরল। রৌদ্রকিরণে প্রান্তর হইতে বর্ষার জল শোষিত হইতেছে—সূক্ষ্ম বাষ্পের তরঙ্গ চারিদিকে লক্ষিত হইতেছে। অতি দূরে গৃধিনী উড়িতেছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন—শব্দ নাই, প্রান্তরে লোক সমাগম নাই, লোকের যাতায়াত পর্য্যন্ত নাই।

সেই জনশূন্য রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমার বন্ধু চন্দ্রকুমার ও আমি গমন করিতেছিলাম। কোথায় যাইতেছিলাম, কেন যাইতেছিলাম, আমি তাহা জানিতাম না। চন্দ্রকুমার আমার বাল্যবন্ধু। কয়েক বৎসর গৃহ ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। সম্প্রতি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অনুরোধ মত তাহার সঙ্গে যাইতেছিলাম। কোথায় যাইতেছিলাম জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই নাই।

দশ দিন হইল আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি। কোথায় আসিয়াছি জানি না। এ কয়দিন রেলে, শকটে কিম্বা শিবিকায় আসিতেছিলাম, পদব্রজে চলিতে হয় নাই। অদ্য প্রাতে চন্দ্রকুমার শিবিকা বিদায় করিয়া দিয়াছে, বলিতেছে আমাদিগকে আর অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। কিছুদূর আসিয়া এই প্রান্তরে পড়িয়াছি। আর কতদূর যাইতে হইবে জানি না।

নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রকুমার মজলিসী রকম লোক ছিল, গল্প গুজব বেশ করিত। ফিরিয়া আসিয়া আর সে রূপ নাই। কথা অল্প কয়, প্রায় মৌন ভাব। আজ ত কথাবার্ত্তা এক রূপ বন্ধ।

পার্শ্বে অথবা পশ্চাতে একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া চন্দ্রকুমার বেগে চলিতেছিল। রৌদ্রে ও পথের শ্রান্তিতে আমি ঘর্ম্মাক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চন্দ্রকুমারের মুখে ক্লান্তি চিহ্ন নাই।

মধ্যাহ্ন কাল অতীত হইলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম সম্মুখে যেমন অনন্ত প্রান্তর পশ্চাতেও সেই রূপ অনন্ত প্রান্তর। মনে সন্দেহ হইল চন্দ্রকুমার পথ হারাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কোথায় যাইতেছি? তুমি পথ হারাও নাই ত?"

"কোন চিন্তা নাই। আমার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আইস।"

আর কোন কথা হইল না। আমরা পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিলাম।

সূর্য্য পশ্চিমে হেলিল। চন্দ্রকুমারের ও আমার ছায়া প্রান্তরে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। প্রান্তর সীমায় ক্রমশঃ বিটপীশ্রেণী দেখা দিল।

সন্ধ্যার সময় প্রান্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে একটী কুটীর দৃষ্ট হইল। কুটীরের সম্মুখে উপনীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকুমার কহিল, "আসিয়াছি।" এই বলিয়া কুটিরে প্রবেশ করিল।

২

তাহার পশ্চাতে আমিও প্রবেশ করিলাম। কুটীর অতি ক্ষুদ্র, একটী মাত্র অপ্রশস্ত গৃহ। ইহাও বুঝিলাম যে কুটীর এ সময় শূন্য হইলেও একেবারে শূন্য নহে, মনুষ্যের যাতায়াত আছে। চন্দ্রকুমার এ ভাবে প্রবেশ করিল যেন কুটীর তাহার নিজের। আমাকে কহিল, "বিশ্রাম কর।"

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। গৃহের কোণে মৃৎকলসীতে জল ছিল, অঞ্জলি পূরিয়া পান করিলাম। চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কয় দিন থাকিতে হইবে ?"

দাঁড়াইয়া চন্দ্রকুমার কুটীরের বাহিরে দেখিতেছিল। কহিল, "পরে বলিব।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। কুটীর তলে শুষ্ক তৃণ বিস্তৃত ছিল। তাহাতে শয়ন করিলাম। শ্রান্তিজনিত তন্দ্রা শীঘ্রই আসিল, পরে নিদ্রা আসিল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি চন্দ্রকুমার কুটীরে নাই। বাহিরে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কুটীরের বাহিরে গমন করিলাম।

জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। চারিদিকে যেন বিষাদের বৃহৎ ছায়া পড়িয়াছে। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে কুটীরের পার্শ্বে বৃক্ষশাখায় পেচক ডাকিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে আমি একা। চন্দ্রকুমার কোথায় গেল ?

রাত্রি হইতে লাগিল। কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না।

গভীর রাত্রে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। দ্রুতপদে কে যেন কুটীরের অভিমুখে আসিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। চন্দ্রকুমার বেগে কুটীরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে আর একজন প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ত্রীলোক এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম। তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।

চন্দ্রকুমার ভীতের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় কহিল, "আর কেহ যেন কুটীরে না প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ সংশয়। তুমি দ্বার রক্ষা কর, কেহ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে। এই ধর।" বলিয়া আমার হস্তে তীক্ষ্ণধার মুক্ত অসি দিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। চন্দ্রকুমারের কোন কথা অন্যথা করিবার যেন আমার ক্ষমতা ছিল না। তরবারি লইয়া কুটীর দ্বারে দাঁড়াইলাম।

জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তরের অনেক দূর দেখা যাইতেছে। যে দিকে বৃক্ষশ্রেণী সেইদিকে কিছু অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না, কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। কুটীরে কাহারও মুখে কোন কথা নাই। ভীতিরুদ্ধ নিশ্বাসের শব্দ কখন কখন শুনিতে পাইতেছিলাম।

অকস্মাৎ কুটীরের সম্মুখে মনুষ্যের ছায়া পতিত হইল। তরবারির উপর মুষ্টি দৃঢ় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে যায় ?"

ছায়া অপসৃত হইল, মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না।

কুটীরে অস্ফুট ভীতিশব্দ হইল, কে করিল বুঝিতে পারিলাম না।

আবার পূর্ব্ববৎ ছায়া দৃষ্ট হইল, আবার ডাকিলাম, "কে যায় ?" আবার ছায়া অদৃশ্য হইল।

ক্রমে আমার বিশ্বাস জন্মিল যে কোন ব্যক্তি অলক্ষিতে থাকিয়া কুটীর প্রদক্ষিণ করিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে এক একবার তাহার ছায়া দেখা যাইতেছে কিন্তু সে স্বয়ং দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যতবার আমি ছায়া দেখিতে পাই ততবার একই প্রশ্ন করি, ততবার ছায়া অপসৃত হয়।

জ্যোৎস্না ক্রমে মলিন হইয়া আসিল, প্রত্যুষের পূর্ব্বগামী অস্পষ্ট অন্ধকার আকাশে দেখা দিল। তখন কুটীরের পার্শ্বে অতি মৃদু, অতি বিকট হাস্যধ্বনি হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

৩

প্রভাত হইলে চন্দ্রকুমার কুটীরের বাহিরে আসিল। এক রাত্রে মনুষ্যের মুখে এত পরিবর্ত্তন কখন দেখি নাই। সে সময়ে সে কথার কোন উল্লেখ করিলাম না। আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল।

চন্দ্রকুমারকে বলিলাম, "দুই একটা কথা আমার জানিবার আছে। এ পর্য্যন্ত তুমি আমায় কিছু বল নাই, আমারও জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য হয় নাই। কিন্তু এখন সৎকর্ম্মে অথবা অসৎকর্ম্মে তোমায় সহায়তা করিতেছি জানা প্রয়োজন।

চন্দ্রকুমার কহিল, "অবশ্য। জিজ্ঞাসা কর।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই রমণী তোমার স্ত্রী ? দেশে তুমি বিবাহ কর নাই।"

চন্দ্রকুমার কহিল, "একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে ?"

আমি কহিলাম, "বিশ্বাস করিব বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"এই রমণী আমার স্ত্রী নহে।"

"তাহা হইলে তুমি ইহাকে কেমন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিলে ?"

"সকল কথা বলিতে পারিব না। এই রমণীর অথবা আমার কাহারও অসদভিপ্রায় নাই। একবার এ আমার প্রাণ রক্ষা করে। তাহার পর ইহার প্রাণ সংশয় হয়। আমি ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। এখন আমাদের উভয়ের প্রাণ সংশয়। তুমি যদি পারত আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের আত্মরক্ষার সাধ্য নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন দেশে ফিরিয়া যাইবে ?"

"যদি বাঁচিয়া থাকি।"

"তখন এই রমণীকে লইয়া কি করিবে ?"

"যদি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হয় তাহা হইলে বিবাহ করিব।"

"তুমি জান না ?"

"আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"যদি স্বীকৃতা না হয় ?"

"তাহা হইলে তোমার গৃহে থাকিবে। তাহা হইলে কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না।"

আমি বিস্মিত হইয়া চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিলাম। কপটতার কোন লক্ষণ নাই।

আমি অন্য কথা তুলিলাম। "তুমি যে বলিতেছ তোমাদের উভয়ের প্রাণসংশয়, তাহার কোন কারণ আছে ? আর আত্মরক্ষা তোমার অসাধ্য কেন ? তোমার বাহুতে বল আমার অপেক্ষা অধিক।"

চন্দ্রকুমার অতি কাতর হাসি হাসিল। কহিল, "রাত্রে আশঙ্কার কোন কারণ দেখ নাই ?"

কুটীর প্রদক্ষিণকারিণী ছায়া, ছায়ার অলক্ষিতে আবির্ভাব ও আচম্বিতে তিরোধান, এবং সেই অতি মৃদু, অতি বিকট হাস্য আমার স্মরণ হইল। এ সকল কি সত্য, অথবা ভয়বিচলিত কল্পনা মাত্র ? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলাম, "যাহা দেখিয়াছিলাম বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিতেছি না।"

"পারিবেও না। পারিলে আশঙ্কা এত হইত না। আমরা যে কারণে আত্মরক্ষায় অক্ষম তুমি এ পর্য্যন্ত সে অবস্থায় পতিত হও নাই এই জন্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

৪

এমন সময় রমণী কুটীরের বাহিরে আসিল। আমাকে দেখিয়া বিশেষ লজ্জিত হইল না। আমিও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

রমণীকে সুন্দরী বলিলে কিছুই বলা হয় না। সুন্দরী বলিলে সে রূপের কিছুই বর্ণনা হয় না। এমন নির্ম্মল সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই। মুখে হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সে হৃদয় নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, প্রসন্ন। সে মুখ দেখিয়া চন্দ্রকুমারের কথায় আর সন্দেহ রহিল না।

রমণীকে দেখিয়া বিদেশীয় ভাষায় চন্দ্রকুমার তাহাকে কি বলিল। রমণীও সেই ভাষায় উত্তর দিল। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার আমাকে কহিল, "আমাদের ভাষা জানে না।"

তাহার পর চন্দ্রকুমার রমণীকে অন্যান্য কথা বলিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম আমার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে, কারণ কথা শুনিতে শুনিতে রমণী এক একবার সলজ্জ অথচ পুলকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছিল। অবশেষে চন্দ্রকুমার আমার নাম বলিয়া দিল।

রমণী ধীরে ধীরে—অশ্রুতপূর্ব্ব নাম একেবারে উচ্চারণ করিতে না পারিয়া—কহিল, "প্র—ভা—ত—চ—ন্দ্র।"

আমি চন্দ্রকুমারকে বলিলাম, "অত বড় নামের আবশ্যক নাই। 'প্রভাত' বলিলেই চলিবে।"

চন্দ্রকুমার বুঝাইয়া দিল। রমণী কতক নিষ্কৃতি পাইয়া আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর কহিল "প্র—ভা—ত।"

রমণীর নাম জানিবার ইচ্ছা হইলেও সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার আপনিই কহিল, "তুমি উহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে না?"

"করিব বই কি!"

চন্দ্রকুমারের কথা মত রমণী আপনার নাম বলিল, "বাদলা।"

নামটী নিতান্ত বিজাতীয় মত বোধ হইল না। আমাদের সঙ্গে কিছু আহার্য্য সামগ্রী ছিল। আহারাদির পর চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করিবার ইচ্ছা করিতেছ?"

চন্দ্রকুমার কহিল, "তোমার কি পরামর্শ?"

আর এক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলাম। এ পর্য্যন্ত চন্দ্রকুমারের ইচ্ছা মতই সমস্ত হইতেছিল। কিন্তু এখন চন্দ্রকুমারের চিত্তবল যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। আমার যেরূপ ইচ্ছা তাহারও ইচ্ছা যেন তদনুরূপ।

আমি কহিলাম, "এখানে আর রাত্রি যাপন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় না। এখানে নানা প্রকার আশঙ্কা।"

চন্দ্রকুমার কহিল, "আমার মনে কেবল এক আশঙ্কাই প্রবল। সে আশঙ্কা এখানে যে রূপ অন্যত্রও তদ্রূপ। প্রাণীশূন্য মরুভূমিতে যেমন, লোকালয়েও সেই রূপ; একাকী অসহায় পথে যে রূপ, সশস্ত্র সৈন্যরক্ষিত দুর্গমধ্যেও সেই রূপ। পলায়ন করিয়া এ আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইব না।"

এ সকল কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া বিস্ময়ের তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া যাইতেছিল। এরূপ অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করিব কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

আমি বলিলাম, "সে যাহাই হউক, এখানে আর থাকিবার ত কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।"

"কিছু না। এখনি চল! বাদলাকে ডাকিব?"

"ডাক।"

চন্দ্রকুমার রমণীকে ডাকিল। আমরা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৫

ছায়াশূন্য প্রান্তরে চলিতে চলিতে দিনমান অতিবাহিত হইল। রমণীকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া আমি চন্দ্রকুমারকে কহিলাম, "তুমি উহার হস্ত ধারণ কর।"

হস্ত ধারণ করিলে রমণী চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া যে রূপ মৃদু মৃদু হাসিল তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত রহিল না। আমি চন্দ্রকুমারকে কহিলাম, "কেমন, তোমাকে বিবাহ করিবে কি না এই সময় জিজ্ঞাসা করিলে হয় না?"

চন্দ্রকুমার অতি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "গৃহে ফিরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিব।"

সন্ধ্যার পর লোকালয়ে উপনীত হইলাম। রাত্রি যাপনের জন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলাম। বাদলা গৃহের ভিতর শয়ন করিল, চন্দ্রকুমার ও আমি দ্বারের নিকট শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হইল না, চন্দ্রকুমার ও রমণীর সম্বন্ধে নানা রূপ চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। কিরূপে ইহাদের পরস্পরের পরিচয় হইল? কিসের আশঙ্কায় ইহারা উভয়ে এত ভীত? এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন আমি ইহাদের সুখ দুঃখের ভাগী, ইহাদের কোন বিপদ হইলে আমি তাহার দায়ী।

নিদ্রিতাবস্থায় দুই একবার চন্দ্রকুমার অস্পষ্ট স্বরে একটা কথা কহিয়াছিল। কি বলিতেছিল ভাল বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে গৃহের ভিতরও শব্দ শুনিতে পাইলাম। রমণী নিদ্রাবস্থায় যেন কি বলিতেছে। আমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলাম। রমণী আবার কথা কহিল। এবার বুঝিতে পারিলাম—"মীরাণ।" ভয় পীড়িত, কাতর, এবং কিয়ৎ অস্পষ্ট স্বরে রমণী এই নাম বলিল। চন্দ্রকুমার পার্শ্ব ফিরিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "মীরাণ।"

চন্দ্রকুমার যে নিদ্রিত তাহাতে আমার কোন সংশয় ছিল না। রমণী নিদ্রিত অথবা জাগ্রত বলিতে পারি না। কিন্তু উভয়ের মুখে এক কথা। যে ব্যক্তির নাম মীরাণ উভয়েই তাহাকে জানে, এবং উভয়েই তাহাকে ভয় করে। মীরাণ কে?

গৃহে এক মাত্র প্রদীপ তৈলশূন্য হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ থাকিয়া থাকিয়া এক একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল অবশেষে একবার জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল।

তখন আমার মনে হইল যেন নিকটেই কাহারও পদশব্দ ও নিশ্বাস শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। শয্যাপার্শ্বে তরবারি ছিল গ্রহণ করিলাম। পদশব্দ আর শুনিতে পাইলাম না।

ক্ষণকাল পরে আর এক দিকে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া তরবারি হস্তে গৃহের বাহিরে গমন করিলাম, কিন্তু দ্বারের নিকট রহিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। চন্দ্র অস্ত যায়। গৃহপ্রাচীরে, বৃক্ষশিরে অল্প চন্দ্রালোক রহিয়াছে। নীচে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যের কোন চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল। মনুষ্য কোথাও দেখিতে পাই নাই, কিন্তু সহসা মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। শরীর লোমাঞ্চ হইল, অজানিত আশঙ্কায় চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। শব্দ গম্ভীর কিন্তু উচ্চ নহে। ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকটা কথা বারম্বার মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ?"

কোন উত্তর হইল না। শব্দ দূরে যাইতে লাগিল। কয়েক বার এই রূপ হইল। শব্দ নিকটে আসে আবার দূরে চলিয়া যায়। একই কণ্ঠ, একই রূপ শব্দ। রাত্রিশেষে শব্দ দূরে চলিয়া গেল, আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

৬

চন্দ্রকুমারের নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম না। তাহার মানসিক অবস্থা যে রূপ তাহাতে এই সকল কথা শুনিলে ভীত হইতে পারে। বলিলেও কোন ফল নাই।

রাত্রিকালে এই রূপ আশঙ্কা ও বিস্ময়জনক ব্যাপার নিত্য ঘটিতে লাগিল। আমি সকল কথাই গোপন রাখিতাম। চন্দ্রকুমার কিছু দেখিতে কিম্বা শুনিতে পাইত কি না বলিতে পারি না। আমাকে কখন কিছু বলিত না।

পথের তিনদিন অবশিষ্ট রহিল। কয়েক দিন রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় চন্দ্রকুমার এবং রমণীর মুখে "মীরাণ" এইনাম শ্রবণ করিয়াছিলাম। অবশেষে কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মীরাণ কে ?"

নাম শ্রবণ মাত্র চন্দ্রকুমার শিহরিয়া উঠিল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, চক্ষু বিকৃত হইল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমার হস্ত ধারণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমাকে বলিল ?"

"কেহ বলে নাই। নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মুখেই শুনিয়াছি।" রমণীর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় তাহার নাম করিলাম না।

চন্দ্রকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাদলার মুখে শুনিয়াছ ?"

আমি কহিলাম, "নিদ্রিতাবস্থায় তাহার মুখেও শুনিয়াছি।"

চন্দ্রকুমার কোন কথা কহিল না। কিছু ক্ষণ পরে উর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "আর অধিক বিলম্ব নাই।"

আমি বলিলাম, "কিসের ?"

চন্দ্রকুমার আমার কথার উত্তর দিল না। অন্য দিকে চলিয়া গেল।

শয়নের কাল উপস্থিত হইলে চন্দ্রকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রমণীও কাঁদিল। হৃদয়বিদারক কাতর স্বরে চন্দ্রকুমার কয়েকটী কথা কহিল। তাহাতে রমণীর অশ্রু-ধারা আরও বেগে বহিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখি দ্বারের নিকট মনুষ্য ছায়া। এবার আমি আর শয্যাত্যাগ করিলাম না, দ্বারের নিকট গমন করিলাম না। ছায়ার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলাম। ছায়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। কিয়ৎকাল পরে আবার দৃষ্ট হইল। দেখিলাম ছায়ার হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে। কয়েক বার এই রূপ হইল। অবশেষে একবার হস্ত-ছায়া অত্যন্ত সঞ্চালিত হইল। গৃহের ভিতর তীব্র বিদ্যুৎ শিখার ন্যায় আলোক

রশ্মি প্রবিষ্ট হইল আবার অন্ধকার। ছায়া অপসৃত হইল আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

যে মুহূর্ত্তে বৈদ্যুতির ন্যায় আলোক গৃহে প্রবেশ করিল সেই মুহূর্ত্তে রমণী চীৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রকুমার শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া রমণীর পার্শ্বে গেল। আমি আলোক উৎপাদন করিলাম।

আলোক লইয়া দেখি রমণী নিস্পন্দ, নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে। বজ্রাঘাতে যেরূপ মৃত্যু হয় রমণীর সেই রূপ মৃত্যু হইয়াছে। চন্দ্রকুমার রমণীর ললাট নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমিও তাহার সহিত দেখিলাম রমণীর ললাটে অঙ্গুলি চিহ্ন রহিয়াছে।

চন্দ্রকুমার চীৎকার করিয়া কহিল, "মীরাণ, আমাকে কেন লইলে না?" এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় রমণীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে গৃহে আর একবার সেই রূপ বিদ্যুৎ চমকিল। চন্দ্রকুমার চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। দেখিলাম তাহার ললাটেও অঙ্গুলির চিহ্ন রহিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বিশ্বাস।

মনে পড়ে সেই ছেলে বেলা
শুনেছিনু একটি কাহিনী,
বড় তাহা লেগেছিল ভাল
অর্থ কিন্তু তখন বুঝিনি।

অমূল্য রতনমণি দিয়া
কোন এক শিল্পী মহাজন,
রচেছিল অপূর্ব্ব অরূপ
রাজকীয় সুদিব্য বসন।

একটী আশ্চর্য্যগুণ বড়
ধরিত সে মায়াময় বাস,
ধর্ম্মহীন নয়নে কাহারো
কখনো না হইত প্রকাশ।

তাই যবে ধরিল নৃপতি
অঙ্গে সেই অপরূপ বেশে,
উপহাসি নির্লজ্জ বলিল
যতলোক ছিল সেই দেশে।

ঈশ্বরের প্রেমবাস খানি
সুমঙ্গল পুণ্য-কাম ভরা,
রেখেছে তেমনি আবরিয়ে
প্রাণীময় এই মহাধরা!

দেখিতে না পায় সেই প্রেম
ক্ষীণ-দৃষ্টি দীন অবিশ্বাস,
হীনতার কালো কাচ দিয়ে
দেখে শুধু অমঙ্গল রাশ!

ভক্তি আর বিশ্বাসের চোখে
এ পৃথিবী মঙ্গল আলয়,
শত রত্ন জিনি প্রভা ধরে
ঈশ্বরের প্রেম জ্যোতির্ম্ময়!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ঠগী কাহিনী।

ভারতীর সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীর পৃষ্ঠায় দুর্দ্দান্ত ঠগী দস্যুদিগের সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা এমন একটি বিষয়, যে ইহার পুনঃ পুনঃ আলোচনায় পাঠকদিগের অপ্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ হরিসাধন বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই সকল কথারই পুনরাবৃত্তি করিব না, তিনি তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই মুখ্যতঃ আলোচনা করিয়াছেন, আমি এই প্রবন্ধে তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি এবং উচ্ছেদ সম্বন্ধে মুখ্যভাবে আলোচনা করিবার মানস করিতেছি।

এই দস্যু-সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এই জনপূর্ণ ভারতের বিশাল বক্ষে আপনাদিগের নিষ্ঠুর ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এক পৌরাণিক ঘটনার উপর ইহারা ইহাদের উৎপত্তি আরোপ করিয়া থাকে। ভারতের অনেক জঘন্য প্রথাই পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের উপর তাহাদের যুগব্যাপী অপবিত্রতার জঞ্জাল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাতে বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছে; এই জন্যই শিক্ষিত সম্প্রদায় পৌরাণিক ঘটনায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং বৈদেশিকগণ বিশ্বস্ত হৃদয়ে ভারতের পৌরাণিক কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করিতে গিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়েন। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এই জন্যই লিখিয়াছেন "Everything monstrous and abominable in India has the sanction of some pucrile or obscene legend to recommend it to the superstitions and the depraved. The legend which declares the divinity of Thuggee is preposterous even for an oriental tradition,"*

কোন পৌরাণিক কাহিনীর উপর ঠগী দস্যুদিগের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সত্যযুগের রক্তবীজ নামক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের কথা সকলেই জানেন। এই রক্তবীজ অমর হইবার আশায় অনেকদিন যাবৎ ঘোরতর তপস্যা করে; প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে আসিলেন, রক্তবীজ অমর বর চাহিল। ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু, সেইটিই হইবে না; তোমাদের জাত ভায়াকে কে না চেনে? আমি অমর বর দিব, আর তুমি সেই বর প্রভাবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের সকলকে তৃণ-জ্ঞান করিয়া আমার এত সাধের সৃষ্টিটি নাশ করিয়া দিবে তাহা হইবে না। অপর কোন বর প্রার্থনা কর।" রক্তবীজ অসন্তুষ্ট

* Vide Kaye's History of the 'Administration of the East India Company' p. 357.

হইয়া বলিল, "ঠাকুর, অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই।"—বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান আরম্ভ করিল ; ব্রহ্মা হংসারোহণে প্রস্থান করিলেন।

রক্তবীজ আবার বিশ পঁচিশ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিল, তাহার সে তপস্যা দেখিয়া দেবগণের মধ্যে মহাভয়ের সঞ্চার হইল ; কুবের, বরুণ, যম প্রভৃতি বড় বড় দেবগণের ভাবনা হইল এতদিন পরে বুঝি তপস্যা প্রভাবে রক্তবীজ তাঁহাদের মৌরসী তত্বগুলি কাড়িয়া লয়। ইন্দ্রের রাত্রে নিদ্রা হয় না, তিনি ভাবিলেন, আর যাহাই হউক, তাঁহার সিংহাসন খানির উপর রক্তবীজের নিশ্চয়ই নজর পড়িয়াছে, নতুবা তাহার এ নিদারুণ তপস্যা কেন?

ব্রহ্মা স্থির থাকিতে পারিলেন না ; আবার রক্তবীজকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সে কিন্তু পূর্ব্বের গোঁ ছাড়িল না, পুনর্ব্বার অমর বর চাহিল। ব্রহ্মা দেখিলেন বড়ই বিপদ, বর দিলেও সর্ব্বনাশ না দিলেও সর্ব্বনাশ, তাহার তপস্যাপ্রভাবে ত্রিলোক কম্পমান সুতরাং তিনি একটু "ডিপ্লোমেসি"—অর্থাৎ কুটনীতি অবলম্বন করিলেন, (আজ কাল ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাচুর্ভাবেই যে "ডিপ্লোমেসি" দেখা যাইতেছে তাহা নহে, পৌরাণিক যুগেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়) ব্রহ্মা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে এমন বর দিতেছি যে তোমাকে আর মৃত্যু জয় করিতে হইবে না ; যদি কোন ক্রমে তোমার বিন্দু মাত্র রক্ত মৃত্তিকায় পতিত হয় তবে সেই রক্ত বিন্দু হইতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজের উৎপত্তি হইবে, তাহারা সকলেই তোমার ন্যায় পরাক্রান্ত হইবে।"—আর অমর বরের আবশ্যক কি? রক্তবীজ "কেল্লা মার দিয়া"—ভাবিয়া তপস্যা ত্যাগ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইল।

ক্রমে রক্তবীজের অত্যাচারে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পমান হইয়া উঠিল। ত্রিভুবনের কোন যোদ্ধাই তাহার গাত্রে অস্ত্রক্ষেপ করিতে সাহস করেন না, এক রক্তবীজেই অস্থির, কোন রকমে এক ফোটা রক্তপাত হইয়া যদি ঝাঁকে ঝাঁকে রক্তবীজ গজাইয়া উঠে তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে?—সকলেরই শর তূণীরের মধ্যে, তীক্ষ্ণ ধার অসি কোষে আবদ্ধ রহিল।

অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দেবগণ এক বৈঠকে যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা সমাগত দেবগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বাপু সকল, আমি বর দিতে পারি কিন্তু অত্যাচার দমন করা আমার কাজ নয় ; তোমরা কালীকে গিয়া ধর।"

দেবতাগণ তাহাই করিলেন। কালী ব্রহ্মার বরের কথা শুনিয়া সেই বরের "ফ্যালাসী" বাহির করিবার অভিপ্রায়ে অনেক ক্ষণ চিন্তান্বিত রহিলেন ; বিস্তর চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে ; দেবগণ, তোমরা এ যাত্রা নির্ভয় হও, কাল রক্তবীজ নিহত হইবে।"

পর দিন কালী তাঁহার গাত্রস্থ ক্লেদ হইতে দুইজন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। জন্ম মাত্রেই তাহারা কালীর সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে দুইখানি রুমাল দিয়া বলিলেন, "ইহার ফাঁস গলায় লাগাইয়া রক্তবীজকে নিহত কর, ইহাতে একবিন্দুও রক্তপাতের ভয় নাই।" অনতি বিলম্বেই দেবীর আদেশ পালিত হইল। দেবী অনুচরদ্বয়ের

কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "যা তোরা লোকের গলায় ফাঁস দিয়া পুত্র পৌত্র পরম্পরায় সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ কর।"

এই পুরাতন কাহিনী হইতে দশ অবতারের গল্পের Evolution thoryর মত কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়া আর্য্য পণ্ডিতদিগকে লোমাঞ্চিত করিতে পারে কি না জানি না, কিন্তু ঠগী দস্যুদল দেবীর এই অনুচরদ্বয়কে আপনাদিগের মহামহিমান্বিত পূর্ব্ব পুরুষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন ধান্য পূর্ণ ভারতের সুবিস্তীর্ণ বক্ষে সগর্ব্বে এবং নির্ব্বাধে আপনাদিগের ব্যবসায় চালাইত। এক সময় ভারতের সর্ব্বত্রই ঠগীদিগের আড্ডাছিল, বিশেষতঃ মধ্য ভারতের ও পশ্চিম প্রদেশে ইহাদের অত্যাচারে লোকের পথ ভ্রমণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। থিভিউট নামক কোন ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন "দিল্লী হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত ভ্রমণের পথ নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু এই সকল পথে ভ্রমণের নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়; পথপ্রান্তে সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অতি সহজ, কিন্তু তাহা ব্যতীত এই পথে এক শ্রেণীর দস্যুর যত ভয় হিংস্র জন্তুর ভয়ও তত অধিক নহে। এই পথে গমনাগমনের সময় যাহাতে কোন ব্যক্তি নিকটে না আসিতে পারে প্রত্যেক পথিকের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এই দস্যুদলের ন্যায় ধূর্ত্ত দস্যু পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। এক খণ্ড বস্ত্রে ইহারা আল্‌গা ফাঁস লাগাইয়া রাখে, কোন পথিককে নিকটে দেখিতে পাইলেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে সেই ফাঁস পথিকের গলায় লাগাইয়া শ্বাসরোধ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ বধ করে। পথিকবর্গকে নিহত করিবার ইহাদের অন্যান্য কৌশলও আছে; ইহাদের দলস্থ কোন সুন্দরী স্ত্রীলোককে নির্জ্জন পথের ধারে একাকিনী বসাইয়া রাখে, স্ত্রীলোকটি আলুলায়িত কুন্তলে ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে থাকে, কোন অশ্বারোহী পথিক সেখানে উপস্থিত হইলে স্বাভাবিক দয়ার্দ্রচিত্ততাবশতঃ তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য তাহাকে নিজের পশ্চাদ্দেশে অশ্বের উপর তুলিয়া লয়, বিশ্বাসঘাতিনী রমণী তখন ধীরে ধীরে ফাঁস বাহির করিয়া সেই অশ্বারোহীর সর্ব্বনাশ করে; রমণী যে কার্য্য আরম্ভ করে, তাহার সহচরগণ নিকটবর্ত্তী গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া তাহা শেষ করিয়া যায়।"

বলা বাহুল্য সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লী হইতে আগরার পথই তখন ভারতের প্রধান রাজপথ ছিল, কিন্তু সেই পথেই ঠগীদিগের এই প্রকার অত্যাচার। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় অন্যান্য পথগুলি কিরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল।

ঠগী সম্প্রদায়ে যাহারা দীক্ষিত হইত, দীক্ষার সময় তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। তাহার মধ্যে মন্ত্রপূত চিনি খাওয়া প্রধান। এই চিনি না খাইলে কেহ ঠগ হইতে পারিত না। ঠগীদের বিশ্বাস এই চিনিতে কালীমায়ীর অংশ আছে এবং মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। ইহাদিগকে এরূপও বলিতে

শুনা গিয়াছে যে "এই চিনিতে মানুষের স্বভাব একেবারে বদ্‌লাইয়া দেয়, ইহার এতই প্রভাব যে ঘোড়াকে খাওয়াইলে তাহার পর্য্যন্ত স্বভাব বদ্‌লাইতে পারে।"—ঘোড়ার স্বভাব বদ্‌লাইয়া সে গাধা হয়, কি ঠগ হয়, সে তত্ত্ব অবশ্য আমরা পাই নাই, কিন্তু কর্ণেল শ্লিম্যানকে একবার এক ঠগ বলিয়াছিল যে "কোন লোকের যদি কুবেরের সম্পত্তিও থাকে এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার লাভজনক ব্যবসায়ে সে সুপণ্ডিত হয়, তবু তাহাকে এই চিনি একটু খাওয়াইলে সে আমাদের ব্যব্যসায় নিশ্চয়ই অবলম্বন করিবে। আমি যখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, সেই সময় আমার বাপ আমাকে এই ভয়ানক চিনি খাওয়াইয়াছিলেন, আমার যদি হাজার বৎসর পরমায়ু হয় তবু আমি এ ব্যবসায় ছাড়িতে পারিব না।"

ইহারা যে সকল লোককে বধ করে তাহাদিগের মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার জন্য মৃত্তিকা খননোপযোগী মন্ত্রপূত খন্তা গ্রহণ ইহাদের আর একটি নিয়ম। এই খন্তার প্রতি ইহাদের অসাধারণ ভক্তি। মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য ইহারা এই খন্তা ভিন্ন অন্য অস্ত্র কখন ব্যবহার করে না। একজন ঠগ শ্লিম্যান সাহেবকে বলিয়াছিল "আমরা সাতদিন অন্তর এই খন্তা পূজা করি, কোথাও যাইবার সময় ইহাই আমাদের দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা যখন কবর খোঁড়া হয় তখন ঠগ ভিন্ন অন্য কেহ সে শব্দ শুনিতে পায় না। এই খন্তা স্পর্শ করিয়া কাহারো মিথ্যা কথা বলিবার যো নাই।"

পথিকগণের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ঠগীরা নানাপ্রকার ছদ্মবেশ অবলম্বন করিত, এবং বিবিধ উপায়ে আপনাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধ করিত। রাস্তায় বাহির হইয়াই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িত। এবং তিন চারিজন একত্রে এক এক পথ অবলম্বন করিত, কিন্তু তাহারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিত যেন কেহ কাহারো পরিচিত নহে। এক সময় হয়ত ইহারা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির মত সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইল; সঙ্গে বিশ ত্রিশ জন আরদালী, পাঁচ সাত খানি পাল্‌কী বা ডুলী যেন তাহাতে কোন জমীদারের পরিবারবর্গ একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে, কিন্তু পাল্কী বা ডুলী অনুসন্ধান করিলে তাহার ভিতর হইতে দু পাঁচখানা খন্তা কি কোন রকম অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন আর কিছু বাহির হওয়া অসম্ভব হইত।

এইরূপ ছদ্মবেশে ইহারা পথিকের সঙ্গ ধরিত। বলা বাহুল্য ইহাদের দুরভিসন্ধিতে কাহারো কিছুমাত্র সন্দেহ হইত না। পথিকেরা কোন জঙ্গল বা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ কোন কোন নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইলে, ইহারা সেই নিঃসন্দেহচিত্ত পথিকদিগকে আক্রমণ করিত। একজন তৎপরতার সহিত ফাঁস বাধাইবামাত্র অপর একজন সেই ফাঁসে টান দিত, এই অবসরে তৃতীয় ব্যক্তি হতভাগ্য পথিকের পদদ্বয় ধরিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিত এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ হইয়া যাইত। মৃতব্যক্তির নিকট টাকাকড়ি যাহা কিছু থাকিত সমস্ত হস্তগত করিয়া ইহারা অবিলম্বে মৃতদেহ সমাহিত করিত। এই সময়ে ঠগেরা অন্য লোক দেখিলে অতি সত্বর একখানি বস্ত্রদ্বারা এই মৃতদেহ আবৃত করিয়া

তৎপার্শ্বে নতজানুভাবে উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিত, যেন তাহাদের কোন প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহারই মৃতদেহ সমাহিত করিতে আসিয়া ইহারা শোকে অধীর হইয়াছে।

সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে ইহারা যে কত প্রকার কৌশল অবলম্বন করিত তাহার সংখ্যা নাই। কখন কখন কোন হতভাগ্য পথিককে বধ করিয়া বস্ত্রান্তরালে তাহার মৃতদেহ সমাহিত করিত এবং অন্য লোককে বুঝিতে দিত যে সেখানে তাহাদের কোন পুর-মহিলার শেষক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। কখন বা পথিপার্শ্বে অন্য লোকের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র দলস্থ একজন সুচতুর ঠগ তখনি ভূপতিত হইয়া মৃগীরোগে আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ ভাব প্রকাশ করিত এবং অন্যান্য সঙ্গীগণ তাহার শুশ্রূষায় রত হইত। ইতিমধ্যে পথিকগণ সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য কোন প্রকার গাছগাছড়ার মুষ্টিযোগ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলে, অন্যান্য ঠগেরা সুবিধা বুঝিয়া মৃতদেহ গোপন করিয়া ফেলিত। অনেক সময় সমাহিত করিবার সুবিধা না পাইলে মৃতদেহ ইহারা নদীজলে বা কূপে নিক্ষেপ করিয়া যাইত।

এইরূপে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক ইহাদিগের করাল কবলে পতিত হইত। এক শদদ্রু ও নর্ম্মদা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডেই প্রতি বৎসর অন্যূন্য দশসহস্র লোক এই দস্যুদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় নিতান্ত অপরিচিত হইলেও ঠগেরা সমব্যবসায়ীদিগকে চিনিয়া লইতে পারিত। ইহাদের এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা ছিল, প্রয়োজন হইলে তাহাদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিত। ইহাদের আচরণ দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, হয়ত ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কিম্বা সমাজবন্ধন ছিল না; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা নহে, ইহারা সকলেই গৃহস্থ এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে সাধারণ অধিবাসীর ন্যায় ইহারা বাস করিত। নিজ গ্রামে ইহারা কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিত না, সকলেই শান্তশিষ্ট কৃষক; অনেকে বা বহু পরিবারবিশিষ্ট চাষী গৃহস্থ, অনেক কৃষক রাখিয়া ইহারা অধিক পরিমাণে জমী চাষ করিত। কিন্তু দস্যুবৃত্তিই তাহাদের প্রধান ব্যবসায়। চাষবাস ইহাদের দস্যুবৃত্তিকে অন্তরালে রাখিবার একটা উপায় মাত্র। গ্রামের লোক প্রায় সকলেই ইহাদের স্বভাব চরিত্রের কথা জানিত, কিন্তু ইহাদের ভয়ে কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিত না এবং প্রকাশ করিয়াও কোন সুফল ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

গ্রাম্য জমীদারগণ ইহাদের পাপ ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। এমন কি থানাদারেরা পর্য্যন্ত অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক ইহাদের অত্যাচার প্রশমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিত। অনেক সময় দেখা যাইত, দুই ভ্রাতার একজন চৌকীদার আর একজন ঠগ; হয়ত চৌকীদার ভ্রাতা গ্রামান্তরে কুটুম্বিতা করিতে গেল। ঠগেরা যাহা লুণ্ঠন করিয়া গৃহে আনিত গ্রাম্য জমীদার ও থানাদারকে তাহার অধিকাংশই দান করিতে হইত, এবং ইহাতে

আপত্তি করিলে সময়ে সময়ে ইহাদিগকে উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইত; এইজন্য ঠগেরা কখন কখন এক জমীদারের জমীদারী হইতে পলায়নপূর্ব্বক অন্য জমীদারের মাটীতে ঘর বাঁধিত। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদের "পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে" লাগিত।

এই দস্যুবৃত্তি যে ঠগীদিগের কেবলমাত্র ব্যবসায় ছিল তাহা নহে, ইহা তাহাদের ধর্ম্মের একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহাদের এই দস্যুবৃত্তির জন্যই দেবী তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন। মানুষ মারিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে ইহারা ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিত এবং দেবী-নির্দ্দিষ্ট সুলক্ষণের প্রতীক্ষায় থাকিত। ইহাদের লক্ষণা-লক্ষণের কতকগুলি নিয়ম ছিল; গৃহ হইতে বাহির হইয়াই খঞ্জ, কুম্ভকার এবং তৈলবিক্রেতা সম্মুখে দেখিলে ইহারা বড়ই কুলক্ষণ মনে করিত। পশুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ এই দুই জীবের মুখদর্শন ইহাদিগের নিকট অত্যন্ত সুলক্ষণের চিহ্ন, বলা বাহুল্য এই দুইটি জীবের একটি শৃগাল অন্যটি গর্দ্দভ। পশু পক্ষীর শব্দ ও দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যেও ইহারা সুলক্ষণ বা কুলক্ষণের পরিচয় পাইত।

নরহত্যাদ্বারা কোন সময় অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহারা মনে করিত দেবীর প্রসাদেই এরূপ হইয়াছে; কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে দেবীর প্রতি দোষারোপ না করিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতাকেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। প্রকৃত পক্ষে হিন্দু মুসলমান সকল ঠগেরই দেবীর প্রতি সুগভীর ভক্তি এবং অসাধারণ বিশ্বাস লক্ষিত হইত। একজন ঠগ কর্ণেল শ্লিম্যানকে বলিয়াছিল অন্য লোক একটি নরহত্যা করিয়াও পরিত্রাণ পায় না কিন্তু দেবীর অনুগ্রহে পুরুষানুক্রমে শত শত নরহত্যা করিয়াও তাহারা সুখে কাল কাটাইয়াছে। অন্যান্য ঠগেরও এই রূপ বিশ্বাস।

এই রূপ নির্দ্দয় নরহত্যাদ্বারা ঠগেরা যুগপৎ ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ ত করেই, এতদ্ভিন্ন এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানে ইহাদিগের প্রাণে যে অসাধারণ স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়, অনেক সাধু ব্যক্তির শত শত সৎকার্য্য করিয়াও তাহা হয় কি না সন্দেহ। শ্লিম্যান সাহেব একদিন এক ঠগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা যাহাদের হত্যা কর তাহাদের জন্য তোমাদের মনে একটু কষ্ট বা দয়া হয় না কি?" ঠগ প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিল "কখন না।"—এই উত্তরে আশ্চর্য্য হইয়া সাহেব পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন "বালক এবং বৃদ্ধেরা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহে বসিয়া গল্প করিতেছে, হয়ত তাহাদের পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা বলিতেছে, বিদেশে কষ্ট, অসু-বিধা এবং যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কতদিন পরে তাহারা স্বদেশে পিতামাতা এবং স্ত্রী পুত্রের কাছে ফিরিয়া যাইতেছে,—সে সমস্ত কথা শুনিয়াও তাহাদের প্রতি দয়া হয় না? অনায়াসে তাহা-দের গলায় ফাঁস লাগাও?"—ঠগ পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল "তাহাদিগকে মারিবার জন্যই ত দেবী আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহাদের না মারিব কেন? আমরা ত দেবীর হস্তে উপলক্ষ মাত্র, না মারিলে দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন যে। অবশেষে কি স্ত্রী পুত্র লইয়া অনাহারে মারা যাইব?"—সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সমস্ত লোক

মারিয়াও তোমরা সুখে নিদ্রা যাও এবং নিরুদ্বেগে খাওয়াদাওয়া কর।" ঠগ বলিল "অত্যন্ত নিরুদ্বেগে, কেবল মধ্যে মধ্যে যদি ধরা পড়িবার ভয় না থাকিত।"

কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ও ইহাদের অধিক ছিল না, কারণ ইহাদের বিশ্বাস দেবী যতক্ষণ সদয় থাকিবেন, ততক্ষণ কেহ ইহাদের কেশ মাত্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বিশ্বাস যে শুধু ঠগীদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, অনেক পরাক্রান্ত জমীদার পর্য্যন্ত ঠগীদের প্রতি দেবীর এই আশ্চর্য্য দয়ার কথায় বিশ্বাস করিতেন। এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য কর্ণেল শ্লিম্যান একজন ঠগীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, ঠগী উত্তর দিল "এমন অনেক জমীদারকে আমি জানি; ঝালোনের রাজা নান্‌হু, বুধু ও তাহার ভ্রাতা খুমুলী এই দুই বিখ্যাত ঠগকে হত্যা করায় দেবী রাজাকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করেন। যে দিন রাজা তাহাদিগকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করেন, তাহার পর দিনই তাঁহার শরীরে কুষ্ঠ বাহির হইল।" সাহেব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিশ্বাস কর এই ঠগদ্বয়ের প্রাণদণ্ড করাতেই দেবী রাজার প্রতি শাস্তি বিধান করিলেন?"—ঠগ সগর্ব্বে উত্তর দিল "নিশ্চয়ই।" সাহেব বলিলেন "রাজা কি দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন?" ঠগ গম্ভীরস্বরে বলিল "অনেক। বুধু ঝালোনে এক কুয়া কাটাইতেছিল, রাজা সেই কুয়া উত্তম করিয়া বাঁধাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, বুধু ও খুমুলীর নামে স্মরণ স্তম্ভ স্থাপন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না; দেবীর এক বার রাগ হইলে কি আর সে রাগ যায়? রাজা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া কয়েক মাস মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই কূপ স্মরণ স্তম্ভ দেখিবার জন্য এখনো দলে দলে লোক সেখানে উপস্থিত হয়।" অনন্তর কর্ণেল শ্লিম্যান অন্য একজন ঠগের নিকট পূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সে উত্তর দিল "আমি এমন অনেক ঘটনা জানি, মাধজী সিন্ধিয়া ৭০ জন ঠগের প্রাণদণ্ড করিবার জন্য তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখেন, তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, কিন্তু সে আদেশ অগ্রাহ্য করায় মাধজী মুখে রক্ত উঠিয়া তিন মাসের মধ্যে মারা পড়িলেন।" এই রূপে অনেক ঠগ সাক্ষী দেবীর মহিমা কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল; এই সকল বিভীষিকাপূর্ণ গল্পের দ্বারা ঠগীদমনের কর্ত্তা শ্লিম্যান সাহেবের মনে আতঙ্ক উৎপাদন করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু অবশেষে তাহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিল যে "কোম্পানীর এতই সৌভাগ্য যে দেবীরও সাধ্য নাই তাহাকে দমন করেন। কোম্পানীর জয়ঢাকের শব্দে ভূত, প্রেত, দৈত্য দানা, প্রভৃতি অপদেবতাগণই যখন পলাইবার পথ পায় না, তখন ঠগী কোন ছার?"

বাস্তবিকই ঠগীদস্যুগণ কোম্পানীর প্রবল শাসন সহ্য করিতে পারিল না; তাহাদের সুদূর বিস্তৃত, দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাদের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই

একদল দস্যু ধরা পড়িত মাত্র। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভারতের তাৎকালীক প্রধান সেনাপতি জেনারাল সেণ্ট লেজার সিপাহীদিগকে ঠগী দমনের জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং দোয়াব অঞ্চলে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। এই সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কয়েকজন উদ্যমশীল ম্যাজিষ্ট্রেট কতকগুলি ঠগীকে ধৃত করেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু উচ্চতর আদালতের বিচারে তাহারা মুক্তি লাভ করে।* সুতরাং বলা বাহুল্য একাল পর্য্যন্ত ঠগের অত্যাচার অতি অল্পই প্রশমিত হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে ভারতের চির হিতাকাঙ্ক্ষী শাসন কর্ত্তা লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের একান্ত যত্নে এবং আন্তরিক উৎসাহে ঠগী দমনের জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ স্থাপিত হইল। এই বিভাগ হইতে ঠগী দমনের জন্য এরূপ বিপুল চেষ্টা হইতে লাগিল এবং তাহাতে এতই আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইল যে দশ বৎসর পরে কর্ণেল শ্লিমান সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, "১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের তাৎকালীক প্রধান সেক্রেটারী মিঃ জর্জ সুইটন আমাকে এবং আমার সুযোগ্য সহযোগী মিঃ স্মিথকে লিখিয়াছিলেন, আমরা যে কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা পালন করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ এই দস্যুদিগের পাপ ব্যবসায় বিস্তীর্ণ ভারত বক্ষে বদ্ধমূল এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রসারিত হইয়াছে। বাস্তবিক ভারতে এমন জেলা ছিল না যেখানে এই দস্যুদল আপনাদিগের আড্ডা না বাঁধিয়াছিল। সুতরাং এই সুদূর বিস্তৃত দস্যু ব্যবসায় যে অতি অল্পদিনে তিরোহিত হইবে একথা কেহ একবারও মনে করিতে পারেন নাই; কিন্তু বিধাতা এই দেশের অসংখ্য নরনারীর মঙ্গলের ভার আমাদের হস্তে সমর্পন করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় অসাধারণ ঘটনা বৈচিত্র্যের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি।"†

কিরূপে এই পাপ উন্মূলীত হইল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্লিম্যান সাহেব এবং তাঁহার সহযোগীবর্গ অসীম উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন কিন্তু তাঁহাদের কৃতকার্য্যের পথে নানা প্রকার বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ প্রথমে নির্দ্দোষী গ্রাম্য লোকের ভিতর হইতে ঠগ বাছিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই, ক্রমে তাঁহারা বিশেষ কৌশলে দুই চারিজন প্রধান ঠগকে সাক্ষী শ্রেণীভূক্ত করিয়া হস্তগত করিলেন, এবং ইহাদের নিকট ঠগীদিগের সমুদয় গুপ্ত রহস্য অবগত হইলেন।

---

* "Mr. Wright apprehended seventy-six of whom seventeen made confessions, which strongly criminated the remaining fiftynine, who denied. Those who denied and those who confessed, were alike released by one sweeping order from the Nizamut Adalut, without security or anything else."

Letter from G. Stockwell, Joint Magistrate Etawah, to T. Wauchope, Magistrate, Bundelcund, December 1814.

† Sleeman. Preface to Published Report on the Depradations Committed by the Thug Gangs of Upper Central India· Calcutta: 1840.

যখন ঠগীদিগের সমস্ত রহস্যর দ্বার কর্ম্মচারী বর্গের নিকট উদ্ঘাটিত হইল, তখন তাহাদিগকে ধৃত করা বিশেষ কঠিন হইল না। বিভিন্ন প্রদেশে দলে দলে ঠগী ধৃত হইয়া কারাগার পূর্ণ করিতে লাগিল, এবং বিচারে কেহ দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ, কেহ দ্বীপান্তরিত এবং কেহ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই প্রকার কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় ঠগীদিগের মধ্যে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেবীর উপর ভার দিয়া আর কোম্পানীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই, সুতরাং তাহারা তখন নিজে নিজেই আত্মরক্ষার পথ দেখিতে লাগিল; কিন্তু পথ কোথায়? আড্ডা ছাড়িয়া, দলবল ভাঙ্গিয়া দেশান্তরী হইলেও কোম্পানীর হাতে রক্ষা নাই, সেখানেও কোম্পানীর লোক পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া অনেক ঠগ গা ঢাকা দিয়া নিতান্ত শান্তভাবে চাষবাসে মনোনিবেশ করিল, যেন তাহারা পরম নিরীহ চাষা, 'ফাঁস' লাগাইয়া মানুষ মারা দূরের কথা, 'ফাঁস' কাহাকে বলে তাহাও যেন তাহারা জানে না। অনেক ঠগ 'কোম্পানীর মুলুকে' বাস করা নির্ব্বিবাদ নহে বুঝিয়া ইংরেজ রাজ্যের বহির্ভূত প্রদেশে আশ্রয় লইল, এইরূপে কত ঠগ যে হায়দরাবাদ অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না। এই সকল মিত্র রাজ্যে যে সকল ইংরেজ রেসিডেণ্ট অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টায় ঠগীগণ সেই সকল রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইল। এইরূপে হিংস্র বন্যপশুর ন্যায় ক্রমাগত দেশ হইতে দেশান্তরে বিতাড়িত হওয়ায় ইহাদের জীবন দুঃসহ ও বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ইহারা ইংরেজ কর্ম্মচারীবর্গের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

ঠগী দমন সম্বন্ধে এই স্থানে একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে। ঠগীদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তাহা সাধারণ বিচার ব্যবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র এবং ঠগীদিগের যথেষ্ট অনুকূল। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে একজন ঠগী অপরাধী একজন সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা লঘুদণ্ড পাইত, এবং সামান্য সন্দেহেই যাহাতে কেহ দণ্ডিত না হয় সেজন্যও যত্ন করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের প্রশমনকালে ভারতপ্রবাসী অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানগণ কিরূপ ভৈরব চীৎকারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকগুলিকে সামান্য সন্দেহে (এবং অনেকে বিনা সন্দেহেই) ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ছিলেন তাহা কাহারো কাহারো স্মরণ থাকিতে পারে, এবং অনেকে হয়ত তৎসম্বন্ধীয় ইতিহাস হইতে তাহা জানিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পরম দয়াবান 'ক্লেমেন্সী' (উপহাস করিয়া সাহেবেরা তাঁহাকে এই উপাধি দান করিয়াছিল) ক্যানিং তাহাদের উন্মত্ত চীৎকারের কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপক্ষপাত বিচারের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং যাহাতে কোন নির্দ্দোষী দণ্ড না পায় তজ্জন্য বিশেষ সুতর্ক হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ভারত ইতিহাসের ইংরেজ রাজত্ব অধ্যায়ে ন্যায়পরতা ও ধীরতার সর্ব্ব প্রথম

দৃষ্টান্ত নহে। সিপাহীবিদ্রোহের বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতহিতৈষী লর্ড বেণ্টিকের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ ঘটনা ঘটে। যখন দলেদলে ঠগী ধরা পড়িতে লাগিল, 'ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়' এই প্রবচনের স্থষ্টি হইল, এবং বৃটিশ কারাগারগুলি ঠগী হত্যাকারীর সংখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন চারিদিকে গভীর কলরব উত্থিত হইল। ভয়ানক বিপদে যেমন লোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকে, বিপদ অতিক্রান্ত হইলে তখন 'হা হুতাশ' আরম্ভ করে, সেইরূপ দেশের লোক ঠগীদিগের করালহস্তে আপনাদের স্নেহময় আত্মীয় বা প্রিয়তম বন্ধুবান্ধব বিসর্জ্জন দিয়া কিংকর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের ব্যথিত ক্রন্দনোচ্ছাস তাহাদের হৃদয় প্রাচীরের সংকীর্ণ সীমায় অবরুদ্ধ ছিল ; শত শত ঠগী কারারুদ্ধ হইলে, তাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী বিপদ নিরাকৃত হইলে, তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিবার অবসর পাইল। ঠগীদিগের বিচারের সময় সেই সকল ব্যক্তির পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও অভিশাপ এই হতভাগ্যগণের মস্তকে উদ্যত বজ্রের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইল এবং এই রক্তশোষী কীটদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য সকলে প্রার্থনা করিতে লাগিল ; গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময় তাহাদের অধীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেন তাহা হইলে অনেক নির্দ্দোষী লোককে আইনের কঠোর দণ্ডে জীবন উৎসর্গ করিতে হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ সময় অত্যন্ত সাবধানতা পূর্ব্বক ঠগীদিগের বিচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই ঠগীদিগের অত্যাচার দূরীভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যদিও কখন কখন উত্তর পশ্চিম বা মধ্যভারতের পথিপার্শ্বস্থ কোন নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে অথবা নদীতীরে কোন হতভাগ্য পথিককে ঠগীদিগের দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নিহত দেখা যায়, কিন্তু ভারতের কোন প্রদেশেই আর ঠগী ব্যবসায় প্রচলিত নাই এবং ঠগী দস্যুর সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস হইয়াছে।

ইংরেজগণ ভারতের অনেক উপকার করিয়াছেন এবং প্রাকৃতিক ও নৈতিক সকল বিভাগেই সংস্কার সাধন করিয়াছেন, ইংরেজের কল্যাণে যে শুধু আমরা রেলেরগাড়ীতে বা ষ্টীমারে চড়িতে পারিতেছি কি তারে খবর চালাইতেছি তাহা নহে, কিন্তু ইংরেজের শিক্ষায় আমরা শিখিতেছি "আমরা কি ?" এইরূপ যত প্রকার ভারত হিতকর অনুষ্ঠান আছে, ঠগীদিগের অত্যাচার নিবারণ সেই সকল মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের পূরোবর্ত্তী বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই জন্যই একজন ইতিহাস লেখক এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "It is a greater exploit than the conquest of Sindh or the Punjab or the annexation of Pegu ; and the names of the commander of that little army of Thug hunters and of his unflinching lieutenants, ought in every History of India, to have honourable mention, and by every student of that History to be held in greateful remembrance."* আমরাও এই সহৃদয়

* John William Kaye: A History of Indian Progress. Part III. pp. 376.

ঐতিহাসিকের সহিত সমস্বরে বলি পঞ্চনদ এবং সিন্ধু হরণ করিয়া কিম্বা ব্রহ্মের সিংহাসন অধিকার করিয়া ইংরেজরাজ যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছেন ভারতের আভ্যন্তরিক সংস্কারে মনোযোগপ্রদান করায় এবং এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সুখশান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখায় তাঁহাদের সে কলঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষালিত হইতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির।

(৪)

দৃগ্‌-যন্ত্র।

"বৈষুব দূরবীক্ষণ" পরিদর্শ শেষ করিয়া তৎপরে আমরা যে গৃহে প্রবেশ করিলাম তাহাতে একটী নাতিবৃহৎ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহার নাম "দৃগ্‌-যন্ত্র" (Alt—Azimuth instrument)।

ক্ষেত্রজ্যামিতির সূত্র মতে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে দুইটী নির্দ্দিষ্ট রেখা গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে ক্ষেত্রস্থ কোন বিন্দুর দূরত্ব পরিমাণ করিলে তদ্দারা অনায়াসে ঐ বিন্দুর স্থান নিরূপণ করা যায়। আকাশ গোলকের পৃষ্ঠদেশকে ঐ রূপ একটী নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র কল্পনা করিয়া তাহাতে উপরোক্ত প্রণালী প্রযুক্ত হইতে পারে; যথা, কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি পরিজ্ঞাত হইতে হইলে ঐ গোলক পৃষ্ঠে দুইটী নির্দ্দিষ্ট রেখা কল্পনা করিয়া তাহা দিগের হইতে ঐ নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করা যায় এবং তদ্দারা তাহার স্থান নিরূপিত হয়। সাধারণতঃ জ্যোতিষীগণ এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ দুইটী উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর "নিরক্ষবৃত্ত" সমতলকে চতুর্দ্দিগে বর্দ্ধিত করিলে তাহা যে বৃত্তপথে আকাশ গোলককে ছেদ করে, ঐ বৃত্তকে "বিষুবদ্বৃত্ত" বলা যায়। পৃথিবীর বার্ষিক গতিবশে সূর্য্যকে সম্বৎসরকালে গগণে যে পথে আবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তাহাকে "ক্রান্তিবৃত্ত" (Ecliptic) বলে। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবদ্বৃত্ত দ্বয়ের সম্পাতবিন্দুদ্বয়কে "বিষুব" বলা যায়; এবং সূর্য্য বিষুবদ্বৃত্তের অধোভাগ হইতে ক্রান্তিবৃত্তপথে ঊর্দ্ধভাগে গমনকালে যে বিষুব অতিক্রম করে, তাহাকে "মহাবিষুব," এবং অপরকে "জলবিষুব" বলা যায়। যে বৃত্ত উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয় ভেদ করিয়া আকাশ গোলক বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে তাহাকে "যাম্যোত্তরবৃত্ত" বলে। প্রত্যেক যাম্যোত্তরবৃত্তোপরি যে সকল নক্ষত্র অবস্থিতি করে, ঐ যাম্যোত্তরকে সেই সকল নক্ষত্রের "লগ্নরেখা" বলা যায়। যে লগ্নরেখা মহাবিষুব ভেদ করিয়া গমন করে তাহাকে "আদিরেখা" বা "লগ্নমূল" বলে। এস্থলে ইহা প্রতীত হইল যে গগনমার্গে অসংখ্য লগ্নরেখা অঙ্কিত করা যাইতে পারে; এবং তাহারা প্রত্যেকেই বিষুবদ্বৃত্তের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত।

লগ্নমূল হইতে, কোন নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের লগ্নরেখার যে দূরত্ব, (ইহা সাধারণতঃ উভয় লগ্নরেখার মধ্যবর্ত্তী বিষুবদ্বৃত্তাংশ অথবা তদনুযায়ী কালাংশদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে,) তাহাকে ঐ নক্ষত্রের "লগ্নভুজ" (Right Ascension) বলে; এবং ঐ নক্ষত্রের যে লগ্নরেখা পথে, বিষুবদ্বৃত্ত হইতে নক্ষত্রের যে দূরত্ব পরিমাপ হয়, তাহাকে নক্ষত্রের "লগ্নজ্যা" বা "ক্রান্তি" বলা যায়।*

এক্ষণে দৃষ্ট হইবে যে বিষুবদ্বৃত্ত একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা এবং বিষুবদ্বয় দুইটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; অতএব লগ্নমূলকেও নির্দ্দিষ্ট রেখা বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে কোন নক্ষত্রের লগ্নভুজ ও ক্রান্তিদ্বারা দুইটী নির্দ্দিষ্ট রেখা হইতে তাহার দূরত্ব সূচিত হয়; অতএব ঐ দূরত্বদ্বয় জ্ঞাত হইতে পারিলে তাহাদ্বারা অনায়াসে নক্ষত্রের স্থিতি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে গগনমার্গে যে কোন দুইটী নির্দ্দিষ্ট রেখা পরাপর সমকোণ ভাবে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের হইতে কোন নক্ষত্রের দূরত্ব সাধনদ্বারা ঐ নক্ষত্রের স্থান পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বিষুবদ্বৃত্ত ও লগ্নমূল এ বিষয়ে সম্যক্‌ উপাদেয় হইলেও তাহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ ও স্থিতি জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আয়াস সাধ্য হইয়া থাকে। তাহারা নয়নের অগোচর; এবং যন্ত্রবলে তাহাদের স্থিতি নিরূপণ না করিলে তাহাদিগের হইতে কোন নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ সহজে জ্ঞান সাধ্য হয় না। এতদ্ভিন্ন নক্ষত্রের উদয়াস্ত কাল ও ক্ষিতিজ-ক্ষেত্রে সমাগমকালে তাহার স্থাননির্ণয়, যাম্যোত্তরবৃত্তাতিক্রমণকালে তাহার "মধ্যলগ্ন" নিরূপণ, এবং পর্য্যবেক্ষণের স্থান নির্দ্দেশে বেলা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি নানা আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে, যাহাতে লগ্নভুজ ও ক্রান্তি ব্যবহার করিতে হইলে তাহার গণনা অতিশয় জটিল হইয়া পড়ে। লগ্নভুজ ও ক্রান্তি সকল স্থানে সমান হওয়াতে তদ্দ্বারা উদয়াস্ত ঘটিত কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব এরূপ স্থলে বৈষুব দূরবীক্ষণ সম্পূর্ণ অনুপাদেয় প্রতিপন্ন হয়। ইহাও সহজে প্রতীত হইবে যে বৈষুব দূরবীক্ষণ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী নহে; তাহা ব্যবহার করিতে হইলে কথঞ্চিৎপরিমাণে জ্যোতিষাভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সকল কারণে, সাধারণ যন্ত্রব্যবহার জ্ঞাত থাকিলেই যাহাতে নক্ষত্রদিগের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং তৎসাহায্যে উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের যুগপৎ মীমাংসাও হইতে পারে তদ্ধেতু নক্ষত্রদিগের স্থান জ্ঞাপনার্থ অপর দুইটী নির্দ্দিষ্ট রেখা গ্রহণ এবং তদনুযায়ী যন্ত্রনির্ম্মাণ মানুষের আবশ্যক বোধ হইয়াছিল; মানুষ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেও সক্ষম হইয়াছে।

কোন স্থানের শীর্ষভেদ করিয়া যে "যাম্যোত্তরবৃত্ত" অবস্থিতি করে তাহাকে ঐ স্থানের "যাম্যোত্তরবৃত্ত" (Meridian) বলা যায়। এই বৃত্ত শীর্ষ ও ধ্রুবতারা ভেদ করিয়া গমন

* সূর্য্যসিদ্ধান্তে এই সংজ্ঞা কেবলমাত্র ক্রান্তিবৃত্তস্থ নক্ষত্রদিগের উক্তবিধ দূরত্ব সূচনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা সকল নক্ষত্রের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইল।

করে, অতএব তাহার স্থান জ্ঞাত হওয়া অতীব সহজ ব্যাপার। যাম্যোত্তরবৃত্ত ক্ষিতিজের সহিত লম্বভাবে অবস্থিতি করে, এবং ক্ষিতিজ জ্ঞান সকলেরই সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ক্ষিতিজ ও যাম্যোত্তরবৃত্ত এতদুভয়কে নির্দ্দিষ্ট রেখারূপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের হইতে কোন নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপদ্বারা তাহার স্থিতি নির্দ্দেশিত হইতে পারে।

শীর্ষভেদ করিয়া ক্ষিতিজের সহিত লম্বভাবে যে সকল বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তাহাদিগকে তত্তদুপরিস্থ নক্ষত্রদিগের "দৃগ্‌বৃত্ত" বলা যায়। এস্থলে ইহা লক্ষিত হইবে যে যাম্যোত্তরবৃত্ত শীর্ষ ভেদ করিয়া ক্ষিতিজের সহিত লম্বভাবে অবস্থিতি করাতে তাহাকেও একটী দৃগ্‌বৃত্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; ইহাকে সাধারণতঃ "ধ্রুবতারার দৃগ্‌বৃত্ত" অথবা "দৃঙ্মূল" বলা যায়। কোন নক্ষত্রের দৃগ্‌বৃত্ত পথে ক্ষিতিজ হইতে নক্ষত্রের যে দূরত্ব পরিমাপ হয় তাহাকে ঐ নক্ষত্রের "উন্নতি" কহে। দৃঙ্মূল হইতে ক্ষিতিজবৃত্তাংশে ঐ নক্ষত্রের "অগ্রা" (Azimuth বলা যায়। অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে কোন নক্ষত্রের "উন্নতি" ও "অগ্রা" সাধন করিতে পারিলে তদ্দ্বারা অনায়াসে তাহার স্থান পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যে যন্ত্রদ্বারা কোন নক্ষত্রের উন্নতি ও অগ্রা যুগপৎ পরিমাপ করা যাইতে পারে তাহাকে 'দৃগ্‌যন্ত্র' কহে।

দৃগ্‌যন্ত্র ও বৈষুব দূরবীক্ষণ এতদুভয়ের কার্য্য ও সাদৃশ্যগত যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন নক্ষত্রের উপর দূরবীক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া নক্ষত্রকে বহুকাল দূরবীক্ষণক্ষেত্রে সমাবিষ্ট রাখিয়া তাহার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করাই বৈষুবের কার্য্য; এই হেতু তাহাকে পৃথিবীর গতি সমন্বয়ে একটী বিপরীত দিগ্বাহী গতি প্রদান করিতে হয়। বৈষুবে অগ্রে স্থূল গণনা করিয়া তৎপর তদুদ্দেশে যন্ত্র স্থাপন করা হইয়া থাকে। কিন্তু দৃগ্‌যন্ত্রের কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহাতে নক্ষত্রের স্থান গণনা করা হইয়া থাকে। বৈষুবে ইহা লক্ষিত হইবে যে একবার যন্ত্রকে নির্দ্দিষ্ট অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলে নক্ষত্রের গতিদ্বারা তাহার কিছুমাত্র স্থিতিব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না; কারণ নক্ষত্রদিগের লগ্নভুজ ও ক্রান্তি সকল দেশে এক রূপ। কিন্তু নক্ষত্রের উন্নতি ও অগ্রা স্থান ও কালভেদে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, এই হেতু স্থান ও কাল সংস্পৃষ্ট কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনার জন্য দৃগ্‌যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

দৃগ্-যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতে সহজেই ইহা অনুমিত হইবে যে, ইহার দূরবীক্ষণের দুইটি স্বতন্ত্র গতি থাকা অত্যাবশ্যক। (১) ক্ষিতিজ সমান্তরালভাবে আবর্ত্তন দ্বারা অগ্রা সাধিত হইবে; (২) তদুপরি লম্বভাবে থাকিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দৃগ্‌বৃত্ত-পথে আবর্ত্তনদ্বারা উন্নতি সাধিত হইবে। প্রথম গতি সম্পাদনার্থ দূরবীক্ষণ ও তাহার অক্ষদণ্ডকে একটী আশ্রয়দণ্ডের উপর এমতভাবে নিবদ্ধ করিতে হইবে যেন ঐ আশ্রয়দণ্ড সর্ব্বাবস্থায় ক্ষিতিজের সহিত লম্বভাবে থাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হয়। এই ঘূর্ণন

দ্বারা অগ্রার পরিমাপ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় গতি সম্পাদনার্থ দূরবীক্ষণ এমতভাবে অবস্থিত করিবে যেন তাহার অক্ষদণ্ড সর্ব্বদা ক্ষিতিজ সমান্তরাল থাকিয়া আশ্রয়দণ্ডের সহিত লম্ব-ভাবে থাকে; অতএব দূরবীক্ষণ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনকালে ক্ষিতিজের সহিত সর্ব্বদা লম্বভাবে থাকিবে। যন্ত্রের সমতলক্ষেত্রকে ক্ষিতিজ সমান্তরালে অবস্থিতি করাইবার জন্য তাহাতে দুইটী "অম্বুসংশুদ্ধি" (Spirit level) সংযোজিত হইয়া থাকে; ইহারা পরস্পর সমকোণ ও পরস্পর হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে।*

গ্রীণ্‌উইচের দৃগ-যন্ত্রের দূরবীক্ষণের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫॥০ ফিট্ এবং চোঙ্গের ব্যাসায়তন ৪॥০ ইঞ্চ্। এই যন্ত্র প্রায়ই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন হইয়া থাকে। আমাদের সমভিব্যাহারী "বালক-প্রদর্শক" ইহা নিজ হস্তে ব্যবহার করিতে সক্ষম ছিল, (এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে একমাত্র মানমন্দিরের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার সহকারী ভিন্ন অপর কাহারই মেরুচক্র ও বৈষুব ব্যবহার করিবার অধিকার নাই; কিন্তু দৃক্‌যন্ত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র যন্ত্র সকল সাধারণতঃ সামান্য কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) সে ব্যক্তি একবার যন্ত্রটিকে ঘুরাইয়া আমাদিগকে তদভ্যন্তরে নেত্রসংযোগ করিতে আহ্বান করিল। আমরা দেখিতে পাইলাম সপ্তমীর চন্দ্র গগনে বিরাজ করিতেছে; তৎকালে তাহার উন্নতি ৩০ অংশে ছিল।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

---

* যাঁহারা Theodolite যন্ত্র দেখিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ইহা 'দৃগ্‌যন্ত্রের' একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানমন্দির সমূহে দৃগ্‌যন্ত্রের পরিবর্ত্তে Theodolite ব্যবহার করা হয়। এই সকল কারণে দৃগ্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল।

যোশীমঠের পথে।

২৪ মে রবিবার,—অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ আমাদের উঠ্‌তে একটু বেশী দেরী হয়েছিল; তখন সূর্য্য উঠেছে কিন্তু তখনো চারদিকে মেঘ বেশ ঘন হয়েছিল, আর সেই মেঘের মধ্যে হ'তে অল্প অল্প সূর্য্যকিরণ জলসিক্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতির উপর এক একবার প্রতিফলিত হচ্ছিল; সে এমন সুন্দর যে সহজেই একটা কিছুর সঙ্গে তার উপমা দেবার ইচ্ছা হয় কিন্তু যার সঙ্গে উপমা দেওয়া যেতে পারে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, আমার মনে হো'ল কোন সুন্দরীর বড় বড় জলভরা দুখানি চক্ষুর উপর মুখে যদি একটুখানি হাসি ফুটে ওঠে ত সে অনেকটা এই রকম দেখায়। প্রভাত সূর্য্যের সেই সতেজ, প্রদীপ্ত রশ্মির চেয়ে এই মেঘাবৃত প্রভা কেমন মধুর এবং সরস! বাজারের উপর সেই খোলা বারান্দায় ব'সে গিরিপ্রাচীরবেষ্টিত এই সুন্দর ক্ষুদ্র নগরটির প্রাভাতিক শোভা দেখে আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল, কিন্তু বেশীক্ষণ এ শোভা উপভোগ করার অবসর পেলুম না, স্বামীজীও বৈদান্তিক সুসজ্জিত হ'য়ে আমার পাশে এসে দর্শন দিলেন; সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না ক'রে নেবে পড়া গেল, দোকানদারের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে অবিশ্যি বেশী বিলম্ব হোল না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি চারদিক হ'তে কল কল ক'রে ঝরণা ছুটছে সুতরাং অনুমান করা কঠিন হ'লো না যে রাত্রে অসম্ভব রকম বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম গত রাত্রে আমরা কুম্ভকর্ণের 'এক্‌টিনী' করেছিলুম। একটু অগ্রসর হয়েই দেখি সেই বাঙ্গালী যাত্রীর দল নন্দপ্রয়াগের বাজারে তাদের এক বৎসরের ঘর দুয়োর ছেড়ে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। তাদের বিদায় দেবার জন্যে বাজারের অনেক লোক সেখানে জমা হয়েছে। দশদিন যেখানে বাস করা যায় সেখানকার লোকজন এমন কি গাছ পালার উপরও একটা স্নেহ জন্মায়, তা পাঁচটি বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ এক বৎসর কাল এই পর্ব্বতে ক্ষুদ্র একটা বাজারের মধ্যে বাস ক'রে সকলেরই পরিচিত এবং অনেকের আত্মীয় হ'য়ে উঠ্‌বে এ আর আশ্চর্য্য কি? আমি সে দোকানের সম্মুখ হতে সহজে চ'লে যেতে পাল্লুম না, আমার মনে নানা ভাবের উদয় হো'ল। স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে কেউ কোন পাহাড়ীর ময়লাকাপড়-পরা, ময়লা-গা মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন কচ্ছে, মেয়েটা এতখানি আদরের কোন কারণই খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে রয়েছে কারণ সে বুঝতে পাচ্ছে না এক বৎসর কাল ধ'রে সে যাদের কাছে আদর পেয়েছে আজ এই তাদের শেষ আদর, আর তারা এ জীবনে তাকে দেখ্‌তে আস্‌বে না। একজন বাঙ্গালী রমণী একটি যুবতীর গলা ধ'রে চক্ষের জল ফেলছে; তার এই এক বৎসরের সঞ্চিত স্নেহ মমতা যেন চোখের জলে উথ্‌লে উঠ্‌চে, যুবতীও তার দেশগত কাঠিন্য ভু'লে স্নেহশীলা বঙ্গবালিকার মতই

রোদন কচ্ছে; কোথায় সেই সুদূর পূর্ব্বের শস্যশ্যামল সমতল বঙ্গের অন্তঃপুরচারিকা আর কোথায় এই হিমালয়ের ক্রোড়স্থ পাষাণ প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র নগরের হিন্দুস্থানী যুবতী, পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল কিন্তু ভালবাসা এমন ছুটী বিসদৃশ প্রাণীকে এই এক বৎসরের মধ্যেই কি দৃঢ়রূপে এক সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে! তাই আজ তারা দেশ কাল ভুলে পরস্পরের জন্যে অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছে। আমি এই দৃশ্যে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম; এই দৃশ্য আমার কত কাল মনে থাক্‌বে। আমরা তিনজন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চি, ছেলের দল আমাদের সম্মুখে সা'র দিয়ে দাঁড়িয়েছে; বাঙ্গালীর জন্যে, আমারই যারা ভাই বোনের মত, তাদের জন্যে এই পাহাড়ীদের এত স্নেহ, এত আগ্রহ; কে জান্‌তো পাহাড়ের অনুর্ব্বর কঠিন প্রদেশেও আমাদের জন্যে করুণার কোমল উৎস শতমুখে প্রবাহিত হ'তে পারে?

পাহাড়ীদের কাছে বিদায় নেওয়া শেষ হ'লে তারা আমাদের কাছে বিদায় নিতে এল। এরা ছেড়ে যাবে, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্‌ল; জানিনে বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের প্রতি এমন টান হয় কেন, বোধ হয় দেশের একটা লুপ্ত স্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠে প্রীতি প্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে দেয়, তাই তখন আমরা আত্মপর ভুলে যাই, শুধু মনে হয়, এ যে দেশের আমিও সেই দেশের, এ আমার স্বদেশবাসী, আমার আত্মীয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই প্রিয়তম জন্মভূমির কথা মনে হোল, আমরা কোন্ অজানিত, বিপদপূর্ণ বরফের রাজ্যে যাচ্ছি, আর এরা চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমিতে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এ যাত্রা হ'তে যে এ জীবনে ফিরে আস্‌বো, সে কথা কে ব'ল্‌বে? মনে পড়লো, সেই বহুদিন আগে যখন কলকাতায় থেকে পড়া শুনা কর্‌তুম, সে সময় মধ্যে মধ্যে বন্ধু বান্ধবদের গাড়ীতে তুলে দিতে শিয়ালদ ষ্টেসনে যেতুম, তাঁরা যখন গাড়ীতে চড়ে বস্‌তেন, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, সে সময় দেশে যাবার জন্যে প্রাণে কেমন একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হোত, সেদিন সমস্ত দিন আর কোন কাজেই মন লাগতো না, শুধু বাড়ীর স্নেহকোমল স্মৃতি একখানা নিরাশাপূর্ণ চপল চিত্তকে অধীর ক'রে তুলতো; আজ অনেক বৎসরের পরে, বহুদূরে এই পর্ব্বতের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষকে দেশে যেতে দে'খে মনে সেই ভাব জেগে উঠ্‌লো। এখন ঘরে মা নেই, বাপ নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই; গৃহ অরণ্যের ন্যায় বিজন, তবু সেই প্রাচীন স্মৃতির সমাধিমন্দিরে ফিরে যেতে মন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। অনাহারে, ফল মূল মাত্র আহার ক'রে কত দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে কম্বল ভিন্ন সম্বল নেই, তারই উপর কত বিনিদ্র রাত্রিই অতিবাহিত হয়েছে, পরিশ্রমেও কাতর নই, কিন্তু হায়, কোথায় সন্ন্যাসীর সংযম এবং একাগ্রতা? মনুষ্যহৃদয় যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ও অত্যন্ত অসার।

কাতর হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে এক রাত্রির পরিচিত বাঙ্গালী যাত্রীদের বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় বিদায় দিলুম এবং যতক্ষণ তাদের দেখা যায় ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে

রইলুম, তারা অদৃশ্য হ'লে ক্ষীণপদবিক্ষেপে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। সঙ্গীদ্বয়ের মনে যে কোন রকম ভাবান্তর উপস্থিত হ'য়েছিল তা বোধ হ'লো না, কারণ তাঁরা আজ খুব তেজে চল্‌তে লাগলেন; আমার মনই আজ উৎসাহশূন্য, আমি সকলের পিছনে প'ড়ে রইলুম।

ছ মাইল এসে একটা টানা সাঁকো পার হ'য়ে লালসাঙ্গায় পৌঁছান গেল। যারা রুদ্রপ্রয়াগ হতে কেদারনাথ দর্শন কর্ত্তে যায় তারা এইখানে এ'সে বদরীনারায়ণের পথে মেশে। রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে আমরা অলকনন্দার ধারে ধারে এসেছি; কেদারযাত্রীগণ রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দা পার হ'য়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারের দিকে যায়; কেদার দর্শন ক'রে আবার চারদিনের রাস্তা হ'টে এ'সে ডাইনের একটা রাস্তা ধ'রে এই লালসাঙ্গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তায় পড়ে। লালসাঙ্গায় দোকানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গঙ্গা অনেক নীচে, সেখানে নাবাউঠা করা বড় কঠিন ব্যাপাব, এবং সকলে এই কষ্টসাধ্য কাজে প্রবৃত্তও হয় না, কারণ পাহাড়ের গায়ে যে তিনটে উৎকৃষ্ট জলের ঝরণা আছে, তাতেই সকলের কাজ চলে যায়।

লালসাঙ্গায় এসে আমরা একটা ছোট দোকানঘরে বাসা নিলুম। যায়গাটা তেমন নির্জ্জন নয়; কেদারনাথ এবং বদরিকাশ্রম উভয় পথের যাত্রীই এখানে সমবেত হয়, সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই এ স্থানটা সরগরম থাকে। এখানেও একটা থানা এবং একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, এ ছুটিই বেশ বড় রকমের; প্রথমে থানা দেখে পরে চিকিৎসালয়টি দেখ্‌তে যাব এ রকম ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানে পৌঁছিয়ে থানায় যে এক ব্যাপারের গল্প শুনা গেল তাতে আর কোথাও যেতে প্রবৃত্তি হ'লো না। ব্যাপারটা আবার আমাদেরই নিয়ে, আমাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের। পাঠক হয়ত গল্পটি শুন্‌বার জন্যে একটু উদ্‌গ্রীব হয়েছেন, সুতরাং সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে গৌরবজনক না হ'লেও আমাকে এখানে ব্যাপারটি খুলে ব'লতে হচ্ছে। ব্যাপার আর কিছু নয় একজন স্বামীজী—অবিশ্যি অনেক তীর্থ ভ্রমণ এবং প্রচুর ডাল রুটীর সর্ব্বনাশ করেছেন—সেইদিন সকালে চোর বলে ধৃত হয়েছেন। চুরীর জিনিষও বড় বেশী নয়, এক দোকানদারের একজোড়া ছেঁড়া নাগরা জুতো; স্বামীজীর স্কন্ধবিলম্বিত ঝোলার মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাশে শততালিবিশিষ্ট, ধূলিধূসরিত সেই অনিন্দ্য সুন্দর নাগরা জুতা শোভা পাচ্ছিল। বেচারা রাত্রে এক দোকানদারের দোকানে ছিল, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গীতাদি পাঠ হয়েছে, দোকানদার সাধু সৎকারেরও ত্রুটি করেনি; কিন্তু সাধুর নিতান্ত গ্রহ মন্দ, সকালে চ'লে যাবার সময় সে দোকানদারের নাগরা জোড়াটা ভু'লে ঝোলার মধ্যে তুলে নিয়ে "যঃ পলায়তি স জীবতি" কচ্ছিল। এদিকে দোকানদারেরও সকালে উ'ঠে কোথায় যাবার আবশ্যক হয়, সে জুতো পায়ে দিতে গিয়ে দেখে যে জুতো নেই! ঐ সন্ন্যাসী ছাড়া তার দোকানে আর কেউ ছিল না, কিন্তু এই ঘোর কলিকালে জুতো যে সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে একরাত্রে হঠাৎ জ্যান্ত গরু হ'য়ে মাঠে চরতে যাবে, নিতান্ত ছাতুখোর হলেও দোকানদারের মনে এমন একটা সম্ভাবনা

কিছুতেই স্থান পায়নি, সুতরাং সে সন্ন্যাসীকেই চোর ঠাউরে তার অনুসন্ধানে ছুটলো এবং শীঘ্রই বমাল সমেৎ সন্ন্যাসীকে ধ'রে লালসাঙ্গার থানায় উপস্থিত ক'রলে। শুনলুম অনেক লোক সেখানে একত্র হ'য়ে স্বামীজীর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা কচ্ছে, এবং সন্ন্যাসী জাতির উপরও অনেক ভদ্রতাবিরুদ্ধ অপরাধ আরোপিত হচ্ছে, অতএব এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে দু চারটে মিষ্ট সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেয়ে দোকানদারের মুখে সবিশেষ শুনাই কর্ত্তব্য মনে কল্লুম। আরও এক কারণে সেখানে যাওয়া হয়নি, শুনলুম চোর সন্ন্যাসী "পূরবিয়া" অর্থাৎ পূর্ব্বদেশবাসী। এ দেশের লোক, কাশী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গলা এই সকল দেশের অধিবাসীকে "পূরবিয়া" বলে, সুতরাং এই চোর সন্ন্যাসীর বাড়ী এই সকল দেশের কোথাও হলেই সে আমার এক দেশবাসী, কারণ আমরা দুজনেই "পূরবিয়া;" খামকা এখন কে চোরের জাতভাই হওয়ার অপবাদ ঘাড়ে কর্ত্তে যায়? বিশেষ আমরা যখন দোকানে ব'সে চোরের গল্প শুনছিলুম সেই সময় দু তিনজন লোক, দেখে বোধ হ'ল পাঞ্জাবী, আমাদের দোকানের সমুখ দিয়ে চোরের কথা বো'লতে বো'লতে যাচ্ছিল, আমাদের দেখেই হৌক কি কথা প্রসঙ্গেই হৌক, একজন বো'ল্লে "তামাম্ পূরবিয়া আদ্‌মী চোট্টা হ্যায়।" কথাটা অম্লান বদনে হজম করা গেল, একে বিদেশ, তাতে রাস্তার লোকের কথা, এ কথার আর কে প্রতিবাদ করবে? কিন্তু হুজুকে দেখ্‌লুম এরাও আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়; দুক্কুর বেলা যতক্ষণ ছিলুম, সকলের মুখেই সেই চোর সন্ন্যাসীর কথা। বোধ হ'ল এরা এই পাহাড়ের মধ্যে এক ভাবেই জীবন কাটিয়ে কিছু নূতনত্বের অভাবে দারুণ বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছিল, আজ এই এক 'নূতন' হুজুক জোঠায় এই ভয়ানক শীতে এরা দিনকত একটু বেশ সজীবতা অনুভব করবে।

বেলা থাকতেই সেখান হ'তে বের হ'য়ে তিন মাইল দূরে 'বওলা' চটিতে উপস্থিত হওয়া গেল; তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসছিল, আকাশ পরিষ্কার, দূরে দূরে দু পাঁচটা বড় বড় নক্ষত্র, পশ্চিম আকাশে অস্তমিত তপনের লোহিত রাগ অতি সামান্য প্রকাশ পাচ্ছিল এবং আমাদের আগেপাছে চারিদিকে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী বিরাট পাষাণ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছিল, সেই গগনস্পর্শী স্তূপাকার অন্ধকার রাশির দিকে তাকিয়ে ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়; জগতের কোন্ গভীর রহস্যে পাষাণ বক্ষ পূর্ণ ক'রে কত যুগযুগান্তর হ'তে এরা এমনি এখানে দাঁড়িয়ে আছে কে বল্‌তে পারে? আমার মত কত সংসারতাপক্লিষ্ট পথিক কতদিন হয়ত এমনি সময় এখানে দাঁড়িয়ে এই গম্ভীর দৃশ্য দেখে এই কথাই চিন্তা করেছে। চটিতে বিশ্রাম করবার জন্যে অল্প জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু রাত্রে আর কিছু আহার যুটলো না। শয়ন করা গেল বটে কিন্তু রাত্রির সঙ্গে শীতে হৃৎকম্প বৃদ্ধি হ'তে লাগলো, কি ভয়ানক শীত, এমন শীত আমরা একদিনও টের পাইনি। কম্বলের সাধ্য কি এ শীতকে দমন করে। স্বামীজী ও বৈদান্তিক একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলেন, আমার আবার সে অভ্যাস নেই, নিতান্ত পক্ষে যদি নাকদুটি বের না ক'রে রাখি ত

দম্ আট্‌কে মারা যাবার উপক্রম হই, কিন্তু নাক খুলে রাখাতে বোধ হ'তে লাগলো রাজ্যের জমাট শীত আর কোন খান দিয়ে সুবিধা না পেয়ে সেই পথেই বুকের মধ্যে প্রবেশ কচ্ছে, চটিওয়ালা আবার এর উপর জানিয়ে দিলে যে এই মোটে শীত আরম্ভ; এই যদি আরম্ভ হয় তবে শেষ না জানি কি রকম, আমার কল্পনা শক্তি সে কথা ভাবতে দেহখানির মতই আড়ষ্ট হয়ে পড়লো। অত্যন্ত কষ্টে রাত্রি কেটে গেল; এই প্রবল শীতে আমার ভাল রকম ঘুম হয়নি কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার নাসিকা গর্জ্জন সমস্ত রাত্রিই অপ্রতিহত ভাবে চ'লে ছিল।

২৫ মে সোমবার,—খুব সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। কনকনে শীত, দুইপাশে উঁচু অসমান পাহাড়, পাহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত রাস্তা; সেই রাস্তা ধ'রে আমরা চল্‌তে লাগলুম। এদিকে ক্রমেই গাছপালা সমস্ত ক'মে আস্‌চে; আমরা আজ যে রাস্তায় চল্‌চি তাতে গাছপালা নেই বল্লেই হয়, খালি নীরস, কঠিন, ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী স্তূপাকার হ'য়ে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, দুই একটা জায়গায় বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে, অন্যান্য দিন কদাচ বরফ দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু আজ অনেক জায়গাতেই শ্বেত বরফের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, সেই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বরফস্তূপের দিকে চাইলে মনে হয়, এমন পবিত্র বুঝি আর কিছু নেই।

বেলা প্রায় ৯টার সময়, আমরা পাহাড়ের যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম সেটা ছেড়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়লুম। এতক্ষণ দেখতে পাইনি, কারণ সম্মুখের পাহাড়ে আমাদের দৃষ্টিরোধ হয়েছিল, কিন্তু এখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র কি অপূর্ব্ব সুন্দর, মহান্ এবং গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হলো। বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে দেখলুম, আমরা এক সুবিশাল বরফের পাহাড়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, তার চারটি সুদীর্ঘ শৃঙ্গ, আগাগোড়া বরফে আচ্ছন্ন। তখন সূর্য্য আকাশের অনেকদূর উঠেছে, তার উজ্জ্বল কিরণ এসে সেই সমুন্নত শুভ্র পর্ব্বত শৃঙ্গগুলির উপর পড়েছে; প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সেই তুষার ধবল আর্দ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে হিল্লোলিত হওয়াতে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে কি যে এক সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হচ্ছিল, বর্ণনাদ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরের তুলিতে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের অতি সামান্য প্রতিকৃতিও অঙ্কিত হ'তে পারে না। মানুষের দুখানি হাত আশ্চর্য্য কাজ ক'রতে পারে, প্রকৃতিকে লজ্জা দেবার চেষ্টাতেই বুঝি মানুষের ক্ষুদ্র দুখানি হাতে আগ্রার জগৎবিখ্যাত সৌধ নির্ম্মিত হ'য়ে পথিকের নয়ন মন মুগ্ধ করছে; তাজমহল আমি অনেকবার দেখেছি, সে সৌন্দর্য্য সে ভাস্কর নৈপুণ্য, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্ব্বেল প্রস্তরের সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য প্রকৃতির স্বহস্তের কোন রচনা অপেক্ষা হীন ব'লে বোধ হয় না, কিন্তু আজ আমার সম্মুখে সহসা যে দৃশ্য উন্মুক্ত হয়েছে এ অলৌকিক; মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব্ব এই বিকট গভীর, নগ্ন সৌন্দর্য্যের পাদদেশে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায়, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বর্ণে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা

আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্ত্তে পারি ; সৃষ্টি দেখে আমরা স্রষ্টার মহানতার কতক পরিমাণ হৃদয়ে ধারণা করবার অবসর পাই।

খানিকদূর আর অন্য দৃশ্য নেই ; বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকেই শুভ্রকায় তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী। এ সকল দৃশ্য দেখবার আগে জায়গায় জায়গায় বরফের স্তূপ দেখেই মনে কি আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু এখন এই বরফের রাজ্যের মধ্যে এসে পড়াতে সেই গভীর আনন্দ অব্যক্ত বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে ; এক একবার আমার মনে হতে লাগলো সেই শস্যশ্যামল, সমতল, ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশ, আর এই চিরহিমানীবেষ্টিত, বৃক্ষলতাশূন্য নির্জ্জন উপত্যকা একি এক পৃথিবীরই অন্তর্গত ?

প্রায় পাঁচ মাইল যাওয়ার পর আবার যেন একটু একটু লোকালয়ের আভাষ পাওয়া গেল। আমরা আর একটা পর্ব্বতের উপর এসে পড়লুম—এটায় তত বরফ দেখা গেল না, স্থানে স্থানে বরফ আছে মাত্র, এ ছাড়া এদিকে ওদিকে দু পাঁচটা গাছ পালাও দেখা গেল। এ পাহাড়টা সেই বরফের পাহাড়ের একটি ক্ষুদ্রমস্তক দরিদ্র প্রতিবাসী ; আরো খানিক দূর যাওয়ার পর শুনলুম নিকটেই একটা বাজার আছে বাজারের নাম "পিপল কুটী", এই পাহাড়ের মাথার দিকটার খানিকটা জায়গা সমভূমি, সেখানেই বাজার অবস্থিত। আমরা রাস্তা ছেড়ে খানিক উপরে উঠে তবে বাজারে পৌঁছালুম। বাজারটা নিতান্ত মন্দ নয়, আট দশখানা দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্যও মোটামুটি সকল রকম পাওয়া যায় ; বাজারের অবস্থিতি স্থানই কিন্তু আমার সব চেয়ে মনোহর বোধ হ'ল। চারদিকে অত্যন্ত নীচু, কেবল মাঝখানে পাহাড়ের মাথার উপর বাজার, বাজার হতে নীচের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা একটা দোকানে আড্ডা নিলুম, আমাদের সেই দোকান বাজারের এক প্রান্তে ; দোকান হতে নেবে দাঁড়িয়ে একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, মাথা ঘু'রে উঠল।

'পিপলকুটী'তেই সে বেলা বাস কর্ত্তে হবে শুনে আমাদের আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। পাঠকের বোধ করি স্মরণ আছে, রাস্তায় একদিন 'পিপল চটিতে' মাছির উৎপাতে বিব্রত হয়ে দুফুরের রৌদ্র মাথায় করেই আমাদের চটি ত্যাগ কর্ত্তে হয়েছিল। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়"—আমাদের সেই দশা ; 'পিপল কুটী' নাম শুনেই 'পিপল চটির' কথা মনে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণ্য মক্ষিকাকুলের সাদর সম্ভাষণের সম্ভাবনায় প্রাণে দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল। সঙ্গের স্বামীজী অচ্যুত ভায়াকে ডেকে বোল্লেন, "অচ্যুত, দেখ কি, আজ মহাসংগ্রাম, 'চটি'তে যদি হাজার সৈন্য থাকে তবে 'কুটী'তে যে লক্ষাধিক সৈন্য থাকবে তার আর সন্দেহ নেই।" যাহোক খানিক পরেই বুঝলুম আমাদের ভয় অমূলক, এখানে মাছির কোন উপদ্রব নেই, কিন্তু মাছির বদলে আমাদের আর এক উপদ্রব সহ্য কর'তে হ'ল। আমাদের দোকান-দারের বাড়ী আর দোকান একই ঘরে, সেই ঘরের যে অংশে আমাদের থাকবার জায়গা হোল, তারই আর এক অংশে দোকানদারের পরিবারগণ বাস করে। তার পরিবারের

মধ্যে তার স্ত্রী, একটি ষোল সতের বছর বয়সের ছেলে, আর তিন চারটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে দেখতে পেলুম। বড় ছেলেটি দোকানের কাজে বাপের সাহায্য করে, আর ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের দোকান আর গৃহস্থালীর এলোমেলো বাড়িয়ে দেয়। আজ তাদের দোকানে এই নূতন যাত্রীকয়টি দেখে তাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের জন্যে তারা বড়ই উৎসুক হ'য়ে উঠলো, অচ্যুৎ ভায়ার গম্ভীর মুখভঙ্গী এবং বিজ্ঞের ন্যায় আকার ইঙ্গিত দেখে তাঁর কাছে বড় ঘেঁসতে সাহস করলে না; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে স্বামীজী ও আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ক'রে নিলে। তিনচার বৎসরের একটি মেয়ে আমার ডাইরীখানা নিয়ে গম্ভীর মুখে তার পাতা উল্‌টে পাল্‌টে পড়তে আরম্ভ কল্লে, শেষে পড়া শেষ হ'লে আমার পেন্সিলটি দখল করে ডাইরীর একখানা সাদা পৃষ্ঠায় দেবঅক্ষরে নানান কথা লিখ্‌তে লাগলো, আমাদের মত লোকের সাধ্য কি সে সব হরফের অর্থ আবিষ্কার করি। আজ কতদিন চ'লে গিয়েছে, সেই বালিকার কথা ভুলে গিয়েছিলুম; বালিকাটিও এতদিন না জানি কত বড় হ'য়ে উঠেছে, হয়তো সে তার সেই শৈশব চাপল্য এতদিনে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু আজ এই বাঙ্গলা দেশের এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্রগৃহে ব'সে যখন ডাইরী খুলে এই সব লিখ্‌চি তখন তার এক পৃষ্ঠায় সেই বালিকাহস্তের হিজিবিজি দেখে সেই সুদূর পর্ব্বতশিখরে দোকানীর সেই ছোট মেয়েটির কত কথা মনে হ'লো। পেন্সিলের দাগ আমার মনের মধ্যে তার সেই সুন্দর মুখ খানি, দুটি মোটা মোটা চোখ এবং কোঁকড়া কোঁকড়া বিশৃঙ্খল চুলের রাশের কথা জাগিয়ে দিলে। আমার সুদূর প্রবাসের অন্যান্য স্মরণ চিহ্নগুলির মধ্যে সাদা কাগজে বালিকাহস্তের এই পেন্সিলের দাগ একটি; কিন্তু এর মধুরত্ব আর কেউ বুঝতে পারবে না, শুধু আমার স্মৃতিতেই এর ক্ষুদ্র ইতিহাস সন্নিবদ্ধ। পেন্সিলের দাগগুলি ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, আমিও হয়ত একদিন সেই ছোট মেয়েটির কথা ভুলে যাব।

মেয়েটি যখন আমার ডাইরীতে এই রকম পাণ্ডিত্য প্রকাশ কচ্ছিল, সে সময় তার একটি বড় ভাই, বয়স, প্রায় ছয় বৎসর হবে, আমার পর্ব্বত ভ্রমণের সুদীর্ঘ যষ্টিখানা Evolution theory র জোরে অশ্বরূপে পরিণত ক'রে তাতেই সোয়ার হয়ে চাবুক লাগাচ্ছিল। এই রকমে আমাদের ক্ষুদ্র সঙ্গীগুলির সঙ্গে যে কত অনর্থক বাক্যব্যয় করতে হয়েছিল তার আর সংখ্যা নেই; তাদের যে সমস্ত প্রশ্ন, তার সদুত্তর দেওয়া আমাদের কাজ নয়, কিন্তু যা হয় একটা উত্তর পেয়েও তাদের সন্তোষের লাঘব হয় নি; তবে একটি ছেলের একটি প্রশ্ন আমার বহুকাল মনে থাকবে, তার বয়স বছর আষ্টেক, সে আমাদের তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে কর্ত্তে অবশেষে বল্লে "বাপ্‌জী নে বোলা কি স্বামী লোগো কো সাথ্ নারায়ণজী বাত্‌চিজ কর্‌তা হ্যায়, তুম্‌হারা সাথ্ নারায়ণজী কো ক্যা বাৎ হুয়া?"—প্রশ্ন শু'নে আমার চক্ষুস্থির। ভেবে চিন্তে বল্লুম "হামারা সাথ্ আবি তক্ নারায়ণজী কি মুলাকাত নেহি হুয়া," আমার কথা শুনে বালক কিছু বিরক্ত হয়ে বল্‌লে "আরে, তব্ কাহে ঘর ছোড়্‌কে সাধু

হয়া ?” কথাটা বালকের বটে কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর ভাবই লুকান ছিল; ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কিন্তু ধার্ম্মিক সাধু অনেক। আমি ধার্ম্মিকও নই, সাধুও নই কেবল সাধুর দলে প’ড়ে এই সব নিগ্রহ ভোগ করছি ; আগে জ্ঞান ছিল অসাধুর সঙ্গে বেড়ালেই বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, কিন্তু এখন দেখ্‌চি সাধুর দলে বেড়ালেও সকল সময় কৈফিয়ৎ এড়ান যায় না।

আজ বৈকালে আর বের হবার ইচ্ছে ছিল না। একেত বেলা বেশী নেই তার পর এমন কন্‌কনে শীত, বেলা থাক্‌তে থাক্‌তেই কম্বলের ভিতর হ’তে হাত পা বের করা শক্ত ; আমরা রওনা হ’তে একটু ইতস্ততঃ করাতে সকলেই বল্লেন এখন একে এই বরফ ভেঙ্গে চলা সহজ নয়, আমাদের গতিশক্তি ক্রমে ক’মে আস্‌চে, আবার এ সময় যদি আমরা দুবেলার বদলে এক বেলা চল্‌তে আরম্ভ করি তা হ’লে বদরিকাশ্রমে পৌছতে আমাদের আরো বিলম্ব হয়ে যাবে। স্থতরাং আমরা চল্‌তে আরম্ভ কল্লুম; দুমাইল দূরে ‘গড়ুই গঙ্গা’ চটী পর্য্যন্ত আস্‌তে আস্‌তেই সন্ধ্যা হ’য়ে গেল, কাজেই সে খানে রাত্রি বাস কর্ত্তে হো’ল।

২৬ মে মঙ্গলবার,—খুব সকালে উঠে চল্‌তে আরম্ভ কল্লুম, আপাদ মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনটি প্রাণী চল্‌চি। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল রৌদ্রে বোধ হয় এখন আমাদের বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে, বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিমের সর্ব্বত্র লোকজন গলদ্‌ঘর্ম্ম হ’য়ে শুধু “জল জল” ব’লে চীৎকার কচ্ছে আর আমরা বরফ স্তূপের ভিতর দিয়ে চল্‌চি, যেন চিরহিমানীমণ্ডিত মেরু প্রদেশ। মেরুপ্রবাসী, কঠিনব্রত, পৃথিবীর গুপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসীবর্গের কথা আমার মনে জেগে উঠ্‌লো ; কি তাঁদের যত্ন, উৎসাহ এবং একাগ্রতা ! এর চেয়েও প্রচণ্ড শীতে এবং বহু দূরবর্ত্তী, অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল প্রদেশে মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান ক’রে তাঁরা দিনের পর দিন কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করেন, আর আমরা কি করি ? হৃদয়ে অনেকখানি অবিনয় এবং মাথায় অহঙ্কারের দুর্ব্বহ বোঝা নিয়ে প্রকাণ্ড সাধু সেজে ইতঃস্তত ঘু’রে বেড়াই, হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং নির্ভর নেই, মানুষের প্রতিও স্বতঃউৎসারিত প্রেমপ্রবাহের একান্ত অভাব; কিন্তু তবু আমরা ইহকালে মানুষের ভক্তি এবং পরকালে অনন্ত স্বর্গের দাওয়া করি, কারণ আমরা সাধু, এবং আমরা তীর্থ পর্য্যটন ক’রে থাকি ! এই সমস্ত কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে “গড়ুই গঙ্গা” হ’তে ছমাইল দূরে ‘কুমার’ চটীতে উপস্থিত হলুম, তখন বেলা প্রায় বারটা। এখানে নামা মাত্র খাওয়া দাওয়া ক’রে অল্প বিশ্রামের পর আবার রওনা হওয়া গেল, তিন মাইল চ’লে সন্ধ্যাবেলা একটা পাহাড়ের গায়ে ডাকহরকরাদের আড্ডার মত এক নির্জ্জন কুটীর দেখ্‌তে পেলুম, সেই পত্র কুটীরেই রাত্রিবাস স্থির করা গেল। অন্ধকার রাত্রি, কোনদিকে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, নিকটে কোন লোকালয় আছে ব’লেও বোধ হ’লো না। এই বহুদূর বিস্তৃত, গগণস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা তিনটি পথশ্রান্ত, শীত ক্লিষ্ট পথিক কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে দিলুম।

২৭ মে বুধবার,—আমরা যোশীমঠের খুব নিকটে এ’সে পড়েছি। সকালে উঠে খুব

উৎসাহের সঙ্গে হাঁট্‌তে লাগলুম। রাস্তা এখনো অনেক যায়গাই বরফে ঢাকা, দিনকত আগে যে প্রায় সমস্ত পথই বরফাবৃত ছিল তা বেশ বুঝতে পারা গেল। এখন খুব বরফ গল্‌ছে। এ পথে "চড়াই উৎরাই" তত বেশী না থাক্‌লেও এই বরফের উৎপাতে আমাদের চোল্‌তে বড় অসুবিধা হ'চ্ছে। আমাদের পাঁচ মাইল পথ আস্‌তেই বেলা তুফুর হ'য়ে গেল; পাঁচ মাইল এ'সে যোশীমঠে (জ্যোতির্ম্মঠে) উপস্থিত হলুম।

শ্রীজলধর সেন।

উদাস-সঙ্গীত।*

(বসন্ত বাহার।)

(১)

আসিল বসন্ত, পড়িল ধূম !
জাগিল ধরণী, ভাঙ্গিল ঘুম।
রসা'য়ে রসা'য়ে, রসাল ডালে,
ডাকিল কোকিল, প্রভাতকালে !
ডাকিল কোকিল, মুকুলে কলি,
ফুটিল কুসুম, ছুটিল অলি;
গুঞ্জরে ভ্রমর, আমের গাছে,
পিউ পিউ পিউ, পাপিয়া নাচে !
ঝুরু ঝুরু বহে, মলয়া বায়,
সৌরভে ভুবন, ভরিয়া যায় !
সোণার নলিনী, সরেতে ভাসে,
টগর সেউতী, রাগেতে হাসে !
রূপের গরবে, ভুবন আলা,
না জানি কে তুলি, গাঁথিবে মালা !
না জানি কে তুলি, পরিবে গলে !
ধন্য রে সেজন, অবনীতলে !
ধন্য রে সেজন, এ খেলা যার,
ধরা খান গড়া, ফুলের ঝার !
কারে দিবে আজ, এ ফুল ডালা ?
কাহার লাগিয়ে ! গাঁথা এ মালা ?
বল রে জগত ! বল রে সবে !
এ ডালা সাজায়ে, কাহারে দিবে ?
সঁপিবে এ মালা, কাহার গলে ?
দাও হে জগত ! দাও হে বোলে !

(২)

আসিল বসন্ত, পড়িল ধূম !
জাগিল ধরণী, ভাঙ্গিল ঘুম ! !
রসা'য়ে রসা'য়ে, রসাল ডালে,
ডাকিল কোকিল, প্রভাত কালে !
ব'সেছে অই যে, জগত-রাণী—
বাড়া'য়ে চরণ-রাঙ্গা তুখানি !
ছড়ায়ে কিরণ ভুবন ভরা,
আপনার রূপে আপনি হারা।
মরি মরি ও যে মজা'ল দেশ,—
নাগর হইয়ে, নাগরী বেশ !

* সঙ্গীত রচয়িতা একজন মুসলমান, তিনি তাঁহার কবিতাটিতে হিন্দু ভাবের যে খেলা খেলাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ সহকারে এই কবিতাটি প্রকাশ করিলাম। ভাঃ সং।

কে জানে উহার এমনি খেলা !
ধন্য রে গুরুর, ধন্য সে চেলা।
কত মায়া জানে! না জানি কি ফাঁদ !
ফাঁদেতে বান্ধিল, গগণ চাঁদ !
মায়াতে গড়িয়া, মায়ার বিশ্ব,
শূন্যেতে ধরিয়া, দেখায় দৃশ্য !
আপনি সে বাপ, আপনি মেয়ে,
আপন মেয়ের উদরে যেয়ে,
আপনি প্রসবে, অযুত বিশ্ব,
ধন্য ধন্য মরি, ধন্য রে দৃশ্য !
আপনি লইতে, আপন ডালা,
আপন গলেতে, আপন মালা,
ছলিতে আপন, ভকত চেলা
বসা'ল একিরে, বাসন্তি-মেলা !

(৩)

সেই ইন্দ্র চন্দ্র, সেই সূর্য্য, মণি
সেই রে আঁধারে, মাণিকের খণি !
সেইঅন্নপূর্ণা লক্ষ্মী বাগ্বাণী ;
সে মোর হৃদয়ে, জগত-রাণী !
পূজরে পূজরে, জগত ! তারে,
ভজরে ভজরে, ভকতি হারে।
সেইত রহ্‌মান্ সেইত রহিম,
সেই রে জিহোবা, গোক্কায় লঈম !
সেই ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মাণ্ড ধারিণী,
সদাপ্রভু সেই, সে কাদের গণী।
সেইত রে বেদ পুরাণের সার,
নুর মহম্মদ্ প্রেরিত তাঁর !
পূজরে পূজরে, জগত ! তাঁরে
ভজরে তাঁহারে ভকতি হারে।

(৪)

আজ এ ধরায়, অপূর্ব্ব খেলা,
রূপের বাজারে, প্রেমের মেলা !
প্রেমের মেলায়, প্রেমের বিলানী,
তাহাতে বিরাজে, জগতের রাণী।
ভজিতে তাহার, চরণ দুখানি,
স্বরগ ভাঙ্গিয়ে, পড়েছে অবনী !
ভজিবারে সাধ, চরণ তার,
নূতন মালীতে গাঁথিছে হার।
নূতন কাননে, নূতন মালী,
হাতেতে লইয়ে, প্রেমের ডালী,
তুলিতে কুসুম, মনের সাধে,
পড়িল বিষম, বিধির বাদে।
ছুঁইতে মুকুল, ছুটিল কলি,
ফুটিল হৃদয়ে, যেন রে শলি !
নাড়িতে লতাটি, ঝরিল ফুল,
পড়িল পরাণে দারুণ শূল !
ঢলিয়া পড়িল সোণার পাখি !
হায় ! কে হানিল, আড়ালে থাকি ?
আড়ালে থাকি কে, মারিল শর ?
পড়িল পাখির হৃদয়পর !
ঢলিয়া পড়িল, সোনার পাখি,
হায় ! কে হানিল, আড়ালে থাকি ?
হায় রে ! নিঠুর কেমন সে রে ?
কান্দিল না প্রাণ, মারিল যে রে ?
নাহি কি মমতা ? নাহি কি মায়া ?
পাষাণে গড়া কি, তাহার কায়া ?
কেন রে ভাঙ্গিল, এমন ছলে ?
পাষাণ পুতুল, ফুলের কলে !
এমন চাতুরী, কেবা সে করে ?
গলিল পাষাণ অনিল ভরে !
যে জন কঠিন, বজর-কায়,
আজ সে পড়িল কুসুম ঘায় !
যে জন চলিত, অচল দ'লে,
আজ সে পড়িল, নলিনী তলে !

এমন চাতুরী, কেবা সে করে ?
গলিল পাষাণ, অনিল ভরে !
চতুরের চূড়া, চতুর সে বটে,
এক ঘটে নয়, বটে সর্ব্ব ঘটে।
ঘটে ঘটে তার, নূতন ঘটা
বলিহারি তার, চাতুরি-ছটা !

(৫)

চতুরের চূড়া চতুর সে বটে,
এক ঘটে নয় বটে সর্ব্বঘটে !
গলিল পাষাণ, গলিল ধরা,
গলিল আকাশ চন্দ্রমা তারা !
গলিল জগৎ, মোমের পারা !
হায় ! কে বহা'ল এ চক্ষে ধারা !
কে সে রে করিল, পাগল হেন ?
এমন করিয়ে কান্দালো কেন ?
কেন কান্দি আজ, কিসের তরে ?
কার প্রেমে আজ, এ অশ্রু ঝরে ?
কি দে'খে পরাণ উদাস এত ?
মানে না বারণ, বাউরা মত ?
কি রূপ রে আজ, হেরিল আঁখি,
পাগল করিল বনের পাখি !
সেইত আকাশ, সেইত ধরা !
না জানি আজিকে কি নূতনে ভরা!!
বনের কোকিলা, বনেতে গায়,
তার সাথে কেন, পরাণ ধায় ?
বনের ভ্রমরা, বনের পতঙ্গ,
তার স্বরে কেন, উথলে তরঙ্গ ?
বন-বাঁশে গড়া, কানুর বাঁশরী,—
তার স্বর কেন ভুবনহারী !
হায় ! কে বুঝাবে ? কে তাহা জানে ?
জগত বান্ধারে কিসের সনে !!
কিসের সনেতে, এ প্রাণ গাঁথা ?
কও রে কোকিলা ! কও সে কথা !
কও রে ভ্রমরা ! গুঞ্জন স্বরে,
কাহারে খোঁজরে, এমন ক'রে ?
কাহারে চাহিছ, তুমি গো ফুল !
কার তরে ফুটি, হয়েছ আকুল ?
কহ কহ শুনি, কহ সে কথা !
কিসের সনেতে এ প্রাণ গাঁথা ?
হায় কে বুঝাবে ? কে তাহা জানে ?
জগত বান্ধারে, কিসের সনে !!

(৬)

সাধে কি পাগল, ব্রজের রাধা
বাঁশীর স্বরেতে পরাণ বাঁধা
সাধে কি মজ্নু, দেখিয়া ফুলে,
পরাণ ত্যজিল সরসীকুলে।
সাধে কি জোলেখা দেখিয়া চান্দে
আকুল পরাণ, ব্যাকুল কান্দে।
সাধে কি পাগল হইল শিরী
রাখালিয়া গান, শ্রবণ করি।
কেন রে আঙ্গনে, রঙ্গন হেরি
মানুষের তরে পাগল পরী !!
গরজে জলদ, চিকুর হানে
নাচেরে ময়ূর, বিজন বনে !
কুমুদী চন্দ্রমা, কিরণ ভাসে,
তা দেখি, কেন রে চকোর হাসে ?
আকাশে তপন, নলিনী সরে,
ভ্রমরা কেন রে, কান্দিয়া মরে ?
হায় ! কে বুঝাবে ? কে তাহা জানে ?
জগত বান্ধারে কিসের সনে !

(৭)

আজ এ ধরায়, অপূর্ব্ব খেলা !
রূপের বাজারে, প্রেমের মেলা।
তাহাতে বিরাজে, জগত-রাণী,
ভজিতে চরণ তাঁর, দুখানি;

নবীন কাননে কে মালাকার,
নূতন কুসুমে, গাঁথিছে হার !
চিকণ গাঁথনে, বাড়িল বেলা,
কারে দিবে আজ, এ ফুল ডালা ?
ফুলের শরীরে, লতার বাঁধ,
কোমলে ছাঁদনে কঠিন ফাঁদ !
দেখিয়ে পরাণে, লাগিল ধন্ধ,
আকাশের চাঁদ, হইল বন্ধ !
সাবাস ফন্দিরে, সাবাস খেলা
ধন্য রে গুরুর, ধন্য সে চেলা।
ধন্য ধন্য আজ, বলি রে তোরে,
ভুবন বান্ধিলে লতার ডোরে !
হেলাতে হেলাতে, খেলাতে বসি,
আকাশ পাতাল, বান্ধিলে কসি !
ধন্য ধন্য আজ, বলি রে তোরে !
ভুবন বান্ধিলে, লতার ডোরে !
না জানি এ গুণ, শিখিলে কোথা ?
"ফুলের মালায়, পরাণ গাঁথা !"
তুমি ইন্দ্র চন্দ্র, তুমি সূর্য্য মণি,
তুমি গো আঁধারে, মাণিকের খণি !
তুমি অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী বাগ্বাণী,
এস এ হৃদয়ে জগত-রাণী !
তুমি রহ্‌মান্, তুমি ত রহিম,
তুমি ত জিহোবা, গোঙ্কার'লঙ্গম,
তুমি সদাপ্রভু, সে কাদের গণী
এস গো হৃদয়ে হৃদয়রাণী !!

শ্রীআব্‌দুল্ হামিদ্ খান্
আহ্‌মদী ইউসফ্‌জয়ী।

শ্যাম ও শ্যামের আভ্যন্তরিক অবস্থা।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্যাম বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিচিত্রতার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সকলেই জানেন বৃটীশ সিংহ এবং ফরাসী শ্যেন উভয়েই লুব্ধ দৃষ্টিতে এই ক্ষুদ্র আহার সামগ্রীটুকু নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, চীন মুষিক ও যে অতি সন্তর্পনে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহাও শুনা গিয়াছে, সুতরাং আশঙ্কা হইতেছিল পূর্ব্ব উপদ্বীপের আর একটু অংশ বুঝি বা এইবার কেহ নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিয়া ফেলে; কিন্তু শ্যামের শুভদৃষ্ট, ফরাসী শ্যেনের বিকট মুখব্যাদন দেখিয়া এবং পক্ষ সঞ্চালনের সঘন শব্দ শ্রবণে, সিংহ শ্যামকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, এখন কিছু কালের জন্য শ্যাম নিরাপদ বটে; তবে কথায় আছে."বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা"—সিংহ স্পর্শ করিলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, কোন প্রবচনে তাহার উল্লেখ নাই।

ইংরেজের সহিত শ্যামের ঘনিষ্ঠতা বড় বেশী দিনের নহে। ভারত সাগরে ইংলণ্ডের বাণিজ্যপোত অনেক কাল হইতেই বিচরণ করিতেছে কিন্তু ইংলণ্ড ও শ্যামের মধ্যে যাহাতে অবাধ বাণিজ্য চলিতে পারে এজন্য যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই মর্ম্মে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামের এক রাজদূত ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রচুর মূল্যবান মণি মুক্তা উপহার প্রদান করেন; এই ঘটনার পর পূর্ব্বোক্ত সন্ধিবন্ধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড বিশেষতঃ ভারতের সহিত শ্যামের বাণিজ্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইংলণ্ডের সহিত শ্যামের এই প্রকার মৈত্রীভাব থাকিলেও য়ুরোপের অন্যান্য প্রবলজাতি যে শ্যামের সহিত একেবারে সম্পর্ক শূন্য এরূপ নহে।

শ্যামরাজ্যের আয়তন বঙ্গদেশের দ্বিগুণ হইবে, কিন্তু লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষের অধিক নহে। শ্যামের অনেক স্থানই অরণ্যে ও পর্ব্বতে সমাচ্ছন্ন, সে সকল স্থানে লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প, কিন্তু সমতল প্রদেশে লোকের বসতি তেমন পাতলা নহে। শ্যামের প্রায় সর্ব্বত্রই নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, এ দেশের অরণ্যে মূল্যবান বৃক্ষ এবং ভূগর্ভে অপর্য্যাপ্ত খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিকাংশ নরপতিই যথেচ্ছাচারী এবং তাঁহাদের যথেচ্ছাচারের পরিচয় নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জের অসহায় জীবনের উপর প্রচুর পরিমাণে প্রকটিত হয়, কিন্তু শ্যামের অধিবাসীগণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান্‌। শ্যামরাজের স্বর্গীয় পিতা প্রজারঞ্জন গুণে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং পিতার এই মহৎ গুণের অনুকরণে বর্ত্তমান রাজারও অত্যন্ত অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা পুত্র উভয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। রাজধানী ব্যাঙ্কক নগর সর্ব্ববিষয়েই ইয়ুরোপীয় নগরের আকার ধারণ করিয়াছে; ব্যাঙ্কক বিদ্যুতালোকে আলোকিত, প্রত্যেক রাজপথ ট্রাম লাইনে সমাচ্ছন্ন এবং

আফিস আদালত ও রাজপ্রাসাদ সমস্তই ইয়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত। শ্যামরাজ সামাজিক সংস্কারেরও অনুরাগী, তাঁহার রাজত্ব কালে রাজ্য হইতে অনেকগুলি কলুষিত প্রথা বিদূরীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দাসব্যবসায় একটি।

শ্যামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। অধিবাসীগণ অত্যন্ত আমোদপ্রিয় এবং পরিশ্রমবিমুখ, সুতরাং ভূগর্ভে যে সমস্ত বহুমূল্য আকরিক পদার্থ থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে তাহা উদ্ধার করিয়া স্বদেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিবার মত ইহাদের প্রকৃতি নহে। এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য প্রধানতঃ চীন ও মালয়বাসীর হস্তে অবস্থিত। কয়েক বৎসর হইতে শ্যামে প্রচুর পরিমাণে রেলওয়ে বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্যামরাজ ইয়ুরোপীয়গণকে আপন অধিকার মধ্যে বাস করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন, এই স্থত্রে ইয়ুরোপের সহিত শ্যামের বাণিজ্য অপ্রতিহত ভাবে বিস্তৃত হইতেছে। গতবৎসর শ্যাম হইতে তিন কোটী টাকার পণ্য দ্রব্য ইয়ুরোপে প্রেরিত হইয়াছিল, শ্যামের ন্যায় অদ্ধ সভ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে ইহা অল্প নহে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্যামের রাজ পরিবারস্থ দামরং নামক একটি যুবক ইংলণ্ড ভ্রমণ করিতে যান, বিখ্যাত 'টাইমস্' পত্রিকার জনৈক লেখক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, দামরং বলিতেছেন "শ্যাম ক্রমে উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরোহন করিতেছে, নদীতে ষ্টীমার এবং রাজপথে ট্রামগাড়ী ও ওমনিবস্ চলিতে আরম্ভ হইতেছে, সন্ধ্যার পর ব্যাঙ্ককের রাজপ্রাসাদ বিদ্যুতালোকে আলোকিত হয়, সমস্ত নগর বিদ্যুতালোকে আলোকিত করিবার প্রস্তাবও শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। রাজ্যে রেলওয়ের প্রচুর বিস্তৃতির জন্যও রাজার অত্যন্ত চেষ্টা আছে।" দামরং শ্যামে শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, সুতরাং তিনি তত্রত্য শিক্ষা বিস্তারের যে বিবরণ দেখিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়, তাঁহার হিসাব অনুসারে শ্যামে গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহে দুই সহস্র ছাত্র এবং পুরোহিতবর্গের অধীনে পঞ্চাশ সহস্র বালক শিক্ষিত হইতেছে। শ্যাম মঠের সংখ্যা পাঁচ সহস্র সুতরাং প্রত্যেক মঠে গড়ে দশজন ছাত্র অধ্যয়ন করে। পুরোহিতগণ কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকেন না কারণ ইহা তাঁহাদের শিক্ষা এবং কর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রধান পুরোহিত রাজকোষ হইতে বার্ষিক প্রায় হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। পুরোহিতরা কাহারো নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিলে যে রূপেই হউক তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহাদিগকে কখন কোন দ্রব্যের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে দেখা যায় না। বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইলেও বর্ত্তমান কালের উন্নতমনা শিক্ষিত যুবকদিগের ন্যায় দামরং স্বীকার করেন যে "যিশুখৃষ্টের প্রবর্ত্তিত উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা তাহা একজন ধার্ম্মিক খৃষ্টানের অপেক্ষা অল্প নহে। গস্পেলে যে মহৎ নীতির অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অতীব প্রসংশনীয়। মিসনারীগণ যদি সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় মতের সমন্বয় সাধনে তৎপর হইয়া এবং কোন

ধর্ম্মেরই হিংসা না করিয়া সাধারণকে সদুপদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে।”

আর একজন পর্য্যটক লিখিয়াছেন অদ্যাবধি শ্যামে লোক সংখ্যা গণনা করা হয় নাই, সাধারণের বিশ্বাস শ্যামের অধিবাসীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ। কিন্তু ইহার সহিত অধীনস্থ জনপদ-গুলি একত্র করিলে লোক সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ হইবে। রাজধানী ব্যাঙ্ককই একমাত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর। ব্যাঙ্ককের লোক সংখ্যা চারি লক্ষ, ইহার মধ্যে ইয়ুরোপীয়ের সংখ্যা চারিশত মাত্র। ব্যাঙ্কক সমুদ্রের তীর হইতে পনেরো ক্রোশ দূরে মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত, মেনামের পূর্ণ নাম “মেনাম-চাও-কিয়া।” মেনামের যে অংশে নৌকাদি যাতায়াত করে তাহার বিস্তার প্রায় তিনশত ফিট। মেনামের অতি অপ্রশস্ত অংশে দুই তীরে দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত রহিয়াছে, নদী মধ্যে কোন জলযানের প্রবেশ বাধা দিতে হইলে এই উত্তর দুর্গ হইতে কতকগুলি সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল প্রসারিত করিয়া তাহাদ্বারা নদীর বিস্তার রোধ করা হয় এবং এই কার্য্যের জন্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার মন লোহশৃঙ্খ দুর্গ সন্নিকটে রক্ষিত হইয়াছে। নগরের মধ্যে অনেকগুলি রাজপথ আছে, তাহার মধ্যে একটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নগরস্থ রাজপথ অপেক্ষা তাহার চতুর্দ্দিকে যে বহুসংখ্যক খাল রহিয়াছে তাহাদ্বারাই নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। খালের এই রূপ প্রাচুর্য্যের জন্য অনেক ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক বাঙ্ককে ‘পূর্ব্ব রাজ্যের ভিনিস্’ এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল খালের একটি প্রধান অসুবিধা আছে, খালগুলির অধিকাংশই প্রায় শৈবাল এবং বিবিধ জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ।

নদীজলে বংশ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর গৃহ ভাসমান রহিয়াছে; বসন্তের চন্দ্রালোকে যখন নদীর চঞ্চলবক্ষ উজ্জ্বল হয় এবং সুন্দর নৈশ সমীরণ-হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গকুল আকুল হইয়া উঠে তখন সেই দারুগৃহবাসী মনুষ্যগণ না জানি কি আনন্দই না অনুভব করে। সন্ধ্যার পরই রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়, সেই সমুজ্জ্বল আলোকমালা পরিশোভিত পথে যখন দলে দলে নরনারী বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া প্রফুল্লহৃদয়ে বিচরণ করে, তখন শত শত ব্যক্তির উৎসাহপূর্ণ পদচারণে রাজপথ সজীব হইয়া উঠে।

শ্যামের রাজপ্রাসাদ একজন ইংরেজ মিস্ত্রীর সহায়তায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই প্রাসাদে পৃথিবীস্থ নানাদেশ হইতে সংগৃহীত অনেক আশ্চর্য্য বস্তু রক্ষিত হইয়াছে। রাজার অভ্যর্থনাগৃহ য়ুরোপীয় রাজন্যমণ্ডলীর মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুসজ্জিত, এই গৃহসজ্জার মধ্যে রুচির পারিপাট্য এবং এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। শ্যামরাজ্যের প্রমোদ গৃহের সজ্জাও অত্যন্ত মনোহর এবং সুরুচিসম্পন্ন; এইগৃ হের অভ্যন্তরভাগ অধি-কাংশই পীতবর্ণ রেসমে আচ্ছন্ন, গৃহের স্থানে স্থানে স্ফটিক নির্ম্মিত সুদৃশ্য দ্রব্যজাত এবং বিবিধ প্রকার বহুমূল্য হীরকরত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হইয়াছে।

এই পর্য্যটক আরো লিখিয়াছেন যে যখন তিনি বাঙ্ককে ছিলেন সেই সময় শ্যামরাজের ৪০শ জন্মবার্ষিক উপলক্ষে তিনি রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হন। সে দিন রাজা অভ্যাগত ব্যক্তিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সময়োচিত কথাবার্ত্তায় সকলকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে তাঁহার দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্র দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তিনি প্রিয়দর্শী এবং মিষ্টভাষী, তিনি যথেচ্ছাচারী নরপতি, সকল প্রকার কর স্থাপন এবং ব্যবস্থা প্রণয়নের তিনিই এক মাত্র অধিকারী; তবে কোন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের পূর্ব্বে তিনি একবার মন্ত্রীসভার মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্যামে তাড়িতবার্ত্তাবহনের ভার ফরাসীদিগের দ্বারা, ডাক বিভাগ জর্ম্মনদিগের দ্বারা, শুল্ক সম্বন্ধীয় কার্য্য পর্টুগীজদিগের দ্বারা কারাবিভাগ রুসের দ্বারা এবং সৈন্য পরিচালন ও নৌবিভাগ দিনেমার কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

হিন্দু বালকগণের চূড়াকরণের ন্যায় শ্যামের বালকবর্গের একটি সংস্কার আছে। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় শ্যামের বালক বালিকাগণের কেশচ্ছেদন সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই বালক বালিকাদিগের সমস্ত মস্তক কেশ শূন্য করিয়া কেবল মস্তকের মধ্যস্থলে তরমুজের বোঁটার ন্যায় একটি স্থূলকায় টিকি রাখা হয়; চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় প্রচুর ধূমধামে এই টিকি কর্ত্তন করা হয়, এবং ইহাই ইহাদের কেশচ্ছেদ সংস্কার। কিন্তু বালকদিগের সম্বন্ধে যাহাই হউক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সুন্দরী কিশোরীর মস্তক মুণ্ডন, টিকি রাখা, কিম্বা টিকি কাটা বোধ করি তাহাদের নিকট কিছুমাত্র প্রীতিকর নহে, না হইলেও কিন্তু ইহাতে তাহাদের গৌরবের বৃদ্ধি ভিন্ন লাঘব দেখা যায় না। যে দেশের যেমন আচার।

তিনবৎসর হইল শ্যামের যুবরাজের এই টিকি কর্ত্তন সংস্কার অত্যন্ত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে সপ্তাহকাল ধরিয়া শ্যামে আনন্দোৎসবের বিরাম ছিল না; দলে দলে বালক বালিকা, যুবক যুবতী এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নানাবিধ উজ্জ্বল রত্ন ও বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া এই রাজকীয় মহোৎসবে মত্ত হইয়াছিল। এই কয়দিন রাজাও যুবরাজ রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রাঙ্গনে সমবেত নাগরীকবর্গের সহিত মিলিত হইতেন এবং সুশোভিত প্যাগোডার উপর হইতে নর্ত্তকগণের নৃত্য ও উৎসব সন্দর্শন করিতেন। চতুর্থদিন প্রাতঃকালে প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী এবং অভিজাতবর্গের সম্মুখে রাজা স্বহস্তে যুবরাজের টিকি কর্ত্তন করিলেন, অনন্তর অবিলম্বে যুবরাজকে স্বর্ণমণ্ডিত মণি মুক্তা ভূষিত পালকীতে উঠাইয়া এবং রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া প্রাঙ্গনস্থিত একটি কৃত্রিম পাহাড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হইল, এই পাহাড় মেরু পর্ব্বতের প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই পাহাড়ের পদতলে রাজা এবং রাজপরিবাস্থ অন্যান্য লোক সমবেত হইয়া পবিত্র জলে যুবরাজকে স্নান করাইয়া দিলেন, অনন্তর তাঁহাকে পাহাড়ের শিখরদেশে লইয়া যাওয়া হইল; সেখানে একখানি বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া রাজা

দুইজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে সাক্ষী করিয়া কুমারের মস্তকে রাজমুকুট এবং হস্তে এক খানি তরবারি প্রদান করিলেন, তাহার পর মন্ত্রাদি পাঠ দ্বারা অন্যান্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে যুবরাজকে রাজবেশে পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে তিনবার ঘুরাইয়া আনা হইল।

যুবরাজকে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য শ্যামরাজ যথেষ্ট যত্ন করিতেছিলেন। যুবরাজের বয়স এখন প্রায় ষোল বৎসর, চারিবৎসর পূর্ব্বে তিনি একবর্ণও ইংরেজী বুঝিতেন না কিন্তু তাঁহার সুদক্ষ শিক্ষক মোবার্ণ্ট সাহেবের অধ্যাপনা গুণে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই অতি উত্তম ইংরজৌ শিখিয়াছেন। বাঙ্গলায় 'সখা' এবং 'সাথীর' ন্যায় ইংরেজীতে 'লিট্‌ল ফোক্‌স' নামক একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা আছে, যুবরাজ এই পত্রিকার একজন গ্রাহক। গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'লিট্‌ল ফোক্‌সের' বালক পাঠকগণের জন্য রচনার পুরস্কার দেওয়া হয়, যুবরাজ এক 'পোষলার' রচনা লিখিয়া পুরস্কার লাভ করেন; তাঁহার শিক্ষক লিখিয়াছিলেন যুবয়াজ অন্যের সাহায্য ব্যতীত, তাঁহার অবসর কালে, এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই সময় তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র; এই অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বিদেশীয় ভাষায় রচনার পুরস্কার লাভ করা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

যুবরাজের নাম মহাবাজিকন্নিস, কিন্তু তাঁহার পিতা ও পিতামহের নামের তুলনায় ইহা অতি ক্ষুদ্র, ভরসা করা যায় তিনি সিংহাসনে আরোহন করিলে তাঁহার নামও মহিমা বৃদ্ধির সহিত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইবে। পাঠক মহাশয় হয়ত বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নাম শুনিতে একটু উৎসুক হইয়াছেন; অনেক দেশের ইতিহাসে আমরা অনেক ছোট বড় নাম পড়িয়াছি কিন্তু শ্যামের রাজাগণের নামের ন্যায় বিভীষিকাপূর্ণ, উচ্চারণকঠিন, সুদীর্ঘ নাম আর কখন দেখা যায় নাই।

শ্যামের বর্ত্তমান রাজার নাম,—ফ্রাবৎ-সমদেৎ-ফ্র-পরমিন্দ্র-মহা-চুলালন-কম-ফ্র-চুল-ফ্রাও ফ্র-চও-য়ুনা। পুত্রের অপেক্ষা বোধ করি পিতার নাম আর একটু দীর্ঘ হওয়া দরকার, তাই স্বর্গীয় রাজার নাম, প্রবৎ-সমদেৎ-প্রবামন্থরাক্ষামনকুৎ-দীপয়াপক্ষ-বংশাদিৎসারাতেসারাৎ-নিকারোদোবরম্‌-মহাচক্রপরাৎচরম্‌থানিমিকা।

এখন জিজ্ঞাস্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শ্যামের ইতিহাস পঠিত হয়?

সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা।

গত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস আলোচনার ফলস্বরূপ ইহাই পাওয়া যায় যে মানুষ যে মানুষ—এক কথায় Humanityর ভাব ধারণা জাতীয় স্ফূর্ত্তিমান জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই ঐতিহাসিক সত্যের গৌরব এত মহৎ যে যতবার বল না কেন তাহাতে পুনরুক্তি দোষের সম্ভাবনা নাই, অনবরত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যদি দোষ থাকে তবে ইহাতেও দোষ আছে।

যদি মনুষ্য জাতি এক পরিবারের অন্তর্গত এই ভাবের প্রতিষ্ঠা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অপরিহার্য্য হয় তবে দেখিতে হইবে যে এই কার্য্যে বাধ্য হইয়াই হউক আর স্বভাবতঃই হউক আমাদের প্রবৃত্তি আছে কি না। কিন্তু এই অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে জানিতে হইবে যে মনুষ্য জাতির একত্ব বা Humanityর যথার্থ ভাব কি।

হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, মানুষের একত্ব বলিলে বুঝায় জাতিগত, সমাজগত, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিলোপ করিয়া সমুদয় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালা;—ধুরমুস করিয়া ষ্টীম রোলারের সাহায্যে বাঁকা চোরা ঘুচাইয়া সমুদয় মানুষকে এক করিবার নামই মানুষের একত্ব। এরূপ যান্ত্রিক একত্ব জড় অচেতনের সম্বন্ধেই ঘটে জীবন্ত বস্তুর পক্ষে এরূপ একত্ব মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। মানুষের দেহ একই একথায় বুঝায় না যে মানুষের হাত ও মাথা একই কার্য্য করে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় মন যে পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ অধিকারে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে, ইহাই দেহের একত্ব। মানুষের একত্ব একটী স্বাভাবিক সত্য এই একত্ব কাহাকেও গড়িতে হয় না। মানুষ স্বভাবতঃ এমনি ভাবে গড়া যে সকল মানুষের ভিতর একটী অখণ্ড একত্ব প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। সেই প্রচ্ছন্নভাবটিকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভাবে ব্যবহারে প্রকট করার নামই মানুষের একত্ব ধারণা। এই ধারণা যতই সুদৃঢ় হউক না কেন ইহাতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্ফূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, স্ফূর্ত্তির একমাত্র সীমাবন্ধন অপর ব্যক্তি বা জাতির সেইরূপ অক্ষুণ্ণ স্ফূর্ত্তির দ্বারা রচিত হয়। তোমার সর্ব্ববিষয়ে যতদূর সম্ভব স্ফূর্ত্তি হউক তাহাতে আমার কোন আপত্তি বা বাধা নাই কেবল দেখিও যেন তোমার দ্বারা আমারও ঐরূপ স্ফূর্ত্তির বাধা না জন্মায়। সকল লোকের ভিতর মানুষের একত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতি একটী প্রাণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে নিজ অধিকার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিবে।

অনেকবার বলা হইয়াছে যে, সমাজের গতিস্থিতির নিয়ম অনেকটা জীব দেহের গতিস্থিতির নিয়মের অনুরূপ। এখনকার লোক যদি কোন সমাজনৈতিক সত্য নূতন ও

ব্যবহারের উপযোগী করিয়া পুনরুদ্ধার করিয়া থাকে তবে ইহাই তাহার প্রধান। পুনরুদ্ধার বলিবার অভিপ্রায় এই যে খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলে ও ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রে সমাজবিশেষকে জীব বিশেষ বলিয়া উল্লেখ আছে। সাধুপৌল খৃষ্টীয়ান উপাসকমণ্ডলীকে খৃষ্টের দেহ বলিয়াছেন। পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে চারিবর্ণাত্মক সমাজ ব্রহ্মার দেহ—এরূপ কথার বহুবার উল্লেখ দেখা যায়। তবে যে সময়ের কথা ইতিহাসে বিশদরূপে বর্ণিত আছে তাহার মধ্যে এই সত্যের আলোক নির্ব্বিশেষে সমাজের গতি স্থিতির আলোচনা দেখা যায় না। এখনকার দিনে এইটি আমরা নূতন পাইতেছি।

যতদিন কোন জীবের ভিতরকার শক্তির প্রভাবে সেই জীব নিজেকে চারিপার্শ্বস্থ বস্তুর সহিত এক সূত্রে রাখিতে সক্ষম হয় ততদিনই তাহার জীবন থাকে। ইহার বিপরীত হইলে তাহার মৃত্যু হয়, সমাজ সম্বন্ধেও এই নিয়মটি খাটে। সমাজ যখন সমাজস্থ লোকের প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় গুলির সহিত সমসূত্রে অবস্থিতি করিতে অপারগ হয়, তখন তাহার মৃত্যু আসন্ন। সমাজকে জীবের ন্যায় আহার করিতে হয় এবং জীবনের উপযোগী অংশ আহার হইলে আত্মসাৎ করিয়া অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি আহারের অভাব হয় বা নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করিবার শক্তি লুপ্ত হয় তাহা হইলে সমাজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সমাজের আহার নূতনভাব ও ব্যবহার। যে সমাজ নূতন ভাব ও ব্যবহার না পায় তাহার জীবনী শক্তিও ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়ে। এইরূপ সমাজ হয় একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় নতুবা অন্য সমাজের বশতাপন্ন হইয়া অনিচ্ছাসত্বেও নূতন ভাব ও ব্যবহার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে অশক্ত হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করিবার শক্তির বিলোপেও ফল ঠিক পূর্ব্বানুরূপ হয়। জীবদেহের ধর্ম্মও যে এই অনুরূপ ইহা সহজেই উপলব্ধ করা যায়।

এই সকল ও এইরূপ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া তবে সামাজিক বিষয়ে ব্যক্তিগত অধিকার ও কর্ত্তব্যতা নির্ণীত হয়। যেমন জীবের শরীরে কতকগুলি বিশেষরূপে জীবিত-মর্ম্ম-স্থান আছে সেইরূপ সমাজ-জীবের মর্ম্মস্থানসমাজের প্রতিনিধি পুরুষগণ। সমাজের জীবন মরণ ইহাদের হস্তে। যে সমাজে প্রতিনিধি পুরুষ নাই তাহা জীবশৃঙ্খলার অত্যন্ত নিকৃষ্ট। কোন ক্রমে জীবিত থাকা ভিন্ন তাহার দ্বারা আর অপর কার্য্য সাধিত হয় না।

যেমন প্রাত্যহিক শারীরিক ব্যাপারে শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় সেই রূপ সমাজের শিক্ষিত লোকের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। সমাজস্থ শিক্ষিত লোকই সাধারণতঃ সমাজের প্রতিনিধি পুরুষ। তবে কোন গতিকে শরীরে ব্যাধির সংক্রমণ হইলে যেমন ঔষধ, সুপথ্য, রক্তমোক্ষণ, ছেদভেদের প্রয়োজন হয় সমাজের জীবন ইতিহাসে ইহার অনুরূপ ব্যাধি সংযুক্ত এমন অবস্থা আছে যখন নানারূপ বিপ্লবের সাহায্যে তবে সমাজ সুস্থতা লাভ করে। সামাজিক ব্যাধির সুচিকিৎসা করিতে যাঁহারা সক্ষম তাঁহারাই বিশেষ অর্থে সমাজের প্রতিনিধি পুরুষ তাঁহারাই প্রকৃত সমাজ সংস্কারক, সমাজ স্থাপক, ব্যবহার প্রবর্ত্তক। যে কোন

সমাজের ইতিহাস যদৃচ্ছাক্রমে আলোচনা করিলেই এই সত্যটি ধরা যাইতে পারে। ইংরেজদিগের মধ্যে ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাদিগের কর্তৃক যে রূপ ব্যবহারপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা চার্লস্ নামধেয় প্রথম রাজার পর ধারাবাহী রূপে চলিলে ইংরেজ সমাজ আজিকার বহুপূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ইংরেজের সৌভাগ্যবশতঃ প্রথম চার্লসের পর ক্রমবেল* আসিয়া তাৎকালিক ইংরেজ সমাজের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করায় রোগ উপশম হইল বটে কিন্তু অবিলম্বেই পালটিয়া রোগের আক্রমণ ঘটিল। তাহার পর কিছুকালব্যাপী চিকিৎসার বলে ইংরেজ পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। জীব বিশেষের ব্যাধি-চিকিৎসা ও আরোগ্যের ইতিহাসও এই আদর্শের অনুরূপ।

আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে বর্ণবিভাগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বিবেচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বশতঃ প্রসঙ্গপ্রয়োজনকে দুই এক স্থানে অতিক্রম করিয়াও আলোচনা করা দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না।

ঋগ্বেদে যে সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায় তখন যে বর্ণভেদ ছিল না একথা বুধসম্মত। মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রাচীনকালে সমাজ যে এক বর্ণাত্মক ছিল এরূপ দেখা যায়। তবে বর্ণভেদ কি করিয়া আসিল? একদিক হইতে দেখিলে জাতিভেদ একটী প্রাকৃতিক ঘটনা। জড়শক্তির সঞ্চারবিৎ পণ্ডিতেরা জানেন যে কোন শক্তির কার্য্যে চারিটি উপকরণ দেখা যায়। প্রথম, শুধু শক্তি; দ্বিতীয়, শক্তির প্রয়োগ বা দিঙ্‌নির্দ্দেশ; তৃতীয়, শক্তির সঞ্চার অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োগ তাহাতে শক্তির বিস্তার; চতুর্থ ও শেষ, শক্তির প্রতিরোধক ক্ষেত্র। সামাজিক শক্তিরও এইরূপ চারিটি অঙ্গ আছে। প্রথমতঃ চিন্তা বা জ্ঞান; দ্বিতীয়, জ্ঞানকে কার্য্যে প্রয়োগ করা; তৃতীয়, সমাজে প্রযুক্ত জ্ঞানের বিস্তার; একদিক হইতে অন্যদিকে গতি; শেষ, সমাজস্থ অজ্ঞানের জ্ঞানবিরোধ। হিন্দুদিগের প্রাচীন সমাজের এইরূপ চারি অঙ্গ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ প্রমুখ চারি বর্ণ। ব্রাহ্মণ জ্ঞানসঞ্চয় করিলে ক্ষত্রিয় বাহুবলে সেই জ্ঞানশক্তি সমাজের অভিমুখে কার্য্যকারী হয়। তাহার পর বৈশ্যদিগের কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যবহারে সমাজের চারিধারে সেই শক্তিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের বিচিত্র জীবন রক্ষা করে। শূদ্র সেই জ্ঞানশক্তির প্রতিরোধস্থান। যদি চারিটি বর্ণকে চারি প্রকার প্রকৃতিভেদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে ইহার দৃষ্টান্ত য়ুরোপেও অপ্রতুল নহে।

এখানে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, ভগবদ্গীতাতে স্বাভাবিক গুণ ও ক্রিয়াভেদে বর্ণ বিভেদ বলিয়া উল্লেখ আছে,

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

এবং বর্ণবিভেদ যে স্বাভাবিক অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে ইহাও সূচিত হইয়াছে।

---

* বাঙ্গলায় অন্তঃস্থ 'ব' কারের প্রয়োজন থাকিলেও ব্যবহার নাই। পেটকাটা 'ব' ও শুধু 'ব' ব্যবহার করিলে প্রস্তাবিত প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব। এ নিমিত্ত চিহ্নান্তরের আবশ্যক। যেমন 'ব'য়ের নীচে বিন্দু 'র' তেমনই 'ব'য়ের উপরে বিন্দু কি অন্তঃস্থ 'ব' হইতে পারে না?

সে যাহা হউক বর্ণবিভেদের য়ুরোপীয় দৃষ্টান্ত বিশেষ কৌতুহলাবহ। যখন গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশ বিশেষের ইতিহাস এড়াইয়া যথার্থ য়ুরোপের ইতিহাসের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায় তখন প্রথমে ধর্ম্মযাজকের আধিপত্য দেখা যায় এই ধর্ম্মযাজকগণ আমাদের ব্রাহ্মণের অনুরূপ। প্রধান যাজক পোপের শাসনে জর্ম্মন সম্রাট হেনরি ও ইংলণ্ডেশ্বর যোহনের দুর্দ্দশা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই বিদিত। ইহার পাশাপাশি বেণ রাজার ইতিহাসকে বসাইলে অপূর্ব্ব মিলন দেখা যায়। তাহার পর লুথরের সময় হইতে রাজার প্রাধান্য সুস্পষ্ট। বর্ত্তমান প্রভৃত ধনশালী বণিকরাজগণের অধিকার। যাঁহারা গত অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এখন রাজনীতি কিরূপ বণিকগণের বশতাপন্ন হইয়াছে। অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই। মিশরে ইংরেজাধিকার, তুর্কীর স্বাধীনতা, অষ্ট্রিয়ায় রাজ্য তন্ত্র বণিকগণের বলের পরিচায়ক। তার পর এখন যেরূপ ধনবল ও শ্রমবলের রেষারিষির সূত্রপাত দেখা যায় তাহাতে ক্রমে শূদ্রের রাজত্বেরও সান্নিকর্ষ সহজে অনুভূত হয়।

এই সকল কথার অনুশীলন করিলে ফলস্বরূপ ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যদিও দুইজন মনুষ্য ঠিক একরকম হয় না, তথাপি স্থূলতঃ মনুষ্য প্রকৃতি চারিভাগে বিভক্ত, এই বিভাগের এক একটী এক একটী বর্ণ বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না।

ইহাই সম্ভবপর মনে হয় যে, অতি প্রাচীনকালেই এদেশের জ্ঞানীদিগের চক্ষে মনুষ্য প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিভাগ উদিত হয়। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহা আর কাহাকেও গড়িয়া তুলিতে হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে জাতিবিভাগ **প্রচলিত তাহা স্বভাবজ** নহে, স্বাভাবিক বস্তুর সম্বন্ধে বিধি নিষেধ নাই। আমার পক্ষে যে কার্য্য করা স্বাভাবিক সেই কার্য্য করিবার জন্য বাহিরের প্রেরণার অপেক্ষা নাই। যে সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রেরণা নাই তাহার প্রতি অভিমুখী করিবার জন্যই বিধানের আবশ্যক। তুমি তোমার প্রতি-বেশীকে স্নেহ কর, এটি সদ্বিধান। কেন না প্রতিবেশীকে ভালবাসা তোমার স্বভাবজাত নহে, তোমার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া প্রতিবেশী-স্নেহ বর্ত্তায় না। কিন্তু আপনাকে স্নেহ কর এরূপ বিধান কেহ কখনও শুনেন নাই, যেহেতু নিজের প্রতি স্নেহ স্বাভাবিক, পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। মূল কথা এই যে, যাহা স্বাভাবিক তাহা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে আর যাহা পুরুষের ইচ্ছাধীন তাহারই সম্বন্ধে বিধি নিষেধ খাটে।

যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ প্রকৃতি সম্পন্ন তাঁহারা অন্য কর্ত্তৃক অপ্রণোদিত হইয়া জ্ঞানোদ্দিষ্ট ও জ্ঞানমূলক লোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, বিধি নিষেধের অপেক্ষা রাখেন না। ব্রাহ্মণ শব্দও যদ্যপি তাঁহারা কখনও না শুনিয়া থাকেন ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ যদি স্বপ্নেও না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করিবেন।

কিন্তু যাহাদিগকে শাস্ত্রে বা লোকের মুখে শুনিয়া আচার ও ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাঁহারা ঔপচারিক ব্রাহ্মণ যথার্থ ব্রাহ্মণ নহেন। ঔপচারিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবমানিত ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক ব্রাহ্মণত্ব অনেকদেখা যায়।

দুই একটি ঘটনা যাহার উল্লেখ পরে হইবে তদ্দৃষ্টে মনে হয় যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এদেশে বর্ণ বিভাগ স্বাভাবিক বলিয়া অনেকেই চিনিয়াছিলেন। এবং তৎকালে সামান্যতঃ ব্যক্তিগত অপর যে বংশপরম্পরায় সংক্রমণ হয় এই প্রাকৃতিক সত্যটিও কতক পরিমাণে রক্ষা হয়। কিন্তু পরশুরামের পূর্ব্বে বর্ণবিভাগ অনেকটা স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছিল। তখনও প্রত্যেক বর্ণের অধিকারের দৃঢ় ভাবে সীমাবন্ধন হয় নাই।

এই সময়ে ঔর্ব্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রভৃত ধনশালী হইয়া হৈহয়বংশীয় নরপতিগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যেরূপ উৎপীড়িত হয়েন তাহা পুরাণ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। হৈহয়দিগের শাসনে ভারতবর্ষ নির্ব্রাহ্মণ-প্রায় হইয়া পড়িলে পরশুরামের আবির্ভাব হয়। ত্রিসপ্তবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ভার্গববংশীয় রাম সমগ্র দেশে একাধিপত্য স্থাপন করেন। পরে চতুর্বর্ণ দৃঢ়ভূমিতে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষত্রিয়ের দান গ্রহণের অধিকার বিনষ্ট করিয়া কশ্যপ উপলক্ষে ক্ষত্রিয় রাজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং স্বয়ং আসমুদ্র ভূভাগের অখণ্ড রাজত্ব ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপোনিরত হইলেন।

আমাদের এখনকার বর্ণবিভাগের এই সূত্রপাত। উৎপত্তির বলে বর্ণবিভেদ ইহার পূর্ব্বে ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে বংশ পরম্পরায় গুণ সংক্রমণ যে প্রাকৃতিক নিয়ম তাহা অবশ্য সর্ব্বসময়েই বলবৎ ছিল। কিন্তু এইরূপ গুণসংক্রমণ ছাড়াও মনুষ্যের চরিত্রের অন্য নিয়মও আছে—যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র বংশ পরম্পরায় গুণপ্রবাহ সমান থাকে না। পরশুরামের পরে বহুকাল পর্য্যন্ত একথার স্মরণ ছিল। ইহার কয়েকটী বিশেষ দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। মৎসোদরীর এক পুত্র—বেদব্যাস—ব্রাহ্মণ, অপরাপর সন্তান—চিত্রবীর্য্য ও বিচিত্রবীর্য্য—ক্ষত্রিয়। বেদব্যাসের এক পুত্র শুক—ব্রাহ্মণ, দুই পুত্র—পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র—ক্ষত্রিয়, এবং অপর এক পুত্র—বিদুর শূদ্র। অসবর্ণ স্ত্রীপুরুষজাত হইয়াও ইহাঁরা কেহই বর্ণশঙ্করের মধ্যে পরিগণিত হন নাই।

এখন পর্য্যন্ত জাতিভেদের জন্য কোন বিশেষ সামাজিক অনিষ্ট সংঘটনা হয় নাই। যদিও এতাবৎ কাল বর্ণবিভেদ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে না রাখিয়া কতকটা মনুষ্যকৃত* নিয়মের অধীন করা হইয়াছিল তথাপি সমাজের প্রতিনিধি পুরুষগণ বুদ্ধিবীর্য্য প্রভাবে মনুষ্যকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া স্বভাবদ্রোহ হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন সমাজ নিস্তেজ হইয়া পড়িল তখন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নূতন ঘটনার সহিত আপনাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার শক্তি অন্তর্হিত হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

---

* ভগবান পরশুরাম কর্ত্তৃক জাতিবন্ধন সংগঠিত এজন্য যাঁহারা উহাকে মনুষ্যকৃত বলিতে অসম্মত তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, যদ্যপি বর্ণবিভেদ ঈশ্বরের সৃষ্ট হইত তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না এবং যে বর্ণবিভেদ স্বাভাবিক অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃত তাহার যে ব্যতিক্রম নাই ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যে সুস্থ অবস্থায় জীব আগন্তুক ঘটনার সহিত আপনাকে মানাইয়া লইতে পারে—ফলতঃ এইরূপ মানাইয়া লইবার শক্তিই জীবন, এ কথা বিজ্ঞানসম্মত, এবং এই শক্তির হ্রাসই স্বাস্থ্যহানি। সমাজও এই নিয়মের অধীন। যত উৎকৃষ্ট নিয়মই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন যতদিন মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধি ও পুরুষকার.শক্তি থাকিবে ততদিন মনুষ্যকে আগন্তুক ঘটনার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইবার আবশ্যক থাকিবে আর এইরূপে মানাইয়া লইবার জন্য নিয়মকে দেশকালপাত্র অনুসারে ন্যূনাধিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। মহা-পুরুষগণ জন্ম লইয়াছেন বলিয়া পুরুষকার কাহারও পরিত্যজ্য হইতে পারে না। যদ্যপি পরিত্যজ্য হইত তাহা হইলে স্বভাবতঃ এ দুই শক্তিও বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। এইজন্যই যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, নিয়ম মানুষের জন্য, মানুষ নিয়মের জন্য নহে। *

নিস্তেজের অবস্থায় এ সত্যটি কেহ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয় না। কোন গুরুতর পীড়ার উপশম হইলে যতদিন বল লাভ না হয় ততদিন দৃঢ়রূপে নিয়ম পালন করিতে হয় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের অবস্থায় নিয়ম ভঙ্গ করিবার শক্তি জন্মে। এই শক্তির উদ্বোধন না হইলে স্বাস্থ্যলাভও হয় না। জীবের সম্বন্ধেও যেমন এই নিয়মটি খাটে সমাজের সম্বন্ধেও সেইরূপ।

শরীরের ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করিলে যেমন দুই শ্রেণীর কারণ পাওয়া যায়—এক, শরীরের ধাতুগত (constitutional) দ্বিতীয়, উত্তেজক (exciting) প্রথম শ্রেণীর কারণ দুরূহ, ঠিক ধরা একরকম দুঃসাধ্য, দ্বিতীয় প্রকট, সহজেই ধরা পড়ে।

চারিবর্ণাত্মক সমাজ যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল তাহার ধাতুগত কারণ অনির্দ্দেশ্য ও সমাজের ভিতরে বরাবর প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল ক্রমে উত্তেজক কারণের সহযোগে জাগিয়া উঠিল। এইরূপে উন্নতি ও অবনতির কারণ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ্য নয় বলিয়াই উহা পুরাণে কাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায় যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের বিশৃঙ্খলতার হেতু কাল। যদি কাল শব্দে সময় অর্থাৎ ঘটনার পারম্পর্য্য বুঝা যায় তাহা হইলে কথাটি সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। সময় ত আর একটা শক্তিসম্পন্ন বস্তু নয়, তবে তাহা হইতে কার্য্যের উদ্ভব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? একমুষ্টি বালুকা শতসহস্র বৎসর অপেক্ষা করিলেও বালুকাই থাকিবে অপর কিছুই হইবে না। যদি বালুকা প্রস্তর বা অপর কিছু হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সময়ের অতিরিক্ত কোন বস্তু ইহার কারণ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কাল শব্দের অপর একটী অর্থ আছে। ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ ঈশ্বর কাল বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেখানে ক্রিয়া-শক্তিমান ঈশ্বরই কাল, ভাষ্য প্রমাণে জানা যায়। কাল শব্দে ঈশ্বরের ক্রিয়া-শক্তিকে লক্ষ্য করে। "কালে ঘটিয়াছে" বলিলে বুঝিতে হইবে ঈশ্বরের ক্রিয়া শক্তির প্রক্ষোভে ঘটিয়াছে, আধুনিক ভাষায় এই ক্রিয়া শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি নামে অভিহিত হয়।

কাল সহকারে প্রাচীন সমাজের তেজোহানি হইতে চলিয়াছে এমন সময় চন্দ্রবংশীয়

* The law was made for man ইত্যাদি।

শেষ রাজচক্রবর্ত্তী নিজ শূদ্র অমাত্য কর্ত্তৃক নিহত হ'ন।* তৎকালের সদ্ব্রাহ্মণগণ এই জঘন্য কার্য্যের নিমিত্ত সেই রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া তাহাকে রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে ব্যর্থযত্ন হইয়া হিমালয়ের উত্তরপৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূদ্র রাজা অর্থের প্রলোভনে রাজ্য হস্তগত করিয়া দুষ্ট শাস্ত্রের রচনা ও সৎশাস্ত্রের বিলোপ করিয়া সর্ব্বত্র বিপ্লব ঘটান। এই সময় ব্রাহ্মণগণ বর্ণোচিত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র জাতিভেদের ব্যবস্থা করেন, এই রূপ অনুমান নিঃসঙ্কোচে করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই রূপ ব্যবস্থা করা ভিন্ন তাৎকালিক ব্রাহ্মণনামাদিগের গত্যন্তর দেখা যায় না। নিজের কার্য্য যাহা যউক না কেন তাহাতে জন্মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। স্বেচ্ছাচার করিয়া লোক সমাজে নিজ নিজ সম্ভ্রম রক্ষার এক মাত্র উপায় বংশাভিমান। এখনও দেখা যায় যে, যাহারা বংশোচিত কার্য্য করেন না তাঁহারাই বংশ মর্য্যাদার বিশেষ পক্ষপাতী। এ কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা অচ্ছেদ্য। এখনও যে কারণে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সহস্রবৎসর পূর্ব্বে ও পরে সেই কারণে সেই কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। রাজঘাতী রাষ্ট্রবিপ্লব সদ্‌ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রাজার বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণনামাগণ যে নিজ স্বার্থের জন্য জন্মগত জাতিবিভেদ ব্যবস্থা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে একটী ঘটনা প্রকৃত হইলে এ ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় হইত, এবং তাহা হইলে এ ব্যবস্থা তাহাদের কৃত এ কথা অযুক্ত হইত। সে ঘটনা—এই ব্যবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তিতা, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে পাণ্ডবদিগের সময় পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থার ছায়া মাত্র দেখা যায় নাই। এই সকল কথার আলোচনায় অনুমানটি দৃঢ়তর হয়।

ব্যাসের ব্রাহ্মণত্ব, পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয়ত্ব ও বিদুরের শূদ্রত্ব প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই স্থির হয় যে তৎকাল পর্য্যন্ত বর্ণসঙ্করের ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। সেই সময়ের বর্ণনায় সূত কিরাত প্রভৃতির যে উল্লেখ দেখা যায় তাহা বর্ণবাচক না হইয়া ব্যবসা বাচক বলিয়াই বোধ হয়। ইহার একটী বিশদ দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। যখন কুরু পাণ্ডবের অস্ত্র পরীক্ষার সময় কর্ণ উপস্থিত হইয়া নিজ শৌর্য্যে দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন তখন তাঁহার সূতপুত্রত্ব প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সেই অবজ্ঞা নিবারণের জন্য দুর্য্যোধন তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্যের রাজা করেন। যদি সূত শব্দ বর্ণবাচক হইত তাহা হইলে কখনও রাজ্যলাভমাত্র কর্ণের বর্ণনিকৃষ্টতারূপ কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইত না। আরও দেখা যায় যে ভার্গবের নিকট যখন কর্ণ অস্ত্রশিক্ষা করেন তখন স্বভাব-জাত গুণের জন্যই তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব ধরা পড়ে বংশাবলীর উল্লেখে নহে। তাহা ছাড়া সহজেই দেখা যায় যে জাতি বিভেদ জন্মগত না হইলে বর্ণসঙ্কর সম্ভবপর হয় না। উহা জাতিগত কাল্পনিক জাতিভেদেরই ফল। মানুষ যেন নিয়ম বাঁধিয়া দিল যে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছেলে শূদ্র কিন্তু উহাত আর প্রকৃতির নিয়ম নহে। প্রাকৃতিক নিয়মে পিতৃজ পুত্রও

* "বিষ্ণুপুরাণে" চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

হয় আর তাহার বিপরীত ও হয় কিন্তু বিপরীত ঘটে তখন বর্ণান্তরিত করিবার বিধি নাই। ইহার অনিবার্য্যফল বর্ণসঙ্কর।

এই রূপ ক্রমশঃ বর্ণসংখ্যা বাড়িবার একটী ফল ব্যবহারসঙ্কোচ। যদি সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একই রূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ না থাকায় শূদ্র জাতির অন্তর্গত গর্ভজাতির পার্থক্য রক্ষা করা সুকঠিন। এজন্য যতই অধিক সংখ্যক জাতির সৃষ্টি হইতে চলিল ততই ব্যবহার উত্তর উত্তর সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। ক্রমে সঙ্কুচিত ব্যবস্থা সমাজের চক্ষে একটি ধর্ম্মগুণ হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দাসত্ব একটী প্রশস্তবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইলে রসুয়ে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ রহিল। অর্থাৎ প্রাচীন জাতিবিভেদকে সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করিয়া নূতন এক জাতিবিভাগ গঠিত হইল। আবার অন্যদিকে ঐ একই কারণে ব্রাহ্মণের নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়া একটী নিষ্ঠার মধ্যে দাঁড়াইল। এই নিষ্ঠা আর একটুকু প্রবল হইলে সমাজ একেবারে ছিন্নমূল হইয়া বিনষ্ট হইত। উপরে বর্ণিত ঘটনার উত্তর কালে যে সকল তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষের আবির্ভাব হয় তাঁহারা সকলেই জাতিভেদের অনিষ্ট দেখিয়া তাহার নিবারণের জন্য চেষ্টিত হন। বুদ্ধের সময় হইতে আর আজ পর্য্যন্ত এই স্রোত চলিয়া আসিতেছে ফলও কতক পরিমাণে চলিয়াছে, এ দেশে ভদ্রলোক বলিয়া যে শ্রেণীর উদয় হইয়াছে তাহা ইহার আয়ত্ত ফল। যিনি ব্রাহ্মণ-দিগের প্রধান গুরু বলিয়া সমাদৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তিনিও এই নবীন জাতিভেদ প্রথার অনিষ্ট দেখিয়া তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আনন্দগিরিকৃত "শঙ্করবিজয়" গ্রন্থে দেখা যায় যে বৌদ্ধাদিকে স্বমতে স্থাপন করিবার সময় তাহাদের প্রকৃতগত গুণ দেখিয়া বর্ণনির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। ফলতঃ এক রামানুজাচার্য্য ভিন্ন অপর কাহারও আমাদের জাতিভেদ দৃঢ় করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কিন্তু সেই রামানুজের জীবদ্দশাতেই তাঁহার শিষ্য রামানন্দ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, অতএব গুরুকৃত সমুদয় বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই এই অনুমানে সম্প্রদায়চ্যুত হইয়াছিলেন। রামানন্দের শিষ্য উদারমতি, সর্ব্বত্র সমাদৃত কবীর দাস।

পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এ দেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না সত্য। ইতিহাস শব্দের মৌলিক অর্থই তাহার প্রমাণস্থল।* তবে ঘটনা শৃঙ্খলার পরম্পর্য্য উপযুক্ত সাধনে সিদ্ধ হয়। বর্ণবিভেদের যে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকটিত হইল তাহাতে বর্ণিত ঘটনার কোন একটীর নিরূপণ হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে যাহার পর যাহা ঘটিয়াছে ও যে অবস্থায় ঘটিয়াছে তাহা অনেকটা স্থির বলা যাইতে পারে।

এই রূপে হিন্দুসমাজের বিশেষ গুণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সমাজ-বৈজ্ঞানিক মত ভারতবর্ষ ও হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে খাটে কি না। সে বিষয়ের আলোচনা সময়া-ন্তরের জন্য স্থগিত রহিল। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* "ইতি-হ" পূর্ব্বক "অস্" ধাতু হইতে "ইতিহাস" পদ নিষ্পন্ন। ইহারি মৌলিক অর্থ "এক সময়ে এই রূপ ছিল"।

একগান—তিন সুর।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র তানসেনের একটী গানের স্বরলিপি পাঠাইয়াছেন। মুখে মুখে গান কিরূপ বদ্‌লাইয়া যায়, তাঁহার কৃত স্বরলিপি তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ গানটীর আর দুইপ্রকার পৃথক পাঠ আমরা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম, এইটী লইয়া তিন প্রকার পাঠ হইল। এই তিনের পরস্পরের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে, ইহাদের সকলেরই তাল ঝাঁপতাল, এবং ইহাদের মধ্যে দুইটী মিঞামল্লার, ও একটী সুঘ্‌রাইকানাড়া। মিঞামল্লার ও সুঘ্‌রাই কানাড়ার অতি নিকট সম্বন্ধ, যেহেতু মিঞামল্লার, মল্লার ও কানাড়ার যোগে মিঞা তানসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সুর, আর সুঘ্‌রাইকানাড়া কানাড়ারই রূপান্তর সুতরাং এই তিনটী গান যে একই গান সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, এখন বিচার্য্য ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী মূল গান, এবং কোন দুটী বা তাহার রূপান্তর? শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র প্রেরিত গানটী যে মূল গান নহে তাহা সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়; ইহার সুর অপেক্ষাকৃত সাদা, মিঞামল্লারের কোমল পরদার গম্ভীর সুরগুলি ইহাতে লাগে নাই; তাহা ছাড়া ইহার কথাগুলি অনেক স্থলে বাঙ্গালীভাবে বিকৃত যথাঃ—"অচল সিংহাসনে কঁহু ছত্র কঁহু ছতির"—এই চরণের "সিংহাসন" শব্দের স্থানে অন্য দুই গানে উর্দ্দু "কুরসি" শব্দ পাওয়া যায়; (২) ইহার শেষ চরণের পাঠ ছিল "শাহানামে বাদ্‌সা আকবরে,"—ইহা স্পষ্টই ভুল, "শাহানামে" এরূপ হিন্দি কোন কথা নাই, উহা সম্ভবতঃ তৃতীয় গানের "শাহানকে" ইহার অপভ্রংশ, তাই আমরা ঐ স্থানের পাঠ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এই দুটী ছাড়া আরও ছোট ছোট ভুল ছিল, ইহা হইতে সহজেই প্রমাণ হয় এই গানটী মূল গান নহে।

দ্বিতীয় মিঞামল্লার ও সুঘ্‌রাইকানাড়ার কথার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কেবল সুঘ্‌রাই-কানাড়ায় প্রথম অন্তরার অভাব, সম্ভবতঃ তাহা গায়কের মেধাবিপর্য্যয়ে ঘটিয়াছে, যাহা হউক এই দুয়ের মধ্যে কোন একটিকে মূল গানের আসন দিতে হইবে। আমরা মিঞামল্লারেরই কিছু পক্ষপাতী, যেহেতু গানটী যে তানসেনের রচনা এ বিষয়ে বিভিন্ন ওস্তাদেরা একমত, এবং "মিঞামল্লার" অর্থে তানসেন কৃত মল্লার বুঝায়, সুতরাং তাঁহার পদ তাঁহার কৃত সুরে যোজনাই বেশী সম্ভব।

নিম্নে আমরা একটী গানের তিনটী বিভিন্ন স্বরলিপি প্রকাশ করিলাম।

স্বরলিপি।

কথা—তানসেন। সুর—ঐ।

মিঞামল্লার—ঝাঁপতাল।

শুভ ঘড়ী শুভদিন পলছল ;
বৈঠে তকত আজু দিল্লীপতি নররে।
চৌখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গুনিজন গাওয়ে ;
ইন্দ্র যো বরখত মোতি মালা নগরে॥
অচল সিংহাসনে কহুঁ ছত্র কহুঁ ছতির ;
এতনী বিরাজিত মোতি মালা গররেরে।
কহে মিঞা তানসেন হুমায়ুকে নন্দন ;
শাহানকে বাদ্শা আকবররে॥

ম১গ১গ১
শু—ভ

[গর১ গ১ । ম২ ধ১ । প২ ।—৩ ।] ম২ । —২ ম১ । র১ র১ । স২ স১ । স২ ।
[শু — ভ ঘ ড়ী —] দি — ন প ল ছ ল বৈ

শেষ।

রম২ ম১ । প১ প১ । ধর্স১ র্স১ । নো২ । ধ১ প১ প১ । মপ১ মপধ১ । প১ ম২ ॥
ঠে ত । ক ত আ জু দি ল্লী প তি ন — র রে
(আ-প্র)

প২ প১

পম১ প১ । ন২ ন১ । নর্স২ । নর্স২ র্স১ । ন১ র্স১ । নর্সর্র২ র্স১ । ন১ র্স১ । প৩ ।
চৌ — খ ণ্ড ব্র হ্মা ণ্ড গু নী জ ন গা ও য়ে
ক হে মি ঞা তান সে ন হু মা য়ু কে ন — ন্দন

[ধ১ নো১ । ধ২ প১ । ধ১ নো১ । র্স২ র্স১ ।] ধনো১ নো১ । ধ১ প১ প১ । মপ১
[ই — ন্দ্র যো ব র খ ত] মো তি মা — লা ন
শা হা ন কে বা — দ্ শা আ — ক ব র রে

মপধ১ । প১ ম১ । ॥ র১ র১ । গম২ গর১ । র২ । র২ র১ । র১ গ১ । ম১ প১
— গ রে অ চ ল সিং হা স নে ক হুঁ ছ —
— — —

(আ-প্র)

প১ । ম১ ম১ । গ১ রগর১ স১ । র১ র১ । ম২ ম১ । প২ । পধনো২ নো১ । ধ১
ত্র ক হুঁ ছ তি র এ ত নী বি রা জি ত মো

নো১ । ধ১ প১ প১ । মপ১ মপধ১ । প৩ ।
তি মা — লা গ র রে

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

মিঞামল্লার—ঝাঁপতাল।

শুভ ঘড়ী শুভদিন মুহূরত
বৈঠে তকত পর দিল্লীপতি নররে।
চৌখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে গুণী আনতোমে
ইন্দ্র যো বরখত মোতিমালা গরেরে॥
অচল কুরসি ধর কহুঁ ছত্র কহুঁ ছায়ে।
এতনী বিরাজিত হীরালাল নগরে।
চারযুগ জীবে হুমায়ুকে নন্দন
শাহে আলম বাদশাহে আকবররে।

রোগো১
গো১ রগো১ । ম১ ম১ ম১ । গোরো১ গো১ । স২ নো১ । নো১ ধনো১ । স১ স১
শু — — ভ ঘ ড়ী — শু ভ দি — — ন

স১ । নো১ ধোনো১ । প২ ম১ । নো২ । নোগো১ র১ গো১ । ম১ ম১ । নো২
মু হূ — র ত বৈ ঠে — ত ক ত প

নো১ । নোর্স১ ধো১ । প২ ম১ । গো১ মগো১ । গোম১ গোমগো১ রো১ ॥
র দি ল্লী প তি ন র রে — —

(আ-প্র)

ধ১ নো১ । র্স২ নো১
ম২ । ধ২ ধ১ । নো২ । নো২ নো১ । ধ১ নো১ । র্স১ নো১ নো১ । ধ১ নো১ ।
চৌ খ ণ্ড ব্র হ্মা - ণ্ড কে — গু — নী অ ন
চার যু গ জী বে হু মা — যূ — কে ন —

ধনোধধো১ পধোপধো১ ম১ । ধো১ পধো১ । ম১ প১ গো১ । ম১ প১ । ধো২
তো — মে ই — ন্দ্র — যো ব র খ
ন্দ — ন শা — হে — আ ল ম বা

নো১ । নোর্স২ ধো১ । প২ ম১ । গো১ মগো১ । গোম১ গোমগো১ রো১ ॥ ন্‌ো১ ন্‌ো ।
ত ম তি মা লা গ রে রে — — অ চ
দ শা হে আ ক ব র রে — —

(আ-প্র)

ধো১ পধো১ ম১ । ম১ ম১ । ম১ মগো১ রো১ । রো১ গো১ । ম২ ম১ । গো১
ল — কু র সি ধ — র ক হুঁ ছ ত্র ক

সগো১ । স২ ন্‌ো১ । ন্‌ো১ ন্‌ো১ । ধো২ প১ । ধো১ ধোম১ । —১ ম১ প১ ।
হুঁ ছা য়ে এ ত নী বি রা — — জি ত

ধ১ ধ১ । ধ২ ধ১ । ধ১ নো১ । নোধ১ ধোপ১ মীপ১ ।
হী রা লা ল ন গ রী — —

সুঘ্রাই কানাড়া—ঝাঁপতাল।

শুভ ঘড়ী শুভদিন মুহূরত
বৈঠে তকত আজি দিল্লীপত নররে।
অচল কুরসি ধরি, কহুঁ চক ছব ছাড়ো
নগমতি নগহীরে ছাত্রে জড়েহুঁ
হুমায়ূকে নন্দন চারযুগ জীবে
শাহানকে বাদসাহে আকবররে।

নো১ ধনো১ । প২ ধ১ । পম১ পম১ । প১ পম১ গো১ । গো২ । রগো১ ম১
শু — ভ ঘ ড়ী — শু — ভ দি ন —

রস১ । রূ২ । স২ স১ । স২ । সম১ গ১ ম১ । প১ প১ । নো১ ম১ প১ । র্স১ র্স১ ।
মু হূ র ত বৈ ঠে — ত ক ত আ — জি দি ল্লী

শেষ।

র্স২ র্স১ । র্সন১ র্র । র্সন১ র্স১ প১ ॥ ম১ ম১ । ম১ গ১ ম১ । প২ । প১ প২ ।
প ত ন র রে — — অ চ ল কু র সি ধ রি
(আ-প্র)

ধ১ পম১
[সম১ ম১ । ম১ গ১ ম১ । প২ । প১ প২ । প১ প১ । ধ১ নো১ র্স১ । র্স১
অ চ ল কু র সি ধ রি চ হুঁ — চ ক ছ

র্সনো১ । নোধ১ নো১ প১] ধ১ প১ । মপ১ মগো১ গো১ । গোম১ ম১ । র২ স১ ।
ব ছো — ড়ে] ন গ ম — তি ন গ হী রে

স২ । ম২ ম১ । পধ১ নোর্স১ । ধর্সনো১ নোধ১ প১ ॥ ন১ ন১ । ন২ ন২ । স২ ।
ছা ত্রে জ ড়ে — হুঁ — — হু মা যু কে নন্

নর্স২ র্স১ । ন১ র্র১ । র্র১ র্রর্ম১ র্র১ । র্স১ র্সর্র১ । র্স২ প১ । র্র২ । র্র১ র্গো১ র্র১ ।
দ ন চা র যু — গ জী — বে — সা হা — ন

র্স২ । র্স১ প১ ধ১ । র্স১ র্স১ । র্স২ র্স১ । র্সন১ র্র১ । র্সন১ র্স১ প১ ॥
কে বা — দ শা হে আ ক ব র রে — —
(আ-প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

ভারতের আর্থিক অবস্থা।

আজকাল যেথানে সেথানে শোনা যায় যে ভারত দিন দিন বড় দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি প্রকৃত হয় তবে বিশেষ শঙ্কার কারণ বটে। তাই বোধ করি সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে।

ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিতে কি বুঝায়? প্রথমতঃ বুঝায় এই যে ভারতবর্ষ দরিদ্র, এবং দ্বিতীয়তঃ এই দারিদ্র্য কালসহকারে বৃদ্ধি পাইতেছে। কোনও দেশকে দরিদ্র বলিলে বুঝায় এই যে তাহার নিয়মিত আয় অপেক্ষা নিয়মিত ব্যয় অধিক, কর্জ্জ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যয় সরবরাহ করিতে হয়, এবং সমগ্র প্রজামণ্ডলীর এমনই দুর্দ্দশা যে ব্যয় সঙ্কুলানের উপযোগীরূপ করভার বৃদ্ধির চাপ তাহারা সহ্য করিতে অসমর্থ। এই ঋণ যদি প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পায় আর সেই সঙ্গে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ক্রমশ হ্রাস হইয়া পড়ে, তবে দেশের দারিদ্র্য ক্রমশই বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। নিয়মিত আয় এবং নিয়মিত ব্যয় উল্লেখের কারণ এই যে, কোন অচিন্ত-

নীয় কারণে কোন বৎসর হয়ত আয় এমন কমিয়া গেল অথবা ব্যয় এমন অধিক মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল যে আয় হইতে ব্যয়ের সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া পড়ায় তখন ঋণ করিয়া সে খরচ নির্ব্বাহ করিতে হইল। কিন্তু সে ঋণ যদি সহজেই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিবার ন্যায্য সম্ভাবনা চক্ষের সমক্ষে দেখা দেয় তবে আর কিছু দেশকে দরিদ্র বলা যায় না; এবং মানুষও ততদূর হাহাকার করে না—শুভদিনের আশায় বুক বাঁধিয়া নিকট ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে অধিক হইলে অবশ্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে হয়।

এখন দেখা যাক ভারতবর্ষ এইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে কি না? সে জন্য দেখা আবশ্যক যে পূর্ব্বকালেই বা ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। কোন দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ তাহার কর এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের হিসাব লইতে হয়। পুরাতন বা হিন্দুভারতের করসমষ্টি কত ছিল এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থাই বা সে সময়ে কিরূপ ছিল তাহা আমাদের স্থির জানিবার উপায় নাই। আদিম ভারতের বিশ্বাস্য খবর বার্ত্তা বড় অধিক পাওয়া যায় না। তবে পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় যে উৎপন্ন দ্রব্যসমষ্টির আয়ের ষড়াংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। ইহা যে বর্ত্তমান করের হার হইতে অনেক অধিক সে কথার বোধ করি বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই বোধ করি ইহার এক প্রকার মোটামুটি ভাব পাওয়া যাইবে যে ইংরাজ সরকারের প্রাপ্য জমির খাজনা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমষ্টির সপ্তদশাংশের অপেক্ষা বড় অধিক নহে। তাহার পর মুসলমানাধিকার কাল;—আকবরের আমলে মোটামুটি হিসাবে ইংরাজদের আমল অপেক্ষা করসমষ্টি অধিক ছিল। আরঙ্গজীবের আমলে করসমষ্টি আকবরের আমলের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোগলদের আমলে (১৫৯৩—১৭৬১ খৃঃ অব্দ) ভারতের বাৎসরিক করসমষ্টি গড়পড়তায় ৬ কোটি পাউণ্ড ছিল—ইহার মধ্যে ১৬৫৫ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক জমির কর গড়পড়তায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ। ইংরাজাধিকৃত ভারতের বিস্তৃতি ও জনসংখ্যা মোগলদের অপেক্ষা বহু অধিক, তথাপি দশ বৎসরের (১৮৬৯—৭৯) গড়পড়তায় দেখা যায় করসমষ্টি মোট ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র,—ইহার মধ্যে জমির গড়পড়তা কর ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মুসলমানাধিকারকালে রূপার ক্রয়-শক্তি এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয় দেশের তুলনায় আমাদের ট্যাক্সের হার অতি সামান্য। আসিয়াস্থ অপরাপর দেশের তুলনাতেও যে ভারতের কর-হার বেশী তাহা নহে। আসিয়াস্থ দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ ব্যতীত এক মাত্র জাপানই পাশ্চাত্যগণের নিকট সভ্য বলিয়া পরিগণিত; তাহার বাৎসরিক মোট করের হার ব্যক্তি হিসাবে ৩ টাকা সে স্থলে আমাদের ২ টাকারও কম। হিন্দু-আমলের ন্যায় মুসলমানদের সময়েরও ব্যবসায় বাণিজ্যের সবিশেষ বৃত্তান্ত

পাওয়া যায় না। অতএব সে কথা না হয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। আর ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা বাদ দিয়া কেবল করের পক্ষ হইতে দেখিলে মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজ আমলে দেশের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। উপরন্তু স্যর উইলিয়ম হণ্টর ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে হিসাবের তালিকায় দেখাইয়াছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের মোট রপ্তানী যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৮৩৪ সালে দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কতকগুলি শুল্কাদি রহিত হওয়ার পর ১৮৮০ সালে দেখা যায় মোট রপ্তানী ১৮৩৪ সালের রপ্তানী হইতেও ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে তিনি আরও বলিতেছেন যে ভারতে আমদানীর অপেক্ষা রপ্তানী অধিক—এই উদ্বর্ত্ত রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ভারতের লভ্য। এই লভ্যের তৃতীয়াংশ ৭০ লক্ষ পৌণ্ড ভারত নগদ গ্রহণ করিতেছে; অন্য তৃতীয়াংশ বিলাতী মূলধন যাহা এদেশে রেলওয়ে, চা-বাগান প্রভৃতি নানান্দিকে খাটিতেছে তাহার শুদ স্বরূপে খাইয়া যায়; এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পেন্সন, বিলাতের ভারততত্ত্বাবধারী ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন, সৈন্য-বিভাগের খরচ ইত্যাদি যাহাকে "হোম চার্জ্জ" বলে তাহার জন্য কাটাইয়া দেওয়া হয়।

দেশের আর্থিক অবস্থা তাহার ঋণের শুদের হারের দ্বারা কতক পরিমাণে সূচিত হয়। ভারতগবর্ণমেণ্টের ঋণের শুদের হার দেখা যাইতেছে ক্রমশই কম হইয়া আসিতেছে। ইহাতেই অবশ্য স্থির প্রমাণ হইতেছে না যে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে, তবে সাধারণের নিকট যে ভারতগবর্ণমেণ্টের credit বাড়িতেছে তাহাতে আর কাহারও সংশয় করিবার যো নাই। টাকার বাজারে ভারতগবর্ণমেণ্টের খাতির যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে যাহারা ঋণ দেয় তাহাদের ভারতগবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস বাড়িতেছে। আর যাহারা ঘরের টাকা বাহির করিয়া ধার দিতেছে, এবং দিবা রাত্রি নানান্ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার খপরাখপর লওয়াই যাহাদের একটী প্রধান কার্য্য তাহাদের উক্তরূপ বিশ্বাসকে উপযুক্তরূপ কারণ ব্যতিরেকে অপ্রামাণ্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কি কখনও সঙ্গত হইতে পারে? অতএব উপরোক্ত কারণ সকল হইতে মোটামুটী ভাবে বলা যাইতে পারে যে ভারতের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বের হইতে মন্দ না হইয়া বরং দিন দিন ভালর দিকেই যাইতেছে। তবে সূক্ষ্ম বিচারে হয়ত বা অন্যরূপও দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রমাণ ও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অতি সাবধানে বিচার করা কর্ত্তব্য—এই মাত্র আমাদের বক্তব্য।

ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধির প্রমাণ সম্বন্ধে কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা যায় যে ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদেরই অবস্থা অতি মন্দ এবং সকলেই ঋণে আকণ্ঠমগ্ন। কথাটা যে কিছু বাড়াবাড়ি তাহা অতি সহজেই বোঝা যায়। ভারতবাসীদিগকে মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—জমীদার, ২য়—কর্ম্মচারী, ৩য়—ব্যবসাদার, ৪র্থ—উকিল, ডাক্তার, প্রভৃতি স্বাধীন জীবিকাবলম্বী, ৫ম—কৃষিজীবী ও মুটে মজুর ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে

এক পঞ্চমশ্রেণীর লোকগণ ব্যতীত অপরদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। জমীদারের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইবার কথা নহে, কারণ, জমীদারীর আয় এবং দাম উভয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক বাড়িয়াছে, তবে আলস্য, অপব্যয় এবং বহুল প্রজাবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে যদি কোন কোন জমীদার ঋণগ্রস্ত হয় তাহাতে দেশের অবস্থা কিছু মন্দ বলা যায় না। ঋণের দায়ে যখন জমীদারী বিকাইয়া যায় তখন আবার কোন ধনী তাহা ক্রয় করিয়া লন, জমীদারীর আয় এক হাত হইতে হস্তান্তরে যায় মাত্র, দেশের তাহাতে কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় না, ক্ষতি কেবল সেই বংশেরই। এই প্রসঙ্গে একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইংরাজ আগমনে ভারতের সামাজিক অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে এবং নূতন রাজার অভ্যুদয়ে কতক পরিমাণে এইরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। ইহার দরুণ কতকগুলি সামাজিক উচ্চ সোপানস্থিত লোকদের নীচের ধাপে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে, এবং নীচের লোক উপরে উঠিয়া' পড়িয়াছে—ইহার অবরোধ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ইহাতে সমগ্র দেশের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ, ইহাতে ত আর দেশের ধন-সমষ্টির কিছু তারতম্য ঘটিতেছে না। স্বাধীনজীবী এবং ব্যবসাদারদের অবস্থা বরং ভালই বলিতে হয়। কর্ম্মচারীদেরও অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ তাহা বলা যায় না। কেবল মাত্র এক কৃষি-জীবীদের অবস্থাই যাহা কিছু মন্দ। তাহা নহিলে একবৎসর একটু অধিক মাত্রায় অজন্মা হইলেই, অমনি দেশে দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণরেখা দেখা দেয় কেন? কিন্তু দেশের কোন এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের অবস্থা মন্দ বলিয়া কিছু আর দেশকে নির্ধন বলা যায় না। তাহা হইলে ত ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান ধনী জাতি ইংরাজদেরও দরিদ্র জাতির সামিলে পড়িতে হয়, কেননা তাহাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে কিরূপ ধনক্লেশ তাহা কে না জানেন। এরূপ অবস্থায় দরিদ্র শ্রেণীর হাতে যাহাতে অর্থ অধিক আসে এবং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দাম কম হয় এবং করভার তাহাদের উপরে কম মাত্রায় পড়ে তাহা করাই ইহার প্রতিকারের উপায় এবং এই জন্যই এরূপ অবস্থায় সাধারণ-ভাবে দেশকে কর পীড়িত না করিয়া বাবুগিরির আসবাবের উপর শুল্ক ধার্য্য করা বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্‌গণের একটি প্রধান ব্যবস্থা।

আর একটা কথা শোনা যায় যে রৌপ্যের দাম কম হওয়া বশতঃ আমাদের দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে—এবং সেই কারণে আইন দ্বারা রূপার দাম বৃদ্ধি অথবা দেশে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন করিবার জন্য কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেছেন। টাকার বাটা বৃদ্ধি বশতঃ আমাদের ক্ষতি হইতেছে সত্য কিন্তু এরূপ পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য উহাতে ক্ষতি কতদূর এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই বা সে সম্বন্ধে কতদূর কি করিতে পারা সম্ভব, এবং যে উপায় গ্রহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উপকারই বা কতদূর হইবে—এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক তবে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হইলেই কি ভাল হয় না?

রূপার দাম কমিয়া গেলে আমাদের দেশের ক্ষতি হয় কেন ? না, যাহাদের দেশে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আছে তাহারা অল্পপরিমাণ স্বর্ণবিনিময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ রূপা পায়। আমাদের দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে ১০০ টাকার দ্বারা যে পরিমাণ স্বর্ণ পাইতাম এখন তাহার জন্য প্রায় ১৫০ হইতে ১৬০ টাকা দিতে হয়। আমাদের ইংলণ্ডকে হোমচার্জ্জ, এবং বিলাত হইতে কর্জ্জ করা মূলধনের শুদ পৌণ্ড শিলিংএ দিতে হয়, তাই এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তাহা ব্যতীত বিলাতী জিনিসপত্র যাহা আমাদের কেনা আবশ্যক সে সমস্ত দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক মূল্যে আমাদের ক্রয় করিতে হয়—ইহাদ্বারাও আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইতেছে। অন্য কোনও উপায়ে টাকার বাটাজনিত এই ক্ষতি পূরণ করিতে না পারিলে আমাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই মন্দ হইবার কথা। এ ক্ষতি দুই উপায়ে পূরণ করা যাইতে পারে—১ম, নূতন উপায়ে আয় বৃদ্ধিদ্বারা ; ২য়, রৌপ্যের দাম বাড়ান।

দ্বিতীয় উপায়টির প্রথমে আলোচনা করা যাউক। আইনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে রৌপ্যের দাম বাড়ান নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। আমেরিকার খনি হইতে বহুল পরিমাণ রূপা বাহির হওয়ায় বাজারে বিক্রয়ার্থে রূপা অধিক হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সোণার সেই পরিমাণ আধিক্যের অভাববশতঃ সোণার তুলনায় রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। এখন জোর করিয়া তাহার মূল্য বাড়াইতে গেলে সোণাওয়ালাদের লোকসান। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত, কাজেই এইরূপ হইলে ইংলণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইংলণ্ড কেনই বা আমাদের জন্য এই ক্ষতি স্বীকার করিবে? আর যদিই বা আমাদের শুভাদৃষ্ট ক্রমে ভারতের সুবিধার জন্য দয়াপরবশ হইয়া ইংলণ্ড এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তথাপি এ কার্য্য নিতান্ত সহজে সিদ্ধ হইবার নহে। কেননা, শুদ্ধ ইংলণ্ড অথবা ইংরাজ শাসিত দেশের সঙ্গেই যে আমাদের কারকারবার তাহা নহে, ফ্রান্স জর্ম্মানী ইটালী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকা প্রভৃতির সহিতও আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। তাহারাও যে ভারতের সুবিধার জন্য আপনাদের ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইংলণ্ডের কথায় রৌপ্যের দাম বাড়াইয়া আমাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইবে এমন আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। কারণ, সহজ কথায় বলিতে গেলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রতি বৎসর পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের কথঞ্চিৎ করিয়া ভিক্ষা প্রদান করিবে। অবশেষে ভিক্ষার উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়াই কি রাজনীতিজ্ঞতার চরমোৎকর্ষের নিশানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে !

আর যদি জোর করিয়া ভারতবর্ষে সোণার টাকার প্রচলন করা হয় তবেই কি আমরা সমস্ত আর্থিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব ? তাহা নহে, বরং আপাততঃ আমাদের কিছু লোকসানই সহ্য করিতে হইবে। আর যাহাই হউক না কেন সোণার টাকার সঙ্গে সঙ্গে তো আর কিছু জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে না, কাজেই হিসাবে পাউণ্ডে পাউণ্ডে মিলিয়া গেলেও লোকসান পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়া যাইবে। টাকার

পরিবর্ত্তে পাউণ্ডের বিনিময়ে জিনিস এখনও যে পরিমাণে দিতে হইতেছে তখনও সেই পরিমাণেই দিতে হইবে। কারণ, ইহাতে পাউণ্ডের হিসাবে তো জিনিসের দাম বাড়িবার কোনও কারণ ঘটিল না। উপরন্তু স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য আপাততঃ সোণা ক্রয় করিতে আমাদের কিছু অর্থ ব্যয় হইবে।

এতদ্ব্যতীত আমাদের আরও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতের সুবিধার জন্য কোন মতেই ইংলণ্ডের ক্ষতি করিতে সাহসী হইবেন না। অতএব সে আশা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য যতটুকু সুবিধা করিয়া দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের নিজের হাতে এই বিপদ হইতে উদ্ধারের যদি কোনও উপায় থাকে তাহাই যথাবিধ যত্নসহকারে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সে উপায় কি, এবং কি রূপেই বা উহা ফলপ্রদ হইতে পারে তাহা আগামী বারে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে।

শেষ কথা এই যে, আমাদের করভার কম এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষ দরিদ্র—বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশের তুলনায়—তাহা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের অপেক্ষা ভারতে ট্যাক্সের হার কম হওয়া এবং রপ্তানী হইতে কমবেশ ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বাৎসরিক লাভ হওয়া সত্ত্বেও দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে অর্থাভাবে যেরূপ বহুপরিমাণ লোকনাশ হয়, কোনও কারণ বশতঃ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়িলে দেশে যেরূপ হাহাকার উপস্থিত হয়, এবং বৎসরের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ লোক অর্দ্ধাহারে জীবন্মৃতের ন্যায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া যেরূপ শোনা যায়, তাহাতে আর ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতর প্রমাণের কি প্রয়োজন ?

শ্রীযোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা।

শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন,—

১। গত কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে আলোচনা প্রবন্ধে প্রকাশবাবু "পিলসুজ" এই কথা-টিকে "পিতল সাজ" শব্দের অপভ্রংশ লেখায়, মাঘ মাসের ভারতীতে যতীশবাবু লিখিয়াছেন যে ইহা এরূপ হইবেক না, এস্থলে কেবল শব্দ সাদৃশ্য প্রমাদ ঘটিয়াছে, "পিলসুজ" পারস্য "ফতিল সুজ" শব্দের অপভ্রংশ। আমার বিবেচনায় যতীশবাবুর যুক্তিটাই ঠিক, কিন্তু তিনি এই শব্দটি বুঝাইতে গিয়া নিজেও ভুল করিয়াছেন। ইহা "ফতিলসুজ" না হইয়া "ফতিলসোজ" হইবেক। একটি আরবী ও একটি পার্সী এই উভয় শব্দ সংযোগে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে যথা, "ফতিলা+সোজ"। আরবী ভাষায় "ফতিলা" শব্দের অর্থ পলিতা বা বাতি, এবং "সোজ" কথাটি পার্সী "সোখতন্" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ জ্বলা। এই উভয় শব্দের সংযোগ হওয়ায় "ফতিলা" শব্দের শেষোক্ত আকারটি লোপ হইয়া অবশিষ্ট "ফতিল সোজ" রহিয়াছে। এবং তিনি যে লিখিয়াছেন, "সেফতন্" শব্দের অর্থ জ্বলা, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, ইহার অর্থ "আসক্ত হওয়া"। উক্ত "সোজ" শব্দটিও ইহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

২। গত মাঘ মাসের ভারতীতে মোহিনীমোহন বাবু কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়া, উহার উৎপত্তি স্থান ও মৌলিক অর্থ নিরাকরণ করিতে গিয়া, ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "জামা" শব্দটিকে তিনি আরবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আরবী ভাষায় ইহার অর্থ "জমাকরে যে" অর্থাৎ সংগ্রহকারী। বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর "জামা" বলিলেই পিরাণ বা কোর্ত্তা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না, যদি "সংগ্রহকারী" বা এরূপ অপর কোন অর্থ বুঝাইত, তাহা হইলে এই শব্দটিকে আরবী বলিতে পারিতাম; পার্সী ভাষায় "জামা" শব্দের অর্থ কাপড় বা কোর্ত্তা। এস্থলে অর্থের সাদৃশ্যে বেশ জানা যাইতেছে যে বাঙ্গালা "জামা" শব্দটি পার্সী ভাষা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, এই উভয় "জামা" শব্দের অর্থে এবং বানানে যে কত প্রভেদ তাহা পার্সী অভিধান দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। "পাজামা"-শব্দটিও বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, ইহা পার্সী "জামা" শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

৩। "এবারত" ও "হজম" এই দুইটী শব্দকে তিনি পার্সী বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোনটী পার্সী নয়; উভয় শব্দই আরবী, "সে-হে-সাদ-জাদ-তো-জো-য়্যান-কাফ", এই আটটী অক্ষরের যে কোনটী হউক কোন শব্দে থাকিলেই তাহা আরবী হইবেক কদাচ পার্সী হইতে পারে না; এবং "পে-চে-জ্যে-গাফ" এই চারিটী অক্ষরের যে কোনটী হউক কোন শব্দে থাকিলে তাহা কদাচ পার্সী ব্যতীত আরবী হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে পার্সী ব্যাক-

রণের গ্রন্থকারেরা তাঁহাদিগের গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলেও "এবারত" শব্দের পূর্ব্বে "য়্যান" অক্ষর এবং "হজম" শব্দের মধ্যবর্ত্তী "জাদ" অক্ষর থাকায় এই উভয় শব্দকে পার্সী না বলিয়া আরবী বলিতে হইবে।

৪। "মেরামত" শব্দটিকেও তিনি পার্সী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও আরবী। এইরূপে "গরম" শব্দটিকেও উর্দ্দূ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা উর্দ্দূ নয়, পার্সী শব্দ, এবং ইহা হইতেই উর্দ্দূ ভাষায় গৃহীত।

৫। আজকাল যেমন ইংরাজী রাজভাষা হওয়ায় বহুল পরিমাণে ইংরাজী শব্দ আমাদিগের জাতীয় ভাষায় স্থান পাইয়াছে, সেইরূপ পার্সীও পূর্ব্বে রাজভাষা ছিল এবং ইহা আরবীর অন্তর্গত বলিয়াই, বহুল পরিমাণে পার্সী ও আরবী শব্দ আমাদিগের জাতীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। যদিও এই বিদেশীয় শব্দগুলির প্রায় অনেকেরই জাতীয় ভাষায় প্রতিশব্দ আছে বটে, কিন্তু তত্রাচ সহবতের এরূপ শিক্ষা, যে আমরা ঐ অপরিচিত শব্দগুলিকে ব্যবহার না করিয়া কদাচ থাকিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের আলোচনার জন্য নিম্নে কতকগুলি পার্সী ও আরবী শব্দ সংগ্রহ করিয়া লেখা হইল;—

পার্সী শব্দ।—আবরু, আচার, জামা, আফসোস, গরম, আওয়াজ, নাচার, খোরাক, গজ, মালিশ, খুনি, চাবুক, দৌলত, চেহারা পোষাক, দেমাগ, পর্দ্দা, দুসমন, জোর, দরখাস্ত, পুল, গালিচা, দস্তানা, আরাম, খরচ। আরবী শব্দ।—সালিস, হাকিম, হুজ্জোত, জুলুম, আদালত, হুকুম, আরক, ইজ্জোত, গরজ, ইমারত, গরিব, কসাই, নজোর, কয়েদী, তদ্‌বির, খবর, ফানুস, খ্যাসারত, হরফ, ওজোর, মসাল, খেতাব, মজবুত, তাজ্জব, মহল।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন,—

পার্সী ও আরবীতে আমার অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন মৌলবীর সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলির মূল নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। মৌলবীর অনবধান প্রযুক্ত যে যে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া দিয়া হরিদাসবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আলোচিত বিষয়টিতে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিপতিত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

প্রাচ্য-কোর্টশিপ।

"দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে এক নগর আছে। তথায় প্রভূত বিত্তশালী শক্তিকুমার নামে এক শ্রেষ্ঠিপুত্র বাস করিতেন। যখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাহারা ভার্য্যাহীন, অথবা যাহাদের ভার্য্যা গুণালঙ্কৃতা নহে, তাহাদের সুখের সম্ভাবনা নাই,—অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে গুণান্বিতা পত্নী লাভ করিতে সক্ষম হইব। অপর লোকে আমার জন্য যে কুমারী মনোনীত করিবে তাহাতে আমার মনোমত গুণগ্রাম না থাকিতে পারে। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি স্বীয় বসনান্তে প্রস্থ পরিমাণ শালিধান্য বাঁধিয়া লইয়া দৈবজ্ঞ বেশ ধারণ করতঃ নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। লক্ষণজ্ঞ ভাবিয়া কন্যাবান ব্যক্তিরা তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে আহ্বান করিয়া আপন আপন কন্যার ভাল মন্দ বিচার করাইতে লাগিলেন। তিনি যে কোন গুণবতী ও সুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইতেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন "ভদ্রে, এই প্রস্থ পরিমাণ শালিধান্য লইয়া আমাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতে পার ?" সকলেই তাঁহাকে পাগল অনুমান করিয়া উপহাস করিত। তিনি এইরূপে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন।

একদা তিনি শিবিরাজ্যের অন্তর্গত কাবেরীনদীর দক্ষিণ তীরস্থ পট্টনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কোন ধাত্রী লক্ষণালক্ষণ নিরূপণার্থ একটী কুমারীকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল। এই কন্যাটী মাতৃপিতৃহীনা, বিভববিহীনা, বিরলভূষণা কিন্তু সুরূপা। তিনি কন্যাটীকে সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি দেখিতে নাতিকৃশ, নাতিস্থূল, নাতিহ্রস্ব, নাতি দীর্ঘ, পেলব ও লাবণ্যময়। করতল রক্ত বর্ণ এবং যব, মৎস, কমল ও কলস প্রভৃতি পুণ্য রেখাদ্বারা লাঞ্ছিত। চরণ দুখানি মাংসল, এজন্য শিরা কিম্বা গুল্‌ফসন্ধির উপলব্ধি নাই। জঙ্ঘাযুগল গোলাকার ও সৌষ্ঠবযুক্ত। জানু দুটিকে যেন স্থূল উরুদ্বয়ে গ্রাস করিয়াছে। বাহু লতায় ধন ধান্য ও পুত্র বাহুল্যের চিহ্নসমূহ স্পষ্টভাবে নয়ন গোচর হইতেছে। নখগুলি মুক্তাফলের ন্যায় উজ্জল ও চিক্কণ। অঙ্গুলি সকল ঋজু, সুগোল ও আরক্তিম। অংশ যুগল আনত ও বাহুদ্বয় লাবণ্য বিশিষ্ট। গ্রীবা ক্ষীণ ও শঙ্খের ন্যায় নতোন্নত। বিম্ব সদৃশ সুগোল সুকোমল ওষ্ঠাধর কি কমনীয় মধ্য রেখায় বিভক্ত। চিবুক নাতিখর্ব্ব ও চারু। গণ্ডস্থল দৃঢ় ও ঈষৎ পূর্ণ। পরস্পর মিলিত, স্নিগ্ধ নীলবর্ণ ভ্রূলতা। নাসিকা সুজাত তিলপুষ্পনিভ। বিশাল নেত্রদ্বয়, স্নিগ্ধ, কজ্জলাভ, ঘন পক্ষ্ম সমূহে শোভিত, নয়নাভ্যন্তরে অতি মনোহর কৃষ্ণবর্ণ তারা যুগল কখন ত্রাস চপল কখন বা স্পন্দহীন, তৎপ্রান্তে শুক্লতা ও লাল রেখা গুলি মনোরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ললাট

ইন্দুকলার ন্যায় বিরাজিত, উভয় পার্শ্বে নীলকান্ত মণির ন্যায় নীলবর্ণ কুটিল অলকগুচ্ছ দোদুল্যমান হইতেছে। কর্ণ যুগল যেন নীলোৎপল মৃণাল কুণ্ডলিত হইয়া রহিয়াছে। আস্য খানি প্রস্ফুটিত কমল সদৃশ। চিকুর কলাপ সামান্য কটিল, স্নিগ্ধ নীলবর্ণ সুগন্ধ ও সুদীর্ঘ, উহার অগ্রভাগেও পিঙ্গলতা দৃষ্ট হয়না। যখন ইহার আকৃতি এরূপ, তখন প্রকৃতি ও যে সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। আমার মন প্রাণ এই কুমারীতে আসক্ত হইতেছে, তথাপি সম্যক পরীক্ষা করিয়া পাণি গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ অগ্রে বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠিকুমার কন্যাটীর প্রতি সুস্নিগ্ধ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে, যদি এই শালিপ্রস্থ লইয়া আমাকে সুন্দররূপে আহার করাইতে পার, তাহা হইলেই তোমার গুণপনা বুঝি।"

তদনন্তর কন্যা ধাত্রীকে নেত্রদ্বারা সঙ্কেত করিলে সে তাহার হস্ত হইতে ধান্যগুলি লইল, এবং শক্তিকুমার পাদ প্রক্ষালন করিলে পর সুষিক্ত ও মার্জ্জিত, বারাণ্ডার অলিন্দ-দেশে তাঁহাকে উপবেশন করিতে আসন প্রদান করিল। কুমারী সেই সুগন্ধ ধান্যগুলিকে আতপে শুকাইয়া লইল এবং কঠিন ও সমতল ভূমির উপর রাখিয়া বার বার উলট পালট করতঃ পেষণদণ্ডদ্বারা অল্প অল্প আঘাত করিয়া তণ্ডুল বাহির করিল। পরে ধাত্রীকে কহিল দেখ মা তুষে অলঙ্কার পরিষ্কার হয়, এই জন্য স্বর্ণকারেরা তুষ ক্রয় করিয়া থাকে, তুমি তাহাদের নিকট ইহা বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইবে তাহাতে নাতিআর্দ্র, নাতিশুষ্ক, সারালকাষ্ঠ এবং ছোট একটি হাঁড়ি ও দুখানি শরা লইয়া আইস। ধাত্রী তৎসমুদয় করিলে পর কন্যা অনতিগভীর, উন্নতমুখ, অর্জ্জুনকাষ্ঠময় উলুখলে রাখিয়া সেই তণ্ডুলগুলি লৌহপাত্রে মুষলদ্বারা কাঁড়িতে লাগিল। সে এক হস্তদ্বারা চাউলগুলি বারংবার উলট পালট করিয়া দিতে লাগিল, এবং অপর হস্তদ্বারা তণ্ডুলের উপর আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে তণ্ডুল কাঁড়িয়া শূর্পদ্বারা খুদ কুঁড়া সব ঝাড়িয়া ফেলিল। তৎপরে চাউলগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া পাঁচ গুণ জলে চড়াইয়া দিল। তণ্ডুলগুলি ফুটন্ত ও মুকুলভাব অতিক্রম করিয়া স্ফীত হইলে কন্যা হাতা দিয়া তাহা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিল। ক্রমে সমস্ত অন্নগুলি সমভাবে সিদ্ধ হইলে জ্বাল কমাইয়া দিয়া ফেণ গালিবার জন্য একখানি শরা দিয়া স্থালীর মুখ আচ্ছাদন করিয়া আর একখানি শরার উপর তাহা কাত করিয়া ধরিল। পরে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলির উপর জল ছিটাইয়া সেই কয়লাগুলি ধাত্রীকে দিয়া কহিল, "এই গুলি অঙ্গার-ক্রেতাদিগের নিকট লইয়া যাও, বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইবে, তাহাতে কিছু শাক, ঘৃত, তৈল, লবণ, দধি, আমলক ও তিন্তিড়ী কিনিয়া আন।" সে সেই সব করিলে পর কুমারী দুই তিনপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল এবং সেই ফেণের নূতন শরা ভিজা বালুকায় রাখিয়া তাহার উপর মন্দ মন্দ পাখার বাতাস দিয়া ঈষৎ শীতল করিয়া তাহাতে লবণ ও অম্ল দিয়া এক চমৎকার পানীয় প্রস্তুত করিল। পরে আমলক ঈষৎ পিষিয়া ও

পদ্মবাসিত করিয়া ধাত্রীকে বলিল উঁহাকে স্নান করাইয়া আন। কুমারী অগ্রে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহাকে তৈল ও সেই আমলক চূর্ণ প্রদান করিলে তিনি অগ্রে গাত্র মর্দ্দন ও পরে স্নান করিলেন। স্নানের পর ধৌত মার্জ্জিত কুট্টিমে কাষ্ঠময় আসনে উপবেশন করিলেন। কুমারী প্রাঙ্গণস্থ কদলীবৃক্ষ হইতে একখণ্ড পাতা কাটিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত ও তাহার উপর জলধৌত একখানি নূতন শরা সংস্থাপিত করিয়া অগ্রে সেই পানীয়দ্রব্য প্রদান করিল। তাহা পান করিয়া তাঁহার পথশ্রম নিবারিত, চিত্ত পুলকিত ও সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মার্দ্র হইয়া উঠিল। পরে কন্যা শালিতণ্ডুলের দুই হাতা অন্ন তাঁহার ভোজনপাত্রে দিয়া সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃত, সূপ, শাক ও চাট্‌নি প্রদান করিল। ইহার পর দধি দিয়া অন্ন ভোজন করাইল। অন্নের কিয়দংশ থাকিতে থাকিতেই তিনি আহারে তৃপ্ত হইয়া পানীয় জল চাহিলেন। অনন্তর কুমারী একটি নব ভৃঙ্গারে পাটল কুসুম ও প্রফুল্ল কমলবাসিত সলিল আনিয়া ঢালিতে লাগিল, তিনিও শরাখানি মুখে ধরিয়া ভৃঙ্গার-নলের মুখ দিয়া জল পান করতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। পান কালে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হিম বিন্দুবৎ প্রতীয়মান, প্রতিঘাতোত্থিত জলকণাগুলি তাঁহার চক্ষের পাতায় সংলগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। সুশীতল বারি পানে তাঁহার কপোলদেশ লোমাঞ্চিত হইয়া ঈষৎ পরুষভাব ধারণ করিল। ধারাপাতের মধুর নিনাদে তাঁহার শ্রবণকুহর, এবং পানীয় সলিলের সুগন্ধে তাঁহার নাসিকা ও উহার মাধুর্য্যাতিশয়ে তাঁহার রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি মস্তক নাড়িয়া সঙ্কেত করিলে কুমারী নিবৃত্ত হইয়া আর একটি পাত্রে আচমনের জন্য জল আনয়ন করিল। পরে ধাত্রী গোময় দ্বারা উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া সেই কুট্টিমে একটি পরিষ্কৃত শয্যা পাতিয়া দিল এবং তিনি কিয়ৎক্ষণ তাহাতে শয়ন করিয়া রহিলেন; এবং পরম পরিতুষ্ট হইয়া যথা বিধানে বিবাহ করিয়া কন্যাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন।”

“দশকুমার চরিতের” গোমিনী বৃত্তান্ত হইতে পাঠকগণকে প্রাচ্য কোর্টসিপের এই চিত্রখানি উপহার দেওয়া গেল। এখনকার কোন্ যুবক এই কোর্টসিপমার্গ অনুসরণ করিতে রাজী আছেন ? *

শ্রীশশীভূষণ রায়।

---

* কৌতূহলী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য লিখিতেছি, সেই শ্রেষ্ঠিকুমারী অতীন্দ্রিয়া হইয়া দেবসেবার ন্যায় পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। গৃহের কার্য্য সকল সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। সে আপনার গুণগ্রামদ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল পরিজনকে স্ববশে আনিল। পতিও তাহার গুণে বশীভূত হইয়া পরিবারের পালনভার তাহার উপর অর্পণ করিলেন এবং স্বীয় জীবন ও দেহ একমাত্র আয়ত্ত রাখিয়া ত্রিবর্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন।

রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা।

বারেক দেখিয়া যাও, ওগো মহা অন্ধকার!
পদ তলে বন প্রান্তে ফুরায় জীবন কার।
গোপন মর্ম্মের কথা ক্ষণেক শুনিয়া যাও,
নামায়ে করুণ নেত্র মুমূর্ষুর মুখে চাও;
তুমিত জাননা কিছু কখন্ কে মুগ্ধ প্রাণে,
মেলিয়া মুকুল আঁখি চেয়ে ছিল তোমা পানে!
শোন তবে, জীবনের নবীন প্রদোষে যবে,
তরুণ শ্যামল মূর্ত্তি, দেখা দিলে সুনীরবে;
অধরে লাগিয়া ছিল হাসির চন্দ্রমারেখা,
ললাটে পড়িয়া ছিল সন্ধ্যার কণক লেখা!
বায়ু ছিল হয়ে স্থির, অরণ্য মর্ম্মর হীন,
স্তব্ধ ব্যোম, অস্ত পথে মেঘে দিবালোক লীন।
বসিয়া সুবর্ণ কক্ষে, পশ্চিম গগন-ধার,
ধরিয়া স্বর্গীয় বীণা রশ্মিরূপ হেমতার,
কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু ছড়ায়ে কোমল তান,
নক্ষত্র করিতে ছিল তোমারি গৌরব গান।
কতযে ক্ষমতা আর কতযে মহত্ব তব,
আভাসে তখনি যেন বুঝিতে পারিনু সব!
আনন্দে উঠিনু ফুটে, তোমারি পূজার তরে
সমস্ত হৃদয় দেহ যৌবনে উঠিল ভরে!
সব গন্ধ সব মধু তব তরে লয়ে বুকে,
অপূর্ব্ব পুলকে আমি চাহিনু তোমার মুখে!
শত লক্ষ গ্রহ তারা খচিত নীলিমাসনে
যখন বসিলে তুমি প্রশান্ত গম্ভীরাননে;
যোগ্য অধিপতি জেনে আপনাকে সমর্পিয়া
ধরণী চরণ তলে পড়ে তব ঘুমাইয়া।
ঈশ্বরের ছায়া যেন দেখিনু তোমাতে রাজে

লুকাল পুরাণো সৃষ্টি নূতন রহস্য মাঝে।
নিদ্রিত বিজন বিশ্বে জাগিয়া নির্ব্বাক হয়ে,
নিমেষ নিহত নেত্রে, হেরিলাম সবিস্ময়ে,
সম্পূর্ণ মহিমা তব ; ডুবে গেল ক্ষুদ্র ফুল,
তোমারি অতল মাঝে না পাইয়া অন্ত, কূল।
আঁধারে খুলিয়া হিয়া অর্পিনু তোমার পায়
প্রেমের সৌরভ ভার ; তখন বুঝিনি হায়
তুমি চেয়ে কার মুখ ! কোন্ পুষ্প কুঁড়িটিরে,
নিভৃত হৃদয় দিয়ে যতনে রেখেছ ঘিরে।
এখন সে নিজ নিধি দিয়ে প্রভাতের বুকে
ফেলিয়া শিশির অশ্রু না জানি চ'লেছ দুখে
কোন্ নিরুদ্দেশে তুমি। ফুরায় জীবন মোর।
আসিছে আলোক অই আঁধার করিয়া ভোর,
পিকগান অলিতান হরষ হিল্লোল লয়ে
নবস্ফুট হৃদিতরে , তব অন্তরালে রয়ে
ফুটেছি, যেতেছি ম'রে' কিছুই চাহিনা আর।
শেষ সুবাসিত শ্বাস প্রণয়ের উপহার,
দিতেছি অন্তিমে ; ওগো, এ নিশ্বাসে অনুক্ষণ,
স্নিগ্ধ রহে যেন তব শূন্য অন্ধকার মন !

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

চলিত গল্প।

আমাদের দেশের চলিত গল্পের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় প্রবাদের এইরূপ মৃত্যু যে সাহিত্য ভাণ্ডারের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক তাহাতে বোধ করি কাহারও দ্বিমত নাই। আমরা এই ক্ষতি কথঞ্চিৎ পরিমাণ নিবারণের অভিপ্রায়ে চলিত গল্পের সংগ্রহে যত্নবান হইয়াছি, গল্পগুলি পড়িয়া যদি কেহ কেহ তাহার উৎপত্তি নির্দ্ধারণে প্রয়াসবান হন তাহা হইলে ইহার অনুরূপ সার্থকতাও হইতে পারে। ভাং সং।

(১)

সর্প ও সাধু।

একদা এক সাধু পথে চলিতে চলিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটী সর্প তাঁহার পদানুসরণ করিতেছে। সাধু সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কিরে! তুই আমাকে দংশন করবি নাকি?"

সর্প উত্তর করিল, "আজ্ঞে না।"

সাধু বলিলেন, "তবে আজ হইতে তুই আমার শিষ্য হ।"

সর্প—"যে আজ্ঞে।"

সাধু—"আমি তোকে উপদেশ দিতেছি, তুই আজ হইতে আর কাহাকেও দংশন করিস্ না।"

সর্প—"যে আজ্ঞে! আমি আজ হইতে আমার দংশন ব্যবসা পরিত্যাগ করিলাম।"

সাধু চলিয়া গেলে সর্প আপন বিবরে প্রবেশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে কাহাকেও কামড়াইবে না। কিছুদিন পরে, ক্রমে গ্রাম্য বালকেরা জানিল যে "ঐ সর্পটা আর কাহাকেও দংশন করিবেনা,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।" তখন সকলে মিলিয়া সর্পকে বিরক্ত করিতে লাগিল, কেহ তাহার গাত্রে ইষ্টক নিক্ষেপ করে, কেহ বা তাহার ল্যাজ ধরিয়া টানে কেহ বা তাহার স্কন্ধোপরি উপবেশন করে; এই প্রকার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সর্প চারিদিকে তাহার গুরুদেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দিন কতক পরে পুনরায় গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সর্প গুরুঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রভু! আপনি যে উদারনীতি শিখাইয়াছেন তাহার যন্ত্রণায় আমি ত' অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। বলিতে কি, ঠাকুর, গাত্র বেদনায় আমার জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, যে কষ্ট তা আর আপনাকে অধিক কি বলব ঠাকুর!"

সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন, হ'য়েছে কি ?"

সর্প ;—"আপনার কথামত আমি আর কাহাকেও কিছু বলি না, তাহাতে সকলে আমাকে যন্ত্রণা দেয়, কেহ ল্যাজ ধরে টানে, কেহ ইট্ মারে, কেহ গালি দেয়, এইরূপ নানান্ প্রকার উৎপাতে আমার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা আর আপনাকে বলিয়া কি জানাইব।"

সাধু উত্তর করিলেন, "বাপু হে! আমি তোমাকে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু তোমার ফোঁস ছাড়িতে ত বলি নাই। তুমি ফোঁস ছাড়িলে কেন ?"

(২)

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী।

কোন ব্রাহ্মণের গৃহিণী স্বামীকে বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রত্যহ শয়ন-গৃহে পরিধেয় আর্দ্র বস্ত্র জল শোষণ করিবার জন্য দড়িতে ঝুলাইয়া দিত। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন পত্নীকে বলিতেন, "ওগো গৃহদেবি! তুমি এস্থানে আর কাপড় শুকাইতে দিও না, ইহাতে ঘরে বায়ু চলাচল করিতে পারে না এবং কাপড়ও শীঘ্র শুষ্ক হয় না।" কিন্তু গৃহিণী স্বামীর কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিতেন না, এই ব্যাপার দেখিয়া সুবোধ ব্রাহ্মণ একদিন আহারান্তে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর্দ্র বস্ত্রখানি তুলিয়া, একখানি ছুরিকা দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি পত্নীর হস্তে দিয়া, হাসিতে হাসিতে পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, "এই লও তোমার বস্ত্র,—এরূপ কার্য্য আর কখন করিও না; তোমার সহিত আমার যে জন্য বিবাদ, তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া দিলাম।"

(৩)

রাজা ও মন্ত্রী।

কোন রাজার একজন সমান্য কর্ম্মচারী একদিন মনে মনে চিন্তা করিল যে, আমরা দুরূহ পরিশ্রম করিয়া এত অল্প বেতন পাই আর মন্ত্রী কেবল রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এত অধিক বেতন পায় কেন? উহার যে কার্য্য তাহা আমি অনায়াসে সমাধা করিতে পারি। এই ভাবিয়া সে একদিন গোপনে রাজার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিল। সুচতুর রাজা, আপন কর্ম্মচারীর ঈদৃশ সাহস দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আজ হইতে তোমাকে ঐ পদ দেওয়া হইল, এবং মন্ত্রীকে আমি জবাব দিলাম।"

কর্ম্মচারী যে দিন মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইল সেই দিন সন্ধ্যার সময় রাজপথে সহসা কিসের গোলযোগ উঠিল। রাজা তাহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নূতন মন্ত্রীকে কহিলেন, "মন্ত্রি! দেখ ত কিসের জন্য এত গোলযোগ হইতেছে।"

নূতন মন্ত্রী আগ্রহ সহকারে দেখিতে গেল এবং আসিয়া বলিল, মহারাজ! বর যাইতেছে।

রাজা প্রশ্ন করিলেন, "কাহাদের বর ?"

মন্ত্রী কহিল, "জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

এই বলিয়া সে পুনরায় তথায় গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, এই বর ব্রাহ্মণের সন্তান।"

রাজা তদুত্তরে প্রশ্ন করিলেন "তাহার পিতার নাম কি ?"

মন্ত্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে গেল এবং আসিয়া বলিল, "প্রভু! বরের পিতার নাম, কৈলাশচন্দ্র।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহ হইবে কোথায় ?"

মন্ত্রী পুনরায় দৌড়িল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মহারাজ! দেবগ্রামে বিবাহ হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কন্যা ?"

মন্ত্রী পুনরায় ছুটিল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ! অম্বিকা বাবুর কন্যা।"

রাজা তখন প্রশ্ন করিলেন, "মেয়েটীর বয়স কত ?"

মন্ত্রী পুনরায় এ বিষয়ের সন্ধান লইবার উদ্দেশে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, "আর না তুমি বস। এক কার্য্য তুমি সাত বার ধরিয়া করিলে তবু তাহার খোঁচ মিটিল না। তুমি মন্ত্রী হইবার কতদূর উপযুক্ত তাহা বোধ হয় এইবারে বুঝিতে পারিয়াছ, সিংহের কার্য্য শৃগাল দ্বারা কি কখনও সাধিত হইতে পারে ? তুমি বস আমি তোমাকে পরীক্ষা দেখাইতেছি—এই বলিয়া রাজা পূর্ব্ব মন্ত্রীকে ডাকাইয়া তাঁহাকে ঐ বিবাহের সংবাদ আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরাতন মন্ত্রী একবার তথায় গিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাজার পার্শ্বে বসিয়াই তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন, বর কত বড়, কন্যা কত বড়, বর কন্যা লেখাপড়া কতদূর জানে, কন্যা ও বরের পিতা মাতা কি কার্য্য করে, তাঁহাদের বিষয় কত, তাহাদের স্বভাব কেমন, ইত্যাদি রাজা যাহা যাহা প্রশ্ন করিলেন মন্ত্রী তাহার সমস্তই উত্তর করিলেন। তখন নূতন মন্ত্রীর চৈতন্যোদয় হইল!

(৪)

সমুদ্রের এবং কূপের ব্যাঙ।

এখনকার বালকেরা যাহা দেখে তাহাই মাত্র বিশ্বাস করে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক কথা তাঁহারা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেন। একদা এক সাধু এই কাণ্ড দেখিয়া নিম্নলিখিত গল্পটী বিবৃত করেন।

এক পাতকুয়ার ভিতর এক ব্যাঙ বাস করিত, ঘটনাক্রমে সেই কূপে একটা সমুদ্রের ব্যাঙ আসিয়া পড়ে। উভয় ব্যাঙ কোলাকুলি করিয়া পরে পাৎকুয়ার ব্যাঙ সমুদ্রের ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, তোমার বাড়ী কোথা ?"

সমুদ্রের ব্যাঙ উত্তর করিল, "আমার বাড়ী সমুদ্রে।"

পাঃ ব্যাঙ—"বটে! আচ্ছা ভাই, সমুদ্র কত বড় ?"

সঃ ব্যাঙ,—"সমুদ্র অতি ভয়ানক বড়।"

পাঃ ব্যাঙ,—"তবু! কত বড় হইবে, আমার এই পাৎকুয়াপেক্ষা বোধ হয় কিছু ছোট হইবে, কেমন ?"

সঃ ব্যাঙ,—"দূর দূর! সে যে সমুদ্র! অপার সাগর।"

পাঃ ব্যাঙ,—"বটে! আচ্ছা ভাই আমার এই পাৎকুয়াপেক্ষা সমুদ্র এত——বড় হইবে।" ব্যাঙ হস্তদ্বয় ঈষৎ বিস্তারপূর্ব্বক দেখাইল। সমুদ্রের ব্যাঙ ইহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে সে যে সমুদ্র,—সমুদ্র—"

পাঃ ব্যাঙ,—"সমুদ্র বটে! আচ্ছা তাহা হইলে বোধ হয়, আমার বাসস্থান হইতে সমুদ্র এত————বড় হইবে।

"দূর দূর সে যে সাগর। তোর বাসস্থান লক্ষ লক্ষ একত্র করিলেও তাহার এক কোণ হয় না!"

পাঃ ব্যাঙ—"বটে এত——————বড়"

"না"

"এত————————বড়"

"না"

"আচ্ছা এত————————————বড়"

"তাও না।"

"তবে সমুদ্র হতেই পারে না।"

এক্ষণে সামুদ্রিক ব্যাঙ হাস্য করিয়া কহিল, "ভাইরে! তুমি সমুদ্র দেখ নাই (তুমি শাস্ত্র সাগরে প্রবেশ কর নাই) তোমার কাছে সমুদ্র অসম্ভব হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

(৫)

ব্রাহ্মণ ও জলের কলসী।

একদা একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নদী হইতে এক কলসী জল গৃহে আনিতেছিলেন। পথিমধ্যে ঐ জল কলসী একজন মুসলমানের স্পৃষ্ট হওয়ায় ব্রাহ্মণ জলপূর্ণ কলসী ভূমে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক্ষণে জল ও কলসীতে কথোপকথন আরম্ভ হইল। জল বলিল, "দেখ্ কলসি, তুই এত অপবিত্র যে তোর ভিতর আশ্রয় লইয়া আমার এই দুর্দ্দশা, রাস্তায় পড়িয়া শুষ্ক ভূমে আমার প্রাণ গেল! নচেৎ আমি যখন নদীতে ছিলাম, তখন কে না আমায় স্পর্শ করিয়াছে

একজন মুসলমান কেন শত শত মুসলমান আমাতে গাত্র ধৌত করিয়াছে, কত অস্পৃশ্য বস্তু আমাতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে কিন্তু তখন আমি অপবিত্র হই নাই, আজ তোর আশ্রয় লইয়া আমার এই দুর্গতি।”

জলের কথা শুনিয়া কলসী বলিল, “তুই আমাকে তিরস্কার করিতেছিস্ কেন? বরং তোর জন্যই আমার প্রাণ গেল, নচেৎ যখন আমি কুম্ভকারের বাটীতে ছিলাম তখন কে না আমাকে স্পর্শ করিয়াছে? কত হাড়ি, মুচি, চণ্ডাল প্রভৃতি হীন জাতিতে আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, এবং বাজাইয়াছে। তখন আমি অপবিত্র হই নাই, আজ তুই আমার ভিতর আসিলি বলিয়া আমার প্রাণ গেল।”

সুবুদ্ধি সুচতুর পাঠকমহাশয়, বলুন দেখি “দোষ কার?”

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

অভিনব উপগ্রহণ।

আমরা সচরাচর গ্রহণের কথা শুনিয়া থাকি, এবং গ্রহণ দেখিতে পাই। কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ সকল গ্রহণ সূর্য্য ও চন্দ্রকে লইয়া ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ চন্দ্র কর্ত্তৃক আবরিত হইয়া সূর্য্য অন্তরালে গমন করিলে তাহাকে ‘সূর্য্যগ্রহণ,’ ও পৃথিবীকর্ত্তৃক প্রত্যাহত হইয়া সূর্য্যকিরণের গত্যভাব হেতু শূন্যমার্গে যে ছায়া সম্পাতিত হয় চন্দ্র তদন্তর্ভাগে নিমজ্জিত হইলে তাহাকে ‘চন্দ্রগ্রহণ’ বলা যায়। এই উভয় গ্রহণেতেই আবরণ বা ছায়াসম্পাত কদাপি সর্ব্বৈধ এবং কদাপি বা আংশিকরূপে ঘটিয়া থাকে। উভয় স্থলেই আবরণ বা ছায়া “বিপুলকায় রাহু” বিশেষ; তাহা জ্যোতিষ্ক বিম্বকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে সমর্থ; তবে যে কখনও আংশিক গ্রহণ লক্ষিত হয় তাহা কেবল পৃথিবী ও চন্দ্র এবং সূর্য্যের কালগত স্থিতিভেদে ঘটিয়া থাকে। এবম্বিধ বিপুলকায় সর্ব্বগ্রাসী রাহুর সঞ্চারকে গ্রহণ কহে।

কিন্তু সৌরজগতে উক্তবিধ বিপুলকায় রাহু ভিন্ন আরও নানাবিধ ‘ক্ষুদ্রকায় গুটিপোকার’ সঞ্চার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা প্রস্ফুটিত গ্রহবিম্ব কিম্বা সৌরবিম্বোপরি হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া যায়; ইহারা বিম্বকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু ইহাদের সঞ্চার দূরবীক্ষণ সহযোগে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। পৃথিবীর কক্ষের অভ্যন্তরভাগে বুধ এবং শুক্র গ্রহদ্বয় বিচরণ করিতেছে; ইহারা আকারে পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং দূরে অবস্থিত বলিয়া আরও ক্ষুদ্র দেখায়। শুক্রগ্রহ কখনও ‘প্রভাতী’ এবং কখনও ‘সন্ধ্যা’ তারারূপে লক্ষিত

হইয়া থাকে, কিন্তু বুধ এত ক্ষুদ্র যে তাহাকে সহসা মুক্তনেত্রে দর্শন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই গ্রহদ্বয় যখন স্বীয় স্বীয় কক্ষপথে চলিতে চলিতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যভাগে উভয়ের সহিত সমসূত্রস্থ হয়, তখন পৃথিবীর অধিবাসীদিগের নিকট ইহা অনুভূত হয় যেন ঐ গ্রহদ্বয়ের ছায়া সৌরবিম্বের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দেখিলে সহজেই মনে হয় যেন একটী প্রস্ফুটিত শতদল-বিস্তৃত পদ্মের উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণভ্রমর গুটি গুটি যাইতেছে। উক্ত গ্রহদ্বয় ভিন্ন অপর কোন গ্রহদ্বারাই সৌরবিম্বোপরি এবম্বিধ কালিমা-সঞ্চার সংঘটিত হইতে পারে না। ইহা যদিও চন্দ্রকর্ত্তৃক আবরণঘটিত সূর্য্যগ্রহণের সহিত এক জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ইহাদের আকারের ক্ষুদ্রত্ব হেতু এস্থলে ইহাদিগকে "উপগ্রহণ" নামে আখ্যাত করা যাইতেছে।

এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে যে গ্রহণ বলিতে যেমন দুই প্রকারের গ্রহণ বুঝায়, (যথা, সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ,) তেমনি উপগ্রহণ বলিতেও নানাপ্রকার উপগ্রহণ বুঝাইতে পারে। উপরে যে দুই প্রকার উপগ্রহণের বিষয় উল্লেখ করা হইল তদ্ভিন্ন সৌরজগতে আরও নানাবিধ উপগ্রহণ ঘটিতে দেখা যায়। পৃথিবীর ছায়া এত দূরবিস্তৃত নহে যে তদ্দ্বারা বৃহস্পতিগ্রহ স্পৃষ্ট হইতে পারে, অতএব 'বৃহস্পতিগ্রহণ' সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বৃহস্পতিকে বেষ্টন করিয়া পাঁচটী উপগ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি কিম্বা একাধিক উপগ্রহ এক সমকালে বৃহস্পতির বিম্বোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছায়াসম্পাতদ্বারা কালিমা সঞ্চার করিয়া থাকে। এই সকল ছায়াসম্পাত উপগ্রহণ জাতীয়, অতএব ইহাদিগকেও উপগ্রহণ বলা যাইতে পারে। আবার উপগ্রহ সকল যখন বৃহস্পতির বিম্বের অন্তরালে নিপতিত হয় তখন তাহাকে ঐ ঐ উপগ্রহের গ্রহণ কহা যায়। এই সকল গ্রহণকে যথাক্রমে উপগ্রহদিগের নামানুক্রমে নামাঙ্কিত করা যাইতে পারে; কিন্তু উপগ্রহণের নামাঙ্কণ নিয়া গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। নানাজাতীয় জ্যোতিষ্কবিম্বোপরি নানা গ্রহ এবং উপগ্রহের সঞ্চারদ্বারা উপগ্রহণ ঘটিতে দেখা যাইতেছে। এই নামবিভ্রাট বিদূরণজন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন বোধ হয়; যথা,—সূর্য্যের বুধকর্ত্তৃক সংঘটিত উপগ্রহণের নাম 'বুধোপগ্রহণ' এবং শুক্রকর্ত্তৃক সংঘটিত উপগ্রহণের নাম 'শুক্রোপগ্রহণ' হইবে। এস্থলে গ্রহণের নামের সহিত একটী বিশেষ পার্থক্য এই লক্ষিত হইবে যে,—মনে করা যাউক যেন 'শুক্রগ্রহণের' কথা বলা যাইতেছে, তদ্দ্বারা অপর কোন গ্রহ কিম্বা উপগ্রহকর্ত্তৃক শুক্রের বিম্বোপরি ছায়াসম্পাত বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি 'শুক্রোপগ্রহণের' কথা বলা যায় তবে ইহা জানিতে হইবে যে শুক্রকর্ত্তৃক সৌরবিম্বোপরি ছায়াসম্পাতের কথা বলা হইতেছে।

উপগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণদ্বারা অনেক নূতন সত্য আবিষ্কার করা যাইতে পারে। শুক্রো-পগ্রহণদ্বারা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব নিরাকরণ অপেক্ষাকৃত উপাদেয় বলিয়া গণ্য হয়। গত ১৮৭৪ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দুইবার শুক্রোপগ্রহণ ঘটিয়া পৃথিবীর জ্যোতির্ব্বিদ-

সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের একতম পর্য্যবেক্ষণফল হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে শুক্রের চতুর্দ্দিকে স্বল্পবিস্তৃত বায়ুস্তর প্রবাহিত রহিয়াছে; এবং অন্যতম হইতে পৃথিবী ও সূর্য্যের দূরত্ব কথঞ্চিৎ বিশুদ্ধতররূপে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মীমাংসা এখনও সম্যকরূপে মানুষের জ্ঞানলব্ধ হয় নাই। উপরোক্ত দূরত্বপরিমাণ বহুকাল মানবের সাধনবস্তু থাকিবে; শুক্রের বায়ুস্তর সম্বন্ধে অপরাপর অনেক পরীক্ষা করা গিয়াছে কিন্তু কিছুতেই ফললাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই।

শুক্রোপগ্রহণে সংঘটন কালের অন্তর সর্ব্বদা একরূপ নহে। গত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ও ১৮৮২ খৃঃ অব্দে দুইবার ৮ বৎসরান্তে ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু আগামী শুক্রোপগ্রহণ ২০০৪ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ১২১½ বৎসরান্তে ঘটিবে। তৎপর ৮ বৎসরান্তে একবার ঘটিয়া পুনরায় ১০৫½ বৎসরান্তে ঘটিবে। এইরূপে যথাক্রমে ৮,১২৯½ ও ৮ এবং ১০৫½ বৎসরান্তে এক একবার ঐ উপগ্রহণ ঘটিয়া থাকে।

বুধোপগ্রহণের ক্রম ইহা হইতে অন্যতররূপে ঘটিয়া থাকে। গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে এক উপগ্রহণ ঘটিয়াছিল; তৎপব বর্ত্তমান বর্ষে (১৮৯৪) নবেম্বর মাসে একটি ঘটিবে। তাহার পর ১৯০৭ খৃঃ অঃ নবেম্বরের পূর্ব্বে আর ঘটিবে না; এবং ১৯১৪ খৃঃ অব্দে আবার ঘটিবে। কিন্তু এই ক্রম আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া একবার দশ বৎসরান্তে ও পুনরায় তিন বৎসরান্তে এইরূপ দুইবার ঘটিবে। এইরূপে দেখা যায় যে বুধোপগ্রহণ যথাক্রমে ১০,৩,১০, ৩,১৩,৭ বৎসরানুক্রমে ঘটিয়া থাকে।

উপগ্রহণ সংঘটনের এবম্বিধ সাময়িক বিরলত্বের কারণ এই যে, গ্রহদিগের কক্ষসকল পরস্পর বিভিন্ন সমতলে অবস্থিতি করিতেছে; অতএব স্বীয় স্বীয় কক্ষাবর্ত্তনবশে তাহারা যদিও সময় সময় পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তিত্বে অবস্থিতি করে, কিন্তু তাহাদের কক্ষাবস্থিতি অনুসারে কখনও পৃথিবীর কক্ষসমতলের উর্দ্ধে এবং কখনও অধোভাগে থাকে, এই হেতু উপগ্রহণ ঘটিতে পারে না। যখন তাহারা পাতবিন্দুতে* অথবা তৎসন্নিধানে সমাগত হয় তখন পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত মধ্যবর্ত্তিত্বে অবস্থিতিকালে সমসূত্রস্থ হইয়া থাকে, অতএব ঐ সময় উপগ্রহণ ঘটিতে দেখা যায়। এই সকল উপগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদসমাজে ইহাদের সমাগম অত্যন্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সহকারে প্রত্যাশিত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল তাহা সমস্তই পৃথিবী এবং তৎপৃষ্ঠদেশ সংঘটিত উপগ্রহণ সম্বন্ধেই বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু যদি এরূপ মনে করা যায় যে কোন একটী বহিঃস্থ গ্রহ (যে সকল গ্রহ ধরাকক্ষের বহির্ভাগে থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; যথা,—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি) স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, সূর্য্যের যে দিকে পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে, সেই দিকে আগমন করিয়া পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত এক সমসূত্রে অবস্থিত হয়,

* গ্রহকক্ষ যে বিন্দুদ্বয়ে ধরাকক্ষসমতলকে ছেদ করে তাহাদিগকে ঐ গ্রহের 'পাত' বলা যায়।

তাহা হইলে ঐ গ্রহ হইতে পৃথিবীকে একটী অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্রহরূপে, তাহার এবং সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তিত্বে সমসূত্রে অবস্থিত লক্ষিত হইবে। অতএব যদি কল্পনাদেবীর রথারোহণপূর্ব্বক আমরা ঐ সময়ে উক্ত গ্রহে উপনীত হইতে পারি তবে দেখিতে পাইব যে পৃথিবীকর্ত্তৃক একটী উপগ্রহণ ঘটিতেছে। যেরূপ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তিত্বে কোন গ্রহ সমাগত হইয়া সমসূত্রস্থ হওয়া অপ্রত্যাশিত নহে, সেইরূপ অপর কোন গ্রহ ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তিত্বে পৃথিবী কিম্বা অন্য একটী অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্রহ সমসূত্রস্থ হওয়া অপ্রত্যাশিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতএব পৃথিবী হইতে উপগ্রহণ দর্শন যেরূপ স্বাভাবিক এবং সময়বিশেষে পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ হইয়া থাকে, অপরাপর গ্রহ হইতেও উপগ্রহণ দর্শন সেরূপ স্বাভাবিক এবং সময়বিশেষে পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে (১) কোন সময়ে কোন গ্রহ হইতে কাহা কর্ত্তৃক উপগ্রহণ ঘটিতে দেখা যাইবে, তাহার কাল গণনা ধরানিবাসী মানুষের সাধ্যায়ত্ত কি না? এবং (২) যদি ঐ সকল গ্রহনিবাসী কেহ না থাকে তবে সেই উপগ্রহণ কে দেখিবে অথবা কাহার জন্য তাহা গণনা করিতে হইবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে, উপগ্রহণের কালগণনা করিতে হইলে কি কি গণনা অগ্রে প্রয়োজনীয় তাহা বিচার করিতে হইবে। ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে দুইটী গ্রহ সূর্য্যের একদিকে অবস্থিতি কালে যখন সূর্য্যের সহিত তাহারা পরস্পর সমসূত্রস্থ হয় তখন মধ্যে বহিঃস্থ গ্রহ হইতে অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্রহকর্ত্তৃক একটী উপগ্রহণ দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ অবস্থায় দুইটী গ্রহ সূর্য্যের সহিত সমসূত্রস্থ হইতে পারে; প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্যের আকর্ষণে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, অতএব ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে সূর্য্যকেন্দ্র প্রত্যেক গ্রহেরই কক্ষ সমতলে অবস্থিতি করিবে অর্থাৎ কক্ষসমতলসকল পরস্পর যে সকল রেখাতে সম্পাতিত হইবে তাহারা সকলেই সূর্য্যের কেন্দ্রেতে মিলিত হইবে। সূর্য্যের কেন্দ্র হইতে যে কোন গ্রহে রেখা টানিলে ঐ রেখা উক্ত গ্রহের কক্ষসমতলে অবস্থিতি করিবে; অতএব যখন দুইটী গ্রহকে সূর্য্যের সহিত সমসূত্রস্থ হইতে দেখা যায় তখন ইহা জানা যায় যে সূর্য্যের সহিত গ্রহদ্বয়কে রেখাদ্বারা সংলগ্ন করিলে ঐ রেখাদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া যায়; কিন্তু তাহারা কক্ষদ্বয়ের সমতলে অবস্থিতি করাতে দৃষ্ট হয় যে ঐ মিলিত রেখা উভকক্ষের সম্পাতরেখারূপে পরিণত হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে যে যখন দুইটী গ্রহ তাহাদের কক্ষসমতলের সম্পাতরেখাতে অবস্থিতি কালে সূর্য্যের একপার্শ্বে অবস্থিতি করিবে তখন তাহাদের মধ্যে উপগ্রহণ ঘটিবে। অতএব উপগ্রহণের কাল নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ গ্রহদ্বয় কোন সময়েতে তাহাদের কক্ষদ্বয়ের সম্পাতরেখাতে সংলগ্ন হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, অতঃপর দেখিতে হইবে তাহারা ঐ সময়ে সূর্য্যের এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে কিনা? কোন দুইটী গ্রহ তাহাদের প্রত্যেক আবর্ত্তনে একবার করিয়া সূর্য্যের এক পার্শ্বে গমন করিয়া থাকে, এবং একবার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সম্পাতরেখাসংলগ্ন হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়ে এক সমকালে সম্পাতরেখাবলম্বন করিয়া

এক পার্শ্বে গমন না করিলে তাহারা সমসূত্রস্থ হইতে পারে না। ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে উভয় গ্রহের একদেশাবস্থিতি কাল এবং তাহাদের সম্পাতরেখা সংলগ্ন হওন কাল দ্বয়ের পরস্পর সমন্বয় করিতে পারিলেই উপগ্রহণের কাল নির্ণীত হয়।

গ্রহগণ যেমন স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহাদের সম্পাতরেখাও সেইরূপ কক্ষ-পথে অপসরণ করিয়া চলিতেছে। কোন সময় এমত হইতে পারে যে, কোন তিনটী গ্রহের সম্পাতরেখাত্রয় (প্রত্যেক দুইটীগ্রহকক্ষ একটী করিয়া সম্পাতরেখা উৎপন্ন করিবে, এই রূপে তিনটী গ্রহের মধ্যে তিনটী সম্পাতরেখা, চারিটী গ্রহের ১২টী সম্পাতরেখা হইবে) পর-স্পর একত্র মিলিত হইয়া যাইবে এবং ঠিক ঐ সময়ে গ্রহদ্বয় সূর্য্যের এক পার্শ্বে তাহাদের সম্পাতরেখা সংলগ্ন হইবে; তখন সর্ব্ববহিঃস্থ গ্রহ হইতে অপর গ্রহদ্বয় কর্ত্তৃক যুগপৎ উপগ্রহণ লক্ষিত হইবে। এইরূপে গণনা করিতে করিতে এমত সময় নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে যখন সকল গ্রহদিগকে উপগ্রহণ স্থানাবলম্বিত দৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ সর্ব্ববহিঃস্থ গ্রহ হইতে অপর সকল গ্রহদিগকে সৌরবিম্বোপরি বিরাজ করিতে দেখা যাইবে! ইহা সচরাচর ঘটিতে পারে না; হিন্দুগণ একবার এই কাল গণনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে গ্রহগণ (ইন্দ্র ও বরুণ গ্রহ বাদ দিয়া চন্দ্র সমন্বিত গ্রহগণ) একবার উপগ্রহণ স্থানীয় ও আপন আপন "উচ্চে" * যুগপৎ সমুপবিষ্ট হইতে এক 'কল্প' কাল অতীত হয়, ইহার পরিমাণ সৌর ৪৩২,০০০০,০০০ বৎসর !!

এক্ষণে এই সুদূরপরাহত কালের গণনা পরিত্যাগ করিয়া একটী সহজ গণনার বিবরণ পাঠকদিগের গোচর করিতেছি। গত জানুয়ারিতে 'মার্থ' নামক জনৈক ইংরাজ জ্যোতিষী একটী গণনা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ২১শে মার্চ্চ (৮ই চৈত্র) বুধবার শুক্রগ্রহ হইতে একটী 'বুধোপগ্রহণ' ও শনি হইতে একটী 'বুধোপগ্রহণ' ও একটী 'শুক্রোপগ্রহণ' যুগপৎ দৃষ্ট হইবে। পাঠকগণ সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ঐ দিবস দোল পূর্ণিমা ছিল, এবং সেই রজনীতে পৃথিবী হইতে চন্দ্রগ্রহণ লক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে ঐ দিবস পৃথিবী বুধ কিম্বা শুক্রের সহিত সমসূত্রস্থ হয় নাই; যদি তাহা হইত তবে আমরাও চন্দ্রগ্রহণ বুধোপগ্রহণ ও শুক্রোপগ্রহণ একত্রে দেখিতে পাইতাম, এবং শনিগ্রহ হইতে মঙ্গল ও বৃহস্পতি ব্যতিরেকে অপর গ্রহ সকলের চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হইত !!!

ইহা বলা হইল যে ২১ শে মার্চ্চ শুক্র হইতে বুধোপগ্রহণ এবং শনি হইতে বুধ ও শুক্র উভয়ের উপগ্রহণ গণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উঠিতেছে যে ঐ উপগ্রহণ দেখিবে কে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে সম্প্রতি ২১ শে মার্চ্চ অতীত হইয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান উপগ্রহণ দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না; ভবিষ্যতে যে সকল উপগ্রহণ গণিত হইবে এবং পৃথিবী ভিন্ন অপরাপর গ্রহ হইতে লক্ষিত হইবে বলিয়া প্রচারিত

* গ্রহ স্বীয় কক্ষের যে বিন্দুতে সূর্য্য হইতে সর্ব্বাধিক দূরস্থিত হয় সেই বিন্দুকে ঐ গ্রহের "উচ্চ" বলা যায়। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।)

হইবে, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করণার্থ একটী ‘গ্রহযাত্রী দল’ গঠন করা যাইবে! এই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ, যখন যে গ্রহ হইতে উপগ্রহণ লক্ষিত হইবে তখন সে গ্রহে যাত্রা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। গ্রহ যতই সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে ততই উপগ্রহণ দর্শনে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর প্রতিপন্ন হইবে; অতএব তাহার উৎকর্ষবিধানার্থ দূরবীক্ষণের দৃষ্টি শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা অতীব ব্যয়সাধ্য, বিশেষতঃ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাতায়াত আরও অধিকতর ব্যয়সাধ্য। যাঁহারা এই দলভুক্ত হইবেন তাঁহাদিগেকে জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে! হিন্দু পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা যাত্রী দল ভুক্ত হইবেন তাঁহাদের সুবিধা ও লাভ বহুবিধ, প্রধানতঃ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে গমন করিয়া প্রত্যক্ষতঃ স্ব স্ব ‘গ্রহাধিকার’ নির্দ্ধারিত করিয়া লইবার বিশেষ সুযোগ পাইবেন! যদি কেহ যাত্রী হইলে জাতিচ্যুত হইবার আশঙ্কা করেন তবে তাঁহারা ইহা জানিয়া স্বাশ্বস্ত হইবেন যে হিন্দুশাস্ত্রমতে ‘সমুদ্র যাত্রা’ নিষিদ্ধ হইলেও ‘গ্রহ যাত্রা’ নিষিদ্ধ নহে; এবং গ্রহাধিকার মতে গ্রহযাত্রার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ তদ্দ্বারা সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া ‘গ্রহশান্তি বিধান’ করা যাইতে পারিবে। যাহাতে যাত্রাকালে বৃথা সময়ক্ষেপ না হয় এবং কার্য্যকালে কেহ অকুশলতার পরিচয় প্রদান না করেন এই হেতু এখন হইতেই ‘যাত্রীদল’ গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দল ভুক্ত হইয়া যদি কেহ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তবে শিক্ষার ভার গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাঠকদিগের ভিতরে কেহ ‘গ্রহযাত্রী’ হইতে প্রয়াসী আছেন কি?

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

শ্যামের রাজান্তঃপুর।

ফাল্গুণ মাসের ভারতীতে আমরা শ্যামের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, আজ আমরা শ্যামের রাজপুর মহিলা সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের গোচর করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী লিয়োনাওয়েনস্ শ্যামের "নামহারম" অর্থাৎ "অবগুণ্ঠনবতী" দিগের নগর সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমতী লিয়োনাওয়েনস্ সামান্য রমণী নহেন, তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত শ্যামরাজকুমারীগণের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং শ্যামরাজের অন্তঃপুর সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে অতএব আশা করা যায় তাঁহার বর্ণিত বিবরণ অযথার্থ কিম্বা অতিরঞ্জিত নহে।

তিনি বলেন শ্যামরাজের প্রাসাদাভ্যন্তরে যে অংশে রমণী ও শিশুগণের বাস তাহা সুদীর্ঘ সমান্তরাল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাসাদের এই অংশ একটি সুবিস্তীর্ণ এবং সুসজ্জিত নগরের ন্যায় জনপূর্ণ ও শোভাময়। ইহার ভিতর সুন্দর সরল রাজপথ, সুদৃশ্য বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন নেপথ্য, কমনীয় কুঞ্জবন, আতট জলপূর্ণ সরোবর, শ্যামল দূর্ব্বাদল শোভিত সমতল ক্ষেত্র ও নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে; এবং সমুন্নত সৌধশিখরে রাজবধূগণ, শ্যামরাজের অগণ্য বালিকাবৃন্দ ও রাজ আত্মীয়াবর্গ সহচরী এবং ক্রীতদাসী সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছে। প্রভাত সূর্য্যের নবীন কিরণ যখন প্রাসাদের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী ঘন পল্লবপূর্ণ নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর উর্দ্ধে শোভমান নীলবর্ণানুরঞ্জিত সৌধ কিরীটে প্রতিফলিত হয় তখন সেই সমুজ্জ্বল প্রাসাদ শিখরগুলি দর্শকগণের মুগ্ধ নয়ন সমক্ষে নীলকান্তমণির আভা ফুটাইয়া তুলে। এই সুরম্য হর্ম্ম্যের পরই প্রাচীন প্রাসাদ অবস্থিত। কুলকামিনীগণ যাহাতে অন্যের অদৃশ্য থাকিয়া গমনাগমন করিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে ইহাতে গুপ্তদ্বার সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। দ্বারপথে এক বিশাল সিংহমূর্ত্তি, তাহার মুখবিবরে একখানি দীর্ঘ তরবারী প্রবিষ্ট করা হইয়াছে এবং তাহার পদতলে একটি শ্যামের কবিতা লিখিত আছে, কবিতাটির অর্থ এই "তোমার মুখগহ্বরে তরবারী প্রবেশ করান অনুচিত হয় নাই যেহেতু তোমার মুখ হইতে স্বর্গের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে একটি কথাও বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।"—শ্রীমতী লিয়োনায়েনস্ ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথাই ব্যক্ত করেন নাই।

এই দ্বারপথের অনতিদূরেই রমণীসৈন্যের সেনা-নিবাস, স্ত্রীবিচারালয় ও তৎসংলগ্ন স্ত্রীকারাগার। এই বিচারালয়ে স্ত্রীবিচারকগণ অপরাধিনী রমণীবর্গের বিচার করেন এবং

বিচারালয় প্রাঙ্গনস্থ কারাগারে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখা হয়। কারাগারের পরই ভাস্কর নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ উন্নত মন্দির, তাহার বহুদুর বিস্তৃত অন্ধকারময় গ্যালারী প্রাচীন স্থপতি বিদ্যার গম্ভীর মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এইখানে শ্রীমতী লিয়োনাওয়েনস্ রাজকুমারীগণকে শিক্ষাদান করিতেন। ক্রমে ব্যায়ামক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রঙ্গমঞ্চে উপনীত হইতে হয়, এখানে রাজকুমারীগণ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গ প্রত্যহ অপরাহ্নে সমবেত হইয়া নানাবিধ গল্প ও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন এবং কখন কখন রূপসী নর্ত্তকীবৃন্দের নুপুর শিঞ্জন ও মধুর কণ্ঠের বিলাসসুন্দর সঙ্গীত উপভোগে জীবনের সুখময় অবসর অতিবাহিত করেন।

এই বিচিত্র ললনানগরীর দক্ষিণাংশ পুঞ্জীভুত জনকোলাহলে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই অংশে রাজমহিষী, কুমারী এবং রাজপুরমহিলা ও বালিকাগণের অগণ্য ক্রীতদাসী তাহাদের স্বামিনীর জন্য বিবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে। প্রাসাদস্থ রমণীগণের সকলেরই নিজ নিজ উপার্জ্জনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর, আর শুধু তাহাই নহে, ইহাদিগের ব্যবস্থা-প্রণালী, বিচারক, শান্তিরক্ষক, প্রহরী, পণ্যবীথিকা, বিক্রেতা, দালাল, শিক্ষক, এবং রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র। জীবন ধারণোপযোগী সমস্ত কার্য্যই ইহারা স্বতন্ত্ররূপে এবং স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ভুতপূর্ব্ব প্রধান স্ত্রী-জজ "খুন-থাও য়্যাপের" ত নাম বিখ্যাত। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মশীলা এবং ন্যায়ানুরক্তা ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে এমন গাম্ভীর্য্য এবং আকৃতিতে এরূপ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত যে আশ্চর্য্য হইতে হইত। স্ত্রীলোক হইলেও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তিনি কোন কথা উচ্চারণ করিতেন না; রাজান্তঃপুরে যাহা কিছু ঘটিত সমস্তই তাঁহার বিদিত ছিল, কিন্তু সমস্ত কথাই তিনি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিতেন। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতাগুণেই তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে এই উন্নতপদে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়া বিনাড়ম্বরে অতি পারদর্শিতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, তিনি গোপনে কোন বিচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি কোনপ্রকার জাঁকজমকের পক্ষপাতী ছিলেন না, চারিজন মাত্র দাসীর সহিত একখানি ক্ষুদ্র গৃহে সামান্য রমণীর ন্যায় বাস করিতেন।

এই স্ত্রীনগরের অভ্যন্তরে রাজা এবং রাজপুরোহিতবর্গ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাজা ও রাজপুরোহিতবর্গ প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া নগর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন, প্রহরীগণ ভিখারিণীদের ভিক্ষা প্রদান করে। যে সকল ক্রীতদাসী এই নগরের পুরমহিলাগণের পরিচারণে নিযুক্ত থাকে, তাহারা তাহাদিগের স্বামী সন্দর্শনের জন্য প্রায় সর্ব্বদাই এই নগরের বহির্দ্দেশে নিজ নিজ গৃহে যাইতে পারে কিন্তু কোন পুরনারীই এই নগরের বাহিরে পদার্পণ করিতে সমর্থ নহেন, তবে তাঁহারা প্রাসাদ, মন্দির কিম্বা উদ্যানের গুপ্ত দ্বার দিয়া ইতস্তত যাতায়াত করিয়া থাকেন। এই নগরের জনসংখ্যা প্রায় নয় সহস্র। রমণীগণ অনেকে সকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ

অভ্যন্তরস্থ প্রমোদকাননে একত্র সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হন, কেহ ফুলের মালা গাঁথিয়া বালক বালিকাদিগকে সজ্জিত করেন, কেহ ফুলের তোড়া প্রস্তুত করেন, অন্যদিকে একদল বসিয়া কেহ পালিত পক্ষীর নিকট কিম্বা জলপাত্র রক্ষিত সুরঞ্জিত মৎস্যের সম্মুখে খাদ্য নিক্ষেপ করেন, কেহ গুণ গুণ স্বরে গান করেন, কেহ বা ক্রীতদাসীদের সুর করিয়া পুঁথি পড়া শুনিয়া আমোদ অনুভব করেন। তাস পাশা এবং সতরঞ্চ ক্রীড়াতেও অনেকে সুপণ্ডিত, অতএব তাহাও অল্প বিস্তর পরিমাণে চলিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে কোন কোন দিন পুরনারীগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রমোদকাননবর্ত্তী লতাবিতানে বেষ্টিত নিভৃত সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া দুঃসহ গ্রীষ্মজ্বালা প্রশমিত করেন। তখন বুঝি সত্যই মনে হয়,

"জলের পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপ খানি,
সরমহীন আরাম সুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি।"

আমাদের দেশের সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্যাম রমণীগণের হৃদয়ও দারুণ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। একদিন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী লিয়োনাওয়েন্সকে ডাইন ও ভূত প্রেতের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং ডাইনীদের যে অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একটি গল্প বলিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ডাইন ও ভূত প্রেত ছাড়ানর অনেক গল্প অনেকের জানা আছে, তথাপি শ্যামদেশের এই ডাইন ছাড়ানর গল্পটি পাঠক পাঠিকাগণের অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া বোধ হয়; আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

একদা শ্যামরাজ ব্যাঙ্কক হইতে বিজিপুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় একদিন উপরোক্ত রমণীনগরে এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক রমণীর আবির্ভাব হইয়াছিল; প্রবাদ, একদিন রাত্রে হঠাৎ সে রাজকুমারী বিথিতাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হয় এবং রাজকুমারীর পরিচারিকা মে-পিয়া নামক একটি যুবতীকে মূক ও বধির করিয়া রাজকুমারীর কক্ষে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন অনেকের সন্দেহ হইল মে-পিয়া নিজে একজন ভয়ানক ডাইনী এবং রাজকুমারীর নিরুদ্দেশের কারণ সে ভিন্ন অন্য কেহ নহে। বলা বাহুল্য তখনই মেপিয়া অন্ধকারময় কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইল। যে দুইটি রমণী-প্রহরীর উপর সেই দিন রাজকুমারীর কক্ষ পাহারা দেওয়ার ভার ছিল, তাহারাও কর্ত্তব্য কর্ম্মে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য মে-পিয়ার সহিত কারারুদ্ধ হইল! কিন্তু কয়েকদিন কারাগারে বাস করিয়াই তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে বাহির করিয়া বিচারের জন্য বিচারালয়ে আনয়ন করা হইল। অনন্তর রাজার বেতনভোগী

জ্যোতিষীগণ এবং ডাইন, ডাইনী ও ওঝার দল ধীরে ধীরে আসিয়া বিচারালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রধান বিচারপতি উপস্থিত হইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার সহকারী এই সংবাদ রাজসমীপে প্রেরণ করিবার জন্য আমূল বৃত্তান্ত লিখিতে লাগিলেন। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য, বিচারকের সম্মুখে অপরাধিনীত্রয় এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পঞ্চাশজন স্ত্রীসেনা সশস্ত্র দণ্ডায়মান ছিল। সকলেরই বিশ্বাস মে-পিয়া পাকা ডাইনী, রাজকুমারীকে চুরী করার পরই তাহার ছদ্মবেশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহার প্রতি কি দণ্ড বিধান করা হয় জানিবার জন্য সকলেই উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একজন প্রধান 'গুণী' ব্যক্তি কয়েকটি কড়ি মন্ত্রপূত করিয়া বনদেবতার উদ্দেশে ছড়াইয়া ফেলিল। আর দেখিতে দেখিতে বনদেবতা নদীর পরপারে আসিয়া দর্শন দিল এবং এক ডুবে নদী পার হইয়া বিচারপতির সম্মুখে উপ[illegible] হইল। এই বনদেবতার আকার বনমানুষের মত, কিন্তু মুখখানি সুন্দর। রাজ্যের কোন আধ্যাত্মিক রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে হইলেই রাজ[illegible]চারীগণ এই অমানুষ মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। বনদেবতা আসন গ্রহণ করিলে বিচারক স্ত্রীপ্রহরীদ্বয়ের জবানবন্দী লইতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা বলিল, যে দিন রাজকুমারী অদৃশ্য হন সেই দিন রাত্রে তাহারা প্রাসাদ প্রাঙ্গনে এক বিকটাকার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল; এক হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ও অন্য হস্তে কতকগুলি চাবি লইয়া সে ধীরে ধীরে দালানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি গভীর, সমস্ত রাজপুরী সুষুপ্ত, এবং আলোকমালা নির্ব্বাপিত প্রায়। সেই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ম্লান আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল এই ভীষণ মূর্ত্তি ক্রমে রাজকুমারীর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি চাবিদ্বারা দ্বরোদ্ঘাটনপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল; তাহারা নিশ্চল ছবির ন্যায় দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল কিন্তু ভয়ে তাহারা এতই আড়ষ্ট হইয়াছিল যে কোন প্রকারে প্রতিবন্ধক করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। যাহা হউক অল্পক্ষণ পরেই সেই ভীষণ মূর্ত্তি আবার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু একাকী; কুমারী তাহার সঙ্গে ছিলেন না। সে তাড়াতাড়ি কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। পরদিন প্রভাতে সেই গৃহকক্ষে কুমারীর পরিবর্ত্তে মে-পিয়াকে পাওয়া গিয়াছে, অতএব মে-পিয়াই ছদ্মবেশিনী ডাইনী, সে ভিন্ন অন্য কেহই রাজকুমারীকে স্থানান্তরিত করে নাই।

মে-পিয়ার প্রতি সাধারণের সন্দেহ গভীরতর হইয়া উঠিল। ওঝা এবং ডাইনীগণ তাহাকে কুমারী সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন কথার উত্তর করিল না; তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিচারকগণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাড়াতাড়ি সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে ইহা জানাইবার জন্য তাহার পশ্চাদ্দেশে প্রবলবেগে ঘণ্টাধ্বনি করা হইল। ঘণ্টা শব্দে চমকিত হইয়া রমণী পশ্চাদ্দিকে মুখ

ফিরাইলে বিচারকগণ বলিলেন, তুমি নিশ্চয়ই কথা কহিতে পার ; কারণ, বুঝিতে পারা যাই তেছে তুমি কালা নহ। কিন্তু এ কথাতেও কোন ফল না হওয়ায় তাহার উপর ঘোর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া বনদেবতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, তোমরা ইহার উপর অত্যাচার করিও না, এই স্ত্রীলোক কথা কহিতে পারিবে না, এ নিজে ডাইনী নহে, ইহাকে ডাইনে পাইয়াছে। এই কথা শুনিয়া যে সকল স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন ; তাহারা প্রস্তাব করিলেন, যদি মন্ত্রপূতঃ জল ইহার গলাধঃকরণ করান যায়, তাহা হইলেই ডাইনী ছাড়িয়া যাইবে। একজন তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিতে গেল, কিন্তু মুখের ভিতর তাকাইয়াই "ব্রহ্ম, ব্রহ্ম" শব্দে চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিল এবং বলিল, ডাইনীতে তাহার জিহ্বা ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তখন তাহার প্রতি সকলেরই মমতা জন্মিল, এবং তাহারা বুঝিতে পারিল সে প্রকৃতই নির্দ্দোষী, ডাইনে শুধু কুমারীকে লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই তাহারও এই প্রকার ভয়ানক দুর্দ্দশা করিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইল, এবং অভিযুক্ত রমণীগণ পুরস্কৃত হইয়া বিদায় লাভ করিলেন।

শ্রীমতী লিয়োনাওয়েন্স লিখিয়াছেন, এই ডাইনী ঘটিত মকদ্দমার গুপ্তরহস্য পরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, মে-পিয়াই নিজে রাজ-কুমারীকে তাঁহার প্রিয়তমের নিকট গুপ্তভাবে লইয়া গিয়াছিল ; পাছে কেহ তাহাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া ফেলে এবং উৎপীড়ন দ্বারা সমস্ত সত্য কথা বাহির করিয়া লয় এই ভয়ে সাবধানতার জন্য সে নিজের জিহ্বা নিজেই কর্ত্তন করিয়াছিল।

এই গল্পে ডাইনীদের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যাউক না যাউক শ্যামের রাজান্তঃপুরে যে প্রভু-মহিলাদিগের জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জ্জনক্ষম পরিচারিকার অভাব নাই, তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মিনতি।

কোথা, নাথ, কোথা তুমি,
আছ কোন দূরে ?
একবার এস, সখা,
এ হৃদয় পুরে !
বাঁচিবারে নাহি সাধ,
মরিবারে বল ;
নাহি সুখ নাহি আশা
নাহি অশ্রুজল।
আছিল আমার যারা ?
চলে গেল ভুলে ;
পরিহারি একা এই
শ্মশানের কূলে !
যা'কিছু আছিল, সখা,
আমার এ ভবে,
শোকের উত্তর বায়
নিয়ে গেল সবে ;
ঢাকিল রবির মুখ
কুহেলিকা জালে,
মলিন চাঁদের হাসি
নীহারের মালে !
ফুল গেল পাখী গেল,
সব গেল চলে,
হৃদয় সে ডুবে গেল
তুষারের তলে !
কপোলে ললাটে আর
অনাবৃত শিরে,
হিম হস্ত বুলাইয়া
দিয়ে গেল ধীরে।

এখন যেদিকে চাই
কিছু নাহি আর,
কেবল শীতল স্তব্ধ
তুষারের ভার।
নাহি আলো নাহি গান,
নাহি অশ্রু জল,
আছে শুধু নিদারুণ
শুষ্ক হাসি-ছল।
শিথিল হয়েছে দেহ,
অবসন্ন প্রাণ,
কাণে বাজিতেছে শুধু
প্রলয়ের তান !
এমনি করে কি ধীরে
আসিবে মরণ ?
অচেতনে অনিচ্ছায়
নাশিবে জীবন !
রুদ্ধ কণ্ঠে একটীও
ফুটিবে না বাণী ;
মহা শূন্যে—যাব ডুবে
কোথায় না জানি !
এই এ ভীষণ মৃত্যু,
অন্ধ অবসান ;
ইহারেই হবে দিতে
এ মোর পরাণ !
না না নাথ, তুমি এস
এস দয়া করে,
তুষার গলিয়া যাক,
তব প্রেম-করে !

তার পরে দিও, মৃত্যু
মৃত্যুর লাগিয়ে,
কাঁদিছে জীবন সদা
শরণ মাগিয়ে।
যে মরণে তুমি, নাথ,
রবে চির সাথে,
উপহার দিব প্রাণ
তব স্নেহ হাতে।
ইচ্ছা যদি হয়, সখা,
দিও দুঃখ তাপ,
দিওনা দিওনা শুধু
ওই অভিশাপ!

ওই শুভ্র হিমময়
তুষারের হাসি,
তুমি হারা আত্ম-হারা
চরাচর গ্রাসী!
মৃত্যু হীন মৃত্যু আর
প্রাণহীন প্রাণ—
আমার হৃদয়ে যেন
নাহি পায় স্থান!
আর কিছু নয় শুধু
দিও অশ্রুধার,
তোমার চরণ তলে
দিতে উপহার।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির।

(৫)

আমরা "দৃগ্‌-যন্ত্র" গৃহ পরিত্যাগ করিরা তৎপার্শ্বস্থ অপর একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহাতে একটী "প্রতিফলক দূরবীক্ষণ" (Reflcctor) ছিল; ইহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলেও তৎকালে কোন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ দূরবীক্ষণের আদর এত কমিয়া আসিয়াছে যে একমাত্র আয়র্লণ্ডনিবাসী লর্ড রশের মানমন্দির ভিন্ন অপর কুত্রাপি এইরূপ যন্ত্র কোন বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে দেখা যায় না। প্রতিফলক দূরবীক্ষণ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে;—নিউটন, হর্শেল, ও গ্রেগরি এই তিন ব্যক্তি যথাক্রমে উক্ত ত্রিবিধ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। নিউটনের যন্ত্রে, দূরবীক্ষণের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পর্য্যবেক্ষণকারীকে তদভ্যন্তরে নেত্রপাত করিতে হয়; হর্শেলের যন্ত্রে দূরবীক্ষণের ঊর্দ্ধভাগ হইতে কিঞ্চিৎ মস্তক হেলাইয়া তাহার অধোপ্রান্তভাগের দিকে নেত্রপাত করিতে হয়; এবং গ্রেগরির যন্ত্রে সাধারণ দূরবীক্ষণের ন্যায় তাহার নিম্নপ্রান্তে নেত্রসংযোগ করিয়া ঠিক নক্ষত্রের স্থিতিব্যপদেশে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইহাই ঐ ত্রিবিধ যন্ত্রের মধ্যে বিশেষতম পার্থক্য; অপর সকল বিষয়ে ইহারা অনেকটা একরূপ।

অনেকেই ইহা জ্ঞাত আছেন যে, আলোক যতই 'বিস্ফারিত' (Refracted) হইতে থাকে ততই তাহাতে 'বর্ণ-বিশ্লেষণ' (Dispersion) উৎপন্ন হয়; কারণ, সাধারণতঃ যে আলোক শ্বেত কিম্বা ঈষৎ রক্তিমাভ বলিয়া অনুভূত হয় তাহা বাস্তবিক নানা বর্ণের রশ্মিমালার ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান এবং পরস্পর সম্মিলনহেতু ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যদি ঐ আলোককে কোন উপায়ে বিস্ফারিত করা যাইতে পারে তবে দেখা যাইবে যে ঐ সকল সম্মিলিত রশ্মিমালা ক্রমে বিস্ফারিত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অতএব তাহাতে একটী সুবিস্তৃত নানা বর্ণের 'আলোক-দৃশ্য' প্রতিভাত হয়। এই অলৌকিক 'আলোক-দৃশ্য'কে Spectrum বলা যায়। ইহা হইতে লক্ষিত হইতেছে যে যেখানে বিস্ফারণ ঘটিবে সেখানেই বিশ্লেষণ কার্য্য ঘটিবে।

দূরবীক্ষণের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য এই যে, তাহাতে দূরসমাগত আলোক-জালকে বিস্ফারিত করিয়া তাহার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব, যে সকল বস্তু হইতে আলোক আসিয়া দূরবীক্ষণে প্রবেশ করে তাহারা দূরত্বহেতু ক্ষুদ্র লক্ষিত হইলেও আলোক বিস্ফারণহেতু তাহাদের আকৃতি বৃহত্তর অনুভূত হইয়া থাকে। এ কারণ দূরের বস্তু বিশিষ্টরূপ লক্ষিত করণার্থেই দূরবীক্ষণের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্বভাবতঃই অনুমিত হইতে পারে যে দৃষ্টবস্তুর এই বিস্ফারিত প্রতিকৃতি অপেক্ষাকৃত বিশ্লেষিত হইয়া তাহাকে নানা রঙ্গে রঞ্জিতভাবে নয়নগোচর করাই। বস্তুতঃ নিউটনের পূর্ব্বে যে সকল দূরবীক্ষণ ব্যবহৃত হইত তাহাতে দৃষ্টবস্তুর প্রতিকৃতি বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণের রেখা সকল বিরাজ করিতে দেখা যাইত। কিন্তু ইহাতে বস্তুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া চিদানন্দ বর্দ্ধন করিলেও তাহাতে জ্যোতির্ব্বিদের কার্য্য সফল হইত না;—তাহাতে বস্তুর প্রতিকৃতি সম্যক্‌ বিশুদ্ধরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইত না। নিউটন প্রথম এই অসুবিধা বিদূরণ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি একটী বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

নিউটন বিজ্ঞানজগতে অতি অল্পসংখ্যক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে তাঁহার ভ্রম সকলও জগতের অনেক উপকারে আসিয়াছে! আমার একজন শিক্ষক একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, নিউটনের সত্যাবিষ্কার হইতে তাঁহার ভ্রমগুলি অধিক কার্য্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ তাঁহার প্রত্যেক ভ্রমই তাঁহাকে এমত সকল বিষয়াবিষ্কারে নিয়োজিত করিয়াছে যাহা অন্যথা জগতে আবিষ্কৃত হইত কিনা সন্দেহের স্থল। সেই জন্যই নিউটনের ভ্রমাবিষ্কার জগতে এক একটী মহৎ কীর্ত্তিরূপে পরিগণিত হইতেছে। তাঁহার যে ভ্রমটীর বিষয় উল্লিখিত হইল তাহা এই, তিনি মনে করিতেন, যে বস্তু হইতে আলোক নিঃসৃত হইতে দেখা যায় তাহার পরমাণু সকল তাহা হইতে স্খলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহা আমাদের নেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে আলোক সঞ্চার করে। আমরা এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছি যে ইহা একটী ভ্রান্ত মত।

প্রকৃতপক্ষে পরমাণু সকল ঈষৎ বিকম্পিত হইলে তাহাদের আন্দোলিত গতি জগৎব্যাপ্ত একটী অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম 'ঈথর' নামক পদার্থে সঞ্চারিত হয়, এবং তাহা ক্রমবিক্ষিপ্ত হইয়া নেত্রে প্রবিষ্ট হইলেই আলোক-জ্ঞান উৎপাদন করে। শেষোক্ত মত যুক্তি ও ও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। নিউটন গবেষণাদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার 'পারমাণবিক আলোকজনয়ন' মতানুসারে ইহা সপ্রমাণিত হইতে পারে না যে আলোকের বিশ্লেষণ বিদূরিত করিলে বিস্ফারণ তিষ্ঠিতে পারিবে! ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দূরবীক্ষণে আলোক বিস্ফারণদ্বারা প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতে হইলে তদানুসঙ্গিক বিশ্লেষণজনিত রঙ্গীন আবরণ পরিহার করা সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ইহা নিউটনের একটী বিষম ভ্রম; কারণ এক্ষণে সাধারণ দূরবীক্ষণ মাত্রই এমতভাবে নির্ম্মিত হয় যাহাতে বিশ্লেষণ অপনোদিত হইয়া কেবল বিস্ফারণের কার্য্য সম্পন্ন করে। এই প্রক্রিয়া সাধারণতঃ "বিশ্লেষণাপনোদন" (Achromatism)* নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইটী ভিন্ন প্রকৃতির কাচখণ্ড পরস্পর পৃষ্ঠসংলগ্ন করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির কাচ শিল্পবলে নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়, একারণ তাহারা অতীব ব্যয়সাধ্য। নিউটন এ কার্য্য অসম্ভব বিবেচনা করিতেন কারণ তাঁহার 'পারমাণবিক' মতানুসারে ইহা অপ্রমাণিত হয় যে এইরূপ ভিন্ন প্রকৃতির কাচ থাকিতে পারে যাহার সংযোগে বিস্ফারণ বজায় রাখিয়া বিশ্লেষণ অপনীত হইবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর নিউটন এই গবেষণাতে প্রবৃত্ত হইলেন যে দূরবীক্ষণে সুবৃহৎ কাচ ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এমন কোন উপায় অবলম্বন করা যায় কি না যাহাতে বিশ্লেষণ ঘটিতে না পারে। এই গবেষণার ফলস্বরূপ জগতে 'প্রতিফলক দূরবীক্ষণের' অভ্যুদয় হইল! তাই আমার শিক্ষক মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, নিউটনের ভ্রম সকল হইতে এমত আবিষ্ক্রিয়া সকল অভ্যুদিত হইয়াছে যাহা অন্যথা হইতে পারিত কি না সন্দেহের স্থল!

প্রতিফলক দূরবীক্ষণের অধোপ্রান্তে এক খণ্ড দর্পণ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, ইহার 'প্রতিফলন-মুখ' দূরবীক্ষণের ভিতরের দিকে অর্থাৎ দৃষ্টবস্তুর দিকে প্রসারিত। এই দর্পণ সাধারণ দর্পণের ন্যায় সমান্তরাল নহে; ইহা সর্ব্বাংশে ঈষৎ 'বর্ত্তুলিত' (অর্থাৎ একটী বর্ত্তুলের পৃষ্ঠদেশ হইতে অংশবিশেষ কর্ত্তন করিয়া লইলে যেরূপ হয় ইহা তদনুরূপ!) ইহা হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ দূরবীক্ষণাভ্যন্তরে স্থলবিশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। এই কেন্দ্রস্থলে অপর একখণ্ড ক্ষুদ্র দর্পণ স্থাপন করিলে তাহাতে দৃষ্টবস্তুর একটী সোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পতিত হয়; ইহা প্রত্যক্ষ করণার্থ দূরবীক্ষণের 'দৃষ্টিখণ্ড'†

* কেহ যদি এই শব্দটীকে সুবোধ্য অথচ সংক্ষেপ করিয়া দিতে পারেন একান্ত বাধিত হইব।

† দূরবীক্ষণের যে দিকে নেত্র সংযোগ করিতে হয় সেই দিকস্থ কাচখণ্ড সমূহের সমষ্টিকে 'দৃষ্টিখণ্ড' কহে।

(Eye-piece) এমতভাবে নিবদ্ধ করা হয় যেন তাহার কেন্দ্র ঠিক উক্ত প্রতিবিম্বে পতিত হয়। যে দর্পণেতে আলোক প্রথম প্রতিফলিত হয় তাহা দূরবীক্ষণে 'বস্তুখণ্ডের' কার্য্য করে; প্রতিফলক দূরবীক্ষণে ইহাকে 'বৃহদ্দর্পণ'* বলা যায়। এবং যাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হয় তাহাকে 'অনুদর্পণ' কহে।

নিউটনের দূরবীক্ষণের 'অনুদর্পণ' সমান্তরাল, গ্রেগরীর দূরবীক্ষণের 'অনুদর্পণ' বর্ত্তুলিত হইয়া থাকে; কিন্তু হর্শেলের যন্ত্রে তাহা একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। অনুদর্পণের স্বরূপ ও স্থিতি এবং (হর্শেল-যন্ত্রে) তাহার অনুপস্থিতি অনুসারে 'দৃষ্টিখণ্ডের' স্থিতিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ইহাই তিন জাতীয় প্রতিফলকযন্ত্রের পার্থক্য নির্দ্দেশ করে।

গ্রীণ্‌উইচের যন্ত্রটী "নিউটন-জাতীয়।" যেহেতু দর্পণ নির্ম্মাণ করা তত কঠিন ব্যাপার নহে, অতত্রব প্রতিফলক যন্ত্র তত অধিক ব্যয়সাধ্য হয় না। কিন্তু তাহাতে আলোকের মাত্রা হ্রাস হয়; এবং ধাতুনির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া তাহা অল্পকালের মধ্যেই মলিন হইয়া যায়। এই সকল কারণে ঐ যন্ত্রের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে গ্রীণ্‌উইচের যন্ত্রটী এক্ষণে ব্যবহার করা হয় না। এতদ্ভিন্ন তথায় অপর একটী প্রতিফলক আছে।

ল্যাশেল্ নামক জনৈক সুবিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ প্রতিফলকের বৃহদ্দর্পণের উন্নতি সাধনকল্পে বহু যত্ন ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া নিজব্যয়ে একটী ৩০ ফিট্ দীর্ঘ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জাতীয় যন্ত্র মধ্যে ইহা আয়তনে তৃতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে। (পূর্ব্বোক্ত লর্ড রসের যন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ!) ল্যাশেল্ কয়েক বৎসর ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক আবিষ্ক্রিয়া সাধন করিয়াছেন। প্রতিফলক দূরবীক্ষণ ইংরাজ জাতির স্বকীয় সম্পত্তি। ইহা ইংরাজ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং ইংরাজ রাজ্যেই উন্নতিলাভ করিয়াছে। য়ুরোপের অপর কুত্রাপি ইহার প্রতিপত্তি অথবা বিস্তৃতি লক্ষিত হয় না। সম্প্রতি ইংলণ্ডেও ইহার হতাদর হইতে চলিয়াছে দেখিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক ল্যাশেলের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে; বিশেষতঃ নিউটনের একটী আবিষ্ক্রিয়া কালের চিরবিস্মৃত সলিলে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে ইহা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক অসহনীয় মনে করেন! হৃদয়ের আবেগে ল্যাশেল্ স্বীয় দূরবীক্ষণটী স্বজাতির নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া গ্রীণ্‌উইচ্-মানমন্দিরে প্রতিষ্ঠার্থ দান করিয়াছেন! ইহা মানমন্দির-শৈলের এক প্রান্তে একটী নবনির্ম্মিত গুম্বজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যখন গ্রীণ্‌উইচ্ দর্শনে গিয়াছিলাম তখন পর্য্যন্ত ইহার স্থাপনাকার্য্য সমাধা হয় নাই। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম তাহা পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

---

* ইংরাজিতে ইহাকে speculum কহে।

সাহিত্যে পলিটিক্‌স্।

মাঘ মাসের "সাহিত্যে" সহযোগী সাহিত্যের অন্তর্গত "প্রজানীতি; কংগ্রেস" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

কংগ্রেসের সহিত সহযোগী সাহিত্যের কি সম্বন্ধ প্রথমতঃ সেই কথাই অনেকের বোধগম্য হয় না। সাহিত্যের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নাই অনেকের এই বিশ্বাস। কিন্তু এ আপত্তি গুরুতর নহে। সাহিত্যের দোহাই দিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন উপলক্ষ্য করিয়াই হউক, পলিটিক্স লইয়া নাড়াচাড়া অনেকে করিয়া থাকে। পলিটিক্স বেওয়ারিসী মাল। যাহার যখন ইচ্ছা পলিটিশান হইয়া উঠিতে পারে। অভিজ্ঞতা না থাকিলে আরও শীঘ্র পারা যায়, কেন না কোন বিষয়ে কিছু জানা না থাকিলে সেই বিষয়ে দুই দশটা কথা অবলীলাক্রমে বলা বা লেখা যায়। যাহার ইচ্ছা সেই পলিটিক্সে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে ইহাতে ক্ষোভের কারণ হইতে পারে কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

এ পর্য্যন্ত "সাহিত্যে" পলিটিক্স লইয়া কোনরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রেই পলিটিক্সের ছড়াছড়ি। "সাহিত্যের" লেখক ও পাঠকগণ এই মাসিক-পত্র হইতে সাহিত্যের বিশুদ্ধ আমোদেরই আশা করেন। কেহ কেহ পলিটিক্স হইতে কিয়ৎকাল নিবৃত্তি লাভ করিবার ইচ্ছায় "সাহিত্যে" লিখিয়া থাকেন এবং "সাহিত্য" পাঠ করিয়া থাকেন। দুরদৃষ্টক্রমে প্রমাণিত হইয়াছে যে পলিটিক্স শুদ্ধ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের একচেটিয়া নহে, সাহিত্যসেবক মাসিকপত্রেরও অঙ্গ বটে। শুধু তাহা নহে। প্রকারান্তরে এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে পত্রের প্রধান উদ্যোগী ও লেখকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতবিদ্য স্বদেশবৎসল সজ্জনসমূহ সেই পত্র কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা গৌরবের অথবা ক্ষোভের এবং লজ্জার কথা "সাহিত্যের" লেখক ও পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে বিরক্তির কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের জন্মাবধি এরূপ কথা শুনিতে হইতেছে। স্যর আক্‌লাণ্ড কল্‌ভিন হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্য্যন্ত দেশের শাসনকর্ত্তারা কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় প্রতিদিন একই ধুয়া—কংগ্রেস নিপাত যাউক। কতিপয় কুঞ্চিতনাসা কৃষ্ণকায় দেশীয় সংবাদপত্রলেখকগণও সেই আশীর্ব্বাদ করেন। "সাহিত্যের" প্রবন্ধলেখকও এই দলবহির্ভূত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কংগ্রেস বা পঞ্চায়েত শীঘ্রই অপদস্থ হইবেন; অচিরাৎ পঞ্চত্ব পাইবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণী নূতন নহে। বিস্তর শাপে বর হয়। কংগ্রেসের

মৃত্যুর বা ব্যাধির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না—দীর্ঘ জীবনের আশঙ্কাসূচক বহু লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি কংগ্রেসের উপর কটাক্ষ হইল তাহা হইলে যাঁহাদিগকে লইয়া কংগ্রেস তাঁহারাই বা রক্ষা পাইবেন কেন? লাহোর কংগ্রেসের "প্রেসিডেণ্ট মিঃ দাদাভাই নৌরজী হইতে মিঃ মূল্যহীন* 'নোবডি' ডেলিগেট বাবুর" দল কেহই নিষ্কৃতি পান নাই। "মূল্যহীন নোবডি ডেলিগেট বাবুদিগের" মধ্যে বর্ত্তমান লেখক একজন। ডেলিগেটদিগকেও গালি আজ নূতন খাইতে হইতেছে না। লর্ড ডফরিণ হইতে অ্যাঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান ও কয়েকটী দেশীয় সংবাদপত্র ধারাবাহিক গালি দিয়া আসিতেছেন। "সাহিত্য" এখন সেই দলের পুষ্টি সাধন করিতেছে। এই মাত্র নূতন। কিন্তু এই নূতন সংবাদে "সাহিত্যের" লেখক, পাঠক ও গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে একটা গোল উপস্থিত হইতে পারে। যাহাতে সেরূপ না হয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের সেই এক মাত্র উদ্দেশ্য।

যাঁহারা কংগ্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নেতা তাঁহারাও এমন কথা বলেন না যে কংগ্রেসের সকল কথাই প্রতিবাদশূন্য অথবা সর্ব্ববাদিসম্মত। কংগ্রেসেই কোন কোন প্রস্তাব লইয়া মতভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু কংগ্রেস যে স্বদেশহিতৈষী ও তাহার উদ্দেশ্য সাধু এ বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একরূপ একমত। সকলে যে স্বার্থশূন্য উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগ দেয় এমন কথাও বলা যায় না। এমন মহাত্মাও আছেন যাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ বাৎসল্যের লেশ মাত্র নাই, অথচ লোকের চক্ষে পেট্রিয়ট্ হইবার আশায় কংগ্রেসের হুজুগে যোগ দেন। এমন মহাপুরুষও আছেন যিনি কংগ্রেসের নাম করিয়া নির্ব্বোধ ধনীদিগের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করেন। কিন্তু এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কংগ্রেসের জন্য অধিকাংশ লোকই নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করে, নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দান করে, নিস্বার্থভাবে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া থাকে। এই জন্যই কংগ্রেস এতদিন জীবিত রহিয়াছে এবং দিন দিন তাহার বলের উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

লেখক কংগ্রেসের বিপক্ষে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন তাহার উত্তরের কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। অভিযোগে অভিশাপে যদি কংগ্রেসের মৃত্যু হইত তাহা হইলে এত দিনে মরিয়া ভূত হইয়া বেড়াইত, প্রেতযোনির উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করিতে হইত। বাস্তবিক, "সাহিত্যে" এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত না হইলে কোন কথাই বলিবার আবশ্যক হইত না।

তথাপি দুইটি কথার উত্তরে কিছু বলা উচিত। প্রথম, লেখকের বক্তব্য যে বেহারের কয়েক জেলায় যে জরিপ হইতেছে তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন ক্ষতি নাই, অতএব কংগ্রেসে এ বিষয়ে কোন কথা উঠা উচিত নহে। ক্ষতি হইবার আশঙ্কা জমিদারের, রেয়তের নহে, কেন না জরিপের পাটা বর্ত্তমান থাকিলে জমিদার স্বেচ্ছামত জমি লইয়া টানাটানি করিতে

* "মূল্যহীন" ইংরাজী Worthless শব্দের অনুবাদ বুঝি! কিন্তু কথাটা বাঙ্গালায় শুনিতে কেমন হইল? প্রবন্ধের অনেক স্থলে ভাষার ছটা এইরূপ।

পারেন না। জমিদারের পক্ষপাত করিয়া কংগ্রেস রেয়তের ক্ষতি করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই কথা বিচার করিবার পূর্ব্বে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে কংগ্রেসের একটা না একটা দুর্ণাম চিরকালই আছে। কেবল দুর্ণাম দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে কোন কথা বলিবার সময় অতীত হইয়াছে। কিছুকাল কংগ্রেস ছিল হিউম সাহেবের—তাঁহার স্বার্থ এই যে তিনি কংগ্রেসের জন্য অকাতরে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত পর্য্যন্ত হইয়াছেন। তাহার পর কংগ্রেস হইল সংবাদপত্র লেখকগণের—তাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রজাকে উত্তেজিত করিয়া নাম কিনিতে চাহেন। এ কথাও অধিক দিন চলিল না। তাহার পর শুনিলাম উকীল বাবুদিগকে লইয়াই কংগ্রেস—তাঁহারা হাইকোর্টের জজিয়তি এবং ইংরাজের অর্দ্ধেক রাজত্ব চান। এখন "সাহিত্যের" এই লেখকের মুখে শুনিতেছি যে কংগ্রেস হিউম সাহেবের নহে, সংবাদপত্র লেখকগণের নহে, উকীল বাবুদিগের ও নহে, জমিদার রাজা বাবুরা টাকা দিয়া—ডেলিগেট বাবুর দল 'মূল্যহীন' হইলেও কংগ্রেসের একটা মূল্য আছে—কংগ্রেসকে বেনামী করিয়া কিনিয়া লইয়াছেন। এমন যত কথাই উঠুক শেষে গিয়া সেই এক কথায় ঠেকিবে—কংগ্রেস তোমার নহে, আমার নহে, এ দলের নহে, সে দলের নহে, প্রজার, দেশের, এবং সমগ্র জাতির। নহিলে কংগ্রেস এতদিন টিকিত না, কংগ্রেসের দ্বারা কোন ফলও হইত না।

সে কথা যাউক। বেহারে যে জরিপ হইতেছে তাহার প্রকাশ্য লক্ষ্য চিরবন্দোবস্তের উচ্ছেদসাধন নহে, এ কথা মানি। কিন্তু গবর্মেণ্ট যে কেবল রেয়ত ও কৃষিজীবিদিগের মঙ্গলকামনায় এই জরিপ করিতেছেন, এ কথা মানি না। গবর্মেণ্টের দৃষ্টি জমিদারের প্রতিও নাই, রেয়তের প্রতিও নাই, আছে কেবল রাজকোষের অর্থের দিকে। জমিদার সর্ব্বস্বান্ত হউক—রাজকোষে অর্থ আসিলেই হইল। কৃষিজীবি ঋণে ডুবিয়া উৎসন্ন যাউক—ভূমিকর প্রতি বৎসর বাড়িলেই হইল। এই বিশ্বাসের সর্ব্বত্রই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস থাকিলে জরিপের নাম শুনিলে আশঙ্কা ব্যতীত আহ্লাদ হয় না।

গবর্মেণ্ট কি রেয়ত ও কৃষিজীবিদিগের জন্য কোন চিন্তা করেন না? করিবেন না কেন! দেশে দেশে বৎসরে বৎসরে রিপোর্ট বাহির হইতেছে যে প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা ঐশ্বর্য্য দিন দিন বাড়িতেছে। বাড়িতেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষিজীবিগণ দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইতেছে। দোষ অবশ্য গবর্ণমেণ্টের নহে। কৃষিজীবি সম্প্রদায় টাকা রাখিতে জানে না, বিবাহাদিতে অত্যন্ত ব্যয় বাহুল্য, উত্তমর্ণের নিকট অধিক শুদে টাকা ধার করে, এইরূপ নানা কারণে কখন ঋণমুক্ত হইতে পারে না। তথাপি তাহাদিগের অবস্থার প্রতি গবর্মেণ্টের ঔদাস্য নাই। এই সে দিন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কৃষিজীবিগণ কেন এত ঋণগ্রস্ত কমিশনের প্রতি সেই বিচারের ভার পড়িয়াছিল। গবর্মেণ্ট কমিশনকে বলিয়া দিলেন, সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে, সকল বিষয়ে সাক্ষ্য লইবে কেবল রাজ-করের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। যে সময় Finance Committee নিযুক্ত

হয় সে সময়ও গবর্মেণ্ট বলিয়া দিয়াছিলেন যে সকল বিষয়েই ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করিবে, কেবল সেনানিবেশের ও পশ্চিম সীমান্তে দুর্গাদি সম্বন্ধে কোন কথা কহিবে না। সকল রোগের চিকিৎসা গবর্মেণ্ট এইরূপে করিয়া থাকেন। যদি হস্তে ব্রণস্ফোটক হয় তাহা হইলে গবর্মেণ্ট পা কিম্বা মাথা কাটিতে সম্মত কিন্তু ক্ষতস্থান কখন স্পর্শ করিবেন না। দুই শত বর্ষের ভিতর কৃষিজীবি দিগের আচার ব্যবহারে কোন প্রভেদ হয় নাই। বিবাহাদিতে পূর্ব্বে যেমন ব্যয় ছিল এখনও সেইরূপ। তবে ঋণ বাড়িল কেন? কারণের জন্য যে দিকে ইচ্ছা খুঁজিয়া দেখ, কেবল রাজকোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। তাহা হইলেই গবর্মেণ্ট বলিয়া উঠিবেন, আমরা ত কৃষিজীবিদিগের সর্ব্বস্ব লইতেছি না! জরিপে কতক ভয়ের কারণ দেখা যায়, ভরসার কোন কারণ দেখা যায় না। জরিপের ব্যয়ভার প্রায় সমুদায় জমিদার ও প্রজার উপর পড়িয়াছে। প্রজা এই ব্যয়ের কোন অংশ বহন করিতে সম্মত নহে। অতএব জরিপ তাহাদেরও অমতে হইতেছে।

এই গেল এক কথা। দ্বিতীয় কথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া। এ সম্বন্ধে লেখকের উক্তি—"কর্ণওয়ালিস তখন বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে পারিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা জমিদারের সহিত না করিয়া বোধ হয়, রেয়তের সঙ্গেই করিতেন।" কর্ণওয়ালিস না বুঝুন, তাঁহার পর ত অনেক গবর্ণর জেনেরেল হইয়া গিয়াছেন। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া নহে, ইচ্ছা করিলে ত গবর্মেণ্ট আর সর্ব্বত্র রেয়তের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারেন। করিলেন না কেন? পরিষ্কার কথাটা এই। কর্ণওয়ালিসের ভ্রম গবর্মেণ্ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু রেয়ত অথবা জমিদারের সঙ্গে সে ভ্রমের সম্বন্ধই নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটাই ভ্রম। ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে গবর্মেণ্ট সন্তুষ্ট হইতেন। আদৌ গবর্মেণ্টের ইচ্ছাই তাহাই। কোন কোন প্রদেশে বন্দোবস্ত দশবৎসরের মাত্র। দশবৎসর পূর্ব্বে যে জেলার ভূমিকর দুইলক্ষ মুদ্রা ছিল দশবৎসর পরে সেই জেলার কর তিনলক্ষ অথবা চারিলক্ষ হয়। ত্রিশ বৎসরের অধিক বন্দোবস্ত কোথাও নাই। নূতন বন্দোবস্ত হইলেই যখন করবৃদ্ধি এক প্রকার নিশ্চয়, তখন জমিদারই হউক অথবা রেয়তই হউক, কোন সাহসে জমির উন্নতি করিবে?

যে দেশে বসিয়া লিখিতেছি, সেই দেশের দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেই এ কথা প্রমাণিত হইবে। পঞ্জাবে সরসা নামে একটা জেলা আছে। সেই জেলার Revised Settlement রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া পঞ্জাব গবর্মেণ্টকে ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৯১ সালে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"After full consideration the Government of the Punjab have adopted a system of fixed assessment for the Sirsa uplands. The result has been a settlement which is exceedingly favourable to the proprietors and at rates below the full half assets and which nevertheless it will be difficult

to work without a liberal resort to suspension, although remissions may not be required. *The Government of India fully share the anticipations of the Local Government that the assessment will constitute no undue burden on the people, and are gratified that this side of the question has been so carefully considered.* At the same time, they are inclined to think that by the fluctuating system of assessment, against which His Honour has decided, the interests both of the State and of the peasants might, in this notoriously insecure tract, have been better secured. At this distance of time the Government of India cannot ask the Local Government to re-consider its decision, but they feel it incumbent on them to lay down, in the clearest terms, the principle, that if in future settlements of this and similar tracts the fixed system of assesments is to be adhered to, no portion of the full share of the assets should be surrendered in any form without the previous sanction of the Government of India being obtained. Care must be taken that full half-asset rates are taken notwithstanding the largeness of the enhancements which may be involved, and even though in order to avoid the appearance of hardship it should be necessary to resort to something like the old methods of progressive assessment."

যে কয়টা কথা italicsএ আছে, তাহার ভিতরের শ্লেষ পাঠক লক্ষ্য করিবেন। পঞ্জাব গবর্মেণ্ট রেয়তের ভারলাঘবের জন্য ব্যস্ত, Stateএর লাভ লোকসানের প্রতি তেমন মনোযোগী নহেন, তাৎপর্য্য এই। পঞ্জাব গবর্মেণ্ট কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত নাই। Sir James Lyall তখন পঞ্জাবের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, তিনি যে তেজের সহিত কোন উত্তর দিয়া থাকিবেন, এমন মনে হয় না।

জলন্দর জেলার Revised Settlment Report ১৮৯১ সালে সম্পূর্ণ হয়। Sir James Lyall লিখিয়া যান যে, নূতন বন্দোবস্ত ত্রিশ বৎসরের জন্য হওয়া উচিত। গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যখন এই রিপোর্ট লইয়া লেখা পড়া হয়, তখন Sir Dennis Fitzpatrick এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। সুপ্রীম্ গবর্মেণ্ট কিছুতে এ বন্দোবস্তে সম্মতি দিতে চাহেন না। ৬ই আগষ্ট, ১৮৯১ সালে তাঁহারা লেখেন—

"It is rarely, indeed, that they (the Government of India) would consider themselves justified in taking exception to the proposals of a Local Government respecting the period of a settlement, especially when it has been announced so long, as in the present case, before being reported to the Supreme Government, unless on a well founded belief that the assessments which it so proposed to impose during the suggested period of settlement are so light as to involve an injustice to the

general tax-payer. In the present case, however, after a careful examination of the settlement proposals, the Government of India have been driven to the conclusion that the surrender of revenue has been so material as to justify either the reduction of the term or, preferably, the adoption of a progressive settlement."

পঞ্জাব গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই দুই প্রস্তাবের অন্যতর প্রস্তাবে তাঁহাদের কোন গুরুতর আপত্তি আছে কি না। লিখিবার রঙ্গ দেখিবেন। Surrender of revenueর জন্য গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার ততটা ভাবনা নহে, যতটা injustice to the general tax-payerএর জন্য! ভেল্কিবাজি অভ্যাস হইয়া গেলে বাজিকরে বাজিকরে আপনাপন্নির ভিতরেও পরস্পরের চক্ষে ধূলা দিয়া থাকে।

উত্তরে Sir Dennis Fitzpatrick লেখেন—

"He is, with the utmost deference to the Government of India, decidedly of opinion that, in considering what assessment the people can bear without having their standard of comfort unduly affected, it is absolutely impossible to leave out of account the local cesses leived on the land. To the Zamindars the circumstance that these cesses go to pay for roads or schools or patwaris, &c., instead of being credited to Imperial Revenues is altogether immaterial. The money to whatever head it may be credited or to whatever purposes it may be devoted has to come out of the Zamindars' pockets. Of course His Honour understands that the principle Government proceeds on is that we may take up to half assets as revenue exclusive of cesses; but when it comes, as it commonly does, to considering what the people can pay, and at the same time live, and to a reasonable extent thrive, it is obviously impossible to leave out of account the large increase which has of recent years been made in the cesses."

এই local cesses কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণিত হইয়াছে, কিন্তু general tax-payer এর প্রতি যে অবিচার হইতেছে, গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া তাহাই ভাবিয়া আকুল—অতটা স্মরণ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিবার পাত্র নহেন। ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী লিখিলেন—

"I am to point out that although the Government of India expressed their inability to admit the propriety of allowing large increases in local cesses to the material injury of the Government land revenue, they never intended to suggest, as seems to be supposed by the Local Government that in making the assessment the amount of local cesses should or could be left out of account."

কিন্তু তাঁহারা আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের কথাই বাহাল রহিল। Sir Dennis Fitzpatrick যেমন করিয়া লিখিয়াছেন, কয়জন শাসনকর্ত্তা এমন করিয়া লিখিতে পারেন ?

ফল কথা, প্রজা ও কৃষিজীবী সম্প্রদায় শান্ত ধেনুর ন্যায়। দুগ্ধ দোহন করিলে শিং মারে না, লাথি ছুঁড়ে না। আর কাহাকেও লইয়া টানাটানি করিলেই বিপদ। ইন্‌কম্ টেক্স লইয়া কি হুলস্থূলই না হইয়া গেল! ইংরাজি বস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করিবার কথা উঠিলেই গবর্মেণ্টের মাথা বাঁচান ভার। বরং ব্যাঘ্রীর দুগ্ধ সংগ্রহ করা সুসাধ্য, কিন্তু ইংরাজ বণিকের নিকট কর আদায় করা দুঃসাধ্য। শান্ত প্রজা পাইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে করিতে গবর্মেণ্ট অবশেষে না শোণিত টানিয়া বাহির করেন এই ভয়। কিন্তু উপায় কি ? কৃষি-জীবিদিগকে খোঁচা দেওয়া সৎপরামর্শ নহে। এই শান্ত গাভী একবার শিং নাড়িয়া পুচ্ছ তুলিয়া ছুটিলে কে তাহাকে থামাইবে ? কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথমে এমন উপায় করা উচিত, যাহাতে ব্যবস্থা-সভায় প্রজার বিপক্ষে আইন না জারি হয়। এই জন্য Legislative Councilsএর সংস্কারের প্রস্তাব। দ্বিতীয়তঃ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ভারতবাসী থাকিলে প্রজাপীড়ন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। এই জন্য Simultaneous Examinantions এবং higher appointments এর জন্য আন্দোলন। এতভিন্ন যদি আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় থাকে, যিনি উদ্ভাবিত করিতে পারিবেন তিনি কংগ্রেসের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। কংগ্রেসকে বিদ্রূপ করিলে বা গালি দিলে কেহ কখন স্বদেশ বা স্বজাতির মঙ্গলপ্রার্থী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

এই প্রবন্ধ "সাহিত্য" পত্রের জন্য লিখিত. হইয়াছিল, এবং সেই পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য যন্ত্রস্থও হইয়াছিল। "সাহিত্যের" সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম যে "সাহিত্যের" পক্ষ হইতে এবং "সাহিত্যের" মঙ্গলের জন্য এই রূপ কয়েকটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সাহিত্য সম্পাদকের মতে এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক এবং সেই জন্য তিনি নোট করিয়া প্রতিবাদ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এমন কোন কথা নাই যাহার প্রতিবাদ করা যায় না, কিন্তু কংগ্রেস লইয়া তর্ক করিবার আমার ইচ্ছা নাই, এবং সাময়িক পত্রে সে বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে কোন ফল নাই। অপর পক্ষে, এমন বিষয়ে নীরব রহিলে আমাকে কিছু গোলে পড়িতে হয়, সুতরাং আমাকে পত্রান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

পুরাতন বর্ষের স্বপ্ন।

একটি স্বপ্নের কথা বলিতেছিলাম। এই নূতন বর্ষে একটি পুরাতন বর্ষের স্বপ্ন দেখিয়াছি। যে বৎসরের স্বপ্ন দেখিয়াছি সে বৎসরটি অনেক দিনের। সেটি আমার বাল্যকালের বৎসর। তাহার পর একে একে এগারটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একটি যুগই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনেও যুগান্তর আসিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নূতন বর্ষের প্রারম্ভ। পল্লিগ্রামে রহিয়াছি। বৈশাখমাস, দুপুরবেলা। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ঘুঘুর বিরল রব বা 'বসন্তগৌরীর' একঘেয়ে দ্রুততান ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। প্রখর রৌদ্র উজ্জ্বল নবীন শ্যামলপত্রতলে পড়িয়া এমনি উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে, বাহিরের সেই তরুণ উজ্জ্বলতা দেখিয়া মনেও বিন্দু মাত্র বিষাদের ছায়া পড়িতে পায় না। হইলেও হইতে পারিত—কিন্তু সেই উজ্জ্বল দিনে আমার নিকট "বিশ্বছবি মসীমলিন বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইল" না। বাহিরের উজ্জ্বল অগাধ রৌদ্রের পানে চাহিয়া পাঠগৃহে একাকী বসিয়া আছি। মনটা কেমন অন্যমনস্ক। হঠাৎ "ভারতী"তে বহুদিন পূর্ব্বে পড়া একটি কবিতার এই চরণটি মনে পড়িয়া গেল—

'দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে'।

এই কথাটি মনে পড়িবামাত্র মনে হইতে লাগিল প্রকৃতই যেন দূর কাননের কোলে হইতে একটা পাখীর ডাক আসিতেছে!

অনেক দূরের কোথাকার একটা বন—এতদূরে, যে পাখির ডাকটি কিছুক্ষণ ধরি[illegible] ভিতর কাণ পাতিয়া থাকিলেই তবে যেন ঠিক শোনা যায়—আর যব পরিমাণ [illegible]—এই রকম থাকিলে যেন সে ডাক আমার অব্যাহিত দূরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বায়ুর স[illegible]
আমার কাণে পশিত না। মনে হইতে লাগিল কাননটি যেন বহুকা[illegible]নে এ রকম অদ্ভুত কথা
দেখিয়াছিলাম, তবে পরিষ্কার স্মরণ হইতেছে না, কুয়াসায় [illegible]
আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হইতেছে। মনটা কেমন [illegible]তে ভুলে গেছি। সে ঐ বট
কেবল মনে হইতে লাগিল— [illegible]লা গাঁথছে। চুপি চুপি গিয়ে চোক্ টিপে

'দুর কাননের কোলে[illegible]ও ছেড়োনা।

কোথায় সে দূর কানন? আর কেনই বা [illegible]
প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বর্ত্তমান হইতে অ[illegible]
করিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ সেই 'দুর কাননের[illegible]র হইল। সলিল জলের পানে চাহিয়া রহিল।

কাননটি প্রকৃতপক্ষে কানন নহে। পল্লীগ্রামের এক আম্রোদ্যান। ইহার উত্তর কোলে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রশস্ত পাকা রাস্তা। অপর দুই দিকে দুটি বাগান। দেখি সেখানে বার বৎসর পূর্ব্বের এক বিচিত্র চৈত্রমাস! উদ্যানটি আম্রমুকুলের সৌরভে আমোদিত। এও সেই ঝাঁ ঝাঁ করা দুপুরবেলা। উদ্যানের মধ্যে এক আম্রতলে দুইটি বালিকা ও একটি বালক মহোল্লাসে কোলাঞ্চলে টুপ্ টুপ্ করিয়া পতিত আম্রক কুড়াইতেছে। সম্মুখস্থ বৃক্ষ হইতে একটি পাখী হুস্ করিয়া হঠাৎ উড়িয়া গেল তাহাতে বৃক্ষশাখা সম্বিবদ্ধ একটি লোষ্ট্র ঢুপ্ করিয়া ভূতলে পড়িল। ইহাতে হঠাৎ ভয় পাইয়া বৃক্ষসন্নিহিত একটি গাভী উর্দ্ধপুচ্ছে উর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গল ভেদ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। বালিকাদ্বয় চমকিয়া উঠিল। চারিধারে চাহিয়া দেখিল; দেখিল চতুর্দ্দিক জনশূন্য, উত্তরে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, মধ্যাহ্ন বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে বালকটিও কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের আম কুড়ান বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা তিনজনে এককালে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—

ঠিক দুপ্পুর বেলা,
ভূতে মারে ঢেলা;
পায়ে পড়্ল রশি,
হাঁটু গেড়ে বসি!

এই বলিয়া তাহারা তিনজনে অবনত জানু হইয়া ভূতলে বসিল, আবার উঠিয়া, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে একটু অগ্রসর হইয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাহারা দক্ষিণ দিক দিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কথা বালিকা দুটি সবে নয় বৎসরে পড়িয়াছে। বালকের বয়স প্রায় এগার। ইহারা হওয়া আবশ্যক ঐ সমবয়স্ক। সকলেই এক প্রকার বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারভুক্ত। মুখশ্রী ও কান্তি এমন কোন কথা নাঃমেয়ে দুটির তুলনায় ছেলেটির সৌন্দর্য্য (যদি কিছু থাকে ত তাহা) আমার ইচ্ছা নাই, এবং সাপরে পড়ে না।

অপর পক্ষে, এমন বিষয়ে নীরধাঙ্গার ঘাট। ঘাটটি বেশ বাঁধান। একধারে এক বট আর পত্রান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ২২প্রতি দিনই সন্ধ্যাকালে তাহারা তিনজনে ঘাটে বেড়াইতে

...র প্রধান উদ্দেশ্য ছিলনা। তাহারা ঘাটে প্রদীপ

প লইয়া ঘাটের যে সিঁড়ি পর্য্যন্ত কুল কুল শব্দে

...তে প্রদীপ তিনটি সারি সারি করিয়া বসাইয়া

থাকিত। আলো দেওয়া হইলে পাড় হইতে

শ হইয়া ছেলেটির সম্মুখে দাঁড়াইত! সর্ব্বপ্রথমে

বালকটি 'নমো নমো' 'নমো নমো' বলিতে বলিতে মেয়ে দুটির মস্তকে দুর্ব্বার অর্ঘ দান করিত। অনন্তর বালিকাদুটি উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে একত্রে বালকে মস্তকে দুর্ব্বাদল রাখিয়া দিত! এইরূপে তাহাদের কুমার কুমারী পূজা সাঙ্গ হইলে তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিত। ফিরিবার সময় হাত ধরাধরি করিয়া বালককে তাহা প্রদীপের ন্যায় নিত্যই মাঝখানে থাকিতে হইত। একদিন এইরূপ প্রত্যাগমন কালে গ্রামের কোন সুরসিকা প্রবীনা পরিহাস করিয়া বলিলেন, "এ চাঁদপানা ছেলেটি তোদের মধ্যে কার বর লা?" অপেক্ষাকৃত চঞ্চলা মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমার বর।" শান্ত প্রকৃতি অপর মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাধ বাধ স্বরে কহিল, "হ্যাঁগো ওরই বর।" শেষোক্তের পরাজয় স্থির পূর্ব্বক প্রবীনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন, বালক স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর তিনবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বালক বালিকারা সন্ধ্যাবেলা আর ঘাটে প্রদীপ দেয় না—পরস্পরকে পূজাও করে না। সেরূপ করা আর ভাল দেখায় না বলিয়া প্রবীনাদের পরামর্শে তাহারা সে খেলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইতি মধ্যে একদিন সন্ধ্যাকালে সেই ঘাটে বেড়াইতে গিয়া অনিল দেখিল—

'জলের পানেতে চেয়ে
ঘাটে বসে আছে মেয়ে
শুনিছে পাতার মর মর।'

দেখিবা মাত্র চিনিল যে, সলিল বসিয়া আছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিল,

"কি সলিল! একলা বসে কি ভাবচো? হিল্লোল কোথা?"

সলিল বলিল, "ভাবচি জল কোথা থেকে আস্‌চে—কোথাই বা যাচ্চে। জলের ভিতর আকাশ কেন দেখা যায়? বাতাস বইলে জলের গায়ে কাঁটা দেয় কেন?—এই রকম কত কি ভাবছি—কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।"

অনিল। তোমার নামও যা ভাবও যে তাই দেখ্‌চি! তোমার মনে এ রকম অদ্ভুত কথা উঠেই বা কেমন করে! হিল্লোল আজ কোথা?

সলিল। ওহো! তুমি প্রথম বারেই জিজ্ঞেস করেছিলে—বল্‌তে ভুলে গেছি। সে ঐ বট গাছের আড়ালে বসে বকুল ফুলের মালা গাঁথছে। চুপি চুপি গিয়ে চোক্ টিপে ধরগে না—কে না বল্‌তে পাল্লে কক্ষণও ছেড়োনা।

অ। তুমি আমার সঙ্গে এস।

স। যাওনা তুমি। আমি একটু পরে যাচ্চি।

অনিল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বটবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। সলিল জলের পানে চাহিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাড়ার সকলেই দেখিয়া আসিতে ছিল যে সলিল অনিল ও হিল্লোল এই তিন জনের মধ্যে ছেলে বেলা হইতে বড় ভাব। একসঙ্গে খেলা—একত্রে গঙ্গার ঘাটে প্রদীপ দেওয়া, তাহাদের সেই পরস্পরকে পূজা প্রভৃতি শৈশবের প্রত্যেক কার্য্য দেখিয়া সকলেই মনে মনে ভাবিত যে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ দুটী মেয়ের একটির যদি বিয়ে হয় তবে বড়ই সুখের মিলন হবে। তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবীনা পরিহাসচ্ছলে মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন যে ছেলেটি কার বর। তদুত্তরে চঞ্চল প্রকৃতি হিল্লোল বলিয়াছিল 'আমার বর'। শান্ত-স্বভাবা সলিল বলিবার আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া অগত্যা হিল্লোলের কথাতেই সায় দিয়াছিল।

সলিলের সহিত অনিলের গঙ্গার ঘাটে দেখা হইবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্নে পাড়ার এক মুখরা বিধবা ঝিয়ারি হিল্লোলের মার কাছে—এর কুৎসা, ওর প্রশংসা—বদ্যিদের পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে—ভোর রাত্রে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ইত্যাদি নানান কথা কহিতে কহিতে বলিল, "হ্যাঁগা, হিলার মা তোমার হিলার বের এত দেরি হচ্ছে কেন?"

হিল্লোলের মা। কি জান, বিধু! মনের মত বর না পেলে কি করে বে দি বল। সত্যিত হিল্লোলত আমার ভেসে আসেনি যে তাকে জলে ফেলে দেবো।

বিধু। কেন, এই তবে শুনলুম চাটুর্য্যেদের অনিলের সঙ্গে বের ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সেখানে তবে ভেঙ্গে গেল নাকি?

মা। না ভেঙ্গেও যায়নি—নিচ্ছস কিছু ঠিক হয়নি। পাত্রটি আমাদের দুজনের খুব মনের মতন বটে। তা হ'লে কি হয় বরের বাপের যে কামড়, তাই ইনি পেছচ্চেন। আমি মেয়েমানুষ—আমার ত আর কোন কথা থাক্‌বে না। আমি যদি বল্লুম যে ঐ ছেলের সঙ্গে হিলার বে দিতে হবে অমনি পুরুষ চটে উঠে বলে বসেন, 'মেয়ে মানুষের কথা শুনে অমি ত আর ভিটে মাটি চাটি কোরতে পারি নে!'—যখন আমি সংসারের কেউ নই—তখন আমার চুপ করে থাকাই ভাল। মেয়ের ভাগ্যে যেমন আছে তেম্নি হবে। আমি মাঝে থেকে শুধু ধড় ফড় করে মলে কি হবে। দেখ বিধু! হিলার সঙ্গে অনিলের একরত্তি বেলা থেকে ভাব।

বি। তা আর আমায় বোল্‌তে হবে না! সেত আমি নিজের চোকেই দেখে আস্‌চি। আর তা ছাড়া দেখ হিলার মা, হিলার অনিলের উপর মন পড়েচে—ছেলেরও মেয়ের উপর মন পড়েচে। সে দিন সন্ধ্যার একটু আগে এই বেলাটা ঝিক্‌মিক্ কোরচে এমনি সময়টা বাঁধাঘাটে জল আন্‌তে গিয়ে দেখি যে, সলিল খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে

হাঁ করে অনিলের দিকে চেয়ে আছে। আর অনিল সেই বটগাছের তলায় হিলির গলাটা জড়িয়ে ধরে তার হাত থেকে একগাছা বকুল ফুলের মালা কেড়ে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি কোর্‌চে—হিলি কিছুতে মালা দেবে না। দুজনে এই রঙ্গ কোর্‌চে এমন সময়ে হিলির সঙ্গে আমার চোকোচোকি ; হিলি ত ছুটে একধারে পালিয়ে গেল, অনিল মাথা হেঁট করে রৈল্। যাই হোক, দুজনে খুব ভালবাসা না থাক্‌লে কি এমন ধারা ব্যাপারটি হয়। তাই বোল্‌ছিলুম যে দুজনেরই দুজনের উপর খুব মন পড়েচে। এ বে যদি না হয় তবে দুজনেরই চির কালটা মনের অসুখে কাটবে। আজ রাত্রে কর্ত্তাকে এসব ভাল করে বুঝিয়ে বলো—তাহলে আর কর্ত্তা অমত কোর্‌বে না। কিছু টাকা বেশি লাগ্‌বে ব'লে মেয়েটাকে কি চিরজীবন অসুখী কর্‌তে হবে। এ পাত্র হাত ছাড়া হ'লে অমনটি আর মিলবে না। আর বেশি কি বোল্‌বো বল হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলোনা!

মা। আচ্ছা, বিধু! তুই যা বল্লি তাই করে দেখবো। একান্ত বেগতিক দেখি ত শেষে নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি কোর্‌বো। তাতেও কি রাজি হবে না?

বি। ওই যা মন্ত্র বল্লি, দিদি! ওতেই সব ঠিক হবে। ও একেবারে নিজ কামরূপ কামিক্ষের মন্ত্র। ওতে যত বড়ই একগুঁয়ে ব্যাদ্‌ড়া পুরুষ হোক্ না কেন ভিড়্‌তেই হবে। শেষে ভেড়া হ'য়ে কাছে বসে থাক্‌বে, মাঝে মাঝে দু চারটে আলোচাল ছড়িয়ে দিলেই আর কিছু দেখ্‌তে হবে না! আজ তবে আসি। হিলির বাসর কোন ঘরটায় হবে!

মা। কোথায় কি তার ঠিক নেই, দিদি! যদি হয় ত ঐ কোণের ঘরটায় হবে।

বি। হ্যাঁ হ্যাঁ—ঘরটি বেশ নিরিবিলি।

মুখরা বিধুর ফুঁর জোরেই হোক্ অথবা হিল্লোলের-মার ধমকের গুণেই হোক্ এক রাত্রির মধ্যেই হিল্লোলের বিবাহ অনিলের সহিত একেবারে পাকা হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ রাত্রে বিবাহ। বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। হুলুধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। বিপুলবপু বিধুরও উপর নীচে করিয়া খাটিয়া খাটিয়া ইহারি মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ টাটাইয়া উঠিয়াছে। যাই হোক্ বিবাহটা গোধূলি লগ্নে ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই অনিল মহাসমারোহে হিল্লোলদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ক্রমে স্ত্রীআচার। শুভদৃষ্টি হইবে, বর কন্যার মাথার উপর বস্ত্র ধরিয়া কন্যার মাতা বলিতেছেন, "সুনয়নে দেখ বাবা! মা, শুভদৃষ্টি কর!" সলিল সেই সময় কৌতূহল পরবশ হইয়া অথবা কি মনে করিয়া কে জানে, সেই বস্ত্রের নীচে কন্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল শুভদৃষ্টির নির্ঘাত সময় হিল্লোল লজ্জায় চোক বুজিয়া রহিল। শাঁক বাজিল। অনিল চাহিয়া দেখিল সলিল তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে—অনিল হাসিল। সলিল হাসিল না। যারই সঙ্গে হোক্ শুভদৃষ্টি আচারটি এক

রকমে শেষ হইয়া গেল। তার পর বিবাহের বক্রী ক্রিয়াটুকু সমাপ্ত হইলে অনিল হিল্লোলের সহিত বাসর ঘরে প্রবেশ করিল।

পাড়ার প্রায় সকল বৌ ঝিই বাসর জাগিতে আসিয়াছিল। আসে নাই কেবল সলিল। সে হিল্লোলের বাসরে না জাগিয়া আপনার শয়নকক্ষে জাগিয়া বসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়া এই বর্ত্তমান বর্ষ আসিয়াছে। অনিল ও হিল্লোল তাহাদের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে লইয়া সুখেস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা অতিবাহিত করিতেছে।

সলিলেরও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বিনা শুভদৃষ্টিতে। বিবাহের সময় তাহাকে যখন সকলে শুভদৃষ্টি করিতে বলিল তাহার আর একদিনের শুভদৃষ্টি বুঝি মনে পড়িয়া গেল তাই তাহার নয়ন আর উঠিল না, অবনত নয়নে তাহার স্ত্রীআচার, বিবাহ কার্য্য শেষ হইল। বিবাহ করিয়াই তাহার স্বামী ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন, এখনও আসেন নাই, এইরূপ গুজব আর কখনও আসিবেন না। তিনি সে দেশেই নূতন সংসার স্থাপন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। সলিলের মুখেও তাহার স্বামীর নাম কখনও শুনা যায় না। বিবাহের পর সে কখনও শ্বশুরালয়ে যায় নাই, পিত্রালয়েও থাকে না, মামার বাড়ীতে রহিয়াছে। পিত্রালয়ে সে আর কিছুতেই আসিতে চাহে না। শুনিতে পাওয়া যায় তাহার মামার বাটীর একটি পরিষ্কার সরোবরের ঘাটে বসিয়া কখন জলের পানে চাহিয়া থাকে কখন বা ঘাটের দুইধারে দুইটি বড় বড় নিবিড় বকুলবৃক্ষ পবনান্দোলিত হইলে সেই চঞ্চল শ্যামল নিবিড়তার পানে চাহিয়া থাকে, কখন বা বকুলের মালা গাঁথিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। কি ভাবিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে মুখেরপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলে, "ভাবৃচি জল কোথা থেকে এল—কতদিনেই বা শুকোবে, জলের বুকের ভিতর আকাশ কেন দেখা যায়—বাতাস বহিয়া গেলে জলের গায়ে কাঁটা দেয় কেন?"

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি।

"বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব্ লিটারেচার" পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসুর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সে পত্রের পাঠ এইরূপ—"মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু"

এই পাঠটি পড়িয়াই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। "বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ"—"বেঙ্গল অ্যাকা-ডেমির" এরূপ সুন্দর ভাষান্তর রাজনারায়ণ বাবু কর্ত্তৃকই সম্ভবে। "বেঙ্গল অ্যাকাডেমির" সভ্যগণ ইহা নজর করেন কি না এবং তাঁহারা এই নামান্তর গ্রহণ করেন কি না জানিতে কৌতুহলী ছিলাম। তাহার পরের সংখ্যায় দেখিলাম শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল লিখিতেছেন—

"Bengal Academy of Literature প্রতিস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাতে ইহার নামকরণ হয় নাই। পদার্থটি যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে সভ্যগণ অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক।

অস্মদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ষষ্ঠ মাসে তাহার নামকরণ বিধেয়। আমাদের একাডেমি (কি লিখিব?—এ্যাকাডেমি—না আকাডেমি না একাডেমি না আক্কাডেমি না আক্যা-ডেমি—কি?—) আমাদের এই সংজ্ঞাহীন জীবটি বিগত জুলাই মাসের ২৩ এ তারিখে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ষষ্ঠ মাস বিগত প্রায়; কিন্তু আজও ইহার নামকরণের কোনও উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে না।

এক্ষণে যে মহোদয়গণ এই পদার্থটির জন্মদাতা তাঁহারা বঙ্গভূমিতে কি নামে ইহাকে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন?

অতি প্রাচীনকালে, যাহাকে বৈদিক যুগ বলা যায় তখন একএক আচার্য্যের চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যেরা বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতেন; চতুষ্পার্শ্বে বসা হইত বলিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল "পরিষদ"। কালে এই শব্দের অর্থ "ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত মণ্ডলী" এইরূপ দাঁড়ায়। অবশেষে গুণ দোষ বিচারক পণ্ডিত সভামাত্রকেই—এমন কি সভা মাত্রকেই—পরিষদ বলা হইত। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ

পরিষদ প্যেষা গুণ গ্রাহিনী॥

গ্রীশদেশে Academy বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পাইত অস্মদ্দেশে পরিষদ বলিলেও একদা অনেকটা তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত হইত। প্রস্তাবিত পদার্থটিকে কি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" বলা যাইবে?

বেনীসংহারের কবি ভট্টনারায়ণ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে সাহিত্যের অবনতি দেখিয়া, এবং সেই সাহিত্যের পূর্ব্বতন অবস্থা অনুস্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কাব্যালাপ সুভাসিত ব্যসনিন
স্তে রাজহংসা গতাঃ
স্তা গোষ্ঠঃ ক্ষয়মাগতা
গুণলব শ্লাঘ্যা ন বাচঃ সতাম্।

কাব্যালাপে এবং মনোহর উক্তিতে অনুরাগী সেই রাজাগণ হংসের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছেন! এখনকার রচনা গুণলেশেও শ্লাঘ্য নয়, কেননা সেই সকল সদ্-গোষ্ঠী (যথায় কাব্যের গুণ দোষ বিচার হইত) তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে!!!

কালিদাস যখন রঘুবংশ রচনা করেন তখন এই সদ্-গোষ্ঠবর্গকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন।

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি
সদসদ্ ব্যক্তি হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ
বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপিবা॥

সদ্-গোষ্ঠী বা সাধু-গোষ্ঠী এটিও একটী উপযুক্ত নামধেয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য সদ্-গোষ্ঠী কিম্বা বঙ্গীয়-সাহিত্য সাধু-গোষ্ঠী; কিম্বা বঙ্গীয় ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সদ্-গোষ্ঠী ইহার মধ্যে কোনও একটি নাম কি সভ্যগণের রুচিকর বোধ হয়?

গোষ্ঠী শব্দ বাঙ্গালায় প্রস্তাবিত অর্থে অপ্রচলিত নহে; এক্ষণেও পাঁচজনে একত্র হইয়া সদালাপ বা শাস্ত্রালাপকে ইষ্ট-গোষ্ঠী বলা যায়।

পরিষদ ও সদ্-গোষ্ঠী দুয়ের মধ্যে একটিও যদি মনোরম না হয় সভ্যগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা সমবেত-বুদ্ধি-বলে শ্রুতি কোমল বিশুদ্ধ আর্য্যভাষায় আপনাদের মিলিত অস্তিত্বের নামকরণ করিবেন;—অপরভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয়, কিম্বহুনা।"

অ্যাকাডেমির বাঙ্গলা যে "পরিষদ" হইবে, এই সত্যটী রাজনারায়ণ বাবু অনায়াসে ধারণ করিয়া নিড়াবম্বরে অথচ দ্বিধাশূন্য ভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক অনুভূত সত্যের মধ্যে যে যুক্তি নিহিত ছিল তাহা উমেশ বাবু দেখাইয়াছেন। এখন "বেঙ্গল অ্যাকাডেমির" সভ্যগণ তাঁহাদের সভার বাঙ্গলা নামকরণ করিয়াছেন "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।" তবে এখনও আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবকে "বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি" এই শীর্ষক করিবার কারণ পূর্ব্বগত প্রবন্ধের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার ইচ্ছা এবং সভার বাঙ্গলা নামকরণ বৃত্তান্ত প্রথমে পাঠকগণের গোচর করিয়া পরে সেই নাম ব্যবহারের সুযুক্ততা। এবার হইতে ইহাকে আমরা "পরিষদ" বলিয়া উল্লেখ করিব।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" এর প্রথম সংখ্যায় পরিষদের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়। তাহার দশম নিয়মটী এই :—

"পরিষদের দুইটী বিভাগ থাকিবে, একটী ইংরেজী, অপরটী বাঙ্গলা এবং সংস্কৃত। ইংরেজী পুস্তক, প্রবন্ধ বা পত্রিকা ইংরেজীতে সমালোচিত হইবে, এবং বাঙ্গলা বা সংস্কৃত গ্রন্থাদি সমালোচকের ইচ্ছানুসারে বাঙ্গলায় কিম্বা ইংরেজীতে সমালোচিত হইতে পারিবে।"

এই নিয়মে আপত্তি উথাপন করিয়া বাবু রাজনারায়ণ বসু লেখেন যে পরিষদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলা ভাষাতেই সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতরূপ উন্নতি সাধন করাই পরিষদের উদ্দেশ্য হয় "তাহা হইলে পরিষদের সেইমত ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গভর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরেজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত অন্য কোন উপলক্ষে ইংরেজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে।" রাজনারায়ণ বাবু যে ইংরেজী শিক্ষা অথবা ইংরেজী সাহিত্য পাঠের, কিম্বা ইংরেজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছেন তাহা নহে। নিতান্ত অল্পবুদ্ধি না হইলে কেহ তাহা অস্বীকার করিবে না।

ইংরেজী শিক্ষা প্রথমতঃ আমাদের জীবিকার জন্যই আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চার জন্য আবশ্যক। ইংরেজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের উপর আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে, যেহেতু আমাদের রাজপুরুষেরা ইংরেজ, বাঙ্গলা কথা তাঁহারা কাণে তোলেন না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে বলিলাম ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চা তাহার অর্থ কি? ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চার কি আবশ্যক? আমাদের চিত্তের প্রসারের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য, ভাব রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য— এক কথায় বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চার আবশ্যক। বাঙ্গালীর প্রাণের একান্ত আকিঞ্চন হওয়া উচিত দশদিক হইতে অমূল্যরত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার সেবা করিবে, মাকে সুন্দর সাজাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আবশ্যকের অতিরিক্ত ক্ষেত্রে, আমাদের নিতান্ত নিভৃত স্নেহকোটরে ইংরেজীকে আমল দেওয়া কেন? বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চাবিষয়ে উৎসাহদানের জন্য পরিষদ বাঙ্গালা পুস্তক সমালোচনা করিবেন তবে সে সমালোচনা ইংরেজীতে কেন লিখিত হইবে? রাজনারায়ণ বাবুর মনের ভাব বোধ হয় এই। তাই তিনি বলিয়াছেন "কেবল বাঙ্গলা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালায় পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন।"

মিঃ লিওটার্ড ইহার উত্তরে বলেন "বেঙ্গল অ্যাকাডেমি" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বাঙ্গলা-সাহিত্য পরিষদ নহে। এ সভা শুধু বাঙ্গলা ভাষার জন্য নহে বাঙ্গালীর

ভাষার জন্য এবং তাহা আজকাল দ্বিবিধ, বাঙ্গলা ও ইংরেজী। যদি ইংরেজী লিখিয়ে বাঙ্গালীকে এ সভা হইতে একেবারে বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে এই সভা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে লইয়া গঠিত হইতে পারে না, সমগ্র জাতির সাহিত্য বিষয়ক চেষ্টার সহিত ইহার সহানুভূতি থাকে না, একটা ভাষার খাতিরে ইহাকে জাতিকে অবহেলা করিতে হয়। আর তাহা করিলেও ইহার দ্বারা শুধু একটা স্থানীয় কাজ করা হয় মাত্র তাহাতে শুধু স্থানীয় আকর্ষণ বর্ত্তায়।

রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন, তাহায় দোষটা কি? "বঙ্গ.পরিষদের কার্য্য বঙ্গ দেশছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে"—"বঙ্গীয় পরিষদের" 'বঙ্গীয়' শব্দেই যে মিঃ লিওটার্ডের 'স্থানীয়' বিষয়ক আপত্তি আপনাপনি খণ্ডন হইয়া যায়—"অতএব উহার কার্য্য কেবল বাঙ্গলা ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না।"

মিঃ লিওটার্ডের উত্তর সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য এই যে বাঙ্গালীর ভাষার উন্নতিই যদি এই সভার উদ্দেশ্য এরূপ তাঁহারা বলেন, তবে শুধু বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা যুক্তিসঙ্গত নয় বাঙ্গালীর ইংরেজীর প্রতিও নজর রাখা কর্ত্তব্য। পরিষদে যতজন বক্তা বা লেখক ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন বা রচনা পাঠ করেন, তাঁহাদের কয়জনার ইংরেজী চোস্ত, নিখুঁত? আজ যদি ইংরেজজাতি পণ করিয়া বসে তাহারা সকলেই ফরাসী অধ্যয়ন করিয়া ফরাসীতে লেখা পড়ার কাজ চালাইবে তাহা হইলে কি অদ্ভুত ইঙ্গফরাসীয় ভাষায় পাশ্চাত্য জগত প্লাবিত হইয়া যায়? ফরাসী অ্যাকাডেমি কি সে ভাষাকে খাঁটি ফরাসী ভাষার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দেন? রাজনারায়ণ বাবু যে বলিয়াছেন "যদি সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে" সে কথাটা নিতান্ত সত্য, এবং তাহার মূল কারণ এই যে সহস্রের মধ্যে একটা লোক বিদেশীয় ভাষার সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গত্ব স্থাপন করিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে "কলিকাতা রিভিউতে" বাঙ্গালীর ইংরেজী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া ছিল তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"THE one great problem with which all concerned with English education in India,—and more especially the Universities have, first and foremost to grapple to-day is the problem of English: no lofty problem of litereture, philosophy, morality and social custom but the simple and elementary problem of plain English speech, the correct and rational speaking and writing of the English tongue itself. For by universal consent, without possibility of controversy, whatever else the Universities have achieved, or not achieved, there has been a great and lamentable, a hugely grotesqne failure in this respect—a failure to move inextinguishable Olympian laughter, to broaden Tratarus with a grin—

a failure to make angels and philologists weep. It stands as a gigantically ludicrous fact to-day that the supreme powers in the Indian Empire, having undertaken to introduce the science and literature of the west into India through the medium of the English Language, have failed to evolve any considerable number of trained scholars who may be trusted to speak and write the English Language with even tolerable correctness and intelligence. This would be no great reproach if they turned out nothing else, but unfortunately the Universities send out yearly hundreds of youths, duly signed and sealed with degrees and certificates equipped with a modicum of crudely mastered knowledge, and what is much more serious—*addicated to a very vile habit of writing and speaking English.* There is no need to reproduce here the poor jest of Babu English. The fact of its universality, and the fact that this and no other, with some honourable exceptions is what the Universities produce, is in itself notorious. It is abundanlty attested by the writing tables of Educational officers, by the experience of every Anglo-Indian official, by the advertisements in newspapers, whole reams of examination papers, and shoals of letters and petitions."

মিঃ লিওটার্ড বলিতেছেন এই পরিষদ বাঙ্গালীর সর্ব্বাবয়বিক উন্নতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন, শুধু আংশিক উন্নতির সহিত নহে, সেই জন্য ইংরেজীও ইহার একটী বিভাগ। কিন্তু বাঙ্গালী-ইংরেজীর সম্বন্ধে উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের সত্যতা ত তাঁহারা অস্বীকার করেন না ? তবে বাঙ্গালীর ইংরেজীর উন্নতিবিধানে তাঁহারা যত্নবান্ নহেন কেন ? বাঙ্গলা সাহিত্যের বিভাগে আলোচ্য রচনার গঠন, ভাষা প্রভৃতি সমস্ত অংশেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা চলে, কোন ত্রুটী চোখ এড়ায় না, কিন্তু ইংরেজী বিভাগে রচনা বিশেষের বিষয়টীর উল্লেখান্তর রচনাটীর মোটের উপর প্রশংসাবাদ ছাড়া আর কোনরূপ সমালোচনা ত এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কথাটা এই ইংরেজী রচনার ত্রুটী কে ধরিবে ? সমালোচক নিজেই যে বাঙ্গালী! অথচ ইংরেজী বিভাগে প্রবন্ধের ভাষাঘটিত দোষ গুণের বিচার না করিলে বাঙ্গালীর ইংরেজীর উন্নতি বিষয়ে পরিষদ চেষ্টা করিতেছেন বলা যায় না। সুতরাং মিঃ লিওটার্ডের কথাটা কাজের কথা দাঁড়ায় না।

তাহার অপেক্ষা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর একটা কথা মাননীয়। তিনি বলিতেছেন, "বাঙ্গলাভাষা বাঙ্গলাদেশের ভাষা বটে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যগত সত্য, অন্যান্যদেশের সাহিত্যগত সত্যের ন্যায়, জগতের বস্তু এবং জগতে প্রচার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইংরেজীভাষা তাহা প্রচারের উপায় মাত্র, যেহেতু এক্ষণে ইংরেজীভাষা প্রায় জগতের ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশ সকলে সংস্কৃত ভাষার আজ যে এত গৌরব তাহার অধিকাংশ মৃত মহাত্মা Sir William Jones প্রতিষ্ঠিত Asiatic Societyর ফল।

যদি এই সভায় প্রাচ্য ভাষান্তর্গত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সকলের কেবল মুদ্রাঙ্কন হইত, যদি তাহাতে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মন, সুইড্ অধ্যাপকগণ নিজ নিজ বিজ্ঞতা না প্রকাশ করিতেন, যদি মৃত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ ইংরেজীতে উহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন না করিতেন তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার গৌরব আজ কি শীর্ষস্থানীয় হইত ? বাঙ্গালাভাষার গৌরব বিদেশে ও ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ সকলে বিস্তার করিতে হইলে ইংরেজীভাষার সহায়তার আবশ্যক। ভাষার উৎকর্ষ সাধন করা বঙ্গবাসীর যেমন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, উহার গৌরববৃদ্ধি করাও সেইরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্ম।”

ইহা সত্য, ক্ষেত্রপাল বাবুর যুক্তি আমরা মানিতেছি এবং পরিষদের ইংরেজীবিভাগ অনুমোদন করিতেছি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য, ভাষার গৌরব বিস্তার করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু তাহার অযথা গৌরব রটনা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাহাতে স্বদেশীয় সাহিত্যকে বিদেশীয় সুধীসমাজে অপদস্থ হইবার অবকাশ দেওয়া হয়। পরিষদে পঠিত উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা সাহিত্যের তালিকা “টাইম্‌স্ পত্রিকা” বিশ্বস্তচিত্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি কোন কুতূহলী ইংরেজ পণ্ডিত তাহা দেখিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠে মনোযোগ দেন তাহা হইলে তাঁহাকে অনেকটা নিরাশ হইতে হইবে। এবং তাঁহার প্রত্যাশাভঙ্গের কথা স্বসমাজে রটনা করিলে আমাদের সাহিত্যের অপমান।

যাহা হউক জগতের সাহিত্যসমাজে আমাদের সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠাদানের উপায়স্বরূপ যেন শুধু আমরা ইংরেজীকে আশ্রয় করি, কিন্তু যে সাহিত্য গড়িব তাহা যেন বাঙ্গলা হয়—পরিষদের যেন এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এই ভাবটাকেই যেন বেশী প্রশ্রয় দেন, তবেই “এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গলায় পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গলায় লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন।” বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি হইবে।

যোশীমঠ।

(জ্যোতির্ম্মঠ)।

২৭মে বুধবার—আগের দিন রাত্রে আমরা যে চটীতে ছিলুম সেখান হ’তে যোশীমঠ মোটে পাঁচমাইল মাত্র, কিন্তু এই পাঁচমাইল আস্‌তেই আমাদের কত সময় লেগেছিল তা পূর্ব্বে ব’লেছি। যোশীমঠ যখন আর প্রায় একমাইল দূরে আছে সেই স্থানে এসে দেখ্‌লুম, পাহাড়ের গা ব’য়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে চ’লে গিয়াছে; আরো দেখ্‌লুম যে বেশীর ভাগ যাত্রীই সেই পথে নেবে যাচ্ছে, এমন কি আমাদের আগে আগে যে সকল যাত্রী আস্‌ছিল,

দুই একজন বাদ সকলেই সে পথে নেবে গেল। তারা কোথায় যায় জান্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হওয়ায় একজন সহযাত্রীকে সে কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম, তিনি উত্তর দিলেন 'আমরা যে পথে যাচ্ছি এইটি যোশীমঠের পথ, যাত্রীরা সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে নারায়ণদর্শন কর্ত্তে যায় না, তারা ঐ নীচের পথ দিয়ে বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে চলে যায়, তার পর নারায়ণ দেখে ফেরবার সময় যোশীমঠ দিয়ে আসে, সেও যে সকলে আসে তা নয়। আমাদের এই রাস্তা হ'তে একটা প্রকাণ্ড "উৎরাই" (দেড়মাইলেরও বেশী) নামলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ'।

নারায়ণ দর্শনে অনেক যাত্রীই যায় কিন্তু তারা যোশীমঠে না গিয়ে কেন যে আশ পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করে তা আমি বুঝ্‌তে পারিনে। হিন্দুর কাছে ত যোশীমঠ একটি সামান্য তীর্থ নয়, তার পর ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকটেও যোশীমঠ অত্যন্ত আদরের সামগ্রী; তবু এখানে লোকের গতিবিধির অভাবের কারণ এই ব'লে মনে হয় যে এ পথে যারা আসে সত্যের প্রতি তাদের ততটা আদর নেই, এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টা অপেক্ষা তীর্থদর্শনের দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জ্জনকেই তারা তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে মনে করে; সুতরাং সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যোশীমঠের তেমন সম্মান দেখা যায় না। আমি এখন পর্য্যন্ত বদরিকাশ্রম দেখিনি, কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হ'লো যত কষ্ট ক'রেই বদরিকাশ্রমে যাওয়া যাক্, যোশীমঠে আস্‌বার জন্যে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কষ্ট স্বীকার করাও সার্থক। যদি য়ুরোপ কি আমেরিকায় যোশীমঠের মত স্থান থাক্‌তো, তা'হলে কত পণ্ডিত, ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাবান কত শিক্ষিত যুবক প্রতি বৎসর সেখানে সমবেত হ'য়ে কত গুপ্তসত্য আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌তেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সে সম্ভাবনা কোথায়?

উপরে বলেছি যোশীমঠ হিন্দুর কাছে একটি মহাতীর্থ। কিন্তু এটি যে শুধু হিন্দুরই তীর্থস্থান, তা নয়। যেখানে নারায়ণের বা মহাদেবের কিম্বা অন্য কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানই হিন্দুর পবিত্রতীর্থ; কিন্তু যেখানে দেবোপম মানব আপনার শান্ত, শুদ্ধ, পবিত্র চরিত্রে চারিদিক মধুর স্নিগ্ধ ক'রে রাখেন, এবং মানবের ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতার অনেক ঊর্দ্ধে দেবমহিমায় বিরাজ করেন সেস্থান শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, সেস্থান বিশাল মানবজাতির সাধারণ তীর্থক্ষেত্র। দেবতার উদ্দেশে উপহার প্রদানের জন্য সেখানে কেহ ফল পুষ্পাদি নিয়ে যায় না বটে কিন্তু নিখিল মানবহৃদয়নিঃসৃত ভক্তি ও প্রীতির পুণ্য সৌরভে সেই দেবমানবের অমর কীর্ত্তি-মন্দির পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে।

এই যোশীমঠ একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্ত্তিমন্দির; শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং এইখানেই তাঁর জীবনের অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছিল অতএব বলা বাহুল্য যে যোশীমঠ শুধু ভক্তহিন্দুর কাছে নয়, ঐতিহাসিকের কাছে বিশেষ আদরের সামগ্রী। শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে তত্ত্ব নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং সেজন্য কোনরকম চেষ্টাও করিনি; চেষ্টা কল্লে হয়ত একটু ফললাভ হ'ত কিন্তু বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করে সেরূপ করা যে এক মহা দোষের কথা! আমরা প্রত্নতত্ত্ব লিখি

কিন্তু তাতে নিজস্ব কতটুকু জিনিষ থাকে? কেবল তর্জ্জমা করি, এবং একজন বৈদেশিক কঠোর পরিশ্রম ও আজীবন সাধনাদ্বারা যে সত্যটুকু আবিষ্কার ক'রে গেছেন, তারই উপর টিকা, টিপ্পনী, ভাষ্য ও মন্তব্য যোগ করে, দোষগুণের প্রতি সূক্ষ্ম আলোচনাদ্বারা আপনাদের পাণ্ডিত্য স্তূপাকারে ফাঁপিয়ে তুলি, এই ত আমাদের ক্ষমতা! আজকাল শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল নিয়ে বঙ্গসাহিত্যে বেশ একটু আলোচনা চল্‌চে কিন্তু আমাদের মনে হয় সে আলোচনা আন্তরিক নয়, এবং তা ইতিহাসে জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যহীন উপায় মাত্র। কিন্তু বাস্তবিকই যদি এ সম্বন্ধে একটা সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণে গভীর আগ্রহ জেগে উঠ্‌তো, তাহলে কি আমরা স্থির থাক্‌তে পাত্তুম? কখন না। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল রচনা, প্রাচীনগ্রন্থ, অনুশাসন ও নিদর্শনাদি যোশীমঠে আছে শুনা গেল, তাতে বুঝলুম একটু বেশী চেষ্টা কল্লেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা নিঃসন্দেহে জান্‌তে পারা যায়, কিন্তু আমি মূর্খ, সংসার বাসনা বিরহিত সন্ন্যাসী মাত্র, কাজেই সেদিকে আমার মন যায়নি, কিন্তু বাস্তবিক যাঁরা ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারে বদ্ধপরিকর তাঁদের কিন্তু এই সমস্ত দুর্গম, পার্ব্বত্য প্রদেশে এ'সে সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকাই উচিত। যাহোক অন্যান্য দেশ হ'লে এরকম আশা করা অন্যায় হো'ত না কারণ সে সকল দেশের লোক জীবনটা শুধু অসার ও মায়াময় ব'লে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে রাজি নয়, যাতে সমাজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল নির্ভর করে এমন কাজে তারা প্রাণপণে নিযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গে যখন একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন আর একদল অকম্পিত হৃদয়ে সেই উচ্ছৃঙ্খল স্রোতের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, আমাদের কাছে জীবন স্বপ্ন, জগৎ মায়াময়, সংসার মরুভূমি তুল্য, কোন রকমে চোক মুখ বুজে যদি চল্লিশটা বছর পার হতে পারি তাহলে আমাদের আর পায় কে? ইহজীবনের কাজে ইস্তফা দিয়ে শৈশবের সুখস্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হই, না হয় পৌত্র পৌত্রীতে পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাদের সঙ্গে নানারকম প্রীতিকর সম্বন্ধ পাতিয়ে পুরাণো, মরচেপড়া রসিকতার প্রবৃত্তিকে কিছু উজ্জল ক'রে তুলি। আমাদের দিয়ে দেশের আবার উপকার হবে! যোশীমঠে উপস্থিত হ'য়ে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নানারকম কথা শুন্‌তে শুন্‌তে নিজের সম্বন্ধে আমার মনে এই প্রকার ভাবেরই উদয় হ'চ্ছিল। দুঃখ বেশী হলে মনের মধ্যে নিজের দুর্ব্বলতার কথাই বেশী বাজে; এ কথার উপর কোন যুক্তি তর্ক নেই এবং কোন দার্শনিক যদি এই মত খণ্ডন করবার জন্য প্রস্তুত হন, তাহলে আমি সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক মনে করি না।

যাহোক যোশীমঠে এসে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যে সকল কথা মোটামুটি জান্‌তে পেরেছিলুম তারই এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। এ সমস্ত কথার সঙ্গে ইতিহাসের কতটা মিল আছে তা আমি বল্‌তে পারিনে, ঐতিহাসিকেরা তা বুঝতে পারবেন, তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে পথেঘাটে সাধু সন্ন্যাসীদ্বারা যে সমস্ত তত্ত্ব সংগৃহীত হয় তার মধ্যে অনেক গলদ থাকাই সম্ভব।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুর চারিটি মহাতীর্থে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। তাঁর আবির্ভাব-কালে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্প্রভ ও জড়তা সম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রাচীন ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত প্লাবিত হয়ে যায়। হিন্দুধর্ম্মের এই অধোগতির পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন ভেদ করে তার যে পুনরুত্থান হয় তা মহাভারতীয় যুগের সেই তেজোময় মহাপ্রতাপসম্পন্ন কর্ম্মশীল জীবনের একটা বিরাট কম্পনে হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ কর্ত্তে পারেনি সত্য কিন্তু তা যে হিন্দুসমাজে এক নব প্রাণের সঞ্চার করেছিল তার আর সন্দেহ নেই; শঙ্করাচার্য্যই এই নব প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ চতুষ্টয়ই তাঁহার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। দ্বারকায় তিনি যে মঠ স্থাপন করেন সেই মঠের নাম "শারদা মঠ," সেতুবন্ধরামেশ্বরে স্থাপিত মঠের নাম "সিঙ্গিরী মঠ," পুরুষোত্তমে "গোবর্দ্ধন মঠ," এবং হিমাচলের এই দুর্গম প্রান্তে "যোশীমঠ" যুগাতীত কাল হতে বিস্তীর্ণ ভারতে তাঁর অমরকীর্ত্তি ঘোষণা কচ্চে। স্থানমাহাত্ম্যের অনুসরণ কল্লে এই মঠ বদরিকাশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বদরিকাশ্রম বৎসরের মধ্যে আটমাস বরফে ঢাকা থাকে সুতরাং সেখানে বাস করা অসম্ভব বুঝে সেস্থানের পরিবর্ত্তে এখানেই মঠ স্থাপিত হয়েছে। এই মঠ অতি পুরাণো, পুরাণো ব'লেই মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালের যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রেছেন তাতে কারও কারও মতে তিনি ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে এবং কারও কারও মতে আরও দুই শ বৎসর পরে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বদরিকাশ্রমে যাওয়ার পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছিল, কথা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠ্‌লে তিনি বল্লেন স্বামীজী (শঙ্করাচার্য্য) অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আরো বল্লেন যে তাঁর সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হলে এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর প্রমাণও দেখাতে পারতেন, যোশীমঠে অনেক পুরাণ পুঁথি ছিল, তার কতক কতক নানারকম বিপ্লবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু সেই হস্তলিখিত কীটদষ্ট জীর্ণ প্রাচীনগ্রন্থের কতকগুলি এই মঠে বর্ত্তমান আছে এবং আমরা যদি পুনর্ব্বার যোশীমঠে যাই তাহলে মঠাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের আহ্লাদের সঙ্গে তাহা দেখাইবেন। সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয় তাতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা, তাৎকালিক রাজনীতি, হিন্দুধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মাদির উন্নতি, বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্ম্মআস্থা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। এই সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন গুপ্ত সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকার সাধন করা যেতে পারে তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে এই দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ করবে? আমাদের দেশে এখনো সে সময় আসেনি এবং আমরা এখনো এই ব্রত গ্রহণ করবার উপযুক্ত হইনি। সত্যের জন্য প্রাণ দেবার কথা বহুপূর্ব্বে শুনা যেত বটে।

মনে করেছিলুম বদরিকাশ্রম হতে ফেরবার সময় যোশীমঠ সম্বন্ধে কতকগুলি ত
সংগ্রহ করে নিয়ে যাব কিন্তু নানারকম বাধাবিঘ্ন ঘটায় আর সে বিষয়ে হাত দিতে পারি
জীবনে কখনো যে সে আশা পূর্ণ হবে তারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমা
উৎসাহশীল, ইতিহাসপ্রিয় কোন পাঠক এই দেশহিতকর কাজে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে চা
যদি এই সমস্ত লুপ্ত প্রায় গুপ্ত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উপযুক্ত মনে করেন তা হ
যোশীমঠ ছাড়া এমন আরো দুচারিটি স্থানের নাম করতে পারি যেখানে সন্ধান কল্লে অনে
প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার হতে পারে।

আমরা যে পথে যোশীমঠে গেলুম সে পথটি পাহাড়ের গায়ে, মধ্যে আঁকা বাঁ
পথের দুধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান, দোকানগুলি নিতান্ত সামান্য, তার প্রায় অধিকাং
দোতলা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষগুলি যেন পর্ব্বতের গায়ে মিশিয়ে রয়েছে। কলিকাতার ব
বড় অট্টালিকা গুলিতে যাঁরা চিরদিন বাসকরে আস্‌চেন, তাঁরা এই ছোট ছোট ঘরগু
দেখ্‌লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে এইটুকু ঘরে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ মানু
কিরূপে বসবাস করে। এই কথা বৈদান্তিক ভায়াকে বলাতে তিনি একটা পৌরাণি
গল্পের অবতারণা কল্লেন। কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হলেও তার একটা সংক্ষিপ্ত সার পাঠক মহাশয়দে
উপহার দেওয়া যেতে পারে। বৈদান্তিকের মুখে শুন্‌লুম পূর্ব্বকালে এক ঋষি ছিলেন (নামটি
বেশ জাঁকাল রকম, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি) সেই ঋষি অনেক বৎসর যাবৎ তপস্
করার পর তাঁর কেমন সখ হোল যে একটুখানি ঘর তৈয়েরি করে তার নীচে মাথ
রেখে দিনকতক আরামে কাটাবেন, কিন্তু মানুষের পরমায়ুর কথাত আর বলা যায় না
যদি শীঘ্রই পরমায়ু শেষ হয় তবে খামকা একখানা ঘর তোলা কেন? তাই একবার ধ্যা
করে পরমায়ুর শেষ মুড়োর অনুসন্ধান করা হলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখলেন তাঁ
পরমায়ুর আর মোট পাঁচ হাজার কি সাড়ে পাঁচ হাজার বছর বাকি আছে, অতএব এ
সামান্য কালের জন্যে ঘর তুলে আবশ্যক কি? এই সিদ্ধান্ত করে তিনি এক গাছতলা
বসেই সেই সামান্য কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে একদিন একটি বড় গোছে
দেবতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর দেবতাটি বল্লেন 'আপনার ঘর
তোলার কথা শুনা গিয়েছিল তার কি হলো?'—আমাদের অল্পায়ু ঋষি ঠাকুরটি উত্তর
দিলেন যে "মোটে পাঁচ হাজার বছর, তা আবার ঘর।"—অর্থাৎ যদি দুপাঁচ লাখ বছর
বাঁচবার সম্ভাবনা থাকৃতো তাহলে একদিন একটা ঘর তৈয়েরী কল্লেও করা যেত।
বৈদান্তিক এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপদেশ জুড়তেও ছাড়লেন না; তিনি বোল্লেন এই ঘটনা
হতে বুঝা যাচ্ছে ইহলোককে আমরা কত তুচ্ছজ্ঞান করি, পরলোকই আমাদের স্থায়ী
বাসস্থান; দিন কতকের জন্য এই ইহলোক প্রবাসে এসে তিন চার তালা বাড়ী তুলে
স্থায়ী রকমে বাসের বন্দোবস্ত, সে কেবল যুরোপীয় গণের বিলাসরসসিক্ত দুর্ব্বল অন্তঃ-
করণের পক্ষেই শোভা পায়, এবং তাদের অনুকরণ প্রিয় দেশীয়গণ সম্বন্ধেও একথা খাটতে

পারে। এই কথায় বৈদান্তিকের সঙ্গে দারুণ তর্ক বেধে গেল, আমি বল্লুম "হ্যাঁ, য়ুরোপীয় গণের এ একটি দারুণ ত্রুটি বলে অবশ্য স্বীকার কর্ত্তে হবে কারণ তাঁরা যে কয়টা বছর বাঁচেন তাতে তাঁদের মহাপ্রাণী একটু সুখ সচ্ছন্দতা, একটু আরাম এবং তৃপ্তি অনুভব করবার অবসর পায়, আর তাঁরা যে কিছু কাজ করেন তাতেও তাঁদের নাম গুলিকে কিছু দীর্ঘকাল ইহলোক স্থায়ী করবার কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্‌টো ব্যবস্থা, জীবনটি পরিপূর্ণ মাত্রায় অপব্যয় করাই আমাদের বৈরাগ্যের প্রধান লক্ষণ।" যাহোক সুখের বিষয় স্বামীজির বিশেষ যত্নে আমাদের এই আন্দোলন অতঃপর নিবৃত্তি হয়ে গেল; আমরা চল্‌তে চলতে বাজার দেখতে লাগ্‌লুম, দেখ্‌লুম বাজারে সকল রকম জিনিষই পাওয়া যায়, এমন কি সোণারূপার কারিকর এবং টাকা কড়ি লেনদেনের মহাজন পর্য্যন্ত এখানে আছে। এসকল এখানে থাকবার কারণ যোশীমঠ বদরি-নারায়ণের মোহান্তের "হেড্ কোয়াটার", তিনি এখানে সশিষ্যে বাস করেন; এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পাহাড়ী ভূটিয়া ও নেপালী গণ বদরিকাশ্রমে বাস করে তারা শীত কালে সেখানে থাক্‌তে না পেরে এখানে নেবে এসে কয়েক মাস কাটিয়ে গ্রীষ্মকালে আবার দেশে ফিরে যায়।

যোশীমঠের দুমাইল নীচে পাহাড়ের পাদদেশে বিষ্ণু প্রয়াগ, বিষ্ণু প্রয়াগেও অনেক লোক বাস করে, কিন্তু তাছেড়ে আর খানিক আগে গেলে আর লোকালয় দেখা যায় না। বল্‌তে গেলে বদরিকাশ্রমের রাস্তায় বার মাসের লোকালয় এখানেই শেষ, তবে এর পরেও দু'একটি যায়গা আছে সেখানে কোন কোন বছর শীতের প্রাবল্য কিছু কম হ'লে দুই একঘর লোক বাস করে থাকে। কিন্তু যোশীমঠের মত এমন আড্ডা আর নেই।

এই সকল কারণেই যোশীমঠ একটি সহরের মত। কিন্তু সে সকল প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন আজও যোশীমঠে বর্ত্তমান আছে তা দেখবার কি বুঝবার লোক বড় একটা দেখা যায় না। আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দাতব্যচিকিৎসালয়ের পাশে একটা দোকানে আশ্রয় নিলুম।

পূর্ব্বেই বলেছি যোশীমঠের রাস্তা পাহাড়ের গায়ে, যোশীমঠের পাহাড়টা একটু বাঁকা তাই রাস্তাও বাঁকা, এই বাঁকের অল্প নীচেই খানিক সমতল স্থান, এইস্থান টুকু এক বিঘার কিছু বেশী হবে, তারই উপর, পর্ব্বতের কোলের মধ্যে হিন্দুর গৌরব স্তম্ভ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বিরাজিত। মন্দিরটি বেশী বড় নয়, আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম মন্দিরের চূড়া ততদূর পর্য্যন্তও উঁচু নয়।

আমরা দোকানে আর বিশ্রাম কল্লুম না। লাঠি আর লোটা দোকান ঘরে ফেলে তখনই মঠ দর্শনে বের হওয়া গেল। যোশীমঠের রাস্তা দিয়ে নীচে নামতে নামতে রাস্তার পাশে আর একটা মন্দির দেখ্‌তে পেলুম, এই মন্দিরে প্রবেশ করি কিনা ভাবচি এমন সময় একজন পথপ্রদর্শক জুটে গেল তার সঙ্গেই আমরা মন্দিরে প্রবেশ কল্লুম, দেখলুম মন্দিরটা বহু কালের পুরাতন, কত শতাব্দীর বিপ্লব এবং পরিবর্ত্তনের নীরব ইতিহাস যে এই প্রাচীন মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরে বন্দী আছে তা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু

এ মন্দির এতই দৃঢ় যে তা একটা জমাট পাহাড়ের স্তূপ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মনে হোল সৃষ্টির শেষদিনেও তা হতে একখণ্ড পাথরও বিচ্যুত হয়ে পড়বেনা। আমাদের পথ প্রদর্শক বল্লে এ মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করিনি তখন মনে হয়েছিল অন্যান্য মন্দিরে যা দেখি এখানেও হয়ত তাই দেখ্‌বো; সেই অনাদি শিবলিঙ্গ না হয় অনন্ত শালগ্রামশিলা, খুব বেশী হয়ত হাত পা ওয়ালা এক নারায়ণ মূর্ত্তি। কিন্তু মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে কোন মূর্ত্তিই আমার দৃষ্টিগোচর হোল না, শুধু মন্দিরের মাঝখানে তিন হাত কি সাড়ে তিন হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া একখান সিঁদুর মাখান জিনিষ তা কাঠও হতে পারে, পাথরও হতে পারে আবার লোহা কি ইস্পাত হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, কারণ তেল সিঁদুর ছাড়া তার কোন স্বরূপ অবধারণ কর্ত্তে পাল্লুম না। প্রথমে মনে কল্লুম হয়তো বা লোকে এই আসন-খানাই পূজা করে। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক যে এক রোমহর্ষণ কাহিনী ব'ল্লে তা শুনে আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠ্‌লো। তার মুখে শুন্‌লুম যে এইখানে এক দেবীমূর্ত্তি বহুকাল হতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, নররক্ত ভিন্ন অন্য কোন রক্তে তাঁর পিপাসা দূর হোতো না বলে তার সম্মুখে প্রতিদিন নিয়ম মত নরবলি দেওয়া হতো, এতদ্ভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কোন কোনদিন এত মনুষ্যমুণ্ড দেহচ্যুত হতো যে তাদের উচ্ছ্বসিত শোণিতপ্লাবনে মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হয়ে যেত। সে বল্লে যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক এই জায়গায় আমার পায়ের নীচে শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি এই পাশবিক অনুষ্ঠানের অনুরোধে নিহত হয়েছে; বোধ করি তাদের অবরুদ্ধ মর্ম্মোচ্ছ্বাস নিরাশ ক্রন্দনে পাষাণ প্রাচীর ভেদ করবার পূর্ব্বেই তাদের জীবনের উপর চির অন্ধকারের যবনিকা পতিত হয়েছে। আমি সভয়ে সম্মুখে চেয়ে দেখলুম, বোধ হতে লাগলো শত শত রক্তাপ্লুত, ছিন্ন মস্তক হ'তে শোণিতস্রোত তীরবেগে ছুটে আস্‌ছে আর ঘাতকের পৈশাচিক নৃত্য ও অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক কম্পিত হচ্ছে। হায় দেবি, কতকাল হতে তুমি মাতার সুপবিত্র, স্নেহ কোমল এবং নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ অধিকার হরণ করে সন্তানের উষ্ণ রুধিরে আপনার লোল জিহ্বা তৃপ্ত করেছ! কিন্তু তোমারই বা দোষ কি, তোমাদের নামে মানুষ প্রতিদিন অসঙ্কোচে কত কুকার্য্যই না করে?

কিন্তু কতদিন দেবী স্থানচ্যুত হয়েছেন তা ঠিক জানতে পাল্লুম না। কেহ কেহ বলেন শঙ্করাচার্য্য যখন যোশীমঠের প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় তিনি এই পাশবিক কাণ্ড নিবারণ করেন; সেই সময় হতে দেবীমূর্ত্তি বিমুখ অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রোথিত হয়েছেন, এখন শুধু তাঁর শূন্য আসনখানিই দেখা যায় এবং তারই পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু কারো কারো মতে এই বিপ্লব শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা সাধিত হয়নি, এ সম্বন্ধে তাদের প্রধান যুক্তি এই যে শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের একজন অবতার বিশেষ, এমন কি অনেকে তাঁর স্কন্ধে শিবত্ব পর্য্যন্ত আরোপ করে থাকে। সেই শঙ্করাচার্য্য যে এমন একটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কাজ করে

ফেলবেন এ কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে রাজী নন। কিন্তু এরা বোঝে না যে ধর্ম্মের সংস্কার ও বিনাশ এক কথা নয় সুতরাং ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য যে কাজ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে নি[illegible]ন্ত সহজ, এরা তা ধর্ম্ম বিনাশক ঠিক করে কখনই মনে ভাবতে পারে না যে এমন অধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্য দ্বারা কিরূপে সাধিত হতে পারে? যাহোক এ সম্বন্ধে এদের মতও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এরা বলে বৌদ্ধেরা যখন এখানে আসেন তখনই তাঁরা এই ঘৃণিত প্রথা বন্ধ করেছিলেন। এই দুই মতের কোন মত সত্য তা অনুমান করা কঠিন। এই বিষম অপ্রীতিকর যায়গায় আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পাল্লুম না, দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ কল্লুম, বোধ হতে লাগলো শত শত নরকঙ্কাল আমার পাছে পাছে ছুটে আসচে।

মন্দির হতে বার হয়ে একেবারে যোশীমঠে উপস্থিত হলুম। বাহিরে একটা ঝরণা হতে অবিরাম জল পড়ছে, সেই ঝরণার কাছ দিয়ে একটা ছোট দ্বারপথে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ কল্লুম। দেখি, একটা দোতলা চক, বাইরে টানা বারাণ্ডা, মধ্যে ছোট ছোট কুঠরী। বাহিরে অনতিদীর্ঘ একটি উঠান, তিনদিকে দোতলা কোঠা এবং একদিকে মন্দির। [illegible]নুচ্চ মন্দির, মন্দিরের মধ্যে দিনের বেলাতেই ভয়ানক অন্ধকার। সচরাচর মন্দিরের মধ্যে যেখানে মূর্ত্তি থাকে, এই মন্দিরে সেখানে তাকিয়া-বেষ্টিত স্থূল গদি দেখ্‌তে পেলুম, এইটি শঙ্করাচার্য্যের গদি। এই গদি বাঁ পাশে রেখে অগ্রসর হতেই দেখি এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তেমন জাঁকাল নয়, বিশেষ একটা অন্ধকারময় কুঠুরীতে পড়ে তাঁর মাহাত্ম্যও খুব খাট হয়ে গিয়েছে ব'লে বোধ হ'ল।

মন্দির হতে বেরিয়ে উঠোনের এক পাশে বসলুম। উঠানটি [illegible] বাঁধান, দেখলুম সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ কোলাহল কচ্ছে। একজন পা[illegible] একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করছে যে সেখানে দুদণ্ড অপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো; কোথায় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠে উপস্থিত হয়ে আমরা শান্তি আনন্দ উপভোগ করবো—না পাণ্ডাঠাকুরদের বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্য হিমালয়ের শৈত্য এবং শান্তিময় ক্রোড়স্থিত এই পরম পবিত্র তীর্থস্থান এক বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঠ নিয়ে যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হয়ে গিয়েছে তা শুন্‌লে মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হয়, পাঠক মহাশয়দের অবগতির জন্য মঠের সেই শোচনীয় ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করচি।

শঙ্করাচার্য্য এই মঠের ভার ত্রোটকাচার্য্য গিরির হাতে সমর্পণ করে যান। এই মঠ তিন শ্রেণী সন্ন্যাসীর অধিকারে থাকে, গিরি, পুরী ও সাগর। সন্ন্যাসী মহাশয়েরা সহসা এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্মটা আর ঠিক রাখতে পাল্লেন না, দীর্ঘকালের কঠোর সংযম এবং বৈরাগ্যকে বিলাস সাগরে ভাসিছে শুষ্ক প্রাণে প্রচুর আরাম সঞ্চয় কর্ত্তে লাগলেন। ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু শারীরিক সুখ সম্ভোগই তাঁদের জীবনের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো, ক্রমে তাঁদের অবস্থা এ রকম হয়ে পড়লো যে মঠ আর চলে না, এই অবস্থায় একজন মঠাধ্যক্ষ "গিরি" সন্ন্যাসী অন্য সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসীর

সঙ্গে জুয়া খেলে যথাসর্ব্বস্ব হারান। শেষে এই মঠ বাজি রেখে খেলা আরম্ভ করেন দুর্ভাগ্যক্রমে মঠটিও হারাতে হয়, সন্ন্যাসী ঠাকুরের যে রকম জেদ তাতে তাঁর যদি দ্রৌপদী থাক্‌তো তাহলে তাঁকেও হয়ত পণে ধরতেন, যাহোক তা না থাকলেও এখানেই এক পর্ব্ব অভিনীত হয়ে গেল। সর্ব্বত্যাগী হয়েও যিনি ইচ্ছা করে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনার মনপ্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এখন বাধ্য হয়ে তাঁকে নিবৃত্তির অঙ্কে আশ্রয় নিতে হ'ল ও আসক্তি বর্জ্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী সাধুর মত সমস্ত ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হ'লো; কিন্তু তাঁর এই চিরন্তনের বিলাসক্ষেত্র ছেড়ে যেতে যে দারুণ আঘাত লেগেছিল মায়াবদ্ধ গৃহীর নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মভেদী যাতনা অপেক্ষা তা অল্প নয়।

যাহোক যে সন্ন্যাসী এই মঠ লাভ কল্লেন, তিনি ইহা দক্ষিণ শ্রেণী ব্রাহ্মণদের কাছে বিক্রয় কল্লেন, তাঁরাই এখন এই মঠের অধিকারী, সুতরাং বদরিনারায়ণের মন্দির আজও তাঁদের দখলে। শুনলুম এ পর্য্যন্ত সাতাশ জন রাওল ব্রাহ্মণ এই মঠের অধ্যক্ষতা ক'রে গেছেন। তাড়িত সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী কেবলানন্দ গিরি এখন নেপালে আছেন শুনা গেল। তিনি অতি মহৎ লোক। এই মন্দির হস্তগত করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা কচ্ছেন, তিনি বলেন মঠ দান বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার সম্পত্তি নহে, কিম্বা মঠাধ্যক্ষের সে অধিকারও নাই, তিনি আজীবনকাল মঠের সত্ত্বাধিকারী মাত্র, তাও যদি তিনি পবিত্রভাবে মঠের সকল অনুশাসন মেনে চলেন তা হ'লেই। কলুষিত চরিত্র বা ভ্রষ্টাচারী হ'লে তাঁকে মঠচ্যুত হ'তে হবে। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের আদেশ, অতএব কেবলানন্দ গিরির এই মঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জানিনা এই মঠ নিয়ে ভবিষ্যতে কখন মামলা মকদ্দমা হওয়া সম্ভব আছে কি না।

বিস্তৃত মঠ প্রাঙ্গণে বসে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে মঠের শোচনীয় ইতিহাস শুন্‌তে লাগলুম। মহিমান্বিত যোশীমঠের এই শোচনীয় কাহিনী আমার মনে শুধু মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং হীন স্বার্থপরতার কথাই জাগিয়ে দিতে লাগলো। দূর হতে মনে হতো যারা সংসার ত্যাগী নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী তাঁরা যে পথ অবলম্বন করেছেন, মুক্তির পক্ষে সেই প্রশস্ত পথ এবং তাঁরা এই সংসার তাপদগ্ধ ক্লিষ্ট পার্থিব হৃদয়ের অনেক ঊর্দ্ধে শান্তি ও প্রীতির সুশীতল ছায়া উপভোগ করেন; মনে হয়েছিল এই সকল পবিত্র তীর্থে তাঁহাদের দর্শন করে, এবং তাঁদের কাছে সান্ত্বনার কথা শুনে হৃদয়ের অশান্তি ও দুর্ব্বলতা খানিকটে দূরে যাবে, চতুর্দ্দিকের বাহ্য প্রকৃতি এবং দেবোপম মানব প্রকৃতি শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র ও পরিতৃপ্ত ক'রে তুলবে; সেই আশাতেই এতদূরে এতকষ্ট করে এসেছিলুম। বাহ্য প্রকৃতি তার অনন্ত সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত করে আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে, এই স্বর্গীয় শোভা আমার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু মানবের সে দেব হৃদয় কই? সেই আত্মত্যাগ ও সমদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং যা দেখবার আশাতে এতদূর এসে পড়েছি তা কোথায়?

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরে এলুম। যে সন্ন্যাসীর কাছে যোশীমঠের ইতিহাস শুনা গিয়েছিল তিনিও মঠের বাহিরে এসে এক পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ কল্লেন, বহুকাল যাবৎ তিনি এই গুহাতেই বাস ক'রে আস্‌ছেন। আমরা আহারাদি শেষ ক'রে আজ এখানে বিশ্রাম করবো এরকম ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্বামীজি কিছুতেই থাকৃতে চাইলেন না। অপরাহ্নে আমরা যোশীমঠ ত্যাগ কল্লুম।

যোশীমঠের দাতব্য চিকিৎসালয়টি বেশ বড়। এই পথে অনেকগুলি চিকিৎসালয় আছে কিন্তু এমন একটিও নয়। এতদ্ভিন্ন এখানে একটি থানা আছে, এপথে যখন যাত্রীর বেশী আমদানী হয় তখন পাহারাওয়ালারা ধড়া চূড়া 'পরে সমারোহ পূর্ব্বক এদিক ওদিক করে ঘুরে বেড়ায়। যোশীমঠে নদী নেই, দুমাইল নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নদী না থাকাতেও লোকের জলকষ্ট ভোগ কর্ত্তে হয় না। কারণ এখানে তিন চারটে ঝরণা আছে তারই জল স্থানীয় লোকের ব্যবহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

শ্রীজলধর সেন।

ভারতের আর্থিক অবস্থা।

(২)

মোগলদের আমল হইতে ইংরাজাধিকার কালে যে এ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই দেখান গিয়াছে। আমাদের দেশ পরাধীন হইলেও আমাদের ইংলণ্ডকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু কর দিতে হয় না। বিদেশী ধন, যাহা আমাদের দেশে আসিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার শুদ বাণিজ্যের লাভ হইতে কাটাইয়া দিয়া তাহার ব্যবহারের মুনফা আমরা আত্মসাৎ করিতেছি। দেশ রক্ষার জন্য জলে ও স্থলে সেনারক্ষার এবং বিলাতের ভারত তত্ত্বাবধায়ী সভার সমস্ত ব্যয় পর্য্যন্ত বাণিজ্যের মুনফা হইতে যাইতেছে, আমাদের গায়ে লাগিতেছে না। এতদ্ব্যতীত বৎসর বৎসর গড়পড়তায় প্রবেশ ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বাণিজ্য হইতে খাস মুনফা পাইতেছি। তথাপি কেন যে ভারতবর্ষ এরূপ দরিদ্র তাহা সহসা ধারণা করা দুরূহ। কিন্তু পদে পদে ইহার এত অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিশ্বাস না করিয়া আর আমাদের চারা নাই। যে দেশে জন হিসাবে বাৎসরিক গড় আয় লর্ড ক্রোমারের মতে ২৭ টাকা হইতেও কম* ; যে দেশের জীবনধারণোপযোগী

---

* স্যার এভেলিন বেয়ারিং গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অনুসন্ধানদ্বারা এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু দাদাভাই নৌরোজি বলেন উহা ২০ টাকার অধিক হইতে পারে না। যাহাই হউক ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে আমাদের গড়পড়তা আয় বাৎসরিক ২৭ টাকা হইলেও নিম্নশ্রেণীস্থ প্রতিব্যক্তির আয় আসলে উহা হইতেও যে অনেক কম হইবে তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মাথাপিছু গড় আয় আমাদের ২৭ টাকার স্থলে প্রায় ৩৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০ শত টাকারও অধিক। ইয়ুরোপের মধ্যে তুরস্ক সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ তথাপি ইহার মাথাপিছু গড় আয় ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫০ টাকা। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সাধারণলোকের অবস্থা যে কত মন্দ তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য অতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও বৎসরের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্য প্রায় ৪০ লক্ষ লোক অনাহারে অথবা একাহারে মৃতের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে—ে দেশের দারিদ্র্য অস্বীকার করিলে চলে কৈ ? মাঘ মাসের রাত্রিতে অনাবৃত গাত্রে উন্মু আকাশের নীচে বসিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া শীতের অভাব বলিলে চলিবে কেন? এই দেশব্যা দারিদ্র্য নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহার কারণ জানা আবশ্যক ব্যাধি কি তাহা সম্যক না বুঝিলে তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবে ?

এই দারিদ্র্য ব্যাধির কারণ দুই শ্রেণীভুক্ত। প্রথমতঃ নৈতিক, দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক। নৈতি কারণগুলি আমাদের স্বভাবপ্রসূত, তাই ব্যাধি উপশমের পক্ষে অধিকতর বিঘ্নোৎপাদক এবং সেই জন্যই অধিকতর যত্নের সহিত চিকিৎসনীয়, এগুলির অপনয়ন হইলে বাহ্যি কারণসমূহের বিনাশ সহজ সাধ্য হইয়া উঠিবে। নৈতিক কারণগুলি এই, আমাদের নিশ্চেষ্টতা আলস্য, এবং বৃথা লজ্জা ও অপমানের ভয়। আমরা বাঁধা মাহিনা, বাঁধা আয়, যেমন বুঝি এম বোধ করি সংসারের অপর কোন জাতিই বুঝে না। আমরা আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান বিসর্জ্জ দিয়া গৃহিণীর অঞ্চলধারী হইয়া সহস্র অপমান ঈষৎ ম্লানবদনে অবাধে সহ্য করিব, কিন্তু তথাপি প্রাণ থাকিতে বাড়ীর বাহির হইয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। আমাদে মেরুদণ্ডের অভাব, আমরা সোজা হইয়া মানুষের মত করিয়া নিজের পদের উপর ভর রাখিয় দাঁড়াইতে পারি না। এমন কি, যদি আমাদের বাড়ীর সম্মুখে প্রচুর পরিমাণ অর্থ পড়িয় থাকে তথাপি সহজে তাকিয়ার ঠেস ত্যাগ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইব না, উঠিবার আলস্যে দশবার ভাবিব, উহা নীতি সঙ্গত কি না, উহাতে ঐহিক অথবা পারত্রিক অমঙ্গলের কোনও রূপ সম্ভাবনা আছে কি না। ততক্ষণে হয়ত পাড়াপড়শীরা তাহা আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা অতিসাবধান। ডগবেরির দর্শন আমাদের মূল মন্ত্র—Discretion আমাদের নিকটে better part of valour! এই অতি সাবধানতাই আমাদের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বাঁধা হিসাবের গণ্ডি পার হইতে না পারিলে, অতিসাবধানতার এই নিবিড় বন্ধন উচ্ছেদ করিতে না পারিলে আর আমাদের মঙ্গল নাই—নচেৎ স্বয়ং ধন্বন্তরি আসিয়া চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেও রোগ উপশম হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। নিশ্চেষ্টতা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া ইংরাজি Enterprising Spiritকে বরণ করিতে পারিলেই তবে দারিদ্র্য-অসুরের নিপাতন সম্ভবপর, নচেৎ নহে। দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরতা, অধ্যবসায় এবং স্বাধীনজীবিকা উপার্জ্জনের স্পৃহা আমাদের চরিত্রে বল সম্পাদন না করিলে আর কিছুতেই আমাদের আশা নাই।

বাহ্যিক কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, পূর্ব্বেকার হইতে এখন রৌপ্যের ক্রয়শক্তি কমিয়া আসিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাব ও দ্রব্যাদির মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের রোজগার সে পরিমাণে বাড়ে নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মধ্যবিৎ শ্রেণীর মধ্যে যে পরিমাণ অভাব যে পরিমাণ ব্যয় বাড়িয়াছে সে

মাণ আয় বৃদ্ধির তেমন সুযোগ ঘটে নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধেও অনেকটা ইরূপ। তাই দেশে ধনাগম সত্ত্বেও আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। আমাদের মধ্যে হারা ধনী, তাঁহারা অধিকাংশ অর্থই হয় ঘরে বসাইয়া রাখিতেছেন না হয় কোম্পানীর াগজাদিতে খাটাইতেছেন। যে টাকা ব্যাঙ্কে রাখা হইতেছে সে টাকা অন্যদের অধিক দে ধার দিয়া বিদেশী ব্যাঙ্কওয়ালারা লাভ করিতেছে। আবার বিদেশী সওদাগরেরা সই টাকা কর্জ্জ লইয়া কারবার চালাইয়া শুদ সমেত কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া লাভ করিয়া ইতেছে। দেশের বাণিজ্যকার্য্য এক প্রকার বিদেশীয়দের হস্তে একচেটিয়া রহিয়াছে লিলেই হয়। আমাদের আয় বৃদ্ধির যে সমস্ত পথ আছে তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়েরা র্ব্ব হইতে অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই কারণে আমাদের বাণিজ্য ও ন্যান্য উপায়ে লাভের মোটা অংশ বিদেশীয়দের হস্তে পড়িতেছে, এবং ইচ্ছা করিলেই াহারা সে ধন বা তাহার লভ্য স্বদেশে লইয়া গিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছে। কাজেই হাতে আমাদের লোকসান বই বিশেষ লাভ নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণের দর বৃদ্ধি ও রৌপ্যের দর হ্রাস হওয়া। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য নেকটা স্বর্ণব্যবহারী দেশের সঙ্গে। তাই সোণার দাম বেশী বাড়ার দরুণ সেই সকল শের আমদানী দ্রব্যের দর পূর্ব্ব হইতে এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আর, তাহারা ান কতকগুলি জিনিষপত্র চালান দেয় যাহা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, যেমন পরিধেয় । অথচ আমরা দেশে অতদূর সস্তা মূল্যে কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি না, কাজে-জেই পূর্ব্বের হইতে অধিক মূল্য দিয়াও এখন তাহা আমাদের ক্রয় করিতে হইতেছে। হা ব্যতীত বাৎসরিক "হোমচার্জ্জ" বলিয়া যে টাকা আমাদের বিলাতে পাঠাইতে হয় াহা, এবং বিলাতী মূলধন যাহা এ দেশে খাটিতেছে তাহার শুধ, এক্সচেঞ্জ কম হওয়ার ঙ্গে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এ দুইটি ছাড়া এ দেশে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী াছেন টাকার দর কমার দরুণ তাহাদের যে লোকসান সহ্য করিতে হইতেছে তাহার ক্ষতি রণ বাবদ আমাদের বাৎসরিক এক কোটি টাকারও অধিক তাহাদের দিতে হইতেছে। ইরূপ নানাম্ কারণে আমাদের অনেক লোকসান সহ্য করিতে হইতেছে। দারিদ্র্য উপশমের শু উপায় কিছু উদ্ভাবন করিতে না পারিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ াস্থিত হইবে। অদূরদর্শিতাবশতঃ এই অমঙ্গলের প্রকৃত দানব-মূর্ত্তি হয়ত আমরা আপাততঃ াক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না, কিন্তু এখন হইতে প্রতিকারের উপায় চিন্তা না করিয়া রূপ ভাবে আর কিছু দিন চলিতে দিলে আর আমাদের কোন উপায়ই থাকিবে না, ভের মধ্যে তখন ক্ষয়কাশ ফুসফুসিকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিবে, ব্যাধি উপশমের র কিছু মাত্র আশা থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায় ইহার দুইটি মাত্র উপায় আছে— থমতঃ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য স্থাপনা করা। দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণব্যবহারী শসমূহ হইতে আমদানী যথাসম্ভব কমান।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িলে বিদেশী সওদাগরদের ... অনেক কমিয়া আসিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লভ্যও দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। এখন আমাদের দেশ হইতে কার্পাষ ইংলণ্ডে যাইতেছে এবং সেখান হইতে বস্ত্র ও সুতা প্রস্তুত হইয়া পুনরায় এ দেশে আসিয়া বিক্রয় হইতেছে। তুলা কিনিতেছে বিদেশী ব্যবসাদারেরা, ইংলণ্ডে যাইতেছে বিদেশী ব্যবসাদারদের জাহাজে করিয়া, সেখানে বিদেশী কলওয়ালারা তাহা লইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। পুনরায় আবার সওদাগরের হাত দিয়া জাহাজে করিয়া এ দেশে বিদেশীয় হৌস ওয়ালাদের নিকট আসিতেছে, সেখান হইতে পাইকারেরা কিনিয়া লইয়া সাধারণকে বি... করিতেছে। কাজেই লাভের গোটা অংশটাই তাহাদের হস্তগত হইতেছে। তাহা না হ... যদি আমাদের দেশে কাপড়ের কল করিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা যায় ত... জাহাজওয়ালাদের যাতায়াতের ভাড়া দিতে হইবে না, এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত করান বশ... পারিশ্রমিকের ব্যয়ও অধিক লাগিবে না এবং সোণার দাম বাড়া বশতঃ এ সমস্তের উপর আর এত অধিক দর বাড়িয়া যাইবে না। লোকে খুব সস্তা দরে কাপড় কিনিতে পারিবে উপরন্তু, লভ্যটা দেশের লোকেই পূর্ণমাত্রায় পাইবে, এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইবে। বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের কল আছে কিন্তু দেশে তাহার কাটতি ... নাই বলিলেই হয়—জানজিবার, ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি স্থানেই তাহা রপ্তানী হইয়া থাকে। বিলাতী কাপড়ের মত অত 'ফাইন' হয় না বলিয়া উহা আমাদের পছন্দসই নহে। কি... দেশে যদি উহার সমধিক প্রচলন হইত তবে একটার স্থানে এখন দেশে দশটা কল দেখা যাইত এবং কাপড়ও দিন দিন ভাল প্রস্তুত হইতে থাকিত। ব্যবসা বাণিজ্যে মতি থাকা বশতঃই পার্শীদের আর্থিক অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিদের অপেক্ষা এত উৎকৃষ্ট। ... সম্বন্ধে তাহাদের নিকট হইতে ভারতের অপরাপর জাতির অনুকরণ করিবার যথেষ্ট আছে।

এইরূপে কাপড়, দিয়েশেলাই, সাবান, সুগন্ধদ্রব্যাদি দেশে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। এ দেশে এখনও বহুবিধ দ্রব্য পড়িয়া আছে অথচ বিশেষ কোনও কাজে লাগিতেছে না—তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যদি কোন উপায়ে ব্যবসায়ে উপযোগীরূপে পরিণত করা যাইতে পারে, তবে দেশের বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেরূপ সামান্য সামান্য দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যবসায়ের উপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা দেখিলে বা শুনিলে আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদেরও সেই সকল দিকে লক্ষ্য দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

এইরূপে দেশে অত্যাবশ্যকীয় ও অল্পাবশ্যকীয় নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিলে সোণার দর বৃদ্ধি হওয়ার দেশের যে লোকসান হইতেছে তাহাও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিবে। ভারতবর্ষ যতকাল ইংলণ্ডের অধীনে থাকিবে ততদিন "হোমচার্জ্জ" আমাদের দিতেই হইবে। তবে বোধ করি সে সম্বন্ধেও আমাদের পক্ষে সুবিধার

* আমাদের দেশের অপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের পারিশ্রমিক অন্যূন চতুর্গুণ অধিক।